দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—

গল্প-সংকলন

সম্পাদনা

বারিদবরণ ঘোষ

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ।। ৯ শ্যামচরণ দে স্ট্রীট ।। কলকাতা ৭০০০৭৩

BHARATBARSA
GALPA-SANKALAN

প্রচ্ছদপট ।। অজয় গুপ্ত

নাথ পাবলিশিং-এর পক্ষে সমীরকুমার নাথ
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ।। কলকাতা ৭০০০০৯ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
অজন্তা প্রিন্টার্স ।। ৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট ।। কলকাতা-৭০০০০৯ কর্তৃক মুদ্রিত।

একশত পঞ্চাশ টাকা

সম্পাদকীয় ভূমিকা

'দেখুন অধরদা, আপনি চাকরিটি ছেড়ে দিন তো দেখি'—দ্বিজেন্দ্রলালের মুখে হঠাৎ এই অদ্ভুত অনুরোধ শুনে আত্মীয় অধরচন্দ্র মজুমদার তো অবাক। সবিস্ময়ে তিনিও তাই বলে উঠলেন—'ওকি, চাকরি ছেড়ে কি অমনি অমনি চুপ করে বসে থাকবো? একটা কিছু তো করতেই হবে।'

এবার ভাবনায় পড়লেন দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং। পরে একটু ভেবে নিয়ে বললেন—

'হুঁ। সেটা একটা কথা বটে। তা দেখুন, আমিও ভাবছি, এই চাকরীটার ২৫ বছর পূর্ণ হলে,—আর তা' হতেও বড় বাকি নেই,—এ কাজ থেকে পেন্সন নেব। তখন, বেশ ধীরে-সুস্থে. মনের মতন করে' বেশ একটা নূতন ধরনের Ideal ('আদর্শ') মাসিক কাগজ বার করা যাবে। লেখকের তো আর অভাব নাই? এই ধরুন না—রাঙ্গাদা, সেজদা, অক্ষয় মৈত্রেয়, পাঁচকড়ি, সুরেশ, দেবকুমার, বিজয়, সুরেন মজুমদার, অক্ষয় বড়াল, আপনি, দাদামশায়, আমি তো আছিই—তা ভিন্ন আরও-সব কতই তো জানাশোনা নামজাদা লেখক সব রয়েছেন। সকলে মিলে যদি কোমর বেঁধে', তেমন ভাবে লিখতে শুরু করি ত' আর ভাবনা কি?...দেখবেন অধরদা, এমন কাগজই বার কর্ব যে, দেশশুদ্ধ লোকের একেবারেই 'তাক্' লেগে যাবে। আপনিও তখন আমার মত এই কাজ নিয়েই ব্যাপৃত থাকতে পারবেন ; আর অমন গোলামি করার দরকার হবে না।'

কথা হচ্ছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সুরধাম'-এ বসে দুজনে অন্তরঙ্গে। এখানে রাঙ্গাদা হলেন হরেন্দ্রলাল রায়, সেজদা জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এবং দাদামহাশয় প্রসাদদাস গোস্বামী। দ্বিজেন্দ্রলালের মাথায় এই পত্রিকা-প্রকাশের খেয়াল চেপেছিল 'ইভনিং-ক্লাবের' এক প্রস্তাব থেকে। এই ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল ক্লাবের মুখপত্র হিসেবে একটা ক্লাব-ম্যাগাজিন প্রকাশ করার। বিখ্যাত পুস্তকপ্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এই ক্লাবের একজন উৎসাহী সভ্য এবং দ্বিজেন্দ্রলালের খুব প্রিয়ভাজন ছিলেন। তাঁকে বলা হল একটা ক্লাব ম্যাগাজিন বের করতে কিরকম খরচ পড়বে। তিনি যা হিসেব দিলেন তাতে একটা ক্লাবের পক্ষে এমন কাগজ বের করা অসম্ভব মনে হল। সবার মন খারাপ হল তাতে। তা দেখে হরিদাসবাবু একটি প্রস্তাব দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে রাখলেন—

'আপনি যদি স্বয়ং সম্পাদক হ'তে স্বীকার করেন ত' আমি নিজ ব্যয়ে, বাঙ্গলা দেশে প্রকাশিত আর-সমস্ত মাসিক পত্রের চেয়ে বড় ও আপনারই নামের যোগ্য, একখানি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র বাহির করার ভার-গ্রহণে সম্পূর্ণ রাজী আছি।'

শুনে সোল্লাসে দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন—'বেশ, তা হলে এ কাগজ এখনই বাহির হউক। আমিও খুব শীঘ্র পেন্সন লইয়া নিজেকে ইহার সম্পাদকপদে নিযুক্ত করিয়া দিব।' এই শুভ প্রস্তাব থেকেই 'ভারতবর্ষ'-এর জন্ম। প্রথমে ঠিক ছিল বৈশাখ মাসেই কাগজ বের হবে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের পেন্সনের আবেদন মঞ্জুর হতে দেরি হল বলে 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হল ১৩২০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে। ঠিক হয়েছিল 'কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ যুগ্ম-সম্পাদক' হবেন, ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৭ই চৈত্র বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের উদ্দেশ্যে একটি প্রচারপত্র ছেপে বিলি করলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় :

'বাঙ্গালা দেশে যে সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকার অভাব আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অন্যান্য সভ্যদেশের তুলনায় আমাদের দেশে মাসিক পত্রিকার সংখ্যা যে কম তাহা আর বলিতে হইবে না। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর

মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা করিয়াছি। বঙ্গ সাহিত্যের জনৈক সুপ্রতিষ্ঠিত মনীষী আমাদের সঙ্কল্পিত পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।'

বলা বাহুল্য তখন 'প্রবাসী'র মতো পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে চলেছিল, তবুও এই বিজ্ঞাপন। তাছাড়া, এই 'জনৈক মনীষী'ই যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়--তা বলে দেবারও প্রয়োজন নেই। 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় প্যারাগন প্রেসে তাঁর কাগজ ছাপতে দিলেন। কিছু টাকা অগ্রিমও দিলেন। ৪/৫ ফর্মার কম্পোজ উঠলো। প্যারাগন প্রেসের ম্যানেজার জলধর সেন প্রথম ফর্মার পেজ সাজিয়ে যেদিন দ্বিজেন্দ্রলালের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন, জলধর সেন স্মৃতিচারণা করে লিখেছেন--'সেই দিনই সেই ফর্মার প্রুফ দেখতে দেখতেই অকস্মাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল অমরধামে চলে গেলেন।' প্রসঙ্গত, পরিকল্পিত পত্রিকার প্রুফ দেখতে দেখতেই দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়েছিল--এমন দাবী করেছেন জলধর। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকারেরা (দেবকুমার রায়চৌধুরী এবং নবকৃষ্ণ ঘোষ--দুজনেই) লিখেছেন--স্বপ্রণীত 'সিংহল-বিজয়' নাটকের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করতে করতেই তিনি রোগাক্রান্ত হন।

নানা বাগ্‌বিতণ্ডার পর স্বদেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের প্রস্তাবমতো পত্রিকার নামকরণ হয়েছিল 'ভারতবর্ষ'। কিন্তু সেই পত্রিকার সম্পাদকরূপে তাঁকে আর পাওয়া গেল না। তাঁর প্রবর্তিত আদর্শ ও নীতি অনুসারে পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ব্যগ্র হয়ে পড়লেন। পত্রিকা প্রকাশিত না হলে তাঁদের প্রকাশনাও বিরাট সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের সমকক্ষ সাহিত্যিক কে আছেন, যে তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া যায়। সম্পাদক হিসাবে অন্তত দ্বিজেন্দ্র-নীতি অনুসরণ করে চলবেন এমন একজন সম্পাদকের জন্য অনুসন্ধান চলতে লাগল। নানা নাম প্রস্তাবিত হল--বিশেষ করে হাইকোর্টের জজ সারদাচরণ মিত্রের নাম। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নাম 'স্বতই উদয়' হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল জলধর সেনের নাম। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তো ছিলেনই। জলধর বিনয়ের সঙ্গে লিখেছেন তাঁকেই 'সহযোগিতা' করার জন্য তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল। আসলে জলধরই হলেন মুখ্যসম্পাদক শেষ পর্যন্ত। দুজনের যুগ্ম সম্পাদনায় ভারতবর্ষ আষাঢ় ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম পর্ব প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্রে মুদ্রিত হয়েছিল :

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত / ভারতবর্ষ / সচিত্র মাসিক পত্র / প্রথম বর্ষ--প্রথম খণ্ড / আষাঢ়-অগ্রহায়ণ / ১৩২০ /- সম্পাদক / শ্রীজলধর সেন, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ / -/ প্রকাশক / শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স / ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা /

আর ছাপা হয়েছিল ঃ

'২০১ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট হইতে শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও ২০৩/১/১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট "প্যারাগন প্রেস" হইতে শ্রীগোপালচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।'

॥ ২ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুতে সম্ভাব্য সম্পাদকের পদে বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের (১৮৪৮-১৯১৭) নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল নানা কারণে। এই প্রসিদ্ধ বিদ্যানুরাগী আইনজীবী বিদ্যাপতির পদাবলীর সটীক সংস্করণ প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। 'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', 'ভারতরত্নমালা' ইত্যাদি পুস্তক তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছিল। কিন্তু এই পদে তাঁর মনোনয়ন সেকালের পাঠক-লেখকগোষ্ঠী অনুমোদন করতে পারেননি। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া জানতে পারি রেঙ্গুন থেকে বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা (ডাকমোহর ২৪ মে ১৯১৩) একটি চিঠি থেকে। এই চিঠিতে 'দ্বিজুদার মৃত্যুসংবাদে...স্তম্ভিত' শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিলেন :

'তোমাদের 'ভারতবর্ষে'র সত্যই বড় দুরদৃষ্ট। আমি ভাবিয়াছিলাম, হয়ত এ কাগজ আর বাহির হইবে না। বাহির হইলেও খুব সম্ভব টিকিবে না। কারণ ইহার আসল আকর্ষণই অন্তর্হিত হইয়া গেল। যদি সম্ভব হয় অন্য সম্পাদক করিয়ো না। সারদা মিত্র কি করিবেন? তিনি ভাল জজ এবং তৃতীয় শ্রেণীর সমালোচক। 'কমপাইলার'ও বটে, লেখা অত্যন্ত মামুলি ও পুরান ধরনের। তিনি খুব সম্ভব 'ফেলিওর' হইবেন। সাহিত্য-পরিষদের মোড়ল হওয়া এক, মাসিক কাগজের সম্পাদক হওয়া আর। তিনি সাহিত্যিক নন এটা মনে রাখিয়ো! অবশ্য তোমরা কলিকাতায় থাক, আমরা মফঃস্বলে থাকি ; এসব মতামত আমরা দিতে পারি না। দিলেও তোমাদের কাছে সেটা বোধকরি তেমন গ্রাহ্য হইবে না--যাই হোক, যাহা ভাল বুঝিলাম, বলিলাম। এবং তাঁহাকে সম্পাদক করিলে যাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহাই জানাইলাম।'

এই অবস্থায় শরৎচন্দ্রের নিজেরই ইচ্ছে হয়েছিল, 'কোন নামজাদা সম্পাদকের আড়ালে থাকিয়া কাগজটা 'এডিট' করিয়া দু-এক মাস চালাইয়া দিতে।' দূর রেঙ্গুনে থাকায় সে ইচ্ছা পূরণ হবার ছিল না। সারদাচারণ মিত্র সম্পর্কে তাঁর আশঙ্কা ৩১ মে ১৯১৩ তারিখের চিঠিতেও তিনি ব্যক্ত করেছিলেন--'এ কি সারদাবাবুর দ্বারা হবে? ওর চেয়ে তোমার যোগ্যতা বেশী।...এ 'সিলেকশন' একেবারেই ভাল হয়নি।'--ইত্যাকার। এবং সারদাচারণ সম্পাদক থাকলে তিনি লিখবেন না--এমন ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন।

অনুমান করি এমনতর আরও মতামত প্রকাশকদের বিচলিত করে তুলেছিল। তাই সারদাচরণকে বাদ দিয়ে তাঁরা জলধর সেনের কথা ভাবলেন। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তো আগে থেকেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। এখন তাঁর সহযোগী করে নির্বাচন করা হল জলধর সেনকে। কিন্তু জলধর কেন?

নানা পত্র-পত্রিকায় লিখে জলধর ইতিমধ্যে সাহিত্যিক হিসাবে সুপরিচিত হয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হবার আগে তিনি 'ভারতী ও বালক', ভারতী, সাহিত্য, নবপর্যায় জাহ্নবী, মানসী, ধ্রুব, বিজয়া, প্রদীপ, দাসী নির্মাল্য, ঢাকা রিভিউ ও সম্মেলন প্রভৃতি পত্রিকায় লিখে যথেষ্ট নাম করেছিলেন। প্রবাসচিত্র, হিমালয়, নৈবেদ্য, পথিক, হিমাচলবক্ষে, দুঃখিনী, পুরাতন-পঞ্জিকা, বিশুদাদা, হিমাদ্রি, সীতা দেবী, করিম সেখ, আমার বর ও অন্যান্য ছোটগল্প প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা হিসাবে লেখক হিসাবেও সুপ্রতিষ্ঠিত। 'প্রবাসচিত্র' পুস্তকের পরিবেশক এবং 'হিমালয়' প্রভৃতি পরবর্তী গ্রন্থাদির প্রকাশ ইত্যাদিসূত্রে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পুত্র হরিদাসের সঙ্গে এর আগেই জলধরের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল। এ বিষয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ একটি চমকপ্রদ বিবরণ লিখে গেছেন :

'প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশক হইয়া জলধরবাবুর সহিত তাঁহার হিতৈষী অভিভাবকের মত ব্যবহার করিতেন। একবার জলধরবাবু পুস্তক বিক্রয়ে তাঁহার প্রাপ্য আনিতে যাইলে--যখন তাঁহাকে হিসাব ও প্রাপ্য টাকা দেওয়া হইল, তখন গুরুদাসবাবু তাঁহার প্রিয় কর্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "অনন্ত, আন ত।" অনন্ত একগাছি স্বর্ণহার আনিলে গুরুদাসবাবু তাহা জলধরবাবুকে দিয়া বলিলেন, "এটি বৌমাকে দিবেন।" সেই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে জলধরবাবু কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। গুরুদাসবাবু মৃদুস্বভাব ছিলেন--জলধরবাবুকে বলিলেন, "সাবধানে নিয়ে যাবেন--পথে যেন না হারান!" '

যদি ভাবি, এই ব্যক্তিগত যোগাযোগ জলধরকে সম্পাদক হিসাবে নির্বাচনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল, তবে উভয়ের প্রতিই অবিচার করা হবে। আসলে জলধরের লেখক-সত্তার অতিরিক্ত একটি সম্পাদক-সত্তা তাঁকে পত্র-পত্রিকা জগতে যথেষ্ট লোভনীয় করে তুলেছিল। জলধরের একটি দীর্ঘ-সম্পাদক জীবন ছিল। ভারতবর্ষ-সম্পাদনের আগে সম্পাদক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল প্রায় তিরিশ বছরের। ছ'টি নানাধরনের পত্রিকা

সম্পাদনাসূত্রে শিক্ষক জলধরের জীবন সম্পাদকের জীবনে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর জীবনের মর্মমূলে বসে যে মানুষটি তাঁকে নিত্য প্রেরণা দিয়ে এসেছিলেন সেই কাঙাল হরিনাথ (হরিনাথ মজুমদার) সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক গ্রামবার্তা-প্রকাশিকা' পত্রিকাতেই তাঁর প্রথম রচনা 'ভজহরির মেলা দর্শন'-এর প্রকাশ এবং পত্রিকা-সম্পাদনায় হাতেখড়ি (বৈশাখ ১২৮৯)। বন্ধু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সহযোগিতায় তিনি আশ্বিন ১২৯২ পর্যন্ত এই পত্রিকার পরিচালনভার গ্রহণ করেছিলেন। তখন বয়স তাঁর তেইশ বছর প্রায়। অবশ্য এখানের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বিষয়ে জলধর মন্তব্য করে গেছেন—'গ্রামবার্তা'র সে শিক্ষানবিশী ভবিষ্যতে সংবাদপত্র সেবায় আমাকে বিশেষ কিছু সাহায্য করেনি।...কলিকাতায় সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে প্রবেশকে আমি নূতন ক্ষেত্রে প্রবেশ বলে মনে করেছিলাম।'

কলকাতার সংবাদপত্র জগতের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ঘটল 'বঙ্গবাসী'র হাত ধরে। 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির চেষ্টায় জলধর মহিষাদল থেকে কলকাতায় এসে মাসিক ৩০্ টাকা বেতনে 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিলেন। এখানে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কাল মাত্র দেড় মাস। কিছুতেই এর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি বটে কিন্তু কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন—বঙ্গবাসীর যোগেশচন্দ্র ছিলেন 'কলিকাতায় বাংলা সংবাদপত্র ক্ষেত্রে আমার প্রথম আশ্রয়দাতা।'

এরপর ১৩০৬ সালের ১৫ বৈশাখ থেকে তিনি যোগ দিলেন 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র সহকারী সম্পাদক হিসেবে। সম্পাদক তখন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুদিন পর তিনি সম্পাদকত্ব ত্যাগ করলে সম্পাদক হন জলধর। কলকাতার সাহিত্যিকমহলে যেমন তাঁকে পরিচিত করে তুলেছিলেন বন্ধু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, তেমনি সংবাদপত্র জগতে এখন তাঁকে সহায়তা করতে এলেন জলধরের আহ্বানে পুরানো ছাত্র-বন্ধু দীনেন্দ্রকুমার রায়। আট বছর ধরে তিনি সম্পাদকত্ব করলেন। তারপর একে-একে কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভগিনী, কন্যা ও স্ত্রীকে হারিয়ে জলধর উন্মাদপ্রায় হয়ে সব ছেড়ে দেশে চলে গেলেন। তাঁর সম্পাদকত্ব কালের (১৮৯৯-১৯০৭) মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯০৩ সালে দিল্লি দরবারে সম্পাদকরূপে যোগদান। একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল এসময়ে। বসুমতীর কর্ণধার স্বয়ং উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই দরবারে যোগ দিয়েছিলেন সামান্য একজন রিপোর্টার হিসেবে।

দেশে তো চলে গেলেন। কিন্তু অন্নচিন্তা চমৎকারা। অতএব কলকাতাতেই ফিরতে হল তাঁকে তিন চার মাস পরেই। কলকাতায় এসে বেড়াতে যেতেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকার আড্ডায়। ব্রহ্মবান্ধবের আহ্বানে প্রতিদিন দুটি টাকার বিনিময়ে জলধর মাত্র কয়েকটি দিনের জন্য 'সন্ধ্যা'র সঙ্গে যোগ দিলেন। ঠিক এই সময়েই উপেন্দ্রনাথ সেনের কাগজ 'হিতবাদী'র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদ জাপান থেকে ফেরবার সময় জাহাজেই মারা যান। উপেন্দ্রনাথ কালবিলম্ব না করে সখারাম গণেশ দেউস্করকে দিয়ে জলধরকে ডেকে আনিয়ে প্রস্তাব দিলেন—"দেখ জলধর, তোমাকে হিতবাদীর ভার নিতে হবে।" সখারাম তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এই শর্তে জলধর সেদিন থেকেই প্রথমে 'হিতবাদী'র 'সেবক', ও পরে সখারাম এই পত্রিকা ত্যাগ করলে 'সম্পাদক'পদে বৃত হলেন (ডিসেম্বর ১৯০৭)।

এখানের সম্পর্ক ত্যাগ করে এবার তিনি সন্তোষের জমিদার প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর ছেলেদের গৃহশিক্ষকরূপে দুবছর থাকার পর নরেন্দ্রনাথ সেনের 'সুলভ সমাচারে'র সঙ্গে যুক্ত হন বছর দেড়েকের জন্যে। 'সুলভ সমাচার' উঠে গেলে জলধর বেকার হলেন পুনশ্চ। তাই শুনে পূর্বোক্ত জমিদার প্রমথনাথ রায়চৌধুরী জলধরকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর 'প্যারাগন' প্রেসের ম্যানেজার করে দিলেন। এখন যেখানে ভারতবর্ষের পুরানো বাড়ি। (শ্রীমানী মার্কেটের কাছে ২০৩/১/১ বিধান সরণি) সেটি আগে ছিল ঘোড়ায় টানা ট্রাম কোম্পানির

ঘোড়াদের আস্তাবল। সেই আস্তাবলের ঘরগুলো ভাড়া নিয়ে প্রমথনাথ এই প্রেস খুলেছিলেন। এই প্যারাগন প্রেসেই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা ছাপার ব্যবস্থা হয়েছিল, আগেই সেকথা বলে এসেছি।

॥ ৩ ॥

'ভারতবর্ষ'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার পরিকল্পনা, লেখা নির্বাচন, এমনকি সম্পাদকীয় পর্যন্ত রচনা করে গেছিলেন স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল। কাজেই এখানে যুগ্ম-সম্পাদক জলধর এবং অমূল্যচরণের সম্পাদকীয় হাতের কোনো স্পর্শ পাওয়া যাবে না। তবুও ইতিহাস হিসাবে সংখ্যাটির গুরুত্ব অপরিসীম। এটিতেই শিল্পী দ্বিজেন্দ্র গোস্বামী অঙ্কিত 'ভারতবর্ষ' নামে একটি চিত্র (সমুদ্রের ঢেউ থেকে ভারতমাতা উঠছেন। মাথায় মুকুট। গলায় সাতনরি হার। ডান হাতে শস্যগুচ্ছ। আকাশে একপাশে উদীয়মান চন্দ্র ও অন্যদিকে বিলীয়মান সূর্য) দ্বিজেন্দ্রলাল-রচিত বিখ্যাত কবিতা ভারতবর্ষ-এর (যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ। পৃঃ ৩-৪) স্বরলিপিসহ মুদ্রিত হয়ে পত্রিকার নামকরণকে সার্থক করেছিল। মোট ১৫২ পৃষ্ঠার মধ্যে পাঁচটি পূর্ণপৃষ্ঠা রঙীন ছবি পত্রিকার সৌন্দর্যপ্রকাশক। একটি ছবির নীচে দ্বিজেন্দ্রলালের উক্তি মুদ্রিত—'উজল করিয়া আছে দূরে সেই আমার কুটিরখানি।' আমরা এই প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত রচনাবলীর একটি সূচীপত্র একালের পাঠকদের অবগতির জন্যে মুদ্রিত করে দিলাম।

মুখপত্রে 'জ্যাটকার' যে ছবিটি ছাপা হয়েছিল তার পরিচয়-পংক্তি ছিল এই প্রকার : বিশ্বাস। আশা। বদান্যতা।

প্রথম বর্ষ ছাপা হয়েছিল প্যারাগন প্রেসে। ব্লক তৈরি করে দিতেন জি. এন. মুখার্জি, মহিলা প্রেস। দ্বিজেন্দ্রলালের দুটি ছবিও, যার মধ্যে একটি মৃত্যুশয্যার, এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। [ফাল্গুন ১৩২০ থেকে পত্রিকাটি ছাপা হতে শুরু করেছিল ১২ সিমলা স্ট্রিটস্থ দি এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে। রচনাগুলি অলঙ্করণে প্রভূত ইলাস্ট্রেশনের ব্যবহার ভারতবর্ষ পত্রিকার প্রথমাবধি বৈশিষ্ট্য ছিল। এ নিয়ে সাধুবাদ ও নিন্দাবাদ দুই-ই হয়েছিল পরে তার উল্লেখ করছি।]

পাঠক একবার প্রথম সংখ্যার সূচী লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন গল্প-উপন্যাস-কবিতা ছাড়া কি বিচিত্র-বিদ্যার আয়োজন এটিতে করা হয়েছিল। যে 'বিবিধ-প্রসঙ্গ' ভারতবর্ষের অন্যতম আকর্ষণ ছিল (যা সমগ্রত সংগৃহীত হলে এক বিশ্বজ্ঞানের মহৎ গ্রন্থে পরিণত হতে পারে) তার সূচনা হয়েছিল প্রথম সংখ্যাটিতেই। কলকাতা বিষয়ক গবেষণার সূত্রপাতও এখানেই ঘটে। এবং রবীন্দ্রনাথকে সম্মান দিয়েই এই সংখ্যার চিত্রসূচী গর্বিত। বাস্তবিকই সম্পাদকীয় সূচনাতে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিলেন—'আমাদের শাসন-কর্তারা যদি বঙ্গ সাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।' তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল আরও লিখেছিলেন 'আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষয় প্রদীপ হইতে এই ক্ষুদ্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া শঙ্খ-ঘণ্টায় মাতার আরতি করিতে আসিয়াছি।' পরবর্তী সম্পাদকদ্বয় সেই প্রদীপে ঋদ্ধ-ঘৃতের নিয়মিত সরবরাহকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁর আদর্শকে

সমুজ্জ্বল রাখার যে চেষ্টা করেছিলেন তাতে জলধর সেনের ভূমিকাটি যে গণনীয় ছিল, তা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হবে।

॥ ৪ ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হল। "তখন চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। 'ভারতবর্ষে'র কর্মকর্তাগণ কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। অনেকের নাম প্রস্তাবিত হল। অবশেষে হরিদাসবাবু আমাকেই দ্বিজেন্দ্রলালের শূন্যপদে জোর করে বসিয়ে দিলেন। আমি এ সৌভাগ্যের আশাও করিনি এবং এজন্য কোন চেষ্টাও করিনি।" (স্মৃতিতর্পণ, ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৪৩)

দ্বিজেন্দ্রলালের শূন্যপদে এসে বসলেন তাঁরই সহপাঠী জলধর। তাঁকে প্রথম বছরে সহযোগিতা করলেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। পত্রিকার পৃষ্ঠায় উভয়কেই যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে ঘোষণা করা হল। তাঁরা যে দ্বিজেন্দ্রলালের উচ্চ আদর্শকে ধরে রাখতে উদ্যোগী এবং সমর্থ হয়েছিলেন তা প্রথমবর্ষের সমস্ত সংখ্যার সূচীপত্র লক্ষ্য করলে সহজেই অনুধাবন করা যায়। প্রথম সংখ্যার উল্লেখনীয় লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন অনাথকৃষ্ণ দেব, অশ্বিনীকুমার দত্ত, আব্দুল করিম, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, নিখিলনাথ রায়, নিরুপমা দেবী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, প্রতিমা দেবী, বিজয়চাঁদ মহাতাব, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, বিপিনবিহারী গুপ্ত, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, হরিদাস পালিত, হেমনলিনী দেবী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কৃষ্ণদয়াল বসু, জগদানন্দ রায়, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বিশ্বপতি চৌধুরী, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সুরূপা দেবী এবং আরও বহুজনের সঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের জন্য ভারতবর্ষকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে। ছবি এঁকেছিলেন অন্যান্যদের মধ্যে ভবানীচরণ লাহা, স্পার্ট, আর্থার সি. বেল, ফণীন্দ্রনাথ বাগচী, চারুচন্দ্র রায়, পি. ঘোষ, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র পালিত প্রমুখ শিল্পীগণ। এছাড়া K. V. Seyne & Bros থেকে প্রচুর ছবি এনে ছাপানো হয়েছিল।

পত্রিকার প্রকাশকদের সঙ্গে মতভেদের ফলে অমূল্যচরণ যুগ্ম-সম্পাদকের পদ থেকে সরে এলেন। একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই তিনি ভারতবর্ষের সমতুল্য একটি পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়ে ১৩২১ বঙ্গাব্দে চারুচন্দ্র মিত্রের সহযোগে 'সংকল্প' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। আটটি সংখ্যা প্রকাশের পর অর্থনৈতিক কারণে এটি বন্ধ হয়ে যায়। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার দীর্ঘজীবনের পশ্চাতে অর্থনৈতিক বল ও নিরাপত্তা একটা মুখ্য কারণ ছিল।

প্রথমবর্ষের শেষে "ভারতবর্ষে"র গত বর্ষ নামে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল ঃ

'বাঙ্গালায় যাঁহারা সাহিত্যের ধুরন্ধর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের রচনাসম্ভারে "ভারতবর্ষ" এই এক বৎসরকাল অলঙ্কৃত হইয়াছে।...এতদ্ভিন্ন নবীন লেখকের রচনারাশিও 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়া তাহাকে যে কেবলই নিন্দিত করিয়াছে, এমন কথা আমাদের কোনও সমালোচকও বলেন না। এই সকল লেখকের রচনা ব্যতীত ভারতবর্ষে অনেক নূতন বিষয় নূতন প্রণালীতে দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

"ভারতবর্ষ" যখন আসরে নামিল, তখন একটা কথা উঠিয়াছিল, এই শ্রেণীর

মাসিকপত্রের কি অভাব আছে? ঠিক এই প্রশ্নের আবৃত্তি-প্রতি নূতন মাসিকপত্রের আবির্ভাবকালেই হয়।...

মাসিকপত্রের অবস্থা এখন যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, সকলেই পাঁচফুলে সাজি সাজাইয়া পাঠক-দেবতার সেবায় লাগাইতেছেন...। একটা ধুয়া উঠিয়াছে, লোকে গল্প-কবিতা-নাটক-উপন্যাসে মশগুল হইয়া পড়িয়াছে, তাই গভীর বিষয়ের আলোচনা পড়িতে চায় না...আমরা কিন্তু সে কথা মানি না! হাটে বল করিয়া দাঁড়াইতে হইলে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, সমালোচনা প্রভৃতি কোন বিষয়ই তো বাদ দিতে পারা যায় না।...'

এই আদর্শ অনুসরণ করেই ভারতবর্ষ পরবর্তী বর্ষে পদার্পণ করল। দ্বিতীয় বর্ষের আরম্ভে পণ্ডিত অমূল্যচরণ চলে গেলে 'বঙ্গনিবাসী'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সহযোগী হলেন। তৃতীয় বৎসরে তিনিও চলে গেলেন। সেই থেকে সুদীর্ঘকাল আমি একাকী 'ভারতবর্ষ' নিয়ে বসে আছি।" (স্মৃতিতর্পণ, ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৪৩)

॥ ৫ ॥

অতএব চতুর্থ বর্ষের সূচনা থেকে (আষাঢ় ১৩২২) আমৃত্যু জলধর ছিলেন 'ভারতবর্ষে'র অবিসংবাদী সম্পাদক। দীর্ঘ চব্বিশ বছরের একক দায়িত্বে ভারতবর্ষ ক্রমশ উন্নতির সোপানে আরোহণ করতে লাগল। দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই তিনি আরও নবীন-প্রবীণ লেখক-লেখিকাকে 'ভারতবর্ষে' ঠাঁই দিতে শুরু করলেন। অমলা দেবী, অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্ত, অক্ষয়কুমার সরকাব, অনঙ্গমোহিনী দেবী, ইন্দিরা দেবী, কাঞ্চনমালা দেবী, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ সোম [বস্তুত বাংলায় মধুসূদন-চর্চার সূত্রপাত জলধর সেনের উদ্যোগেই আরম্ভ হয়েছিল], পরমেশপ্রসন্ন রায়, প্রফুল্লময়ী দেবী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বটুকনাথ ভট্টাচার্য, বিনয়কুমার সরকার, বিভূতিভূষণ ভট্ট, মন্মথনাথ ঘোষ, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, রাধাগোবিন্দ চন্দ্র, রামপ্রাণ গুপ্ত, শশাঙ্কমোহন সেন, শিবরতন মিত্র; সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ লেখকদের রচনায় ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ হয়েছিল। পরবর্তী বৎসরগুলিতে একই প্রক্রিয়ায় নবীন-প্রবীণদের আহ্বান-আমন্ত্রণ অব্যাহত থাকল। ফলে অচিরেই 'ভারতবর্ষে-র' আকর্ষণ বাঙালী পাঠকের কাছে অনিবার্য হয়ে উঠল। সঙ্গের একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্রসম্পদ ভারতবর্ষের নান্দনিক প্রসাদবর্ধনে নিরলস থাকল। প্রতি মাসের প্রথমেই পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ যেন প্রবাদে পরিণত হল। এর পাশে প্রবাসী ছাড়া অন্য পত্রিকাগুলি যেন ম্লান। 'যমুনা'র কথা স্মরণ করে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় একটি তুলনামূলক চিত্র এঁকেছেন ঃ

'তখন অভাব-অসুবিধার উভয়কূল-ব্যাপী বালুকারাশির মধ্যে 'যমুনা' নিতান্তই শীর্ণকায়া। গ্রাহক-সংখ্যা শ' দুই-আড়াইয়ের বেশি নয়, নগদ বিক্রয় তদপেক্ষাও কম। কার্তিক মাসের পূজার সংখ্যা বাজারে নামে পৌষ মাসে,...বিনা পয়সার কমপ্লিমেন্টারি কাগজ প্রতিমাসে বোধহয় শ' দেড়েক-দুই বিতরিত হয়।...চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থা ; শান্তি-সন্তুষ্টি কোনোদিকেই দেখা যায় না, একমাত্র বিনা-পয়সার খদ্দেরদের দিক ছাড়া।'

শুধু যে অর্থ এবং লেখক থাকলেই পত্রিকা সম্পাদনা করা যায় না, চিরদিনের সম্পাদক জলধর সে-কথা জানতেন। পত্রিকাকে তিনি পাঠকের গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য বিবিধপ্রকার আয়োজন করতেন। বাঙালী প্রীতি ছিল তাঁর প্রবাদস্থলীয় কিন্তু ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ এবং বিশ্বকে বঞ্চিত করে যে পত্রিকার তথা বাংলাসাহিত্যের

উন্নতি করা যাবে না, তা তিনি জানতেন। শুধু বাণিজ্য-সফল পত্রিকা সৃষ্টি তাঁর লক্ষ্য ছিল না, ছিল বাংলা সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করার পরিকল্পনা। তিনি নিজে একজন সাহিত্যিক ছিলেন, তাই সাহিত্যের মর্যাদা ও প্রসার তাঁর লক্ষ্য ছিল। 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকেরা বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে কেমন করে বিশ্বসাহিত্যের সংযোগ ঘটিয়ে চলেছেন তা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। 'ভারতবর্ষে'ও অনুবাদ এবং বিদেশী নানা সংবাদ পরিবেশিত হতে থাকল। 'নিখিল প্রবাহ' ও 'বৈদেশিকী' নামক দুই স্তম্ভ ভারতবর্ষের বিদেশ-চর্চার অন্যতম নিদর্শন। কবি নরেন্দ্র দেব তাঁকে এ-বিষয়ে সহযোগিতা করতেন অন্যান্যদের মধ্যে। একইসঙ্গে প্রাদেশিক সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে যে একটা জাতীয় সংহতি গড়ে ওঠে, তা বহুপূর্বেই তিনি অনুধাবন করেছিলেন। তাছাড়া তুলনামূলক সাহিত্যচর্চার একটা দিগন্তও এতে উন্মোচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ পূর্ণদায়িত্ব নেবার পরই প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অধ্যাপক রসিকলাল রায় মাঘ ১৩২২ এবং বৈশাখ ১৩২৩ সংখ্যায় দুটি সুদীর্ঘ সচিত্র প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন যথাক্রমে 'হিন্দি-সাহিত্য ও তাহার সেবকগণ' এবং 'গুজরাতী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' নামে। 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত সাময়িকীতে ধরা আছে সে সময়ের ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক নানা বিচিত্র সংবাদ—যা বাদ দিয়ে ভারতের ইতিহাস রচনা করা যায় না। তার সঙ্গে 'শোকসংবাদ' শিরোনামায় বিখ্যাত মানুষদের সচিত্র জীবনী প্রকাশ করে বাঙালীর জাতীয়জীবনের একটি ধারাবাহিক আলেখ্য সংযুক্ত করে গেছেন। বহু সংখ্যার প্রচ্ছদচিত্রই ছিল সেরা বাঙালীর রঙীন চিত্র। অনেক সময় তাঁদের সম্পর্কে চমৎকার জীবনী রচিত হয়েছে (বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁর 'সন্ধ্যা'র সহযোগী, তাঁর মতোই কানে কিছুটা বধির—এগুলির মধ্যে অনেকগুলির রচয়িতা) ভিতরের পৃষ্ঠায়। বস্তুত প্রচ্ছদচিত্রগুলির বিবরণ ইতিহাসের বিষয় হয়ে রয়েছে। পৌষ ১৩৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিকৃতি। এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল :

'এবারের 'ভারতবর্ষ'-এর প্রচ্ছদপটে যে মহাত্মার প্রতিকৃতি সুশোভিত হইল, বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে এই পৌষ মাসে তিনি পরলোকগত হইলেও আজ পর্যন্ত বঙ্গদেশবাসী—শুধু বঙ্গদেশবাসী কেন ভারতবাসী তাঁহার নাম, তাঁহার অবদান বিস্মৃত হয় নাই—তিনি মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়। এখনও এতকাল পরে কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে তাঁহার সেই জলদগম্ভীর বক্তৃতা, তাঁহার প্রাণস্পর্শী বাণী।'

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ পত্রিকা জলধর সেনের সম্পাদকতায় বাঙালীর দুষ্প্রাপ্য অ্যালবামে পরিণত হয়েছিল। যে চিত্র অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না, তার জন্যে ভারতবর্ষে সন্ধান হয়তো ব্যর্থ প্রচেষ্টা নাও হতে পারে।

॥ ৬ ॥

লেখক আবিষ্কার ও লেখক সৃষ্টি প্রথম শ্রেণীর সম্পাদকের অন্যতম কর্তব্য। এ বিষয়ে জলধরের ভূমিকা তর্কাতীত। বহু লেখকের প্রথম লেখা এর পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। এঁদের পরবর্তী সাহিত্যজীবন ছিল ফলপ্রসূ। উদাহরণ স্বরূপ 'পরশুরাম'-খ্যাত রাজশেখর বসুর কথা বলতে পারি। তাঁর প্রথম গল্প 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' ভারতবর্ষেই প্রথম প্রকাশিত হয় (১৩২৯)। প্রবোধকুমার সান্যালের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে 'ভারতবর্ষে' 'মহাপ্রস্থানের পথে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পর। নতুন লেখকদের সম্পর্কে তাঁর একটা আশ্চর্য সহানুভূতি ছিল। কাউকেই তিনি কটু কথা বলতে অথবা 'রচনা মনোনীত হয়নি তাই ছাপা হয়নি' এমনতর কথা বলে আঘাত দিতে চাইতেন না। উৎসাহ দিতেন, সংশোধন করে নিতেন অথচ মনোনীত না হলে ছাপার কথা ভাবতেন না। কবিতার ব্যাপারে প্রায় সব

সম্পাদকের মতো তিনিও বিশেষত্ব সম্পন্ন ছিলেন। কারণ বাংলাদশে চিরকালই কবিতা ছাপাবার আগ্রহ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। কেউ কবিতা দিলে সেটি নিয়েই পকেটস্থ করতেন। ধীরে পকেট উঁচু হয়ে উঠত। কিছুদিন পরে সেসব অমনোনীত রচনা 'রজকালয় থেকে নিষ্পাপ শুভ্রতার রূপ নিয়ে ফিরে আসত' বলে কেউ কেউ অনুযোগও করেছেন। আবার কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষ্য দিয়েছেন--রচনা একটু চলনসই হলেই তিনি তরুণদের আশা উৎসাহ ও সৎপরামর্শ দিয়ে তুষ্ট করতেন এবং সেটিকে একটু আধটু পরিবর্তিত করে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করতেন। সে কারণে উল্টে অন্য ক্রিটিকদের কাছে কত কথাই না শুনতেন। শুনে হেসে বলতেন--'ভারতবর্ষকে মহাদেশ বললে গুরুতর ভুল হয় না। তার পক্ষে ভালমন্দ থাকবে বইকি!' আমরা 'ভারতবর্ষে' লিখেছেন—এমন কয়েকজনের সাক্ষ্য এখানে তুলে ধরি :

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী : ভ্রমণ-বিবরণ-কথা-সাহিত্যে আমি তাঁহার অযোগ্য অনুবর্তী। তাঁহার সম্পাদিত যুগ-প্রবর্তক 'ভারতবর্ষ' পত্রে আমার 'য়ুরোপে তিনমাস' প্রথম প্রচারিত। সেই উৎসাহে পরে 'প্রবাস-পত্র', 'দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য কাহিনী', 'জেনিভা ভ্রমণ' ও 'স্মৃতিরেখা' প্রকাশিত হয়।...নবীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের আনুকূল্যে 'য়ুরোপে তিনমাস' ভারতবর্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। এই জন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী।

মুণীন্দ্র দেবরায় : '"ভারতবর্ষে" আমার প্রথম প্রবন্ধ "বংশবাটী" বা 'বাঁশবেড়িয়া' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ আলাপ ঘটে নাই—সাক্ষাৎ জানাশুনা নাই অথচ দাদার আমার প্রতি দয়ার অবধি নাই।'

যোগেশচন্দ্র বাগল : 'বিখ্যাত পার্শী ধনী ও দানবীর রুস্তমজী কাওয়াসজী সম্বন্ধে একটি তথ্যভিত্তিক বড় প্রবন্ধ রচনা করিলাম।...দ্রুত প্রকাশনার নিমিত্ত ব্রজেন্দ্রনাথ আমার এ প্রবন্ধের বিষয় জলধরদাকে বলিলেন। জলধরদা আমার প্রবন্ধটি সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং 'ভারতবর্ষের' পরবর্তী সংখ্যায় উহার অর্ধেকটা প্রকাশিত হইল (চৈত্র, ১৩১৮)। দ্বিতীয়ার্ধ বাহির হয় পরবর্তী জ্যৈষ্ঠ মাসে। এই আমার প্রথম নাম সংযুক্ত মুদ্রিত রচনা। প্রথম লেখা এইরূপ দ্রুত প্রকাশে কত যে উৎসাহিত হইয়াছিলাম বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। একদিন দেখি জলধরদা স্বয়ং..."ভায়া, এই নাও" বলিয়া পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া আমার বুক পকেটে গুঁজিয়া দিলেন। বুঝিলাম ইহা আমার লেখার দক্ষিণা। ...জলধরদার নিকট সেদিন যে উৎসাহ ও প্রেরণা পাই, জীবনে তাহা পাথেয় স্বরূপ হইয়া আছে। এইরূপ কত তরুণই না তাঁহার নিকট হইতে উৎসাহ লাভ করিয়াছেন।'...

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : 'ওদিকে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল "ভারতবর্ষ"—কাটতির জনশ্রুতি পরিস্ফীত। আশাতীতরূপে সেখানে একদিন ডাক দিলেন জলধর সেন। সর্বকালের সর্ববয়সের চিরন্তন দাদা। অতি-আধুনিক সাহিত্যিক বলে কোনো ভীরু সংস্কার তো নেইই বরং যেখানে শক্তি দেখলেন সেখানেই স্বীকৃতিতে উদার-উচ্ছল হয়ে উঠলেন। মুঠো ভরে শুধু দক্ষিণা দেয়া নয়, হৃদয়ের দাক্ষিণ্য দেওয়া।...একজন রায়বাহাদুর, প্রখ্যাত এক পত্রিকার সম্পাদক, সর্বোপরি কৃতার্থম্মন্য সাহিত্যিক—অথচ অহংকারের অবলেশ নেই। ছোট বড় কৃতী-অকৃতী—সকলের প্রতি তাঁর অপক্ষপাত পক্ষপাতিত্ব। বাংলা সাহিত্যের সংসারের একমাত্র জলধর সেনই অজাতশত্রু।...সম্পাদকের লেখা প্রত্যেকটি চিঠি তিনি স্বহস্তে জবাব দিতেন--আর সবচেয়ে আশ্চর্য, ছানিকাটানো চোখেও প্রুফ দেখতেন বর্জাইস টাইপের। কানে খাটো ছিলেন...কিন্তু প্রাণে খাটো ছিলেন না।...চেঁচিয়ে বলছিলুম এতক্ষণ যাতে সহজে শোনেন। হঠাৎ গলা নামালুম, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ করলুম, আর, আশ্চর্য, অমনি শুনে গেলেন সহজে। খবর পেলুম গল্প পড়া ছাড়া ছাপা শেষ হয়ে গেছে। কাল কাগজ বেরুবে তা বেরোক, আজ যখন এসেছ আজকেই টাকাটা নিয়ে যাও।'

নলিনীকান্ত সরকার : 'জলধর সেন মহাশয় তখন 'সুলভ সমাচার'-এর সম্পাদক। একটি কবিতা...পাঠিয়ে দিলাম...মাসখানেকের মধ্যেই কবিতাটি প্রকাশিত হলো।...সেই জলধর সেন মহাশয় হলেন 'ভারতবর্ষের' সম্পাদক।...একটি হাসির গান 'ভারতবর্ষের' জন্য তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। ও হরি, সেই জলধর সেন মহাশয় এবারে আমার হাসির গানটি ফিরিয়ে দিলেন।...একটি রসরচনা লিখলাম। লেখাটি অবিলম্বে 'ভারতবর্ষে' (আষাঢ় ১৩২৬) বেরিয়ে গেল।...ইচ্ছা হলো 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি।...ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম সম্পাদক মহাশয়কে।...সম্পাদক জলধর সেন মহাশয় স্নেহ-সম্ভাষণে বললেন, 'বোসো ভাই, বোসো। লেখাটেখা কিছু এনেছো?' "...লেখা তো কিছু আনতে পারিনি, কেবল আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।" দর্শন করবে আর দর্শনী দেবে না—এ কেমন কথা? তা হবে না। কাগজ দিচ্ছি, কলম দিচ্ছি—ঐখানে বসে যা হয় একটা কিছু লিখে দিয়ে যাও।" '

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য : 'একটা প্রবন্ধ খাড়া করিলাম, নাম—শকড়িতত্ত্ব।...তখন সবে 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হইয়াছে ; জলধর সেন সম্পাদক। তাঁহার সহিত পরিচয় নাই। প্রবন্ধটি 'ভারতবর্ষে' প্রকাশের জন্য ডাকে পাঠাইলাম, খুব ভয়ে ভয়ে। সঙ্গে যে পত্র লিখিলাম তাহার শেষে লেখা ছিল যে সপ্তাহের মধ্যে উত্তর না পাইলে ধরিয়া লইব যে উহা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইবে না।...তৃতীয় দিনে জলধরবাবুর নিকট হইতে উত্তর আসিল। তাহাতে লেখা—"আমরা সম্পাদক শ্রেণীর জীব, চিঠির উত্তর বড় দিই না। কিন্তু আপনার চিঠি পাইযাই উত্তর দিতেছি, সুতরাং জানিবেন আপনার শকড়ি, মাথায় করিয়া লইয়াছি।" '

এমনি আরও পঞ্চাশটি সাক্ষ্য উপস্থিত করতে পারি। তার প্রয়োজন কি। উদ্ধৃত অংশগুলি থেকে সম্পাদক জলধরের চরিত্রটি স্পষ্টতই অনুধাবন করা যায়। আসলে জলধর কোনোদিন গুরুগিরি করতে চাননি। তাঁর দায়িত্ববোধ, দূরদর্শিতা এবং দক্ষতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সুস্পষ্ট ও ঋজু বিচক্ষণতা। পত্রিকার আঙ্গিক, সৌষ্ঠব বৃদ্ধি, মুদ্রণে পারিপাট্য, আলোকচিত্র, অঙ্কিত চিত্র, কাগজ বাঁধাই—সব কিছুকেই রচনাবৈচিত্র্যের সঙ্গে পাঠকদের মনোগ্রাহী করে তুলেছিলেন। তারই সঙ্গে আদর্শবোধ ছিল সদাজাগ্রত। যা নিজে বুঝতেন না, তা নিয়ে অকারণ খবরদারি করতেন না।

'দেশ'-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষ এ-বিষয়ে তাঁর একটি কৌতুককর অভিজ্ঞতার কথা 'সম্পাদকের বৈঠকে' সরস করে পরিবেষণ করেছেন :

'শরৎচন্দ্রের জয়ন্তী উৎসব ঘটা করে করবার উদ্যোগ চলছে। শিল্পীবন্ধু সুকুমারদা...এই উপলক্ষে কাঠের উপর তেলরঙ দিয়ে শরৎচন্দ্রের একটি জবরদস্ত পোর্ট্রেট এঁকে আমায় বললেন—'এই সময়ে কলকাতার কোনো পত্রিকায় ছবিটা ছেপে দাও।'

মনে পড়ল 'ভারতবর্ষে'র কথা।...ছবিখানি হাতে করে সটান চলে এলাম কলকাতায়, একেবারে ভারতবর্ষের অফিসে।...

—'শরৎবাবুর একটা রঙীন পোর্ট্রেট এনেছি, একবার যদি দেখেন।' খবরের কাগজের ভাঁজ খুলে ছবিটি তার হাতে তুলে দিলাম।

ছবিটি হাতে নেওয়া মাত্রই জলধরদার চোখ-মুখের সেই প্রশান্ত ভাব নিমেষে অপ্রসন্নতায় ভরে উঠল। দু হাতে ছবির দুটো ধার ধরে একবার চোখের কাছে নিয়ে আসেন, আবার দুই হাত সটান সামনের দিকে প্রসারিত করে দূরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন।...তারপরেই ছবিটাকে উল্টো করে ধরে ভ্রূকুঞ্চিত তন্ময়তায় কি যেন একটা খুঁজে বার করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন।...

অবশেষে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব মুখে এনে ছবিটা টেবিলের উপর ধপাস করে ফেলে জলধরদা বললেন—

'না হে, ও আমার কম্মো নয়। আসুক হরিদাস, এ-সব শান্তিনিকেতনী আর্ট ও-ই বুঝবে ভালো।'

ক্ষীণকণ্ঠে সভয়ে আমি বললাম—'আজ্ঞে না। এটা শান্তিনিকেতনী আর্ট নয়, কন্টিনেন্টাল আর্ট। একেবারে মডার্ন ইটালিয়ান স্কুল।'

গর্জন করে উঠলেন জলধরদা। '—এসব ইস্কুলের ছেলেছোকরাদের ছবি, তা আমার কাছে এনেছ কেন? 'মৌচাক' 'শিশুসাথী'তে গেলেই তো পারতে?'

প্রসঙ্গত শান্তিনিকেতনী তথা অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকলা সম্পর্কে জলধর সেনের বোধকরি একটা আতঙ্কই ছিল। অবনীন্দ্রনাথও জলধরকে নিয়ে কৌতুক করতেন আড়ালে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরলোকগমনের পর একটি সভায় জলধর সেন বলেন 'সত্যেন্দ্রনাথ আজ পরলোকে। কিন্তু আমার মনে হয়, হেমেন্দ্রকুমারের কবিতার ভিতর দিয়ে আবার তিনি আত্মপ্রকাশ করছেন।' তাই শুনে পাশে বসা হেমেন্দ্রকুমারকে ডেকে চুপিচুপি তাঁর কানে অবনীন্দ্রনাথ বললেন—'ও হেমেন্দ্র। জলধরবাবু বলেন কি হে? সত্যেন্দ্রনাথের প্রেতাত্মা নাকি তোমার উপরে ভর করেছে? দেখো খুব সাবধান!'

আবার কেউ যদি কোনো ভুল দেখাতেন তাঁর কাজে, তাতে কখনও রাগ করতেন না। সভাসমিতিতে যোগদানে তাঁর প্রবল উৎসাহ। সেখান থেকেই বহু সাহিত্যিককে তিনি আবিষ্কার করতেন। বলতেন 'সাহিত্যসভাদি মাত্রই আমার তীর্থ'। নিজে একজন প্রতিষ্ঠিত সম্পাদক কিন্তু সমসাময়িক প্রায় সমস্ত পত্রিকাতেই তিনি লিখতেন। নবীন পত্রিকার আগমনকে তিনি স্বাগত জানাতেন। 'দেশ' পত্রিকার জন্মলগ্নেই তাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, প্রথম সংখ্যাতেই লিখেছেন 'সেকালের কথা'। দ্বিতীয় বর্ষেও তাকে জানিয়েছেন 'অভিনন্দন'। 'বিচিত্রা' পত্রিকাকে তিনি যে বলেছিলেন 'একটা উপহারের বই'—তার কারণ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিলেন, তার ভয়ে। উপেন্দ্রনাথ সম্পাদক হয়ে সম্পাদকীয় কলা-কৌশল শিখেছিলেন জলধরের কাছেই। আর এক ডাকসাইটে সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন : 'যিনি বহুকাল ধরে, 'ভারতবর্ষ'-এর ন্যায় প্রকাণ্ড মাসিক পত্রের ভার বহন করেছেন এবং তার উন্নতি সাধন করেছেন—তাঁর এ কৃতিত্বের জন্য আমি তাঁকে বাহবা দিতে বাধ্য, কারণ এর জন্য যে কি পরিমাণ অধ্যবসায় প্রয়োজন—তা আমি অনুমান করতে পারি। আমিও একসময়ে একখানি স্বল্পকায় মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করি, কিন্তু বেশিদিন সেটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি যদিও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে পত্রের সহায় ছিলেন।' বহু সম্পাদককে তিনি নিজের পত্রিকায় লিখিয়েও নিয়েছিলেন।

॥ ৭ ॥

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জলধরের একটা প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ যে বেশি লিখেছেন, এমন কখনই নয়। তবুও 'রবিবাসর'-এর সর্বাধ্যক্ষ হিসেবে উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রবিবাসরের প্রথম অনুষ্ঠানেই 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রথম বর্ষ থেকেই রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ সংযুক্ত হয়েছিল। আমি এখানে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত [জলধর সম্পাদিত] রবীন্দ্রপ্রসঙ্গের একটি তালিকা এখানে সংযুক্ত করে দিলাম [ড. চিত্রা দেবের সৌজন্যে] :

১৩২০	পৌষ : শান্তিনিকেতনে একদিন	: কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত
১৩২১	পৌষ : আগরায়, রবীন্দ্রনাথ	: "একজন প্রবাসী"
১৩২২	কার্তিক : 'শেষ খেয়া'	: শশিবালা দেবী
	চৈত্র : ফাল্গুনী	: জলধর সেন

১৩২৩ শ্রাবণ। সাহিত্য সমালোচনার মাপকাঠি : রাধাকমল মুখোপাধ্যায়
[প্রসঙ্গত রবীন্দ্র উপন্যাসের আলোচনা]

১৩২৬ শ্রাবণ ও ভাদ্র : সাহিত্যে অধ্যাত্মচেতনা : রামপদ মজুমদার [প্রসঙ্গত]

১৩২৮ কার্তিক : রজনীকান্ত ও রবীন্দ্রনাথ : নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

১৩২৯ বৈশাখ : ভারতবর্ষের কালচার ও রবীন্দ্রনাথ : সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

১৩৩১ ভাদ্র : 'সোনার তরী' : বিভূতিভূষণ গুপ্ত

১৩৩৩ আষাঢ় : রবীন্দ্রনাথ ও সঙ্গীত : দিলীপকুমার রায়

শ্রাবণ ও ভাদ্র : 'রক্তকরবী' : ক্ষেত্রলাল সাহা

মাঘ : অতি আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য
: অমলচন্দ্র হোম [প্রসঙ্গত 'ঘরে বাইরে']

১৩৩৫ শ্রাবণ : অন্তঃপুরে রবীন্দ্রনাথ : রাধারাণী দত্ত

আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ : 'রক্তকরবী' : ক্ষেত্রলাল সাহা

১৩৩৬ শ্রাবণ : রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যের ভূমিকা : নীহাররঞ্জন রায়

কার্তিক : রবীন্দ্রপ্রতিভার উৎস [জীবনদেবতা] : ঐ

ফাল্গুন : 'নাম্নী' : যুগলকিশোর সরকার

১৩৩৮ ফাল্গুন : রবীন্দ্রজয়ন্তী : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ : পারস্যে রবীন্দ্রনাথ : [নামহীন]

আশ্বিন : 'শেষের কবিতা' অবনীনাথ রায়

১৩৪১ আষাঢ় : উত্তর প্রত্যুত্তর [রবীন্দ্রনাথ ও আশালতা দেবীর পত্র বিনিময়]

১৩৪৩ চৈত্র : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছুক্ষণ : পরিমল গোস্বামী

১৩৪৪ বৈশাখ : কর্মী রবীন্দ্রনাথ : উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ : রবীন্দ্রনাথ ও কাব্যসঙ্গীত : দিলীপকুমার রায়

আশ্বিন : শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন [রবীন্দ্র কথা]
: সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

এখানে উল্লেখ করার বিষয় 'ভারতবর্ষ' পক্ষ-বিপক্ষ অবলম্বন না করেই রবীন্দ্রচর্চা অব্যাহত রেখেছিল। ১৩৩৮ পৌষ সংখ্যার সূচনাতেই মুদ্রিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ পৃষ্ঠা ছবি, এ ছাড়া উপরোক্ত রচনাগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এমন বহু ছবি ছাপা হয়েছিল, যা অন্যত্র দুর্লভ। সৌদামিনী দেবীর দৌহিত্র অরুণরঞ্জন মুখোপাধ্যায় 'অনামি' নামে যে কবিতাটি লিখে রবীন্দ্রনাথকে সংশোধন করতে দেন, কবি সেটির সংশোধনান্তে নামকরণ করেন 'গোধূলিলগ্ন'। মূল এবং সংশোধিত—দুটি পাঠই পৌষ ১৩৩৮ সংখ্যায় [পৃ. ১০৮] মুদ্রিত হয়ে রবীন্দ্রচর্চাকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছিল ভারতবর্ষ ; যেমন প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' পড়ে কবির অভিমতকেও তাঁরা মুদ্রিত করেছিলেন (পৌষ ১৩৪০)।

"ভারতবর্ষে' রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশরী' নাটকটি সম্পূর্ণত মুদ্রিত হয়েছিল কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩৪০ সংখ্যায়। এটির প্রসঙ্গে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির উল্লেখ করি (দ্র. দেশ ১৬ ভাদ্র ১৩৬৮) :

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

সঙ্কটে পড়েচি। ভারতবর্ষওয়ালারা ফরমাশ করেচে সেই 'কপালের লিখন' গল্পটা, অর্থাৎ বাঁশরীর পূর্বজন্মের লীলাটাকে তাদের আশ্বিন সংখ্যার জন্যে। রথী কলকাতায় গিয়ে পেটের

দায়ে তাদের কাছ থেকে তিনশো টাকার চেক পকেটে করে এসে আমাকে বলে সেই গল্পটা দাও। আমি বাক্স তোরঙ্গ আলমারি ডেস্ক বালিশের নীচে তক্তপোশের তলায় ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে খোঁজ করে পেলাম না—তিনশো টাকা পুনরুদ্ধার করবার মতো সাহস ও শক্তি নেই। এক একবার অত্যন্ত ঝাপসাভাবে মনে হচ্ছে খাতাটা হয়তো বা তোমার করকমলে আশ্রয় পেয়েচে—জোর গলায় বলতে পারচিনে, কেননা আমার স্মরণশক্তির 'পরে আমার শ্রদ্ধামাত্র নেই। কিন্তু যদি সেখানা তোমারই করুণছায়ায় রক্ষা পেয়ে থাকে তবে পত্রপাঠমাত্র রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে মান রক্ষা করো—পোস্টেজের খরচ কত লাগল জানবামাত্র সেই তিনশো টাকা থেকে শোধ করে দেব—এবং কাজ উদ্ধার হলেই খাতাটিকে তোমার হাতে সমর্পণ করে তার খাতাজন্ম সার্থক হতে দেব—ইতি

৪ ভাদ্র ১৩৪০ কবি

একই সময়ে বিচিত্রাতে গল্প লিখেও কবি সমপরিমাণ টাকা পেতেন (দ্র. নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা ৬ কার্তিক ১৩৩৯ তারিখের চিঠি, দেশ, ১২ আগস্ট ১৯৬১, পৃ. ১২৪)। এর পরই প্রমথ চৌধুরী লেখক হিসাবে ভারতবর্ষে যোগ দেন। সানন্দে কবি প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন :

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

পেয়েছি ভারতবর্ষ। সাবাস্। খুব ভালো হয়েছে। অর্থাৎ তোমার শিলমোহরের ছাপ পড়েছে অতএব এর দাম কম নয়। এ ধরনের লেখা আর কারো কলমে ফুটতে পারে না। সাহিত্যে যারা জালিয়াতি করে দিন চালায় তারা হতাশ হবে। ইতি ৩ শ্রাবণ ১৩৪৪।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জলধর সেনের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত রবীন্দ্রনাথ জলধর সেনের ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত 'জলধর কথা'র সূচনায় লিখেছিলেন :

ওঁ

যিনি বাংলা সাহিত্যসমাজে আপন স্নিগ্ধ সহৃদয়তাগুণে বর্তমান সাহিত্যসাধকদের হৃদয় জয় করিয়াছেন সেই প্রবীণ সাহিত্যতীর্থ পথিক শ্রীযুক্ত জলধর সেনের সম্মাননার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট প্রশস্তি পুস্তকে এই কয়েকছত্র অর্ঘ্যরূপে পাঠাইলাম। ইতি ২৩ আষাঢ় ১৩৪১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর জলধরের পরলোকগমনের সংবাদ শুনে লিখেছিলেন :

জলধর

বাঙালীর প্রীতি অর্ঘ্যে তব দীর্ঘ জীবনের তরী
স্নিগ্ধ শ্রদ্ধাসুধারস
নিঃশেষে লয়েছে পূর্ণ করি।
আজি সংসারের পারে, দিনান্তের অস্তাচল হোতে
প্রশান্ত তোমার সৃষ্টি
উদ্ভাসিত অন্তিম আলোতে ॥

পুরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬-৪-৩৯

একদিকে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যদিকে শরৎচন্দ্র—দুই শ্রেষ্ঠ বাঙালী সাহিত্যিককে 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠায় আকর্ষণ ও আবদ্ধ করে জলধর এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠার মূলে জলধরের (অবশ্যই হরিদাস চট্টোপাধ্যায়েরও) ভূমিকা প্রবাদের স্থান গ্রহণ করতে পারে। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের কুন্তলীন পুরস্কারের বেনামী শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' নামে যে গল্পটি প্রথম পুরস্কার পায়,—ঘটনাচক্রে তার নির্বাচক ছিলেন জলধর সেন।

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের সময় শরৎচন্দ্রের মনোভাব নানা কারণে অনুকূল ছিল না। বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা চিঠিপত্রগুলি থেকে (দ্র. শরৎচন্দ্র, তৃতীয় খণ্ড, গোপালচন্দ্র রায়) তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হওয়ায় অনেকেই ভারতবর্ষের 'স্ট্যাবিলিটি' সম্পর্কে সন্দিহান হন। তবুও প্রমথনাথের টানে শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষে লিখতে সম্মত হন। আসলে সে সময়ে তিনি 'যমুনা' এবং 'ভারতবর্ষে'র মধ্যে দোটানায় পড়েছিলেন। শেষ অবধি 'যমুনার' সঙ্গে তিনি সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং বস্তুত বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে 'ভারতবর্ষে'র প্রতি তাঁর মন অনুকূল হয়ে ওঠে এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচনার সিংহভাগ এর পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম যে রচনা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়, সেটি ছিল 'বিরাজ বৌ' (পৌষ ও মাঘ ১৩২০)। পরে পরে পণ্ডিতমশাই, মেজদিদি, দর্পচূর্ণ, আঁধারে আলো, দেওঘরের স্মৃতি, পল্লীসমাজ, বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়া, শ্রীকান্ত, দেবদাস. নিষ্কৃতি, একাদশী বৈরাগী, দত্তা, গৃহদাহ, দেনাপাওনা, নববিধান, শেষ প্রশ্ন, অনুরাধা, শেষের পরিচয় (অসমাপ্ত) প্রভৃতি রচনা প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের এই হোলটাইমারকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। এর পিছনে জলধরের ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রগণ্য। স্বভাবত অলস শরৎচন্দ্রকে ক্রমাগত তাগাদা দিয়ে লেখানোর ব্যাপারে তাঁর ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপ সম্পাদক হিসাবে তাঁকে আদর্শ করে তুলেছিল। 'ভারতবর্ষ' অফিসে এলে ঘর অর্গলবদ্ধ করে, সামতাবেড়-পানিত্রাসে লাঠি হাতে গিয়ে রাত্রিবাস করে, কখনও রুষ্ট, কখনও তুষ্ট হয়ে শরৎচন্দ্রকে দিয়ে তিনি লিখিয়ে না নিলে বাংলা সাহিত্য দরিদ্র হয়ে পড়ত। সেকথা শরৎচন্দ্রও বুঝতেন। তাই তাঁর এই দাদাটিকে তিনি সমীহই করতেন। জলধর সম্বর্ধনা পত্রটি রচনা করে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধাকে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন। উল্লেখ করার বিষয় জলধর যেখানে থেমে গেছেন আর তাগাদা দিতে পারেননি, সেখানেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টিও থেমে গেছে। প্রসঙ্গত শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হলে জলধর 'ভারতবর্ষে'র ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৪৪ সংখ্যায় 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' নামে যে বিশেষ ক্রোড়পত্র বের করেন—তার তুলনা হয় না। শরৎচন্দ্র এখানে সমগ্রত ধরা পড়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন সেন, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ, বি. গোপাল রেড্ডি, সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, লর্ড ব্রাবোর্ন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং দীনেশচন্দ্র সেনের শ্রদ্ধাঞ্জলির সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছিল প্রবোধচন্দ্র সান্যাল, মুরলীধর বসু. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শচীন সেন, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সোমনাথ মৈত্র, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হুমায়ুন কবীর, অবনীনাথ রায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, অপরাজিতা দেবী, নরেন্দ্র দেব, রাধারানী দেবী, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, শিবরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি বহু জনের রচনা। শরৎচন্দ্রের নানা দুষ্প্রাপ্য ছবি এবং হাতের লেখার ব্লক এই সংখ্যার মূল্য বৃদ্ধি করেছিল।

এই প্রসঙ্গে নিবেদনযোগ্য যে, জলধর এর আগে ভারতবর্ষের আরও একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। ১৩২২ সনের কার্তিক সংখ্যাটি 'মহিলা সংখ্যা' রূপে চিহ্নিত

হয়। এই সংখ্যায় সুশীলা সেন, কাঞ্চনমালা দেবী, সুনীতি দেবী, হেমনলিনী দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, অমলা দেবী, ঊর্মিলা দেবী, মৃণালিনী সেন, প্রমীলা মিত্র প্রভৃতি কেবল মহিলাদের গল্প-কবিতা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা লেখিকাদের স্বর্গরাজ্য ছিল।

॥ ৯ ॥

জলধর সেন নিজের পত্রিকায় ভ্রমণমূলক নানা রচনা ছাড়া, নানা সাহিত্য সম্মেলনের রিপোর্টাজ, স্থানবৃত্তান্ত, ধর্মজীবন, গল্প, জীবনী, নক্সা, ইতিহাস, পল্লীচিত্র, পুস্তক সমালোচনা, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি লিখেছেন। লক্ষ্য করার বিষয় নিজে একজন ঔপন্যাসিক হওয়া সত্ত্বেও 'ভারতবর্ষে' তাঁর কোনো উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি। তবে এখানে প্রকাশিত ১১ কিস্তিতে (কার্তিক ১৩৪২--ভাদ্র ১৩৪৩) রচিত তাঁর 'স্মৃতি-তর্পণ' শীর্ষক রচনাগুলি তাঁর জীবন এবং সমসাময়িক জীবনের মূল্যবান দলিল বিশেষ--ইতস্তত কিছু ভুলত্রুটি থাকা সত্ত্বেও। আর মূল্যবান এর বর্ষশেষে রচিত সম্পাদকীয়গুলি। কিভাবে বহুজনের সংশয় এবং ঈর্ষার অবসান ঘটিয়ে 'ভারতবর্ষ' সগৌরবে তার রথের গতি অব্যাহত রেখেছিল--সম্পাদকীয়গুলি তার প্রমাণ। সবিনয়ে এখানে তিনি নিজেকে 'ভারতবর্ষে'র সেবকরূপে চিহ্নিত করে গেছেন আর সমস্ত লেখক, পাঠকদের কাছে 'বৃদ্ধ সম্পাদক তাঁহাদের অনুগ্রহ ও সাহচর্য প্রার্থনা' করেছেন।

তবুও দুঃখ পেয়েছেন অজস্র। 'সাহিত্য' পত্রিকার শ্রাবণ, ভাদ্র, কার্তিক ও মাঘ ১৩২৯ সংখ্যায় 'ভারতবর্ষে'র কয়েকটি রচনাকে প্রশংসা করলেও 'ভারতবর্ষ'কে নিন্দা করাই হয়েছে বেশি। একটি উল্লেখ করি :

'পৌষের 'ভারতবর্ষে' একখানি ছবি বাহির হইয়াছে, উহা যে কেন বাহির করা হইল তাহা বলিতে পারি না। যুবতীর একটি স্তন ও উরুর ঊর্ধ্বদেশ যতদূর সম্ভব নগ্ন করা যাইতে পারে ততদূর সম্ভব নগ্ন করিয়া দেখাইলে যদি 'আর্ট' হয় তাহা হইলে ছবিখানিতে পুরামাত্রায় 'আর্ট' আছে। এমন ছবি মাসিকপত্রে যদি বাহির হইতে থাকে তাহা হইলে ফরাসী মুলুকের গুপ্ত ছবিগুলি ত বেপরোয়া ঘরে রাখা চলে।--সম্পাদক রায় বাহাদুর এই ছবি বাছাই করিয়া 'বাহাদুরী'র পরিচয় দিয়াছেন।' (মাঘ ১৩২৯)

আর বন্ধু ও শিষ্য দীনেন্দ্রকুমার রায়ের বিরোধিতার সর্বজনবিদিত কাহিনী তাঁর 'অজাতশত্রু' নামের অপবাদ ঘটিয়েছে। সে ইতিহাস লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। উৎসাহী পাঠককে আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'সেকালের স্মৃতি' এবং মাসিক বসুমতী পত্রে প্রকাশিত (আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ১৩৪৩) দীনেন্দ্রকুমারের 'জলধর-স্মৃতি সম্বর্ধনা' পাঠ করার বরাত দিয়ে সে প্রসঙ্গে ইতি ঘটাতে চাইছি। শুধু জলধরের প্রতিক্রিয়াটুকু সংক্ষেপে নিবেদন করি :

'এ সমস্ত জেনেও আমার বহুদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু দীনেন্দ্রকুমার তাঁর সুদীর্ঘ প্রবন্ধে আমাকে অজস্র ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, তীব্র পরিহাস ও আক্রমণ করেছেন, জানি না এতে তাঁর কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং এরূপ ব্যবহারে তাঁর গৌরব কতদূর বৃদ্ধি পাবে। তবে আমি এ সমস্ত অপমান তাঁর বৃদ্ধবয়সের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত 'গুরুদক্ষিণা' বলেই প্রশান্ত অন্তরে গ্রহণ করিলাম।' (মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৪৩, পৃ. ৭২০-২২)

তবুও সম্মানই পেয়েছেন অজস্র। একটি পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মোহর

SANAD

To

Babu Jaladhar Sen

Editor of the 'Bhart Varsha'

Calcutta, Bengal

I hereby confer upon you title of Rai Bahadur as a personal distinction.

(Lord Reading)
Vice-roy and Governor
General of India

Simla
The 3rd June 1922

আর দেশবাসী তাঁকে সম্মান জানিয়েছিল তাঁর ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তিন দিন ধরে অনুষ্ঠিত বিশাল সভাসমাবেশের দ্বারা। প্রথমদিনে (২ ভাদ্র ১৩৪১, ১৯ আগস্ট ১৯৩৪) সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয়দিনে প্রমথ চৌধুরী। জলধর-সংবর্ধনা সমিতির সভাপতি ছিলেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে তাঁকে সম্বর্ধিত করা হয়।

'রায়বাহদুর' উপাধি পেয়ে জলধর বলেছিলেন : দেশসুদ্ধ আমার ভায়েরা আমাকে শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে যে 'দাদা' উপাধি দিয়েছে, এ তুচ্ছ রাজ সম্মান আমার কাছে তার চেয়ে বড় নয়।

আর দেশবাসীর সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি বলেন :

'আপনারা বলুন, আমাকে উপলক্ষ করে আপনারা বঙ্গজননীকে অভিনন্দিত করেছেন। তা হলে আমি আপনাদের এই সমস্ত অভিনন্দন পত্র ও উপহার তাঁর চরণে পৌঁছিয়ে দেবার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।'

জলধর সেন ছাড়া একথা আর কেই বা বলতে পারেন

॥ ১০ ॥

এহেন একটি পত্রিকা জলধরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে বন্ধ হয়ে যায়নি, তার কারণ ছিল এর আভ্যন্তরীণ সামর্থ্য। সেজন্যেই ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুধাংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়, শৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সম্পাদনায় ভারতবর্ষ আরও দুদশকের কাল বেশি সময় ধরে প্রকাশিত হতে পেরেছিল। শেষে যুগের চাহিদাকে পূরণ করতে অপারগ হয়ে এবং পরিচালনাগত অসুবিধার কারণে পত্রিকাটির প্রচার রহিত হয়ে যায়। কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বছরের জীবৎকালে ভারতবর্ষ যে সম্পদের ভাণ্ডার হয়ে ওঠে তার তুলনা 'ভারতবর্ষ' নিজে—'প্রবাসী'র উদাহরণ বাদ দিলে।

এই অপরিমেয় সম্পদের একটা বড় অংশ এর কথাসাহিত্যের বিভাগ। 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত উপন্যাসরাজিকে নিয়েই একটা ইতিবৃত্ত লেখা চলে, যেমন চলে এতে প্রকাশিত গল্পাবলী নিয়ে। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ভারতবর্ষে অন্তত দেড় হাজার গল্প প্রকাশিত হয়েছিল, যার মধ্যে আড়াইশো গল্পকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গল্প বলা যেতে পারে। এতোগুলি গল্প সংকলন করতে পারলেই পত্রিকার চরিত্রটি অনুধাবনে সুবিধে হত। কিন্তু একজন

লেখকের একাধিক গল্প আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। আমাদের সামর্থ্যও সীমাবদ্ধ। সেকারণেই ভালো গল্পগুলির মধ্যেও বাছাই করে নিতে হয়েছে উৎকৃষ্টতর গল্পকে এবং প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদেরও। যদি পাঠকদের চাহিদা লক্ষ্য করি তবে হয়তো আরও একটি খণ্ড প্রকাশে আমরা উদ্যোগী হতে পারবো। তবুও এই খণ্ডের গল্পগুলি সম্ভবত পাঠকদের পরিতৃপ্ত করতে পারবে। এর লেখকদের রচনাবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনার অপেক্ষা রাখে না, যেমন এর পৃষ্ঠাতেই প্রথম গল্প "শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নিয়ে আবির্ভাব মুহূর্তেই 'পরশুরাম' বিখ্যাত হয়ে গেছেন। আমরা সেরা লেখকদের সেরা গল্পগুলি সংকলনের চেষ্টা করেছি, তবুও রুচিপার্থক্যে হয়তো মতপার্থক্য ঘটে যেতে পারে—যে কোনও সংকলককে এই ঝুঁকি নিতেই হয়। একাধিক খণ্ড প্রকাশ পেলে হয়তো সচেতন পাঠকদের অতৃপ্তি দূরীভূত হতে পারবে।

বাংলা ছোটগল্প সংকলনে আমার অভিজ্ঞতার কথা বিদিত থাকায় নাথ পাবলিশিং-এর প্রিয়ভাজন প্রকাশক শ্রীসমীরকুমার নাথ "ভারতবর্ষ"-এর পুরনো ফাইলগুলি দিয়ে এর সম্পাদনা ভার আমাকে অর্পণ করে বাধিত করেছেন। একাজে লেখকগণ ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের অনেকেই অনুমতি প্রদান করে অনুগৃহীত করেছেন, অন্যদের সহযোগিতাও পাবার প্রত্যাশা রাখি। সকলের কাছেই আমার ঋণ, সেকথা সোচ্চারে উচ্চারণ করে এই দীর্ঘ ভূমিকা পরিসমাপ্ত করি। পঞ্চাশ বছরের গল্পচর্চার একটা দলিলগ্রন্থ পেয়ে ভরসা করি পাঠকবর্গের আশীর্বাদধন্য হবো।

কলিকাতা পুস্তকমেলা বারিদবরণ ঘোষ

সূচীপত্র

আঁধারে আলো

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

সে অনেকদিনের ঘটনা। সত্যেন্দ্র চৌধুরী জমিদারের ছেলে ; বি.এ. পাশ করিয়া বাড়ি গিয়াছিল, তাহার মা বলিলেন, মেয়েটি বড় লক্ষ্মী—বাবা, কথা শোন্, একবার দেখে আয়।

সত্যেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, না মা, এখন আমি কোনমতেই পারব না। তা হলে পাস হতে পারব না।

কেন পারবি নে? বৌমা থাকবেন আমার কাছে, তুই লেখাপড়া করবি কলকাতায়, পাস হতে তোর কি বাধা হবে আমি ত ভেবে পাইনে, সতু!

না মা, সে সুবিধে হবে না—এখন আমার সময় নেই, ইত্যাদি বলিতে বলিতে সত্য বাহির হইয়া যাইতেছিল।

মা বলিলেন, যাস্‌নে দাঁড়া, আরও কথা আছে। একটু থামিয়া বলিলেন, আমি কথা দিয়েছি বাবা, আমার মান রাখবি নে?

সত্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, না জিজ্ঞাসা করে কথা দিলে কেন?

ছেলের কথা শুনিয়া মা অন্তরে ব্যথা পাইলেন, বলিলেন, সে আমার দোষ হয়েছে, কিন্তু তোকে ত মায়ের সম্ভ্রম বজায় রাখতে হবে। তা ছাড়া, বিধবার মেয়ে, বড় দুঃখী—কথা শোন্ সত্য, রাজী হ।

আচ্ছা, পরে বলব, বলিয়া সত্য বাহির হইয়া গেল।

মা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঐটি তাঁহার একমাত্র সন্তান। সাত-আট বৎসর হইল স্বামীর কাল হইয়াছে, তদবধি বিধবা নিজেই নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে মস্ত জমিদারি শাসন করিয়া আসিতেছেন। ছেলে কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়ে, বিষয়-আশয়ের কোন সংবাদই তাহাকে রাখিতে হয় না। জননী মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, ছেলে ওকালতি পাস করিলে তাহার বিবাহ দিবেন এবং পুত্রবধূর হাতে জমিদারি এবং সংসারের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। ইহার পূর্বে তিনি ছেলেকে সংসারী করিয়া তাহার উচ্চশিক্ষার অন্তরায় হইবেন না। কিন্তু অন্যরূপ ঘটিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীর মৃত্যুর পর এ বাটীতে এতদিন পর্যন্ত কোন কাজকর্ম হয় নাই। সেদিন কি একটা ব্রত উপলক্ষে সমস্ত গ্রাম নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, মৃত অতুল মুখুয্যের দরিদ্র বিধবা এগারো বছরের মেয়ে লইয়া নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছিলেন। এই মেয়েটিকে তাঁহার বড় মনে ধরিয়াছে। শুধু যে মেয়েটি নিখুঁত সুন্দরী, তাহা নহে, ঐটুকু বয়সেই মেয়েটি যে অশেষ গুণবতী তাহাও তিনি দুই-চারিটি কথাবার্তায় বুঝিয়া লইয়াছিলেন।

মা মনে মনে বলিলেন, আচ্ছা, আগে ত মেয়ে দেখাই, তার পর কেমন না পছন্দ হয়, দেখা যাবে।

পরদিন অপরাহ্নবেলায় সত্য খাবার খাইতে মায়ের ঘরে ঢুকিয়াই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার খাবারের জায়গার ঠিক সুমুখে আসন পাতিয়া বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীঠাকরুনটি কে

হীরামুক্তায় সাজাইয়া বসাইয়া রাখিয়াছে।

মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, খেতে ব'স্।

সত্যর চমক ভাঙ্গিল। সে থতমত খাইয়া বলিল, এখানে কেন, আর কোথাও আমার খাবার দাও।

মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তুই ত আর সত্যিই বিয়ে করতে যাচ্ছিস নে—ঐ একফোঁটা মেয়ের সামনে তোর আর লজ্জা কি!

আমি কারুকে লজ্জা করিনে, বলিয়া সত্য প্যাঁচার মত মুখ করিয়া সুমুখের আসনে বসিয়া পড়িল। মা চলিয়া গেলেন। মিনিট-দুয়ের মধ্যে সে খাবারগুলো কোনমতে নাকেমুখে গুঁজিয়া উঠিয়া গেল।

বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ইতিমধ্যে বন্ধুরা জুটিয়াছে এবং পাশার ছক পাতা হইয়াছে। সে প্রথমেই দৃঢ় আপত্তি প্রকাশ করিয়া কহিল আমি কিছুতেই বস্‌তে পারব না—আমার ভারী মাথা ধরেচে। বলিয়া ঘরের এক কোণে সরিয়া গিয়া তাকিয়া মাথায় দিয়া, চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। বন্ধুরা মনে মনে কিছু আশ্চর্য হইল এবং লোকাভাবে পাশা তুলিয়া দাবা পাতিয়া বসিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেক চেঁচামেচি ঘটিল, কিন্তু সত্য একবার উঠিল না, একবার জিজ্ঞাসা করিল না—কে হারিল, কে জিতিল। আজ এ-সব তাহার ভালই লাগিল না।

বন্ধুরা চলিয়া গেলে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া সোজা নিজের ঘরে যাইতেছিল, ভাঁড়ারের বারান্দা হইতে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মধ্যে শুতে যাচ্ছিস যে রে?

শুতে নয়, পড়তে যাচ্ছি। এম. এ'র পড়া সোজা নয় ত! সময় নষ্ট করলে চলবে কেন? বলিয়া সে গূঢ় ইঙ্গিত করিয়া দুমদুম শব্দ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

আধঘণ্টা কাটিয়াছে, সে একটি ছত্রও পড়ে নাই। টেবিলের উপর বই খোলা, চেয়ারে হেলান দিয়া, উপরের দিকে মুখ করিয়া কড়িকাঠ ধ্যান করিতেছিল, হঠাৎ ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। সে কান খাড়া করিয়া শুনিল—ঝুম্। আর একমুহূর্ত—ঝুমঝুম। সত্য সোজা উঠিয়া বসিয়া দেখিল, সেই আপাদমস্তক গহনা-পরা লক্ষ্মীঠাকরুনটির মত মেয়েটি ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্য একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বলিল, মা আপনার মত জিজ্ঞেসা করলেন।

সত্য মুহূর্ত মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কার মা?

মেয়েটি কহিল, আমার মা।

সত্য তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া পাইল না, ক্ষণেক পরে কহিল, আমার মাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।

মেয়েটি চলিয়া যাইতেছিল, সত্য সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, তোমার নাম কি?

আমার নাম রাধারানী, বলিয়া সে চলিয়া গেল।

দুই

একফোঁটা রাধারানীকে সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সত্য এম.এ. পাস করিতে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মতেই না, খুব সম্ভব, পরেও না। সে বিবাহই করিবে না। কারণ, সংসারে জড়াইয়া গিয়া মানুষের আত্মসম্ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবুও রহিয়া রহিয়া তাহার সমস্ত মনটা যেন কি একরকম করিয়া ওঠে, কোথাও কোন নারীমূর্তি দেখিলেই আর একটি অতি ছোট মুখ তাহার পাশেই জাগিয়া উঠিয়া তাহাকেই আবৃত করিয়া দিয়া, একাকী বিরাজ করে ; সত্য কিছুতেই সেই লক্ষ্মীর প্রতিমাটিকে ভুলিতে পারে না। চিরদিনই সে নারীর

প্রতি উদাসীন; অকস্মাৎ এ তাহার কি হইয়াছে যে, পথে-ঘাটে কোথাও বিশেষ একটা বয়সের কোন মেয়ে দেখিলেই তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, হাজার চেষ্টা করিয়াও সে যেন কোনমতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে না। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ, হয়ত অত্যন্ত লজ্জা করিয়া, সমস্ত দেহ বারংবার শিহরিয়া উঠে, সে তৎক্ষণাৎ যে-কোন একটা পথ ধরিয়া দ্রুতপদে সরিয়া যায়।

সত্য সাঁতার কাটিয়া স্নান করিতে ভালবাসিত। তাহার চোরবাগানের বাসা হইতে গঙ্গা দূর নয়, প্রায়ই সে জগন্নাথের ঘাটে স্নান করিতে আসিত।

আজ পূর্ণিমা। ঘাটে একটু ভিড় হইয়াছিল। গঙ্গায় আসিলে সে যে উৎকলী ব্রাহ্মণের কাছে শুষ্ক বস্ত্র জিম্মা রাখিয়া জলে নামিত, তাহারই উদ্দেশে আসিতে গিয়া, একস্থানে বাধা পাইয়া স্থির হইয়া দেখিল, চার-পাঁচজন লোক একদিকে চাহিয়া আছে। সত্য তাহাদের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে গিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

তাহার মনে হইল, একসঙ্গে এত রূপ সে আর কখনও নারীদেহে দেখে নাই। মেয়েটির বয়স আঠার-উনিশের বেশী নয়। পরনে সাদাসিধা কালাপেড়ে ধুতি, দেহ সম্পূর্ণ অলঙ্কারবর্জিত, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কপালে চন্দনের ছাপ লইতেছে, এবং তাহারই পরিচিত পাণ্ডা একমনে সুন্দরীর কপালে নাকে আঁক কাটিয়া দিতেছে।

সত্য কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পাণ্ডা সত্যর কাছে যথেষ্ট প্রণামী পাইত, তাই রূপসীর চাঁদমুখের খাতির ত্যাগ করিয়া হাতের ছাঁচ ফেলিয়া দিয়া 'বড়বাবুর' শুষ্ক বস্ত্রের জন্য হাত বাড়াইল।

দু'জনের চোখাচোখি হইল। সত্য তাড়াতাড়ি কাপড়খানা পাণ্ডার হাতে দিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া জলে গিয়া নামিল। আজ তাহার সাঁতার কাটা হইল না, কোনমতে স্নান সারিয়া লইয়া যখন সে বস্ত্র পরিবর্তনের জন্য উপরে উঠিল তখন সেই অসামান্যা রূপসী চলিয়া গিয়াছে।

সেদিন সমস্তদিন ধরিয়া তাহার মন গঙ্গা গঙ্গা করিতে লাগিল, এবং পরদিন ভাল করিয়া সকাল না হইতেই মা গঙ্গা এমনি সজোরে টান দিলেন যে, সে বিলম্ব না করিয়া, আলনা হইতে একখানি বস্ত্র টানিয়া লইয়া গঙ্গাযাত্রা করিল।

ঘাটে আসিয়া দেখিল, অপরিচিতা রূপসী এইমাত্র স্নান সারিয়া উপরে উঠিতেছেন। সত্য নিজেও যখন স্নানান্তে পাণ্ডার কাছে আসল, তখন পূর্বদিনের মত আজিও তিনি ললাট চিত্রিত করিতেছিলেন। আজিও চারি চক্ষু মিলিল, আজিও তাহার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ বহিয়া গেল; সে কোনমতে কাপড় ছাড়িয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

তিন

রমণী যে প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিতে আসেন, সত্য তাহা বুঝিয়া লইয়াছিল। এতদিন যে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে নাই, তাহার একমাত্র হেতু—পূর্বে সত্য নিজে কতকটা বেলা করিয়াই স্নানে আসিত।

জাহ্নবীতটে উপর্যুপরি আজ সাতদিন উভয়ের চারি চক্ষু মিলিয়াছে, কিন্তু, মুখের কথা হয় নাই। বোধ করি তার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, যেখানে চাহনিতে কথা হয়, সেখানে মুখের কথাকে মূক হইয়া থাকিতে হয়। এই অপরিচিতা রূপসী যেই হোন, তিনি যে চোখ দিয়া কথা কহিতে শিক্ষা করিয়াছেন, এবং সে বিদ্যায় পারদর্শী, সত্যর অন্তর্যামী তাহা নিভৃত অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে পারিয়াছিল।

সেদিন স্নান করিয়া সে কতকটা অন্যমনস্কের মত বাসায় ফিরিতেছিল, হঠাৎ তাহার কানে গেল, 'একবার শুনুন!' মুখ তুলিয়া দেখিল, রেলওয়ে লাইনে ওপারে সেই রমণী

দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার বাম কক্ষে জলপূর্ণ ক্ষুদ্র পিতলের কলস, দক্ষিণ হস্তে সিক্তবস্ত্র। মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। সত্য এদিক-ওদিক চাহিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তিনি উৎসুক-চক্ষে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, আমার ঝি আজ আসেনি, দয়া করে একটু যদি এগিয়ে দেন ত বড় ভালো হয়।

অন্যদিন তিনি দাসী সঙ্গে করিয়া আসেন, আজ একা। সত্যের মনের মধ্যে দ্বিধা জাগিল, কাজটা ভাল নয় বলিয়া একবার মনেও হইল, কিন্তু সে 'না' বলিতেও পারিল না। রমণী তাহার মনের ভাব অনুমান করিয়া একটু হাসিলেন। এ হাসি যাহারা হাসিতে জানে, সংসারে তাহাদের অপ্রাপ্য কিছুই নাই। সত্য তৎক্ষণাৎ 'চলুন' বলিয়া উহার অনুসরণ করিল। দুই-চারি পা অগ্রসর হইয়া রমণী আবার কথা কহিলেন, ঝির অসুখ, সে আসতে পারলে না, কিন্তু আমিও গঙ্গাস্নান না করে থাকতে পারিনে—আপনারও দেখচি এ বদ অভ্যাস আছে।

সত্য আস্তে আস্তে জবাব দিল, আজ্ঞে হাঁ, আমিও প্রায় গঙ্গাস্নান করি।

এখানে কোথায় আপনি থাকেন?

চোরবাগানে আমার বাসা।

আমাদের বাড়ি জোড়াসাঁকোয়। আপনি আমাকে পাথুরেঘাটার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বড় রাস্তা হয়ে যাবেন।

তাই যাব।

বহুক্ষণ আর কোন কথাবার্তা হইল না। চিৎপুর রাস্তায় আসিয়া রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আবার সেই হাসি হাসিয়া বলিলেন, কাছেই আমাদের বাড়ি—এবার যেতে পারব —নমস্কার।

নমস্কার, বলিয়া সত্য ঘাড় গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে যে কি করিতে লাগিল, সে কথা লিখিয়া জানান অসাধ্য। যৌবনে পঞ্চশরের প্রথম পুষ্পবাণের আঘাত যাঁহাকে সহিতে হইয়াছে, শুধু তাঁহারই মনে পড়িবে, শুধু তিনি বুঝিবেন, সেদিন কি হইয়াছিল। সবাই বুঝিবেন না, কি উন্মাদ নেশায় মাতিলে জল-স্থল, আকাশ-বাতাস—সব রাঙ্গা দেখায়, সমস্ত চৈতন্য কি করিয়া চেতনা হারাইয়া, একখণ্ড প্রাণহীন চুম্বক-শলাকার মত শুধু সেই একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িবার জন্যই অনুক্ষণ উন্মুক্ত হইয়া থাকে।

পরদিন সকালে সত্য জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, রোদ উঠিয়াছে। একটা ব্যথার তরঙ্গ তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত আলোড়িত করিয়া গড়াইয়া গেল ; সে নিশ্চিত বুঝিল, আজিকার দিনটা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। চাকরটা সুমুখ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ভয়ানক ধমক দিয়া কহিল, হারামজাদা, এত বেলা হয়েছে, তুলে দিতে পারিস নি? যা, তোর এক টাকা জরিমানা।

সে বেচারা হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। সত্য দ্বিতীয় বস্ত্র না লইয়াই রুষ্ট-মুখে বাসা হইতে বাহির হইয়া গেল।

পথে আসিয়া গাড়ি ভাড়া করিল এবং গাড়োয়ানকে পাথুরেঘাটার ভিতর দিয়া হাঁকাইতে হুকুম করিয়া, রাস্তার দুইদিকেই প্রাণপণে চোখ পাতিয়া রাখিল। কিন্তু গঙ্গায় আসিয়া, ঘাটের দিকে চাহিতেই তাহার সমস্ত ক্ষোভ যেন জুড়াইয়া গেল, বরঞ্চ মনে হইল, যেন অকস্মাৎ পথের উপরে নিক্ষিপ্ত একটা অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইল।

গাড়ি হইতে নামিতেই তিনি মৃদু হাসিয়া নিতান্ত পরিচিতের মত বলিলেন, এত দেরি যে? আমি আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি—শিগগির নেয়ে নিন, আজও আমার ঝি আসেনি।

এক মিনিট সবুর করুন, বলিয়া সত্য দ্রুতপদে জলে গিয়া নামিল। সাঁতার কাটা তাহার কোথায় গেল! সে কোনমতে গোটা দুই-তিন ডুব দিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আমার

গাড়ি গেল কোথায়?

রমণী কহিলেন, আমি তাকে ভাড়া দিয়ে বিদেয় করেচি।

আপনি ভাড়া দিলেন!

দিলামই বা। চলুন। বলিয়া আর একবার ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া অগ্রবর্তিনী হইলেন।

সত্য একেবারেই মরিয়াছিল, না হইলে যত নিরীহ, যত অনভিজ্ঞই হোক, একবারও সন্দেহ হইত—এ-সব কি!

পথ চলিতে চলিতে রমণী কহিলেন, কোথায় বাসা বললেন, চোরবাগানে?

সত্য কহিল, হাঁ।

সেখানে কি কেবল চোরেরাই থাকে?

সত্য আশ্চর্য হইয়া কহিল, কেন?

আপনি ত চোরের রাজা। বলিয়া রমণী ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া কটাক্ষে হাসিয়া আবার নির্বাক মরাল-গমনে চলিতে লাগিলেন। আজ কক্ষের ঘট অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল, ভিতরে গঙ্গাজল ছলাৎ-ছল্ ছলাৎ-ছল্ শব্দে—অর্থাৎ, ওরে মুগ্ধ—ওরে অন্ধ যুবক! সাবধান! এ-সব ছলনা—সব ফাঁকি, বলিয়া উছলিয়া উছলিয়া একবার ব্যঙ্গ, একবার তিরস্কার করিতে লাগিল।

মোড়ের কাছাকাছি আসিয়া সত্য সসঙ্কোচে কহিল, গাড়ি-ভাড়াটা—

রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, সে ত আপনার দেওয়াই হয়েচে।

সত্য এই ইঙ্গিত না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল, আমার দেওয়া কি করে?

আমার আর কাছে কি যে দেব! যা ছিল সমস্তই ত তুমি চুরি-ডাকাতি করে নিয়েচ। বলিয়াই সে চকিতে মুখ ফিরাইয়া, বোধ করি উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ জোর করিয়া রোধ করিতে লাগিল।

এ অভিনয় সত্য দেখিতে পায় নাই, তাই এই চুরির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তীব্র তড়িৎরেখার মত তাহার সংশয়ের জাল আপ্রান্ত বিদীর্ণ করিয়া বুকের অন্তস্তল পর্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া ফেলিল। তাহার মুহূর্তে সাধ হইল, এই প্রকাশ্য রাজপথেই ওই দুটি রাঙ্গা পায়ে লুটাইয়া পড়ে, কিন্তু চক্ষের নিমিষে গভীর লজ্জায় তাহার মাথা এমনি হেঁট হইয়া গেল যে, সে মুখ তুলিয়া একবার প্রিয়তমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেও পারিল না, নিঃশব্দে নতমুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ও-ফুটপাতে তাহার আদেশমত দাসী অপেক্ষা করিতেছিল, কাছে আসিয়া কহিল, আচ্ছা দিদিমণি, বাবুটিকে এমন করে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চ কেন? বলি, কিছু আছে টাছে? দু'পয়সা টানতে পারবে ত?

রমণী হাসিয়া বলিল, তা জানিনে, কিন্তু হাবাগোবা লোকগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরোতে আমার বেশ লাগে।

দাসীটিও খুব খানিকটা হাসিয়া বলিল, এতও পার তুমি! কিন্তু যাই বল দিদিমণি, দেখতে যেন রাজপুত্তুর! যেমন চোখমুখ, তেমনি রঙ। তোমাদের দুটিকে দিব্যি মানায়—দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছিলে, যেন একটি জোড়া-গোলাপ ফুটে ছিল।

রমণী মুখ টিপিয়া বলিল, আচ্ছা চল্। পছন্দ হয়ে থাকে ত না হয় তুই নিস্।

দাসীও হটিবার পাত্রী নয়, সেও জবাব দিল, না দিদিমণি, ও জিনিষ প্রাণ ধরে কাউকে দিতে পারবে না, তা বলে দিলুম।

চার

জ্ঞানীরা কহিয়াছেন, অসম্ভব কাণ্ড চোখে দেখিলেও বলিবে না, কারণ, অজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে না। এই অপরাধেই শ্রীমন্ত বেচারা নাকি মশানে গিয়াছিল। সে যাই হোক, ইহা অতি

সত্য কথা, সত্য লোকটা সেদিন বাসায় ফিরিয়া টেনিসন্ পড়িয়াছিল এবং ডন্ জুয়ানের বাঙলা তর্জমা করিতে বসিয়াছিল। অতবড় ছেলে, কিন্তু একবারও এ সংশয়ের কণামাত্রও তাহার মনে উঠে নাই যে, দিনের বেলা শহরের পথেঘাটে এমন অদ্ভুত প্রেমের বান ডাকা সম্ভব কি না, কিংবা সে বানের স্রোতে গা ভাসাইয়া চলা নিরাপদ কি না।

দিন-দুই পরে স্নানান্তে বাটী ফিরিবার পথে অপরিচিতা সহসা কহিল, কাল রাত্রে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলুম, সরলার কষ্ট দেখলে বুক ফেটে যায়—না?

সত্য সরলা প্লে দেখে নাই, স্বর্ণলতা বই পড়িয়াছিল ; আস্তে আস্তে বলিল, হাঁ, বড় দুঃখ পেয়েই মারা গেল।

রমণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ, কি ভয়ানক কষ্ট! আচ্ছা, সরলাই বা তার স্বামীকে এত ভালবাসলে কি করে, আর তার বড়জা-ই বা পারেনি কেন বলতে পার?

সত্য সংক্ষেপে জবাব দিল, স্বভাব।

রমণী কহিল, ঠিক তাই! বিয়ে ত সকলেরই হয়, কিন্তু সব স্ত্রী-পুরুষই কি পরস্পরকে সমান ভালবাসতে পারে? পারে না। কত লোক আছে, মরবার দিনটি পর্যন্ত ভালবাসা কি, জানতেও পায় না। জানবার ক্ষমতাই তাদের থাকে না। দেখনি, কত লোক গান-বাজনা হাজার ভাল হলেও মন দিয়ে শুনতে পারে না, কত লোক কিছুতেই রাগে না—রাগতে পারেই না! লোকে তাদের খুব গুণ গায় বটে, আমার কিন্তু নিন্দে করতে ইচ্ছে করে।

সত্য হাসিয়া বলিল, কেন?

রমণী উদ্দীপ্তকণ্ঠে উত্তর দিল, তারা অক্ষম বলে। অক্ষমতার কিছু কিছু গুণ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু দোষটাই বেশী। এই যেমন সরলার ভাশুর,—স্ত্রীর অতবড় অত্যাচারেও তার রাগ হল না।

সত্য চুপ করিয়া রহিল।

সে পুনরায় কহিল, আর তার স্ত্রী, ঐ প্রমদাটা কি শয়তান মেয়েমানুষ! আমি থাকতুম ত রাক্ষসীর গলা টিপে দিতুম।

সত্য সহাস্যে কহিল, থাকতে কি করে? প্রমদা বলে সত্যই ত কেউ ছিল না,—কবির কল্পনা—

রমণী বাধা দিয়া কহিল, তবে অমন কল্পনা করা কেন? আচ্ছা, সবাই বলে, সমস্ত মানুষের ভেতরেই ভগবান আছেন, আত্মা আছেন, কিন্তু প্রমদার চরিত্র দেখলে মনে হয় না যে, তার ভেতরেও ভগবান ছিলেন। সত্যি বলচি তোমাকে, কোথায় বড় বড় লোকের বই পড়ে মানুষ ভাল হবে, মানুষকে মানুষ ভালবাসবে, তা না, এমন বই লিখে দিলেন যে, পড়লে মানুষের ওপর মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়—বিশ্বাস হয় না যে সত্যিই সব মানুষের অন্তরেই ভগবানের মন্দির আছে।

সত্য বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, তুমি বুঝি খুব বই পড়?

রমণী কহিল, ইংরেজী জানিনে ত, বাংলা বই যা বেরোয়, সব পড়ি। এক-একদিন সারারাত্রি পড়ি—এই যে বড় রাস্তা—চল না আমাদের বাড়ি, যত বই আছে সব দেখাব।

সত্য চমকিয়া উঠিল—তোমাদের বাড়ি?

হাঁ, আমাদের বাড়ি—চল, যেতে হবে তোমাকে।

হঠাৎ সত্যর মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, সে সভয়ে বলিয়া উঠিল, না না, ছি ছি,—

ছি ছি কিছু নেই—চল।

না না, আজ না—আজ থাক, বলিয়া সত্য কম্পিত দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আজ তাহার এই অপরিচিতা প্রেমাস্পদার উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধার ভারে তাহার হৃদয় অবনত হইয়া রহিল।

পাঁচ

সকালবেলা স্নান করিয়া সত্য ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি ক্লান্ত, সজল। চোখের পাতা তখনও আর্দ্র। আজ চারদিন গত হইয়াছে, সেই অপরিচিতা প্রতিমাকে সে দেখিতে পায় নাই—আর তিনি গঙ্গাস্নানে আসেন না।

আকাশ-পাতাল কত কি যে এই কয়দিন সে ভাবিয়াছে, তাহার সীমা নাই। মাঝে মাঝে এ দুশ্চিন্তাও মনে উঠিয়াছে, হয়ত তিনি বাঁচিয়াই নাই, হয়ত বা মৃত্যুশয্যায়! কে জানে!

সে গলিটা জানে বটে, কিন্তু আর কিছু চেনে না। কাহার বাড়ি, কোথায় বাড়ি, কিছুই জানে না। মনে করিলে অনুশোচনায় আত্মগ্লানিতে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়। কেন সে সেদিন যায় নাই—কেন সেই সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছিল?

সে যথার্থই ভালবাসিয়াছিল। চোখের নেশা নহে, হৃদয়ের গভীর তৃষ্ণা। ইহাতে ছলনা কাপট্যের ছায়ামাত্র ছিল না, যাহা ছিল—তাহা সত্যই নিঃস্বার্থ, সত্যই পবিত্র, বুকজোড়া স্নেহ।

বাবু!

সত্য চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার সেই দাসী যে সঙ্গে আসিত, পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে।

সত্য ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া ভারী গলায় কহিল, কি হয়েছে তাঁর? বলিয়াই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল—সামলাইতে পারিল না।

দাসী মুখ নীচু করিয়া হাসি গোপন করিল, বোধ করি হাসিয়া ফেলিবার ভয়েই মুখ নীচু করিয়াই বলিল, দিদিমণির বড় অসুখ, আপনাকে দেখতে চাইচেন।

চল, বলিয়া সত্য তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া চোখ মুছিয়া সঙ্গে চলিল। চলিতে চলিতে প্রশ্ন করিল, কি অসুখ? খুব শক্ত দাঁড়িয়েছে কি?

দাসী কহিল, না, তা হয়নি, কিন্তু খুব জ্বর।

সত্য মনে মনে হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল, আর প্রশ্ন করিল না। বাড়ির সুমুখে আসিয়া দেখিল, খুব বড় বাড়ি, দ্বারের কাছে বসিয়া একজন হিন্দুস্থানী দরোয়ান ঝিমাইতেছে। দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি গেলে তোমার দিদিমণির বাবা রাগ করবেন না ত? তিনি ত আমাকে চেনেন না।

দাসী কহিল, দিদিমণির বাপ নেই, শুধু মা আছেন। দিদিমণির মত তিনিও আপনাকে খুব ভালবাসেন।

সত্য আর কিছু না বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সিঁড়ি বাহিয়া তেতলার বারান্দায় আসিয়া দেখিল, পাশাপাশি তিনটি ঘর, বাহির হইতে যতটুকু দেখা যায়, মনে হইল, সেগুলি চমৎকার সাজান। কোণের ঘর হইতে উচ্চহাসির সঙ্গে তবলা ও ঘুঙুরের শব্দ আসিতেছিল। দাসী হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, ঐ ঘর—চলুন। দ্বারের সুমুখে আসিয়া সে হাত দিয়া পর্দা সরাইয়া দিয়া সু-উচ্চকণ্ঠে বলিল, দিদিমণি, এই নাও তোমার নাগর।

তীব্র হাসি ও কোলাহল উঠিল। ভিতরে যাহা দেখিল, তাহাতে সত্যর সমস্ত মস্তিষ্ক ওলট-পালট হইয়া গেল; তাহার মনে হইল, হঠাৎ সে মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছে, কোনমতে দোর ধরিয়া, সে সেখানেই চোখ বুজিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল।

ঘরের ভিতরে মেঝেয় মোটা গদি-পাতা বিছানার উপর দু-তিনজন ভদ্রবেশী পুরুষ। একজন হারমোনিয়াম, একজন বাঁয়া-তবলা লইয়া বসিয়া আছে,—আর একজন একমনে মদ খাইতেছে। আর তিনি? তিনি বোধ করি, এইমাত্র নৃত্য করিতেছিলেন; দুই পায়ে একরাশ ঘুঙুর বাঁধা, নানা অলঙ্কারে সর্বাঙ্গ ভূষিত—সুরারঞ্জিত চোখ দুটি ঢুলুঢুলু করিতেছে;

ত্বরিতপদে কাছে সরিয়া আসিয়া, সত্যর একটা হাত ধরিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, বঁধুর মিরগি ব্যামো আছে নাকি? নে ভাই, ইয়ারকি করিস নে, ওঠ্—ও-সবে আমার ভারী ভয় করে।

প্রবল তড়িৎস্পর্শে হতচেতন মানুষ যেমন করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠে, ইহার করস্পর্শে সত্যর আপাদমস্তক তেমনি করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিল।

রমণী কহিল, আমার নাম শ্রীমতী বিজ্‌লী—তোমার নামটা কি ভাই? হাবু? গাবু?—

সমস্ত লোকগুলা হো হো শব্দে অট্টহাসি জুড়িয়া দিল, দিদিমণির দাসীটি হাসির চোটে একেবারে মেঝের উপর গড়াইয়া শুইয়া পড়িল—কি রঙ্গই জান দিদিমণি!

বিজ্‌লী কৃত্রিম রোষের স্বরে তাহাকে একটা ধমক দিয়া বলিল, থাম্, বাড়াবাড়ি করিস নে—আসুন, উঠে আসুন, বলিয়া জোর করিয়া সত্যকে টানিয়া আনিয়া, একটা চৌকির উপর বসাইয়া দিয়া, পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, হাত জোড় করিয়া শুরু করিয়া দিল—

আজু রজনী হাম, ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ-চন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশ-দিশ ভেল নিরদন্দা।
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু গেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা
অব সো ন যবহু মরি পরিহোয়ত—
তবহুঁ মানব নিজ দেহা—

যে. লোকটা মদ খাইতেছিল, উঠিয়া আসিয়া পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল। তাহার নেশা হইয়াছিল, কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, ঠাকুরমশাই, বড় পাতকী আমি—একটু পদরেণু—

অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ সত্য স্নান করিয়া একখানা গরদের কাপড় পরিয়াছিল।

যে লোকটা হারমোনিয়াম বাজাইতেছিল, তাহার কতকটা কাণ্ডজ্ঞান ছিল, সে সহানুভূতির স্বরে কহিল, কেন বেচারাকে মিছিমিছি সঙ্ সাজাচ্চ?

বিজ্‌লী হাসিতে হাসিতে বলিল, বাঃ, মিছামিছি কিসে? ও সত্যিকারের সঙ্ বলেই ত এমন আমোদের দিনে ঘরে এনে তোমাদের তামাশা দেখাচ্চি। আচ্ছা, মাথা খাস গাবু, সত্যি বল্ ত ভাই, কি আমাকে তুই ভেবেছিলি? নিত্য গঙ্গাস্নানে যাই, কাজেই ব্রাহ্মও নই, মোচলমান খ্রীষ্টানও নই। হিঁদুর ঘরের এতবড় ধাড়ী মেয়ে, হয় সধবা, নয় বিধবা—কি মতলবে চুটিয়ে পীরিত করছিলি বল্ ত? বিয়ে করবি বলে, না, ভুলিয়ে নিয়ে লম্বা দিবি বলে?

ভারী একটা হাসি উঠিল। তার পর সকলে মিলিয়া কত কথাই বলিতে লাগিল। সত্য একটিবার মুখ তুলিল না, একটা কথার জবাব দিল না। সে মনে মনে কি ভাবিতেছিল, তাহা বলিবই বা করিয়া, আর বলিলে বুঝিবেই বা কে? থাক্ সে।

বিজ্‌লী সহসা চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাঃ বেশ ত আমি। যা ক্ষ্যামা, শিগ্‌গির যা—বাবুর খাবার নিয়ে আয়; স্নান করে এসেচেন—বাঃ, আমি কেবল তামাশাই কচ্চি যে। বলিতে বলিতেই তাহার অনতিকাল পূর্বের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বহ্ন্যুত্তপ্ত কণ্ঠস্বর অকৃত্রিম সস্নেহ অনুতাপে যথার্থই জুড়াইয়া গেল।

খানিক পরে দাসী একথালা খাবার আনিয়া হাজির করিল। বিজ্‌লী নিজের হাতে লইয়া আবার হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল, মুখ তোল, খাও।

এতক্ষণ সত্য তাহার সমস্ত শক্তি এক করিয়া নিজেকে সামলাইতেছিল, এইবার মুখ তুলিয়া শান্তভাবে বলিল, আমি খাব না।

কেন? জাত যাবে? আমি হাড়ি না মুচি?

সত্য তেমনি শান্তকণ্ঠে বলিল, তা হলে খেতুম। আপনি যা তাই।

বিজ্‌লী খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, হাবুবাবুও ছুরি-ছোরা চালাতে জানেন দেখচি! বলিয়া আবার হাসিল, কিন্তু তাহা শব্দ মাত্র, হাসি নয়, তাই আর কেহ সে হাসিতে যোগ দিতে পারিল না।

সত্য কহিল, আমার নাম সত্য, 'হাবু' নয়। আমি ছুরি-ছোরা চালাতে কখন শিখিনি, কিন্তু নিজের ভুল টের পেলে শোধরাতে শিখেচি।

বিজ্‌লী হঠাৎ কি কথা বলিতে গেল, কিন্তু চাপিয়া লইয়া শেষে কহিল, আমার ছোঁয়া খাবে না?

না।

বিজ্‌লী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিহাসের স্বরে এবার তীব্রতা মিশিল ; জোর দিয়া কহিল, খাবেই। এই বলচি তোমাকে, আজ না হয় কাল, না হয় দু'দিন পরে খাবেই তুমি।

সত্য ঘাড় নাড়িয়া বলিল, দেখুন, ভুল সকলেরই হয়। আমার ভুল যে কত বড়, তা সবাই টের পেয়েছে ; কিন্তু আপনারও ভুল হচ্চে। আজ নয়, আগামী জন্মে নয়—কোনকালেই আপনার ছোঁয়া খাব না। অনুমতি করুন, আমি যাই—আপনার নিঃশ্বাসে আমার রক্ত শুকিয়ে যাচ্চে।

তাহার মুখের উপর গভীর ঘৃণার এমনি সুস্পষ্ট ছায়া পড়িল যে, তাহা ঐ মাতালটার চক্ষুও এড়াইল না। সে মাথা নাড়িয়া কহিল, বিজ্‌লীবিবি, অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্! যেতে দাও—যেতে দাও—সকালবেলার আমোদটাই ও মাটি করে দিলে।

বিজ্‌লী জবাব দিল না, স্তম্ভিত হইয়া সত্যর মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যথার্থই তাহার ভয়নাক ভুল হইয়াছিল। সে ত কল্পনাও করে নাই, এমনি মুখচোরা শান্ত লোক এমন করিয়া বলিতে পারে।

সত্য আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজ্‌লী মৃদুস্বরে কহিল, আর একটু বসো।

মাতাল শুনিতে পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, উঁ হুঁ, হুঁ প্রথম চোটে একটু জোর খেলবে—যেতে দাও—যেতে দাও—সুতো ছাড়ো—সুতো ছাড়ো—

সত্য ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল ; বিজ্‌লী পিছনে আসিয়া পথরোধ করিয়া চুপি চুপি বলিল, ওরা দেখতে পাবে, তাই, নইলে হাতজোড় করে বলতুম, আমার বড় অপরাধ হয়েচে—

সত্য অন্যদিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সে পুনর্বার কহিল, এই পাশের ঘরটা আমার পড়ার ঘর। একবার দেখবে না? একটিবার এসো, মাপ চাচ্চি।

না, বলিয়া সত্য সিঁড়ির অভিমুখে অগ্রসর হইল। বিজ্‌লী পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে কহিল, কাল দেখা হবে?

না।

আর কি কখনো দেখা হবে না?

না।

কান্নায় বিজ্‌লীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল ; ঢোক গিলিয়া জোর করিয়া গলা পরিষ্কার

করিয়া বলিল, আমার বিশ্বাস হয় না, আর দেখা হবে না। কিন্তু তাও যদি না হয়, বল, এই কথাটা আমার বিশ্বাস করবে?

ভগ্নস্বর শুনিয়া সত্য বিস্মিত হইল, কিন্তু এই পনর-ষোল দিন ধরিয়া যে অভিনয় সে দেখিয়াছে, তাহার কাছে ত ইহা কিছুই নয়। তথাপি সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। সে-মুখের রেখায় রেখায় সুদৃঢ় অপ্রত্যয় পাঠ করিয়া বিজ্‌লীর বুক ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু সে করিবে কি? হায়, হায়! প্রত্যয় করাইবার সমস্ত উপায়ই যে সে আবর্জনার মত স্বহস্তে ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে!

সত্য প্রশ্ন করিল, কি বিশ্বাস করব?

বিজ্‌লীর ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু স্বর ফুটিল না। অশ্রুভারাক্রান্ত দুই চোখ মুহূর্তের জন্য তুলিয়াই অবনত করিল। সত্য তাহাও দেখিল কিন্তু অশ্রুর কি নকল নাই! বিজ্‌লী মুখ না তুলিয়াই বুঝিল, সত্য অপেক্ষা করিয়া আছে ; কিন্তু সেই কথাটা যে মুখ দিয়া সে কিছুতেই বাহির করিতে পারিতেছে না, যাহা বাহিরে আসিবার জন্য, তাহার বুকের পাঁজরগুলো ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া দিতেছে!

সে ভালবাসিয়াছে। সে ভালবাসার একটা কণা সার্থক করিবার লোভে সে এই রূপের ভাণ্ডার দেহটাও হয়ত একখণ্ড গলিত বস্ত্রের মতই ত্যাগ করিতে পারে—কিন্তু কে তাহা বিশ্বাস করিবে! সে যে দাগী আসামী! অপরাধের শতকোটি চিহ্ন সর্বাঙ্গে মাখিয়া বিচারের সুমুখে দাঁড়াইয়া, আজ কি করিয়া সে মুখে আনিবে, অপরাধ করাই তাহার পেশা বটে, কিন্তু এবার সে নির্দোষ! যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই সে বুঝিতে লাগিল, বিচারক তাহার ফাঁসির হুকুম দিতে বসিয়াছে, কিন্তু কি করিয়া সে রোধ করিবে?

সত্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল ; সে বলিল, চললুম।

বিজ্‌লী তবুও মুখ তুলিতে পারিল না, কিন্তু এবার কথা কহিল। বলিল, যাও, কিন্তু যে কথা অপরাধে মগ্ন থেকেও আমি বিশ্বাস করি, সে কথা অবিশ্বাস করে যেন তুমি অপরাধী হয়ো না। বিশ্বাস করো, সকলের দেহতেই ভগবান বাস করেন এবং আমরণ দেহটাকে তিনি ছেড়ে চলে যান না। একটু থামিয়া কহিল, সব মন্দিরেই দেবতার পূজা হয় না বটে, তবুও তিনি দেবতা। তাঁকে দেখে মাথা নোয়াতে না পার, কিন্তু তাঁকে মাড়িয়ে যেতেও পার না। বলিয়াই পদশব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, সত্য ধীরে ধীরে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে।

স্বভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে ত উড়াইয়া দেওয়া যায় না। নারীদেহের উপর শত অত্যাচার চলিতে পারে, কিন্তু নারীত্বকে ত অস্বীকার করা চলে না ! বিজ্‌লী নর্তকী, তথাপি সে যে নারী। আজীবন সহস্র অপরাধে অপরাধী, তবুও যে এটা তাহার নারীদেহ! ঘণ্টা-খানেক পরে যখন সে এ ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার লাঞ্ছিত, অর্ধমৃত নারীপ্রকৃতি অমৃতস্পর্শে জাগিয়া বসিয়াছে। এই অত্যল্প সময়টুকুর মধ্যে তাহার সমস্ত দেহে যে কি অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা ঐ মাতালটা পর্যন্ত টের পাইল। সে-ই মুখ ফুটিয়া বলিল ফেলিল—কি বাইজী, চোখের পাতা ভিজে যে! মাইরি ছোঁড়াটা কি একগুঁয়ে, অমন জিনিসগুলো মুখে দিলে না। দাও, দাও, থালাটা এগিয়ে দাও ত হ্যাঁ, বলিয়া নিজেই টানিয়া গিলিতে লাগিল।

তাহার একটি কথাও বিজ্‌লীর কানে গেল না। হঠাৎ তাহার নিজের পায়ে নজর পড়ায় পায়ে বাঁধা ঘুঙুরের তোড়া যেন বিছার মত তাহার দু পা বেড়িয়া দাঁত ফুটাইয়া দিল, সে তাড়াতাড়ি সেগুলা খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, খুললে যে?

বিজলী মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আর পরব না বলে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, আর না। বাইজী মরেছে—

মাতাল সন্দেশ চিবাইতেছিল। কহিল, কি রোগে বাইজী?

বাইজী আবার হাসিল। এ সেই হাসি। হাসিমুখে কহিল, যে রোগে আলো জ্বাললে আঁধার মরে, সূর্যি উঠলে রাত্রি মরে—আজ সেই রোগেই তোমাদের বাইজী চিরদিনের জন্য মরে গেল বন্ধু।

ছয়

চার বৎসর পরের কথা বলিতেছি। কলিকাতার একটা বড় বাড়িতে জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশন। খাওয়ানো-দাওয়ানোর বিরাট ব্যাপার শেষ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর বহির্বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আসর করিয়া আমোদ-আহ্লাদ, নাচ-গানের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে।

একধারে তিন-চারটি নর্তকী—ইহারাই নাচ-গান করিবে। দ্বিতলের বারান্দায় চিকের আড়ালে বসিয়া রাধারানী একাকী নীচের জনসমাগম দেখিতেছিল। নিমন্ত্রিতা মহিলারা এখনও শুভাগমন করেন নাই।

নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া সত্যেন্দ্র কহিলেন, এত মন দিয়ে কি দেখচ বল ত?

রাধারানী স্বামীর দিকে ফিরিয়া হাসিমুখে বলিল, যা সবাই দেখতে আসচে—বাইজীদের সাজসজ্জা, কিন্তু, হঠাৎ তুমি যে এখানে?

স্বামী হাসিয়া জবাব দিলেন, একলাটি বসে আছ, তাই একটু গল্প করতে এলুম।

ইস্!

সত্যি! আচ্ছা, দেখচ ত, বল দেখি, ওদের মধ্যে সবচেয়ে কোন্‌টিকে তোমার পছন্দ হয়?

ঐটিকে, বলিয়া রাধারানী আঙুল তুলিয়া, যে স্ত্রীলোকটি সকলের পিছনে নিতান্ত সাদাসিধা পোশাকে বসিয়াছিল তাহাকেই দেখাইয়া দিল।

স্বামী বলিলেন, ও যে নেহাত রোগা।

তা হোক, ঐ সবচেয়ে সুন্দরী। কিন্তু, বেচারী গরীব—গায়ে গয়না-টয়না এদের মত নেই।

সত্যেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, তা হবে। কিন্তু, এদের মজুরি কত জান?

না।

সত্যেন্দ্র হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, এদের দু'জনের ত্রিশ টাকা করে, ঐ ওর পঞ্চাশ, আর যেটিকে গরীব বলচ, তার দু শ টাকা।

রাধারানী চমকিয়া উঠিল—দু শ! কেন, ও কি খুব ভাল গান করে?

কানে শুনিনি কখনো। লোকে বলে, চার-পাঁচ বছর আগে খুব ভালই গাইত,—কিন্তু, এখন পারবে কিনা বলা যায় না।

তবে, অত টাকা দিয়ে আনলে কেন?

তার কমে ও আসে না। এতেও আসতে রাজী ছিল না, অনেক সাধাসাধি করে আনা হয়েছে।

রাধারানী অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, টাকা দিয়ে সাধাসাধি কেন?

সত্যেন্দ্র নিকটে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, তার প্রথম কারণ, ও ব্যবসা ছেড়ে দিয়েচে। গুণ ওর যতই হৌক, এত টাকা সহজে কেউ দিতেও চায় না, ওকেও আসতে হয় না, এই ওর ফন্দি! দ্বিতীয় কারণ, আমার নিজের গরজ।

কথাটা রাধারানী বিশ্বাস করিল না। তথাপি আগ্রহে ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল, তোমার

গরজ ছাই। কিন্তু ব্যবসা ছেড়ে দিলে কেন?

শুনবে?

হাঁ, বল।

সত্যেন্দ্র একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, ওর নাম বিজ্‌লী। এক সময়ে—কিন্তু, এখানে লোক এসে পড়বে যে রানী, ঘরে যাবে?

যাব, চল, বলিয়া রাধারানী উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া সমস্ত শুনিয়া রাধারানী আঁচলে চোখ মুছিল। শেষে বলিল, তাই আজ ওঁকে অপমান করে শোধ নেবে? এ বুদ্ধি কে তোমাকে দিলে?

এদিকে সত্যেন্দ্রর নিজের চোখও শুষ্ক ছিল না, অনেকবার গলাটাও ধরিয়া আসিতেছিল। তিনি বলিলেন, অপমান বটে, কিন্তু সে অপমান আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না। কেউ জানবেও না।

রাধারানী জবাব দিল না। আর একবার আঁচলে চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকে আসর ভরিয়া গিয়াছে এবং উপরের বারান্দায় বহু স্ত্রীকণ্ঠের সলজ্জ চীৎকার চিকের আবরণ ভেদ করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য নতর্কীরা প্রস্তুত হইয়াছে, শুধু বিজ্‌লী তখনও মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তাহার সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল, তাই অভাবের তাড়নায় বাধ্য হইয়া আবার সেই কাজ অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছে, যাহা সে শপথ করিয়া ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু, সে মুখ তুলিয়া খাড়া হইতে পারিতেছিল না। অপরিচিত পুরুষের সতৃষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে দেহ যে এমন পাথরের মত ভারী হইয়া উঠিবে, পা এমন করিয়া দুমড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিবে, তাহা সে ঘণ্টা-দুই পূর্বে কল্পনা করিতেও পারে নাই।

আপনাকে ডাকচেন—। বিজ্‌লী মুখ তুলিয়া দেখিল পাশে দাঁড়াইয়া একটি বার-তের বছরের ছেলে। সে উপরের বারান্দা নির্দেশ করিয়া পুনরায় কহিল, মা আপনাকে ডাকচেন।

বিজ্‌লী বিশ্বাস করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, কে আমাকে ডাকচেন?

মা ডাকচেন?

তুমি কে?

আমি বাড়ির চাকর।

বিজ্‌লী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমাকে নয়, তুমি আবার জিজ্ঞাসা করে এসো।

বালক খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আপনার নাম বিজ্‌লী ত? আপনাকেই ডাকচেন,—আসুন আমার সঙ্গে, মা দাঁড়িয়ে আছেন।

চল, বলিয়া বিজ্‌লী তাড়াতাড়ি পায়ের ঘুঙুর খুলিয়া ফেলিয়া, তাহার অনুসরণ করিয়া অন্দরে আসিয়া প্রবেশ করিল। মনে করিল, গৃহিণীর বিশেষ কিছু ফরমায়েস আছে, তাই এই আহ্বান।

শোবার ঘরের দরজার কাছে রাধারানী ছেলে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ত্রস্ত কুণ্ঠিত পদে বিজ্‌লী সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্রই সে সসম্ভ্রমে হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিল ; এবং একটা চৌকির উপর জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া হাসিমুখে কহিল, দিদি, চিনতে পার?

বিজ্‌লী বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। রাধারানী কোলের ছেলেকে দেখাইয়া বলিল, ছোটবোনকে না হয় নাই চিনলে দিদি, সে দুঃখ করিনে ; কিন্তু, এটাকে না চিনতে পারলে সত্যিই ভারী ঝগড়া করব। বলিয়া মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

এমন হাসি দেখিয়াও বিজ্‌লী তথাপি কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু তাহার আঁধার আকাশ

ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিতে লাগিল। সেই অনিন্দ্যসুন্দর মাতৃমুখ হইতে সদ্যবিকশিত গোলাপ-সদৃশ শিশুর মুখের প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া রহিল। রাধারানী নিস্তব্ধ। বিজ্‌লী নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া শিশুকে কোলে টানিয়া লইয়া সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাধারানী কহিল, চিনেচ দিদি?

চিনেচি বোন।

রাধারানী কহিল, দিদি, সমুদ্র-মন্থন করে বিষটুকু তার নিজে খেয়ে সমস্ত অমৃতটুকু এই ছোটবোনটিকে দিয়েচ। তোমাকে ভালবেসেছিলেন বলেই আমি তাঁকে পেয়েচি।

সত্যেন্দ্রের একখানি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ হাতে তুলিয়া বিজ্‌লী একদৃষ্টে দেখিতেছিল ; মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, বিষের বিষই যে অমৃত বোন। আমি বঞ্চিত হইনি ভাই। সেই বিষই এই ঘোর পাপিষ্ঠাকে অমর করেচে।

রাধারানী সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, দেখা করবে দিদি?

বিজ্‌লী একমুহূর্ত চোখ বুজিয়া স্থির থাকিয়া বলিল, না দিদি। চার বছর আগে যেদিন তিনি এই অস্পৃশ্যটাকে চিনতে পেরে, বিষম ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন, সেদিন দর্প করে বলেছিলেন, আবার দেখা হবে, আবার তুমি আসবে। কিন্তু, সেই দর্প আমার রইল না, আর তিনি এলেন না। কিন্তু, আজ দেখতে পাচ্ছি, কেন দর্পহারী আমার সে দর্প ভেঙ্গে দিলেন! তিনি ভেঙ্গে দিয়ে যে কি করে গড়ে দেন, কেড়ে নিয়ে যে কি করে ফিরিয়ে দেন, সে কথা আমার চেয়ে আজ কেউ জানে না বোন! বলিয়া সে আর একবার ভাল করিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, প্রাণের জ্বালায় ভগবানকে নির্দয় নিষ্ঠুর বলে অনেক দোষ দিয়েচি, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, এই পাপিষ্ঠাকে তিনি কি দয়া করেচেন। তাঁকে ফিরিয়ে এনে দিলে, আমি যে সবদিকে মাটি হয়ে যেতুম! তাঁকেও পেতুম না, নিজেকেও হারিয়ে ফেলতুম।

কান্নায় রাধারানীর গলা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে কিছুই বলিতে পারিল না। বিজ্‌লী পুনরায় কহিল, ভেবেছিলুম কখনও দেখা হলে তাঁর পায়ে ধরে আর একটিবার মাপ চেয়ে দেখব। কিন্তু তার আর দরকার নেই। এই ছবিটুকু শুধু দাও দিদি—এর বেশী আমি চাইনে। চাইলেও ভগবান তা সহ্য করবেন না—আমি চললুম, বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাধারানী গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, আবার কবে দেখা হবে দিদি?

দেখা আর হবে না বোন। আমার একটা ছোট বাড়ি আছে, সেইটে বিক্রি করে যত শীঘ্র পারি চলে যাব। ভাল কথা, বলতে পার ভাই, কেন হঠাৎ তিনি এতদিন পরে আমাকে স্মরণ করেছিলেন? যখন তাঁর লোক আমাকে ডাকতে যায়, তখন কেন একটা মিথ্যে নাম বলেছিল?

লজ্জায় রাধারানীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে নতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বিজ্‌লী ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, হয়ত বুঝচি। আমাকে অপমান করবেন বলে, না? তা ছাড়া, এত চেষ্টা করে আমাকে আনবার ত কোন কারণই দেখিনে।

রাধারানীর মাথা আরও হেঁট হইয়া গেল। বিজ্‌লী হাসিয়া বলিল, তোমার লজ্জা কি বোন? তবে তাঁরও ভুল হয়েচে। তাঁর পায়ে আমার শতকোটি প্রণাম জানিয়ে বোলো, সে হবার নয়। আমার নিজের বলে আর কিছু নেই! অপমান করলে, সমস্ত অপমান তাঁর গায়েই লাগবে।

নমস্কার দিদি!

নমস্কার বোন! বয়সে ঢের বড় হলেও তোমাকে আশীর্বাদ করবার অধিকার ত আমার নেই—আমি কায়মনে প্রার্থনা করি বোন, তোমার হাতের নোয়া অক্ষয় হোক। চললুম।

ভাদ্র ১৩২১

পরিবর্ত

বিজয়রত্ন মজুমদার

প্রথম পরিচ্ছেদ

কেমন করিয়া সম্ভব হইল—কে জানে! কিন্তু হইল।

সত্যেন্দ্র করিয়াছিল একটি কয়লা-চালানী আফিস। মিরিয়ম ডাইক্স ছিল সেই আফিসের দশ-পনেরোটি কেরানীর একটি! একটি টাইপিস্ট! মুখচোরা বেচারা,—না কয় বেশী কথা, না বেশী হাসে একটু,—না কিছু! আর সত্যেন্দ্র ছিল সেই ধরণের পুরুষ একজন, যে সারা জীবনটা স্ত্রী-জাতিকে ভয়, সম্ভ্রম, সমীহ করিয়া আসিয়াছে।

সেই সত্যেন্দ্রই মিরিয়ম ডাইক্সকে ভালোবাসিয়া ফেলিল! শুধু যে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াই ক্ষান্ত হইল তাহা নহে,—বলিয়াও ফেলিল। মিরিয়ম শুনিল ; শুনিতে-শুনিতে তাহার গোলাপের মত কপোলটি রক্তবর্ণ ধারণ করিল,—নীল নয়ন-দুটি বার-দুই কাঁপিয়া স্থির হইয়া গেল। মিরিয়ম দুই হাতে একটা পেন্সিল চাপিয়া নীরবে সত্যেন্দ্রের টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া রহিল।

সত্যেন্দ্র চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—ঘুরিয়া আসিয়া, মিরিয়মের হাতখানি তুলিয়া লইয়া, আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে কহিল—মিরিয়ম, প্রিয়তমে মিরিয়ম, আমার অসীম উন্মুখ প্রেম উপেক্ষা করিও না প্রিয়ে,—তাহা হইলে আমি বাঁচিব না। বল—বল, প্রাণাধিকে, তুমি কি আমায় ভালোবাসিতে পারিবে না?

মিরিয়ম নিঃশব্দ।

সত্যেন্দ্র অধীর হইয়া উঠিতেছিল। এক মুহূর্ত প্রেমিকের নিকট এক ঘণ্টার সমান বোধ হয়। সত্যেন্দ্র দুই হাতে মিরিয়মের মুখখানি তুলিয়া ধরিল। ধরিতেই কয়েক ফোঁটা জল সত্যেন্দ্রের হাতের উপর ঝরিয়া পড়িল। সত্যেন্দ্র ভয় পাইয়া গেল। ও বাবা! কাঁদে যে!

কিন্তু সে প্রবল ইচ্ছাবেগ সম্বরণ করিতেও পারিতেছিল না। মিরিয়মের সিক্ত মুখের পানে চাহিয়া, ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসিল—মিরিয়ম, এ কি একান্তই দুরাশা?

এ কথায় সেই অশ্রুধৌত চোখেও বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল। মিরিয়ম কোন কথার উত্তর দিল না,—নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

সত্যেন্দ্রের বুঝা উচিত ছিল,—যুবতীর চোখে এমন সময়ে অশ্রু কেন? অশ্রু ঝরে কি অমনি-অমনি! সুখে ঝরে, দুঃখে ঝরে! সে যে প্রস্তাব করিয়াছে, সে ত সুখেরই প্রস্তাব,—দুঃখের কি আছে তাহাতে?

কিন্তু অত-শত সে বুঝিল না। দেরী দেখিয়া নিরাশায় তাহার হৃদয়টি ভরিয়া যাইতেছিল,—ক্ষণমাত্র বিলম্ব তাহার সহিতেছিল না। সে শুনিয়াছে, এমন অবস্থায় নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিলে, বিফলতার সম্ভাবনা অল্প। যেমন মনে হওয়া, অমনি সে তড়াক করিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, কাতর, করুণ কণ্ঠে ডাকিল—মিরিয়ম, মিরিয়ম, প্রিয় আমার, ভালোবাসা আমার! কথা কও, বল, বল...

মিরিয়ম এইবার কথা কহিল, বলিল—ও হ, দিস্ ইজ সকিং! আমাকে ভাবিতে সময় দিন।

ভাবিতে সময়? মিরিয়ম...

হাঁ, এক সপ্তাহ সময় দিন।

ওঃ! এক সপ্তাহ!...সত্যেন্দ্র সত্যসত্যই হতাশ হইয়া গেল। বলিল—সময় কেন প্রিয়ে! তুমি কি তবে আমায় ভালোবাস না?

বাসি!

তবে?

মিরিয়ম গদগদ কণ্ঠে কহিল, আমাকে মন স্থির করিতে দিন।

সত্যেন্দ্র বলিল—একান্তই সময় চাই?

মিরিয়ম ঘাড় নাড়িল।

বেশ—তাই ; আজ শনিবার ; আগামী শনিবারের পূর্বেই বলিবে?

বলিব।...মিরিয়ম প্রস্থানোদ্যত হইয়াছিল,—সত্যেন্দ্র আবার তাহার হাতটি ধরিল। বলিল—মিরিয়ম, শনিবারের আশায় রহিলাম। প্রিয়তমে! দেখিও, আমাকে নিরাশা-সাগরে ডুবাইও না যেন!

মিরিয়ম নিঃশব্দে একটি কটাক্ষ করিয়া, কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। সত্যেন্দ্র নিজের চেয়ারটিতে বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। মিরিয়ম বলিয়াছে, ভালোবাসে! তবে আর সম্ভবত বিশেষ কোন ভাবনা নাই! যদিও সময় লওয়াটা সত্যেন্দ্রের মনে একটি খট্‌কা তুলিয়াছিল,—কিন্তু ভাবিতে ভাবিতে মনটি সাফ্ হইয়া গেল। ইংরেজে-বাঙ্গালীতে বিবাহ অনেক হইয়াছে বটে, এখনও হইতেছে ;—কিন্তু ভয় প্রথম-প্রথম কাহার না হয়? স্ববর্ণ নহে, স্বদেশীয় নহে, স্বজাতীয়ও নহে, স্বধর্মীও নহে ;—এমন লোককে বিবাহ করিতে কি অমনি এক কথায় রাজী কেহ হইতে পারে? বেশ ত, মন ঠিক করিয়া লউক না,—সাত দিনে আর কি ক্ষতি হইতেছে? আর এ বিবাহে আপত্তি করিবার কেহ নাই,—কিছু নাই। মিরিয়ম বলিয়াছে যে আত্মীয়-পরিজন তাহার নাই,—অল্প বয়সেই সে পিতৃমাতৃহীনা ;—এক ধর্মযাজক পরিবারের মধ্যেই সে মানুষ হইয়াছিল। কয় বৎসর হইল, তাঁহারাও দেহরক্ষা করিয়াছেন। এখন তাহার অভিভাবক সে স্বয়ং! একটা ক্লাব হাউসে অনেকগুলি চাক্‌রে মেয়ের সঙ্গে বাস করে। যা আশীটি টাকা মাহিনা পায়, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট!

মিরিয়ম সর্টহ্যাণ্ড নোট্ লইতে আসিত। সত্যেন্দ্র ডিক্‌টেসন দিত না ;—না দিয়া প্রশ্ন করিয়া, একে-একে এই সব জানিয়া লইয়াছিল।

আফিসে নিয়ম ছিল,—কর্মকারকগণ গৃহে গমনকালে অধ্যধিকারীকে শুভ-রাত্রি জ্ঞাপন করিয়া যাইত। সেদিন ছিল শনিবার। তিনটা বাজিতেই, একে-একে বাবুরা সু-সন্ধ্যা করিয়া গেল। সকলের শেষে আসিল, মিরিয়ম!

স্বপ্নালোকিত কক্ষে সহসা একঝাড় রজনীগন্ধা দুলিয়া উঠিল। মিরিয়ম বলিল—শুভ-রাত্রি!

শুভ-রাত্রি! বাড়ী যাইবে ত মিরিয়ম? চলো না আমার সঙ্গে, কারে। নামাইয়া দিয়া যাইব। আমার প্রিয়ার বাসস্থানটি ত দেখা হইবে!

ধন্যবাদ! চল।

সত্যেন্দ্র বেহারাকে ডাকিতে ঘণ্টা বাজাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সপ্তাহ কাটিয়া গেছে,—আজ শনিবার।

সত্যেন্দ্র সকাল-সকাল স্নানাহার সারিয়া, দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেশ-বাস সজ্জিত করিয়া লইল। তাহার সপ্তদশ-বর্ষীয়া পত্নী সুবাস নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল ; সত্যেন্দ্রের তিলমাত্র অবকাশ নাই, তাহার সহিত দাঁড়াইয়া দুইটি কথা কহে, বা একটু আদর করে।

আর কি কথাই বা কহিবে? সে কি জানে কথা কহিতে? একটা রহস্য বুঝে না,—একটা রসিকতা সহ্য হয় না ;—ঘ্যান-ঘ্যানে আর প্যান-প্যানে। সত্যেন্দ্র বরাবর ভাবিত, সে এমন কি অন্যায় করিয়াছে, যাহার জন্য বিধাতা তাহার ভাগ্যে এমন 'স্ত্রী-রত্ন' জুটাইয়া দিলেন। বেশীর ভাগ বাঙ্গালীই বিবাহিত জীবনে সুখী নয়। এই বিংশ শতাব্দীর নব সভ্যতার আলোকে বঙ্গীয় যুবকগণের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে,—গৃহের কোণে স্ত্রীর অধর-সুধায় ও চোখের জলে আর তাহার তৃপ্তি নাই। তাহাতে না আছে এতটুকু বৈচিত্র্য, না আছে সজীবতা! কি সুখে জীবন যাপন করে জানি না,—সত্যেন্দ্র ত মরিয়া হইয়াছে! সেই দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবন! সেই আফিস হইতে আসা,—সেই জলখাবারের রেকাবী,—সেই খাও-খাও, আমার মাথা খাও—অনেক হইয়াছে,—আর চলে না, চলে না! অসহ্য!

আজ বঙ্গীয় যুবকগণের শরীরে স্বাস্থ্য নাই, দেহে বল নাই, মনে স্ফূর্তি নাই, কর্মে আগ্রহ নাই,—কেন? সে ঐ স্ত্রী। স্ত্রীর জন্য! স্ত্রীরা কি স্বামীদের তুষ্টির জন্য অন্যরূপ হইতে পারে না? তাহারা কি ইহ-পরকালের প্রভুকে সুখী করিতে চাহে না? সত্যেন্দ্র স্বীকার করিত, না, তাহাদের দোষ নাই ; কিন্তু সমাজ! সমাজ যে চারিদিকে কান খাড়া করিয়া রক্ত চক্ষে চাহিয়া আছে!

পারে যদি কেহ এই সমাজটাকে আঙ্গুল তুলিয়া বঙ্গসাগর গর্ভে নিক্ষেপ করিতে, তবেই,—তবেই আবার দেশে প্রাণ আসিবে, ছেলেরা মানুষ হইবে! নতুবা সব যাইবে। কুব্জ-পৃষ্ঠ অধিকতর কুব্জ,—ন্যুব্জ দেহ আরো ন্যুব্জ হইবে! সত্যেন্দ্র সমাজ সংস্কারক নহে,—সমাজ বাঁচুক বা মরুক, সে চিন্তা করিয়া মস্তিষ্ক উষ্ণ করিবার তাহার প্রয়োজন নাই ; নিজের পথ সে বাছিয়া লইয়াছে। তাহাতে যদি তাহার নিন্দা হয়,—হৌক ; লোকে নিষ্ঠুর বলে,—বলুক। লোকের জন্য নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিবে, এমন মূর্খ, বর্বর সে নয়।

সত্যেন্দ্র দশ মিনিটের মধ্যেই আফিসে আসিয়া পৌঁছিল। বেহারা হাত হইতে ছড়ি ও টুপি লইয়া, আল্‌নায় ঝুলাইয়া, প্রভুর কামরায় পাখা খুলিয়া দিল। সত্যেন্দ্র কোট্‌টি খুলিতে খুলিতে হাজিরা-বহি টানিয়া লইল—সকলেই আসিয়াছে ;—আসে নাই—কেবল মিরিয়ম! সব আসা না আসা সমান হইয়া গেল। সত্যেন্দ্র ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, ১০-৩৫। পাতা উল্টাইতে-উল্টাইতে সত্যেন্দ্র দেখিল, কখনও ১০-২৫এর পরে মিরিয়ম আসে নাই। ২০, ২১ ২২, ক্বচিৎ ২৫—ইহার বেশী একটি দিনও হয় নাই।

সত্যেন্দ্র চিন্তান্বিত মুখে চেয়ারে বসিল। বেহারা কাচের পিরিচের উপর কাচের গেলাসে কাচের মত বরফ-জল রাখিয়া গেল। সত্যেন্দ্র গেলাস তুলিয়া জল পান করিল বটে,—কিন্তু তাহার জিহ্বায় জলের স্বাদ আজ কিরূপ ঠেকিল, তাহা কি আর বলিতে হইবে! সত্যেন্দ্র সিগারেট ধরাইল ; এত প্রিয় যে সামগ্রী, আজ তাহার তাহা ভাল লাগিল না। কিন্তু কি করিবে! সিগারেট ছাড়া আর কিসে মনের ব্যাকুলতার কথঞ্চিৎ শান্তিও দিতে পারে? একটা, দুইটা, তিনটা—পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, শান্তি মিলিল না।

বাহিরে খটা-খট্ টাইপ-কলের শব্দ হইতেছে। থাকিয়া-থাকিয়া টুং-টুং করিয়া টেলিফোঁর ঘণ্টা বাজিতেছে। মধ্যে মধ্যে নিম্নকণ্ঠে বাবুদের গুঞ্জন-ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। টেবিলের উপর স্তরে-স্তরে চিঠিপত্র ও কাগজাদি সজ্জিত। সত্যেন্দ্র কিছুতেই মন দিতে পারিতেছে না।

দেখিতে দেখিতে ঢং ঢং ঢং ঢং করিয়া চারটা বাজিয়া গেল। আর এক ঘণ্টা, তার পরই ত আফিস বন্ধ হইবে। আর কি সে আসবে? নাঃ আজিকার দিনই যখন বৃথায় গেল, আসিল না, তখন নিশ্চয় মিরিয়ম আর আসিবে না। আকাশের গায়ে গত সাত দিন ধরিয়া যে সুরম্য হর্ম্য গঠিত হইয়া উঠিতেছিল, ঐ বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়ে! ঐ বুঝি তাহার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মূল হইয়া যায়!...

টেলিফোঁর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। এক-মিনিট পরেই টেলিফোঁ-বাবু পরদা ঠেলিয়া

সত্যেন্দ্রের সম্মুখীন হইয়া ইংরাজীতে কহিল—আপনাকে কেহ খুঁজিতেছেন মহাশয়!

সত্যেন্দ্র অত্যন্ত বিরক্তভাবে টেলিফোঁর কল তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসিল, কে তুমি!

উত্তর আসিল, আমি মিরিয়ম!

আজ সপ্তাহ শেষ হইল, তুমি ত আসিলে না?

উত্তর হইল—হা হতোস্মি! আমি আসিব! সেই কি রীতি? না, তুমি আসিবে।

সত্যেন্দ্র জিভ্ কাটিয়া কহিল—আমায় ক্ষমা কর, মিরিয়ম, আমি এখনি যাইতেছি।

বেহারা টুপি ও ছড়ি লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সত্যেন্দ্র জিজ্ঞাসিল, গাড়ী?

খাড়া—হুজুর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রিয়া-নিকেতনে পৌঁছিতে, সারাদিনের উৎকণ্ঠা অবসাদ, চিত্ত-গ্লানি বিদূরিত হইয়া গেল। মিরিয়ম অশ্রু-ছলছল চোখে বলিল—আমি কি তোমার উপযুক্ত হইতে পারিব?

সত্যেন্দ্র মিরিয়মের কৃশ দেহটিকে বক্ষে বাঁধিয়া সহর্ষ কণ্ঠে কহিল, ও-কথা বোলো না মিরিয়ম, ও-কথা বোলো না। তুমি আমার উপযুক্ত হইতে পারিবে না? তবে আমার কি ভয় হইতেছে, জান ডিয়ার? আমাকে লইয়া তুমি সুখী হইতে পারিবে ত? বল,—বল, আমাকে লইয়া তুমি সুখী হইতে পারিবে?

এ প্রশ্নের উত্তর মিরিয়ম আর মুখে দিতে পারিল না। দুটি চক্ষু দিয়া কোমল মুখের রেখার ভিতর দিয়া, দুটি সস্নেহ বাহু-পাশ দিয়া এ কথার এবং অনেক কথার উত্তর দিয়া দিল।

প্রায় অর্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইলে, মিরিয়ম বলিল—আমি শুনিয়াছিলাম, বাঙ্গালী যুবকদের খুব অল্প বয়সেই বিবাহ হয়। আমার কাছে দু'একখানি ছবি আছে,—বিলাতী ম্যাগাজিনে বাহির হইয়াছিল—বাঙ্গালা দেশের বর কনে। তাহাতে বরের মুখে গোঁফের রেখাটিও দেখা দেয় নাই ;—আর কনে ত স্কুল গার্ল বলিলেই হয়।

হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঐরূপ আগে হইত বটে, এখন-ও দু'একটা হয়। কিন্তু আগের তুলনায় সে কিছুই নয়। এখন পরিণত বয়সের আগে কেহ বিবাহ করে না।

মিরিয়ম কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিল—তোমার আত্মীয় স্বজন আছেন,—তুমি তাঁহাদের অনুমতি পাইবে?

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিল—বিবাহে অনুমতি? তুমি কি বলিতেছ, প্রাণাধিকে! অনুমতি পাইব না! আর কাহারই বা অনুমতি আবশ্যক? এক বৃদ্ধা মা আছেন,—তিনি আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না।

তবুও মিরিয়মের মুখখানির মলিনতা ঘুচিল না। সে ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে বলিল—কিন্তু তিনি কি...কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না। সত্যেন্দ্র কিন্তু তাহার মনের ভাবটি বুঝিল। বুঝিয়াও জিজ্ঞাসিল—কিন্তু কি বলিতেছিলে?

তিনি কি তোমার প্রতি রুষ্ট হইবেন না?

রুষ্ট হইবেন কেন? ইংরেজে-বাঙ্গালীতে বিবাহ এই প্রথম নয়,—পূর্বে অনেক হইয়া গেছে। আমারই ছোট-মামা বিলাতে মেম্ বিবাহ করিয়াছিলেন। আমার সে মামী এখনও জীবিত রহিয়াছেন।

তিনি কোথায়? এখানেই আছেন?

না, তাঁহারা থাকেন, লাহোরে। আমার মামা সেখানকার ইঞ্জিনীয়ার।

কিন্তু তিনি বোধ করি বাড়ী আসিতে পারেন না?

সত্যেন্দ্র শিস্ দিয়া উঠিল ; বলিল—পূঃ—কেন পারিবেন না? এই ত সেবারও আমাদের

বাড়ীতে সস্ত্রীক, সকন্যা তিনমাস থাকিয়া গেলেন।

মিরিয়ম নীরব। যুবতীটি অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে সুদূর ভবিষ্যতের অদৃষ্ট-জগতে উঁকি দিতেছিল,—কথা কহিল না।

সত্যেন্দ্র দুই মিনিট কাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গাঢ়স্বরে বলিল—মিরিয়ম, মিরিয়ম, কেন তুমি এত ভাবিয়া আকুল হইতেছ? আমি তোমাকে ভালোবাসি,—তোমাকে সুখী করিতে কি আমি ত্রুটি করিব প্রিয়ে?

মিরিয়ম তথাপি নীরব, নতমুখ।

সত্যেন্দ্র বলিল—তুমি বুঝি আমাকে ভালোবাস না মিরিয়ম?...নিশ্চয়ই বাস না। বাসিলে কখনই তুমি এত সন্দেহ করিতে না। এই দেখ না, আমি তোমাকে ভালোবাসি, সেই আমার যথেষ্ট। কে অসন্তুষ্ট হইবে, কে মন্দ বলিবে—কৈ এ সব কথা ত একবারটিও আমার মনে আসিতেছে না! কেন আসিতেছে না, জান? তোমার প্রেমেই আমি সন্তুষ্ট। তুমি যদি আমার মত...

মিরিয়ম সহসা মুখ তুলিয়া, দুইটি পেলব শ্বেত বাহু-বল্লরীর দ্বারা সত্যেন্দ্রকে বক্ষ সন্নিকটে টানিয়া, গদগদ কণ্ঠে কহিল, বোলো না, বোলো না, প্রিয়তম, আর বোলো না!...সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সত্যেন্দ্র জানিত না যে, এইদিনই অঙ্গুরীয়ক পরাইয়া দিতে হয়। মিরিয়ম সে কথা বলিয়া দিল। তখনি উভয়ে হাওয়া-গাড়ী চড়িয়া লালদীঘির সামনে এক বাঙ্গালী জুয়েলার্স-এর দোকান হইতে বহুমূল্য হীরকখচিত অঙ্গুরীয় ক্রয় করিয়া, ইডেন-গার্ডেন্সের কৃত্রিম হ্রদের তীরে একটা নির্জন স্থান দেখিয়া বেঞ্চে বসিল। শত চুম্বনে গণ্ড দু'টি ভরাইয়া দিল। মিরিয়মের শ্বেত গণ্ডে এক-একটি চুম্বন দেয়, আর সত্যেন্দ্র ভাবে এত সুখ জীবনে আর কোন দিনই সে অনুভব করে নাই! শুধু দুই অধর-পুটে এত সুখ, এত সুধা যে উথলিয়া উঠিতে পারে,—সত্যেন্দ্র কবির কাব্যে, ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে পাঠ করিয়াছে বটে,—কিন্তু এই সে প্রত্যক্ষ করিল। এই সে প্রথম বুঝিল,—কবির কল্পনা অলীক, অসত্য নহে ; ঔপন্যাসিকের লেখার মধ্যে সত্যতা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান আছে।

রাত্রে এক সঙ্গে খাইতে হয়,—উভয়ে গ্রেট ইস্টার্নে ঢুকিল। সত্যেন্দ্র গোটা-দুই পেগ্ খাইয়া, একটুখানি খাওয়াইবার অনেক চেষ্টা করিল ; কিন্তু মিরিয়ম সাহস করিল না। সে খানিকটা ভার্মুথ পান করিল।

কথাবার্তা বাঙ্গালাতেই হইতেছিল। মিরিয়ম ছেলেবেলায় মিশনারী স্কুলে বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিল। সত্যেন্দ্র বলিয়াছে, বিবাহের পর তাহাকে স্বয়ং উত্তমরূপে বাঙ্গালা শিক্ষা দিবে।

সেইখানে বসিয়া কথা কহিতে-কহিতে স্থির হইল যে, আগামী কল্যই মিরিয়ম ক্লাবের বাস উঠাইয়া, কাশীপুরস্থিত সত্যেন্দ্রের উদ্যান-বাটিকায় চলিয়া আসিবে। এবং যতদিন না বিবাহ হয়, সেই স্থানে বাস করিবে। উদ্যান বাটিকাটি ভাগীরথীর কূলেই অবস্থিত,—নির্জন এবং অতি মনোরম! সকাল-সন্ধ্যায় নদীর হাওয়া, পাখীর কল-গুঞ্জন। এত ট্রামের ঘটা-ঘং শব্দ নাই,—মোটরের ভোঁক্-ভোঁক্ নাই, মোটর-লরীর ধোঁয়া নাই ;—শুনিতে-শুনিতে মিরিয়ম প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিল—চিরদিন কি সেখানেই বাস করা যায় না প্রিয়তম?

কেন যাইবে না মিরিয়ম! সে ত আজ হইতে তোমারই হইল। যতদিন আমরা বাঙ্গালা দেশে থাকিব, ততদিন সেখানেই থাকা যাইবে। তার পর তোমায় লইয়া ইয়োরোপ ঘুরিতে বাহির হইব।

মিরিয়মের চক্ষু দু'টি মুদিয়া আসিল। এ যে তাহার কল্পনারও অতীত ছিল।

সে রাত্রে যখন উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় লইল, তখন মিরিয়মের বাসা-বাটির পার্শ্বের গির্জার ঘড়িতে ঘং ঘং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। গৃহে ফিরিতে সত্যেন্দ্রের ইচ্ছা

হইতেছিল না ; কিন্তু তখনও আড়াই ঘণ্টা রাত্রি রহিয়াছে,—পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়ানোও অসম্ভব। সত্যেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া দ্বিতলে শয়ন-কক্ষে জামা কাপড় ছাড়িতে লাগিল।

সুবাস মেহগ্নি-খাটে দুগ্ধ শুভ্র শয্যায় গাঢ় নিদ্রামগ্ন। সত্যেন্দ্র বার-দুই স্তিমিত-বীর্য জীবটির পানে চাহিয়া, বৈঠকখানায় নামিয়া গিয়া, কৌচে শুইয়া পড়িয়া, মিরিয়মের কথাই ভাবিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সত্যেন্দ্র একটু মুস্কিলে পড়িয়া গেল।

এলাহাবাদ হইতে তাহার জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা শ্রীমতী আভাস লিখিয়াছেন, এই ১৭ই শ্রাবণ হিরণের বিবাহ। সুবাসকে আনিতে হিরণ স্বয়ং যাইতেছে। সুবাস যেন অতি অবশ্য আসে। হিরণ কালই সকালে পৌঁছিবে, এবং সন্ধ্যার ডাক-গাড়িতে তাকে লইয়া পুনঃ যাত্রা করিবে।

সুবাস ত যাইবার আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। তবে সেই সঙ্গে একটা মুস্কিলও বাধাইয়া ফেলিয়াছে। আজ আর কাল দু'টি দিন সত্যেন্দ্রকে আফিস কামাই না করাইয়া ছাড়িবে না। সত্যেন্দ্র প্রথমটা সম্মত হয় নাই ; কিন্তু শেষে সুবাস যখন কাঁদ-কাঁদ স্বরে অনুযোগ করিল যে, আবার কত দিন দেখা হ'বে না, কিছু না—তখন রাজী না হইয়া পারিল না। সারাটা দিন সে অতি কষ্টেই 'এক সঙ্গে' কাটাইল। সময় কি কাটিতে চাহে? সত্যেন্দ্রের মনটি তখন কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে,—মাত্র দেহটা লইয়া কি সময় কাটান যায়! কিন্তু সুবাস ইহাতেই সন্তুষ্ট হইল। বেচারা সারা দিনমান ও রাত্রি অনর্গল গল্প করিয়া গেল। মাঝে-মাঝে এক আধটা হুঁ হাঁ শুনিয়াই তৃপ্তি পাইল। সত্যেন্দ্র ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িতে, তাহারই একখানা বাহুর উপর মাথাটি রাখিয়া সুবাস নিশি জাগিল।

হিরণ আসিয়া পৌঁছিতেই, সুবাস সত্যেন্দ্রকে বলিল—সেই যে আমাদের ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ দেখবার কথা আছে, ভালোই হয়েছে। হিরণ এসেছে, ও-ও দেখেনি বল্‌ছে।

সত্যেন্দ্র বলিল—ভালোই ত! আমি গাড়ী রেখে যাচ্ছি, তোমরা দু'জনে দেখে এস।

সুবাস মুখখানা গোমড়া করিয়া বলিল—যেতে চাই নে, যাও! ওঃ, কি আমার আফিসের টান গো...একটী দিন বই নয়,—তা'ও আবার কতদিন দেখা হবে না, কিছু না...

অগত্যা সত্যেন্দ্রকে রাজী হইতে হইল। ঠিক দশটার সময় আহারাদি শেষ করিয়া তিনজনে গড়ের মাঠের উদ্দেশে যাত্রা করিল। স্মৃতি-সৌধের অমল-ধবল মূর্ত্তি নয়নগোচর হইবামাত্র সুবাস উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া উঠিল, বাহ্ বাহ্! ভাগ্যে তোমার বিয়ের ঠিক হয়েছিল, হিরণ, নইলে ত দেখতে পেতে না।

হিরণ লজ্জারুণ মুখে হাসিতে লাগিল। ছবি দেখিতে, প্রত্যেক ছবিটির ইতিহাস শুনিতে-শুনিতে তিন ঘণ্টা সময় লাগিয়া গেল ;—দেড়টার সময় তাহারা আবার মোটরে উঠিল। মধ্য পথে একটা বিলাতী হোটেলে লাঞ্চ খাইয়া, তাহারা যখন গৃহে ফিরিল, তখন পৌনে তিনটা।

সত্যেন্দ্র বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া আফিস যাইতে প্রস্তুত হইয়া, সুবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল—আফিসের কাজ-কর্ম সেরে স্টেশনেই দেখা করব'খন।

সুবাস ছড়ি-শুদ্ধ হাতটি ধরিয়া বলিল—কেন, বাড়ী আস্‌তে পারবে না?

সত্যেন্দ্র কহিল—জানি কি! দু'দিন ত আফিস ছাড়া। কাজ-কর্ম যদি বেশী জমে গিয়ে থাকে, সময় না-ও পেতে পারি—তাই বল্‌ছি।

সুবাস হাত ছাড়িয়া দিয়া, নত হইয়া প্রণাম করিল। সত্যেন্দ্র বলিল—এখনি কেন? আবার ত দেখা হ'বে স্টেশনে।

আর একবার করব'খন। একটা বেশী পেরনাম করলে ত আর জাত যাবে না—বলিয়া সে মৃদু হাসিল।

আচ্ছা—আসি—বলিয়া সত্যেন্দ্র বিদায় লইতেছে,—সুবাস বলিল—দেখ, যদি পার ত বাড়ীতেই সোজা চলে এস।

আচ্ছা।

সত্যেন্দ্র কথাটা সত্য বলিয়াছিল—রাশীকৃত কাজ জমিয়া গিয়াছে। বিলাতী মেল্-ডে—সে চিঠিগুলির উত্তর না দিলেই নয়। বিলাতের ব্যাঙ্কে কিছু টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। আফিসে ঢুকিতেই বড়বাবু মস্ত এক লিস্ট দাখিল করিয়া বসিলেন। শুনিয়া সত্যেন্দ্র সাহেবের মাথা ঘুরিয়া গেল।·এই সব সারিয়া, স্টেশনে উহাদের বিদায় দিয়া, কাশীপুর পৌঁছিতে কত রাত্রি যে হইবে, কে জানে!

না-জানি, মিরিয়ম কত ভাবিতেছে! দুই-দুই দিনের অদর্শনে না জানি সে কত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কখন্ গিয়া সেই মলিন অধরে চুম্বন দিয়া, আবার সে মুখখানি আরক্ত করিয়া দিবে,—কখন বক্ষে ধরিয়া অস্থির বক্ষ শান্ত করিবে,—ভাবিতে-ভাবিতে সত্যেন্দ্র চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িল।

বড়বাবু খাতা-পত্র হাতে ঘরে ঢুকিয়া বলিতে লাগিলেন—এই সময়ে আবার টাইপিস্ট ছুঁড়ীটা কামাই করিল! কি করিয়া যে কাজ চালাইতেছি, কি হাঙ্গামাই যে যাইতেছে, তাহা আর কাহাকে বলিব!—

বড়বাবুর উপর একটু রাগ হইল, আবার হাসিও পাইল। রাগ হইল, 'ছুঁড়ী' শুনিয়া, আর হাসি পাইল এই ভাবিয়া যে আর সে টাইপিস্ট নহে, এখন—এখন সে...

আচ্ছা, কাশীপুরের বাগান-বাড়ীটায় যদি টেলিফোঁ সংযুক্ত থাকিত! নাঃ, সারাইতে কন্ট্রাক্টার লাগান হইয়াছে,—সারান শেষ হইলেই টেলিফোঁ লইতে হইবে। নহিলে আফিসের কয় ঘণ্টা সময় কাটানো দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে যে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেই সেদিন রাত্রি ১টার সময় সেই যে চলিয়া গেছে, কাল সারা দিন-রাত্রি, আজ—এই তিনটা রাজে—ইহার মধ্যে একবারও কি সত্যেন্দ্র সময় পাইল না যে, একটিবার শুধু দেখা দিয়া যায়! কাল কন্ট্রাক্টার শৈলেন্দ্র বাবুর দ্বারা টেলিফোঁ করাইয়া জানিয়াছিল, সত্যেন্দ্র আফিসেও আসে নাই।

মিরিয়মের ভাবনার অন্ত ছিল না। অসুখ হইল না ত? সেদিন অত রাত্রি পর্যন্ত মোটর লাঞ্চে চড়িয়া নদীর হাওয়া লাগাইয়াছে, সর্দি-টর্দি হয় নাই ত!...একটা চাকরও বাড়ী জানে না, যাহাকে পাঠাইয়া সংবাদ লওয়া যায়। এক নিজে আফিসে গিয়া সংবাদ লওয়া—কিন্তু সত্যেন্দ্র যে তাহাকে আফিসে যাইতে বার-বার নিষেধ করিয়া দিয়াছে। তবে উপায়?

বাগান-বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া-বসিয়া মিরিয়ম আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। কেন অমন হইল? মিরিয়ম যে ক্লাবটিতে এত কাল বাস করিত, সেখানে তাহার অনেকগুলি বন্ধু-বান্ধব জুটিয়াছিল। তন্মধ্যে আবার দু'একটি অন্তরঙ্গ হইয়া গিয়াছে। তাহাদেরই একজন মিরিয়মের দুঃসাহসিকতার নিন্দা করিয়া বলিয়াছিল, এই নেটিভগুলাকে আমার বিশ্বাস হয় না মিরিয়ম। তুই মিঃ মিত্রের সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেছিস্ বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, নেটিভ জাতটাই নীচ। তাহারা কথায়-কথায় হাতে চাঁদ ধরিয়া দেয়,—কাজের বেলায় লুকাইয়া পড়ে!—মিরিয়ম ক্লাব ত্যাগ করিবার সময়, অন্তরঙ্গ লুসীর সহিত দেখাটি পর্যন্ত করে নাই। যাহাদের দেশে জন্মিয়া, যাহাদের দেশের মাটীর অন্নকণায় শরীর ধারণ করিয়া, যাহাদের অন্নে বাঁচিয়া আছে—তাহাদের নেটিভ বলিয়া ঘৃণা করিতে বা তাহাদের সম্বন্ধে নীচ ধারণা পোষণ করিতে বাস্তবিক চিরদিনই মিরিয়মের কষ্ট বোধ হইত। আজ না হয় সত্যেন্দ্রের সঙ্গে তাহার হৃদ্যতা জন্মিয়াছে,—আজ না হয় সত্যেন্দ্রকে সে নিতান্তই আপনার
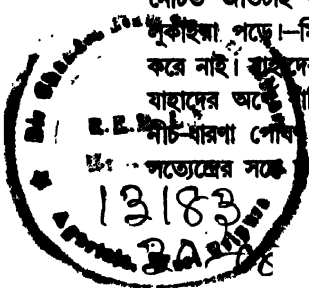
বলিয়া জানিয়াছে ; কিন্তু যখন কিছুই জানে নাই, শুনে নাই, তখনও এই শ্যামবর্ণ জাতির প্রতি তাহার শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। এমন সরলতা-মণ্ডিত মুখ যাহাদের, এত মিষ্ট যাহাদের কণ্ঠ-স্বর, অনাড়ম্বর বেশভূষায় যাহাদের শান্ত-শ্রী ফুটিয়া থাকে,—তাহাদের সম্বন্ধে নারী-হৃদয় প্রস্তুত ছিল না, অন্তরঙ্গ লুসীর খাতিরেও না।

তাই আজ তাহার মন তুফানে তরণীখানির মতই টল-মল করিতেছিল। সত্যেন্দ্রের না আসিবার কারণটি কত রকমেই খুঁজিয়া বাহির করিতে গেল ; কোনটাই মনের মত হইল না,—কোনটাতেই অশান্ত চিত্ত শান্ত হইল না।

কন্ট্রাক্টার শৈলেন্দ্রবাবু মস্ত একটা সোলার হ্যাট পরিয়া মজুর খাটাইতেছিলেন ;—মিরিয়ম বেহারা দ্বারা তাঁহাকে সেলাম জানাইল।

শৈলেন্দ্র বাবু ঘরে ঢুকিয়া, টুপিটি খুলিয়া কহিলেন—আজ সকালে মিঃ মিত্রের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত তিনি দশটার সময়ই তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া...

মিরিয়ম বাম হস্তে টেবিলের কোণ চাপিয়া ধরিল।

...ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল দেখিতে গিয়াছেন,—দেখা হইল না।

মিরিয়ম পাংশুমুখে জিজ্ঞাসিল—কাকে লইয়া?...আপনি কাহার কথা বলিতেছেন মিঃ কার?

মিঃ মিত্রের কথাই বলিতেছি। কিছু টাকার আমার বিশেষ দরকার পড়িয়াছিল...

মিরিয়ম পার্শ্বস্থিত চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িল। অস্ফুট-কণ্ঠে বলিতে লাগিল—মিঃ মিত্র, মিঃ মিত্র. ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল—

শৈলেন্দ্র বাবু বলিলেন—হাঁ। সেইখানেই গিয়াছেন, শুনিলাম।

মিরিয়ম হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল—মিঃ—মিঃ কার, আপনি নিশ্চয় জানেন, শুনিতে আপনার ভুল হয় নাই?

না,—না, ভুল হইবে কেন? আমি ঠিকই শুনিয়াছি, তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল দেখিতে গিয়েছেন...

আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না, মিঃ কার, আমি—আমি জানিতে চাই যে—যে—তিনি ঐ মিঃ মিত্র একেলা...

না, তাঁহার স্ত্রী ও শ্যালক দু'জনকে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বেহারা আমাকে বলিল—বাবু দুইটার সময় ফিরবেন, বলিয়া গিয়াছেন।

মিরিয়ম নিঃশব্দে ফিরিয়া চেয়ারটায় বসিল। আর একটি কথাও সে বলিতে পারিল না। হৃদয়-মধ্যে যে বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে, অপর একজন লোকের সামনে তাহা গোপন করিবার জন্য সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল ; কিন্তু গোপন ত থাকে না। বুক যে ফুলিঁয়া-ফুলিয়া উঠিতেছে, নিঃশ্বাসের শব্দ যে ক্রমশই গভীর হইতেছে,—চক্ষের জল ত আর বাধা মানে না ;—মিরিয়ম দক্ষিণ হস্তটি তুলিয়া করুণ কণ্ঠে কহিল—গুড আফ্‌টার্নুন...

শৈলেন্দ্র বাবু 'গুড আফ্‌টার্নুন' করিলেন বটে, কিন্তু প্রথা-মত তখনি কক্ষ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। মিরিয়মের অশ্রু-সজল মুখের কতকাংশ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল ;—তিনি অতি ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন—একটা কথা কি বলিতে পারি মহাশয়া?

না,—না, কোন কথা না—আপনি যান...গুড আফ্‌টার্নুন...

শৈলেন্দ্র বাবু আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, ধীরে-ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিয়া কর্ম্মস্থলে ফিরিলেন।

মিরিয়ম অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। এই বাঙ্গালী! সে'ও এত শঠ, এত প্রবঞ্চক! তাহার কাছেও নারী খেলার সামগ্রী? কেবলমাত্র ভোগের বস্তু? মিরিয়ম যে কত গ্রন্থে এই ধর্ম্মপরায়ণ জাতির সপক্ষে কত কথাই পাঠ করিয়াছে ;—সে সকল মিথ্যা?

ইহাদের জন্য ত্যাগের আদালতের প্রয়োজন হয় না,—ইহাদের পারিবারিক জীবনের কুৎসা খবরের কাগজে ছাপা হইয়া পৃথিবীময় হৈ-চৈ পড়ে না। মিরিয়ম যে শুনিয়াছিল, ইহাদের দাম্পত্য-জীবনে বিচ্ছেদ নাই, ত্যাগ নাই, বিরহ নাই—মিলন, মিলন—শুধুই মিলন! সে সব মিথ্যা! আর অমন মিথ্যা!

বাহির হইতে মিথ্যা-পরিপূর্ণ ইহাদের সমাজকে সে কি সত্য, কি সুন্দরই না দেখিত! মুখে অসামান্য সরলতার মুখোস পরিয়া কি বীভৎসতাই না গোপন করিয়া রাখিয়াছে—উঃ!

মিরিয়ম হঠাৎ এক সময় দাঁড়াইয়া উঠিল। তখনি আবার নতজানু হইয়া বসিয়া অশ্রুসিক্ত মুখে জগদীশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া, সেই বারান্দাটিতে ফিরিয়া আসিল। শৈলেন্দ্র বাবু তখনও মজুরদের সঙ্গে ঘুরিতেছিলেন। মিরিয়ম তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল—প্লিজ মিঃ কার, আপনি এখানে কতক্ষণ থাকিবেন?

ঘড়ি দেখিয়া শৈলেন্দ্রবাবু বলিলেন—পাঁচটা পর্যন্ত ত বটেই,—একটু দেরীও হইতে পারে।

তবে আপনার কারখানি আমাকে একবার দিবেন?

নিশ্চয়ই!

ধন্যবাদ! আমি পাঁচটার ভিতরেই আসিতেছি।

না আসিতে পারিলেও ক্ষতি নাই ; আমার ছোট ভাইও—তিনি আমার সহকারী—আসিয়া পড়িয়াছেন,—আমি তাঁহার কারেই ফিরিতে পারিব।

মিরিয়ম তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া, তাঁহার গাড়ীতে বসিয়া সোফেয়ারকে বলিল—মিঃ মিত্রের বাড়ী!

* * * *

বেহারা দীর্ঘ কুর্নিশ করিয়া কহিল—তাহার প্রভু গৃহে নাই, আসিতে রাত্রি হইবে।

সুবাস কি-একটা কাজে রামলক্ষ্মণকে ডাকিতে আসিয়াছিল ;—মিরিয়মকে দেখিয়া বলিল,—সেলাই কলের মেম্ বুঝি রে! বলে দে' বাবুর সঙ্গে আফিসে দেখা করতে!—মিরিয়ম শান্ত দৃষ্টিতে সুবাসকে দেখিতে-দেখিতে বলিল—বেহারা, ইনি কে আছেন?

বেহারা একগাল হাসিয়া বলিল—মায়িজী!

সুবাস ইংরেজ মেয়েটিকে বাঙ্গলায় কথা বলিতে শুনিয়া কাছে আসিয়া বলিল—তুমি কে গা?

তোমার স্বামীর আফিসের টাইপিস্ট!...তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

এস,—সুবাস তাহার হাত ধরিয়া নিজ কক্ষে লইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সত্যেন্দ্র কাজ-কর্ম সারিয়া উঠি-উঠি করিতেছে,—চশমা-চোখে বড়বাবু কামরায় ঢুকিয়া বলিলেন—কি-রকম ওভার-টাইম দেব, বলুন! সবাই গজ-গজ করছে,—বলে, লোক রয়েছে,—উইদাউট্ নোটিশে (বিনা খবরে) কামাই করবে,—আর আমরা শালারা খেটে-খেটে মরব!

সত্যেন্দ্র বলিল—দিয়ে দিন না, যা হয়!...সে সিগারেট ধরাইল।

বড় বাবু বলিলেন—তা না হয় দিয়ে দিচ্ছি—কিন্তু উইদাউট্ নোটিশে যে এতদিন কামাই করেছে, তাকে রাখবার আর দরকার দেখি নে!

সত্যেন্দ্র চুরুটিকাটি দাঁতে চাপিয়া মনে-মনে ভাবিল, বলিয়া ফেলিল যে আফিসে তাহাকে রাখিবার আর কোন দরকারই নাই। না থাক্—আরও কিছু দিন থাক্—অন্তত সুবাস চলিয়া যাক্—তার পর!

বড় বাবু সত্যেন্দ্রকে নীরব দেখিয়া রোষযুক্ত স্বরে কহিলেন—ও রকম ফচ্‌কে ছুঁড়ী-ফুঁড়ি

দিয়ে কাজ চলে না। একদিন নয়—দু'দিন নয়, একেবারে দশ-পনেরো দিন কামাই,—না খবর, না কিছু! আমি কালই তার জায়গায় লোক নিতে চাই ;—এমন করে আর কাজ চলে না। কি বলেন? কালই একটা লোকের চেষ্টা করি...

অক্লেশে করতে পারেন!...

বড় বাবু ফিরিতেই সত্যেন্দ্র দেখিল, মিরিয়ম! সত্যেন্দ্র প্রফুল্লিত হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু বেরসিক বৃদ্ধের সাক্ষাতে তাহা প্রকাশ করিল না, মৃদু হাসিল মাত্র।

বড় বাবু মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে বলিলেন—তোমার এই পনেরো দিন কামাই,—আমি বাপু কাজ চালাই কি করে? তাই কি একটা খবর দিয়েছিলে? এমনধারা কর্‌লে কাজ কি ক'রে চলে বল। লোক একটা ত দেখতেই হ'বে...

আমি একটি লোক দিতে পারি।

আবার তোমার লোক?

সত্যেন্দ্র বাঙ্গালায় বলিল—উহার সাবস্টিট্যুট্ উহার লোককেই করা উচিত।

মিরিয়ম নতমুখে গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—এক মিনিট অপেক্ষা করুন, তাহাকে আনিয়া দিতেছি। মিঃ মিত্র, আপনি তাহাকে নিশ্চয়ই নির্বাচন করিবেন।

হাঁ—হাঁ—নিশ্চয়ই...

বড় বাবু বলিতেছিলেন—দাঁড়াও, লোক আসুক, দেখি, টেস্ট করি...কিন্তু কথা শেষ হইবার পূর্বেই মিরিয়ম বাহির হইয়া গেল এবং নিমেষমধ্যে এক অবগুণ্ঠিতা নারী সহ ফিরিয়া আসিয়া বলিল- মিঃ বড় বাবু, আপনি এক মুহূর্তের জন্য বাহিরে আসিবেন কি?

সত্যেন্দ্রের মাথা ঝিম্-ঝিম্ করিতেছিল,—লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—কে!!

দেখ—মিঃ মিত্র! চিনিতে পার কি?...সে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

হতভাগ্য শৈলেন্দ্র বাবু আর সত্যেনের নিকট কোন কাজ আদায় করিতে পারেন নাই। মেসার্স মার্টিন কোং এখন সত্যেন্দ্রের কন্ট্রাক্টার্স!

ভাদ্র ১৩২৯

কাঠের বাক্স

চৈতন্যচরণ বড়াল

১

একদিন সকালে ক্ষুদ্র রাধামাধবপুর গ্রামের সকলে শুনিল যে, কালীচরণ ও নারায়ণ দুই ভ্রাতার বিবাদ বাধিয়াছে—তাহারা পৃথক হইবে। বলা বাহুল্য, জনকয়েক লোক আন্দোলনের উপযুক্ত একটা জিনিষ পাইয়াছে বুঝিয়া, একটু আনন্দের ভাব দেখাইলেও, বেশীর ভাগ লোক খুব বিস্ময় প্রকাশ করিল। জীবনের অর্ধেকটা একান্নভুক্ত থাকিয়া কাটাইবার পর, হঠাৎ কালীচরণ তাহার ছোট ভাইকে পৃথক করিয়া দিবে, এটা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে, তাহা তাহারা কিছুতেই ঠিক করিতে না পারিয়া, একে-একে কালীচরণের বাটীতে আসিয়া জড় হইতে লাগিল। সেখানে আসিয়া তাহারা দেখিল, কনিষ্ঠ নারায়ণচন্দ্র গৃহের তৈজসপত্র, এমন কি বালিশ-বিছানা পর্যন্ত, সব প্রাঙ্গণে জড় করিয়াছে—গ্রামের বয়োবৃদ্ধ দুইজনকে সম্মুখে রাখিয়া সব ভাগ করিয়া দিতে বলিতেছে।

বিবাদের কারণ যৎসামান্য। কালীচরণ ও নারায়ণচন্দ্রের মাতার একটি কাঠের বাক্স ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর—সে প্রায় দশ বৎসর পূর্বের কথা—বড়বধূ অর্থাৎ কালীচরণের স্ত্রীই সেই বাক্সটি ব্যবহার করিতেছিল। সে দিন নারায়ণের কন্যা সহসা আব্দার ধরিল যে, ঐ বাক্সটি সে লইবে! বড়বৌ প্রথমটা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তার পর যখন ছোটবৌ আসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল যে, ছেলেমানুষ যখন আব্দার ধরিয়াছে, তখন তাহাকে উহা দিতে দোষ কি,—তখন বড়বৌ একবার স্থিরদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া সব বুঝিয়া লইল। তবু সে আর একবার বালিকাকে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিল ; বলিল, "দুর্গা, তোর বিয়ের সময় এটা তোকে দোব—শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাস্।"

দুর্গা কোন কথা কহিবার পূর্বেই তাঁহার মাতা বলিল, "সামান্য একটা কাঠের বাক্স—তাও দিদি প্রাণ ধরে দিতে পার্লে না!" অনুযোগটা বড়বধূর প্রাণে লাগিল। নিঃসন্তান তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে যে দুর্গাকে নিজেদের মেয়ের মত আদর-যত্নে মানুষ করিয়াছে, সেই দুর্গার মাতা কি না আজ এই অন্যায় খোঁটা দিল! একটু বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল, "আমার নিজের জিনিষ হলে—যত দামীই হোক, দুর্গাকে দিতে—তোদের দিতে—কোন কষ্ট হোত না। কিন্তু এ তো আমার নয়,—এ যে সংসারের। শাশুড়ীর কাল হবার আগে থেকে তাঁর এ জিনিষ সংসারে ব্যবহারে লাগছে। এমন পবিত্র জিনিষ কি ছেলেদের খেলা কর্বার জন্য দেওয়া যায়!"

একটু শ্লেষ দিয়া ছোটবৌ বলিল, "বেশ তো, সংসারের জিনিষ যদি হয়, তাহ'লে ওতে আমারও দখল থাকা উচিত।"

"বেশ, তাহ'লে ভাগ করে নাও—আমি কোন কথা কহিব না।" বড়বৌ আর দাঁড়াইল না। সে বুঝিয়াছিল যে, এ সংসার আর টিকিতে পারে না।

বলা বাহুল্য, ক্ষণকাল পরে নারায়ণ পত্নীর নিকট হইতে বিবাদের বৃত্তান্ত শুনিল ; এবং কর্তব্য স্থির করিয়া, তৎক্ষণাৎ বহির্বাটীতে দাদার নিকট উপস্থিত হইল ; এবং স্পষ্ট ভাষায় জানাইল যে, যখন সংসারে মনোমালিন্য ঘটিযাছে, তখন আলাদা হওয়াই ভাল—নতুবা তাহাকে সপরিবারে বাটী ছাড়িতে হইবে।

কালীচরণের বিস্ময়ের ভাব কাটিবার পূর্বেই, নারায়ণ দুইজন প্রতিবাসীকে ডাকিয়া মধ্যস্থ হইতে বলিল ; এবং বিষম উৎসাহের সহিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ফর্দ প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গেল। কালীচরণ একবার জোরে গলাটা সাফ করিয়া বলিল, "হাঁ রে নারাণ! এই শেষ বয়সে আমার বদনাম রটালি। এতকালের সব কথা ভুলে গেলি!"

নারায়ণও যেন তৈয়ারী হইয়া আসিয়াছিল ; বলিল, "এর পর কি তোমার সঙ্গে হাতাহাতি হবে? এই বেশ সদ্ভাবের সঙ্গে ভাগ হয়ে যাওয়া ভাল নয় কি?"

কালীচরণ আর কিছু বলিল না। শুধু দাঁড়াইয়া দেখিল যে, সংসারের সমস্ত তৈজসপত্র পর্যন্ত দুইভাগে বিভক্ত করা হইল ;—ভাগ মিলাইবার জন্য সতরঞ্চ, কার্পেট পর্যন্ত কাটিয়া ভাগ করা হইল ;—ওজন করিয়া পিত্তল-কাঁসার জিনিষ ভাগ হইল ;—ফলে, একধারে গেলাস, একধারে তাহার সরপোষ গেল ; একধারে থালা, একধারে খাবার ঢাকা গেল।

শেষে কাঠের বাক্সটি ভাগ করিবার জন্য বাহির করা হইল। বড়বৌ সেটিকে লইবার ইচ্ছা জানাইলে, নারায়ণ তাহার বদলে দশগুণ দামের একটি দেরাজ লইয়া তুষ্ট হইল।

২

দারুণ বৈশাখী সূর্য সমস্ত দিন অগ্নিবৃষ্টি করিয়া, অপরাহ্নকালে যেন অবসন্ন দেহে গগনমধ্য হইতে ঢলিয়া পড়িতেছিল। এ-হেন প্রখর রৌদ্র-তেজে দগ্ধপ্রায় হইয়া, কালীচরণ অবসন্ন-পদে, ক্লান্তদেহে গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া পত্নীকে ডাকিল। পত্নী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া, স্বামীর মুখপানে চাহিয়াই সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল। এমন শুষ্ক, বিষণ্ণ বদন, এমন হতাশা-মাখান, উদাস দৃষ্টি সে যে আর কখনো দেখে নাই!

সে শুধু বলিল, "জমীদার-বাড়ী থেকে ফির্‌তে এত দেরী হোল যে? সমস্ত দিন আমি বসে আছি!"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া কালীচরণ বলিল, "আজ সব কষ্টের শেষ করে এলাম। চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে এলাম।"

পত্নীর গলা শুকাইয়া গেল ; বলিল, "সে কি! চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এলে? এত দিনের চাক্‌রী!"

"আর চাক্‌রী করে কি হবে বড় বৌ? সারা জীবনটা তো খেটেছি—আর কার জন্য খাট্‌বো? দু'মুঠো খেতে আর পাব না? নাই যদি পাই, তাতে কি ক্ষতি হবে?"

স্বামী আজ কত দুঃখে কথা কয়টি উচ্চারণ করিল, তাহা সে বেশ বুঝিতেছিল। তখন সে স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "তা বেশ করেছ। এখন এস, চান করে খাওয়া-দাওয়া কর্বে।"

প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিতেই কালীচরণ চমকিত হইল। এ কি! একপাল রাজমজুর মহাধুমধামে উঠানের মাঝে জড় হইয়া মশলা মাখিতেছে—ইঁট জড় করিতেছে—মাটি খুঁড়িতেছে। সে পত্নীর পানে চাহিল, "বড় বৌ!"

পত্নী নতনেত্রে শুধু বলিল, "ঘরে চল—সব বল্‌ছি। ঠাকুরপো উঠানে পাঁচিল দিচ্চে—সরিকানের উঠানে ছোট বোয়ের কাজ করবার অসুবিধা হয়।"

কালীচরণ সেই পশ্চিমের রৌদ্র সর্বাঙ্গে মাখিয়া প্রাঙ্গণ মধ্যে বসিয়া পড়িল। তাহার কণ্ঠ হইতে শুধু নির্গত হইল,—"বাপ-ঠাকুরদাদার উঠানে পাঁচিল না দিয়ে নারাণ ছাড়্‌লে না!"

বড়-বৌ বড়ই ভয় পাইল। সে স্বামীর হাত ধরিয়া টানিল। সে দিকে মোটে লক্ষ্য না করিয়া কালীচরণ ডাকিল, "নারাণ! নারাণ!"

তাহার চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া আগে নারায়ণের কন্যা দুর্গা বাহির হইয়া আসিল। কালীচরণ বলিল, "মা, তোর বাবা কোথা রে?" দুর্গা বলিল, "বাবা কাছারীতে!"

"এ পাঁচিল দেওয়া হচ্চে কার হুকুমে?"

ইতিমধ্যে সরকার গোকুল সেদিকে আসিল। এখন ছোটবাবুর তরফে গেলেও, সে বহুকাল দুই ভায়ের সংসারে কাজ করিয়াছে।

গোকুল যখন টানাটানি করিয়া বড় বাবুকে গৃহমধ্যে লইয়া চলিল, তখন সে বলিল, "ওঃ, এই সংসার ঘাড়ে নিয়ে আমি বুকের রক্ত জল করে একে সাজিয়েছিলাম! আহা গোকুল! এমনটা হোল কেন বল্‌তে পার?"

৩

সেদিন প্রাতে গৃহিণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন বলিল, "ওগো! শুনেছ? দুর্গার বিয়ে!" অমনি কালীচরণ লাফাইয়া উঠিল ; উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি! কবে? কোথা?" পত্নী একটু শ্লেষ-জড়িত স্বরে বলিল, "তা' জেনে আর তোমার লাভ কি!" কালীচরণ গ্রাহ্য করিল না ; বলিল, "পাগল! আমি তার জ্যাঠা! আমি তার বিয়ের কথা জান্‌বো না তো জান্‌বে কে?"

পত্নীর আর সহ্য হইতেছিল না। সে বলিল, "অত বাড়াবাড়ি কর্চ্চ কেন? কাল গায়ে-হলুদ, বিয়ে—সব। বলি, তোমার নেমন্তন্ন হয়েছে?"

কালীচরণ খুব চটিয়া বলিল, "আমি কন্যাকর্তা—আমার আবার নিমন্ত্রণ কি! আর এতবড় একটা কাজ—নারাণের সাধ্য কি যে, আমি না দাঁড়ালে সব ঠিক বন্দোবস্ত করে!" এই বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল। সে কক্ষ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, পত্নী বাধা দিয়া বলিল, "তা' হবে না। বিনা নিমন্ত্রণে তুমি কি যেচে অপমান মাথা পেতে নেবার জন্য যাবে না কি! ভাই কি ইচ্ছা কর্লে তোমায় ডাকতে পার্ত না?"

তাই ত! এতটা ত কালীচরণ ভাবে নাই! ভাই যদি সত্যই অপমান করে! যদি দেশের, দশের সাম্‌নে—জ্ঞাতি-কুটুম্বদের দেখাইয়া বলে যে, সে ভাইকে চায় না—ভাই জোর করিয়া আসিয়াছে—তখন?

সহসা নারায়ণের বাটী হইতে সানাই সুর ছাড়িল। মধুর রাগিণীর আলাপ একেবারে পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া কালীচরণের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া—তাহার হৃদয়-দ্বারে সজোরে এক ধাক্কা মারিল। সঙ্গে-সঙ্গে সে মেঝেতে বসিয়া পড়িল!

সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে,—এমন সময় কক্ষদ্বার হইতে পুরোহিত কেদারনাথ ডাকিল, "বড়বাবু! একবার এদিকে আসুন!" সে চমকিত হইয়া লাফাইয়া উঠিল! ঐ যে তাহার নিমন্ত্রণ! নারায়ণ নিজে নিশ্চয় তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে। "এই যে আমি ভাই—" বলিতে-বলিতে চঞ্চল পদক্ষেপে সে কক্ষদ্বারে আসিল—চারিদিকে চাহিল। কিন্তু পুরোহিতকে একাকী দেখিয়াই, সহসা কে যেন তাহার বক্ষে লৌহদণ্ড দ্বারা সবলে আঘাত করিল,—তাহার বক্ষের স্পন্দন পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল। কেদার একখানি লাল কাগজ তাহার হাতে দিয়া সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "ছোট বাবুকে অত করে বল্লাম,—এই সুযোগে ঝগড়াটা মিটাইয়া ফেলুন—হাজার হোক বড় ভাই—!" সহসা সে কালীচরণের পাণ্ডুর বদন ও উদ্‌ভ্রান্ত নয়ন দেখিয়া ভয় পাইল। নিমন্ত্রণ-পত্র হাতে পড়িতেই, কালীচরণ আগে দেখিবার চেষ্টা করিল যে, কাহার নামে পত্র ছাপা হইয়াছে। প্রথমটা সে চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তার পর দ্বিতীয়বারও যখন দেখিল যে, কালীচরণ নহে নারায়ণচন্দ্র দত্ত নিজ নাম দিয়া পত্র ছাপাইয়াছে,—তখন সে সত্যই মরণ কামনা করিল! ছি! ছি! সমাজের সকলে বলিবে কি? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্তমান—তবু ছোট ভাই নিজে কর্মকর্তা সাজিয়াছে!

৪

সানাই বিসর্জনের সুর ধরিয়াছিল। তাহার বিনান-বিনান, করুণ অথচ মোলায়েম তান পর্দায়-পর্দায় উঠিয়া প্রভাতী বাতাসকে পর্যন্ত একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাসে পরিণত করিতেছিল। আর তাহার রেশ নারায়ণের হৃদয়ে পর্যন্ত প্রহত হইয়া তাহাকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রভাতে যখন সে নিদ্রা হইতে উঠিয়া, বারান্দায় আসিয়া, ঘুমঘোর-মাখান দুর্গার মুখখানি দেখিল, আর ভাবিল যে, তাহার আদরিণী কন্যা আজ পরের ঘরে চলিল,—তখন সে সত্যই বিমর্ষ হইয়া গেল। শুধু তাই নহে ; আরও একটা কি যেন দুর্ভাবনা তাহার হৃদয়-দ্বারে উঁকি মারিতেছিল।

সহসা পুরোহিত আসিয়া হাঁকিল, "ওগো, এয়োর দল, কোথা গেলে সব। মাঙ্গলিক কাজগুলো সেরে নাও না তাড়াতাড়ি। বর যে ট্রেনে যাবে।" তখন নারী মহলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। অনেক ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকির পর ঠাট্টা, বিদ্রূপ, হাসি, তামাসার ঢেউ বহিল—এয়োর দল নবদম্পতীকে ঘেরিয়া বসিয়া মাঙ্গলিক কর্ম সুরু করিয়া দিল।

এমন সময় সহসা সকলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল যে, কালীচরণ সেই নরনারীর ভীড় ঠেলিয়া ধীরে-ধীরে কক্ষ মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। কাহারও প্রতি না চাহিয়া, কোন কথা না বলিয়া, বরবধূর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, কম্পিত হস্তে একগাছি সোনার হার বাহির করিয়া দুর্গার গলায় পরাইয়া দিল। দুর্গা এমন অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া চমকিত হইল। তার পর অর্ধোচ্চারিত স্বরে "জ্যাঠামশাই" বলিয়াই তাহাকে প্রণাম করিল। জামাতাও তাহার দেখাদেখি মাথা নত করিল। কালীচরণ দুইটি হাত তাহাদের মাথার উপর দিয়া কি যেন বলিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিল। তার পর দ্রুত পদক্ষেপে কক্ষ ত্যাগ করিল। তখন সকলের চমক ভাঙ্গিল—পুরোহিত হাঁকিল "বড়বাবু, দাঁড়ান, দাঁড়ান। ছোটবাবু, যান, বড়বাবুকে ধরে আনুন্।" নারায়ণের গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়েছিল! বলা বাহুল্য, ততক্ষণে কালীচরণ নিজকক্ষে প্রবেশ করিতেছে। তাহার ব্যস্ত ভাব দেখিয়া পত্নী ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে তোমার?"

স্বামী কোন উত্তর না দিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল দেখিয়া, সেও পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, বাক্স খুলে কি নিলে? কোথা গিয়েছিলে?" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া খুব ছোট গলায় কালীচরণ বলিল, "বড়-বৌ! দুর্গাকে আশীর্বাদ করে এলাম। তোমার হারগাছটা দিয়ে এলাম! নারাণ আমায় ডাকেন না বলে কি আমি যাব না? আমি দুর্গার জ্যাঠা—আমার তাকে আগে আশীর্বাদ করার কথা। নারাণ ভুল করেছে বলে কি আমিও ভুল কর্ব! কর্তব্য হারাবো?" বলিতে-বলিতে আবেগে তাহার স্বর কাঁপিতে লাগিল।

৫

নারায়ণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। একটা কথা কহিবার, প্রতিবাদ করিবার শক্তিও সে সংগ্রহ করিতে পারে নাই। প্রাতঃকাল হইতে যে কালো মেঘখণ্ড তাহার হৃদয়-কোণে উঁকি মারিতেছিল—দাদার এই অতর্কিত আবির্ভাবে তাহা আরও জমাট বাঁধিয়া, আরও বড় হইয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল। দাদার ঐ বিরস, মলিন আকৃতি—বিষাদ-করুণ কাহিনী তাহাকে বজ্রাহত করিয়া দিয়াছে। দাদা যখন কন্যা-জামাতাকে আশীর্বাদ করিতে উদ্যত হইল, তখন সে একবার ভাবিল, ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরে—তাহাকে বারণ করে। কিন্তু কি জানি কেন—কি একটা অভাবনীয় ভয় আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিল—তাহার হস্ত-পদকে শক্তিহীন করিল—কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করিল।

ছোট-বৌ আসিয়া তাহাকে যখন বলিল যে, দাদার যৌতুক ফিরাইয়া দিয়া আসিতে হইবে, তখন কে যেন তাহার বক্ষে হাতুড়ীর দ্বারা সবলে আঘাত করিল। সে পত্নীর দিকে

চাহিল—তাহাকে ভাল করিয়া দেখিল। তার পর ধীরে-ধীরে বলিল, "আমি পার্ব না।" উত্তেজিত কণ্ঠে পত্নী বলিল, "তা হ'বে না। এ ভিক্ষা আমরা নিতে পার্ব না। তুমি যদি না পার,—আমি নিজে গিয়ে এ হার ফিরিয়ে দিয়ে আস্‌বো।"

নারায়ণ পত্নীর দিকে পিছন ফিরিয়া বলিল, "ও জিনিষ দুর্গার—জামায়ের—ওটা ফিরে দেবার আমাদের কোন অধিকার নেই।"

বহুক্ষণ পরে, বিদায়ের পূর্বে, বরকন্যাকে লইয়া বাটীর মহিলাবৃন্দ তাহার কক্ষদ্বারে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "কন্যা-জামাতা বিদায় লইতেছে—তাহাদের আশীর্বাদ কর।" সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল ; দেখিল, তাহার আদরিণী কন্যা লালবস্ত্রে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, কাঁদিয়া-কাঁদিয়া তাহার লাল কচি মুখখানি আরও লাল করিয়া, তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার পার্শ্বে এক নবীন যুবক তাহার হাত ধরিয়া রহিয়াছে।

কন্যা-জামাতা তাহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, সে উভয় হস্তে তাহাদের বাধা দিল। টানিয়া তুলিয়া, উত্তেজিত স্বরে বলিল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও! আগে আমায় নয়—এস আমার সঙ্গে—" সে জোর করিয়া তাহাদের টানিতে-টানিতে, প্রাঙ্গণ পার হইয়া, একেবারে দাদার কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "দাদা!"

চুম্বক যেন লৌহকে আকর্ষণ করিল। একলম্ফে কালীচরণ কক্ষের বাহিরে আসিল। নারায়ণের আর কিছু বলিতে হইল না—সম্মুখে নবদম্পতীকে দেখিয়াই কালীচরণ তাহাদের জড়াইয়া ধরিল—কথা বলিবার শক্তি যে তাহার জোগাইতেছিল না—আশীর্বাদ-বাণী যে জিহ্বা পর্যন্ত আসিল না। দ্বার-পার্শ্বে বড়-বৌকে দেখিয়াই নারায়ণ ভগ্নস্বরে বলিল, "দুর্গা! তোর জেঠাইমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছিস না?"

দুর্গা নত হইবার চেষ্টা করিতেই, তাহার জেঠাইমা চিলের মত ছোঁ মারিয়া নবদম্পতীকে কক্ষমধ্যে লইয়া গেল। তাহার নারী-হৃদয়ে আর সহ্য হইতেছিল না—উপস্থিত নরনারীর সম্মুখে খাড়া হইয়া দাঁড়াইবার শক্তিও যে তাহার ছিল না।

* * *

শুভযাত্রার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় বলিয়া পুরোহিত হাঁক দিতেই, নবদম্পতী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহারা বাহিরে আসিবার পূর্বেই কালীচরণ তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে একটা কাঠের বাক্স টানিয়া আনিল ও ভৃত্য সদার মাথায় সেটা তুলিয়া দিয়া বলিল, "যা, এটা দুর্গার পাল্কীতে তুলে দিয়ে আয়।"

কার্তিক ১৩২৯

আসামী

শচীন্দ্রলাল রায়

১

বীরনগরের সাধুচরণ মাঝির পুত্র যাদবের মাঝিগিরিতে হাতে-খড়ি না হইতেই, তাহার পিতা দুখানি ডিঙ্গি ও খান পাঁচ-ছয় বৈঠার বোঝা তাহার মাথায় চাপাইয়া, পৃথিবী হইতে সরিয়া পড়িল। যাইবার সময় শুধু প্রতিবেশী হরিচরণকে বলিয়া গেল—"যেদোটাকে একটু তৈরী করে নিও ভাই—এখন থেকে তুমিই হ'লে ওর অভিভাবক।" তার পর পুত্রকে বলিল—"হরির পায়ের ধুলো মাথায় ক'রে নে যেদো,—আজ থেকে ইনিই তোর শিক্ষাগুরু।"

হরিচরণ কার্যত যাদবের অভিভাবকত্ব গ্রহণ না করিলেও, তাহার নৌকা-দুখানির যে অভিভাবক হইয়া বসিল, এ কথা কাহারও অস্বীকার করিবার জো ছিল না। তাহার নিজের জরাজীর্ণ ডিঙ্গিখানি যখন কিছুতেই আর চলিতে পারিতেছিল না—তখন অপ্রত্যাশিত ভাবে যাদব ও তাহার নৌকা দুখানি হাতে আসিয়া পড়িল। হরিচরণ যাদবকে বুঝাইয়া দিল, তাহাব কোনও ভয় নাই—সে খাইয়া-দাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া খেলিয়া বেড়াক ; এখনও তার নৌকা বাহিবার বয়স হয় নাই। পাড়া-প্রতিবেশীরা কিন্তু বলাবলি করিত—এ হচ্ছে হরিচরণের ফন্দী। যেদোকে নৌকা বাহিতে শিখাইলে যদি ডিঙ্গি-দুখানি হাতছাড়া হইয়া যায়! তাহারা এ কথা যাদবকে বুঝাইতে চাহিলে সে জিভ কাটিয়া বলিত—"আরে রাম বল! উনি হচ্ছেন—আমার গিয়ে কি বলে—শিক্ষাগুরু। ওঁর বিরুদ্ধে আমি কি কোনও কথা কইতে পারি!" কোনও কিছু শিক্ষা না দিয়াই যে হরিচরণ কি করিয়া যাদবের শিক্ষাগুরু হইল—ইহা তাহারা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। আর এই কথা তাহাকে বুঝাইতে গেলেও সে কিছুতেই বুঝিতে চাহিত না।

হরিচরণ যাদবের গুরুপদ গ্রহণ না করিলেও, তাহার নয় বছরের কন্যা ফুলকুমারী ওরফে ফুলী তাহার গুরু হইয়া বসিল। এই ছোট্ট মেয়েটি তাহার এক-পিঠ কালো, ঝাঁকড়া চুল দোলাইয়া যা-কিছু করিতে আজ্ঞা দিত—যেদো অম্লান বদনে তাহাই সম্পন্ন করিত। ফুলীর অভিভাবকত্বে যেদোর দিনগুলি, পরের গাছের ফল চুরি করিয়া, পাখীর ছানা পাড়িয়া, খেলিয়া বেড়াইয়া, জলের মত কাটিয়া যাইতে লাগিল। হরিচরণ এই দুইটী প্রাণীর রকম সকম দেখিয়া মনে-মনে বোধ করি খুসীই হইয়া উঠিতেছিল ; এবং কি করিয়া সাধুচরণের ডিঙ্গি-দুখানি একেবারে হস্তগত করা যাইতে পারে, তাহারও একটা আভাষ এখন হইতেই তাহার মনের কোণে উঁকি মারিতে লাগিল।

২

একঘেয়ে খেলায় ফুলীর আর ভাল লাগিতেছিল না—তাই সেদিন যাদবকে বলিল—"আজ একটা মজা করলে হয় না, যেদো দা?"

"কি মজা রে ফুলী?"

"চল না—একবার নৌকো চ'ড়ে বেড়িয়ে আসি, আজ বাবাও বাড়ী নেই। একখানা ডিঙ্গিও ঘাটে আছে। বাবা এলে তো যাওয়া ঘটে উঠ্‌বে না। চল, চট্ করে ফিরে আসবো।"

যাদব বিস্মিত হইয়া বলিল—"তুই বলিস্ কি রে ফুলী—আমি কি নৌকো বাইতে জানি?"

ফুলী মুখে-চোখে হাসির লহর ছুটাইয়া বলিল—"আরে ধেৎ—নৌকো বাইতে জান না, তা হয়েছে কি? নৌকো আপনি-আপনি বেশ হেল্‌তে-দুল্‌তে যাবে—সে ভারি মজা হবে যেদো দা!" তার পর সে ভঙ্গী করিয়া বলিল—"আমি এমনি ক'রে হাল ধরে বস্‌বো—আর তুমি বৈঠে নিয়ে, এই এম্‌নি ক'রে—হেঁইও, হেঁইও;—না, না,—আর দেরী নয়। চল, শীগ্‌গীর চল।"

ফুলীর উৎসাহ দেখিয়া যাদব মনে-মনে ভারী খুসী হইয়া বলিল—"আচ্ছা চল্‌,—সন্ধ্যের আগেই ফিরতে হবে কিন্তু।"

ফুলী ঘরের দাওয়া হইতে দুইখানি বৈঠা লইয়া দৌড়াইয়া নদীর ঘাটে গিয়া নৌকায় চড়িয়া বসিল। যেদোও নৌকার বাঁধন খুলিয়া নৌকায় উঠিল। ঠিক হইল—তাহারা প্রথম উজান বাহিয়া যাইবে—তার পর আসিবার সময় ভাটিতে নৌকা না বাহিয়াই অক্লেশে আসিতে পারিবে। ফুলী একখানি বৈঠা লইয়া নৌকার পিছনে হাল ধরিয়া বসিয়া হুকুম করিল—"এই যেদো দা—এইবার খুব কসে টান্‌।" যাদব অমনি উৎসাহভরে উজান মারিতে-মারিতে তান তুলিল—"হেঁইও বল রে, আরে হেঁইও বল রে।" কিন্তু নদীর প্রবল স্রোতের বেগে নৌকা কিছুতেই উজান-মুখে আগাইতেছিল না; ওস্তাদ মাঝির হাতে পড়িয়া ডিঙ্গি-খানা ঘুরিতে ঘুরিতে স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিল। নৌকাকে ঘুরপাক খাইতে দেখিয়া ফুলী তো ভারী খুসী! সে ভাবিল—তাহারই হাতের কৌশলে নৌকা ঘুরিতে-ঘুরিতে অগ্রসর হইতেছে। সে উল্লসিত হইয়া বলিল—"যাক্‌, যেদো দা,—তোমাকে আর কষ্ট ক'রে বাইতে হবে না। নৌকা এখন এই দিকেই চলুক—আমি দিব্যি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নিয়ে যাব এখন। তার পর ফির্‌বার সময় উজান বেয়ে এলেই চল্‌বে।" যেদো প্রায় মিনিট দশেক ডিঙ্গিখানিকে উজান মুখে লইবার প্রবল চেষ্টা করিয়া হাঁফাইয়া পড়িয়াছিল;—সেও এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বৈঠা রাখিয়া ফুলীর কাছে আসিয়া বসিল; এবং হাল ধরিবার উপলক্ষে তাহার মুখে-চোখে যে নানা ভঙ্গিমার শ্রী ফুটিয়া উঠিতেছিল—তাহাই মুগ্ধ চক্ষে দেখিতে লাগিল।

কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে যখন দেখা গেল যে, তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে, আর দিনের আলোও প্রায় নিভিয়া আসিতেছে—তখন ফুলী বলিল—"যেদো দা এইবার বৈঠা নাও তো—শীগ্‌গির ফেরা যাক। আমি নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছি।" যেদো অমনি উৎসাহ-ভরে বৈঠা লইয়া 'হেঁইও, হেঁইও' আরম্ভ করিয়া দিল। নৌকার মুখ না ফিরাইতেই বৈঠার টান পাইয়া স্রোতের দিকে নৌকা সোঁ-সোঁ করিয়া ছুটিয়া চলিল। ফুলী চেঁচাইয়া মাতব্বরের মত বলিতে লাগিল—"তোমার একটুও বুদ্ধি নেই—নৌকার মুখ না ঘুরাতেই অমনি টান!" অপ্রস্তুত হইয়া যেদো বৈঠা তুলিয়া রাখিল। কিন্তু মিনিট দশেকের প্রবল চেষ্টায়ও যখন নৌকার মুখ ফিরিল না—অনবরত ঘুরপাক খাইতে-খাইতে স্রোতের মুখেই অগ্রসর হইতে লাগিল—তখন ফুলীর মুখ চিন্তাকুল হইয়া উঠিল। যাদব এইবার উৎসাহ দিয়া বলিল—"তুই সর ফুলী—আমি এখনই সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।" তার পর হাল লইয়া নানা কারসাজি করিয়াও নৌকার ইচ্ছাগতিকে যখন সংযত করিতে পারিল না—তখন হতাশ হইয়া বলিল—"তাই তো, এখন কি করা যায় রে ফুলী?" ফুলীর মুখে-চোখে ভীতির সুস্পষ্ট আভা ফুটিয়া উঠিল—সে অ'ড়ষ্ট হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

অদূরে একজন লোক আর একখানি ছোট নৌকা বাহিতে-বাহিতে এই দুইটি কিশোর-কিশোরীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া হাসিতেছিল। সে তাহার নৌকাখানি আগাইয়া আনিয়া ফুলীদের নৌকার সাথে ভিড়াইয়া বাঁধিয়া বলিল—"নৌকা চালাতে পার না—এদিকে সখ আছে তো খুব। এখন এম্‌নি করে ভাস্‌তে-ভাস্‌তে সমুদ্দরে পড়গে—তাহ'লে বেশ হবে।" ফুলীর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

"আর কাঁদতে হবে না—চল, তোমাদের বাড়ী রেখে আস্‌ছি।" ফুলী আর যেদো খুসী

হইয়া কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে শিক্ষিত আগন্তুকের নৌকাচালন-প্রণালী দেখিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় হরিচরণ বাড়ীতে আসিয়া, ফুলী ও যাদবকে দেখিতে না পাইয়া হাঁক-ডাক সুরু করিয়া দিয়াছে—এমন সময় তাহারা সেই লোকটির সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল।

হরিচরণ বলিল—"কোথায় গিয়েছিলি এই ভরসন্ধ্যে বেলায়?" যেদো ও ফুলী নির্বাক হইয়া রহিল। কিন্তু আগন্তুকটি একে-একে সব কথা খুলিয়া বলিয়া, পরে নিজের পরিচয় দিয়া বলিল—"আমার নাম শিবরতন—আমি হরিপুরের নবীন মাঝির ছেলে।"

নবীন পাঁচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে একজন মাতব্বর মাঝি। তাহার টাকাকড়ি, ধানচালের আড়ত, বড়-বড় পানসী নৌকা অন্যান্য মাঝিদিগের ঈর্ষার জিনিস ছিল। এমন লোকের পুত্র তাহার বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছে দেখিয়া সে তাহার অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল ; যাদব ও ফুলীর শাস্তির কথা এই অভ্যর্থনার আবেগে চাপা পড়িয়া গেল।

এই ঘটনার পর হইতে শিবরতনের এই বাড়ীতে আনাগোনা এবং হরিচরণের সহিত কি এক বিষয়ে শলা-পরামর্শ অনবরত চলিতে লাগিল। কথাটাও আর বেশীদিন চাপা থাকিল না ; শীগ্‌গিরই প্রকাশ হইয়া পড়িল,—ফুলীর সহিত নবীন মাঝির পুত্রের বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল—"হরিচরণের বরাত ভাল, খুব একটা 'দাঁও' মারিয়া লইয়াছে।"

খেলার সাথী ফুলীকে আর একজন এমনই করিয়া ছিনাইয়া লইয়া যাইবে—ইহা যাদব আর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিল না। বালক হইলেও সে জানিত—ফুলীর সহিত তাহারই বিবাহ হইবে। হরিচরণও প্রকাশ্যে এ কথা অনেকবারই বলিয়াছে। কিন্তু ঐ লোকটা কোথা হইতে ধূমকেতুর মত আসিয়া, সমস্তই মাটি করিয়া দিল যে! রাগে, অভিমানে যাদব গম্ভীর হইয়া উঠিল।

ফুলী যাদবের এই ভাব-পরিবর্তন দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। সে তাহাকে গম্ভীর হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, যাদব তাহাকে এমনই তাড়া মারিল যে, সে কাঁদিতে-কাঁদিতে পিতার নিকট নালিশ করিতে গেল।—হরিচরণ নালিশের মর্ম শুনিয়া হাসিয়া বলিল—"তুই আর ওর সঙ্গে মিশিস নে—তোর যে শীগ্‌গিরই শিবরতনের সাথে বিয়ে।"

এই প্রলোভনেও ফুলীর ক্রন্দনের বেগ কমিল না—বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সে পা ছড়াইয়া এই বলিয়া কাঁদিতে বসিয়া গেল যে, সে কক্ষনো ঐ 'পুঁতকো' শিবুকে বিবাহ করিবে না, করিবে না, করিবে না।

কিন্তু ফুলীর এই আপত্তি কার্যকালে টিকিল না। হরিচরণ শীগ্‌গিরই একটা শুভ দিন দেখিয়া ফুলীকে শিবরতনের হাতে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

ফুলীর বিবাহের কয়েক দিন পরে যেদো হরিচরণকে গম্ভীর ভাবে জানাইল, "আমার নৌকোটৌকো বুঝিয়ে দাও। আমি আর তোমার এখানে থাক্‌ছিনে।" হরিচরণ বিস্মিত হইয়া বলিল—"তুই আবার যাবি কোথায় রে যেদো?"

যাদব রাগিয়া বলিল—"কেন, আমার নিজের বাড়ী কি নাই? তোমার মত এমন জোচ্চোরের বাড়ীতে আর আমি একদণ্ডও থাকছি নে। নৌকোগুলো ফিরিয়ে দেবে তো দাও—নইলে আমি আদালত করবো।"

হরিচরণ বুঝিল—যেদোকে পাড়ার লোক বিগড়াইয়া দিয়াছে। তাহার ভাব দেখিয়া আর নৌকা রাখিবার সাহস তাহার হইল না। সে ক্ষুণ্ণ মনে সব বুঝাইয়া দিয়া পাড়া-প্রতিবেশীকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল—"আমার সুখ দেখে সব শা'—র মাথায় টনক পড়েছে। আর এ ছোকরাকেও এতদিন ধরে মানুষ করলাম—তার প্রতিফলও বেশ দিল দেখছি। কলিকাল আর কাকে বলে।"

বছর চার-পাঁচ পরের কথা বলিতেছি। যাদব এখন পরিপূর্ণ যুবা পুরুষ,—সে ইহার মধ্যে মাঝিগিরিতেও বেশ পাকা হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন নৌকার ভাড়া খাটিয়া আসিয়া, সন্ধ্যার পর নিজের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক সাজিতে-সাজিতে গান ধরিয়াছে—

"মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতি পারলাম না।
আমার ভাঙ্গা নায়ের ছেঁড়া দড়ি রে—এ-এ-এ-এ-এ—"

এমন সময় ফুলী আসিয়া ডাকিল—"যেদো দা—।"

যাদবের সুর ভাঁজা শেষ হইল বটে, কিন্তু সে কোনও উত্তর দিল না—সাজা কলিকায় ফুঁ দিতে লাগিল।

ফুলী হাসিয়া বলিল—"কলকেটা আমার কাছে দাও—আমি ফুঁ দিচ্ছি।" যাদব গম্ভীর হইয়া বলিল—"না থাক্। ও-কাজ আমিই পারবো।" তাহার কথার ভঙ্গী শুনিয়া ফুলী দুঃখিত হইল ; তাহার মনে হইল—ছোটবেলায় যাদব অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তাহাকে দিয়া কতবার তামাক সাজাইয়া লইয়াছে—তাহার ফুঁ দেওয়া লইয়া কত রকমে উপহাস করিয়া তাহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে ;—কিন্তু আজ? ফুলী অতি কষ্টে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া লইয়া সহজ ভাবেই বলিল—"আচ্ছা, এ কাজ না হয় তুমিই পারলে ; কিন্তু আর একটা কাজও যে তোমাকে পারতে হয় যেদো দা?"

যাদব হুঁকায় একটা টান দিয়া বলিল—"কি কাজ?"

ফুলী হাসিয়া বলিল—"তোমার ভাঙ্গা 'নাও' আর ছেঁড়া দড়ি যাতে শীগ্‌গির মেরামত হয়, তাই এখন তোমাকে করতে হয় যে?"

উদাসীন ভাবে যাদব বলিল—"পয়সা নাই।"

ফুলী বলিল—"তোমার তো বিশেষ পয়সা লাগবে না ভাই ;—যে মেরামত করবে, তারই বাপের কিছু লাগ্‌তে পারে বটে!"

যাদব সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম?"

ফুলী হাসিয়া বলিল—"এইবার এ্কটা বিয়ে কর যেদো দা।"

যাদব আরও গম্ভীর হইয়া গেল। ফুলীর বিবাহের পর যখনই তাহার সাথে দেখা হইয়াছে, সে এই একই অনুরোধ অনেকবার করিয়াছে ;—কিন্তু যাদব কোনও উত্তরই দেয় নাই ; আজও দিল না।

ফুলী বলিল—"চুপ করে থাকলে চলবে না তো—আজ তোমার কথা নিয়ে তবে আমি যাব।" যাদব তবু কোনও কথা বলিল না—গম্ভীরভাবে তামাক টানিতে লাগিল।—ফুলী তখন অনুযোগের সুরে বলিল—"যেদো দা, লক্ষ্মীটি, এইবার বিয়ে কর ভাই—কতদিন এম্‌নি ভাবে থাকবে বল তো।"

যেদো উদাস ভাবে বলিল—"যতদিন বেঁচে থাক্‌বো।"

"কিন্তু আমি তোমায় এ ভাবে আর কিছুতেই থাকতে দেবো না।" ফুলীর কথার দৃঢ়তা যাদব লক্ষ্য করিল—তাই বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"কিসের জোরে ফুলী?" ফুলীর মুখ ছাই বর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই ঝাঁঝাল স্বরে বলিয়া উঠিল—"জোর? কিছু না। তুমি আমার কে যে তোমার ওপর জোর চল্‌বে আমার? কিন্তু তোমার জন্য আমাকে যে সকলে এমনি করে থেঁতলাবে—এই বা আমি সহ্য করবো কিসের জন্য, বলতে পার?"

যাদব বিস্মিত হইয়া বলিল—"আমার জন্য তোকে—।"

বাধা দিয়া উগ্র স্বরে ফুলী বলিল—"হ্যাঁ! বিশ্বাস না হয় এই দেখ।" এই বলিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ফুলী তাহার পিঠের কাপড় অপসারিত করিল। যাদব সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—

তাহার সমস্ত পিঠে বিষম প্রহারের গভীর সুস্পষ্ট ক্ষতচিহ্ন। সে শিহরিয়া উঠিয়া আর্তস্বরে বলিয়া উঠিল—"এ দশা তোর কে করলে রে ফুলী?"

ফুলী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"আমার স্বামী! কিন্তু তাঁরই বা দোষ কি যেদো দা? সবাই বল্‌ছে যে তুমি আমারই জন্য এখনও বিয়ে কর নি। তাই ওঁর রাগ হওয়া তো স্বাভাবিক।" তার পর একটু থামিয়া বলিল—"কিন্তু, এর প্রতিকার তো তুমিই করতে পার।" ক্রোধে যাদবের সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; বলিল—"প্রতিকার? হ্যাঁ এর প্রতিকার আমাকেই কর্তে হবে বৈ কি!"

যাদবের মুখের ভাব দেখিয়া ফুলী চমকাইয়া গেল। সে দেখিতে পাইল, প্রতিহিংসার সুস্পষ্ট চিহ্ন তাহার মুখে-চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে ভীত হইয়া বলিল—"ও সব মারধোরের মতলব এঁটো না যেদো দা!"

যাদব বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"তোর স্বামীর ভয়ে না কি?" ফুলী এইবার দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"কার ভয়ে তা জানি নে—কিন্তু ও-সব মতলব ছাড় তুমি।"

যাদব মুখ খিঁচাইয়া বলিল—"তোর উপদেশ তো চাইনি আমি। ফের যদি কথা—।"

ফুলীও দৃপ্ত স্বরে বলিয়া উঠিল—"বেশ। তোমার সঙ্গে যেন আর আমার কোনও দিন কোনও কথা বল্‌তে না হয়। তবে আজ এই কথা জানিয়ে দিচ্ছি—আমার স্বামীর সঙ্গে যেন তুমি লাগতে যেও না—তোমার মঙ্গল হবে না।"

"আমার কিসে মঙ্গল হবে, সে আমি জানি ফুলী,—এ সম্বন্ধে তোর কাছে আমি উপদেশ চাই না তো। ইচ্ছা হয়, তোর স্বামীকে আমার মনের কথা জানিয়ে বলিস্—যে হাত দিয়ে তোর ঐ কোমল দেহে সে আঘাত করেছে—সে হাত যত দিন না একেবারে অকর্মণ্য করে দিতে পারি—তত দিন আর আমার শান্তি নাই। তাকে এখন থেকে সাবধান হয়ে থাক্‌তে বলিস্।"

ফুলী যাদবের কথায় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তার পর সে ঝোঁকটা সামলাইয়া লইয়া বলিল,—"হ্যাঁ—তাঁকে সাবধান করে দিতে হবে বৈ কি। কিন্তু, তুমিও সাবধানে থেকো যেদো দা।" এই বলিয়া, যাদবের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া, আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

যাদব সেই একই স্থানে গুম হইয়া বসিয়া রহিল—তাহার দুই চোখ দিয়া বড়-বড় অশ্রুর ফোঁটা টপ-টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এই কথাটি আজ তার মনে খোঁচার মত বিঁধিয়া রহিল যে—সে ফুলীর কাছে তার স্বামী অপেক্ষা কতখানি হীন ও ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে।

৪

বীরনগর ও হরিপুরের মধ্য দিয়া যে নদীটি বহিয়া গিয়াছে, তাহারই কোন অংশে মাছ ধরা লইয়া এই দুই গ্রামের জেলেদের মধ্যে অনেকদিন হইতেই রেষারেষি চলিতেছিল ; কারণ, এই জলার মালিক বীরনগরের জমীদার কি হরিপুরের জমীদার, তাহার যখন কিছুতেই নিরাকরণ হইল না, তখন দুই গ্রামের জেলেরাই গায়ের জোরে ইহার একটা মীমাংসা করিতে সচেষ্ট হইল। কিন্তু গ্রামের নাম বীরনগর হইলেও এই যুদ্ধে তাহারাই ক্রমশ পিছাইতে লাগিল ;—কেন না তাহাদের লোক-বল হরিপুর অপেক্ষা হীন ছিল। কয়েক বছর কোনও রকমে যুঝিয়া, আজ দুই বৎসর হইল তাহারা জয়ের গৌরব হরিপুরের মাথায় তুলিয়া দিয়া একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

মাঝিদের মধ্যে যাহারা বৃদ্ধ, তাহারা এই পরাজয়ের কলঙ্ক মাথায় করিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইলেও, তরুণের দল এ অপমানের ব্যথা ভুলিতে পারে নাই ; এবং সুবিধা বুঝিলে যে

আবার তাহারা একহাত লড়িয়া দেখিতে পারে, এ ইচ্ছাও তাহাদের মনে মাঝে-মাঝে উঁকি দিত।

হরিপুরের উপর যাদবের আক্রোশ ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। কেন না তাহার নিজের গ্রাম যে হরিপুরের নিকট ছোট হইয়া গেল, ইহা তো তাহাকে বিঁধিতই,—তাহার উপর ঐ গ্রামেরই শিবরতন তাহার ফুলীকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে যে! শুধু তাই নয়—ফুলীর উপর ঐ পশু অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত নয়। তাহার মাথায় খুন চাপিয়া গেল ;—সে কি করিয়া যে হরিপুর গ্রামকে অপদস্থ করিয়া শিবরতনকে শাস্তি দিবে, এখন হইতে তাহারই পন্থা খুঁজিতে লাগিল ; এবং কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রামের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দল গঠন করিয়া ফেলিল।

একদিন যাদব কয়েকজন সঙ্গীর সহিত মস্ত একটি পাকা রুইমাছ লইয়া জমীদার-বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, জমীদার-বাবুকে প্রণাম করিয়া কহিল—"মাছটি কর্তার সেবার জন্য ধরিয়া আনিয়াছি।" জমীদারবাবু মাছটির সুডৌল বিপুল অবয়ব দেখিয়া খুসী হইয়া বলিলেন—"কি রে যেদো, তুই আবার মাছ ধরা আরম্ভ করলি কবে থেকে?"

যাদব বলিল—"আজ্ঞে, এই কিছুদিন হ'লো। শুধু নৌকো ভাড়া খাটালেই সংসার চলে না—তাই একটা জালও করেছি।"

জমীদারবাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তোর আবার সংসার কিসের রে?"

"আজ্ঞে, সংসার বৈ কি। যতদিন একলা ছিলাম, ততদিন না হয়।"

জমীদারবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"সে কি! তুই কি বিয়ে করেছিস্?"

যাদব হাসিয়া বলিল—"না বাবু। শুধু বিয়ে করলেই কি আর সংসার হয়!"

তার পর তাহার সঙ্গীদের দেখাইয়া বলিল—"এদের ভার যে আমি নিয়েছি বাবু—তাই শুধু ভাড়া খেটে আর সংসার চলে না।"

"কেন? ওদের কি বাড়ী-ঘর নাই?"

"তা' থাকবে না কেন? কিন্তু আজকাল ওরা আমার কাছেই থাকে কি না—তাই ওদের খেতেও দিতে হয়।"

জমীদারবাবু বলিলেন—"বেশ—বেশ! কিন্তু এ মাছ কোথাকার রে? ভারি চমৎকার মাছটি কিন্তু!"

যাদব মহা খুসী হইয়া বলিল—"আজ্ঞে, সেই জন্যই তো হুজুরের জন্য নিয়ে আসা। মাছটি ঐ হরিপুরের—কি বলে, সেই জলাটার কি না।"

জমিদারবাবু অবাক্ হইয়া বলিলেন—"সে কি রে—ওরা তোদের মাছ ধরতে দিলে?"

"ধরতে কি আর ইচ্ছা করে দেয় কর্তা—জোর করে আন্‌তে হয়।" তার পর গম্ভীর ভাবে জানাইল—"একটা হুকুম যে দিতে হয় কর্তা!"

"কিসের হুকুম রে?"

"ঐ জলাটা একবার দখল করি। গাঁয়ের অপমান আর সইতে পারি নে।" জলাটা অধিকার করিবার ইচ্ছা থাকিলেও জমীদার পারিয়া উঠিতেছিলেন না—এ দুঃখ তাঁহারও মনে বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু যাহা একবারে চুকিয়া-বুকিয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া কোনও হাঙ্গামা করিতেও আর ইচ্ছা হইতেছিল না। তিনি বলিলেন—"ও-সব তো মিটে গেছে রে—আর কেন?"

বাবুর ইচ্ছা থাকিলেও দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয়ে তিনি হুকুম দিতে পারিতেছেন না—তাহা যাদব বুঝিল। তাই সে হাসিয়া বলিল—"তোমার প্রজা আমরা কর্তা,—তাই একটা হুকুম তোমার কাছ থেকে নিতে এসেছি—নইলে যে আমাদের পাপ হবে। তুমি কিছু ভেবো না কর্তা—তোমাকে এর ফ্যাঁসাদে পড়তে হবে না। যত দোষ-ঘাট আমিই মাথা পেতে নেব। শুধু, তুমি একবার হুকুম দেও,—আশীর্বাদ করো—তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি।"

জমীদারবাবু বলিলেন—"যা ভালো বুঝিস্ কর—কিন্তু আমাকে যেন এর মধ্যে জড়াস্

নে।"

"তা আর তোমাকে বল্‌তে হবে না কর্তা"—এই বলিয়া একে-একে তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া সকলে বাহির হইয়া গেল।

*　　*　　*　　*

যখন প্রচুর মাছ সমেত সঙ্গীদের লইয়া যাদব বাসায় ফিরিল—তখন রাত প্রায় আটটা বাজিয়া গিয়াছে। যাদবের মুখ আজ তৃপ্তির আভায় যেন ঝলমল করিতেছিল। সে মাছগুলি সঙ্গীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া বলিল—"বাড়ী যাবার সময় এই দুটি মাছ জমীদার-বাড়ীতে দিয়ে যাস্ কেষ্ট।"

কেষ্টদের কিন্তু তখনই বাড়ী যাইবার ইচ্ছা হইতেছিল না। তাহারা প্রতিদিন রাত্রে যাদবের কাছেই থাকে ; আজ যাদব কিন্তু তাহাদের এ বাড়ীতে রাখিতে প্রস্তুত নয়। মাছ ধরিতে গিয়া যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এ বাড়ীতে আজ পুলিশের শুভাগমন হইবেই, এ কথা সে জানিত। কারণ, সে যে দলের নেতা এ কথা আর অপ্রকাশ ছিল না। তাই সে সকলকে বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়াই ঠিক করিয়াছিল।

কেষ্ট বলিল—"দাঁড়াও দাদা, একটু তামাক খেয়ে নি।" তামাক সাজিয়া তামাক খাইতে বসিয়া তাহাদের মজলিশটি বেশ জমিয়া গেল।

রামচন্দ্র বলিল—"সাবাস্ তোমার লাঠির জোর যেদো দা—এক চোটেই শিবুর হাত চুরমার। ও শালা তো লাঠির বাড়ি খেয়ে জলে পড়ে ভেসে যাচ্ছিল ; না পারছিল সাঁতার দিতে—না পারছিল হাত নাড়তে। যেমন বদমায়েস—তেমনি শাস্তি।"

কৃষ্টধন বলিল—"এবার ভারি জব্দ হয়ে গেছে ওরা। ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি—হ্যাঁ।"

নবীন হুঁকার এক 'সুখটান' দিয়া ধুম ছাড়িয়া বলিল—"ওরাও কিন্তু মারামারির জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিল—নইলে কি করে জান্‌লে যে, আজই গোলমাল হবে?"

রাম বলিল—"ঐ বেটা হরিচরণের কাজ। বেটা ঘরভেদী বিভীষণ—কি করে আমাদের মতলব জান্‌তে পেরে ওদের সাবধান করে দিয়েছিল। ওর জামাই তো আজ অক্কাই পাচ্ছিল—ভাগ্যিস যেদো দা দয়া করে জল থেকে তুলে ফেল্‌লে।

যাদবের এ-সব আলোচনায় আর যোগ দিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। সে যে তাহার অপমানের অনেকটা প্রতিশোধ লইতে পারিয়াছে,—সে যে শিবরতনের চেয়ে হীন নয়, ইহাই দেখাইতে পারিয়াছে—ইহাতেই সে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছি । সব চেয়ে তাহার আনন্দ হইতেছিল এই ভাবিয়া যে, যে হাত দিয়া ফুলীর দেহে শিবু আঘাত করিয়াছে—সেই হাত সে একেবারে জখম করিতে পারিয়াছে।

এদিকে যাদবের সঙ্গিগণের আলোচনা তুমুল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, যেদো তাহাদের তাড়া দিয়া বলিল—"এই বেলা তোরা বাড়ী যা তো।—আমাকে একটু নিশ্চিন্ত হতে দে।" সঙ্গীগণ তাহার ধমক খাইয়া, ক্ষুণ্ণ হইয়া, একে-একে বাড়ী চলিয়া গেল।

যাদব একা-একা অন্ধকারেই চুপ করিয়া কতক্ষণ বসিয়া ছিল, তাহা তাহার ঠিক ছিল না। হঠাৎ ভীত-ত্রস্ত স্বরে ফুলী আসিয়া ডাকিল—"যেদো দা!"

যাদব চমকাইয়া উঠিল ; বলিল—"ফুলী, এত রাত্রে যে?"

ফুলী যাদবের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল—"যেদো দা—পালাও।"

যাদব ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"কেন রে?"

"পুলিশ আস্‌ছে! তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে, এই কথা শুনে আমি ছুটে চলে এসেছি। তুমি পালাও যেদো দা।"

যাদব তাহার পায়ের তলা হইতে ফুলীকে উঠাইয়া বসাইয়া বলিল—"পালাবো কোথায় রে?"

"যেখানে ইচ্ছা তোমার।—কোনও দূরদেশে কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকো। তার পর হাঙ্গামা চুকে গেলে আবার ফিরে এসো।"

যাদব সহজ ভাবে বলিল—"তা হয় না রে!"

ফুলী যাদবের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, "হবে না কেন শুনি? তুমি যদি না পালাও, তবে আমিও আর এ বাড়ী ছেড়ে যাব না।"

যাদব হাসিয়া বলিল—"কিন্তু লোকে দেখ্‌লে বল্‌বে কি? পুলিশ তো এখানেই আসছে—সঙ্গে তোর স্বামীও—।"

ফুলী বলিল—"স্বামীর যে অবস্থা করেছো,—তাকে দু'মাসের মধ্যে আর শয্যা ছেড়ে উঠ্‌তে হবে না। কিন্তু আর সকলে আস্‌বে বটে।"

"তবে?"

ফুলী স্থির ধীর ভাবে বলিল—" তবে আর কি! তোমাকে যদি পুলিশ ধরে নিয়ে যায়—আমাকেও নিয়ে যাবে। আমি বল্‌বো—আমিই এ দাঙ্গা বাধাতে তোমাকে বলেছিলাম।"

যাদব বলিল—"তোর ও-কথায় লোকে বিশ্বাস করবে কেন?"

ম্লান হাসিয়া ফুলী বলিল—"বিশ্বাস? বিশ্বাস তো লোক করে বসে আছে। তার উপর, এত রাত্রে তোমার ঘরে আমাকে দেখে লোকে কি বল্‌বে বল তো। এ দেখেও কি লোকে বিশ্বাস করবে না?"

যাদব শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—"ফুলী, তুই শীগ্‌গির যা ভাই—তারা যে এসে পড়লো বলে!"

ফুলী বেশ করিয়া সুস্থির হইয়া বসিয়া বলিল—"আসুক,—আমি নড়ছি নে।"

যাদব ব্যাকুল হইয়া বলিল—"ছেলেমানুষী করিস্‌ নে ফুলী—আমার কথা শোন্‌।"

ফুলী উত্তেজিত হইয়া বলিল—"ছেলেমানুষী আমার, না তোমার, শুনি? আমারই জন্য এ বিপদ তোমার—এ জেনে-শুনেও কি আমি চুপ করে থাকবো? না—তোমাকে এই বিপদের মুখে ফেলে আমি চলে যাবো?"

যাদব বিস্মিত হইয়া বলিল—"তোর জন্য আমার এ বিপদ!"

বড় মধুর হাসি হাসিয়া ফুলী বলিল—"সে আমি জানি যেদো দা।"

ফুলীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব দেখিয়া যাদবের মুখ শুকাইল। সে যদি এ গ্রাম ছাড়িয়া না পালায়, তাহা হইলে ফুলীও যে এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে না, তাহা সে বুঝিল।—তাই, কি-যেন একটু ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা, আমি না হয় পালাচ্ছি।—তা হ'লে তো তুই হরিপুরে ফিরে যাবি?"

ফুলী বলিল—"হ্যাঁ।" যাদব উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফুলীকে বলিল—"চল্‌, তোকে নদী পার করে দিয়ে, আমি ছোট ডিঙ্গিখানি নিয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যাবো। কিন্তু, তুই নদী পার হয়ে এলি কি করে রে ফুলী?"

ফুলী হাসিয়া বলিল—"নৌকো বেয়ে। প্রাণের দায়—বোঝ না?"

দুইজনে যখন নদীর ধারে আসিয়া পৌঁছিল—তখন রাত্রি বোধ হয় দশটা। আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিল—একেবারে মেঘাচ্ছন্ন। নক্ষত্রও আর দেখা যাইতেছিল না।

আকাশের ভাবগতিক দেখিয়া যাদব বলিল—"বড় ঝড় উঠ্‌বে রে ফুলী।"

ফুলী বলিল—"উঠুক। এই ঝড়ের গোলমালে তুমি অনেক দূর যেতে পারবে।"

তাহারা দুইজনে নৌকায় চড়িয়া বসিল। ফুলীকে ছইয়ের ভিতর বসিতে বলিয়া, যাদব নৌকা খুলিয়া দিল। নৌকা খুলিতে-না-খুলিতেই তুমুল ঝড় আরম্ভ হইল। যাদব সে দিকে গ্রাহ্য না করিয়া বলিল—"আচ্ছা ফুলী, তোকে এতক্ষণ বাড়ীতে না দেখে ওরা কিছু বল্‌বে না?"

ফুলী বলিল—"ওরা ঠিক পায় নি বোধ হয়। বাড়ীতে যে মহামারী কাণ্ড আজ! আর ঠিক পেলেই বা কি—কিছু প্রহার দেবে বই তো নয়।"

উত্তর শুনিয়া যাদবের মুখ শুকাইল। কিন্তু তখনই বাতাসের জোরে হা'ল বেঁকিয়া গেল—হা'ল সোজা করিয়া লইয়া বলিল,"বড্ড ঝড় রে আজ—কিছু ঠাওর কর্তে পারছি নে যে!"

এই সময় হঠাৎ এক প্রবল ঢেউ নৌকার ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ফুলী ভয় পাইয়া বলিল—"আমার ভয় করছে যেদো দা!"

যাদব তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল—"ভয় কি রে? আচ্ছা, আমার কাছে এসে বস্।" ফুলী ছই হইতে বাহির হইয়া, যাদবের পায়ের কাছে যাইয়া বসিল।

ঝড়ের বেগ ক্রমশ বাড়িয়াই চলিল। যাদব ফুলীকে বলিল—"আজ আমার বড্ড গান করতে ইচ্ছা হচ্ছে রে!"

ফুলী ঝড় ও ঢেউয়ের তাণ্ডব নৃত্য দেখিতে-দেখিতে বলিল—"আচ্ছা, গাও না।"

যাদব গান ধরিল—

"মন মাঝি তোর বইঠা নে রে
আমি আর বাইতি পারলাম না।
আমার ভাঙ্গা নায়ের ছেঁড়া দড়ি রে—"

বাধা দিয়া ফুলী বলিল—"ছিঃ, ও গান নয় যেদো দা—আর একটা গান গাও।"

কিন্তু আর গান গাহিবার সময় হইল না। বাতাসের প্রবল ধাক্কায় হালের দড়ি ছিঁড়িয়া গেল। যাদব জলে পড়িতে-পড়িতে ঠিকারাইয়া ফুলীর গায়ের ওপর পড়িল। তখনই আর এক ঝাপটায় নৌকা কাত হইয়া পলকের মধ্যে তলাইয়া গেল। তারপর শুধু ঢেউয়ের তাণ্ডব নৃত্য—আর প্রবল ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দ।

পরদিন সকাল-বেলা সকলে সবিস্ময়ে দেখিল—হরিপুরের চড়ার উপর যাদব ও ফুলীর মৃতদেহ পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। গ্রামের লোক আমোদ পাইয়া একে-একে আসিয়া জটলা করিতে-করিতে নানা মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।—দারোগা সাহেব সংবাদ পাইয়া, ঘটনাস্থলে আসিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—"এই তো আমার আসামী দেখ্ছি।" তারপর স্বভাবসুলভ স্বরে চৌকিদারদের হুকুম করিলেন—"হারামজাদা ব্যাটারা, হাঁ করে কি দেখছিস্—লাস দুটো এখনই সদরে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।"

ভাদ্র ১৩২৯

প্রায়শ্চিত্ত

জলধর সেন

(১)

আইন-ক্লাশের পড়া শেষ করিয়া বেলা এগারটার সময় অক্ষয় তাহার মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে আসিয়া দেখিল, তাহার টেবিলের উপর একখানি ডাকের চিঠি রহিয়াছে। খামের উপর তাহারই গ্রামের পোস্ট-আফিসের ছাপমারা ; কিন্তু হাতের লেখাটা তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। বাড়ীর চিঠি, অথচ লেখা অপরিচিত হাতের—অক্ষয়ের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। দুইমাস পূর্বেই টেলিগ্রাম পাইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীতে যাইয়াও সে তাহার মাতাকে জীবিতা দেখিতে পায় নাই—মায়ের মৃতদেহ পুত্রের অগ্নি-সংস্কারের অপেক্ষা করিয়াছিল। আবার আজ এ কি?

অক্ষয় কম্পিত-হস্তে পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। একটু পড়িয়াই অক্ষয়ের মুখ লজ্জায়, ঘৃণায় ও ক্রোধে যেন কেমন হইয়া গেল ; সে পত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

মিনিট দুই-তিন স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া সে পুনরায় পত্রখানি তুলিয়া লইল। পত্রখানিতে অল্প কয়েকটী কথাই লিখিত ছিল। যিনি পত্র লিখিয়াছেন, তিনি নাম প্রকাশ করেন নাই,—লিখিয়াছেন—"কোন আত্মীয়।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াও অক্ষয় হাতের লেখা চিনিতে পারিল না।

তাহার পর সে পকেট হইতে বাক্সের চাবী বাহির করিয়া পত্রখানি রাখিবার জন্য বাক্স খুলিল ; এবং বাক্স বোঝাই কাপড়-চোপড় তুলিয়া তাহার নীচে পত্রখানি রাখিয়া দিয়া বাক্স বন্ধ করিল, এবং তৎক্ষণাৎ ছাত্রাবাস্ হইতে বাহির হইয়া গেল।

হ্যারিসন-রোডের ডাকঘরে উপস্থিত হইয়া অক্ষয় বাড়ীতে পিতার নিকট টেলিগ্রাম করিল যে, সে বিশেষ কারণে অপরাহ্ণ ১টার লোকাল ট্রেনেই বাড়ী যাইতেছে ; স্টেশনে যেন পালকী-বেহারা উপস্থিত থাকে।

অক্ষয়ের যে গ্রামে বাড়ী, তাহার নাম—ঠিক নামটা না হয় না-ই বলিলাম—এই ধরিয়া লউন,—সে গ্রামের নাম রহিমপুর ; ইস্টইণ্ডিয়া রেলের শক্তিগড় স্টেশন হইতে এই গ্রাম তিন মাইল দূরে। অক্ষয়ের পিতা শ্রীযুক্ত রামকমল ঘোষ বর্ধমানরাজের একজন বড় পত্তনীদার। অবস্থা খুব ভাল। সন্তানের মধ্যে ঐ একই ছেলে অক্ষয়কুমার। অক্ষয় এম-এ পাশ করিয়া বি-এল পড়িতেছে। বড়মানুষের এম-এ পাশ, একমাত্র পুত্র—কিন্তু এখনও বিবাহ হয় নাই। লেখাপড়া একরকম শেষ না হইলে অক্ষয় বিবাহ করিবে না,—ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা। পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন কেহই সে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতে পারেন নাই। মায়ের অদৃষ্টে পুত্রবধূর মুখদর্শন ছিল না—তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। অক্ষয় কলিকাতার মেসে থাকিয়া আইন পড়িয়া জ্ঞান-সঞ্চয় করে, আর তাহার পিতা দেশে বসিয়া আইন-বিরুদ্ধ কাজ করিয়া অর্থ ও অধর্ম সঞ্চয় করেন ; পুত্র পিতার অন্যায় অত্যাচারের কথা শুনিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জন করে, আর পিতা সেই একমাত্র পুত্রের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য প্রজা-পীড়ন করিয়া কোম্পানীর কাগজে লোহার সিন্ধুক পূর্ণ করেন। অন্দর-মহলে ছেলে মায়ের কাছে কাঁদিত—মা ছেলের কাছে কাঁদিত ; কিন্তু কর্তাকে কোন কথা বলিতে কাহারও সাহসে কুলাইত না ;—রামকমল ঘোষ

তেমন বাপের বেটাই ন'ন যে, স্ত্রী-পুত্রের কথা শুনিয়া জমিদারী চালান। দুইমাস পূর্বে মাতা স্বর্গে গেলেন—ছেলের কাঁদিবার স্থানও থাকিল না। মাতার শ্রাদ্ধাদির পর অক্ষয় যখন কলিকাতায় আসে, তখন সে মনে-মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল যে, শীঘ্র আর বাড়ীতে যাইবে না। কিন্তু এই বেনামী চিঠি পাইয়া সে বাড়ী যাইতে প্রস্তুত হইল। চিঠিতে কি লেখা ছিল, তাহা যখন সে কাহাকেও বলিল না, তখন গল্প-লেখক সর্বজ্ঞ হইলেও সে কথা পাঠকগণের গোচর করা সঙ্গত মনে করিতেছেন না।

(২)

শক্তিগড় স্টেশনে নামিয়া অক্ষয় দেখিল বাড়ী হইতে পালকী-বেহারা আসিয়াছে ; সঙ্গে আসিয়াছে বাড়ীর বৃদ্ধ ভৃত্য কালিদাস। কালিদাস অক্ষয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাভাই, হঠাৎ এলে যে? শরীর ভাল আছে ত?"

অক্ষয় শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "শরীর ভাল আছে কালীদা! মনটা কেমন খারাপ ঠেকল ; তাই একবার তোমাদের দেখ্‌তে এলাম।"

কালিদাস অনেক কালের চাকর ; অক্ষয়কে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, অক্ষয়কে সে ভালরূপই চেনে। সে বলিল, "না, দাদাভাই, তোমার শরীর-মন দুই-ই খারাপ হয়েছে। বুড়োর কাছে গোপন করো না। তা এখন থাক্, চল বাড়ী যাই, তার পর সব শুনব।" এই বলিয়া অক্ষয়ের সঙ্গে-সঙ্গে সে স্টেশনের বাহিরে আসিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে ; বেহারারা লণ্ঠন জ্বালাইয়া লইল। একজন বলিল, "কালীদা, তুমি একটা লণ্ঠন নিয়ে পিছনে এস, আমরা একটা আলো নিয়ে চলে যাই।"

কালিদাস বলিল, "আমাকে আর ফেলে যেতে পারবি নে ; তোরা যত দৌড়েই যাস্ না কেন, কালিদাস তোদের সঙ্গে চলতে পারবে।" কালিদাস পালকীর সঙ্গে-সঙ্গেই চলিল। পালকী যখন গ্রাম পার হইয়া মাঠের মধ্যে পড়িল, তখন কালিদাস গলা ছাড়িয়া গান ধরিল—

"আমার মন কেন উদাসী হ'তে চায় ;
ওগো দরদী গো—।"

কালিদাসের এই করুণ সুর অক্ষয়ের হৃদয় স্পর্শ করিল ;—তাহার মনও যে আজ সত্য-সত্যই উদাসী হইতে চাহিতেছিল। কালিদাস কি তাহার মনের বেদনা বুঝিতে পারিয়াই এমন করুণ-সুরে ঐ গানটী গায়িতেছে? কালিদাস গায়িল—

"সে যে এমন করে দেয় গো মন্ত্রণা,
ও সে উড়ায়ে দেয় প্রাণের পাখী, মানা মানে না ;
সে যে উড়ে যায় বিমানেরি পথে,
শীতল বাতাস লাগে গায়।"

অক্ষয় পাল্‌কীর মধ্যে শয়ন করিয়া অতৃপ্ত-হৃদয়ে কালিদাসের গান শুনিতেছিল ; তাহার প্রাণ-পাখী আজ শীতল বাতাসের জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিল । কিন্তু সে শীতল বাতাস ত সে বাড়ী যাইয়া পাইবে না ;—আজ ত আর তার স্নেহময়ী জননী তাহার পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া নাই ;—আজ যে সে নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হইবার জন্য বাড়ী যাইতেছে!

কালিদাস গান শেষ করিয়া নীরব হইতেই একজন বেহারা বলিল, "ও কালীদা, আর একটা ভাল গান ধর না।"

কালিদাস বলিল, "আর গান-টান ভাল লাগে না ভাই!"

এই বলিয়াই সে গান ধরিল—

"রবে না দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন,
একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।

এতকাল করে খেলা, গেছে বেলা,

এই সন্ধ্যাবেলা আর কি হবে ;

জগতের কারণ যিনি, দয়ার খনি,

তিনিই মশায় ভরসা ভবে।"

অন্ধকার রাত্রি, মাঠ নির্জন ; তাহার পর কালিদাসের মধুর কণ্ঠস্বর ;—অক্ষয় আর পালকীর মধ্যে থাকিতে পারিল না ;—তাহার প্রাণের মধ্যে কেবলই ধ্বনিত হইতে লাগিল—

"ওরে, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।"

সে তখন বেহারাদিগকে পালকী থামাইতে বলিল। বাহকেরা পালকী নামাইলে সে বাহির হইয়া বলিল, "তোরা পালকী নিয়ে চল্, আমি কালীদার সঙ্গে একটু হাঁটি। ঐ ত গ্রাম দেখা যাচ্ছে, আমি এ পথটুকু হেঁটেই যেতে পারব।"

কালিদাস আপত্তি করল ; বাহকেরা বলিল, "কর্তা শুনলে রাগ করবেন।" অক্ষয় সে কথায় কর্ণপাত করিল না। বাহকেরা পালকী লইয়া অগ্রসর হইল।

তখন কালিদাস বলিল, "দাদাভাই, এখন বল ত, তুমি পড়া কামাই করে কেন হঠাৎ বাড়ী এলে। নিশ্চয়ই তোমার মনে কিছু আছে।"

অক্ষয় বলিল, "কালীদা, তোমার কাছে গোপন করব না, আমি বাবার একটা ব্যবস্থা করবার জন্য এসেছি।"

"বাবার ব্যবস্থা! তুমি কি পাগল হয়েছ দাদাভাই!"

"না কালীদা, আমি পাগল হইনি এখনও, কিন্তু হবারও দেরী নেই।"

"কেন, কি হয়েছে, আমাকে খুলেই বল না ভাই!"

অক্ষয় বলিল, "কালীদা, সে কথা বল্‌তেও আমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি কি বাবাকে জান না যে আমার মুখ দিয়ে পিতৃনিন্দা শুন্‌বে?"

কালিদাস বলিল, "তা হ'লে কথাটা তোমার কাছেও গিয়েছে! কে তোমাকে এসব কথা লিখেছে?"

"কে লিখেছে, তা জানিনে ; সে নাম প্রকাশ করে নাই। কি লজ্জা, কি ঘৃণার কথা কালীদা! কি আমার দুরদৃষ্ট! ছেলেকে বাপে শাসন করে এই ত এতদিন জানতাম ; আমার অদৃষ্টে তার উলটো হলো।"

কালিদাস বলিল, "তা কি করবে মনে করেছ? কর্তাকে ত জান ; আর তুমি কি-ই বা বল্‌বে তাঁকে? বল্‌তেই বা পারবে কেন? না দাদাভাই, ও-সব ব্যাপারের মধ্যে তোমার গিয়ে কাজ নেই। যার যা ইচ্ছে, সে তাই করুক। তুমি কালই কলকাতায় ফিরে যাও। যে দিন মা-লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন, সেইদিনই—আর সেই দিন-ই বা কেন, আমি অনেক আগে থেকেই সব জানি।"

অক্ষয় বলিল, "সে কি আর আমিই জানতাম না, কালীদা! কিন্তু মায়ের ভয়ে, তাঁরই অনুরোধে আমি চুপ করে ছিলাম। আর বাড়ীর মধ্যে যা হচ্ছিল, তা হচ্ছিল, এখন যে বাহিরে গেল। ছিঃ ছিঃ, কালীদা আমার যে মরতে ইচ্ছা করে।"

কালিদাস বলিল, "তা তুমি যে বাড়ী এলে, কি মতলব কোরে এসেছ বল দেখি। জান ত, কর্তার মেজাজ!"

"সব জানি কালীদা! কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, হয় বাবাকে কাশী যেতে হবে, আর না হয় ত আমার সঙ্গে চিরদিনের মত সম্বন্ধ ত্যাগ করতে হবে। এই দুইয়ের এক আমি করে যাবই।"

এই সময় তাহারা বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালিদাস অক্ষয়কে বলিল, "দেখ দাদাভাই, আমার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া হঠাৎ কোন কাজ করিও না। জান ত, তোমার বাবাকে। সাবধান।"

অক্ষয় কোন কথা না বলিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

(৩)

কর্তা রামকমল ঘোষ মহাশয় পুত্রের প্রতীক্ষায় বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। অক্ষয় বারান্দায় উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি কহিলেন, "তোমার কলেজ কি এরই মধ্যে বন্ধ হোলো অক্ষয়!"

অক্ষয় বলিল, "না, কলেজ বন্ধ হয় নাই। মনটা ভাল ছিল না, তাই একবার বাড়ীতে এলাম।"

"তা এসেছ, বেশ করেছ। তবে কলেজ কামাই করাটা বোধ হয় ভাল নয় ; পড়াশুনার বোধ হয় তাতে ক্ষতি হয়। তা হোক্ ; যখন এসেছ, তখন, আজ হোলো বৃহস্পতিবার, কাল-পরশু দুটো দিন থেকে রবিবার বোধ হয় কলকাতায় গেলেই ভাল হয়।"

অক্ষয় 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

সারারাত্রি অক্ষয় কত কথা ভাবিল ; সে মনে মনে যে পন্থা স্থির করিয়া আসিয়াছিল, বাড়ী আসিয়া ভাবিয়া দেখিল, তাহার কোনটাই অবলম্বন করা তাহার পক্ষে সম্ভবপরও নহে, কর্তব্যও নহে। কিন্তু সে যে এ অবস্থায় কি করিতে পারে, পিতাকে কুপথ হইতে ফিরাইবার জন্য কি করা যাইতে পারে, তাহা সে মোটেই ভাবিয়া পাইল না। সুধু নিজের উপরই তাহার ধিক্কার জন্মিতে লাগিল। আর মনে হইতে লাগিল তাহার সেই স্নেহময়ী, সাক্ষাৎ দেবীরূপিণী জননীর কথা। আজ তাহার মা বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার কাছে সে মনের বেদনা জানাইতে পারিত। এখন তাহার একমাত্র পরামর্শদাতা বৃদ্ধ ভৃত্য কালিদাস—তাহার পরম সুহৃদ কালীদা!

প্রাতঃকালে উঠিয়া অক্ষয়ের গৃহে মন টিকিল না। ইতিপূর্বে বাড়ী আসিয়া সে প্রায়ই গ্রামের কোথাও যাইত না। আজ তাহার কাছে বাড়িতে বসিয়া থাকা ভাল লাগিল না ; সে রাস্তায় বাহির হইল।

অল্পদূর যাওয়ার পর সে দেখিল যে, অলক্ষিত ভাবে সে পীতাম্বর ভট্টাচার্যের বাড়ীর সম্মুখেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভট্টাচার্য মহাশয় তখন পূজার ফুল তুলিবার জন্য সাজি-হস্তে বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন। অক্ষয় তাড়াতাড়ি বাড়ীর সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু সে ভট্টাচার্য মহাশয়ের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এই যে অক্ষয়, কবে বাড়ী এলে বাবা? শরীর ভাল আছে ত?"

অক্ষয় তখন কি করে, ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "আজ্ঞে কাল এসেছি।"

"হঠাৎ কি মনে করে বাড়ী এলে বাবা?"

অক্ষয় বলিল, "এমনি দুই-এক দিন ঘুরে যাবার জন্য এসেছি। রবিবারেই আবার কলিকাতায় ফিরে যাব।"

ভট্টাচার্য মহাশয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বাবা অক্ষয় ,তোমার সঙ্গে—" কথাটা অর্ধপথেই বন্ধ হইল। ভট্টাচার্য মহাশয় অতি কাতরনয়নে অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। সে চাহনিতে বিষাদমাখা ; সে চাহনি যেন একটু সহানুভূতিলাভের আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ!

ভট্টাচার্য মহাশয়কে এমন করিয়া কথাটা অসমাপ্ত রাখিতে দেখিয়া অক্ষয়ও কাতর হইল ; বুঝিতে পারিল, ভট্টাচার্য মহাশয় কেন অমন করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন, কেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন! রামকমল ঘোষের ছেলের সঙ্গে যে তাঁহার কি দরকার, তাহাও অক্ষয়ের বুঝিতে বাকী রহিল না। তাহার মনে হইল, কেন সে মূর্খের মত তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়াছিল? কেন সে প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া এ পথে আসিয়াছিল? অক্ষয় চুপ করিয়া

রহিল। সে কি বলিবে? তাহার কি কিছু বলিবার মুখ আছে?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন, "তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ অক্ষয়?"

অক্ষয় বলিল, "বিশেষ কোথাও নয়, এই একটু বেড়াতে বেড়িয়েছি।"

"তুমি রবিবারে কলকাতায় যাবে বল্‌ছিলে না?"

"আজ্ঞা, রবিবারেই যাব মনে করেছি।"

ভট্টাচার্য মহাশয় আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া থামিয়া থামিয়া বলিলেন—"তা—দেখ—এই যাবার আগে—নাঃ,—আর কাজ নেই। তুমি এখন যাও বাবা। আমারও বেলা হোলো। মা জগদম্বা!"

অক্ষয় এইবার আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; অতি সঙ্কোচের সহিত বলিল, "যাবার আগে কি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করবার কথা বলছেন?"

ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ— ;—না, তা আর কাজ নেই।"

ভট্টচার্য মহাশয়ের মলিন মুখ ও তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া অক্ষয়ের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে বলিয়া উঠিল, "আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না. আমি সব জানি, আমি—"

ভট্টাচার্য মহাশয় অক্ষয়ের কথায় বাধা দিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া "বাবা—" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; আর একটি কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

অক্ষয় তখন বলিল, "সে সব কথা আর আপনার ব'লে কাজ নেই। এখন বলুন ত, এর উপায় কি? আমি তারই জন্যই বাড়ী এসেছি।"

ভট্টাচার্য মহাশয় কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন, "আমি গরিব ব্রাহ্মণ, তোমরা বড়মানুষ, আমি কি বলব। কথাটা ত আর গোপন নেই ; আমি যে আর মুখ দেখাতে পারিনে বাবা! উপায়ের কথা বল্‌ছ? একমাত্র উপায় আছে। নিজের হাতে মেয়েটার মুখে বিষ তুলে দেওয়া। তা ছাড়া আর কোন পথ নেই ; তারপর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আমার আর ব্রাহ্মণীর আত্মহত্যা! বাবা, এ সংসারে ঐ বিধবা মেয়েটির মুখ চেয়েই আমরা বেঁচে ছিলাম। শেষে কি না এই হোলো। ব্রাহ্মণের মেয়ে—কি বলব বাবা! তোমরা গ্রামের জমিদার ; তোমরা গরিবের ধর্মরক্ষা করবে, না তোমরাই এমন কাজ করলে। অভিশাপ দেব না বাবা, কিন্তু বলতে পার, কি পাপে আমার এই শাস্তি।"

অক্ষয় বলিল, "তা বলতে পারিনে ; কিন্তু আপনারা উচিত প্রতিকার করলেন না কেন?"

ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন, "বাবা, তাতে কি হোতো ;—তাতে কি আমার এই জাতিনাশের প্রতিকার হোতো ; অপমান যে আরও বেড়ে যেত। না বাবা, সে দুর্মতি আমার হয় নাই।"

অক্ষয় বলিল, "বেশ। আমি কি করতে পারি, তাই বলুন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি তাই করব। এদেশে আর আমি মুখ দেখাব না ; বিষয়-সম্পত্তি কিছু আমি চাই না। আপনার জন্য কি করতে পারি, তাই বলুন ; সেই কাজ শেষ করে আমি জন্মের মত গ্রাম ছেড়ে চলে যাব।"

ভট্টাচার্য মহাশয় কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার অপরাধ কি বাবা, তুমি যে সোনারচাঁদ ছেলে। তুমি আমাদের জন্য তোমার পিতা—তোমার জন্মদাতাকে অপমান কোরো না। না বাবা, এমন কাজও কোরো না। জান ত আমাদের শাস্ত্রে আছে পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ।"

"ঠাকুর মশাই, আমার ধর্ম নাই, আমি স্বর্গও চাই না। সে দ্বার আমার কাছে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এমন পিতার পুত্র কিছুরই অধিকারী নয়।"

"তা হ'লে তুমি কি করতে চাও?"

"সেই কথাই ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।"

"আমি কি বল্‌ব বাবা!"

অক্ষয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "দেখুন, আমি এক কথা বলি। আপনি সপরিবার কাশী চ'লে যান। যা খরচ লাগে, আমি আজই আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। তারপর সেখানে আপনাদের যা ব্যয় হবে, সে সব আমি দেব।"

"বাবা অক্ষয়, মনে কিছু কোরো না। আমার কন্যাকে যে ধর্মপথভ্রষ্ট করেছে, তারই অর্থে আমি কাশীবাস করব ; সে আমি পারব না বাবা! সে কিছুতেই না।"

অক্ষয় বলিল, "তার অর্থ নয় ঠাকুর মশাই! আমার স্বোপার্জিত টাকা আছে। আমার পরীক্ষার জলপানির টাকা। তাই আমি আপনাকে দিতে চাচ্ছি। তবে আমি তাঁর পুত্র ; এই ব'লে যদি আপনি আমার সাহায্য না নিতে চান, তা হলে ত আর কোন উপায় দেখি না। কিন্তু আপনার পায়ে ধ'রে বলছি, আমার এই অনুরোধ রক্ষা করুন। পাপের সামান্য প্রায়শ্চিত্ত—অতি সামান্য প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে দিন।" এই বলিয়া অক্ষয় ভট্টাচার্য মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল।

অক্ষয় ও ভট্টাচার্য মহাশয় যখন কথাবার্তা বলিতেছিলেন. তখন অন্দরে যাইবার দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আর একজন তাঁহাদের কথা শুনিতেছিল। সে আর কেহই নহে—ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিধবা কন্যা তারা। তারা যে ঘরে ছিল, তাহার পশ্চাতে বহির্বাটীর অঙ্গনে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা হইতেছিল। তারা প্রথমে দুইচারিটি কথা অল্প শুনিতে পাইয়াছিল, তাহার পরই সে উঠিয়া আসিয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল।

অক্ষয় যখন ভট্টাচার্য মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল, তখন তারা উন্মাদিনীর মত বাহির হইয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "না,—না বাবা—না না, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করছি।" তাহার পরই সে মূৰ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল।

ভট্টাচার্য মহাশয় তাড়াতাড়ি যাইয়া কন্যাকে কোলে লইয়া বসিলেন ; দেখিলেন তাহার সংজ্ঞা নাই। অক্ষয় দৌড়িয়া বাড়ীর মধ্যে যাইয়া জল লইয়া আসিল এবং তারার মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিল। কিন্তু সকলই বৃথা। তারার ঘৃণিত, অভিশপ্ত প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য মহাশয় তারার মুখের দিকে চাহিয়া অবিচলিত স্বরে বলিলেন, "জীবনদানে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। সহস্র জীবন নরকভোগেও নয় তারা—কিছুতেই নয় ;—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।"

তারার অকস্মাৎ দেহত্যাগে অক্ষয় স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে একদৃষ্টিতে তারার দিকে চাহিয়া রহিল।

ভট্টাচার্য মহাশয় অক্ষয়কে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "বাবা অক্ষয়, আর কি দেখ্‌ছ, এখন বাড়ী যাও।"

অক্ষয় কাতরস্বরে বলিল "এ জীবনে আর নয়।"

"সে কি কথা অক্ষয়? তুমি বাড়ী যাবে না কেন?"

অক্ষয় বলিল, "আমার পাপেরও ত প্রায়শ্চিত্ত নেই।"

ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন, "তোমার পাপ! তুমি ত কোন অপরাধই কর নাই বাবা!"

অক্ষয় তীব্র কঠোর স্বরে বলিল, "অপরাধ করি নাই? আপনি কি বলছেন ঠাকুর? আমি মহা অপরাধী। আমার অপরাধ—আমি রামকমল ঘোষের পুত্র।—এ অপরাধেরও প্রায়শ্চিত্ত নেই।" এই বলিয়াই অক্ষয় উন্মাদের মত দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

* * *

তাহার পরে অক্ষয় যে কোথায় গেল, কেহই এত কালের মধ্যে সে সন্ধান দিতে পারিল না।

চৈত্র ১৩২৪

য়ীহুদী

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

(১)

নিস্তব্ধ মরুভূমি-পারে সূর্য ডুবে গেল। প্রাচীন ও অপরিচ্ছন্ন সহরটার মাথায় ধূলি ও সন্ধ্যার সোনালি আলোয় আঁজি দেওয়া একখানা ওড়না ধীরে বিছিয়ে যাচ্ছে।

"সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছে, আজকের মতন যাই।"

"রোজই এমনি কোরে চলে যাবে?" বোলে জুবেদা তার তপ্ত কোমল হাত দুখানি আমার কাঁধের ওপর রেখে বুকের কাছে আরও সরে এল।

"কিন্তু না গিয়ে উপায় কি?"

"রাতটাও যাতে থাকতে পার তার কি উপায় হ'ল?"

"চেষ্টা কোরছি—এমনি কোরে আর বিদায় নিতে হবে না বেশী দিন।"

এ কথায় তার ভরাট দীর্ঘ দেহটা আনন্দে ঢেউ খেলে উঠ্‌ল। সে পদ্মের মতন তার সজীব মুখখানাকে আমার ঠোঁটের দিকে তুলে ধরলে।

কিছুক্ষণ পরে যখন জুবেদাকে ছেড়ে বোগদাদের ধুলোভরা পথ দিয়ে আমাদের ছাউনির দিকে চলেছি, ততক্ষণে সন্ধ্যা একটু ঘোরালো হয়ে এসেছে। মনটা আমার তখন আনন্দে এমন ভরে উঠেছিল যে ইচ্ছে কোরছিল এই গোটা পৃথিবীটাকেই বুকের ভেতর খুব জোরে চেপে ধরি। আর আমার যা কিছু আছে, যদি কেউ এসে চায় ত সব বিলিয়ে দিই। ঠিক সেই সময় একটা ভিখারী আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। পকেটে আমার টাকা পাঁচেকের ওপর ছিল। সে হাত পাততেই একটা আধুলি দিয়ে দিলুম।

(২)

টাইগ্রিস নদী এঁকে-বেঁকে মরুপথে পারস্য উপসাগরের দিকে ছুটে চলেছে। তারি সরস তটের একটা খেজুর কুঞ্জে আমাদের ছাউনি। চারিপাশে দিগন্তের কোলে কোলে বিছানো শুষ্ক তপ্ত বিজন মরুভূমি। আমাদের ছাউনি থেকে প্রায় এক মাইল দূরে ছেলেবেলায় গল্পে শোনা এই বোগদাদ নগরী।

প্রায় আট মাস হয়ে গেছে আমরা এখানে এসেছি। এখানকার মতন জীবন্ত সৌন্দর্যের এমন প্রাচুর্য ও নিদারুণ অপচয় আর কোথাও দেখিনি। হয় ত মরুভূমি বোলেই এটা সম্ভব। এই আট মাসে এদের ভাষাটাকে এক রকম দুরস্ত কোরে নিয়ে, সৈনিকের নিয়ম ও নিষেধকে লঙ্ঘন কোরে, জুবেদার সঙ্গে গোপনে মিশে গেলাম। প্রতি সন্ধ্যায়ই তাকে এমনি কোরে ছেড়ে চলে আস্‌তে হয়! তার কারণ এরা আমাদের শত্রু। এদের সঙ্গে, বিশেষত এই গোলাপগুলির সঙ্গে আমাদের মিলন একেবারে নিষিদ্ধ। বিকেল ছটার পর সারা সহরে একটি আলো জ্বল্‌তে পাবে না, বা কারুর পথ দিয়ে চলবার হুকুম নেই! অন্ধকার রাতের মতন একটা দুর্ভেদ্য রহস্য নিয়েই অপরিচ্ছন্ন সহরটা পড়ে থাকে।

সেদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। তাম্বুর পর্দার ফাঁকে তারাভরা আকাশখানা ঝিকমিকিয়ে উঠ্‌ল। তার তলে ঘুমন্ত অসাড় সহরটার অস্পষ্ট ছায়া দেখতে পেলুম। মনে হ'ল, যেমন কোরেই হোক, এই সৈনিকের পোষাক খসিয়ে ফেলে,

কেরাণীগিরিতে ঢুকতেই হবে। না হলে জুবেদাকে কিছুতেই একেবারে আপনার কোরে পেতে পারি না। কোন্ দিন রক্তে লাল, কামানের নির্ঘোষ ও ধূমাচ্ছন্ন রণক্ষেত্রের মৃত্যু-কোলাহলে আমার কণ্ঠটি চিরদিনের মতন ডুবে যাবে, কে জানে!

পর দিন ঘুম ভাঙ্গতেই মতলব ঠাউরাতে লাগলুম কি কোরে আমার কাজটা শেষ করা যায়। যারা সৈনিকপদ ছেড়ে কেরাণীগিরিতে গিয়ে যোগ দিয়েছিল, তাদের কাছে পরামর্শ চাইলুম। কিন্তু তেমন কোন আশা কোথাও পেলুম না। তবু নিরাশ না হয়ে চেষ্টা কোরতে লাগলুম।

সেদিনও জুবেদা আমায় জিজ্ঞাসা কোরলে—"কতদূর?"

"ব্যস্ত কি?" কথাটা হয় ত নিজেকেই সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বল্লুম।

"না, এরকম কোরে চলবে না!" হঠাৎ তার গোলাপরাঙ্গা নরম গাল দুখানির ওপর দিয়ে চোখের জল নেমে এল! তার জলে-ভরা সরল চোখ দুটোতে চুমো দিয়ে, জল মুছিয়ে শান্ত করবার ছলে বল্লুম—"এ বাড়ীটা কিন্তু আমাদের ছাড়তেই হবে—"

"কেন, কোথায় যাবে?"

"ঐ যে রাস্তার শেষে নদীর দিকের বাড়ীটা—ঐটে আমরা নেব—কি বল?"

"বেশ ত ; কিন্তু দেরী কোরছ কেন?"

"তবে এস আমাদের বিয়েটা হয়ে থাক্—"

"এখন নয় ; কাজটা তোমার আগে শেষ হোক্—" কথাটা শেষ না কোরেই সে আমায় দুহাতে জড়িয়ে ধরে মুখের দিকে চাইলে। আমার একটা জায়গায় কেমন ব্যথা দিত—এই জন্যে যে, জুবেদার কাছে আমি অকপট হতে পারিনি। অর্থাৎ আমি ক্রীশ্চান না হয়েও নিজেকে তাই বোলে পরিচয় দিতে বর্তমানে খুবই বাধত।

সেদিন আসবার সময় আমারও তাকে ছেড়ে আস্‌তে খুব কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, যেন তার সঙ্গে সেই শেষ দেখা। তাই তাকে বুকের ভেতর নিবিড় কোরে ধরেও স্বোয়াস্তি পাচ্ছিলাম না! আর এ ভাবটা দিন কয়েক সারা মন জুড়ে লেগে রইল।

কিন্তু যখন এ মিথ্যা উদ্বেগের কোন কারণই আর আমাদের চোখে পড়ল না, আমরা দুজনে বেশ শান্ত হয়ে উঠলুম। দিনগুলি বেশ ভরপুর সুখে কেটে যেতে লাগল!

(৩)

হঠাৎ এক দিন তাম্বুতে ফিরে গিয়ে শুন্‌লুম, পর দিন ভোরে আমাদের সেখান থেকে যাত্রা কোরতে হবে। কোথায়, এক ছাড়া—তা আর কেউ বলতে পারে না। তবে খুব সম্ভব যেখানে লড়াই হচ্ছে সেইদিকে।

বিছানাটার ওপর চুপ কোরে বসে পড়লুম! বোগদাদকে, জুবেদাকে ছেড়ে যেতে হবে? কারুর সঙ্গে ভাল কোরে কথা না বলে রাতখানাকে একরকম জেগেই কাটিয়ে দিলুম।

পর দিন ভোর হতে না হতে চারিদিকে সাজ সাজ! এতদিনকার এতবড় একটা ছাউনি এক নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল। মরুভূমির ওপার থেকে সূর্য উঠ্‌তে না উঠ্‌তে আমরা সবাই প্রস্তুত। তার পর পথের লাল ধুলো উড়িয়ে আধঘুমন্ত সহরটার বুকের ভেতর দিয়ে সারে সারে আমরা চল্‌তে লাগলুম।

জুবেদাদের বাড়ীর নীচে দিয়ে চলেছি। হঠাৎ তাদের দোতলায় একটা জানালা খুলে গেল। চেয়ে দেখলুম—জুবেদার ঘুম-জড়ান মুখখানা তার ভেতর থেকে ভেসে উঠেছে। চোখাচোখি হতেই আমি ইসারায় জানিয়ে দিলুম—বিদায়! সে যেন কেমন বিস্মিত হয়ে উঠ্‌ল। তার পর ম্লান মুখে বিদায়ের বাণী নিয়ে আমার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল!

একটা মাস চলে গেছে। বোগদাদ থেকে বহু দূরে চলে এসেছি। কিন্তু কোথায় এসেছি, জুবেদা তা জানে না ; তাকে জানাবারও কোন উপায়ই তখন পাইনি।

একদিন সন্ধ্যা-বেলা বসে বসে ভাব্‌তে ভাব্‌তে হঠাৎ মনে হ'ল—যদি পালিয়ে যাই, দূরে—টাইগ্রিস পার হয়ে মরুভূমিকে পেছনে ফেলে রেখে পাহাড় পথে পথে জুবেদাকে সঙ্গে নিয়ে? ধরা পড়লে আমার শাস্তি হবে ; কিন্তু না পালিয়ে এখানে থেকে শাস্তির কম্‌তি ত কিছু হচ্ছে না! কার জন্যে আমি মরতে চলেছি? আমার প্রাণ দিলে কার গৌরব বাড়বে? আমার দেশের? আমার দেশ ত ঐ বোগদাদ, যেখানে জুবেদা থাকে! কিন্তু আমার মন কিছুতেই পালিয়ে যেতে সায় দিলে না ; আবার শান্তও হল না। সেইদিন থেকেই আমি পথঘাটের সব সন্ধান নিতে লাগলুম।

একজন রুষের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। পর দিন তার সঙ্গে দেখা হতেই কথার ছলে পথঘাটের খবর নিতে লাগলুম। সে তার দেশের এমন বর্ণনা কোরলে—বিশেষত গাঢ় নীল আকাশ-ছোঁয়া তুষারে ঢাকা ফুটফুটে সাদা ককেসাস পাহাড়মালা, ও তারি গায়ে শালের মতন জড়ান, পায়ের তলে কার্পেটের মতন বিছানো সবুজ ও গভীর বনের এমনি ছবি এঁকে আমার চোখের সবুজ ধরলে যে, আমি সেখানে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলুম। সে আরও বল্লে যে, পাহাড়ের কোল-ঘেঁসা অতবড় নীল সমুদ্রটা রয়েছে—তার কূলেও ত অনেকে আমার মতন এখান থেকে গিয়ে ছোট ছোট কুঁড়ে বেঁধে বাস করে। বনের হরিণ ও পাখী শিকার কোরে, সমুদ্রের নানান্‌ রকম ঝিনুক ও শামুক বিক্রী কোরে, সুখে স্বাধীন ভাবে দিন কাটায়।

"কিন্তু আমি যে সেখানে গিয়ে বাস কোরতে চাচ্ছি—এ কথা তুমি বলছ যে?"

"নাও হতে পারে—" বোলে সে ঠোঁটের কোলে একটা দুষ্টুমির হাসি নিয়ে চলে গেল। একটু বিস্মিত হয়ে পড়লুম! আমার মনের কথাটা লোকটা কি কোরে জান্‌তে পারলে? মনে হ'ল, হয় ত সে নিজেও এমনি ধরণের কাজ অনেকবার কোরেছে বা অন্য লোককে কোরতে দেখেছে। কাজেই ওর কাছ থেকে আমার ভয়ের কোন কারণ নেই।

তার পাঁচ দিন পরে দিনের আলো ফুটতে না ফুট্‌তে, রাইফেলটাকে ঘাড়ে ফেলে, টাকা-কড়ি যা ছিল সব সঙ্গে নিয়ে, বোগদাদের দিকে যাত্রা কোরলুম। ধরা পড়বার ভয়ে সৈনিকের পোষাকটা খসিয়ে আরবীয় বেশে চলেছি।

আমাদের নৌকাখানা টাইগ্রিসের খরস্রোতে দু'দিন ছুটে চলেছে। নদীর দুটি তীরে, খুব দূরে দূরে ছোট ছোট খেজুর-কুঞ্জ, লম্বা লম্বা মন্দিরের মতন "তুঁত" ফলের গাছ। তারি ছায়ায় কোথাও কোথাও সুস্থ কুসুম-কলির মতন দু'একটা আরবী কিশোরী একলাটি মেষ চরাচ্ছে! রবি-কর-তপ্ত মরুস্থলীর শুষ্ক বালি উড়িয়ে সারাদিন ধরে বাতাস হাহা কোরে ছুটে চল্‌ছে। আমি খুব সাবধানে চলেছি। কেন না এই নদীটির তীরে তীরে পাহারা।

আমি ভাবছিলাম—সেই দূর তুষারে-সাদা ককেসাসের পায়ের তলায় কৃষ্ণসাগরের তটে বন প্রান্তে জুবেদা আর আমি কত সুখে দিন কাটাচ্ছি! সে সুখের আর সীমা নেই! দুঃখটাও তার পায়ে এসে ঠেকে হাসির ঢেউ হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে! সেটা যেন আমাদের প্রেমটাকে আরও গাঢ় কোরে তুল্‌ছে। হঠাৎ আমার অজানিতে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—জুবেদা! নৌকাওয়ালারা একটু চম্‌কে উঠ্‌ল ; আমিও অপ্রস্তুত হয়ে নদীর ওপর দিয়ে পাল তুলে একখানা বিপরীতগামী নৌকার দিকে চোখ ফেরালুম! দেখলুম, একটা য়ীহুদী পুরুষের পাশে বসে একটি তরুণী য়ীহুদী আমাদের নৌকার দিকে, বিশেষ কোরে আমায় দেখে, মুখটা একটু ঢেকে, নৌকার আচ্ছাদনীর আড়ালে গিয়ে বসল। মেয়েটার লজ্জা দেখে আমার একটু হাসি এল ; আমিও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বসলুম। কিছুক্ষণ পরে ফিরে দেখলুম

—নদীর বাঁকের আড়ালে তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময়ে একজন সৈনিক হাত তুলে আমাদের থামতে বল্লে। আমি নৌকোওয়ালাকে চালাতে বলে রাইফেলটা হাতে তুলে নিলুম। প্রাণ দেব তবু ধরা কিছুতেই দেব না। সে লোকটাও তার রাইফেলটা বাগিয়ে ধরলে, কিন্তু খুব কাতর সুরে বল্লে—"বড় বিপন্ন।" অবশেষে নৌকো ভিড়িয়ে, সন্দেহ সত্ত্বেও তাকে তুলে নিলুম। কিছুদূর গিয়ে দুজনের বেশ ভাব হয়ে গেল। শুনলুম, সেও আমারই মতন পলাতক। বোগদাদের আগেই নেমে যাবে—তার বেশী আর কিছু বল্লে না।

পর দিন—প্রায় বেলা শেষাশেষি—বোগদাদের সেই খেজুর-কুঞ্জ চোখে পড়ল! আমরা দুজনেই সেখানে নৌকো থেকে নেমে পড়লুম। সে একটা আরব পল্লীর দিকে চলে গেল—আমি ভয় ও আশা-আনন্দ বুকে নিয়ে বোগদাদের দিকে ছুট্‌তে লাগলাম।

সহরে ঢুকে কোন কিছুর দিকে না চেয়ে একেবারে সোজা এসে তাদের বাড়ীর ভেতর দাঁড়িয়ে ডাকলুম—

"জুবেদা—"

তার ভাই বেরিয়ে এল। আমায় দেখে খুবই একটু বিস্মিত হয়ে একটু পরে বল্লে—

"জুবেদা তার স্বামীর সঙ্গে তিন দিন আগে টাইগ্রিস দিয়ে ইউরোপ যাত্রা কোরেছে।"

"স্বামী—? ইউরোপ—?" আমি অবসন্ন দেহে দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়ালুম। তারা দুটিতে আজ অফুরন্ত সুখের আশায় পথে কেবলই চলেছে—আর আমার মাথার ওপর শাস্তির কঠিন উদ্যত দণ্ড!

কার্তিক ১৩৩১

শিউলি

হেমেন্দ্রকুমার রায়

(ক)

নীলিমা ঢাকিয়া যখন সজল বাদলে কাজল-মেঘের ঘোরঘটা পড়িয়া যায়, কাল আকাশ তখন আপন বুক চিরিয়া মাঝে-মাঝে ক্ষণিক আলো দেখায় কেন? সে জানাইয়া দেয় যে, এই অকাল-সাঁঝে অন্ধকারই তাহার যথাসর্বস্ব নহে! অন্ধকারের ভিতর হইতেও যে আলো ফুটিতে পারে, সব-সময়ে এটা আমরা মনে না রাখিয়া প্রকৃতির উপরে কঠিন অবিচার করি।

—আরম্ভটা ঠিক গল্পের মত শুনাইতেছে না। কিন্তু জীবনের সব গল্প ঘটনার গল্প নয়; সুতরাং আরম্ভেই পাঠককে রোমাঞ্চিত করা চলে না।

যার কথা বলিব, তার নাম শিউলি। সে ঘৃণিতা পতিতা। সকলের মৌখিক প্রেমে ও আন্তরিক অবজ্ঞায়, সংসারের সাগর-সৈকতে বালুকার ঘর বাঁধিয়া সে চঞ্চল-যৌবনের দ্রুত দিনগুলি গুণিয়া গুণিয়া দীর্ঘশ্বাসে কাঁপিয়া উঠিত!

তাহার 'দেবতাকে কেহ ত চাহে' নাই! মাটীর ঢেলায় তাহার আত্মার বেদী ঢাকা। পঙ্কিল রূপের ঘৃণ্য আবর্জনা সরাইয়া তাহার আত্মার মাঝে দেবতার গোপনবাণী কেহ শুনিয়াছে কি—'আমি আছি, আমি আছি!'—কেহ না, কেহ না!—"হরিনাম ব্যর্থ নয় গণিকারো মুখে" এ কবির বাণী—সমাজের নয়।

হায় এ জীবনের ভ্রম-প্রমাদ! রত্ন এখানে তত সহজে পুঞ্জীভূত হয় না—জঞ্জাল যত সহজে হয়।

(খ)

পৃথিবীতে দুইদল বড়মানুষের নাম শোনা যায়। অমুক চার পয়সার সম্বল হইতে লক্ষপতি হইয়াছিলেন, আর অমুক বিড়ালের বিবাহে লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছিলেন।

বিলাসচন্দ্র দ্বিতীয় শ্রেণীর 'অমুকে'র দলে। এবারে পশ্চিমে যাইবার সময়ে শিউলিকে সে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

তীর্থে-তীর্থে ঠাকুর দেখিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবার ইচ্ছা, ভাল-মন্দ সকল নারীর মনেই প্রবল থাকে। কাশীধামে আসিয়া শিউলির প্রাণ তাই পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, নরক ছাড়িয়া আজ যেন সে সশরীরে স্বর্গে আসিয়া উপস্থিত।

পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিয়া সে গঙ্গাস্নানের জন্য বাহির হইল। শিউলির আগ্রহ বেশী—সে আগে-আগে যাইতে লাগিল, পিছনে-পিছনে বিলাসচন্দ্র। শিউলির অঙ্গের অলঙ্কার পুষ্পিত যৌবনের চঞ্চল রাগিনীর মত বড় মধুর-মধুর বাজিতেছে! তাহার লঘু গমন-ভঙ্গী দেখিলে মনে হয়, যেন প্রথম বসন্তের মলয় সমীর আজ এখানে মূর্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে! শিউলির চরণতালে বিলাসচন্দ্রের প্রাণ উঠিতে ও নামিতে লাগিল।

রাস্তার লোকে মুগ্ধ হইয়া শিউলির দিকে তাকাইয়া রহিল। কেহ-কেহ চোখ নাড়িয়া ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িল না। এ-রকম ইঙ্গিত শিউলি আগেও অনেকবার দেখিয়াছে; কিন্তু আজ, এখানে, সে ইহার প্রত্যাশা করে নাই। আজ সে চলিয়াছে বিশ্বদেবতার দুয়ারে,

নতশিরে, পূজারিণীর বেশে ;—কাহারও চিত্ত তৃষিত করিবার জন্য সে ত কোনরকম হাব-ভাবের শরণ লয় নাই! রাজপথ দিয়া আরও কত রূপসী কুলকামিনী চলিয়াছেন ; এ হতভাগারা তাঁহাদের দিকে চাহিয়া ত এমন ইঙ্গিত করিতে ভরসা পাইতেছে না! তবে? বিধাতা তাহার মুখে এমন কি ভয়ানক অভিশাপের ছাপ মারিয়া দিয়াছেন যে, সে লুকাইতে গেলেও ধরা পড়িয়া যায়? শিউলির গতি সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। একবার পিছনপানে চাহিয়া দেখিল, বিলাসচন্দ্র আসিতেছে কি না?—দেখিল, বিলাসচন্দ্র দেমাকে ডগমগ হইয়া রাস্তার সেই অসভ্য লোকগুলার দিকে চাহিয়া মৃদু-মৃদু হাসিতেছে। শিউলি সে হাসির মানে বুঝিল। সে হাসি যেন সকলকে বলিতে চায়, 'হুঁ, হুঁ ; দেখ দেখ—কি দুর্লভ রত্নের মালিক আমি, দেখ!'

অত্যন্ত আহত হইয়া শিউলি আপন মুখে ঘোমটা টানিয়া দিল।

(গ)

গঙ্গাজলে ডুব দিয়া শিউলির মনে হইল, তাহার সারা জীবনের ময়লা-মাটী যেন একেবারে ধুইয়া গেল। সাদা জলে একটি গোলাপী পদ্মের মত শিউলি অনেকক্ষণ আনমনে বসিয়া রহিল,—ছোট ছোট ঢেউ আসিয়া তাহার কটিতট চুম্বন করিয়া, মধুর কলহাস্যে উছলিয়া উছলিয়া উঠিতে লাগিল। ওপারের ঐ ধবল বালুতটে, যেখানে দীপ্ত নীলিমার তলায় ভোরের রৌদ্র ঝিক্‌মিকে সোনার ফুল ফুটাইতেছিল, শিউলির চোখ যেন সেখান হইতে কিছুতেই ফিরিতে চাহিতেছিল না। ওপারের ঐ বিজন গঙ্গাতটে, সবুজ গাছের শীতল ছাওয়ায়, একখানি কুঁড়েঘর বাঁধিয়া সব ছাড়িয়া, যদি এক্‌লাটি বসিয়া-বসিয়া কাশীধামের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া—কেবল চাহিয়া থাকিতে পারা যায়, তাহা হইলে সে কেমন সুখের হয়!"

শিউলি বসিয়া-বসিয়া এমনি সব নানান কল্পনা করিতেছে, হঠাৎ ঘাট হইতে বিলাসচন্দ্র ডাকিয়া বলিল, "কিগো, ঘাট থেকে আজ কি আর বাড়ী ফিরবে না—ব্যাপার কি বল দেখি?"

শিউলি চমকিয়া বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ—এই যাই!"—বলিয়া কাপড়খানা তাড়াতাড়ি কাচিয়া লইয়া উপরে উঠিল।

বিলাসচন্দ্র একেবারে শিউলির গা-ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া ঘাটের দু-চারজন লোক অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। শিউলি তাহা লক্ষ্য করিয়া বিলাসচন্দ্রকে বলিল, "রাস্তার মাঝখানে ও কি কর! তুমি পাছে-পাছে আলাদা হয়ে এস। আমি এখন মন্দিরে যাব।"

বিলাসচন্দ্র বলিল, "এত বেলায় মন্দিরে! সে এবেলা নয়, ওবেলা হবে এখন।"

শিউলি বলিল, "সে কি হয় গা! গঙ্গা-নেয়ে শুদ্ধ হলুম, এখন মন্দিরে যাব না ত আবার কখন্ যাব? চিরকালটা পাপই করে আস্‌ছি, ঠাকুর-দেবতার জন্যে একদিন না হয় একটু কষ্টস্বীকার-ই করলুম—তাতে ত আর মরে যাব না!"

বিলাসচন্দ্র অস্ফুট, বিরক্ত স্বরে কহিল, "যার যত পাপ, পুণ্যের দিকে তার টান্ তত বেশী!"

শিউলির মুখ প্রথমে বিবর্ণ—তারপর রাগে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। যেখানে ব্যথা সেইখানেই লাগে। খানিকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ সে উদ্ধতস্বরে বলিল, "তোমার যদি অসুবিধে হয় তুমি বাসায় আগে ফিরে যাও। মন্দির হয়ে আমি পরে যাচ্ছি।"

বিলাসচন্দ্র হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, "কি মুস্কিল, ঠাট্টা বোঝ না! চল চল, কোথায় যাবে চল!"

(ঘ)

মন্দিরে ঢুকিবার আগে শিউলি আঁচল ভরিয়া বেলপাতা আর পূজার ফুল কিনিল।

তখন দুর্গাপূজার ছুটি। বিশ্বনাথজীর মন্দিরে যাত্রীর বড় ভিড়।

চারিদিক্ হইতে দেবাদিদেব মহাদেবের চরণোদ্দেশে ভক্তদের গদগদ কণ্ঠের জয়গাথা ধ্বনিয়া উঠিতেছে ;—কেহ ডাকিতেছে 'জয় বাবা বিশ্বনাথ!'—কেহ বলিতেছে 'কাশীনাথজী কী জয়!'—কেহ বলিতেছে 'জয় শিব শম্ভো!'—নানাজাতি নানাভাষায়, নানাস্বরে, সেই একই দেবতাকে একপ্রাণে ডাকিয়া হৃদয়ের গোপন কামনা নিবেদন করিতেছে—কেহ কাহাকেও জানে না, চিনে না, কিন্তু সকলেরই মনের কথা এক—কি পাপী, কি পুণ্যবান্!

ঘনঘন ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে গম্ভীর স্তোত্রপাঠ ও পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ শুনিতে-শুনিতে, শিউলি অভিভূত প্রাণে অঙ্গন পার হইয়া বিশ্বনাথের মূর্তির সুমুখে গিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার তিক্ত, বিস্বাদ জীবনের মাঝে হঠাৎ আজ এ কি অজানা আনন্দের মধুর ফোয়ারা ফুটিয়া উঠিল—এ অমৃতের অজস্রধারায় শিউলির প্রাণ গলিয়া যায় যে, গলিয়া যায়!

তাহার সেই ভক্তিভরা, নতজানু, যুক্তকর মূর্তি আজ চিত্রের মত স্থির, সুন্দর, অপূর্ব!

কে এক ভক্ত একতারা বাজাইয়া, অঙ্গনে নাচিয়া-নাচিয়া গায়িতেছিল—

"—বাবা, ভক্তিতে ভুলে
সেটা, যাই-না ভুলে—
বাবাকে তুষ্ব দুটো বিল্বদলে—"

সে গান শিউলির প্রাণকে স্পর্শ করিল।

সেইখানে দুই চোখ মুছিয়া বসিয়া শিউলি, ঠাকুরের পায়ে আপনার কলঙ্কিত জীবনের কোন্ কামনা জানাইল, তা বলিতে পারি না ; কিন্তু তাহার চোখ ছাপিয়া, গাল বহিয়া, ঝর-ঝর-ঝর অশ্রু ঝরিতে লাগিল—সে বুঝি অনুতাপের পবিত্র অশ্রু! সে অশ্রু-ধারার সঙ্গে-সঙ্গে তার হৃদয়ের সকল কলঙ্ক ধুইয়া বাহির হইয়া আসিল। ঠাকুরকে এমন করিয়া আর কখনও সে ডাকিতে পারে নাই ; আজ এই মহাতীর্থে, অপূর্ব স্থান-মাহাত্ম্যে, নিখিল ভক্তের নিখিল যাচ্না একত্র হইয়া তাহার চিত্তেও যেন ভক্তির জোয়ার বহাইয়া দিতেছে।

দেবমূর্তির সুমুখে প্রতিমার মত স্থির হইয়া শিউলি যে কতক্ষণ বসিয়া রহিল, তা সে জানে না ; হঠাৎ বিলাসচন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া টানিল।

কিন্তু শিউলির আত্মা তখন অন্য লোকে—সে নিঃসাড় হইয়াই বসিয়া রহিল।

বিলাসচন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া আরও জোরে নাড়া দিয়া অধীর স্বরে বলিল, "কি, ফিরতে কি হবে না?"

শিউলি ফিরিয়া বিলাসচন্দ্রের মুখের দিকে নিদ্রোত্থিতের মত চাহিয়া দেখিল। তাহাকে দেখিবামাত্র শিউলির আবার আপনাকে মনে পড়িল এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে তাহার দৃষ্টিতে কি গভীর একটা ব্যথার আভাস ফুটিয়া উঠিল!

কাতরস্বরে থামিয়া-থামিয়া সে বলিল, "কি, কি-বল্‌চ—তুমি?"

বিলাসচন্দ্র ব্যঙ্গের সহিত বলিল, "বলি, অতিভক্তি চোরের লক্ষণ যে! ক্ষিদেয় পেট আমার বাপান্ত কর্‌ছে—এদিকে ওঁর পূজো—না মাথামুণ্ডু—শেষ আর হয় না। নাও, ওঠ!"

বিলাসচন্দ্র আবার শিউলির দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করিল। শিউলির সমস্ত বুকটা ভরিয়া বিদ্রোহের একটা ঝড় বহিয়া গেল। সে কি একটা শক্ত কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সকলে তাহাদের দিকে কৌতূহলী ও বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া, সে আপনাকে সাম্‌লাইয়া নীরবে আবার দেবমূর্তির দিকে ঘুরিয়া বসিল।

ঠোঁট কাম্‌ড়াইয়া বিলাসচন্দ্র বলিল, "কি, কথা কইলে না যে!"

শিউলি চুপ।

বিলাসচন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া সজোরে একটা টান্ মারিয়া বলিল, "ওঠ, ওঠ বল্‌ছি।"

সাপ যেমন করিয়া ফণা তোলে, বিলাসচন্দ্র তাহার গায়ে হাত দিবামাত্র শিউলি তেমনি করিয়া ঘাড় তুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। কঠিন, তীব্রস্বরে বলিল, "কে, কে তুমি? চলে যাও এখান থেকে!"

তাহার কণ্ঠস্বরে ঘরশুদ্ধ লোক চমকিয়া উঠিল। একজন পাণ্ডা এতক্ষণ দূরে বসিয়া তাহাদের দুজনের হাবভাব খরচোখে লক্ষ্য করিতেছিল। গোলযোগ দেখিয়া এখন সে আগাইয়া আসিল। শিউলিকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, মায়ী?"

বিলাসচন্দ্র তাহার বলিষ্ঠ দেহের দিকে তাকাইয়া ভয়ে ভয়ে কহিল, "কিছু হয় নি। এ আমার স্ত্রী, সঙ্গে যেতে চাইছে না।"

শিউলি তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, "ও আমার কেউ নয়। আমার গায়ে ও হাত দিয়েছে—আমি ওকে চিনি না!"

পাণ্ডা হুঙ্কার দিয়া উঠিল। বিশ্বনাথজীর মন্দিরে মহিলার অপমান! একটি কথা না কহিয়া বিলাসচন্দ্রের গলা ধরিয়া সে এক ধাক্কা মারিল,—বিলাসচন্দ্র লাট্টুর মত ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে আঙ্গিনায় ঠিক্‌রিয়া পড়িল। তারপর, আপনাকে সাম্‌লাইতে না সাম্‌লাইতে সে দেখিল, ক্রুদ্ধ মহিষের মত পাণ্ডা আবার তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে! পলক-না পালটিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ততক্ষণে শিউলি আবার হাতদুটি যোড় করিয়া, আঁচল-গলায় জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়াছে—তাহার নতনেত্রে গভীর আনন্দের পবিত্র আভাস!

বৈশাখ ১৩২৩

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

পরশুরাম

১। আদিকাণ্ড

মাঘ মাস, ১৩২৬ সাল। এই মাত্র আর্মানি গির্জার ঘড়িতে বেলা এগারটা বাজিয়াছে। শ্যামবাবু চামড়ার ব্যাগ হাতে ঝুলাইয়া জুডাস্ লেনের একটি তেতলা বাটীতে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীটি বহু পুরাতন,—ক্রমাগত চূন ও রংএর প্রলেপে লোলচর্ম কলপিত-কেশ বৃদ্ধের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। নীচের তলায় অন্ধকারময় মালের গুদাম। উপরতলায় সম্মুখভাগে অনেকগুলি ব্যবসায়ীর অফিস, পশ্চাতে বিভিন্ন জাতীয় কয়েকটি পরিবার পৃথক-পৃথক অংশে বাস করেন। প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখেই তেতলা পর্যন্ত বিস্তৃত কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশের দেওয়াল আগাগোড়া তাম্বুলরাগচর্চিত,—যদিও নিষেধের নোটিস লম্বিত আছে। কতিপয় নেংটে ইন্দুর ও আরসোলা পরস্পর অহিংস ভাবে স্বচ্ছন্দে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। ইহারা আশ্রম-মৃগের ন্যায় নিঃশঙ্ক,—সিঁড়ির যাত্রীগণকে গ্রাহ্য করে না। অন্তরালবর্তী সিন্ধি পরিবারের রান্নাঘর হইতে নির্গত হিংএর তীব্র গন্ধের সহিত নরদমার গন্ধ মিলিত হইয়া সমস্ত স্থান আমোদিত করিয়াছে। অফিসসমূহের মালিকগণ তুচ্ছ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিয়া, কেনা-বেচা, তেজী-মন্দী, আদায়-উসুল ইত্যাদি মহৎ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দিন যাপন করিতেছেন।

শ্যামবাবু তেতলায় উঠিয়া একটি ঘরের তালা খুলিলেন। ঘরের দরজার পাশে কাষ্ঠফলকে লেখা আছে—'ব্রহ্মচারী এণ্ড ব্রাদারইন্‌ল, জেনারেল মার্চেন্টস্।' এই কারবারের স্বত্বাধিকারী স্বয়ং শ্যামবাবু (শ্যামলাল গাঙ্গুলী) এবং তাঁহার শ্যালক বিপিন চৌধুরী, বি-এস্‌সি। ঘরে কয়েকটি পুরাতন টেবিল, চেয়ার, আলমারী প্রভৃতি অফিস-সরঞ্জাম। টেবিলের উপর নানা প্রকার খাতা, বিতরণের জন্য ছাপানো বিজ্ঞাপনের স্তূপ, একটি পুরাতন থ্যাকার্স ডিরেক্টরি, একখণ্ড ইণ্ডিয়ান কম্পানিজ য়্যাক্ট্, কয়েকটি বিভিন্ন কোম্পানির নিয়মাবলি বা articles, এবং অন্যবিধ কাগজপত্র। দেওয়ালে সংলগ্ন তাকের উপর কতকগুলি ধূলি-ধূসর কাগজমোড়া শিশি এবং শূন্যগর্ভ মাদুলী। এককালে শ্যামবাবু পেটেণ্ট ও স্বপ্নাদ্য ঔষধের কারবার করিতেন, এগুলি তাহারই নিদর্শন।

শ্যামবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি,—গাঢ় শ্যামবর্ণ, কাঁচা-পাকা দাড়ি,—আকণ্ঠলম্বিত কেশ, স্থূল লোমশ বপু। অল্পবয়স হইতেই তাঁহার স্বাধীন ব্যবসায়ে ঝোঁক ; কিন্তু এ পর্যন্ত নানাপ্রকার কারবার করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। ই-বি-রেলওয়ে অডিট অফিসের চাকরীই তাঁহার জীবিকা-নির্বাহের প্রধান উপায়। দেশে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি এবং একটি জীর্ণ কালীমন্দির আছে ; কিন্তু তাহার আয় সামান্য। চাকরীর অবকাশে ব্যবসায়ের চেষ্টা করেন,—এ বিষয়ে শ্যালক বিপিনই তাঁহার প্রধান সহায়। সন্তানাদি নাই, কলিকাতার বাসায় পত্নী এবং শ্যালক সহ বাস করেন। ব্যবসায়ের কিছু উন্নতি হইলেই চাকরী ছাড়িয়া দিবেন, এইরূপ সংকল্প আছে। সম্প্রতি ছয় মাসের ছুটি লইয়া, নূতন উদ্যমে 'ব্রহ্মচারী এণ্ড ব্রাদারইন্‌ল' নামে অফিস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্যামবাবু ধর্মভীরু লোক, পঞ্জিকা দেখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন এবং অবসর মত তান্ত্রিক সাধনা করিয়া থাকেন। বৃথা—অর্থাৎ ক্ষুধা না থাকিলে—মাংস ভোজন, এবং অকারণে

কারণ পান করেন না। কোন্ সন্ন্যাসী সোনা করিতে পারে, কাহার নিকট দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ বা একমুখী রুদ্রাক্ষ আছে, কে পারদ ভস্ম করিতে জানে, এ সকল সন্ধান প্রায়ই লইয়া থাকেন। কয়েক মাস হইতে বাটীতে গৈরিক বাস পরিধান করিতেছেন এবং কতকগুলি অনুরক্ত শিষ্যও সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্যামবাবু আজকাল মধ্যে-মধ্যে নিজেকে 'শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী' আখ্যা দিয়া থাকেন ; এবং অচিরে এই নামে সর্বত্র পরিচিত হইবেন, এরূপ আশা করেন।

শ্যামবাবু তাঁহার অফিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া, 'একটি সার্ধ-ত্রিপাদ ইজিচেয়ারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ডাকিলেন—"বাঞ্ছা, ওরে বাঞ্ছা।" বাঞ্ছা শ্যামবাবুর অফিসের বেহারা,—এতক্ষণ পাশের গলিতে টুলে বসিয়া ঢুলিতেছিল,—প্রভুর ডাকে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল। শ্যামবাবু বলিলেন, "গঙ্গাজলের বোতলটা আন্—আর খাতাপত্রগুলো একটু ঝেড়ে-মুছে রাখ্, যা ধুলো হয়েচে।" বাঞ্ছা একটা তামার কুপী আনিয়া দিল। শ্যামবাবু তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক লইয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক গৃহমধ্যে ছিটাইয়া দিলেন। তার পর টেবিলের দেরাজ হইতে একটি সিন্দূরচর্চিত রবার স্ট্যাম্পের সাহায্যে ১০৮ বার দুর্গানাম লিখিলেন। স্ট্যাম্পে ১২ লাইন 'শ্রীশ্রীদুর্গা' খোদিত আছে ; সুতরাং ৯ বার ছাপিলেই কার্যোদ্ধার হয়। এই শ্রমহারক যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা শ্রীমান বিপিন। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন—'দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ' এবং পেটেন্ট লইবার চেষ্টায় আছেন।

উক্ত প্রকার নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া, শ্যাম বাবু প্রসন্নচিত্তে ব্যাগ হইতে ছাপাখানার একটি ভিজা প্রুফ বাহির করিয়া লইয়া সংশোধন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জুতার মশ্-মশ্ শব্দ করিতে-করিতে অটল বাবু ঘরে আসিয়া বলিলেন—"এই যে শ্যামদা, অনেকক্ষণ এসেচেন বুঝি? বড় দেরী হয়ে গেল,—কিছু মনে করবেন না,—হাইকোর্টে একটা মোশন ছিল। ব্রাদারইন্‌ল কোথায়?"

শ্যাম বাবু।—বিপিন গেছে বাগবাজারে তিনকড়ি বাঁড়ুয্যের কাছে। আজ পাকা কথা নিয়ে আসবে। এই এল বলে।

অটল বাবু চাপকান-চোগাধারী সদ্যজাত এটর্ণি। পিতার অফিসে সম্প্রতি জুনিয়ার পার্টনার রূপে যোগ দিয়াছেন। গৌরবর্ণ, সুপুরুষ,—বিপিনের বাল্যবন্ধু। বয়সে নবীন হইলেও চাতুর্যে পরিপক্ক। জিজ্ঞাসা করিলেন—"বুড়ো রাজি হ'ল? আচ্ছা ওকে ধরলেন কি করে?"

শ্যাম।—আরে তিনকড়ি বাবু হলেন গে শরতের খুড়শ্বশুর। বিপিনের মাস্তুতো ভাই শরৎ। ঐ শরতের সঙ্গে গিয়ে তিনকড়ি বাবুকে ধরি। সহজে কি রাজি হয়? বুড়ো যেমন কঞ্জুষ, তেম্‌নি সন্দিগ্ধ। বলে—আমি হলুম রায় সাহেব, রিটায়ার্ড ডেপুটি, গবরমেণ্টের কাছে কত মান। কোম্পানির ডিরেক্টার হয়ে কি শেষে পেন্‌শন খোয়াব? তখন নজীর দিয়ে বোঝালুম—কত রিটায়ার্ড বড় বড় অফিসার ত ডিরেক্টরি কচ্ছেন,—আপনার কিসের ভয়? শেষে যখন শুনলে যে, প্রতি মিটিংএ ৩২্ টাকা ফি পাবে, তখন একটু ভিজ্‌ল।

অটল।—কত টাকার শেয়ার নেবে?

শ্যাম।—তাতে বড় হুঁসিয়ার। বলে—তোমার ব্রহ্মচারী কোম্পানি যে লুঠ করবে না, তার জামিন কে? তোমরা শালা-ভগ্নিপতি মিলে ম্যানেজিং এজেণ্ট হয়ে কোম্পানিকে ফেল কর্‌লে, আমার টাকা কোথায় থাকবে? বল্লুম—মশায়, আপনার মত বিচক্ষণ সাবধানী ডিরেক্টর থাকতে কার সাধ্য লুঠ করে। খরচপত্র ত আপনাদের চোখের সামনেই হবে। ফেল হতে দেবেন কেন? মন্দটা যেমন ভাবচেন, ভালর দিকটাও দেখুন। কি রকম লাভের ব্যবসা। খুব কম করেও যদি ৫০ পারসেণ্ট ডিভিডেণ্ড পান, তবে দু'বছরের মধ্যেই ত আপনার ঘরের টাকা ঘরে ফিরে এল। শেষে অনেক তর্কাতর্কির পর বল্লে—আচ্ছা, আমি শেয়ার নোবো, কিন্তু বেশী নয় ; ডিরেক্টর হতে হ'লে যে টাকা দেওয়া দরকার, তার বেশী

দোবো না। আজ মত স্থির করে জানাবেন ; তাই বিপিনকে পাঠিয়েচি।

অটল।—অমন খুঁতখুঁতে লোক নিয়ে ভাল করলেন না শ্যামদা। আচ্ছা, মহারাজাকে ধল্লেন না কেন?

শ্যাম।—মহারাজকে ধর্‌তে বড় শিকারী চাই,—তোমার আমার কর্ম নয়। তা'ছাড়া, পাঁচ ভূতে তাঁকে শুষে নিয়েচে,—কিছু আর পদার্থ রাখে নি।

অটল।—খোট্টাটা ঠিক আছে ত? আস্‌বে কখন?

শ্যাম।—সে ঠিক আছে, এই রকম দাঁও মারতেই ত সে চায়। এতক্ষণ তার আসা উচিত ছিল। প্রস্‌পেক্টস্‌টা তোমাদের শুনিয়ে আজই ছাপাতে দিতে চাই। তিনকড়ি বাবুকে আসতে বলেছিলুম,—বাতে ভুগছেন, আস্‌তে পারবেন না জানিয়েচেন।

২। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

"রাম রাম বাবুসাহেব"!

আগন্তুক মধ্যবয়স্ক, শ্যামবর্ণ, পরিধানে সাদা ধুতি, লম্বা কাল বনাতের কোট, পায়ে বার্নিস-করা জুতা, মাথায় পীতবর্ণ ভাঁজকরা মখমলের পাগড়ি, হাতে অনেকগুলি আংটি, কানে পান্নার মাকড়ি, কপালে ফোঁটা।

শ্যাম বাবু বলিলেন—"আসুন, আসুন—ওরে বাঞ্ছা আর একটা চেয়ার দে। এই ইনি হচ্চেন অটল বাবু, আমাদের সলিসিটর দত্ত কোম্পানির পার্টনার। আর ইনি হলেন আমার বিশেষ বন্ধু—বাবু গণ্ডেরীরাম বাটপারিয়া।"

গণ্ডেরী।—নোমোস্কার, আপনের নাম শুঁনা আছে, জান পহ্‌চান হয়ে বড় খুস্ হ'ল।

অটল।—নমস্কার, এই আপনার জন্যই আমরা বসে আছি। আপনার মত লোক যখন আমাদের সহায়, তখন কোম্পানির আর ভাবনা কি?

গণ্ডেরী।—হেঁ হেঁ—সোকোলি ভগবানের হিঞ্ছা। হামি একেলা কি করতে পারি? কুছু না।

শ্যাম।—ঠিক, ঠিক। যা করেন মা তারা দীনতারিণী। দেখ অটল, গণ্ডেরী বাবু যে কেবল পাকা ব্যবসাদার, তা মনে কোরো না। ইংরিজি ভাল না জানলেও, ইনি বেশ শিক্ষিত লোক, আর শাস্ত্রেও বেশ দখল আছে।

অটল।—বাঃ আপনার মত লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় বড় সুখী হলুম। আচ্ছা মশায়, আপনি এমন সুন্দর বাংলা বল্‌তে শিখলেন কি করে?

গণ্ডেরী।—বহুত বঙ্গালীর সঙে হামি মিলা মিশা করি। বংলা কিতাব ভি অন্‌হেক পঢ়েচি। বঙ্কিমচন্দ্, রবীন্দরনাথ, আউর ভি সব।

এমন সময় বিপিন বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। ইনি একটু সাহেবী মেজাজের লোক,—এককালে বিলাত যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরিধানে সাদা প্যাণ্ট, কাল কোট, লাল নেকটাই, হাতে সবুজ ফেল্ট্ হ্যাট। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ক্ষীণকায়, গোঁফের দুই প্রান্ত কামানো। শ্যাম বাবু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হল?"

বিপিন।—ডিরেক্টর হবেন বলেচেন ; কিন্তু মাত্র দু'হাজার টাকার শেয়ার নেবেন। তোমাকে, অটলকে, আমাকে পরশু সকালে ভাত খাবার নিমন্ত্রণ করেচেন। এই নাও চিঠি।

অটল।—তিনকড়ি বাবু হঠাৎ এত সদয় যে?

শ্যাম।—বুঝলুম না। বোধ হয় ফেলো ডিরেক্টরদের একবার বাজিয়ে যাচাই করে নিতে চান।

অটল।—যাক্, এবার কাজ আরম্ভ করুন। আমি মেমোরাণ্ডম্ আর আর্টিকেল্‌সের মুসবিদা এনেচি। শ্যামদা প্রস্‌পেক্টস্‌টা কি রকম লিখলেন পড়ুন।

শ্যাম।—হাঁ, সকলে মন দিয়ে শোনো। কিছু বদলাতে হয় ত এই বেলা। দুর্গা—দুর্গা—

জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ।

১৯১৩ সালের ৭ আইন অনুসারে রেজিস্ট্রিত।

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড।

মূলধন—দশ লক্ষ টাকা, ১০্ হিসাবে ১০০,০০০ অংশে বিভক্ত। আবেদনের সঙ্গে অংশ পিছু ২্ প্রদেয়। বাকী টাকা ৪ কিস্তিতে তিন মাসের নোটিসে প্রয়োজন মত দিতে হইবে।

অনুষ্ঠান-পত্র

ধর্মই হিন্দুগণের প্রাণস্বরূপ। ধর্মকে বাদ দিয়া এ জাতির কোন কর্ম সম্পন্ন হয় না। অনেকে বলেন--ধর্মের পুরস্কার পুণ্য। ইহা আংশিক সত্য মাত্র। বস্তুত ধর্মবৃত্তির উপযুক্ত প্রয়োগে ইহলৌকিক উভয়বিধ উপকার হইতে পারে। এতদর্থে চতুর্বর্গ লাভের উপায়স্বরূপ এই বিরাট ব্যাপারে দেশবাসীকে আহ্বান করা হইতেছে।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত দেবমন্দিরগুলির কিরূপ বিপুল আয়, তাহা সাধারণের জানা নাই। রিপোর্ট হইতে জানা গিয়াছে যে, বঙ্গদেশের একটি দেবমন্দিরের দৈনিক যাত্রীসংখ্যা গড়ে ১৫ হাজার। যদি লোক-পিছু চার আনা মাত্র আয় ধরা যায়, তাহা হইলে বাৎসরিক আয় প্রায় সাড়ে তের লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। খরচ যতই হউক, যথেষ্ট টাকা উদ্‌বৃত্ত থাকে। কিন্তু সাধারণে এই লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত।

দেশের এই মহৎ অভাব দূরীকরণার্থ 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামে একটি জয়েন্টষ্টক কোম্পানি স্থাপিত হইতেছে। ধর্মপ্রাণ শেয়ার-হোল্‌ডারগণের অর্থে একটি মহান্ তীর্থক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে, এবং জাগ্রত দেবী সমন্বিত সুবৃহৎ মন্দির নির্মিত হইবে। উপযুক্ত ম্যানেজিং এজেন্টের হস্তে কার্যনির্বাহের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। কোনো প্রকার অপব্যয়ের সম্ভাবনা নাই। শেয়ার-হোল্‌ডারগণ আশাতীত দক্ষিণা বা ডিভিডেণ্ড পাইবেন এবং একাধারে ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

ডিরেক্টরগণ।—(১) অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ বিচক্ষণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায় সাহেব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। (২) বিখ্যাত ব্যবসাদার ও ক্রোরপতি শ্রীযুক্ত গণ্ডেরীরাম বাটপারিয়া। (৩) সলিসিটর্স দত্ত এণ্ড কোম্পানির অংশীদার শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দত্ত, M. A. B. L. (৪) বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিষ্টার বি, সি, চৌধুরী, B. Sc., A. S. S. (U. S. A.) (৫) কালীপদাশ্রিত সাধক ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ শ্যামানন্দ (ex-officio)।

অটল বাবু বাধা দিয়া বলিলেন—"বিপিন আবার নূতন টাইটেল পেলে কবে?"

শ্যাম।--আরে বল কেন। পঞ্চাশ টাকা খরচ করে আমেরিকা না কামস্কাট্‌কা কোত্থেকে তিনটে হরফ আনিয়েচে।

বিপিন।—বা, আমার কোয়ালিফিকেশন না জেনেই তারা শুধু শুধু একটা ডিগ্রি দিলে? ডিরেক্টর হতে গেলে একটা পদবী থাকা ভাল নয়?

গণ্ডেরী।—ঠিক বাত। ভেক বিনা ভিখ মিলে না।

শ্যাম বাবু, আপ্‌নিও এখনসে ধোতি উতি ছোড়ে লঙোটি পিন্‌হুন।

শ্যাম।--আমি ত আর নাগা সন্ন্যাসী নই। আমি হলুম শক্তিমন্ত্রের সাধক,--পরিধেয় হল রক্তাম্বর। বাড়ীতে ত গৈরিকই ধারণ করি। সব অফিসে পরে আসি না ; কারণ, ব্যাটারা সব হাঁ করে চেয়ে থাকে। আর একটু লোকের চোখ-সহা হয়ে গেলে, সর্বদাই গৈরিক পরব। যাক্, পড়ি শোনো—

মেসার্স ব্রহ্মচারী এণ্ড ব্রাদারইন্‌ল এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সি লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন—ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁহারা লাভের উপর শতকরা দুই টাকা মাত্র কমিশন লইবেন, এবং যতদিন না—

অটল বাবু বলিলেন—"কমিশনের রেট অত কম ধরলেন কেন? দশ পার্সেণ্ট অনায়াসে

ফেলতে পারেন।"

গণ্ডেরী।—কুছ্ দরকার নেই। শ্যাম বাবুর পর্‌বস্তি অপ্‌নেসে হোয়ে যাবে। কমিশনের ইরাদা থোড়াই করেন।

এবং যতদিন না কমিশনে মাসিক ১০০০ টাকা পোষায়, ততদিন শেষোক্ত টাকা এলাউন্স রূপে পাইবেন।

গণ্ডেরী।—শুনেন, অটল বাবু, শুনেন। আপনি শ্যাম বাবুকে কি শিখ্‌লাবেন?

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী গোবিন্দপুর গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী দেবী বহু শতাব্দী যাবৎ প্রতিষ্ঠিতা আছেন। দেবীমন্দির ও তৎসংলগ্ন দেবোত্তর সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সম্প্রতি স্বপ্নাদেশ পাইয়াছেন যে, উক্ত গোবিন্দপুর গ্রামে অধুনা সর্বপীঠের সমন্বয় হইয়াছে এবং মাতা তাঁহার মাহাত্ম্যের উপযোগী সুবৃহৎ মন্দিরে বাস করিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী অবলা বিধায়, এবং উক্ত দৈবাদেশ স্বয়ং পালন করিতে অপারগা বিধায়, উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি মায় মন্দির, বিগ্রহ, জমি, আওলাত আদি এই লিমিটেড কোম্পানিকে সমর্পণ করিতেছেন।

অটল।—নিস্তারিণী দেবী আবার কোত্থেকে এলেন? সম্পত্তি ত আপনার বলেই জান্‌তুম।

শ্যাম।—উনি আমার স্ত্রী। সেদিন তাঁর নামেই সব লেখাপড়া করে দিয়েচি। আমি আর এ সব বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে চাই না।

গণ্ডেরী।—ভাল বন্দ বস্ত্‌ কিয়েচেন। অপ্‌নেকো কোই দুস্‌বে না। নিস্তার্নী দেবীকো কোন্ পহ্‌চানে। দাম কেতো লিচ্চেন?

অতঃপর তীর্থ-প্রতিষ্ঠা, মন্দির-নির্মাণ, দেবসেবাদি কোম্পানি কর্তৃক সম্পন্ন হইবে ; এবং এতদর্থে কোম্পানি মাত্র ১৫,০০০ টাকা পণে সমস্ত সম্পত্তি খরিদার্থে বায়না করিয়াছেন।

গণ্ডেরী।—হদ্দ্ কিয়া শ্যাম বাবু। জঙ্গল কি ভিতর পুরানা মন্দিল, উস্‌মে দো চার শোও ছুছুন্দর, ছটাক ভর জমীন, উস্‌পর দো-চার বাঁশ ঝাড়,—বস্ ইসিকা দাম পন্দ্র হাজার!

শ্যাম।—কেন, অন্যায়টা কি হল? স্বপ্নাদেশ, বাহান্ন-পীঠ এক ঠাঁই, জাগ্রত দেবী,—এসব বুঝি কিছু নয়? গুড্‌উইল হিসেবে পনর হাজার টাকা খুবই কম।

গণ্ডেরী।—অচ্ছা। যদি কোই শেয়ার-হোল্ডার হাইকোর্ট মে দরখাস্ত পেশ করে—সপন উপন সব ঝুট্, ছক্‌লায়কে রুপেয়া লিয়া,—তব্?

অটল।—সে একটা কথা বটে, কিন্তু ঐ সব দৈব ব্যাপার বোধ হয় অরিজিনেল সাইডের জুরিস্‌ডিক্‌শনে পড়ে না। আইন বলে—caveat emptor, অর্থাৎ ক্রেতা, সাবধান! সম্পত্তি কেনবার সময় যাচাই করোনি কেন? যা হোক একবার expert opinion নোবো।

শীঘ্রই নূতন দেবালয় আরম্ভ হইবে। তৎসংলগ্ন প্রশস্ত নাটমন্দির, নহবৎখানা, ভোগশালা, ভাণ্ডার প্রভৃতি আনুষঙ্গিক গৃহাদিও থাকিবে। আপাতত দশ হাজার যাত্রীর উপযোগী অতিথিশালা নির্মিত হইবে। শেয়ার-হোল্ডারগণ বিনা খরচায় সেখানে সপরিবারে বাস করিতে পারিবেন। হাট, বাজার, যাত্রা, থিয়েটার, বায়োস্কোপ ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের আয়োজন যথেষ্ট থাকিবে। যাঁহারা দৈবাদেশ বা ঔষধ প্রাপ্তির জন্য হত্যা দিবেন, তাঁহাদের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকিবে। মোট কথা, তীর্থযাত্রী আকর্ষণ করিবার সর্বপ্রকার উপায়ই অবলম্বিত হইবে। স্বয়ং শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী সেবার ভার লইবেন।

যাত্রিগণের নিকট হইতে যে দর্শনী ও প্রণামী আদায় হইবে, তাহা ভিন্ন আর নানা উপায়ে অর্থাগম হইবে। দোকান, হাট বাজার, অতিথিশালা, মহাপ্রসাদ বিক্রয়, প্রভৃতি হইতে প্রচুর আয় হইবে। এতদ্‌ভিন্ন by-product recoveryর ব্যবস্থা থাকিবে। সেবার ফুল হইতে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হইবে, এবং প্রসাদী বিল্বপত্র মাদুলীতে ভরিয়া বিক্রীত হইবে। চরণামৃতও বোতলে প্যাক করা হইবে। বলির জন্য নিহত ছাগসমূহের চর্ম ট্যান করিয়া উৎকৃষ্ট কিডস্কিন্ প্রস্তুত হইবে এবং বহুমূল্যে বিলাতে চালান যাইবে। কিছুই ফেলা যাইবে না।

গণ্ডেরী।—বকড়ি মারবেন? হামি ইস্‌মে নেহি, রামজি কিরিয়া। হামার নাম কাটিয়ে দিন।

শ্যাম।—আপনি ত আর নিজে বলি দিচ্চেন না। আচ্ছা, না হয় কুম্‌ড়ো বলির ব্যবস্থা করা যাবে।

অটল।—কুমড়োর চামড়া ত ট্যান হবে না। আয় কমে যাবে। কিহে বৈজ্ঞানিক, কুমড়োর খোসার একটা গতি করতে পার?

বিপিন।—কষ্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল করে বোধ হয় ভেজিটেব্‌ল্ শু হ'তে পারে। এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখ্‌ব।

গণ্ডেরী।—যো খুসী করো। হামার কি আছে। হামি থোড়া রোজ বাদ অপ্‌না শেয়ার বিলকুল বেচে দিব।

হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে, কোম্পানির লাভ বাৎসরিক অন্তত ১২ লক্ষ টাকা হইবে ; এবং অনায়াসে ১০০ পারসেণ্ট ডিভিডেণ্ড দেওয়া যাইবে। ৩০ হাজার শেয়ারের আবেদন পাইলেই allotment হইবে। সত্বর শেয়ারের জন্য আবেদন করুন। বিলম্বে এই স্বর্ণ-সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন।

গণ্ডেরী।—লিখে লিন—ঢাই লাখ টাকার শেয়ার বিক্রি হ'য়ে গেছে। হামি এক লাখ লিব, বাকী দেড় লাখ শ্যাম বাবু, বিপিন বাবু, অটল বাবু সমান হিসসা লিবেন।

শ্যাম।—পাগল আর কি। আমি আর বিপিন কোথা থে॰ পঞ্চাশ-পঞ্চাশ হাজার বার করব? আপনারা না হয় বড় লোক আছেন।

গণ্ডেরী।—হামি শালা রুপেয়া ডালবো আর তুমি লোগ্ মৌজ করবে? সো হোবে না। সব্‌কো ঝোঁখি লেনা পড়েগা। শ্যাম বাবু, ইঠো সমঝলেন না? টাকা কোই দিব না। সব্ হাওলাতি থাকবে। মানেজিং এজিণ্ট মহাজন হোবে।

অটল।—বুঝলেন শ্যাম-দা? আমরা সকলে যেন ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌দের কাছ থেকে কর্জ ক'রে নিজের-নিজের শেয়ারের টাকা কোম্পানিকে দিচ্চি ; আবার কোম্পানি ঐ টাকা ম্যানেজিং এজেণ্টদের কাছে গচ্ছিত রাখচে। গাঁট থেকে এক পয়সাও কেউ দিচ্চেন না।

শ্যাম।—তার পর তাল সামলাবে কে? কোম্পানি ফেল হ'লে আমি মারা যাই আর কি।

গণ্ডেরী।—ডরেন কেনো? শেয়ার পিছু তো অভি দো টাকা দিতে হবে। ঢাই লাখ টাকার শেয়ারে সিরিফ্ পচাশ হাজার দেনা হোয়। প্রিমিয়ম্ মে সব্ বেচে দিব—সুবিস্তা হোয় ত আউর ভি শেয়ার ধরে রাখবো। বহুত মুনাফা মিল্‌বে। চিম্‌ড়িমল্ ব্রোকার সে হামি বন্দোবস্ত কিয়েছি। দো চার দফে হম্ লোগ অপ্‌না অপ্‌নি শেয়ার লেকে খেল্‌বো, হাঁথ বদ্‌লাবো, দাম চড়বে, বাজার গরম হোবে। তখন সব্ কোই শেয়ার মাংবে, দামকা বিচার করবে না। কবীরজি কি বচন শুনিয়ে—

ঐসী গতি সন্‌সার মে য়ো গাড়র কি ঠাট।
এক পড়া যব্ গাড়মে সবৈ যাত তেহি বাট।।

মানি হচ্ছে—সন্‌সারের লোক সব্ যেন ভেড়ার পাল। এক ভেড়া যদি খান্দেমে গির্ পড়ে তো সব্ কোই উসিমে ঘুসে।

শ্যামবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"তারা ব্রহ্মময়ি, তুমিই জান। আমি ত' নিমিত্ত মাত্র। তোমার কাজ তুমিই উদ্ধার ক'রে দাও মা—অধম সন্তানকে যেন মের না।"

গণ্ডেরী।—শ্যামবাবু, মন্দিল উন্দিল কা কোম্পানি যো কর্‌না হ্যায় কিজিয়ে। উস্‌কি সাথ ঘই-এর কারবার ভি লাগায় দিন। টাকায় টাকা লাভ।

অটল। ঘই কি চিজ্?

গণ্ডেরী। ঘই জানেন না? ঘিউ হোচ্ছে অস্‌লি চিজ্,—যো গায় ভঁইস বকড়িকা দুধসে বনে। আউর নক্‌লি যো হ্যায় সো ঘই কহ্‌লাতা। চর্বি, চীনাবাদাম তেল ওগায়রহ্ মিলা কর্ বনায়া যাতা। পর্ সাল হামি ঘই-এর কামে পচিশ হাজার লাগাই, সাড়ে চৌবিশ হাজার মুনাফা মিলে।

অটল। উঃ! বিস্তর সাপ মেরেছিলেন বলুন!

গণ্ডেরী। আরে সাঁপ কাঁহাসে মিল্‌বে? উ সব ঝুট বাত।

অটল। আচ্ছা গণ্ডার জি--

গণ্ডেরী। গণ্ডার নেহি, গণ্ডেরী।

অটল। হাঁ হাঁ, গণ্ডেরী জি। বেগ্ ইওর পার্ডন। আচ্ছা, আপনি ত' নিরামিষ খান, ফোঁটা কাটেন, ভজন পূজনও করেন।

গণ্ডেরী। কেনো করব না? হামি হর্ রোঁজ গীতা আউর রাম-চরিত-মানস পঢ়ি, রাম-ভজনভি করি।

অটল। তবে অমন পাপের ব্যবসাটা করলেন কি বলে?

গণ্ডেরী। পাঁপ? হামার কেনো পাঁপ হোবে? বেব্‌সা ত করে কাসেম আলি। হামি রহি কলকত্তা, ঘই বনে হাথরস্‌মে। হামি ন আঁখ্‌সে দেখি—ন নাকসে শুংখি--কালী মায়ী কিরিয়া। হামি ত স্রিফ্ মহাজন আছি—রুপেয়া দে কর্ খালাস। সুদ লি, মুনাফার আধা হিস্‌সা ভি লি। যদি হামি টাকা না দি, কাসেম আলি দুস্‌রা ধনিসে লিবে। পাঁপ হোবে ত শালা কাসেম আলিকা হোবে। হামার কি? যদি ফিন্ কুছ দোষ লাগে,—জানে রণছোড়জি—হামার পুণ্‌ভি থোড়া বহুত জমা আছে। একাদ্‌সি, শিউরাত, রামনওমীমে উপবাস, দান খয়রাত ভি কুছু করি। আট আটঠো ধরমশালা বানোআয়া,—লিলুয়ামে, বালিমে, শেওড়াফুলিমে—

অটল। লিলুয়ার ধর্মশালা ত' আসর্ফিলাল ঠুনঠুনওয়ালা করেচে।

গণ্ডেরী। কিয়েছে ত কি হইয়েছে। সভি'ত ওহি কিয়েছে। লেকিন্ বানিয়ে দিয়েছে কোন্? তদারক কোন্ কিয়েছে। ঠিকাদার কোন্ লাগিয়েছে? সব্ হামি। আসর্ফি হামার চাচেরা ভাই লাগে। হামি সলাহ্ দিয়েছি তব্ না রুপেয়া খরচ কিয়েছে।

অটল। মন্দ নয়,—টাকা ঢাললে আসর্‌ফি, পুণ্য হ'ল গণ্ডেরীর।

গণ্ডেরী। কেনো হোবে না? দো দো লাখ রুপেয়া হর্ জগেমে খরচ কিদয়া। জোড়িয়ে ত কেত্‌না হোয়। উস্ পর কম্‌সে কম্ সঁয়কড়া পাঁচ রুপেয়া দস্তুরী ত হিসাব কিজিয়ে। হম্ ত বিলকুল ছোড় দিয়া। আসর্ফিলালকা পুণ্ যদি সোলহ্ লাখকা হোয়, মেরাভি অস্‌সি হজার মোতাবেক হোনা চাহ্‌তা।

অটল। চমৎকার ব্যবস্থা! পুণ্যেরও দেখচি দালালী পাওয়া যায়। আমাদের শ্যামদা গণ্ডেরীদা যেন মাণিকজোড়।

গণ্ডেরী। অটলবাবু, আপনি দো চার অংরেজী কিতাব পঢ়িয়ে হামাকে ধরম কি শিখ্‌লাবেন? বঙ্গালি ধরম জানে না। তিস রুপেয়ার নোকরি করবে, পাঁচ পইসার হরিলুঠ দিবে। হামার জাত রুপেয়া ভি কামায় তেজসে, পুণ্‌ ভি করে তেজসে। অপ্‌নেদের রবীন্দর নাথ কি লেখচেন—

বৈরাগ্‌ সাধন মুক্তি সো হমার নেহি।

হামি এখন চল্‌ছি, রেস খেলনে। কোন্ট্রি গেরিল ঘোড়ে পর্‌ আজ দো চারশও লাগাওয়েঙ্গে।

অটল। আমিও উঠি শ্যামদা। আর্টিকেলের মুসবিদা রেখে যাচ্ছি, দেখে রাখবেন। প্রস্‌পেক্‌টস্‌ ত' দিব্বি হয়েচে। একটু-আধটু বদ্‌লে দেবো এখন। পরশু আবার দেখা হবে। নমস্কার!

৩। সুন্দরাকাণ্ড

বাগ-বাজারে গলির ভিতর রায় সাহেব তিনকড়ি বাবুর বাড়ী। নীচের তলায় রাস্তার সম্মুখে নাতিবৃহৎ বৈঠকখানা ঘরে গৃহ-কর্তা এবং নিমন্ত্রিতগণ গল্পে নিরত ;—অন্দর হইতে কখন ভোজনের ডাক আসিবে, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। আজ রবিবার, তাড়া নাই, কিন্তু বেলা অনেক হইয়াছে।

তিনকড়ি বাবুর বয়স ষাট বৎসর, ক্ষীণ-দেহ, দাড়ি কামানো। শীর্ণ গোঁফে তামাকের ধোঁয়ায় পাকা খেজুরের রং ধরিয়াছে,—কথা কহিবার সময় আরসোলার দাড়ার মত নড়ে। তিনি দেব-ব্যাপারে বড় একটা বিশ্বাস করেন না। প্রথম পরিচয়ে শ্যামবাবুকে বুজরুক সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, কেবল লাভের আশায় কোম্পানিতে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু আজ কালীঘাট হইতে প্রত্যাগত সদ্যস্নাত শ্যামবাবুর অভিনব মূর্তি দেখিয়া কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্যামবাবুর পরিধান লাল চেলী, গেরুয়া রংএর আলোয়ান, পায়ে বাঘের চামড়ার শিং-তোলা জুতা। দাড়ি এবং চুল সাজিমাটি দ্বারা যথাসম্ভব ফাঁপাইয়াছেন ; এবং কপালে মস্ত একটি সিন্দুরের ফোঁটা পরিয়াছেন।

তিনকড়ি বাবু তামাক টানার অন্তরালে বলিতেছিলেন—"দেখুন স্বামীজি, হিসেবই হল ব্যবসার সব। ডেবিট ক্রেডিট যদি থাকে, আর ব্যালান্স যদি মেলে, তবে সে বিজনেসের কোনো ভয় নেই।"

শ্যামবাবু। আজ্ঞে, বড় যথার্থ কথা বলেচেন। সে জন্যই ত' আপনাকে চাই। আপনাকে আমরা মধ্যে-মধ্যে এসে বিরক্ত করব, হিসেব সম্বন্ধে পরামর্শ নোবো—

তিনকড়ি। বিলক্ষণ, বিরক্ত হব কেন। মিটিংগুলো একটু ঘন ঘন করবেন। আমি সমস্ত accounts ঠিক করে দোবো। দেখুন, অডিটার ফডিটার আমি বুঝি না। আরে বাপু, নিজের জমা-খরচ যদি নিজে না বুঝলি, তবে বাইরের একটা অর্বাচীন ছোকরা এসে তার কি বুঝবে? ভারি আজকার সব বুক-কিপিং শিখেছেন। সে কি জানেন,—একটা গোলাক-ধাঁধাঁ, কেউ যাতে না বোঝে তারই চেষ্টা। আমি বুঝি—রোজ কত টাকা এল, কত খরচ হল, আর আমার মজুদ রইল কত। আমি যখন আমাড়গাছি সবডিভিশনের ট্রেজারির চার্জে, তখন এক নতুন কলেজে-পাশ গোঁফ-কামানো ডেপুটি এলেন আমার কাছে কাজ শিখতে। সে ছোকরা কিছুই বোঝে না, অথচ অহঙ্কারে ভরা। আমার কাজে গলদ ধরবার আস্পর্ধা। শেষে লিখলুম কোল্ডহ্যাম সাহেবকে, যে হজুর, তোমরা রাজার জাত, দু' ঘা দাও তাও সহ্য হয়, কিন্তু দিশি ব্যাঙাচির লাথি বরদাস্ত করব না। তখন সাহেব নিজে এসে, সমস্ত বুঝে নিয়ে, আড়ালে ছোকরাকে ধমকালেন। আমাকে পিঠ চাপড়ে হেঁসে বল্লেন—ওয়েল তিনকড়ি বাবু, তুমি হলে কত কালের সিনিয়ার অফিসর, একজন ইয়ং চ্যাপ তোমার কদর কি বুঝবে? তার পর দিলেন আমাকে নওগাঁয়ে গাঁজা গোলার চার্জে বদলী করে। যাক্‌ সে

কথা। দেখুন, আমি বড় কড়া লোক। জবরদস্ত হাকিম বলে আমার নাম ছিল। মন্দির-টন্দির আমি বুঝি না,—কিন্তু একটি আধলাও কেউ আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। রক্ত-জল-করা টাকা আপনার জিম্মায় দিচ্ছি, দেখবেন যেন—

শ্যাম। সে কি কথা! আপনার টাকা আপনারই থাকবে, আর শতগুণ বাড়বে। এই দেখুন না—আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব পৈতৃক পঞ্চাশ হাজার টাকা এতে ফেলেচি। আমি না হয় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী,—অর্থে প্রয়োজন নেই,—লাভ যা হবে মায়ের সেবাতেই ব্যয় করব। বিপিন আর এই অটল ভায়াও প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার ফেলেচেন। গণ্ডেরী আড়াই লাখ টাকার শেয়ার নিয়েচে। সে মহা হিসেবী লোক,—লাভ নিশ্চিত না জানলে কি নিত?

তিনকড়ি। বটে, বটে? শুনে আশ্বাস হচ্চে। আচ্ছা, একবার কোল্ডহ্যাম সাহেবকে কনসল্ট্ করলে হয় না? অমন সাহেব আর হয় না।

"ঠাঁই হয়েচে"—চাকর আসিয়া খবর দিল।

"উঠতে আজ্ঞা হোক ব্রহ্মাচারী মশায়, আসুন অটল বাবু, চল হে বিপিন।" তিনকড়ি বাবু সকলকে অন্দরের বারান্দায় আনিলেন।

শ্যাম বাবু বলিলেন—"করেছেন কি রায় সাহেব, এ যে রাজসূয় যজ্ঞ। কই, আপনি বস্‌লেন না?"

তিনকড়ি।—বাতে ভুগ্‌চি, ভাত খাইনে, দুখান সুজির রুটি বরাদ্দ।

শ্যাম।—আমি একটি ফেৎকারিণী তন্ত্রোক্ত কবচ পাঠিয়ে দোবো, ধারণ করে দেখবেন। শাক ভাজা, কড়াই-এর ডাল,—এটা কি দিয়েছ ঠাকুর, এঁচোড়ের ঘণ্ট? বেশ, বেশ। শোধন করে নিতে হবে। সুপক্ক কদলী আর গব্যঘৃত বাড়ীতে হবে কি? আয়ুর্বেদে আছে—পনসে কদলং কদলে ঘৃতং। কদলী ভক্ষণে পনসের দোষ নষ্ট হয়, আবার ঘৃতের দ্বারা কদলীর শৈত্যগুণ দূর হয়। পুঁটিমাছ ভাজা,—বাঃ। রোহিতাদপি রোচকাঃ পুণ্টিকাঃ সদ্যভর্জিতাঃ। ওটা কিসের অম্বল বল্লে,—কামরাঙা? সর্বনাশ, তুলে নিয়ে যাও। গত বৎসর শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে ঐ ফলটি জগন্নাথ প্রভুকে দান করেচি। অম্বল জিনিষটা আমার সয়ও না,—শ্লেষ্মার ধাত কি না। উস্‌প্‌, উস্‌প্‌, উস্‌প্‌। প্রাণায় আপানায় সোপানায় স্বাহা। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ ভোজনে তু জনার্দনম্। আরম্ভ কর হে অটল।

অটল।—(জনান্তিকে) আরম্ভের ব্যবস্থা যা দেখচি, তাতে বাড়ী গিয়ে খুন্নিবৃত্তি করতে হবে।

তিনকড়ি।—আচ্ছা ঠাকুরমশায়, আপনাদের তন্ত্রশাস্ত্রে এমন কোনো প্রক্রিয়া নেই, যার দ্বারা লোকের—ইয়ে—মানমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে?

শ্যাম।—অবশ্য আছে! যথা কুলার্ণবে—অমানিনাং মানদেন। অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হলে অমানী ব্যক্তিকেও মান দেন। কেন বলুন ত?

তিনকড়ি।—হাঃ হাঃ, সে একটা তুচ্ছ কথা। কি জানেন, কোল্ডহ্যাম সাহেব বলেছিলেন সুবিধা পেলেই লাটসাহেবকে ধরে আমায় বড় খেতাব দেওয়াবেন। বার-বার ত রিমাইণ্ড করা ভাল দেখায় না, তাই ভাবছিলুম, যদি তন্ত্রে মন্ত্রে কিছু হয়। মানিনে যদিও, তবু—

শ্যাম।—মানতেই হবে। শাস্ত্র মিথ্যা হতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ বিষয়ে আমার সমস্ত সাধনা নিয়োজিত করব। তবে সদ্‌গুরু প্রয়োজন, দীক্ষা ভিন্ন এ সব কাজ হয় না। গুরুও আবার যে সে হলে চলবে না। খরচ—তা আমি যথাসম্ভব অল্পেই নির্বাহ করতে পারব।

তিনকড়ি।—হুঁ। দেখা যাবে এখন। আচ্ছা, আপনাদের অফিসে ত বিস্তর লোকজন দরকার হবে, তা—আমার একটি শালীপো আছে. তার একটা হিল্লে লাগিয়ে দিতে পারেন না? বেকার বসে-বসে আমার অন্ন ধ্বংস করচে,—লেখাপড়া শিখলে না,—কুসঙ্গে মিশে

বিগ্‌ড়ে গেছে। একটা চাকরী জুটলে বড় ভাল হয়। ছোকরা বেশ চটপটে আর স্বভাব-চরিত্রও বড় ভাল।

শ্যাম।—আপনার শালীপো? কিছু বলতে হবে না। আমি তাকে মন্দিরের হেড পাণ্ডা করে দোবো। এখনি গোটা পনর দরখাস্ত এসেছে। তা আপনার আত্মীয়ের ক্লেম সবার ওপর।

তিনকড়ি।—আর একটি অনুরোধ। আমার বাড়ীতে একটি পুরানো কাঁসর আছে,—একটু ফেটে গেছে, কিন্তু আদত খাঁটি কাঁসা। এ জিনিসটা মন্দিরের কাজে লাগানো যায় না? সস্তায় দোবো।

শ্যাম।—নিশ্চয়ই নেবো। ওসব সেকেলে জিনিষ কি এখন সহজে মেলে?

* * * *

৪। লঙ্কাকাণ্ড

গণ্ডেরীর ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের জোরে এবং প্রতিষ্ঠাতৃগণের চেষ্টায় সমস্ত শেয়ার লইবার জন্য অস্থির, বাজারে চড়া দামে বেচা-কেনা হইতেছে।

অটল বাবু বলিলেন—"আর কেন শ্যামদা, এইবার নিজের শেয়ার সব ঝেড়ে দেওয়া যাক। গণ্ডেরী ত খুব একচোট মারলে। আজকে ডবল দর। দুদিন পরে কেউ ছোঁবেও না।"

শ্যাম।—বেচতে হয় বেচ, মোদ্দা কিছু ত হাতে রাখতেই হবে, নইলে ডিরেক্টর হবে কি করে?

অটল।—ডিরেক্টরি আপনি করুন গে। আমি আর হাঙ্গামায় থাকতে চাইনে। সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় আপনার ত কার্যসিদ্ধি হয়েচে।

শ্যাম।—এই ত সবে আরম্ভ। মন্দির, ঘরদোর, হাটবাজার সবই ত বাকী। তোমাকে কি এখন ছাড়া যায়!

অটল।—থেকে আমার লাভ? পেটে খেলে পিঠে সয়। এখন ত ব্রাদারইন্‌ল কোম্পানির মরশুম চল্ল। আমাদের এইখানেই শেষ।

শ্যাম।—আরে ব্যস্ত হও কেন, এক যাত্রার কি পৃথক ফল হয়? সন্ধ্যাবেলা যাব এখন তোমাদের বাড়ীতে—গণ্ডেরীকেও নিয়ে যাব।

* * * *

দেড় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী এণ্ড ব্রাদারইন্‌ল কোম্পানির অফিসে ডিরেক্টরগণের সভা বসিয়াছে। সভাপতি তিনকড়ি বাবু টেবিলে ঘুসি মারিয়া বলিতেছিলেন—"আ—আ—আমি জান্‌তে চাই, টাকা সব গেল কোথা। আমার ত বাড়ীতে টেকা ভার,—সবাই এসে তাড়া দিচ্চে। কয়লাওলা বলে তার পঁচিশ হাজার টাকা পাওনা,—ইঁটখোলার ঠিকাদার বলে বারো হাজার,—তারপর ছাপাখানাওলা, শার্পার কোম্পানি, কুণ্ডু মুখুয্যে, আরো কত কে আছে। বলে আদালতে যাব। মন্দিরের কোথা কি তার ঠিক নেই—এর মধ্যে দু'লাখ টাকা ফুঁকে গেল? সে ভণ্ড জোচ্চোরটা গেল কোথা? শুন্‌তে পাই ডুব মেরে আছে, অফিসে বড় একটা আসে না।

অটল।—ব্রহ্মচারী বলেন, মা তাঁকে অন্য কাজে ডাকচেন,—এদিকে আর তেমন মন নেই। আজ ত মিটিংএ আসবেন বলেচেন।

বিপিন বলিলেন—"ব্যস্ত হচ্চেন কেন সার, এই ত ফর্দ রয়েচে, দেখুন না—জমি কেনা, শেয়ারের দালালী, Preliminary expense, ইট তৈরি, establishment, বিজ্ঞাপন, অফিস-খরচ—"

তিনকড়ি।—চোপরও ছোকরা। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।

এমন সময় শ্যাম বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বলিলেন—"ব্যাপার কি?"

তিনকড়ি।—ব্যাপার আমার মাথা। আমি হিসেব চাই।

শ্যাম।—বেশ ত, দেখুন না হিসেব। বরঞ্চ একদিন গোবিন্দপুরে নিজে গিয়ে কাজকর্ম্ম তদারক করে আসুন।

তিনকড়ি।—হ্যাঁঃ, আমি এই বাতের শরীর নিয়ে তোমার ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুরে গিয়ে মরি আর কি। সে হবে না,—আমার টাকা ফেরৎ দাও। কোম্পানি ত যেতে বসেছে। শেয়ার-হোল্ডাররা মার-মার কাট-কাট করচে।

শ্যাম বাবু কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিলেন—"সকলি জগন্মাতার ইচ্ছা। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। এতদিন ত মন্দির শেষ হওয়ারই কথা। কতকগুলো অজ্ঞাতপূর্ব কারণে খরচ বেশী হয়ে গিয়ে, টাকার অনাটন হয়ে পড়ল,—তাতে আমাদের আর অপরাধ কি? কিন্তু চিন্তার কোনো কারণ নেই, ক্রমশ সব ঠিক হয়ে যাবে। আর একটা Callএর টাকা তুললেই সমস্ত দেনা শোধ হয়ে যাবে, কাজও এগোবে।"

গণ্ডেরী বলিলেন—"আউর টাকা কোই দিবে না। আপ্‌নেকো থোড়াই বিশোয়াস্ করবে।"

শ্যাম।—বিশ্বাস না করে, নাচার। আমি দায়-মুক্ত,—মা যেমন করে পারেন, নিজের কাজ চালিয়ে নিন। আমাকে বাবা বিশ্বনাথ কাশীতে টানচেন, সেখানেই আশ্রয় নোবো।

তিনকড়ি।—তবে কি বল্‌তে চাও, কোম্পানি ডুব্‌লো?

গণ্ডেরী।—বিশ হাঁথ পানি।

শ্যাম।—আচ্ছা তিনকড়ি বাবু, আমাদের ওপর যখন লোকের এতই অবিশ্বাস, বেশ ত, আমরা না হয় ম্যানেজিং এজেন্সি ছেড়ে দিচ্চি। আপনার নাম আছে, সম্ভ্রম আছে, লোকেও শ্রদ্ধা করে ; আপনিই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে কোম্পানি চালান না?

অটল।—এইবার পাকা কথা বলেচেন।

তিনকড়ি।—হ্যাঁঃ, আমি বদ্‌নামের বোঝা ঘাড়ে নিই, আর ঘরের খেয়ে বুনো মোষ তাড়াই।

শ্যাম।—বেগার খাটবেন কেন? আমিই মিটিংএ প্রস্তাব করব যে, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ব্যানার্জি মহাশয়কে মাসিক ১০০০্ পারিশ্রমিক দিয়ে কোম্পানি চালাবার ভার অর্পণ করা হোক। এমন উপযুক্ত কর্ম্মদক্ষ লোক আর কোথায়? আর—আমরা যদি ভুলচুক করেই থাকি, তার দায়ী ত আর আপনি হবেন না।

তিনকড়ি।—তা—তা—আমি এখন চট্ করে কথা দিতে পারি নে। ভেবে চিন্তে দেখব।

অটল।—আর দ্বিধা করবেন না রায়সাহেব। আপনিই এখন ভরসা।

শ্যাম।—যদি অভয় দেন ত আর একটি নিবেদন করি। আমি বেশ বুঝেচি, অর্থ হচ্চে সাধনের অন্তরায়। আমার সমস্ত সম্পত্তিই বিলিয়ে দিয়েচি—কেবল এই কোম্পানির ষোলশ খানেক শেয়ার আমার হাতে আছে। তাও সৎপাত্রে অর্পণ করতে চাই। আপনিই সেটা নিয়ে নিন। প্রিমিয়াম চাই না—আপনি কেনা দাম ৩২০০্ মাত্র দিন।

তিনকড়ি।—হ্যাঁঃ, ভাল করে আমার ঘাড় ভাংবার মতলব।

শ্যাম।—ছি ছি। আপনার ভালই হবে। না হয় কিছু কম দিন,—চব্বিশ শ—দু'হাজার—হাজার—

তিনকড়ি।—এক কড়াও নয়।

শ্যাম।—দেখুন, ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের দান প্রতিগ্রহ নিষেধ, নৈলে আপনার মত লোককে আমার অমনিই দেবার কথা। আপনি যৎকিঞ্চিৎ মূল্য ধরে দিন। ধরুন—পাঁচশ টাকা। Transfer-form আমার প্রস্তুতই আছে,—নিয়ে এস ত বিপিন।

তিনকড়ি।—আমি এ—এ—আশী টাকা দিতে পারি।

শ্যাম।—তথাস্তু। বড়ই লোকসান হল, কিন্তু সকলি মায়ের ইচ্ছা।

গণ্ডেরী।—বাহ্বা তিনকৌড়ি বাবু, বহুৎ কিফায়ৎ হুয়া।

তিনকড়ি বাবু পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া সদ্যপ্রাপ্ত পেন্‌শনের টাকা হইতে আটখানা আনকোরা দশ টাকার নোট সন্তর্পণে গণিয়া দিলেন। শ্যাম বাবু পকেটস্থ করিয়া বলিলেন—"তবে এখন আমি আসি। বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজা আছে! আপনিই কোম্পানির ভার নিলেন এই কথা স্থির। শুভমস্তু—মা দশভুজা আপনার মঙ্গল করুন।"

শ্যাম বাবু প্রস্থান করিলে, তিনকড়ি বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"লোকটা দোষে-গুণে মানুষ। এদিকে যদিও হম্‌বগ্‌, কিন্তু মেজাজটা দিলদরিয়া। কোম্পানির ঝক্কিটা ত এখন আমার ঘাড়ে পড়ল। ক'মাস বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলুম, কিছুই দেখতে পারি নি,—নৈলে কি কোম্পানির অবস্থা এমন হয়? যা হোক, উঠে পড়ে লাগতে হল,—আমি লেফাফা-দুরস্ত কাজ চাই,—আমার কাছে কারো চালাকী চলবে না।"

গণ্ডেরী।—আপ্‌নের কুছু তক্‌লিফ করতে হোবে না। কম্প্‌নি ত ডুব গিয়া। অপ্‌কোভি ছুট্টি।

তিনকড়ি।—তা হলে কি বল্‌তে চাও আমার মাসহারাটা—

গণ্ডেরী।—হাঃ হাঃ, তুম্‌ভি রুপেয়া লেওগে? কাঁহাসে মিল্‌বে বাত্‌লাও। তিনকৌড়ি বাবু শ্যামবাবুকে কাররবাই নহি সমঝে? নব্বে হজার রূপেয়া কম্পনিকা দেনা। দো রোজ বাদ লিকুইড্রিশন। রিসিভর সিকিগু কল আদায় করবে, তব দেনা শুধবে।

তিনকড়ি।—অ্যাঁ, বল কি? আমি আর এক পয়সাও দিচ্ছি না।

গণ্ডেরী।—আলবৎ দিবেন। গবরমিণ্ট কান পকড়্‌কে আদায় করবে। আইন এইসি হ্যায়।

তিনকড়ি।—আরও টাকা যাবে? সে কত?

অটল।—আপনার একলার নয়। প্রত্যেক অংশীদারকেই শেয়ার-পিছু ফের দু'টাকা দিতে হবে। আপনার পূর্ব্বের ২০০ শেয়ার ছিল, আর শ্যামদার ১৬০০ আজ নিয়েচেন। এই ১৮০০ শেয়ারের উপর আপনাকে ছত্রিশ শ টাকা দিতে হবে। দেনা শোধ, রিসিভারের খরচা—সমস্ত চুকে গেলে শেষে সামান্য কিছু ফেরৎ পেতে পারেন।

তিনকড়ি।—তোমাদের কত গেল?

গণ্ডেরী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—"কুছ্‌ভি নেহি, কুছ্ ভি নেহি! আরে হামাদের ঝড়তি-পড়তি শেয়ার ত সব্ শ্যাম বাবু লিয়েছিল—আজ আপনাকে বিক্‌কড়ি কিয়েছে।"

তিনকড়ি।—চোর—চোর—চোর। আমি এখনি বিলেতে কোল্ডহ্যাম সাহেবকে চিঠি লিখচি।

অটল। তবে আমরা এখন উঠি। আমাদের ত আর শেয়ার নেই, কাজেই আমরা ডিরেক্টর নই। আপনি কাজ করুন। চল গণ্ডেরী।

তিনকড়ি।—অ্যাঁ—

গণ্ডেরী।—রাম রাম!

মাঘ ১৩২৯

অপবাদ

নরেন্দ্র দেব

শিবুদের ঠিক পাশের বাড়ীতেই ইলা আর নীলা বলে দুটি সুন্দরী তরুণী থাকে। তারা দুই বোন্। অল্প দিন হ'ল এ পাড়ায় এসেছে—কিন্তু এরই মধ্যে পাড়ায় তাদের বদনাম রটেছিল যে তারা নাকি সুচরিত্রা নয় ; কারণ, তাদের কোনও পুরুষ অভিভাবক ছিল না। বাড়ীতে ঝি চাকর আর দ্বারবান ছাড়া আর কোনও লোকজন দেখা যেত না। কেবল রোজ রাত্রি নটার সময় একখানা খুব বড় মোটর গাড়ী তাদের বাড়ীর গলির মুখে এসে দাঁড়াতে দেখা যেতো। কিন্তু, কত রাত্রে যে সেখানা ফিরে যেতো তার খবর পাড়ার লোকেরা কেউ সঠিক বলতে পারতো না। কেউ বলতো বারোটা, কেউ বলতো একটা, কেউ বলতো দু'টো! কাজেই এ সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা আজও হয়নি, তবে এটুকু এক রকম স্থির হ'য়ে গেছ্‌ল যে মোটরখানা অনেক রাত্রে ফেরে এবং তার মালিক একজন মস্ত বড়লোক ও নামজাদা এটর্নি!

গুজব যে এই বড়লোক এটর্নি বাবুই না কি বড় বোন ইলার রূপের ফাঁদে ধরা পড়ে' এদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন ক'রছেন। কিন্তু সে যাই হোক্, বেশ্যা বলে বদ্‌নাম রটলেও কেউ তাদের এক দিনের জন্যেও পাড়ায় কোনও বেচাল দেখতে পায়নি। মাঝে মাঝে সে বাড়ী থেকে মিহি সুরে শ্রবণ-মধুর সঙ্গীতালাপ শোনা যেতো বটে, কিন্তু চিক্-ফেলা বারান্দার দিকে অনেকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকেও শিবু কোনও দিন তাদের পাশের বাড়ীর এই রহস্যময়ী ভাড়াটেদের কারুরই মুখ দেখতে পেতো না!

হঠাৎ এক দিন কলেজ যাবার সময় শিবু দেখলে তাদের গলির মুখে বেথুন কলেজের প্রকাণ্ড বাস্‌খানা এসে দাঁড়িয়েছে। একটু পরেই তাদের পাশের বাড়ী থেকে একটি পনেরো-ষোলো বছরের ফুট্‌ফুটে মেয়ে এক গোছা বই খাতা হাতে করে বেরিয়ে এলো।

গলিটা সরু, দু'জন লোক পাশাপাশি যেতে পারে না, কাজেই শিবু, মেয়েটিকে পথ ছেড়ে দিয়ে একটু পাশ কাটিয়ে দাঁড়ালো।

অধর-প্রান্তে একটু স্নিগ্ধ মধুর হাসি ফুটিয়ে মেয়েটি একবার চকিতের জন্য শিবুর মুখের দিকে চেয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো।

দু'টি কালো চোখের সেই নিমেষের নয়নপাতে অনেকখানি ধন্যবাদ নিবেদন করা ছিল। শিবু মুগ্ধ হ'য়ে দীর্ঘক্ষণ সেই অজগর গাড়ীখানার চলে যাওয়ার পথে পলকহীন চোখে চেয়ে রইল। কিন্তু ওই এক-গাড়ী মেয়ের মধ্যে পাশের বাড়ীর সে মেয়েটি যে কোথায় হারিয়ে গেল, শিবু আর তাকে খুঁজে পেলে না। তার বদলে পাঁচ-সাত জোড়া চশ্‌মা পরা চোখ গাড়ীর ভিতরের অন্ধকার থেকে তার দৃষ্টির সামনে যেন চক্ চক্ ক'রে উঠলো।

শিবু অপ্রস্তুতের মতো চোখ ফিরিয়ে নিলে, কিন্তু সে দিগ্‌গজ গাড়ীখানা তখন একটা মোড় ঘুরে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

শিবু সেদিন কেমন যেন একটু মনমরা হয়ে কলেজে চলে গেল।

এমনি করেই শিবুর সঙ্গে নীলার প্রথম দেখা হ'য়েছিল সে এক দিন দৈবাৎ! তার পর থেকে রোজই হয় ; কিন্তু, আর দৈবাৎ নয়। বেথুন কলেজের গাড়ীর আওয়াজ পেলেই শিবুর কলেজ যাবার সময় হয়ে যেতো। কিন্তু, নীলা যতক্ষণ না বেরিয়ে এসে গাড়ীতে

উঠতো, ততক্ষণ সে কিছুতেই আর তাদের বাড়ীর সামনের সেই ছোট্ট সরু গলিটা পার হ'য়ে যেতে পারতো না! কাজে-কাজেই তাদের দু'জনের এখন প্রত্যহই দেখা হওয়াটা একটা নিশ্চিত ব্যাপার হ'য়ে উঠেছিল।

কেবল রবিবার ও ছুটীর দিন হ'লে শিবু এ মেয়েটির দেখা পেতো না। ছুটীর দিন এগিয়ে আসতো শুধু যেন শিবুকেই সাজা দেবার জন্য। অদর্শনের যন্ত্রণা তাকে এমনি কাতর ও অধীর করে তুলতো যে বারান্দার সারি সারি নীল চিক্‌গুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হ'য়ে সে অনেক সময় ভাবতো—যা-হোক একটা কিছু ছুতো ক'রে একবার পাশের বাড়ীতে ছুটে গিয়ে মেয়েটিকে দেখে আসি।

কিন্তু, বেচারির সাহসে কুলাতো না! দরজার সামনে যে দ্বারবান বসে কেবলই হাতের তালুতে রগড়ে খৈনি খেতো ও তুলসীদাসী রামায়ণ পড়তো, তাকে শিবু তত ভয় করতো না। কিন্তু, ওই বাড়ীখানার চারিদিকে এমন একটা কলঙ্কের কাঁটা দেওয়া কুৎসার বেড়া বেঁধে দেওয়া হ'য়েছিল, যে, শিবুর সেটা কিছুতেই ডিঙিয়ে যেতে সাহস হ'তো না!

*

এক দিন বাড়ী থেকে বেরুতে নীলার একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। গাড়ী এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল বলে সে একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে, প্রায় ছুটেই গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছিল। এমন সময় তার খাতার ভিতর থেকে ফাউনটেন পেনটা ছিটকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। শিবু দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে গাড়ীর দরজার কাছে দৌড়ে গিয়ে সেটা নীলাকে দিয়ে এলো। নীলা সেটা হাত বাড়িয়ে নেবার সময় এমন সুন্দর হেসে কৃতজ্ঞ চোখে চেয়ে শিবুকে মিহি মিষ্টি গলায় ধন্যবাদ দিলে, যে, শিবুর দেহ-মন একটা চরিতার্থতার আনন্দে যেন পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল!

ওদিকে গাড়ীশুদ্ধ মেয়ে কলরব করে নীলাকে জিজ্ঞাসা করলে—ও কে ভাই, ও সুন্দর ছেলেটি বুঝি তোমার দাদা?

নীলা একটু ইতস্তত করে বললে—হ্যাঁ।

এমনি করেই তাদের প্রথম আলাপ-পরিচয় হয়েছিল।

তার পর কি একটা ছুটির দিনে নীলার অদর্শনে কাতর শিবু বাড়ীতে আর তিষ্ঠতে না পেরে বিকেলের দিকে তার ইউনিফর্মটা পাট করে বগলে নিয়ে মাঠে খেলতে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়ল। গলিতে নেমেই দেখে নীলা আসছে,—আজ তার ইস্কুলের পোষাক নয়, চমৎকার বেশভূষা। জরীর গুল্‌-বসানো ঢাকাই শাড়ী ব্রাহ্মিকা ধরণে পরা। গায়ে সেই রকমেরই একটি ব্লাউজ। নিভাঁজ কালো এলো চুলের গোছা পরিপুষ্ট পিঠখানি ছাপিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মাথার দু পাশে চুলের গায়ে দুটি সুন্দর ক্লিপ্‌ আঁটা! হাতে একটি ঝক্‌ঝকে নূতন এস্রাজ।

হঠাৎ শিবু সামনে এসে পড়াতে নীলা পথের মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। রূপসী নীলার সেই 'কুন্দেন্দু-তুষার-হার-ধবলা' বীণাপানি মূর্তি দেখে মুগ্ধ ও চমৎকৃত শিবনাথের হাত থেকে ইউনিফর্মের মোড়কটা মাটিতে পড়ে গেল। শিবুর কিন্তু সেদিকে খেয়াল ছিল না। নীলা দেখতে পেয়ে হেঁট হয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে শিবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে —আপনার এটা কি পড়ে গেল।

শিবু চমকে উঠে—'হ্যাঁ' বলে হাত বাড়ালে।

নীলা সেটা ফিরিয়ে দেবার আগে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললে—আপনি কোন্ টিমে খেলেন?

ইউনিফর্মের মোড়কটার গা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে শিবু বললে—আমাদের কলেজ টিমে।

—আজ বুঝি খেলা আছে?

—হাঁ

—তবে আসুন না আপনাকে মাঠে নামিয়ে দিয়ে যাই, আমি ত ওই দিকেই যাচ্ছি—

—কোন্ দিকে?

—আমাদের গান-বাজনার ইস্কুলে।

—আপনি গান-বাজনাও শিখছেন?

শিবনাথের চোখে-মুখে একটা সপ্রশংস বিস্ময় ফুটে উঠল।

নীলা একটু লজ্জিত হয়ে বললে—এই একটু আধটু, তাও দায়ে পড়ে। দিদির ইচ্ছে, জামাইবাবুর সখ, কি করি বলুন,—তাই ও পাঠটাও পড়তে যেতে হচ্ছে—বলতে বলতে নীলা তার বাঁ হাতটি লীলায়িত ভঙ্গীতে তুলে মৃণাল মণিবন্ধে বাঁধা সোনার হাত-ঘড়ীটির দিকে চকিতে একবার চেয়ে দেখে বললে—আসুন, আর সময় নেই কিন্তু,—

নীলা গাড়ীর দিকে এগিয়ে চললো—

শিবু একবার সভয়ে তাদের বাড়ীর দিকে চেয়ে দেখে কলের পুতুলের মতো নীলার পিছু পিছু গিয়ে টুক্ করে গাড়ীতে উঠে পড়লো।

নীলা তাকে এদিকের সিটে বসবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও শিবু উঠে সামনের সিটেই বসে পড়েছিল।

নীলা গাড়ীতে উঠবার সময় হাতের এস্রাজটা শিবুর দিকে বাড়িয়ে দিলে, শিবু অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দু'হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে সেটাকে সযত্নে বুকের উপর তুলে নিলে। সস্নেহে সেটার গায়ে হাত বুলিয়ে বললে—আপনার এস্রাজটা ত ভারী চমৎকার!

নীলা গাড়ীতে উঠে বসে হাঁকাতে বলে দিয়ে প্রশ্ন করলে—আপনি কি বাজাতে জানেন?

ঘাড় হেঁট করে শিবু বললে—সামান্য রকম,—মোটে মাসদুই তিন খাঁ সাহেবের বাড়ীতে শিখতে গেছলুম। কিন্তু, পড়াশুনোর ক্ষতি হবে বলে দাদা বারণ করলেন, তাই আর ওটা ভালো করে শেখা হলো না। আপনি বেশ ভালো বাজাতে শিখেছেন বোধ হয়।

—রামঃ! কেবল দিদির তাড়ায় মাঝে মাঝে একটু একটু ছড়ি টানি! তাও, ঐ ইস্কুলে গিয়ে! বাড়ীতে এসে আর আমি একে ছুঁই না!

—কেন? আপনি কি গান-বাজনা পছন্দ করেন না?

—পছন্দ করলেই বা কি হবে? আপনিও যেমন! আমাদের দেশে গৃহস্থ মেয়েদের গান-বাজনা শেখা একটা বিড়ম্বনা বই ত নয়! সংসারের কাজকর্ম নিয়ে, ছেলেমেয়ে মানুষ করা নিয়ে তাদের দিনরাত এমন ব্যস্ত থাকতে হয়, যে, এ রসটুকু উপভোগ করবার তারা ফুরসৎই পায় না। তা ছাড়া আমাদের হিঁদুর ঘরে আবার গুরুজনরা উপস্থিত থাকলে—ওটা তো এক-রকম নিষিদ্ধ ব্যাপার ব'লেই বিবেচিত হয়! এই বলে নীলা একটু মৃদু হাসলে ; শিবু সে হাসিতে যোগ দিয়ে বললে—

—আপনি যা ব'লছেন সে কথা ঠিক্—

তা তো বুঝলুম। কিন্তু, আমাদের সমাজের এগুলো কতদূর অন্যায় বলুন তো! সারাদিনের খাটুনীর পর একটু অবসর পেলে আমরা যদি খানিকটা গান-বাজনা নিয়ে আমোদ করি—তাতে দোষটা যে কি আমি তো বুঝতে পারি না।

—দোষগুণ যদি বিচার ক'রে দেখা হতো, তা'হলে বোধহয় পুরুষরা মেয়েদের এতটা কড়া শাসনে রাখতে পারতো না—

—আপনি হয় ত' জানেননা, এ সব বিষয়ে পুরুষ অভিভাবকদের চেয়ে বাড়ীর সেকেলে গিন্নীরাই বেশী আপত্তি করেন। তাঁরা স্পষ্টই বলেন—ওটা নিতান্ত বেহায়াপনা! হিঁদুর

বাড়ীর গৃহস্থ ঘরের বৌ-ঝি আবার গান-বাজনা করবে কি—তারা কি বাঈজী?

শিবু এস্রাজের তারে একটি আঙুল ছুঁইয়ে দু-একটা মৃদু ঝঙ্কার তুলে বললে—তাঁদের কথা ছেড়ে দিন—তাঁরা অশিক্ষিতা ; অনেকের অক্ষর-পরিচয় পর্যন্ত নেই। আজকালকার দিনে মেয়েরা যে-সব সুবিধে ভোগ ক'রতে পাচ্ছে, তখনকার কালে তাঁরা সে-সব সুবিধে কখন পাননি! কাজে কাজেই, তাঁরা স্বভাবতই একটু (jealous) হয়ে ওঠেন, দেখে শুনে সহ্য ক'রতে পারেন না—তাই বাধা দিতে চেষ্টা করেন।

গাড়ী চৌরঙ্গী দিয়ে যেতে যেতে একটা বাঁয়ে গলির মুখে যখন মোড় নিতে যাচ্ছিল, নীলা গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে—ডাহিনা যাও—ময়দান।

শিবু তাড়াতাড়ি বললে—না না, কেন কষ্ট করে আবার অতটা যাবেন?—আমাকে এইখানেই নামিয়ে দিলে হবে—ওই ত, আমাদের গ্রাউণ্ড দেখা যাচ্ছে—

নীলা হেসে উঠে বললে—এতটা পথ আপনাকে নিয়ে এলুম, আর ওইটুকু যেতেই কি আমাদের ঘোড়া মরে যাবে?

শিবু অপ্রতিভ হয়ে বললে—এ গাড়ী ঘোড়া বুঝি আপনাদেরই নিজের?

নীলা চট্ ক'রে এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারলে না, একটু ভেবে বললে—আমাদের নিজের মানে আমার নয়—এ সুবোধ বাবুর। তবে, তাঁর গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন, টাকা-কড়ি সবই ত' দিদির, কাজেই আমারও ব্যবহার করবার একটা অধিকার আছে!

কথাটা শুনে শিবু মনে মনে শিউরে উঠে চুপ ক'রে বসে ভাবতে লাগল—তাই ত! সুবোধ বাবুরই সব! তাহ'লে পাড়ার লোকেরা যা বলে সেটা সত্যি? ছি ছি—এরা তবে সত্যিই বেশ্যা! সুবোধবাবু এদের মনিব! কী লজ্জার কথা! শিবুর চট্ ক'রে মনে হ'লো—তাই ত' আমাকে যদি কেউ এর সঙ্গে এক গাড়ীতে দেখে তাহ'লে আমি তো আর কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারবো না! শিবু গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো—সবুর!—সবুর!

গাড়ী দাঁড়াতেই শিবু উঠে প'ড়ে তার হাতের এস্রাজটা গাড়ীর গদির ওপর হেলিয়ে রেখে টপ্ করে বাইরে লাফিয়ে পড়লো এবং নীলাকে চট্ করে একটা নমস্কার ক'রে—'চল্লুম' বলে পিছন ফিরে মাঠের উপর দিয়ে—প্রায় একরকম ছুট্ দিলে।

নীলা একটু বিস্মিত হ'য়ে গাড়ী ঘুরিয়ে নিতে বললে।

* * * *

শিবু সেদিন আর তেমন মন দিয়ে ভাল ক'রে খেলতে পারলে না। খেলার শেষে 'টেণ্টের' আড্ডাতেও সে তেমন ক'রে যোগ দিতে পারলে না! সন্ধ্যের পর সারাটা পথ সে কেবল নীলাদের কথাই ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরে এলো। তার বড্ড দুঃখ হচ্ছিল যে, অমন সুন্দর মেয়ে কেন বেশ্যা হ'ল?—

শিবুর দাদা ভোলানাথ বাড়ীর বাইরে রকে বসে একটি মস্ত হুঁকোয় কাঠের একটা বিঘৎ-প্রমাণ লম্বা নল লাগিয়ে তামাক খাচ্ছিলেন এবং সামনের বাড়ীর বিধু বাগ্‌চির সঙ্গে কলিকালের ছেলেদের বর্তমান বেচাল সম্বন্ধে নানা আলোচনা করছিলেন।

শিবু সেদিকে মোটে না চেয়েই বাড়ীর ভিতর ঢুকে প'ড়ছিল। কিন্তু, ঠিক সেই সময়েই দাদা তাকে ডাকলেন—শিবনাথ!

শিবু চম্‌কে উঠলো! দাদার গলাটা আজ যেন তার কানে অতিরিক্ত গম্ভীর ব'লে মনে হ'লো!

'আজ্ঞে!' বলে সে ভোলানাথের কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো।

ভোলানাথ হুঁকোর নল থেকে মুখটি সরিয়ে নিয়ে অত্যন্ত কঠোর ভাবে তাকে জানিয়ে দিলেন যে—আর কোনও দিন যদি তিনি শোনেন যে শিবনাথকে পাশের বাড়ীর মেয়েদের

সঙ্গে একগাড়ীতে বেড়াতে যেতে কেউ দেখেছে,—তা'হলে এ-বাড়ীতে আর তাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না—

শিবনাথ মৃদু স্বরে কি একটা জবাব দেবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ভোলানাথ রূঢ় কণ্ঠে তাকে প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বললেন—এতখানি বয়েস হয়েছে তোমার—এম্ এ পড়ছো—আর এটা জানতে পারোনি আজও যে পাশের বাড়ীর ও দুটো বেশ্যার মেয়ে!

এ কথা শুনে শিবু হঠাৎ একবার কি-জানি-কেন পাশের বাড়ীর চিক-ফেলা বারান্দার দিকে চকিতের ন্যায় চেয়ে দেখলে। আজ কিন্তু চাইবামাত্র সেই নীল চিকের ফাঁকে একখানি অতি সুন্দর মুখ সে দেখতে পেলে। এ মুখ সে আর কখনও দেখেনি! কিন্তু সে মুখে তখন ঘৃণা, লজ্জা, ক্রোধ, ক্ষোভ, সমস্ত যেন একসঙ্গে ফুটে উঠেছিল! শিবু অপরাধীর মতো ছুটে বাড়ীর মধ্যে পালিয়ে গেল!

ভোলানাথ তখন বিধু বাগচিকে বলতে সুরু করলেন—আমাকে বোধ হয় এইবার এ পাড়া ছাড়তে হ'লো। এমন চোখের সামনে ডাইনীরা যে আমার ভাইগুলোর মাথা চিবিয়ে খাবে—এ আমি দেখতে পারবো না।

তার পর শিবুকে ডেকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে নীলার এস্রাজ হাতে গড়ের মাঠে বেড়াতে যাওয়ার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে তিনি বললেন—এর একটা যদি তোমরা কিছু বিহিত না করো, তাহলে তো ভাই এই সাতপুরুষের ভিটে বেচে আমাকে বাধ্য হ'য়ে এখান থেকে চলে যেতে হবে!

ঠিক এই সময় গলির মুখে একখানা প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো। গাড়ীর তীব্র আলোয় শিবুদের সরু গলিটা আলো হ'য়ে উঠলো।

সমস্ত পথটা একটা স্নিগ্ধ সৌরভে আমোদিত ক'রে তুলে সুবোধ বাবু যখন ভোলানাথের রকের সামনে এসে পড়লেন, ভোলানাথ সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে হুঁকো-শুদ্ধ হাতে তাঁকে একটা নমস্কার ক'রে বললেন—আপনার কাছে এ গরীবদের একটু নিবেদন আছে!

সুবোধবাবু দাঁড়িয়ে গেলেন। ভোলানাথ হুঁকোর নলটায় বার দুই খুব জোরে জোরে শেষ টান দিয়ে, খুব খানিকটা চোঁয়া ধোঁয়া ছেড়ে, খানিকটা কেশে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে, হুঁকোটা বিধু বাগচির হাতে দিয়ে বললে—আপনি বড়লোক, আপনার অগাধ পয়সা, এসব আপনাকে শোভা পেতে পারে, কিন্তু, আমাদের মতো গরীব গৃহস্থের ছেলেগুলো মাটী হ'য়ে যায়—এইটেই কি আপনার ইচ্ছে?

সুবোধবাবু আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন? কি হয়েছে?

ভোলানাথ তাঁর অভিযোগ ব্যক্ত করতে গিয়ে যেমন একবার তাঁর প্রতিবেশিনীদের উল্লেখে বলে ফেলেছেন বেশ্যার মেয়ে,—সুবোধবাবু তৎক্ষণাৎ তাঁকে তীব্র তিরস্কার করে বললেন—ওদের জননী সতী লক্ষ্মী ছিলেন—তিনি সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা ছিলেন ; তাঁর সম্বন্ধে এবং আপনার প্রতিবেশিনীদের সম্বন্ধে আপনি যখনি কিছু বলবেন, বেশ সংযত ও ভদ্র ভাবে এবং তাঁদের উপযুক্ত সম্মান রেখে কথা বলবেন।

ভোলানাথ হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে উঠে বললেন—তা হয় ত' তাঁরা হ'তে পারেন ; কিন্তু, উপস্থিত ওঁদের দুই বোনের পেশাটা কি, তা জানতে পাড়ার লোকের কারুর বাকী নেই—সুতরাং

বাধা দিয়ে সুবোধবাবু বললেন—মাপ করবেন, আপনি কিচ্ছু জানেন না! ওঁদের দুই বোনের মধ্যে জ্যেষ্ঠা হ'চ্ছেন আমার স্ত্রী! কনিষ্ঠা এখনও অবিবাহিতা।

ভোলানাথ রুক্ষ ভাবে বললেন—ওসব আর আমাদের শেখাবেন না, আমরা ওসব জানি, একেবারে নেহাৎ দেহাতী লোক মনে করবেন না। সাতপুরুষ কলকাতায় বাস করছি,

আপনার মতো বড়লোকও ঢের দেখেছি। ছোট বোনটার চট্‌পট্ একটা গতি করুন—নইলে তিনি যে আমার ভাইগুর্লির মাথা খাবেন তা হ'তে দিচ্ছিনে ; হয় আমি এপাড়া ছাড়বো, আর নয় আপনার মেয়েমানুষদের এপাড়া ছাড়া করবো—তবে আমার নাম ভোলানাথ চাটুর্যে—এই বলে রাখলুম।

আপনার মতো অভদ্র ইতর লোকগুলো যাতে এপাড়া থেকে শীঘ্র দূর হয়, আমিও সেই ব্যবস্থা করবো জানবেন—অত্যন্ত অবজ্ঞার সঙ্গে এই কথাগুলো বলে সুবোধ বাবু বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন।

বিধু বাগচি বললে—কাজটা ভালো ক'রলে না দাদা,—বড়লোকের সঙ্গে বিবাদ রাখা উচিত নয়—সেই ছেলেবেলায় পড়া মৃৎপাত্র ও কাংস্যপাত্রের গল্পটা কি মনে নেই?

—আরে রেখে দাও তোমার বড়লোক! ভয় করতে হয় তোমরা ক'রগে—ভোলা চাটুর্যে কাউকে কেয়ার করে না! বলতে বলতে ভোলানাথও হুঁকো নিয়ে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

কলেজে যাবার সময় গলির মধ্যে শিবনাথ ও নীলার যে প্রত্যহই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হয়, পাড়ার কারুর কাছেই সে খবরটা চাপা ছিল না। সুতরাং ভোলানাথও, যথা সময়ে এ সংবাদ অবগত হ'য়েছিলেন। কাজে কাজেই তিনি পরের দিন থেকে অফিস যাবার সময় নিজে ভায়াকে সঙ্গে ক'রে কলেজে পৌঁছে দিয়ে আসবার প্রস্তাব ক'রলেন।

শিবনাথ বললে—দাদা, সে কি রকম করে হবে? আমাদের তো কিছু ঠিক নেই, কোনও দিন বারোটায় ক্লাশ—কোনও দিন দু'টোয় ক্লাশ—সব দিন তো দশটায় ক্লাশ থাকে না।

ভোলানাথ বললেন—বেশ, যেদিন দশটায় ক্লাশ থাকবে সেদিন আমার সঙ্গে কলেজে যাবি। আর যেদিন বেলায় গেলে চ'লবে সেদিন বাড়ীতে বসে থাকবি, যতক্ষণ না ঐ বেবুশ্যে মেয়েটা ইস্কুলে বেরিয়ে যায়! নইলে তোকে আমি বাইরের কোনও কলেজে ট্রান্স্‌ফার্ ক'রে দেবো!—

অগত্যা শিবনাথকে এই প্রস্তাবে সম্মত হ'তে হ'লো। ফলে নীলার সঙ্গে তার দেখা শোনাটা এখন সকালে না হ'য়ে বিকেলে সুরু হ'লো।

অর্থাৎ কলেজ থেকে ফিরে শিবনাথ আর বাড়ীতে ঢুকতো না, চারটের পর থেকে গলির মুখে বড় রাস্তার ধারে বেথুন কলেজের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা ক'রতো!

কিছুদিন পরে এটাও জানাজানি হ'য়ে গেল। ভোলানাথ একদিন শিবুকে ডেকে বললেন—দেখো, ছোট ছেলের মতো রোজ রোজ এমন ক'রে তোমায় ডেকে শাসন করতে আমার লজ্জা করে। বড় ভাইয়ের কথাটা অগ্রাহ্য করা কি তোমার উচিত? তবে আর তোমায় এতো লেখাপড়া শেখালুম কি জন্যে? ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে তোমার বেশ্যার মেয়েদের সঙ্গে মিশতে লজ্জা করে না একটু? শুনলুম নাকি বুড়ো ছেলে তুমি কলেজ পালিয়ে এসে মেয়েটার সঙ্গে দেখা করো—

শিবু গম্ভীরভাবে বললে—দাদা ওরা বেশ্যা নয়!

ভোলানাথ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল—না! তা কি আর? ওরা হচ্ছে খড়দার মা-গোঁসাই।

শিবু বললে—ওরা ভদ্রমহিলা—

—হ্যাঁ, একেবারে 'কুলবালা'! তুই আমার চেয়ে জানিস্ কি না? কে বলেছে তোকে ওরা বেশ্যা নয়—

—না দাদা, নয়—

—সে কি রে হতভাগা!—পাড়াশুদ্ধ লোক যে কথা জানে, তুই তা' জানিসনি আজও?

—পাড়াশুদ্ধ লোক ভুল জানে দাদা, আমিও সেই ভুলে ওই মেয়েটিকে একদিন আপনার চেয়েও ঢের বেশী অপমান করেছিলুম। লিখে দিয়েছিলুম—'তোমরা বেশ্যা—তোমাদের সঙ্গে আমি পরিচয় রাখতে ইচ্ছে করিনি' তারই উত্তরে সেইদিন প্রথম ওদের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারলুম—ওরা, যে কত মহৎ—কত উদার সে আপনার ধারণা হ'বে না—

ভোলানাথ মনে মনে বললেন—হ্যাঁ! মরেছো দেখছি একেবারে!—প্রকাশ্যে বললেন—ওদের প্রকৃত পরিচয় কি তুমি ওদেরই কাছ থেকে সংগ্রহ করেছো শিবু?—

শিবু বললে—নীলা আমায় ব'লেছে।

—নীলা! নীলা আবার কে?

—ছোটবোনের নামই তো নীলা। আর ওর দিদির নাম ইলা!—

—বটে! আজকাল ওরা নামও নিচ্ছে সব অন্যরকম দেখ্ছি—আমাদের সময়ে নাম শুনতুম্—পান্না—ফিরোজা—মতিবিবি—এই সব—

—আঃ! কি বলছেন আপনি ওসব? ভদ্রলোকের মেয়েদের অপমান করবেন না—দাদা।

শিবুর চোখে মুখে একটা বিরক্তি ও ঘৃণা ফুটে উঠ্‌ল।

ভোলানাথ সেটা লক্ষ্য ক'রে আর কিছু বললেন না ; মনে মনে ভাইটির জন্যে শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন। ভাবলেন ডাইনীরা ছোঁড়াটাকে ভালমানুষ পেয়ে গিঁথে ফেলেছে দেখছি!

শিবু বললে—আপনি যদি ওদের পরিচয় শোনেন, তাহ'লে বুঝতে পারবেন যে ওদের প্রতি আপনি কতবড় অবিচার করছেন।

ভোলানাথ বললেন—ওদের মুখে ওদের পরিচয় শুনে বিশ্বাস করবার মতো বয়েস আর আমার নেই—বুঝলে! তোমাকে আমার এই শেষ অনুরোধ যে ওদের সংস্রব তুমি ত্যাগ করো, নইলে তোমার ভবিষ্যৎ বড় বিষময় হয়ে উঠবে শিবু।

*

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হ'য়ে যাবার পর নীলা আর ইস্কুলে যেতো না। কাজেকাজেই শিবনাথের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎও আজকাল আর বড় একটা হয় না।

ইতিমধ্যে একদিন মোটঘাট্ বেঁধে ইলারা বাড়ীতে চাবী দিয়ে—কোথায় হাওয়া খেতে চলে গেল। ভোলানাথ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ভাবলেন—যাক্, আপদ গেল। এইবার দেখে শুনে ভায়ার একটা বিয়ে দিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

কিন্তু, ভোলানাথের কানে এ খবরটা আর গিয়ে পৌঁছল না, যে, পাশের বাড়ীর আপদ বালাইরা উপস্থিত কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে গেলেও ভায়ার সঙ্গে তাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি। শিবনাথ যে রাত্রি জেগে আজকাল রোজ আটপাতা ক'রে চিঠি লিখছে নীলাকে এবং নীলা যে সেই সুদূর মুশৌরী পাহাড়ের কোল থেকে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই পত্রপুটে ভরে তার আনন্দ অঞ্জলি শিবনাথের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে—এর কোনও সন্ধানই ভোলানাথ পাননি। তিনি এখন প্রায় প্রতি রবিবারেই হয় বালি, নয় বেহালা, নয় বেলঘরেতে শিবনাথের জন্য পাত্রী দেখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!

দেখতে দেখতে দু'মাস কেটে গেল। একটিও পাত্রী কিন্তু ভোলানাথ এখনও পর্যন্ত মনোনীত করে উঠতে পারলেন না! যেখানে মেয়ে পছন্দ হয়, সেখানে তারা এম এ-পড়া ছেলের উপযুক্ত দক্ষিণা দিতে অক্ষম ; যেখানে পাওনার প্রতিশ্রুতি খুব বেশী পাওয়া যায়, সেখানে কন্যাটি একেবারে যেন সাক্ষাৎ বিভীষিকা! ভায়ার জন্য ভোলানাথ কোথাও একত্রে কামিনী-কাঞ্চনের অপূর্ব সমাবেশ আবিষ্কার করতে পারছিলেন না।

অবশ্য তাঁর চেষ্টারও কোনও ত্রুটী ছিল না, বিশেষ যেদিন অফিস থেকে এসে

দেখলেন যে পাশের বাড়ীতে আবার আলো জ্ব'লছে এবং দেউড়ীতে সেই দ্বারবানটি পুনরায় তুলসীদাস ভাঁজতে সুরু ক'রেছে—তিনি পাত্রীর সন্ধানে সেদিন থেকে একান্ত ভাবে তৎপর হয়ে উঠলেন।

নীলারা ফিরেছে, কিন্তু শিবনাথের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। শিবনাথ দেখা করবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু দাদার ভয়ে তার কিছুতেই সাহস হচ্ছিল না। হঠাৎ একদিন একটা অভাবনীয় সুযোগ এসে গেল।

সেদিন গেজেটে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়েছিল। শিবনাথের ছোট ভাই শম্ভুনাথও এবার ম্যাট্রিক্ দিয়েছিল, শিবনাথ তাই একখানা গেজেট কিনে এনে রকে বসে দেখছিল। তার আশে পাশে শম্ভুনাথ এবং পাড়ার আরও অনেকগুলি ম্যাট্রিকের আসামী ছেলে ভীড় জমিয়ে তুলেছিল। মহা একটা কলরব চলছিল।

সেই সময় পাশের বাড়ীর দ্বারবান এসে একটা লম্বা সেলাম ঠুকে শিবনাথের হাতে একখানা চিঠি দিলে।

চিঠির উপর নীল পেন্সিলে নীলার হাতের মতির হরফ দেখে গেজেটখানা শম্ভুর হাতে দিয়ে শিবনাথ তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুলে পড়লে—নীলা লিখেছে—

"পাশের খবরটা জানবার জন্যে পাশের বাড়ীতে আর একটি প্রাণীও যে বিশেষ উৎসুক হ'য়ে আছে সে কথাটি কি স্মরণ করিয়ে দিতে পারি? গেজেটখানা নিয়ে যদি একবারটি দয়া ক'রে আমাদের বাড়ীতে আসেন তাহ'লে বিশেষ অনুগৃহীতা হবো। ইতি—নীলা"—

শম্ভুর হাত থেকে ছোঁ মেরে কাগজখানা কেড়ে নিয়ে—রকের ধারে জমায়েৎ সমস্ত ছেলেদের অবাক্ করে দিয়ে—শিবনাথ চক্ষের পলকে পাশের বাড়ীতে ঢুকে পড়ল।

নীলা তার জন্য নীচেয় নেমে এসেই অপেক্ষা করছিল। পরম সমাদরে শিবনাথকে সে অভ্যর্থনা করে নিলে। দুটি কমল-কোরক তুল্য কমনীয় করপুট জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সুন্দর একটি নমস্কার করে নীলা শিবনাথের কুশল জিজ্ঞাসা করলে এবং সঙ্গে করে একেবারে উপরে নিয়ে গিয়ে নিজের পড়বার ঘরটিতে এনে আপনার বসবার ইজি চেয়ারখানি আঁচল দিয়ে ঝেড়ে তাকে বসতে দিলে। আর একখানা চেয়ার টেনে শিবনাথের কাছে এগিয়ে নিয়ে এসে নিজে তাতে বসল এবং স্নিগ্ধ হাস্যে অধর-প্রান্ত রঞ্জিত করে জিজ্ঞাসা করলে—দেখলেন? ছাপার হরফে এই বদ্‌খৎ নামটা কি বেরিয়েছে?

শিবনাথ মহা অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লো। সে তো নীলার নামটা আছে কি না এখনও দেখেনি, অথচ নীলা ঠিক ক'রে বসে আছে যে সে তার নামটা নিশ্চয় দেখেছে—! শিবু কী বলবে ভাবছে, এমন সময় নীলা বললে—নেই বুঝি?

শিবু তাড়াতাড়ি বললে—এইমাত্র কাগজখানা কিনে এনেছি, আনতে না আনতেই ওরা সব কাড়াকাড়ি সুরু করে দিলে, আমি এখনও একপাতাও দেখবার সময় পাইনি!

নীলা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে শিবুর হাত থেকে গেজেটখানা কেড়ে নিয়ে বললে—তাই বলুন! চুপ করে আছেন দেখে আমি একেবারে দমে গেছলুম!

ঝড়ের বেগে নীলা গেজেটখানার পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগল—তার চোখের চঞ্চল দৃষ্টি গেজেটের প্রত্যেক পাতার উপর থেকে নীচে পর্যন্ত নেচে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ এক জায়গায় স্থির হয়ে সে বলে উঠলো—এরে!

তারপর টেবিলের উপর থেকে তার মোটা নীল পেন্সিলটা তুলে নিয়ে তার নামটায় দাগ দিয়ে শিবনাথকে দেখতে দিলে।

শিবনাথ যখন নীলার নামটা পড়ে দেখছে, নীলাও তার পাশে গিয়ে ইজি চেয়ারটার হাতলের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। নীলার একগুচ্ছ কেশ তার কানের পাশ থেকে ঝুলে এসে শিবুর কাঁধের উপর লতিয়ে পড়ল। নীলার শাড়ীর প্রান্ত একটুখানি উড়ে শিবুর

গায়ে এসে লাগল, আর তার মৃদুতপ্ত নিশ্বাসের লঘু স্পর্শ শিবনাথের কপোল রোমাঞ্চিত ক'রে তার অন্তরে-বাহিরে কি যেন একটা পুলক-শিহরণ জাগিয়ে তুললে।

শিবু নিস্পন্দের মতো গেজেটখানার সেই নীল দাগ দেওয়া নামটার দিকে চেয়ে কী স্বপ্ন দেখছিল কে জানে—নীলা জিজ্ঞাসা করলে—আপনার বিশ্বাস হ'চ্ছে না বুঝি?

শিবু ঈষৎ যেন চমকে উঠে বললে—কেন? বিশ্বাস হ'বে না কেন? এমন স্পষ্ট লেখা রয়েছে—নীলা রায়—

শিবুর কথা শেষ হবার আগেই নীলার দিদি ইলার গলা পাওয়া গেল ; তিনি বললেন —কে এসেছে রে নেলি?

বলতে বলতে ইলা সেই ঘরে এসে উপস্থিত হ'লো। নীলা অমনি ফস্ ক'রে গেজেটখানা শিবুর হাত থেকে টেনে নিয়ে তার দিদির সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—চেয়ে দেখো একবার—চক্ষু-কর্ণের বিবাদটা ভঞ্জন ক'রে নাও এইবেলা, বড্ড যে বলেছিলে আমি কলাটি পাশ হবো—পড়ে দেখো ফার্স্ট ডিভিশন্!

ইলা পড়ে দেখে বললে—তাই ত রে! এ যে তোর নামই দেখছি! সত্যিই তবে পাশ হ'য়ে গেলি না কি নেলি?—

—ওই দেখুন শিবুবাবু, দিদিও আমার ঠিক আপনারই মতো কিছুতেই বিশ্বাস ক'রতে চাইছে না যে আমি পাশ করিছি! সুবোধবাবু যে দিন য়ুনিভার্সিটি থেকে খবর এনে দিলে—দিদি হেসে উড়িয়ে দিলে! বললে ভুল হ'য়েছে, ও আর কোনও নীলা হবে। আমাদের এ নীলা নয়! আজ গেজেটে ছাপার হরফে নাম বেরিয়েছে তবু দিদি সন্দেহ ক'রছে—

ইলা আবার জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ রে নেলি! তবে কি সত্যিই পাশ হয়েছিস—?

নীলা কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ ক'রে বললে—না-না রামঃ! সত্যি কখনও পাশ হ'তে পারি? ও আমি ঘুস্ দিয়ে গেজেটে নামটা ছাপিয়ে নিয়েছি!...কি বলেন শিবুবাবু?— আপনারও বোধ হয় তাই বিশ্বাস?—

শিবু একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললে—কই আমি তো একবার এরূপ কোনও সন্দেহ কখন প্রকাশ করিছি বলে মনে পড়ছে না?

এতক্ষণে শিবনাথের প্রতি ইলার দৃষ্টি পড়লো। ছোট্ট একটি নমস্কার করে বললে—এই যে—আপনি এসেছেন যে! কতক্ষণ?

শিবনাথ আশ্চর্য হয়ে—ইলাকে প্রতিনমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কি আমাকে চেনেন?

ইলা হেসে বললে—বুড়ো হ'য়েছি বটে, কিন্তু আমার দৃষ্টি-শক্তি এখনও এত ক্ষীণ হয়নি যে, পাশের বাড়ীর লোককে চিনতে পারবো না! তাছাড়া, নীলার মুখে যে শিবনাথ বাবুটির সুখ্যাতি শুনতে শুনতে কানে আমার তালা ধরে যাবার যোগাড়—তাকে কি সে আমায় না চিনিয়ে দিয়ে ছেড়েছে মনে করেন? একদিন হাত ধরে টেনে এনে সে আমাকে বারান্দার চিক্ সরিয়ে আপনাকে দেখিয়ে দিলে। আমি আপনাকে দেখেই বললুম—এটি তো আমাদের পাশের বাড়ীর ছেলে! ওকে আমি অনেকবার দেখেছি, দু'টি চোখে অবাক্ আগ্রহ ভরে নিয়ে এই বারান্দার নীল চিকগুলোর দিকে কতদিন চেয়ে থাকে!

এই ব'লে ইলা ক্ষণকাল চুপ ক'রে রইল। তারপর একটু দুষ্টুমীর হাসি হেসে শিবনাথকে জিজ্ঞাসা করলে—চিকের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতেন কেন? আমাদের এই নীল চিকগুলো খুব সুন্দর দেখতে, না?

নীলা হেসে উঠে বললে—দিদি যেন কী। উনি বুঝি চিকের সৌন্দর্য দেখবার জন্যই চেয়ে থাকতেন?—

ইলা এবার বোনের দিকে চেয়ে বললে—তবে বুঝি তোমাকে একবার দেখতে পাবার

লোভেই কাঙালের মতো শিবনাথবাবুর ব্যাকুল দৃষ্টি এই বারান্দার দিকে প্রত্যহ চোখ পেতে চেয়ে থাকতো?

শিবনাথ যেন শ্বশুর-বাড়ীতে আসা নূতন জামাইটির মতো লজ্জায় ঘাড় হেঁট ক'রে বসে রইল।

নীলা তার সুন্দর মুখখানি সরমে রাঙা ক'রে তুলে বললে—যাও, তুমি ভারী দুষ্টু!

ইলা শিবনাথের দিকে ফিরে হাসতে হাসতে বললে—আচ্ছা, তুমিই বলো তো ভাই, আমার কথা ঠিক কি না?

পর মুহূর্তেই শিবনাথকে 'তুমি' বলে ফেলাটা হয়ত' অভদ্রতা হয়ে গেল ভেবে ইলা বললে—তোমাকে ভাই আমি ছোট ভা'য়ের মতো দেখি,—নীলা তোমায় দাদার মতো ভালবাসে ; সুতরাং তুমি আমাদের স্নেহের পাত্র। তোমায় যদি শিবনাথ বাবু, আপনি, মশাই না বলতে পারি, তুমি রাগ করবে না ত?

শিবনাথ শুধু বললে—আপনি আমারও দিদি।

এ কথাটা শুনে নীলার মনের মধ্যে কেমন একটা অহেতুকী স্ফূর্তি হ'লো! সে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে বললে—দিদি, পাশ করলুম, আমাকে একদিন খাওয়াবে না?

ইলার মুখখানি সহসা গম্ভীর হয়ে উঠলো! ভারী গলায় ব'ললে—পাশ ক'রে আর কার মাথা কিন্‌লি নীলা? গভর্মেণ্ট আফিসে কি চাক্‌রী করতে যাবি? যে রকম ব্যাপার দেখছি, তোকে বোধ হয় শেষটা 'নার্স' কিম্বা 'মিডওয়াইফ্' হ'য়ে জীবনটা কাটাতে হবে। এখন থেকেই পাড়ায় আমাদের যে রকম সুনাম রটতে সুরু হয়েছে, তাতে কোনও ভদ্রলোকের ছেলে যে তোমায় বিয়ে করতে সাহস করবে, আমার তো তা মনে হয় না!

শিবু তাড়াতাড়ি বললে—না দিদি, যে শুধু লোকের কথা শুনে বিশ্বাস করবে সে হয়ত ভয় পাবে, কিন্তু, যে আপনাদের পরিচয় পাবে সে নীলাকে বিবাহ করা তার একটা সৌভাগ্য বলেই মনে করবে!

নীলা আস্তে আস্তে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল!

ইলা বললে—দেখো ভাই, তোমাদের ওই কবিত্ব-টবিত্ব আমার সত্যিই বলছি একটুও ভাল লাগে না! আমি সাদা কথার মানুষ সোজাসুজি চলতে ভালবাসি! নীলা আমার প্রায় সতেরোয় পড়লো। আমি একটি সৎপাত্র দেখে ওর বিয়ে দিতে চাই। আমাদের বাঙালীর ঘরের মেয়ে সতেরো আঠারো বছরের বেশী থুবড়ী করে রাখা ঠিক নয়!

শিবু খুব উৎসাহের সঙ্গে বললে—আপনি যা বলছেন সে কথা খুব ঠিক্ ; কিন্তু, ও-বয়সের আগেও কোনও মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। অল্প বয়স থেকেই সন্তান প্রসব করার দরুণ আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়ে জীবনে কখন আর সুস্থ সবল ও পরিপুষ্ট যৌবন লাভ করতে পারে না! তারা প্রায় চিররুগ্না হয়ে থাকে, নয় অকালে ইহলীলা সম্বরণ করে!

—সে তো চোখের উপরই দেখতে পাচ্ছি ভাই, কিন্তু, উপায় কি বলো? আমাদের সমাজ যে সেটা মানতে চায় না? সে কারুর যুবতী কন্যা অনূঢ়া আছে দেখলে তার নামে দুর্নাম রটায়!

—সে রকম মূঢ় সমাজের বিধি ব্যবস্থা না মানাই উচিত!

—না মেনেও যে উপায় নেই দাদা! মানুষ তো সমাজ ছাড়া জীব নয়! ছেলে মেয়ের বিয়ে দেবে সে কেমন ক'রে?

—ছেলে মেয়ে তাদের সুশিক্ষা ও সদ্‌গুণের জোরে সমাজের বুকের উপর দিয়ে তাদের সত্য ও ন্যায়ের বিজয়-রথ চালিয়ে নিয়ে চলে যাবে—সমাজ বাধ্য হয়ে তাদের নতশিরে মেনে নেবে—

—তোমার কি সে সাহস আছে?

—নিশ্চয় আছে। আমি দেখাতে চাই যে আমরা সমাজের দাস নই—প্রভু!

—তোমার কথা শুনে মনে বেশ জোর পাচ্ছি, কিন্তু আমার অবস্থা যে অন্য রকম ভাই! সমাজ যে আমার ললাটে কলঙ্কিনীর ছাপ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে—

কথাটা শুনে শিবু একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠলো ; উত্তেজিত ভাবে বললে—কিন্তু, আপনি ত কলঙ্কিনী নন—কোন্ পাষণ্ড বলে? আমি তাদের কথা বিশ্বাস করিনে—

শিবুর কথা শুনে ও তার ভাবভঙ্গী দেখে ইলা এবার হেসে ফেললে—বললে—তোমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের উপর তো সমাজের মত বদলাবে না শিবনাথ! কলঙ্কের অপবাদ একবার কানে এসে পৌঁছলেই হ'ল! লোকে আর বিচার করে তলিয়ে দেখে না যে সেটা সত্য কি মিথ্যা—সম্ভব কি অসম্ভব—সে অপবাদ তারা তৎক্ষণাৎ অবিসম্বাদী সত্য বলে চরম সিদ্ধান্ত করে ব'সে!

এই পর্যন্ত বলে ইলা চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ আত্মস্থ হ'য়ে কি যেন ভাবলে। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—আর লোকেদেরই বা দোষ কি? চিরদিন সর্বশাস্ত্রের মারফৎ তারা শিখে আসছে—স্ত্রীলোককে অবিশ্বাস করতে, ঘৃণা করতে। নারী নরকের দ্বার—নারী-চরিত্র দেবতারও দুর্জ্ঞেয়—ক্রোড়স্থ নারীকেও বিশ্বাস কোরবে না কখন—এই-সব শিক্ষা ও সংস্কার নিয়েই তো এ দেশের ও এ সমাজের পুরুষেরা বড় হচ্ছে। সুতরাং তাদের কাছে নারী আর কি সুবিচার প্রত্যাশা ক'রতে পারে বলো?...তাই ত আমার মাঝে মাঝে ভয় হয় যে, হয়ত নীলাকে আমার সুখী ক'রতে পারবো না। আমি এই সমাজের অন্যায় বিধিকে অবজ্ঞা করিছি, সে কি আমাকে তার শাস্তি না দিয়ে ছাড়বে? নিশ্চয় সে কাপুরুষের মতো আমার এই নিরপরাধ নির্দোষ বোন্‌টির কল্যাণের বিরোধী হ'য়ে, আমাকে সাজা দেবে।

শিবনাথ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বললে—নীলার জন্যে আপনি কিছুমাত্র ভাববেন না। কেউ যদি ওকে গ্রহণ করতে না চায়—আমাকে জানাবেন—

—তোমাকে জানিয়ে কি লাভ? মিছে তোমার মনে কষ্ট দেওয়া বৈ' ত' নয়। তুমি ভাই, ওকে যেরকম ভালবাসো শুনিছি—তাতে নিশ্চয় ওর দুঃখের দুঃসংবাদ তোমার প্রাণে খুবই লাগবে।—

শিবু দু'একবার মাথাটা চুল্‌কে নিয়ে—বলে ফেললে—আমাকে যদি অযোগ্য পাত্র বলে বিবেচনা না করেন, তাহলে—আমি যদি নীলার পাণিগ্রহণ ক'রে ধন্য হ'তে পারি।

ইলা এই কথাটাই তার মুখ থেকে এতক্ষণ শুনতে চাচ্ছিল। তবু সে উচ্চহাস্য ক'রে উঠে বললে—তুমি কি পাগল হ'য়েছো ভাই? তোমার হাতে যদি ওকে তুলে দিতে পারতুম—তাহ'লে—তার চেয়ে সুখের আর কি হ'তে পারতো বলো? কিন্তু তা যে হবার জো নেই দাদা! নেলিকে মুশৌরীতে লেখা তোমার কবিত্বপূর্ণ চিঠিখানা পড়ে অবধি আমি সেটা অনেক ভেবে দেখেছি। সে হয় না,—তোমার দাদাই এ বিবাহের প্রধান বিরোধী হবেন,—তুমি কি আর তোমার দাদার অমতে বিবাহ করতে পারবে? আর পারলেও সেটা কি করা উচিত?

—অনুচিতই বা কিসে? তিনি আপনাদের সঠিক পরিচয় জানেন না—একটা ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছেন। কিন্তু, আমি তো আপনাদের সমস্ত ইতিহাস জানি—তাছাড়া—আপনাদের এ মিথ্যা কলঙ্ক ও অপবাদ যদি সত্যও হ'তো, তাহ'লেও আমি নীলাকে গ্রহণ ক'রতে কিছুমাত্র দ্বিধা করতুম না—যদি—

ইলা আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলে—যদি কি?—

সলজ্জ বিনত মুখে শিবনাথ বললে—যদি জানতে পারতুম যে—আমাকে বিবাহ করলে নীলা নিজে সুখী হবে বলে মনে করে—

একখানি জাপানি কাঠের রঙীন ট্রের উপর চক্‌চকে চীনে মাটির ফুলকাটা পিয়ালায়—গরম চা এবং আর একখানি প্লেটে কিছু জলখাবার সাজিয়ে নিয়ে নীলা সে ঘরে ফিরে এলো—এবং শিবনাথের সামনে অঞ্জলি দেবার মতো দু'হাত বাড়িয়ে সেগুলি ধ'রে বললে—পাশের খবর শুনিয়েছেন, একটু মিষ্টিমুখ করুন!

শিবু বললে—সে হিসেবে আমার ওতে কোনও claim নেই ; কেন না, খবরটা আসলে সুবোধবাবুই আগে দিয়ে ছিলেন, আমি শুধু গেজেটখানা দেখিয়েছি। তবে খেতে আমার কোনও আপত্তি নেই এইটুকু বলতে পারি। মিষ্টিমুখ ক'রতে আমি খুব মজবুত—

বলতে বলতে শিবু এক হাতে চায়ের কাপটি এবং আর এক হাতে জলখাবারের প্লেটটা তুলে নিলে।

ইলা বললে—শুধু মিষ্টিমুখ করিয়ে ফাঁকি দিলে চলবে না, নেলি, শিবনাথকে তোমার মিষ্টি গলার একখানি গানও শুনিয়ে দিতে হবে—

নীলা লজ্জায় আরক্ত হ'য়ে উঠে বললে—আমি বুঝি গাইতে জানি?

শিবু বললে—গান না শোনালে কিন্তু আমি জলস্পর্শ করছিনি—এই রইল তোমার চায়ের বাটী আর জলখাবার!

অগত্যা নীলা গিয়ে টেবিল হারমোনিয়মটার ডালা খুলে ঘাড় বেঁকিয়ে তার বিলোল আঁখি মেলে শিবনাথের দিকে চেয়ে বলে ব'সলো—

—কিন্তু, আপনাকেও একটা গাইতে হবে!—

শিবু বললে—আচ্ছা!

নীলা বললে—কার গান শুনতে আপনার ভাল লাগে বলুন—

শিবু বললে—একটিমাত্র লোকের—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর!

নীলা হারমোনিয়মে সুর দিয়ে—গান ধরলে—

—আজি গন্ধ-বিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে?
আজি ক্ষুব্ধ নীলাম্বর মাঝে
এ কি চঞ্চল ক্রন্দন বাজে—

শিবনাথ গান শুনতে শুনতে এমনি তন্ময় হ'য়ে পড়লো— তার হাতের গরম চা'য়ের পেয়ালাটা জুড়িয়ে জল হ'য়ে গেল!

ইলা শিবনাথকে এ বিষয়ে সচেতন ক'রে দিয়ে বললে—গান শোনা আর পান করা একসঙ্গে কখন অভ্যাস না থাকলে এই অসুবিধে হয়!

শিবু অপ্রস্তুত হ'য়ে সেই ঠাণ্ডা চায়ের বাটিটাই ঢক্‌ঢক্ করে এক নিঃশ্বাসে শেষ ক'রে ফেলে জলখাবারে মনোযোগ দিলে—এবং নীলাকে জিজ্ঞাসা করলে—

"সে কোন্ বনের হরিণ
ছিল আমার মনে—"

এ গানটা জানো?

নীলার সুললিত কণ্ঠ সুমধুর তানলয়ে আবার ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠলো! নীলার গান শেষ হবার পর দুই বোনের একান্ত পীড়াপীড়িতে শিবনাথ গাইলে—

—"আমার নয়ন ভুলানো এলে
শিউলিতলার পাশে পাশে
ঝরাফুলের রাশে রাশে
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ রাঙা চরণ ফেলে!"

এমনি করে তিন চারখানা গান শুনে ও শুনিয়ে শিবু যখন বিদায় নিয়ে ফিরলো. তখন বেলা বারোটা বেজে গেছে।

ইলা আসবার সময় বিশেষ করে তাকে ব'লে দিলে—আজ রাত্রে এসে নেলির পাশের খাওয়া খেয়ে যাবে, তোমার নিমন্ত্রণ রইল আমার কাছে—

শিবনাথ প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলো যে সে নিশ্চয় আসবে। যে গানের সুর কতদিন তাকে বাড়ী থেকে টেনে বার করে এনে পাশের বাড়ীর বারান্দার চিকের দিকে চাইয়ে দাঁড় করিয়ে রাখতো—তার প্রত্যক্ষ উপভোগের লোভ কি সহজে ত্যাগ করা যায়! তার উপর এই দু'টি মেয়ের এই অকুণ্ঠ ব্যবহার, এই আন্তরিক যত্ন আদর!—এ যে শিবনাথের জীবনে এক নূতন আনন্দ-আস্বাদের অনুভূতি এনে দিলে!

নীলার দিদি ইলাকে শিবনাথ এই প্রথম দেখলে। যেমনি সুন্দর দেখতে, তেমনি সুন্দর কথাবার্তা, তেমনি সুন্দর ব্যবহার! কতই বা বয়স—পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নিশ্চয়ই নয়—শিবুর চেয়ে হয়ত, মাত্র দু'এক বছরের বড় হবে—কিন্তু মনে হয়—যেন স্নেহে সে তার স্বর্গগতা মায়ের মতো! কথা কয়ে মনে হ'লো—যেন সে কত বড়, আর তার সঙ্গে যেন কতদিনের পরিচয়!

এমন পরিপূর্ণ আনন্দ শিবু তার জীবনে আর কোনও দিন পায়নি। বেশ প্রফুল্ল চিত্তে ও প্রসন্ন মনে সে বাড়ীতে এসে ঢুকলো। সদরেই দাদা দাঁড়িয়ে ছিলেন—জিজ্ঞাসা করলেন—এত বেলা পর্যন্ত কোথায় ছিলি?—

গম্ভীর ভাবে—'পাশের বাড়ীতে' বলে শিবনাথ ভিতরে চলে গেল।

ভোলানাথ ভায়ার উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বুঝলেন ছোক্‌রা বিগড়েছে—নইলে এতবড় স্পর্ধা—এতখানি সাহস সে কোথায় পেলে?

শীঘ্রই যে একটা কড়া-রকম কিছু বিহিত করা চাই, ভোলানাথ এ বিষয়ে একেবারে দৃঢ়সঙ্কল্প হ'য়ে উঠলেন।

বিকেলের দিকে শিবনাথ তার নিমন্ত্রণের কথা বৌদিকে জানাতে, বৌদি জিজ্ঞাসা ক'রলেন—কোথা গো?

—অনেক দূর!

—তবু! আমরা কি শুনতে পাইনি।

—দাদাকে ব'লবে না বলো?

—এমন কোনও প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারবো না, ঠাকুরপো!

শিবনাথ একটু ভেবে বললে—আমাদের পাশের বাড়ীতেই আজ আমার নিমন্ত্রণ হয়েছে!—নীলা 'পাশ' হ'য়েছে—তাই তার দিদি আজ আমাকে খাওয়াবেন।

বৌদির 'মুখের হাসি' মিলিয়ে গেল। তিনি বললেন—ঠাকুরপো, ওদের বাড়ী আর যেও না। ওই রকম একটি গাইয়ে বাজিয়ে দেখে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে উনি তোমার বিয়ে দেবেন ঠিক ক'রেছেন—! আজ সকালে নাকি তাঁর অবাধ্য হ'য়ে তুমি পাশের বাড়ীতে গিয়েছিলে, তাই উনি বড্ড রাগ করছিলেন—শুনিছি ও বাড়ীর মেয়েরা না কি ভালো নয়!

—ভুল শুনেছো বৌদি, ওরা খুব ভালো—

—না ভাই, পুরুষমানুষদের মন ভোলাবার জন্য ওরা ওই-রকম ভালো সেজে থাকে—তারপর তার যথাসর্বস্ব ভোগা দিয়ে নিয়ে তাকে পথের ভিখারী ক'রে ছেড়ে দেয়—

—আঃ! কি ব'ল্‌ছো বৌদি! ওরা বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মেয়ে!

—না—বিশ্বাস কোরনা ভাই, ওরা ওই-রকম ভদ্রলোকের মেয়ে সেজে থাকে। তুমি যেও না ঠাকুরপো, তোমার যথাসর্বস্ব কেড়ে নেবে—

শিবু ব'ললে—সেইটেই তো আজ আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ বৌদি যে, ওদের দেবার মতো আজ আমার কিছু নেই। আমার যদি কিছু থাকতো, তাহ'লে ওদের কেড়ে নিতে হ'তো না, আমি নিজেই উপযাচক হ'য়ে আমার যথাসর্বস্ব ওদের বিলিয়ে দিতুম!

দুই চোখ কপালে তুলে বৌদি বললেন—তবে তো তোমার দাদা ঠিকই বলেছেন, ওরা তোমায় গিঁথে ফেলেছে!

—পরকে আত্মীয় করে নেওয়া—এর মানে যদি তোমাদের শাস্ত্রে 'গিঁথে-ফেলা' বলে, তাহ'লে তোমাদের অনুমান মিথ্যে নয় বৌদি!

—ওই যে ছেনাল ছুঁড়ীটা রোজ ইস্কুলে যাবার সময় তোমায় ইসারা ক'রে ডাকতো—সেইটের সঙ্গেই বুঝি তোমার একটু নট্‌ঘট্ হয়েছে?—

—ছি ছিঃ—বৌদি, তোমরা ভদ্রঘরের মেয়ে হ'য়ে এ-সব কি ভাষা ব্যবহার ক'রছো বলো তো—তোমাদের মুখে একটু বাধে না?

—আহা, রাগ করো কেন ঠাকুরপো! আমি তো আর তোমার 'সুইটহার্টকে' কোনও গাল দিইনি ভাই, অল্পবয়সী মেয়েদের আমাদের মা-ঠাকুমার আমল থেকেই 'ছুঁড়ী' বলা হয়, ওটা কিছু মন্দ কথা নয়!

—কিন্তু, তুমি তো বৌদি মা-ঠাকুমার আমলের মেয়ে নও—তুমি লেখাপড়া শিখেছো, ইংরিজি জানো, তোমার কি ও সব বর্বর যুগের ভাষা আর ব্যবহার করা উচিত?—

—বর্বর যুগের ভাষা কি ব'লছো ঠাকুরপো! ইংরিজীতে তোমার যাকে ব'লে girlie—আমাদের 'ছুড়ী' হ'চ্ছে অনেকটা তাই। তবু আমরা কুড়ি পেরুলে আর কাউকে ও নামে অভিহিত করিনি। কিন্তু ও-দেশে জানো তে চল্লিশেও girlie!—

কিন্তু ওই আর একটা কথা?

শিবুর বৌদি হেসে উঠে বললে—'ছেনাল' কথাটায় তোমার আপত্তি হ'চ্ছে ঠাকুরপো? —কিন্তু ইংরিজীতে যদি Coquette বলতুম, তাহ'লে কি তুমি আপত্তি ক'রতে?

শিবু বললে—সে তো Coquette নয়! তা'ছাড়া বাংলায় ও কথাগুলো বড় বিশ্রী শোনায়,—তুমি আর ব্যবহার কোরো না—

বৌদি বললেন—আচ্ছা, সে না হয় হোলো ; কিন্তু তোমার দাদা বলেছেন, কাল তোমাকে একজনরা দেখতে আসবেন,—তুমি সকালে বাড়ী থেকে বেরিও না যেন—

শিবনাথের মুখ এবার আরও গম্ভীর হয়ে গেল, বললে—দাদা কি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই আমার বিয়ে দিতে চান না কি? দাদাকে বোলো আমি এম-এ পাশ না ক'রে বিয়ে করবো না।

—তা বেশ তো, এখন দেখাশুনো এবং আশীর্বাদ-পত্র সব হয়ে থাক। তার পর এম-এ পাশের খবর বেরুলে না হয় চার হাত এক হবে—এখন ওটা মুলতুবী থাক। আর এম-এ পরীক্ষারও তো বেশী দিন দেরী নেই ; সেদিন তো বলছিলে—আসছে মাসের গোড়াতেই সুরু হবে!

শিবু একটু উত্তেজিত হ'য়ে বললে—না না—দাদাকে বোলো—আমি বিয়ে করবো না—আর যদি কখনও করি, তাহ'লে—ওই পাশের বাড়ীর মেয়েটিকেই বিয়ে করবো—

এই কথা বলেই পলক না ফেলতে শিবনাথ বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

শিবনাথ একেবারে নীলাদের ওখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে বাড়ী ফিরলো যখন, তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটা। ভোলানাথ ঘুমিয়েছে। শম্ভু বাইরের ঘরে শুয়েছিল। তাকে শিবনাথ জানলা দিয়ে চাপা গলায় আস্তে আস্তে অনেকবার ডাকলে, কিন্তু শম্ভুর ঘুম ভাঙল না। দরজা খুলে দিলে একটা হারিকেন লণ্ঠন হাতে তার বৌদি এসে।

শিবনাথ ঢুকতেই, বৌদি বললে—বাকী রাতটুকুও তো ও বাড়ীতে থেকে এলেই পারতে ঠাকুরপো! নিমন্ত্রণ কি এতক্ষণ ধরে খাচ্ছিলে? কী এতো হাতী-ঘোড়া খাওয়ালে শুনি?

—অপরাধীর মতো নিম্নস্বরে শিবনাথ বললে—খাওয়ার জন্যে দেরী হয়নি বৌদি, দেরী হয়ে গেল আজ ওদের সুবোধবাবুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে!—বড় ভালো লোক!

—হ্যাঁ, তোমার কাছে তো এখন ওদের বাড়ীর বিড়ালটা কুকুরটা পর্যন্ত ভাল লাগবেই! কিন্তু—তোমার দাদা যে এদিকে কোনও কথা শুনবেন না বললেন! জোর করে তোমার বিয়ে দেবেন ব'লে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন।

—এই দেখো বৌদি—আমাদের অভিভাবকদের কতবড় অন্যায়!—বিয়ে যে করবে তার মতামতের যেন কিছুই প্রয়োজন নেই! নিজেদের খেয়াল মতো যেখানে হোক্ দিয়ে দিলেই হ'লো? এই জন্যে কত যে জীবন এ দেশে অসুখী হ'য়ে যাচ্ছে, তার কোনও হিসেব রাখো কি?

—না ভাই, রাতদুপুরে আমার আর অত হিসেব নিকেশের সময় নেই। আমরা হিঁদুর মেয়ে, বাপ-মা, গুরুজন, এঁরা যার হাতে মন্ত্র পড়ে সঁপে দেন, তাকেই আমরা মনে মনে ইষ্টদেবতা বলে বরণ করে নিই! স্বামী যদি ভালবাসেন—ভাগ্য বলে মানি, যদি অবহেলা করেন—অদৃষ্টের দোষ দিয়ে মুখ বুজে সারা জীবন শুধু নিজেদের কর্তব্যটুকু করে যাই।

শিবনাথ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠে বললে—তার কারণ কি জানো বৌদি? ছেলেবেলা থেকে তোমাদের শেখানো হয়েছে যে—মেয়েমানুষ হ'য়ে যখন জন্মেছো তখন তোমার নিজের আর স্বাধীন ইচ্ছে বলে কিছু থাকতে পারে না!—তোমরা মেয়েমানুষ—জগতের অতি হেয় জীব! পুরুষের ক্রীতদাসী হবার জন্যই তোমাদের জন্ম। ছোটো বেলায় খেলনা-পুতুল বা খাবার-দাবার নিয়ে যখন ভায়েদের সঙ্গে সমান ভাগের দাবী ক'রতে—তখন থেকেই তোমাদের বলে দেওয়া হ'য়েছে যে—মেয়েমানুষের কিছু চাইতে নেই, নিতে নেই, খেতে নেই, ছুঁতে নেই। তাদের দয়া করে যা' দেওয়া হবে, তাই তাদের যথেষ্ট বলে মেনে নিতে হবে। আজন্ম এই সব শুনে শুনে, আর এই রকম ভাবে প্রতিপালিত হয়ে, তোমরা তোমাদের স্বাধীন সত্তাটুকু হারিয়ে ফেলেছো! যে নিষ্ঠুর—যে দুশ্চরিত্র—যে ব্যভিচারী—ঘটনাচক্রে সে যদি তোমাদের স্বামী হয়,—তোমরা অমনি তাকে দেবতার সম্মান দিয়ে বিশ্বদেবতার অপমান ক'রতে একটুও ইতস্তত করো না—

—রক্ষে করো ঠাকুরপো, তোমার বক্তৃতা থামাও। এত রাত্রে বাড়ী একেবারে গোলদীঘি করে তুললে দেখছি! তোমার সার কথা আমি বুঝতে পেরেছি—তুমি ওই মেয়েটাকেই বিয়ে করতে চাও?—

—নিশ্চয়!

—তাহ'লে তোমায় একটা কথা বলে রাখি ভাই, রাগ কোরো না, আমি ভদ্রঘরের মেয়ে—ভদ্র পরিবারের কুলবধূ, আমি আমার বাড়ীর অন্তঃপুরে ওসব মেয়েদের ঢুকতে দিতে পারবো না!

—সে তোমার অভিরুচি বৌদি, কিন্তু এটা জেনে রেখো যে—সে মেয়েটিও ভদ্রবংশের কন্যা এবং স্ত্রীও হবে সে ভদ্রলোকেরই।

—বেশ, তোমার দাদাকে এ সব কথাই জানাবো। শুধু আমার একটি কথা তুমি মনে রেখো ঠাকুরপো, যে, এক অজ্ঞাতকুলশীলা, কলঙ্কের ছাপমারা, কুলটার কুহকে মুগ্ধ হয়ে যেন জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল কোরে বোসো না!

—তোমার এ উপদেশ বাহুল্য মাত্র! আমি ওদের খুব ভাল ক'রেই জেনেছি বৌদি! তুমি একে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে বটে ; কিন্তু, আজ যদি আমার মা বেঁচে থাকতেন,

তাহলে তিনি তাঁর সন্তানের মনোনীত পুত্রবধূকে কখনই প্রত্যাখ্যান করতেন না—এ আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি!

—মা থাকলে আজ কি করতেন না করতেন, সে আমি ঠিক বলতে পারিনি। পুত্র স্নেহের বশে হয়ত তুমি যা বলছো তিনি তা ক'রতে পারতেন, কিন্তু তাঁর অবর্তমানে আমাকে যখন এ গৃহের শুভাশুভের ভার নিতে হয়েছে, আমি তখন নিজের শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম ও বিবেক এবং কর্তব্য-বুদ্ধি অনুসারে তাঁদের এ শুদ্ধান্তঃপুরের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য, এ সংসারের কল্যাণ ও এ পরিবারের মঙ্গল বিধানের জন্য--যা করা উচিত ও প্রয়োজন বলে মনে করবো, তা যতই কঠোর ও অপ্রিয় হোক্—পাষাণে বুক বেঁধে আমাকে তা ক'রতেই হবে। যদি এতে তুমি তোমার প্রতি আমার স্নেহের অভাব বোধ করো—আমি নিরুপায়! কিন্তু, ঈশ্বর জানবেন ঠাকুরপো, যে, কী বেদনার অন্তর্দাহ নিয়ে আমাকে সে কাজ করতে হবে!

শিবনাথ আর কোনও কথা না ব'লে শুতে চলে গেল—

সকালে খেতে বসে ভোলানাথ শিবুকে বললে--তোমার বৌদির কাছে সব কথা শুনলুম। এ-রকমটা যে হবে তা আমি পূর্বেই আশঙ্কা করিছিলুম ; তাই সময় থাকতে তোমায় পাশের বাড়ীর সংস্রবে থাকতে বিশেষ ক'রে নিষেধ করিছিলুম। কিন্তু তুমি আমার অবাধ্য হয়ে গোপনে ও-বাড়ীতে যাতায়াত রেখেছিলে, এমন কি, কাল না কি ওদের বাড়ীতে রাত্রে নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছো! যাক্, সে যা করবার করেছো, এখন বড় হ'য়েছো, লেখাপড়া শিখেছো, মনে করেছিলুম মানুষ হয়ে উঠবে। অল্পবয়সে বাবা মারা গেছলেন, আঠারো বছরের ছেলে আমি, আমার ঘাড়ে সমস্ত সংসারের ভার এসে পড়েছিল। ইচ্ছে থাকলেও বেশী কিছু লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পাইনি, তাই নিজে না-খেয়ে-না-পরে তোমাদের ভাল ক'রে কলেজে পড়িয়েছি, কিন্তু, এখন বুঝতে পারছি—ভুল করিছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে তোমরা নিজেদের ধর্ম ও সমাজকে হেয় জ্ঞান ক'রতে শিখেছো, পূর্বপুরুষদের কৃত বিধি-নিষেধগুলোকে বর্বরতা আখ্যা দিয়ে অমান্য করে চলো--কিন্তু, আমি মূর্খ মানুষ—আমি আমার বংশের পুরুষ-পরম্পরার ধারা—আমার পিতৃপিতামহদের নির্দেশিত বিধিব্যবস্থাগুলিকে অস্বীকার করে চলতে পারবো না। তুমি যে কন্যাকে বিবাহ করবে ব'লে কৃতসঙ্কল্প হ'য়েছো, তাকে আমি এ গৃহে স্থান দিতে অক্ষম জানবে। তুমি যদি আমার অমতেও কোনও জানিত ভদ্রপরিবারের মেয়েকে বিবাহ ক'রে আনতে, তাহলেও আমি তোমার পত্নীকে আমার পরিবার-ভুক্ত করে নিতে কিছুমাত্র আপত্তি করতুম না,; কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি তোমার বদখেয়ালীর পোষকতা করে সমাজদ্রোহী হ'তে পারবো না। কারণ, আমার অনেকগুলি পুত্র-কন্যা রয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দেওয়া, তাদের প্রতি অবিচার করা পিতার কর্তব্য নয়। সুতরাং তুমি যদি ওইখানে বিবাহ করাই একবারে স্থির সিদ্ধান্ত ক'রে থাকো, তাহ'লে আগে আত্মনির্ভরতা শেখো এবং পত্নীকে নিয়ে পৃথক থাকবার জন্য প্রস্তুত হও। কারণ, এ বাড়ী আমার স্বকৃত উপার্জনে প্রস্তুত হ'লেও, এর মালিক তোমার বৌদিদি। তার ইচ্ছে নয় যে ওরূপ কোনও স্ত্রীলোক তুমি এ বাড়ীতে এনে রাখো। বুঝলে?—

শিবনাথ কোনও কথা না ব'লে নিঃশব্দে আহার করছিল, শেষকালে শুধু একটি জবাব দিলে—যে আজ্ঞে।

এম-এ পরীক্ষা হয়ে যাবার পর শিবু যেদিন আবার নীলাদের বাড়ী বেড়াতে গেল—ইলা এসে কুশল প্রশ্ন ক'রে বললে—ইস্! একজামিনের পড়া পড়ে পড়ে ভায়া আমার রোগা

হ'য়ে গেছে দেখছি।

শিবু বললে—হ্যাঁ, বড্ড খাটুনী গেছে—আপনাদের সব খবর কি বলুন!

—আর আমাদের খবর! তোমাদের পাড়া এইবার আমাদের ছাড়তে হচ্ছে শিবু! বাড়ীওয়ালা আমাদের আর রাখবেন না বলে নোটিশ দিয়েছেন। আর পাড়ার লোকেরা না কি আমাদের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে, সবাই একসঙ্গে সই করে পুলিশ কমিশনারের কাছে এক লম্বা দরখাস্ত করেছে—যে, আমরা এ পাড়ার একটা Public Nuisance হয়ে উঠেছি। পুলিশের লোক সেদিন এসে enquiry ক'রে গেল। তোমার দাদাই না কি এসবের উদ্যোগী আর প্রধান পাণ্ডা শুনলুম। পুলিশের লোকের কাছে তিনিই সবার চেয়ে জোর সাক্ষ্য দিয়েছেন আমাদের বিরুদ্ধে!

শিবু বললে—কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়! কারণ, আমার পরীক্ষার কিছু দিন পূর্বে দাদা এক দিন আমাকে ডেকে স্পষ্টই বলে দিয়েছেন—পৃথক হয়ে যাবার জন্য। ও-বাড়ীতে আর আমার স্থান হবে না। অপরাধ—আমি এখানে আসি!

শিবুর মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনে ইলা জিজ্ঞাসা করলে—তুমি তাহলে এখন কি করবে মনে ক'রছো?

শিবু বললে—সেদিন তো তোমায় বলেছি দিদি, সমস্তই নির্ভর করছে নীলার উপর। সে যদি এই গৃহহারা—বিত্তহীন—নিঃস্ব—দরিদ্রকে বরমাল্য দিতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে আমি বিশ্বে অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে একটুও দ্বিধা বোধ করবো না—

—পারবে কি ভাই? বড় শক্ত! দেখতে পাচ্ছ তো চোখের উপর আমি একজন ভুক্তভোগী!

শিবু বলতে যাচ্ছিল—আপনার পায়ের ধুলো আর আশীর্বাদ মাথায় করে নিয়ে—এমন সময় নীলা সেদিকে আসছে দেখে সে চুপ করে গেল।

নীলা এসে বললে—এই যে, আপনি কখন এসেছেন চুপি চুপি। বেশ মজার লোক তো—সেদিন বলে পাঠালেন—হ্যাঁ আমার সঙ্গে বায়োস্কোপে যাবেন, অথচ এলেন না, আর আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা ক'রে বসে রইলুম কতক্ষণ ; শেষে কাপড়চোপড় সব খুলে ফেললুম। আপনিও গেলেন না, আমাকেও যেতে দিলেন না! আর আপনাকে নিয়ে আমি কোথাও যাবো না!

ইলা হাসতে হাসতে বললে—কি ক'রে শিবনাথ বাবু আসবে বল্—ও যে এখন বিয়ের ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছে!

কথাটা শুনে নীলার মুখখানি হঠাৎ একটু যেন বিবর্ণ হ'য়ে গেল, তবু তারই মধ্যে একটু করুণ হাসি ফুটিয়ে বললে—তাই না কি? আমাদের নিমন্ত্রণ করবেন তো? দেখবেন লুচিটা ফাঁকি দেবেন না—

ইলা বললে—তোমাকে তো এ বিয়েতে ও শুধু লুচি খাবার নিমন্ত্রণ করতে আসেনি, তোমাকেই গিয়ে যে শিবুর ক'নে হ'তে হবে, সে নিমন্ত্রণটাও তুমি নেবে কি?—

নীলা লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠলো, কোনও উত্তরই দিতে পারলে না, ঘাড়টি হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

ইলা শিবনাথকে বললে—তোমরা তাহ'লে দু'জনে বোঝা পড়া করো ভাই, আমার অনেক কাজ আছে, আমি চললুম।

সেদিন তাদের দু'জনে কি কথা হ'য়েছিল তা কেবল তারা দুজনে ছাড়া আর কেউ জানে না। কিন্তু তারই কিছুদিন পরে শিবনাথ হঠাৎ এক দিন বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল। যাবার আগে সে তার ঘরে দাদার নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছল।

ভোলানাথ সেই চিঠিখানা স্ত্রীকে প'ড়ে শোনাতে লাগল—

শ্রীচরণেষু—

দাদা, আমি কৃষ্ণনগরের উকীল অনুকূলচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নীলা রায়কে শাস্ত্রমতে বিবাহ করেছি। আপনাদের মত ছিল না বলে—আপনাদের জানাইনি। আপনি আমার জন্য চিন্তিত হবেন না, আমি রেঙ্গুন কলেজে একটা প্রফেসারী পেয়ে সস্ত্রীক সেখানে চললুম। প্রণাম জানবেন ও বৌদির চরণে জানাবেন! শম্ভুকে আমার স্নেহাশিস দিবেন। ইতি—

প্রণতঃ
শিবু

পত্র শুনে ভোলানাথের পত্নী বলে উঠলেন—ওমা! কৃষ্ণনগরের উকীল অনুকূল রায় যে মা'র পিস্তুতো ভাই হ'তেন! তিনি যে আমাদের মামা। ও! ঠিক, ঠিক—বটেই ত। তার দুই মেয়ে ছিল পরমা সুন্দরী বড়টি অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল, কিন্তু, মামাবাবু মারা যাবার আগে তার আবার বিয়ে দিয়ে যান! ও হরি! সেই 'এলি' 'নেলি' কি আমাদের পাশে এতদিন ভাড়া ছিল! ওমা তা কে জানে? ছিছি—কি লজ্জা! যাই আমি ওদের সঙ্গে গিয়ে দেখাশুনো করে আসি। ঠাকুরপো 'নীলা-নীলা'—'ইলা-ইলা' করতো বটে—তখন কে জানে ছাই যে সে আমাদের 'এলি-নেলি!' ওই 'এলিকে' বিধবা জেনেও বিয়ে করে নিয়ে গেল এক মস্ত বড়-লোক—এটর্নি সুবোধ বাঁড়ুয্যে! অবশ্য সেও দোজপক্ষের, কিন্তু শুনেছি তার বয়স বেশী নয়, দেখতেও কার্তিকের মতো, স্বভাব চরিত্রও ভাল। কিন্তু, প্রথম পক্ষের একটি ছেলে আর একটি মেয়ে আছে বলে 'এলি'কে বিয়ে করে বাড়ীতে এনে রাখেনি। ওদের না কি বড় কড়া সমাজ, পাছে এর পর ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে কষ্ট হয় বলে এলিকে নিয়ে আলাদা বাড়ীভাড়া করে রেখেছে। কে জানে সে আমাদের পাশেই রয়েছে। যাই, দেখা শুনো ক'রে আসি—কত দিন তাদের দেখিনি!

পত্নীকে পাশের বাড়ীতে যেতে উদ্যত দেখে ভোলানাথ গম্ভীরভাবে বললেন,—আমি তাদের নামে অপবাদ দিয়ে—পুলিশের সাহায্যে ভদ্রলোকের পাড়া থেকে তাদের তুলে দিয়েছি,—পাশের বাড়ীতে তারা আর নেই—

কার্তিক ১৩৩৫

কবুল-জবাব

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

অশনিকে পুলিস গেরেপ্তার ক'রে যখন হাড়কাটার গলিতে চন্দনার বাড়ীতে নিয়ে এলো, তখনও তার চোখের ঘুম আর নেশা কাটে নি।

তাকে যখন চন্দনার মৃতদেহের সাম্‌নে এনে দাঁড় করিয়ে দিলে, তখন সে অর্ধমুক্ত চোখের স্থির দৃষ্টি চন্দনার মুখের উপর রেখে দাঁড়িয়ে রইলো, তার মুখের কোনো ভাবান্তর হ'লো না, মুখের একটা পেশীও একটু কুঞ্চিত হ'লো না।

ঢুলুঢুলু চোখের আনত পল্লবের তলা দিয়ে সে পুরু ধব্‌ধবে বিছানার উপর অবলুণ্ঠিত স্রস্তবসনা চন্দনার প্রাণহীন দেহের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখ্‌ছে...তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে চন্দনার শুভ্র বুকের বাঁ দিক ঘেঁষে যেখানে কা'র হাতের নিষ্ঠুর ছুরী বিদ্ধ হয়ে একটা রক্তাক্ত লাল বিদারণরেখা রেখে গেছে ; চন্দনা যেখানটায় বুক ফেটে মরেছে, সেই ক্ষতমুখে রক্ত জ'মে আছে, রক্ত ছিট্‌কে তার গৌরাঙ্গে রক্তচন্দনের তিলক পরিয়েছে, তার তুষারশুভ্র বিছানার উপর ছিট্‌কে প'ড়ে চুনরী ছিটের মতন দেখাচ্ছে, খানিকটা রক্ত বুক বেয়ে গড়িয়ে প'ড়ে তার পাঁজরের পাশে জ'মে আছে।

চন্দনার দেহ প্রাণহীন হয়েছে কাল গভীর রাত্রে ; এখন বেলা আটটা। তার দেহ অনেকক্ষণ হ'লো প্রাণহীন হয়েছে, কিন্তু রক্তশূন্য হওয়াতে দেহ এখনও কঠিন আড়ষ্ট হয়ে যায় নি। চন্দনার গৌরবর্ণ একটু ফেকাসে হয়েছে, কিন্তু তার তনুদেহের যৌবনপূর্ণ নিটোল বলনটি কোথাও একটু টস্‌কায় নি ; চন্দনার একাদশীর চাঁদের মতন শুভ্র নখগুলি একটু নীল আর আল্‌তা-পাটি ঠোঁট দুখানি একটু কাল্‌চে হয়ে যাওয়া ছাড়া তার শরীরে আর কোথাও মৃত্যুর লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। তার আধ-খোলা চোখের সন্নত দীর্ঘপক্ষ্ম পল্লবের তলা থেকে কালো তারা দুটি এখনও উজ্জ্বল হয়েই উঁকি মারছে, যেন সে ঘুমোচ্ছে ; তার পাত্‌লা ছোট্ট ঠোঁট দুখানিতে একটু মিষ্টি হাসি এখনও লেগে আছে, যেন সুখস্বপ্ন দেখছে। হয় তো তার হত্যাকারী রক্তলোলুপ শাণিত ছুরী লুকিয়ে রেখে কোনো রঙ্গরসের কথা ব'লে চন্দনাকে হাসিয়েছিলো, হয় তো তাকে ভালোবাসার কথা ব'লে ভুলিয়েছিলো, আর তার পরক্ষণেই অতর্কিতে তার বুকে ছুরী বসিয়ে দিয়েছিলো, নিঃসন্দিগ্ধ চন্দনার সুন্দর মুখ থেকে আনন্দের আভাটুকু মিলিয়ে যাবার আর অবসর পায় নি। ঠোঁট দুখানি ঈষৎ ভিন্ন হয়ে আছে...হয় তো বা অর্ধসমাপ্ত কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে যাওয়াতে।

ঘরের মধ্যে একটা বুকচাপা স্তব্ধতা গুমোট পাকিয়ে ছিলো। অভিযুক্ত অশনিকে করোনার ম্যাজিস্ট্রেট জুরী আর পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌ছে। অশনি দুজন কন্‌স্টেবলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সটান খাড়া মাথা উঁচু ক'রে অচঞ্চল অবিচলিত ; তার মুখে একটা অগ্রাহ্য তাচ্ছিল্যের ভাব, তার হাত দুটো পিছন দিকে হাতে-হাতে ধরা।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন অশনির কোনও সাড়া পাওয়া গেলো না, তখন করোনার অশনিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—অশনি-বাবু, আপনি এই স্ত্রীলোকটিকে চেনেন?

অশনির মাথাটা ন'ড়ে উঠ্‌লো, সে করোনারের দিকে ফিরে তাকালে, তার পর আবার

সেই সুন্দরীর শবের দিকে ফিরে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে রইলো, যেন স্মৃতির অরণ্যে তার মন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অল্পক্ষণ পরে অশনি ধীর অকম্পিত স্বরে বল্‌লে—না, আমি একে চিনি না, একে আমি এর আগে কখনও দেখি নি।

—কিন্তু এই বাড়ীর অনেকেই তো হলফ ক'রে ব'লেছে যে আপনি ছিলেন এর প্রণয়ী, আপনার কাছেই এ বাঁধা ছিলো...

অশনি বিরক্ত ভাবে বল্‌লে—সাক্ষীরা মিথ্যা বলেছে বা ভুল করেছে। আমি এই স্ত্রীলোকটিকে কস্মিন্ কালেও দেখিই নি...

করোনার এক মুহূর্ত নীরব থেকে বল্‌লে—আপনি বেশ ক'রে ভেবে চিন্তে উত্তর দেবেন। যা স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে গেছে, তা অস্বীকার ক'রে লাভ কি? ন্যায় বিচারে ভ্রম ঘটানোর চেষ্টা করা বৃথা। আমরা যা প্রমাণ পেয়েছি তাই যথেষ্ট, তাতেই আপনার অপরাধ প্রমাণ হয়ে গেছে ; আপনাকে দিয়ে কবুল করানো কেবল আইনের দস্তুর পালন...নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করা বই আর কিছু নয়। আপনি বুদ্ধিমান্, ভদ্রবংশের লোক ; আপনি যদি জুরীদের দয়া পেতে চান তা হ'লে আপনার নিজের ভালোর জন্যে আমি আপনাকে দোষ কবুল কর্‌তে অনুরোধ করি...

অশনি মাথা উঁচু ক'রে স্থির কণ্ঠে বল্‌লে—আমি নির্দোষ. কাজেই আমার কবুল কর্‌বার কিছুই নেই।

—আর একবার আপনি বেশ ক'রে ভেবে দেখুন, আপনার অস্বীকারের বাস্তবিক কোনো মূল্যই নেই।...আমি বুঝতে পার্‌ছি যে আপনি বিশেষ কোনো প্রবল উত্তেজনার বশে এই গর্হিত কাজ হঠাৎ ক'রে ফেলেছেন, সাময়িক উত্তেজনায় ক্ষণিকের সেই রকম উন্মত্ততা যাতে মানুষের মাথায় খুন চাপে, মানুষ রক্তলোলুপ হয়ে ওঠে, চোখের দৃষ্টির জ্বালা সে রক্ত দিয়ে ধুতে চায়! নইলে যাকে আপনি ভালোবেসেছেন, কতো আদর যত্ন ক'রেছেন, তাকে আঘাত ক'রে প্রাণে বধ করা কি সোজা কথা!... দেখুন, ভালো ক'রে আপনার প্রণয়িনীর দিকে চেয়ে দেখুন...নিশ্চয় আপনার অন্তর ব্যথিত হবে, কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ হবে...এই সুন্দরী যুবতী...যাকে একদিন ভালোবেসেছিলেন তার এই দুর্দশা দেখে আপনার কষ্ট হচ্ছে না...অনুতাপ হচ্ছে না?...

অশনি ঈষৎ হেসে বল্‌লে—অনুতাপ? যে কাজ আমি করি নি তার জন্যে আমি অনুতাপ অনুভব কর্‌বো কেমন ক'রে। তবে কষ্ট নিশ্চয়ই হচ্ছে। যখন আমাকে খুনের দায়ে ধ'রে নিয়ে এলো, তখন এ রকম দৃশ্য যে দেখবো তা জেনেই এসেছিলাম ; তবু এই কাঁচা বয়সের এমন সুন্দরীকে কোন্ নরাধম এমন ক'রে হত্যা ক'রেছে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে বৈ কি। তবে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি ব'লেই যে আমি একে হত্যা ক'রেছি তার তো কোনো মানে নেই ; তা হ'লে তো আপনারাও হত্যা ক'রেছেন বল্‌তে পারা যায়...বরং আমাকে আনা হয়েছে ধ'রে, আর আপনারা এসেছেন স্বেচ্ছায় ; কাজেই আমার চেয়ে আপনাদেরই হত্যাকারীও হওয়া বেশী সম্ভব। আর অনুতাপ যদি হতে হয় তো আপনাদেরই হওয়া উচিত যে একজন নিরীহ ভদ্রলোককে ঘুম থেকে চমকা জাগিয়ে টেনে এনে এমন নিদারুণ বীভৎস দৃশ্য দেখাচ্ছেন, আর তাকে মিথ্যার জালে জড়াতে চাচ্ছেন!...

অশনি কোনো রকম অঙ্গভঙ্গী না ক'রে প্রশান্ত ভাবে অকম্পিত স্পষ্ট স্বরে কথাগুলি বল্‌লে যেমন শুধু বল্‌তে পারে নির্দোষ ও আত্মবশ দৃঢ়চিত্ত লোক। এই দারুণ অভিযোগ ও বিষম বিপদের সম্ভাবনাতেও সে একটুও বিচলিত হয় নি, এবং সে শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে নিজের নির্দোষিতা বার বার ঘোষণা কর্‌লে।

পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ অস্পষ্ট স্বরে বল্‌লে—কঠিন লোক। একে কবুল করানো যাবে

না...ফাঁসিকাঠে চ'ড়ে এ অস্বীকার করবে...

অশনি এই কথা শুনতে পেলে। সে স্বচ্ছন্দে স্বাভাবিক ভাবে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের দিকে ফিরে বল্‌লে—নিশ্চয়, ফাঁসিকাঠে চ'ড়েও আমি আমার নির্দোষিতা ঘোষণা কর্‌বো।

অশনির কণ্ঠস্বর দৃঢ়, কিন্তু ক্রোধবর্জিত।

সকালেবেলার রৌদ্র এসে চন্দনার গায়ের উপর পড়্‌লো। চন্দনার মুখের মরা হাসি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো।

করোনার অশনিকে প্রত্যেক অভিযোগ অস্বীকার কর্‌তে শুনে বল্‌লে—আচ্ছা, আপনি তো এই মেয়েলোকটিকে চেনেন না। কিন্তু এটার সম্বন্ধে কি বলেন?

করোনার একটা কাগজের মোড়ক খুলে একখানা হাতীর দাঁতের বাঁট দেওয়া বড়ো ছোরা অশনির সাম্‌নে ধর্‌লে ; ছোরার চওড়া চক্‌চকে ফলার উপর রক্ত জ'মে রয়েছে।

অশনি ছোরাখানার বাঁট সন্তর্পণে দু আঙুলে ধ'রে তুলে নিলে ; তার পর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আবার কাগজের উপর রেখে দিলে, এবং নিজের আঙুলে রক্ত লেগেছে কি না একবার নিরীক্ষণ ক'রে দেখে আঙুল দুটো পকেট থেকে রুমাল বা'র ক'রে মুছে ফেল্‌লে।

তার পর ধীর স্বরে বল্‌লে—এ ছোরা আমি কখনও দেখি নি। কিন্তু ছোরাখানি বেশ সুন্দর!

করোনার একটু শ্লেষের স্বরে বল্‌লে—ক্রমাগত অস্বীকার!...এইটেই আপনার প্ল্যান্‌ দেখ্‌ছি!...কিন্তু এই ছোরাখানা আপনার, এ কথা বিশ জন লোকে সাক্ষ্য দিয়েছে।

অশনি ঈষৎ হেসে বল্‌লে—তাতেই কি কিছু প্রমাণ হ'লো? সেই সব সাক্ষীর ভুল হয়েছে, অথবা পুলিসে বলিয়েছে...একটা খুন যখন হয়েছে তখন একজন খুনীও আছে...এ আত্মহত্যা হ'লেও একজনকে শাস্তি দেওয়াতে পার্‌লে পুলিসের খোস্‌নাম হবে, অতএব ধরো একজন নিরীহ ভদ্রলোককে, আর তার গলায় ফাঁসির ফাঁস পরিয়ে দেবার জোগাড় করো...

করোনার বল্‌লে—ঢের বক্তৃতা হয়েছে, আপনার বক্তৃতা রাখুন। যদিও আপনার অপরাধের সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই, তথাপি আমরা আপনাকে আর একটা শেষ পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বো। এই মেয়েটির গলায় হাত দিয়ে চেপে কণ্ঠরোধ করার চিহ্ন আছে এর গলার ডান দিকে সুগঠিত লম্বা লম্বা চারটি আঙুলের আর বাঁ দিকে বুড়ো আঙুলের চাপের দাগ আছে, খুনী একে বাঁ হাতে গলা টিপে কণ্ঠরোধ ক'রে ডান হাতের ছোরা এর বুকের বাঁ দিক ঘেঁষে একেবারে হৃদয় বিদ্ধ ক'রে মেরেছে। দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

করোনার মৃত রমণীর গলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে দেখালে। শঙ্খের মতন শুভ্র কণ্ঠের দু পাশে পাঁচ আঙুলের চাপে কালশিরা পড়েছে ; ছড়া ছড়া কালশিরার শেষ, প্রান্তে গলার চাম্‌ড়ায় একটা একটা টোল খাওয়া, বোধ হয় আঙুলের নখ চেপে মাংসের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলো। সমস্ত কালশিরা দাগটা একটা পাঁচ-শিরা পাতার আদ্‌রার মতন দেখাচ্ছে।

—এই দেখুন আপনার হাতের কারসাজি! আপনি বাঁ হাতে এই অবলা রমণীর কণ্ঠ চেপে ধ'রে মুক্ত ডান হাতে এই ছোরা ওর বুকে বসিয়ে দিয়েছিলেন। এগিয়ে আসুন...গলায় আঙুলের দাগে দাগে আপনার আঙুল বসিয়ে দেখুন ঠিক ঠিক মিলে যায় কি না।

অশনি এক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে ইতস্তত কর্‌লে, তার পরে গা ঝাড়া দিয়ে বিরক্ত স্বরে বল্‌লে—গলার কালশিরার উপর আমার আঙুল বসাতে হবে?...আপনি আঙুল বসিয়ে দেখুন না, আপনার আঙুলই মিলে যাবে...দাগের উপর যে আঙুল বসাবে তারই আঙুল মিলবে। আমার আঙুলের সঙ্গে যদি দাগ মেলেই তা হ'লে কি প্রমাণ হবে?

—যাই প্রমাণ হোক, আপনি আঙুল বসিয়ে দেখুন না...

অশনি চন্দনার বিছানার দিকে এগিয়ে গেলো ; তার মুখ স্পষ্ট ফেকাশে হয়ে উঠেছে, সে দাঁতে দাঁত চেপেছে, তার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়েছে। চন্দনার কাছে গিয়ে অশনি এক মুহূর্ত স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তার দৃষ্টি চন্দনার আড়ষ্টপ্রায় দেহের উপর নিবদ্ধ। তার পর সে হঠাৎ যেন এক হেঁচ্‌কা টান দিয়ে নিজের বাঁ-হাতটাকে প্রসারিত কর্‌লে আর সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে চন্দনার গলার উপর রাখ্‌লে।

মৃত শরীরের হিম চট্‌চটে স্পর্শ হাতে ঠেক্‌বা মাত্রই অশনির গা হঠাৎ শিউরে কেঁপে উঠলো, আর সেই হঠাৎ অঙ্গ-সঞ্চালন তার বাঁ-হাতের আঙুলগুলো সঙ্কুচিত হয়ে গেলো। আঙুলগুলো সঙ্কুচিত হ'তেই চন্দনার গলায় চাপ পড়্‌লো যেন সে তার গলা চেপে দম্‌ বন্ধ করে ফেল্‌ছে।

অশনির আঙুলের চাপ পেয়েই চন্দনার মৃত শরীরের আড়ষ্টপ্রায় মাংসপেশীতে টান পড়লো এবং সেই টানে চন্দনার মৃত আড়ষ্ট মাংসপেশী যেন জীবন্ত হয়ে উঠ্‌লো, তার দুই চোয়াল কানের দিকে স'রে যেতেই মুখ হাঁ আর দন্তপংক্তি বিকশিত হ'য়ে গেলো। অশনি দেখ্‌তে পেলে চন্দনার মুখের মধ্যে থুতু ঘন হয়ে জ'মে থক্‌থক্‌ কর্‌ছে।

সকলে আতঙ্কে চম্‌কে উঠলো, তাদের গা ঘিনঘিন কর্‌তে লাগ্‌লো।

চন্দনার হাঁ করা মুখের শুক্‌নো ঠোঁট স'রে যাওয়াতে দাঁতগুলো হঠাৎ বেরিয়ে পড়লো, যেন চন্দনা বিকট হাস্য ক'রে উঠ্‌লো। ঘরের সকল লোকের মনে হ'লো যেন মৃত্যুর পরপার থেকে মরণশ্বাস ফিরে এসে তার গলার মধ্যে ঘড়্‌ ঘড়্‌ কর্‌ছে, কেবল তার জিবটা ফুলে উল্টে টাক্‌রায় লেগে কণ্ঠনালী অবরুদ্ধ ক'রে রেখেছে ব'লে সেই ঘড়্‌ঘড়ানি শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না।

তখনই কিন্তু চন্দনার মুখগহ্বরের অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেলো, আর একটা নীল রঙের চক্‌চকে কাঁচমাছি ভন্‌ভন্‌ কর্‌তে কর্‌তে বাইরে বেরিয়ে এলো।

মাছিটা এক মুহূর্ত চন্দনার মুখের পচা লালার লোভে মুখের কাছে ঘুরে ঘুরে ভন্‌ভন্‌ কর্‌তে কর্‌তে উড়্‌তে লাগলো, তার পর বোঁ ক'রে অশনির ভয়ে-নীলমাড়া ঠোঁটের দিকে উড়ে গেলো।

অশনি চম্‌কে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ডান হাত নেড়ে মাছিটাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌লে ; মাছিটা একটা ঘুরপাক খেয়ে অশনির হাতে: তাড়না এড়িয়ে বন্‌ ক'রে এসে তার ঠোঁটের উপর বস্‌লো। চন্দনার মুখের চট্‌চটে লালায় সিক্ত মাছির ছ-ছটা পা যেনো অশনির ঠোঁটে আট্‌কে গেলো।

অশনি আঁৎকে উঠে এক লাফে পিছু হ'টে এলো,—তার চোখ দুটো ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌তে চাচ্ছে, তার মাথার চুল পর্যন্ত ভয়ে খাড়া হয়ে উঠেছে। সে দু হাত সাম্‌নে প্রসারিত আর দু হাতের দশ আঙুল বিস্তারিত ক'রে যেন কোনো আক্রমণকারী আততায়ীকে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে পাগলের মতন চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো!...আমাকে নিয়ে চলো!...আমি কবুল কর্‌ছি, কবুল কর্‌ছি...আমিই চন্দনাকে খুন ক'রেছি।

চন্দনার মুখের বেরিয়ে-পড়া দাঁতগুলোয় বিকট হাসি মরণে আড়ষ্ট হ'য়ে তখনও লেগে ছিলো।

শ্রাবণ ১৩৩৫

ডিটেকটিভের গল্প

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

রবিবারের সকাল...

প্রোফেশর সত্যশরণের ঘরে জমাট আসর...রবিবার-সকালের বাঁধা রুটিন। সে আসরে সদ্য-ফোটা আধুনিক কবি তরুণকান্তি থেকে পেন্‌সনী-ডেপুটি রায় বাহাদুর পর্যন্ত...পদমর্যাদা ভুলে সাম্য-মৈত্রীর ঢালা-বিছানা পেতে এক হয়ে মিশে বসেন।

পাশের বাড়ীর পুলিশ অফিসার শান্তি সেন বললেন—কালকের কাগজে ঐ ট্রেনে-খুনের খবর পড়েছেন কেউ? উকিল চিত্তবিহারী বললে—ইয়েস্ ঐ মার্চাণ্ট-প্রিন্স তালুকদারের কথা বলচেন তো? ঐ আসাম-মেলে?

—হ্যাঁ।

তরুণকান্তি বললে—কমুনাল ব্যাপার! ভদ্রলোক ছিলেন একা ফার্স্টক্লাশ কামরায়। রাণাঘাটে ট্রেন থামলে একটা কুলি কি করে' তাঁকে দেখে—বেঞ্চের নীচে মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছেন। দেখে সে-ই দেয় রেল-পুলিশকে খবর!

কমুনিস্টদলের বীরেন রায় ভ্রূকুঞ্চিত করে' বললে—কমুনাল বলে রায় দিলে যে...হেতু?

তরুণকান্তি বললে—না হলে দেখুন না, তাঁর কাগজপত্র এতটুকু তছনছ নয়—হাতের ঘড়ি, আংটি, পকেটের পার্শ...কোয়ায়েট ইন্‌ট্যাক্ট! খুনের মোটিভ শুনি?

ললাটে ভ্রূকুটি-রেখা...বীরেন বললে—মোটিভ খুঁজে পেলে না, অতএব কমুনাল! চমৎকার! তোমরাই আরো এমনি মনের বিষে কমুনাল বিষটাকে জমিয়ে রাখো!

এমনি বাদানুবাদের মধ্যে শান্তিময় সেনকে উদ্দেশ করে প্রোফেশর সত্যশরণ প্রশ্ন নিক্ষেপ করলেন—ব্যাপারখানা খুলে বলো তো শান্তি!

শান্তি সেন বললে—খবরের কাগজটা আপনি একবার পড়ে দেখুন...তারপর...

—বেশ!

সত্যশরণ কাগজ পড়লেন ; পড়ে বললেন—এতে শুধু খবর দেখছি আসাম-মেল রাণাঘাটে পৌঁছুলে একটা কুলি দেখে, কামরার কোণের সীটের নীচে ভদ্রলোক মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছেন। তারপর পুলিশ এলো, এসে দেখে—ভদ্রলোকের ডান-রগে চোট্...অথচ কামরার মধ্যে কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়নি!...এর পরে?

এ প্রশ্নটা তিনি সকলকে লক্ষ্য করেই বর্ষণ করলেন।

শান্তি সেন বললে—আমার অভিজ্ঞতা থেকে নানারকম অনুমানই করতে পারি...কিন্তু সে অনুমান মিথ্যা হবে, কারণ প্রমাণের নামগন্ধ এখনো কিছু পাওয়া যায়নি!

প্রোফেশর বললেন—হুঁ! শুধু অনুমান! কিন্তু ফ্যাক্ট ছাড়া কল্পনার উপর অনুমান খাড়া করা চলে না! বাজে অনুমানে পৃথিবীতে নিত্য কত অবিচারই না চলেছে।...আচ্ছা, আমি কতকগুলো কথা বলি...খবর যা পাচ্ছি তা থেকে বুঝছি যে-খুনী সে ঐ ট্রেন রাণাঘাটে থামবার আগেই সরে পড়েছে...তার অস্ত্রসমেত। কুলি যখন দেখে, তখন কামরার দরজা বন্ধ ছিল কি খোলা ছিল, সে খবর আমরা পাচ্ছি না। আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, ভদ্রলোক কামরার জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে কিছু দেখছিলেন সেই সময় লাইনের ধারে কোনো শক্ত জিনিসের সঙ্গে রগে লাগলো ধাক্কা! মাথার ডানদিকে চোট্...উনি বসেছিলেন

এঞ্জিনের দিকে মুখ করে'!...এ পর্যন্ত...হুঁ...কিছু না হে, এ থেকে কোনো অনুমান করতে আমি রাজী নই! তুমি কি বলো শান্তি?

মৃদু হেসে শান্তি সেন বললে—আমি ও নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাইনি।...পুলিশ-তদারকীতে কিছু খবর বেরুক তখন আমি চিন্তা করবো।

একটু চিন্তিতভাবে সত্যশরণ বললেন—তা ঠিক। তবে ব্যাপারটা বেশ মিস্টিরিয়স্ মনে হচ্ছে।

তরুণকান্তি চাইলো গোবর্ধন ঘোষের দিকে। গোবর্ধন ঘোষ এ-যুগের পশারওয়ালা ডিকেটটিভ উপন্যাসের লেখক...সে-সব উপন্যাস লিখে অজস্র পয়সা রোজগার করছে! উপন্যাসের মালমশলা কতক সংগ্রহ করে শান্তি সেনের কাছ থেকে—তারপর তাতে রঙ চড়ায়,...আইন-কানুন জানে না, ইগনরান্স ইজ ব্লিশ...অবাধে কলমের ডগায় থ্রিল করিয়ে চলে! বলে—মানুষ পড়তে পড়তে ভোঁ হয়ে যাবে...আইন-কানুনের তোয়াক্কা রাখবে না!

গোবর্ধনের দিকে তাকিয়ে তরুণকান্তি বললে—তুমি কি বলো হে গোবর্ধন? তুমি তো ক্রিমিনলজিতে এক্সপার্ট! শ্লেষের জ্বালা দু'চোখে ভরে' গোবর্ধন নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো শুধু তরুণকান্তির দিকে...কোনো জবাব দিলে না!

পরের বুধবার সন্ধ্যাবেলা। প্রোফেশরের ঘরে রেগুলার আসর।

পেন্সনী ডেপুটি রায় বাহাদুর উপনিষদ পড়ছেন...চাকরি-জীবনে পুলিশকে তুষ্ট রাখতে বিচারের নামে অবিচারের বহু পাপ সঞ্চয় করেছেন, উপনিষদের শ্লোকে সে পাপের কতক যদি স্খালন হয়—পরলোক যদি থাকে, সেখানে এ পাপের জন্য নিগ্রহ ভোগ যদি উপনিষদের ছোঁয়ায় লঘু হয়...

একটি শ্লোকের ছত্র নিয়ে তিনি আলোচনা জমিয়ে তুলেছিলেন, এমন সময় শান্তি সেন এসে দেখা দিলেন—এসেই বললেন প্রোফেশরকে লক্ষ্য করে'—সেই ট্রেন-মার্ডার!...মার্চান্ট-প্রিন্স তালুকদার...মনে আছে?

স্তম্ভিত নিশ্বাসে সকলে তাকালো শান্তি সেনের পানে...উপনিষদের জটিল অরণ্য ছেড়ে থ্রিলের রোমাঞ্চ রেখা!

শান্তি সেন বললে—আমার উপর তদারকের ভার পড়েছে!

সত্যশরণ শান্তকণ্ঠে বললেন—বটে!

শান্তি সেন বললেন—রেল-পুলিশ যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করেছে বলি...আগ্রহের ভারে ঘর হলো স্তব্ধ...সকলের চোখে কৌতূহল উজ্জ্বল শিখায় ঝক্‌ঝক্ করে' উঠলো।

শান্তি সেন বললেন—তালুকদারের ঐশ্বর্য অগাধ হলেও সংসার প্রায় শূন্য! স্ত্রী নেই,...একটিমাত্র ছেলে...ছেলেকে তিনি কারবারে ঢুকিয়েছেন—তবে ছেলে চলে নিজের গোঁ-ভরে...বাপের ওপর খুব ভক্তিশ্রদ্ধা আছে, তা নয়, তবে বিরোধও নেই! বহু বিষয়ে বাপের সঙ্গে ছেলের মতবিরোধ...এ-বিরোধ ব্যবসার ক্ষেত্রে নয়...সামাজিক আচার-ব্যবহারে। ছেলের নাম বিনয়...বয়স ত্রিশ-বত্রিশ—এখনো বিবাহ হয়নি!...ছেলের জবানবন্দী নিয়েছে রেল-পুলিশ। ছেলে বলেছে, ঐ আসাম-মেলেই সে সেদিন ব্যারাকপুর যায়—সেদিনটা ব্যারাকপুরে থেকে পরের দিনে বেরিয়ে নৈহাটী ব্যাণ্ডেল হয়ে বর্ধমানে যাবার কথা...তারপর বর্ধমান থেকে হাজারিবাগ!...শিকারের উদ্দেশে। ব্যারাকপুর স্টেশনে এসে খবরের কাগজ পড়ে বাপের এই অপমৃত্যুর খবর পায়,—তার ফলে বর্ধমানে যাওয়া বন্ধ...ছেলে তখনি বাপের সন্ধানে কলকাতায় আসে...বাপের লাশ তখন কলকাতায় এসেছে পোস্ট-মর্টেমের জন্য! ছেলে বিনয় আরো বলেছে, বাপ তালুকদার আসাম-মেলে শিলঙ যাচ্ছিলেন—পনেরো দিনের জন্য...জাস্ট ফর এ চেঞ্জ!...এ ছাড়া আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি!

সত্যশরণ বললেন—তোমার ফার্স্ট মুভ এখন?

শান্তি সেন বললেন—তাঁর বাড়ীতে গিয়ে সকলকে প্রশ্ন করা...কে শত্রু ছিল? অফিসে কাকেও তাড়া দিয়ে ডিস্‌মিস্ করেছেন, কিম্বা...তাঁর মুখের কথা লুফে নিয়ে থ্রিলার লেখক গোবর্ধন বললে—তালুকদার-মশাই উইডোয়ার যখন—নিশ্চয় তখন প্রণয়-ঘটিত কোনো রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা!

গোবর্ধনের পানে তাকিয়ে তরুণকান্তি বললে—তুমি এর মধ্যে তোমার "তালুকদার খুন" উপন্যাস লিখতে সুরু করে' দেছ—এ্যাঁ?

এ কথায় চকিতে সঙ্কুচিত হয়ে গোবর্ধন বললে—ঐ তো...সব তাতেই ঠাট্টা! এভরি-ডে লাইফ নিয়ে আমি কস্মিনকালে নভেল লিখি না।

সঙ্গে সঙ্গে তরুণকান্তির টিপ্পনী—ঠিক কথা! লাইফের পরিচয় নেবার জন্য যে চোখ আর যে মনের দরকার, তোমার মতো লেখক ও দুটি বস্তু থেকে যে চিরবঞ্চিত!

—তার মানে? গোবর্ধন রুখে উঠলো যেন!

তরুণকান্তি সহজ কণ্ঠে বললে—ফুলস্ রাশ ইন্ হোয়্যার এঞ্জেল্‌স্ ফীয়ার টু ট্রেড!

সত্যশরণ বাধা দিলেন, গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আঃ, কি ছেলেমান্ষী করো তোমরা!

আর দুদিন পরে...

শান্তিময় এসে আবার রিপোর্ট দাখিল করলেন—তালুকদারের পুত্র বিনয় যখন আসাম-মেলে গিয়ে ওঠে, তখন আসাম-মেল সদ্য প্ল্যাটফর্ম ছাড়তে সুরু করেছে...বিনয় তালুকদার গার্ডের কামরার ঠিক আগে যে থার্ডক্লাশ কামরা, তার ফুটবোর্ডে উঠে দরজা ঠেলে কামরার মধ্যে ঢোকে—তার হাতে ছিল ছোট এ্যাটাচি আর একটা বন্দুকের বাক্স! সে যে ব্যারাকপুরে নেমেছিল, তার কোনো প্রমাণ মেলেনি। বিনয়কে প্রশ্ন করায় সে বলে, ব্যারাকপুরে নেমেছিল, নেমে কোথায় গিয়েছিল এবং সে রাতটা ওখানে কার বাড়ীতে ছিল, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। সে সম্বন্ধে বিনয় কোনো কথা বলবে না—অসম্ভব জেদ,...বলে, না বলার জন্য তাকে যদি পুলিশ খুনের চার্জে সন্দেহবশে গ্রেফতার করে, সে তাতে সাবমিট্ করবে।...আর একটি খবর জানা গেছে, তালুকদারের এক বন্ধু মহেন্দ্র মিত্র তালুদারের হাতে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে যান...মৃত্যুর সময় এ টাকাটা তালুকদার তার ব্যবসায় খাটাবে বলে। মহেন্দ্র মিত্রের বিধবা স্ত্রী আছেন এবং একটি মেয়ে আছেন...মেয়েটির বিবাহ হয়নি। বিনয় চায় সেই মেয়েকে বিবাহ করতে—বাপ তালুকদার এ-বিবাহ কিছুতে হতে দেবেন না বলে' ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছিলেন। ছেলেকে শাসিয়েছিলেন এ বিবাহ করলে বিনয়কে তিনি ত্যাজ্যপুত্র করবেন—একটি পাই-পয়সা দেবেন না! এবং মহেন্দ্র মিত্রের যে টাকা তাঁর ব্যবসায় খাটছে, সে টাকা তখনি ফেলে দেবেন! এই ব্যাপার নিয়ে বাপে-ছেলেতে বিরোধ—এমন বিরোধ যে দুজনে বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ! যেদিন ঐ আসাম যাত্রা, সেদিন বেরুবার আগে মহেন্দ্র মিত্রের মেয়ের ব্যাপার নিয়ে দুজনে ভয়ানক একটা শীন্ হয়েছিল বাড়ীতে। বাড়ীতে যে সরকার আছেন—দীননাথ...বহুকালের পুরোনো কর্মচারী—সেই দীননাথকে বহু জেরা করে জানা গেছে, কর্তা বিনয়কে বলেছিলেন, মণিমালার সঙ্গে বিনয়ের নিত্য দেখাশুনা চলেছে, এ খবর তিনি পেয়েছেন—এবং মণিমালার বিবাহের জন্য কর্তা একটি পাত্রও ঠিক করেছেন—শিলঙ থেকে ফিরে সেই পাত্রের সঙ্গে তিনি দেবেন মণিমালার বিবাহ! এ কথায় বিনয় যেন ক্ষেপে ওঠে এবং দুজনে ভয়ানক বাকবিতণ্ডা চলে!...

গোবর্ধন প্রশ্ন করলে—মণিমালা বুঝি ঐ মহেন্দ্র মিত্রের মেয়ে?

শান্তিময় বললেন—হ্যাঁ।

তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠে গোবর্ধন বললে—হুঁ! তাহলে তো মিস্ট্রি ইজ ক্লীয়ার...এ্যাজ ক্লীয়ার এ্যাজ ডে লাইট!...প্রণয়ে বিঘ্ন—শিলংয়ের পথে বিনয় তাই বিঘ্ন-বিমোচন করেছে! ঐ যে বন্দুক নিয়ে বেরুলো...এর ঐ একটিমাত্র অর্থ!

পেন্সনী-ডেপুটি রায় বাহাদুর বললেন—বিনয় তালুকদারকে এখনো এ্যারেস্ট করোনি শান্তি?

শান্তি সেন বললেন—না!

পেন্সনী রায় বাহাদুর যেন আকাশ থেকে পড়েছেন, এমনি বিস্ময়-বিহ্বল তাঁর ভাব! বললেন—অন্যায়। সেক্‌সন্ ফিফটি ফোর তোমার সহায় রয়েছে...আর ঘটনাচক্রও যখন এমন...

সত্যশরণ বললেন—এ থেকে সন্দেহ জাগবার হেতু?

পেন্সনী রায় বাহাদুর বললেন—ছেলের লাভ-এ্যাফেয়ার, বাপের বাধা,...ঘটনার খানিক আগে ঝগড়া...তারপর এক ট্রেনে যাত্রা...ছেলের হাতে বন্দুক...এবং...

সত্যশরণ বললেন—মানছি, কিন্তু সে বন্দুক থেকে কখন কোথায় গুলি ছুটলো বাপকে লক্ষ্য করে'...তার তো কোনো সন্ধান মিলছে না!

পেন্সনী রায় বাহাদুর বললেন—সে সন্ধান মিলবে ছেলেকে গ্রেফতার করে' হাজতে আটকে রাখলে...মার্ডার চার্জ...নন বেইলেবল্ অফেন্স! ছেলে প্রমাণ দিক, সে মারেনি...তার বন্দুকের গুলিতে বাপের মৃত্যু হয়নি।

রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট এ্যাণ্ড সেশন্ জজ মাখন দত্ত দুটি চক্ষু বিস্তারিত করে' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—বাট দী ওনাস্ ইজ উইথ ইউ...বিনয় আসামী...সে কোনো কথা বলতে বাধ্য নয়...দ্যাট্‌স ল!

পেন্সনী ডেপুটি উষ্মাভরে বললেন—রেখে দিন আপনার ল! সিভিল কোর্টে ল'য়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করে' চলেন—ক্রিমিনালে তা চলে না। ক্রিমিনালে শুধু ধরো আর মারো!...পুলিশ যাকে ধরে চালান দিচ্ছে তাকেই আমি চিরদিন সাবড়ে এসেছি...এমন সাবাড় যে আপীলেও সে সাবড়ানির ঘাবড়ানি চলেনি! অত আইন দেখতে গেলে কি এ্যাডমিনিস্ট্রেশন্ চালাতে পারতো ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট।

তরুণকান্তি বললে—যা বলেছেন রায় বাহাদুর, আপনাদের এমনি বিচার-মহিমার জন্যই সেকালে একটা কথা ছিল বটে ডেপুটিদের সম্বন্ধে যে—নো কনভিকশন, নো প্রোমোশন। কিন্তু কালের চাকা আজ ঘুরে গেছে, রায় বাহাদুর!

সত্যশরণ বললেন—বাজে কথা যাক—তুমি খোলা-মন নিয়ে এ্যাণ্ড উইথ নো প্রেজুডিস্ তদন্ত করো শান্তি! একজন নিরীহ মানুষের জীবন গেছে দুর্বৃত্ততার ফলে সত্য, কিন্তু তা বলে' এর জন্য আর একজন নিরীহের নির্যাতন আর হত্যা—এর সমর্থন চলে না!

শান্তি সেন বললেন—নিশ্চয়! পুলিশে চাকরি করছি বলে' কশাই হতে হবে, এর মানে বুঝি না!

তরুণকান্তি চাইলো গোবর্ধনের পানে—গোবর্ধন স্তব্ধ—তার মাথার মধ্যে যেন কল্পনার তরঙ্গ বয়ে চলেছে! তরুণকান্তি বললে—তুমি বলে দাও গোবরচন্দ্র..এ-সবের হদিশ তো তোমার নখদর্পণে...চ্যাপটারের পর শুধু চ্যাপটার খুলে যাওয়া!

গোবর্ধন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো তরুণকান্তির পানে...সত্যশরণ দিলেন ধমক—আবার তরুণ!

তরুণকান্তি বললে—কি জানি, আমার ঐ ডিটেকটিভ-নভেলগুলোর উপর কেমন দারুণ আক্রোশ...মানুষের কথা এরা লিখবে, অথচ সে লেখায় না থাকবে এতটুকু সেন্স! যা-তা পাগলের মতো।

সত্যশরণ বললেন—আঃ। তাঁর দুচোখে ভ্রূকুটি। তারপর সত্যশরণ প্রশ্ন করলেন শান্তি সেনকে—হাজারিবাগে শিকার করার কথাটার সম্বন্ধে?

শান্তি সেন বললেন—বিনয় বলেছেন, বর্ধমানে থাকেন ওঁর বন্ধু শান্তনু...বর্ধমান থেকে শান্তনুকে নিয়ে হাজারি-বাগে শিকার করতে যাবেন—এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়।—শান্তনুকে সে-সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করেছো?

—করেছি। শান্তনু বললেন—শিকার করতে হাজারি-বাগে যাওয়ার কোনো কথাই হয়নি বিনয় তালুকদারের সঙ্গে।

পেন্সনী ডেপুটি বলে' উঠলেন—এ লাই...লেম এক্স্‌কিউজ!

শান্তি সেন বললেন—বিনয় তালুকদার বলেন, আগে থাকতে শিকারে যাবার এনগেজমেণ্ট না করলেও বর্ধমানে গিয়ে শান্তনুকে পাওয়া কঠিন ছিল না! কারণ শান্তনুরও শিকারের সখ আছে এবং তার সঙ্গে বিনয় তালুকদার দু-চারবার শিকারে গেছেন—একবার বাদায় পাখী মারতে এবং একবার যশোরের দিকে বরা মারতে।

ডিস্ট্রিক্ট-সেশন-জজ প্রশ্ন করলেন—তার করোবরেশন্ মিলেছে শান্তনুর কাছে?

শান্তি সেন বললেন—হুঁ...

সত্যশরণ বললেন—তাহলে তো ও-ব্যাপার চুকে গেল! শিকারের জন্যই বিনয় বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছিলেন—ইট্ এক্সপ্লেন্স্!

পেন্সনী রায় বাহাদুর বললেন—কিন্তু ঐ ব্যারাকপুর?

সত্যশরণ বললেন—তুমি যে মণিমালার কথা জেনেছো, সেই মণিমালা কোথায় থাকেন?

শান্তিময় সেন বললেন—তিনি আর তাঁর মা থাকেন ভুবনেশ্বরে। তালুকদারের সরকার দীননাথ মণি-অর্ডারের রসিদ দেখালেন এই মাসের টাকা তিনি রিসিভ করেছেন ভুবনেশ্বরে...দেড়শো টাকা—এ টাকাটা তালুকদার মাসে মাসে পাঠান, মহেন্দ্র মিত্রের যে-টাকা কারবারে খাটছে, তারি লাভের অংশ!

সত্যশরণ বললেন—তাহলে ঐ ব্যারাকপুরই হলো মিস্ট্রি!

শান্তিময় বললেন—হুঁ!

বিনয় তালুকদারের ধনুর্ভঙ্গ পণ...ব্যারাকপুর সম্বন্ধে কোনো কথা বলবেন না—তার জন্যে যা ঘটে, ঘটুক।

বড়কর্তার আদেশে শান্তিময় করলেন বিনয় তালুকদারকে গ্রেফতার। কাগজে কাগজে সে খবর বিরাট-সমারোহে প্রচারিত হলো...আদালতে জামিন মিললো না...খুনের চার্জ...প্রত্যক্ষ প্রমাণ না মিললেও ঘটনাচক্রে বিনয়কে কেন্দ্র করেই সন্দেহ ঘনায়িত..কাজেই...

শুনে সত্যশরণ বললেন—অন্যায় হলো শান্তি...

শান্তিময় সেন বললেন—কি করি, বলুন? আই হ্যাভ টু ওবে...

নিশ্বাস ফেলে সত্যশরণ বললেন—এতে রহস্য-ভেদ হবে না...একজন নিরীহকে অনর্থক নিগ্রহ করা। কেস যদি কোর্টে যায়, কনভিকশন্ হবে?

—অসম্ভব!

কানুনের চাকা যাঁরা চালান—চালানোটুকু নিয়েই তাঁদের কারবার—ঠিক পথে কি ভুল পথে চাকা চলছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবার প্রয়োজন আছে, ভাবেন না! তার ফলে...কিন্তু এ হলো দর্শনের কথা—আমরা দার্শনিক আলোচনা করছি না, আমরা বলছি কাহিনী।

দশ বারো দিন শান্তি সেনের দেখা নেই...প্রোফেসরের ঘরে আসর বসে নিয়মিত,—সে-আসরে পেন্সনী-ডেপুটি থেকে থ্রিলার লেখক গোবর্ধন—সকলে আসেন—গল্প হয়, আলোচনা হয়—তার সঙ্গে কত চায়ের পেয়ালা হয় খালি, কত সিগারেট পুড়ে ছাই হয়ে যায়...দেখা নেই শুধু শান্তিময় সেনের!

সেদিন আসর ভাঙ্গবার ঘণ্টাখানেক পরে শান্তিময় সেন এসে উপস্থিত..ভারী ক্লান্ত ভদ্রলোক!

সত্যশরণ বললেন—কি খবর শান্তি?

শান্তিময় সেন বললেন—বাইরে গিয়েছিলুম...অনেক তথ্য আছে—বলি ঃ

তথ্য যা বললেন, তার মর্ম ঃ ভুবনেশ্বরে মণিমালার মায়ের সন্ধানে গিয়েছিলেন—সেখানে কারো দেখা পাননি, না মণিমালার, না তাঁর বিধবা মায়ের। সেখান থেকে খবর সংগ্রহ করে' শান্তিময় গেছলেন নবদ্বীপ—নবদ্বীপ থেকে ব্যারাকপুর। স্টেশনের পূব-দিকে মাঠবাট ভেঙ্গে তিন ক্রোশ দূরে বিজন গ্রাম—সেই গ্রামে থাকেন যদু ভট্টাচায্যি—মণিমালার মায়ের দীক্ষাগুরু...তাঁর ওখানে মণিমালা আর তাঁর মা বাস করছিলেন ভুবনেশ্বর ছেড়ে। এখানে বাসের হেতু—তালুকদার শিলং যাবার মাসখানেক আগে আলটিমেটাম জানিয়ে ছিলেন, বিনয়কে গ্রাস করা চলবে না...ছেলের বিবাহ-সম্বন্ধে তাঁর আকাঙ্ক্ষা স্বতন্ত্র রকম...বন্ধুর কন্যা বলে' মণিমালার উপর তালুকদারের স্নেহ গভীর হলেও তাঁর ছেলের বিবাহ তিনি এমন-ঘরে দিতে চান, যে-ঘরের নাম দেশের বুকে হীরকাক্ষরে জ্বলজ্বল করচে—এবং সে-বিবাহের ব্যবস্থাও তিনি করে' রেখেছেন। বিনয় সম্বন্ধে দুরাশা ত্যাগ করে' তালুকদারের নির্দিষ্ট পাত্রে মণিমালাকে অর্পণ না করলে তালুকদার তাঁদের সমস্ত টাকা প্রত্যর্পণ করবেন এবং তাঁদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না।...এতে কঠিন প্রতিবাদ উঠলো বিনয়ের তরফ থেকে...বিনয় বললে—বাপের সব আদেশ শিরোধার্য করতে রাজী থাকলেও এ ব্যাপার আমি মানতে পারবো না—তার জন্য যদি বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হই—সহ্য হবে! মণিমালাও বললেন—বিবাহ না হয় তবে না, তা বলে' যাকে উনি ধরে এনে দেবেন, তাঁকে? কখনো না! এ অবস্থায় বিনয়ের পরামর্শে ওঁরা ব্যারাকপুরে আসেন—গুরু যদু ভটচায্যির গৃহে। নবদ্বীপ হলো মহেন্দ্র মিত্রের পৈতৃক বাসভূমি—কিন্তু ব্যারাকপুর কলকাতার কাছে—মনে করলে যাতায়াত চলে—তাই ব্যারাকপুরে আসা। বিনয় এখানে য় আসা-যাওয়া করছিলেন—এবং তালুকদার যে-আলটিমেটাম দিয়েছিলেন শিলঙ থেকে ফিরেই মণিমালার গতি—তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিনয় ব্যবস্থা করেন, বাপ শিলঙে থাকতে থাকতে মণিমালাকে বিবাহ করবেন...

সত্যশরণ বললেন—বুঝলুম—কিন্তু একটা বিষয় এখনো রহস্যে রয়ে যাচ্ছে। তাই যদি স্থির হয়ে থাকে তো হাজারি-বাগে শিকার অভিযান?

শান্তিময় বললেন—বিনয়কে প্রশ্ন করেছিলুম জবাব মেলেনি। তিনি কোন কথার জবাব দেবেন না পণ করেছেন।

সত্যশরণ বললেন—এখনো তাঁর জামিন মেলেনি?

—না...

সত্যশরণ কি ভাবলেন, তার পর বললেন—মণিমালা এখন কোথায়?

—ব্যারাকপুরেই আছেন। তবে মা আর মেয়ে এমন হয়ে আছে যে দেখলে চমকে উঠবেন।

সত্যশরণ বললেন—তোমার সুপিরিয়র অফিসার কি বলেন?

—তিনি বলেন, চালান লিখে কোর্টে পাঠাও কেস্...কতদিন আর ঐ নিয়ে মাথা ঘামাবো! কোর্টের বিচারে যা হয় হোক!...

সত্যশরণ বললেন—বিচারে খালাশ পাবে...কারণ এটুকু প্রমাণে...প্রমাণ মানে অনুমান মাত্র...মানুষের সাজা হতে পারে না।...তবে খালাস পাওয়াই তো কথা নয়—কোর্টে চালান দিলে সম্মান-মর্যাদাটুকু জন্মের মতো খোয়া যাবে!...সাধারণে ভাববে, খুন করেছিল ঠিক...উকিল ব্যারিস্টারের জোরে ফশকে বেরিয়ে গেছে!

শান্তিময় বললো—হুঁ...

তারপর আসর বসলো না ক'দিন...বিশেষ কাজে সত্যশরণকে কদিন ছুটোছুটি করতে হলো—কেষ্টনগর আর কলকাতা, কলকাতা আর কেষ্টনগর!...

শেয়ালদার ট্রেনে চড়ে ব্যারাকপুর আর রাণাঘাট পেরিয়ে কেষ্টনগর যাতায়াত! তালুকদারের অপমৃত্যু, বিনয়ের গ্রেফতার...এগুলো বুকে ফুটে আছে কাঁটার মতো! অবসর পেলে মনে ঐ এক চিন্তা...হাজার তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়! ট্রেনের কামরায় বসেন পশ্চিম-দিক ঘেঁষে...এঞ্জিনের দিকে মুখ করে'...তালুকদার তাঁর ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় যে-ভাবে বসেছিলেন বলে' শুনেছেন—সেই পোজিশনে! বরাবর লাইনের ধারে নজর রাখেন,—লাইনের ধারে কোনো রকম কিছু যদি...! মনে হয়, ব্যারাকপুরের আগেই যদি গুলি ছুটে থাকে? সবটাই তো অনুমান...এমন প্রমাণ তো পাওয়া যায়নি যে মৃত্যু ঘটেছে ব্যারাকপুর ষ্টেশন পার হবার পর!...

একটা জিনিষ চোখে পড়েছে ক'বারই...পলতা আর ইছাপুর স্টেশনের মধ্যে ফাঁকা একটা মাঠ...সেই মাঠের পূবে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে পোঁতা বন্দুক-প্রাকটিশের টার্গেট পোস্ট...কাঠের থাম্বায় গাঁথা বড় বোর্ড...বোর্ডের গায়ে কালো কালো চক্র আঁকা...সেই আঁকা-গণ্ডীর মধ্যে তাগ করে' গুলি লাগানো চাই! হঠাৎ সেদিন মনে হলো, ঐ টার্গেট-প্রাকটিশ করতে এসে যদি...

মাথার মধ্যে মস্ত-এক সম্ভাবনার বিদ্যুৎ চমক দিয়ে গেল যেন...এবং সেদিন বাড়ী ফিরেই তিনি দেখা করলেন শান্তিময়ের সঙ্গে। তাঁকে বললেন...মনে যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত জেগেছিল! এবং...

পরের দিনই বেরিয়ে পড়লেন শান্তিময়কে নিয়ে। ট্রেনে চড়ে এসে নামলেন পলতা-স্টেশনে। নেমে লাইন ধরে গেলেন টার্গেট প্রাকটিশের মাঠে! সেখানকার অপিসে দেখা হলো মালীর সঙ্গে, বেয়ারার সঙ্গে। তাদের জিম্মায় ছিল লগ-কেতাব—এ কেতাবে কে কবে এলো প্রাকটিশ করতে, কতক্ষণ প্রাকটিশ চললো...কটা গুলি কবে খরচ হলো—সে গুলি-চালানোর ফলাফল...সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ লেখা থাকে।

লগ-বুক পরীক্ষা করলেন বেশ হুঁশিয়ার হয়ে। পরীক্ষায় খবর মিললো, যেদিন তালুকদারের মৃত্যু ঘটেছে, ঐদিন বেলা সাড়ে বারোটায় এসেছিল হপকিন্স বলে' এক সাহেব টার্গেট-প্রাকটিশ করতে। হপকিন্স মাঠে নামে পৌনে একটায়—প্রাকটিশ করেছিল সমানে বেলা একটা চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত। খবর মিললো, পাঁচটা ট্রাই করেছিল।...তার মধ্যে একটি লাগে বোর্ডে, তিনটে আশে-পাশে—টার্গেট-পোস্টের পিছনে কাঁটাল গাছে...তাতে একটা লাইনের ধারে একটা বাছুর ঘাস খাচ্ছিল, সেই বাছুরের পায়ে একটা আর একটা লাইনের গায়ে উঁচু মাটীতে—বাকী পাঁচ-নম্বরটা কোথায় লাগলো তার হদিশ মেলেনি!

সত্যশরণ বললেন—হদিশ মেলেনি?

বেয়ারা বললেন—জী নহি!

সত্যশরণ চাইলেন শান্তিময়ের পানে, বললেন—মেডিকেল রিপোর্টগুলির পার্টিকুলার্স পেয়েছো?

—নিশ্চয়।

সত্যশরণ বললেন বেয়ারাকে—সাহেব কি গুলি ব্যবহার করেছিল, বলতে পারো?

—জী! সে সব স্টোরের কিতাবে লিখা থাকে।

—দেখাতে পারো?

—জী!

দেখে নোট করা হলো...শান্তিময় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন সত্যশরণের দিকে। সত্যশরণ বললেন—মেডিকেল রিপোর্টে যে-গুলির খবর পেয়েছো, মিলিয়ে দেখো তো তার সঙ্গে...আমার মনে হয়...

শান্তিময় সেন বললেন—কি মনে হয়?

সত্যশরণ বললেন—খুন নয়...এ্যাক্সিডেণ্ট...হপকিন্সের প্রাকটিশ গুলি গিয়ে লেগেছে অতর্কিতে তালুকদারের রগে—তিনি কামরার এদিক ঘেঁষে বসেছিলেন খোলা জানালার ধারে...এ্যাণ্ড আই অ্যাম সিয়োর ইট ওয়াজ হপকিন্স-বুলেট দ্যাট হ্যাড...

বেয়ারার কাছে আরো খবর মিললো। হপকিন্স ভয়ানক আনাড়ি...ওর তাগা কোন দিকে লাগবে—ঠিক ঠিকানা থাকে না কোনো কালে। তিন চার মাস প্রাকটিশ করছে সাহেব—তবু যেমন আনাড়ি তেমনি রয়ে গেছে।...সেবারে এমন গুলি ছুঁড়লো, পোল্ তো এদিকে—গুলি গিয়ে লাগলো ওদিকে এক কুলি ঘাস কাটছিল, তার পায়ে একেবারে!...

এ লাইনে সমস্যা-পূরণ হলো! গুলির মেক্ আর মাপ দুই গেল মিলে—হপকিন্স প্রাকটিশ করছিল যে-সময়ে, ঐ সময়েই আসাম-মেল ফীল্ড পাশ করছিল—হপকিন্স স্বীকার করলো, তার ছোঁড়া একটি গুলির সন্ধান মেলে নি।

লালবাজারেই মামলার ফয়শালা হলো—বিনয় পেলেন মুক্তি এবং তার পর কিন্তু বিবাহের কথা লেখবার আমাদের প্রয়োজন নেই—সে হলো প্রজাপতির নির্বন্ধ। খুশী হলেন সকলে—আমার থেকে এত বড় সমস্যার মীমাংসা...

গোবর্ধন শুধু বিচলিত...ইতিমধ্যে সে এই মৃত্যু-রহস্য নিয়ে দুশো পাতার এক থ্রীলার লিখে ফেলেছে—সে লেখার ছত্রে ছত্রে দারুণ সাস্‌পেন্স...বেচারী সগর্বে বলেছিল সে যা লিখেছে—

শুনছি, সে-লেখা রোমাঞ্চ-সিরিজের ১৪৭ নম্বর উপন্যাস-রূপ ছেপে বেরুবে চাঁপাতলা পাবলিশিং হাউস থেকে। যাঁদের রুচি হয় পড়ে দেখবেন!

আষাঢ় ১৩৫৫

দেবদূত

রাসবিহারী মণ্ডল

১

সে যেন শুধু আমাদের মিলনের পথটুকু সরল করে দেবার জন্যই কোন্ স্বর্গ হতে ছুট্‌কে এসে আমাদের সংসারের মাঝে পড়েছিল। সে যদি তার ফুলের মত কচি হাত দুখানি প্রসারণ করে, ব্যবধান-পথে সেতুর মত আমাদের মধ্যে এসে না দাঁড়াত, হয়ত বা লক্ষ্যভ্রষ্টের মত আমাদের জীবনস্রোতের গতি ভিন্ন পথে ফিরে যেত।

সে আজ অনেকদিনের কথা। প্রথম যখন তাঁকে আমি দেখি, তখন সবে আমার জীবনের প্রথম প্রভাত। অজ্ঞাতে হৃদয়ের মাঝে কে যেন ধীরে-ধীরে একটা সোনালি তুলি বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল,—নয়নে সৌন্দর্যের অঞ্জন পরিয়ে দিয়েছিল, যার স্পর্শে সংসারের সমস্ত সৌন্দর্যই যেন কেন্দ্রীভূত হয়ে সম্মোহনরূপ আমার নয়ন-সম্মুখে ভেসে উঠ্‌ত। হৃদয়খানা যেন এক বিচিত্র পুষ্পাস্তরণে পরিণত হ'য়ে তার প্রস্ফুটিত প্রসূনরাজির সৌরভে আমায় আকুল করে তুল্‌ত'। আমি সেই স্তূপীকৃত অসংখ্য ফুলরাশির ভারে অবনত হ'য়ে কার, কোন্ দেবতার চরণে অঞ্জলি দেবার জন্য শুধু অপেক্ষায় আকুল আগ্রহে পথ চেয়ে থাক্‌তুম, পাছে সে সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুলরাশির সৌরভটুকু সমীর-প্রবাহে মিশিয়ে যায়,—পাছে তাঁর আসার পূর্বেই তা ম্লান হয়ে যায়।

দেবতা দর্শন দিলেন আমাদেরই বাড়ীতে। আমি যে ডালি নিয়ে এতদিন ধরে অপেক্ষায়-অপেক্ষায় কাল কাটাচ্ছিলুম, প্রথম দর্শনেই সে প্রসূন সম্ভার তাঁর চরণ প্রান্তে ঢেলে দিলুম। তিনি কিন্তু তখন তা গ্রহণ করেছিলেন কি না জানি না, মরুক্‌গে তা জান্‌বারই বা আমার প্রয়োজন কি ছিল? সে বয়সে যে কেবল আত্মদানেই তৃপ্তি!—নিজের জন্য নিজের বল্‌তে কোন কিছু রাখবার আকাঙ্ক্ষাও ছিল না, অবসরও ছিল না।

তিনি আমার দিদির দেবর। দিদি সন্তান-সম্ভাবনায় বাড়ী এসেছিলেন, তাই তিনি কলেজের ছুটিতে দিদিকে দেখ্‌তে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। দিদি আমার বিদ্যাবুদ্ধির অনেক পরিচয় দিলেন,—রূপেরও যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। আমি লজ্জায় লাল হয়ে নেয়ে উঠ্‌লুম। তিনি আমার দুরবস্থা দেখে মৃদু-মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌লেন। আমার বড় লজ্জা করতে লাগল ;—কিন্তু সে ভুবন-ভোলান হাসিটুকু দেখবার প্রলোভন ত্যাগ করে ত' আমি ঘর হতে উঠে যেতেও পারলুম না। কি সরল, সুন্দর হাসিটুকু। সেই হাসিটুকু সম্বল করেই যে এখন এই জীবনের পথ ধরে চলেছি।

মধ্যাহ্নে বাবা, মা ও দিদি বাব্বার ঘরে বসেছিলেন,—বাবা তামাক খাচ্ছিলেন। আমি দু'তিনবার মিথ্যা অছিলা করে, পাশের ঘরটায় গিয়ে দেখে এলুম, তিনি ঘুমুচ্ছেন। ফিরে এসে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়াতেই শুনলুম, বাবা দিদিকে ওঁর নাম করে বল্‌ছেন, "সুধার সঙ্গে আমাদের এর বিয়ে হ'লে বেশ মানায়, না সরো?" মা বললেন, "আমি অনেক দিন ধরেই মনে করেছিলুম ;—ছেলেটীকে দেখে আমার ভারি পছন্দ হয়েচে বাছা! আহা! যেমন চেহারা, তেম্‌নি লেখাপড়ায়! সরো! তোমাকে মা, জামাইয়ের মত করাতেই হবে ;—ঘরে এমন পাত্র থাক্‌তে, কোথায় দোরে-দোরে ঘুরতে যাবো?" দিদি হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্‌লেন, "মা! তাঁর মতের জন্য ত' ভাবনা নেই। ছেলের মত করাতে পারলেই হয়। আমার শ্বশুর

শ্বাশুড়ী নেই,—শেষকালে না আমাদের দোষে! তবে আমার খুব অনুগত,—কথা ঠেলবে না বোধ হয়।"

মা একটা আশ্বাসের নিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন, "হাঁ মা, তুমি একটু মনোযোগ কর। আর আমার সুধাও ত' বাছা কাল-কুৎসিত নয়, যে, অপছন্দ হবে।"

"না, অপছন্দ বোধ হয় হবে না। তবে আজ-কাল যে এক বায়না ধরেছে—বি-এ পাশ করে বিলেত যাবে।"

বাবা বলে উঠ্‌লেন, "বেশ ত'—বিয়ে-থা করে যাবে। সুধাও আমাদের বেশ লেখাপড়া শিখেছে। বিয়ের পরও সে যাতে ভাল রকম শিখ্‌তে পারে, আমি তার বন্দোবস্ত করে দেব।"

দিদি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "সর্বনাশ! তা হলেই মাটী করেছেন। ও বাই ওর ছাড়াতেই হবে। তা না হ'লে কি আর ও আমাদের থাক্‌বে? আর আমার ঐ একটা সম্বল।" বাবা বলে উঠ্‌লেন, "পাগ্‌লি মা! সবাই কি আর বিলেত গেলেই অমনি পর হয়ে যায়? যে দিন-কাল পড়েছে, তাতে লেখাপড়া শিখে একবার ঘুরে আস্‌তে পারলে একটা মানুষের মত হবে।"

"তোমাদের ঐ এক কথা! আচ্ছা বাবা! আমাদের দেশে থেকে লেখাপড়া শিখ্‌লে কি মানুষ হয় না?—ঐ যে কি এক ভুল ধারণা তোমাদের আমি বুঝি না,—তাঁরও ঐ কথা!"

দিদি বাহিরে এসেই আমায় নিয়ে পড়লেন। চুল বাঁধ্‌তে, সাজগোজ কর্তেই বিকেল হয়ে গেল। সেদিন আমার সাজগোজের প্রতি দিদি যেন একটু বেশী মনোযোগী হয়ে পড়লেন। আমার চুল বেঁধে দিচ্ছিলেন, হঠাৎ কি জানি কি ভেবে একটা টান মেরে আমার চুলগুলো খুলে দিয়ে পিঠের উপর ছড়িয়ে দিলেন, মাঝখানে শুধু একটা লাল রেশমী ফিতের ফাঁস্ দিয়ে দিলেন। সাবান দিয়ে মুখখানা ধুয়ে দিয়ে একটু ক্রীম, ঠোঁটে একটু রং দিয়ে দিলেন। আমি অবাক্ হয়ে দিদির মুখের পানে চেয়ে রইলুম। তিনি গম্ভীরভাবে একখানা বাদামী-রং-করা শাড়ী এনে আমায় পরতে বলে, একখানা বেশ বড় 'টিপ্' কপালে বসিয়ে দিয়ে, আমার চিবুকখানা তুলে ধরে হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্লেন, "আজ ভাইমণির আমার মুণ্ডুটী ঘুরে যাবে!"—আমার ভারি লজ্জা করতে লাগল। দিদির গায়ে একটী ছোট্ট চিম্‌টী দিয়ে বল্লুম, "যাঃ! আমি এমনি সং সেজে সাম্‌নে বেরুব' কি না?"

"খবর্দার! দুষ্টুমি কর্লে মর্‌বি!"

ঠিক্ সেই সময়ে "বৌদি! বৌদি!" বল্‌তে-বল্‌তে একেবারে তিনি নীচে নেমে আমাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। একবার অতি কষ্টে চোখ তুলে তাঁর মুখের পানে চেয়ে দেখলুম, তাঁর সুন্দর আয়ত চক্ষুদুটি আমারই মুখের উপর নিবদ্ধ। আর পিছনে দাঁড়িয়ে দিদি মুখ টিপে হাস্‌ছে। আমার ত' লজ্জায় মাটির মধ্যে মিশে যেতে ইচ্ছা হল'!

২

নির্দিষ্ট সময়ে দেবদূতের মত একটী দিব্যি টুক্‌টুকে খোকা এসে দিদির কোল ও আমাদের ঘর আলো করে দিলে। বাড়ীময় একটা আনন্দের সোরগোল পড়ে গেল। জামাইবাবু খোকাকে দেখে গেলেন। কিন্তু কি ছাই 'তাঁর' লেখাপড়া,—তিনি আর একদিন সময় করে এত আদরের খোকামণিকে দেখতে আসতে পারলেন না? আমার ত' ভারি রাগ হত'। দিদিকে বল্‌লে তিনি কেবল মুখ টিপে হাসতেই থাকেন—হয় ত মনে ভাবতেন আমার গরজ কিছু বেশী। কাজেই দিদির সামনে আর সে প্রসঙ্গের উত্থাপন করতুম না। খোকা হওয়ার পর তিনি দিদিকে প্রায়ই চিঠি দিতেন। দিদি সূতিকাগৃহে,—কাজেই, সে চিঠিগুলো পড়ে আমিই দিদিকে শোনাতেম, আরও লুকিয়ে অনেকবার পড়তুম, যেন পড়ে

আশ মিটত না। প্রথম দু'তিনখানা চিঠিতে তিনি আমার নাম উল্লেখ করে কুশল জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সেই তাঁর হাতের লেখা দুটী অক্ষর 'সুধা'র মধ্যে কি যেন একটা মাদকতা লুকানো থাকতো,—আমি দেখ্‌তে-দেখ্‌তে বিভোর হয়ে যেতুম। বিশ্বজগতের সমস্ত মাধুর্য যেন সেই অক্ষর দুটীর মধ্যে জড় হয়ে বায়োস্কোপের ছবির মত আমার চোখের সামনে সদাই উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ত। আমি অনেকবার ঠিক্ তেমনি ভাবে ঐ অক্ষর দুটী জোড়া দিয়ে লেখবার চেষ্টা করতুম ; কিন্তু তেমনটী যেন কিছুতেই হতে চাইত না। আমি মনে-মনে কত কল্পনার স্বপ্নজাল বুন্‌তে-বুন্‌তে চিঠিগুলো নাড়াচাড়া করতুম। সে ভাব, সে মাধুর্য রবিবাবুর কবিতার মধ্যেও খুঁজে পেতুম না। কিন্তু তার পরের চিঠিগুলো খুঁজে-খুঁজেও যখন তাদের সারা বুকের উপর ঐ ছোট্ট নামটী, সামান্য দুটী অক্ষর একত্র, একসঙ্গে দেখ্‌তে পেতুম না, তখন একটা রুদ্ধ অভিমান আমার সমস্ত অন্তরটা জুড়ে হাহা করে ঘুরে বেড়াত। আমার চোখদুটী জলে ভরে আসত'—মনে হত, নিষ্ঠুর দেবতা! এটুকু দিতেও এত কুণ্ঠিত।

বুকে-পিঠে করে যখন খোকাকে পাঁচ মাসেরটী করে তুললুম, সেই সময় একদিন হঠাৎ জামাই বাবুর কাছ থেকে দিদির তলব হল। উনি আসছেন দিদিকে ও খোকাকে নিতে। আমার দেবতার দর্শন ও খোকার বিচ্ছেদ, এই দুই আনন্দ ও ব্যথায় প্রাণটা ভরে উঠ্‌ল। খোকা তার কচি মোমের মত হাত-দুখানি দিয়ে আমার একগুচ্ছ চুল ধরে টান্‌তে-টান্‌তে আমার মুখের পানে চেয়ে একগাল হেসে উঠ্‌ল ; আমার চোখ-দুটো সহসা ভারি হয়ে উঠে, খোকার বুকের উপর টপ্ টপ্ করে দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু পড়ে গেল। খোকা যেন বিস্মিত আতঙ্কে আমার মুখের পানে চেয়ে রৈল—তার মুখের হাসিটুকু সহসা নিবে গেল। আমি অজস্র চুম্বনে খোকাকে আচ্ছন্ন করে দিলুম।

খোকাকে কোলে নিয়ে দিদি যখন গাড়ীতে উঠ্‌লেন, আমার প্রাণটা যেন একেবারে খালি হয়ে গেল। অজস্র ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ে আমার গণ্ড প্লাবিত করে দিলে। তিনি গাড়ীতে ওঠবার সময় আমার হাত ধরে বল্লেন, "কান্না কি সুধা!—এই ও-মাসে খোকার ভাতের সময় আমাদের বাড়ী গিয়ে আবার তাকে দেখে আসবে।"—কি মধুর সম্বোধন! কি প্রাণময় স্পর্শ! আমি তাঁর পাদমূলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লুম। তিনি হাসতে-হাসতে গাড়ীতে উঠে, খোকাকে কোলে নিয়ে বল্লেন,—"ছিঃ! পরের ছেলের উপর কি এত মায়া বসাতে আছে?"

খোকা বাবুও তাঁর চশমার পানে চেয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল।

৩

খোকার অন্নপ্রাশনের পর প্রায় দেড় বৎসর কেটে গেল। কতদিন খোকাকে দেখিনি! দিদি তাঁর সংসারে একা,—তাঁর এ-বাড়ী আসার বড়-একটা সুবিধা হয়ে উঠ্‌ত না। খোকার জন্য আমার বড় মন কেমন করত ;—ভাবতুম্ সে এতদিনে কত বড়টী হয়েছে,—কেমনটী হয়েছে! আর ভাবতুম তাঁর কথা—তাঁর নির্মমতার কথা!—আমার জীবন-মরণের কথা! কেন এমন হল!—কেন তিনি এত নিষ্ঠুর হয়ে আমার সযত্নে-গড়া তাসের ঘরটী পায়ে ঠেলে ভেঙ্গে দিলেন? বিলাতই যদি যান, তাঁর বিয়ে করে যেতে কি ক্ষতি ছিল? সেখান হতে ফিরে এলে কি তাঁর মনের মত হতে পারতুম না? কেন তিনি বলে দিলেন না?—কেন তিনি শিখিয়ে দিলেন না? তিনি যেমনটী শেখাতেন, আমি তেমনটী প্রাণপণে শিখতুম,—তাঁকে অদেয় ত' আমার কিছুই ছিল না। তবে কেন নিষ্ঠুর দেবতা!—তবে কেন আমায় দূরে ঠেলে ফেলে দিলে? তিনি গান ভালবাসেন,—তা আমি যেমন জানি, লজ্জাসরম ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তাঁকে শুনিয়েছিলুম। কেন তিনি বল্লেন না,—আমি ভাল করে শিখতুম! তবে কি আমি

তাঁর অযোগ্য? অযোগ্য ত' বটেই! পায়ের নীচে থাক্‌তে চেয়েছিলুম—দেবতার যোগ্য হবার স্পর্ধা ত' কখন কোন দিন রাখিনি! কেন তবে আমায় এই আঁধারের মধ্যে ফেলে দিলেন?...এমনি একটা কালো নিরাশাভরা আকুলতায় আমার হৃদয় সদাই ভারি হয়ে উঠ্‌ত। আমার অজ্ঞাতে গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে, উপাধান সিক্ত করে দিত। একটা অখণ্ড, অবশ্যম্ভাবী বিপদের ভয়ে আমার ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না,—শ্রান্তির অবসন্নতার মত একটা ঘন কাল ছায়া যেন আমায় ঘিরে ফেলেছিল।

দিদির নিমন্ত্রণে আমি খোকাকে দেখতে গিয়েছিলুম। খোকাকে কাছে পেয়ে যেন আমার হৃদয়ের কালো ছায়াটুকু অপসৃত হয়ে গেল। সে বেশ হাঁট্‌তে এবং আধ-আধ কথা বলতে শিখেছিল। তার সঙ্গে খেলা-ধূলায়, আর নিষ্ঠুর দেবতার দর্শনের মধ্যে দিয়ে, আমার দিনগুলো বেশ সহজ ভাবেই কেটে যাচ্ছিল। খোকার কল্যাণে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাটুকু দিন-দিন অলক্ষ্যে বেড়ে উঠ্‌ছিল। তাঁর সম্মুখে প্রাণপণ প্রয়াসে হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন ব্যথাটুকু গোপন করে, তাঁর রহস্যালাপে যোগ দিতুম ; খোকাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে খেলা কর্‌তুম ; সময়মত তাঁর অনেক ছোটখাট কাজও করে দিতুম। তিনি যখন আমার সেই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রসাধনগুলির অনর্গল প্রশংসা করে যেতেন, তখন চোখ-দুটো আমার ভারি হ'য়ে উঠত,—আমার মনে হত, তাঁর পা দুখানার উপর আমার মাথাটা চেপে ধরে বলি, 'ওগো! আমার চির আকাঙ্ক্ষিত! ওগো আমার বাঞ্ছিত দেবতা! আমায় অধিকার দাও, আমার লজ্জা নিবারণ কর!'—

৪

উপরের বারান্দায় পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে আমি খোকাকে নিয়ে গল্প করছিলুম। নক্ষত্রখচিত নির্মল আকাশে, গাছের মাথায়-মাথায় কে যেন রূপোলি তুলি বুলিয়ে দিয়েছিল। দূরে পাংশুবর্ণ খণ্ড-মেঘগুলো আকাশে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল। খোকা একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিল, তার কুসুম-পেলব মুখে-চোখে জ্যোৎস্নার ধারা ঝরে প'ড়ছিল। আমার উন্মুক্ত কবরী হতে প্রস্ফুটিত বেলফুলের গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। উনি হঠাৎ সেখানে এসে খোকাকে আমার কোল হতে একেবারে বুকে তুলে নিলেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠে কাপড়খানা সংযত করে নিলুম। খোকা তাঁর মুখপানে চেয়ে হেসে বলে উঠল, "কাকাবাবু! দুষ্টু!"—তিনি আমার মুখের পানে চেয়ে, হাস্‌তে-হাস্‌তে তার গালে-মুখে অজস্র চুম্বন দিয়ে, তাকে উত্যক্ত করে তুল্লেন। খোকার হাসির বেগ একটু উপশম হতেই, কোল হতে নেমে পড়ে দুষ্টু ছেলে বলে উঠ্‌লো, "কাকা! মাসী চুমু।"—আমি লজ্জায় মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু এ কি?—সহসা তিনি আমায় আলিঙ্গনে বন্দিনী করে, আমার উত্তপ্ত ওষ্ঠের উপর তাঁর কম্পিত ওষ্ঠাধর দুখানি সংযত করে দিলেন। আমার নিস্পন্দ ওষ্ঠ-দুখানির মধ্য দিয়ে সর্ব শরীরে একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটে গেল। উপরে আকাশে নক্ষত্রগুলো দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে উঠ্‌ল,—একটা গন্ধামোদিত দমকা বাতাস ছুটে এসে আমায় আকুল করে তুলল। একটা স্ফুরিত জ্যোৎস্নালোক আমার মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ল। আবেশে আমার চক্ষুদুটী মুদে এল। আবেগে কাঁপতে কাঁপতে আমি নিথর হ'য়ে তাঁর শীতল বক্ষের উপর আচ্ছন্নের মত ঢলে পড়লুম—তিনি আমায় বেষ্টন করে বুকের মাঝে চেপে ধরলেন। সহসা খোকার হাস্যধ্বনিতে আমার চমক ভাঙ্গতেই, আমি তাড়াতাড়ি খোকাকে কোলে তুলে নিলেম,—তিনি ঝড়ের মত বেগে তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

* * * *

ধরার বুকে সেদিন কি অপরূপ সৌন্দর্যই ঝরে প'ড়েছিল। তরল রজত জ্যোৎস্নার বন্যায় ধরাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল! সে মাধুর্য, সে সৌন্দর্য যেন ঠিক উপলব্ধি করা যায় না।

আমি পরিপূর্ণ ভাবে সে সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্যই যেন, সেই সৌন্দর্যের মধ্যে নিজের সমস্ত সত্তা ডুবিয়ে দিয়ে, উপরে নক্ষত্র-খচিত সীমাহীন নীলিমার পানে চেয়ে রইলুম। অলক্ষ্যে কোথা হতে একটীর পর একটী করে, কত নদী, নালা, খানা ডিঙ্গিয়ে রাশিরাশি চিন্তা ছুটে এসে আমার ভাবপ্রবণ হৃদয় মধ্যে আছড়ে পড়তে লাগল। কি সে তৃপ্তি! কি সে মাদকতা! কি সে উন্মাদনা! আমার কেবলই মনে হতে লাগল,—

"—লুটিয়া সর্বস্ব মোর,
দিলে মোরে ধন্য করে—"

*　　*　　*　　*

খোকা তার মায়ের কাছে যাবার বায়না ধরতেই, আমি তাকে নিয়ে নীচে দিদির কাছে নেমে গেলুম। খোকা একেবারে একগাল হেসে তার মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু কি দুষ্টু ছেলে গো! বলে কি? সে দিদির চিবুকখানি ধরে হাস্‌তে-হাস্‌তে বলে উঠ্‌লো, "মা কাকা আমা চুমু,—মাসি চুমু"—আমার ইচ্ছা হল, হাত দিয়ে খোকার মুখখানা চেপে ধরি! কিন্তু সে যে জোঁকে তার মার কোল অধিকার করে বসেছিল। দিদি হেসে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "কি হয়েছে খোকন? কাকা তোমার কার চুমু কেয়েছে?" ছিঃ! ছিঃ! কি লজ্জা! দুষ্টু ছেলে একেবারে পেয়ে বসেছে! সে আবার আমার মুখে হাত দিয়ে বলে উঠল, "কাকা আমা চুমু--মাসি চুমু,—না মাসি?"

হঠাৎ দিদির মুখের হাসিটুকু নিবে গেল। তিনি খুব গম্ভীর হয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন। আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারলুম না,—আমার ভারি কান্না আস্‌তে লাগল। আমি ঝড়ের মত বেগে সেখান থেকে পালিয়ে গেলুম।... ... ...

*　　*　　*　　*

পরদিন প্রভাতে দিদি আমাকে বরণ করে এ-বাড়ীর বধূর আসনে প্রতিষ্ঠার মানসে একেবারে শুভ-দিন স্থির করে বাবাকে চিঠি লিখলেন। দেবতা নিজে এসে ধরা দিয়েছিলেন,—তার পর আর যে তাঁর কোন পথই ছিল না ;—তিনি যে আমার ওষ্ঠপল্লব দুখানির মাঝে অমৃতের ধারা ঢেলে দিয়ে, নিতান্ত আপনার করে নিয়ে, তাঁর অভয় বুকে আমায় স্থান দিয়েছিলেন। খোকার কল্যাণে আমার নারী-জীবন সার্থক হলো ভেবে, আমি তাকে প্রগাঢ় হর্ষে ও স্নেহে বুকের মাঝে নিষ্পেষিত করে, অজস্র চুম্বনে আচ্ছন্ন করে ফেললুম।

৫

সে যেন শুধু এইটুকুর জন্যই দেবতার আশীর্বাদের মত আমাদের দুজনার মধ্যে ঝরে পড়েছিল। আমার দেবতার মন্দিরে আমার প্রতিষ্ঠার জন্যই যেন সেই দেবদূতের মত শিশুটী স্বর্গ হতে আমাদের গৃহতলে খসে পড়েছিল ;—তাই কাজ শেষ করেই বাছা আমার দেবলোকে ফিরে গেল। স্বর্গের ফুল, স্বর্গ থেকে ঝরে পড়ে ধরার মাঝে শুধু তার গন্ধটুকু রেখে চলে গেল।

আজ পাঁচ বৎসর আমি এই গৃহতলে বধূর আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি,—কিন্তু এই দীর্ঘ দিনের এমন একটী দিনও যায়নি, যে দিন না একবার সেই রাঙ্গা মুখখানি আমার মনের মাঝে ভেসে উঠেছে। সে যে ভোলবার জিনিস নয় গো!' তাকে কি ভোলা যায়? আমার স্নেহময়ী দিদির মুখের অম্লান জ্যোৎস্নার মত সেই পরিপূর্ণ হাসিটুকু যেন সে কোন্ সীমাহীন আঁধারের গর্ভে ডুবিয়ে দিয়ে চলে গেছে! তাঁর মুখে যেন শ্মশানযাত্রীর মত সদাই একটা বিরাট নির্লিপ্ততা!

দিদির আর কোন সন্তান-সন্ততি হয় নি। আমার একটী খোকা। আমার খোকাকে

কোলে পেয়ে অবধি দিদির সে নির্লিপ্ত ভাবটুকু যেন ক্রমে-ক্রমে কেটে যাচ্ছিল ; কিন্তু আজও আমার খোকাকে দিদির কোলে দেখ্‌লে,—আজও যখন উনি আদালতে যাবার সময় আমায় আবেগে আলিঙ্গন করে, তাঁর সেই 'নিত্যকার অভ্যাস'টুকুর লোভ সংবরণ কর্ত্তে পারেন না—তখনি একখানি ছোট্ট কচি মুখের ঝাপ্‌সা আলো ফুটে উঠে, বুকের নীচে কাঁটার মত বিঁধতে থাকে।

পৌষ ১৩২৬

পুনর্জীবন

মানিক ভট্টাচার্য

'মা'

'কি বাবা?'

'সকাল হ'ল?

'না, বাবা, সকাল হতে এখনও অনেক দেরী।'

'উঃ মাগো!—এখনও অনেক দেরী! কটা বেজেছে?'

'এই একটা।'

'ঘড়ি নিশ্চয় ভুল চল্‌ছে মা। বোধ হয় বন্ধ হয়ে গিছ্‌ল। একবার জানলা দিয়ে দেখ না মা।'

'এই তো জানলা খোলা রয়েছে বাবা। বাইরে ঘোর অন্ধকার।'

'পূর্বদিকে দেখ তো মা। একটা তারা দেখতে পাচ্ছ না—বেশ জ্বল জ্বল করছে?'

'না বাবা, সে তারা তো এখনও ওঠেনি।'

'মা!'

'বাবা!'

'তোমাদের বড় কষ্ট দিইছি—নয় মা?'

'চার বচ্ছর আমাদের ছেড়ে ছিলি—কষ্ট হবে না?'

'মা!'

'বাবা!'

'তোমাদের কষ্ট দিয়ে আমিও কষ্ট পেয়েছি—আমিও সুখী হইনি।'

'তা জানি, বাবা,—মরে যাই!'

'তুমি সব কথা জান না—আমি বলি না মা?'

'বেশী কথা বল্‌তে ডাক্তার বারণ করেছেন, বাবা, তার চেয়ে একটু ঘুমোও।'

'এখন ঘুম যে আসছে না, মা! একটু তোমার সঙ্গে কথা কই—রাগ কর্‌বে মা?'

'না বাবা।'

'আমি এখান থেকে কোথায় চলে যাই জান মা?'

'যুদ্ধে—'

'না মা, প্রথমে আমি হরিদ্বারে যাই; সেখানে মাস খানেক থাকি; তারপর বদরিকাশ্রমে যাই। ছমাস পরে কলকাতা ফিরে আসি।'

'কলকাতা এসেছিলি!'

'হ্যাঁ মা, তবু তোমাদের কাছে যাইনি। আমি কোথায় এসেছিলাম জান?'

'না বাবা।'

'সুচারুদের বাড়ী। সুচারু বলেছিল যে কিছুতে অন্য কোথাও কনকের বিবাহ হতে দেবে না। কনকও তাই বলেছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখ্‌লাম কি জান মা?—আমি যাওয়ার পর দুটো মাসও অপেক্ষা করেনি। লক্ষ্মীগড়ের জমিদারের ছেলের সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে গিছ্‌ল। তুমি শোননি মা?'

'তুই যে এসেছিলি তা জানিনে—বিয়ের কথা শুনেছিলাম।'

'অথচ তার জন্য আমি আমার সর্বস্ব ত্যাগ করেছি—তোমাকে দুঃখ দিইছি, বাবার বিরাগভাজন হয়েছি, শোভাকে অবহেলা করেছি।'

'আর ও-সব কথা কেন তুলছিস্!'

'কথাটা শেষ করে নিই মা—রাগ কোরো না। তাই তো মনে বড় ধিক্কার হ'ল। একবার ভাবলাম তোমার কাছে ফিরে আসি ;—বড় লজ্জা করতে লাগল, পারলাম না। একেবারে চাকরি নিয়ে মেসোপটেমিয়ায় চলে গেলাম।'

'আহা বাছারে! কত দুঃখ পেয়েছিস্ সেখানে।'

'হ্যাঁ মা—বড় দুঃখ পেয়েছি! তোমাদের যে অবাধ্য হয়েছিলাম, শোভাকে যে তুচ্ছ করেছিলাম—সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনেকটা হয়ে গেছে মা! আর একটু বাকি আছে—তাও শীঘ্র হবে।'

'ও-কথা বল্‌তে নেই বাবা!'

'দেখ মা, সেখানে কেবলি মনে হ'ত তুমি আমায় ডাকছ, শোভা আমার কথা ভাবছে, বাবা আমাকে ক্ষমা করেছেন। মনে হ'ত ছুটে তোমাদের কাছে আসি ; কিন্তু তখন আর আসার উপায় ছিল না। পাঁচটি বছর থাক্‌তেই হবে কথা ছিল।'

'বন্দুকের গুলি কোথায় লেগেছিল বাবা?'

'বুকের এইখানটায় মা। মরে যাবারই কথা—তোমায় আর একবার দেখতে পাব, তাই বোধহয় বেঁচে গেছি। তাই তো মা কিছুকাল হাসপাতালে রেখে ছেড়ে দিলে!'

'আহা যদি আর মাস দুই আগে ছেড়ে দিত!'

'হ্যাঁ—আগে দেবে! আমাদের সাহেব বল্লে, ডাক্তার ব্যানার্জি একেবারে অকর্মণ্য হয়ে গেছে—একে দেশে পাঠিয়ে দাও ; তবে না ছেড়ে দিলে! আমার এ বুকে আর কিছু নেই মা!'

'ভয় কি বাবা, এবার সব সেরে যাবে।'

'দেখ মা, আঘাতের পর যখন হাসপাতালে জ্ঞান হ'ল—একে একে সব মনে পড়্‌ল। তখন বার বার তোমার কথা মনে হ'ত আর চোখ দিয়ে জল পড়্‌ত। সাহেব বকত, আর বল্‌ত, ডাক্তার, তোমরা বাঙ্গালীরা বড় বাড়ীর জন্য পাগল! তখন আমি মনে মনে তোমাকে কেবলি ডাকতাম। হাসপাতালের জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যেত ; শেষ-রাত্রে শুকতারার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতাম। মনে হ'ত, তোমার চোখের আলো ওই তারার মধ্যে জেগে আছে। মা তুমি বুঝ্‌তে পারতে না?'

'পারতাম বৈ কি বাবা!'

'বাবাকেও বড় কষ্ট দিইছি। নয় মা?'

'তোকে ছেড়ে কষ্ট হবে বৈ কি বাবা।'

'মা, বাবা কি আমার উপর রাগ করে গেছেন?'

'না বাবা, তিনি তোর জন্য আশীর্বাদ রেখে গেছেন। যাবার দিনও তিনি বলে গেছেন—ধীরু এলে বোলো, তার উপর আমার কোন রাগ নেই ; তাকে আমার সমস্ত অন্তরের আশীর্বাদ দিও ; আর বোলো, তার ওপর তো রাগ করিনি—একটু কঠিন হয়েছিলাম—যদি সে সুপথে ফিরে আসে। ওখানে বিবাহ হ'লে সে কখন সুখী হবে না জানতাম, তাই আমি মত দিইনি। যদি সে সময়ে ফিরে আসে, বোলো, শোভাকে যেন সে গ্রহণ করে—শোভা স্বর্গের দেবী!'

'সে কথা ঠিক মা ; কিন্তু আমার যে দেরি হয়ে গেল !—তুমি কাঁদছ মা?'

'না বাবা, আমি সব হারিয়েও তোকে পেয়ে সুখী হইছি।'

'কিন্তু তোমার চোখে জল যে মা!'

'একটু জল আসবে না বাবা—কত দুঃখে যে তোকে ফিরে পেয়েছি।'

'মা, শোভার বেশ ভাল বিয়ে দিয়েছ ত?'

'সে তো বিয়ে করেনি!'

'আজ পর্যন্ত বিয়ে করেনি! কেন মা?'

'পাগল ছেলে! তুই কি জানিস্‌নে তাকে? সে যে তোকে ছাড়া বিশ্বসংসারে আর কাকেও জানে না রে!'

'আমার মত পাপী পৃথিবীতে আর কেউ নেই মা। আমি বাবার মৃত্যুর কারণ হইছি, তোমারও জীবনের সব সুখ কেড়ে নিইছি, শোভারও দুর্দশার চরম করেছি!'

'তিনি বল্‌তেন, জানিস্‌ তো বাবা, কেউ কাউকে কষ্ট দিতে পারে না, নিজ নিজ কর্মফলে সবাই কষ্ট পায়। আর তুই-ই কি কম কষ্ট পেইছিস্‌ বাবা! কি শরীর ছিল, কি হয়ে গেছে ! চব্বিশ ঘণ্টা মুখে হাসি লেগে থাকত ; সে মুখের হাসি একেবারে শুকিয়ে গেছে!'

'মা, এবার একটু দেখ না—সকাল হতে আর কত দেরী।'

'এখনও দেরী আছে বাবা। এবার একটু চুপ করে থাক্‌ দিকি, ঘুম আস্‌বে।'

'না মা, এখন ঘুম আস্‌বে না। আগে সেই ভোরের তারাটি উঠবে, ঠাণ্ডা বাতাস বইবে, আকাশ-উষা উঁকি মারবে—তবে মা আমি ঘুমুব।'

'অনেকক্ষণ কিছু খাস্‌নি, তাই বোধ হয় ঘুম আস্‌ছে না, একটু দুধ গরম করে আনি।'

'মা চলে গেলেন! বাইরে যে বড় অন্ধকার—আকাশে তো আলোর লেশ নেই! কখন অন্ধকার কেটে যাবে—কখন আলো ফুটবে!'

২

'ঘুমুচ্ছ?'

'না। কে?'

'আমি।'

'শোভা!'

'হ্যাঁ, মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, দুধটুকু খেয়ে ফেল।'

'শোভা, তুমি এখানেই আছ?'

'হ্যাঁ। আমি আর কোথায় যাব?'

'শোভা, আমি তোমাকে না বুঝে অবহেলা করিছি—আমাকে মার্জনা কর।'

'ও কথা বোলো না। দুধটুকু খেয়ে ফেল।'

(শোভা চামচ করিয়া দুধ খাওয়াইয়া দিতে লাগিল।)

'আর নয়। এখন তোমার সঙ্গে একটু কথা কই।—এখনি সকাল হবে, তখন আর সময় হবে না। ও কি, তুমি কাঁদছ—শোভা,শোভা?'

'বল।'

'আমায় ক্ষমা করেছ?'

'বলিছি তো ও-কথা বোলো না।'

'দেখ শোভা, মানুষে নিজের মন বুঝতে পারে না, আমিও পারিনি ; তাই তোমাকে কষ্ট দিইছি, নিজেও কষ্ট পেয়েছি।'

'মা তো বলেছেন, ও-সব কথা আর মনে কোরো না।'

'শোভা?'

'কি বলছ?'

'তুমি এখনও আমাকে মনে করে রেখেছ? এখন আমার আবার বাঁচতে সাধ হচ্চে। কিন্তু আর তো সময় নেই।'

'তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অমন করে' বোলো না।'

'শোভা।'

'কি বল্‌ছ?'

'অদৃষ্টে সুখশান্তি না থাকলে কেউ তা দিতে পারে না—নইলে তোমার মর্যাদা সময়ে বুঝিনি ! ঘরের রত্ন ফেলে যদি মরীচিকার পিছনে না ছুটতাম, তাহলে আজ আমার চেয়ে সুখী কে!'

'তুমি ফিরে এসেছ—এই আমাদের কত ভাগ্য—এখন ও-সব ক্ষোভ কোরো না।'

'শোভা!'

'কি বল্‌ছ?'

'আর একটু এগিয়ে এস, হ্যাঁ—এইখানটিতে বস। আর আমার কপালে একটু হাত দাও তো! আঃ, কি নরম আর ঠাণ্ডা হাত তোমার শোভা! আমার কপাল যেন জুড়িয়ে গেল।'

'মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে?'

'না—যন্ত্রণা হচ্ছে বুকে। কে যেন বুকের মধ্যে থেকে বেরুতে চাচ্ছে ; পারছে না, তাই ছট্‌ফট্‌ কচ্ছে।'

'তুমি একটু স্থির হয়ে থাক দেখি, আমি বুকটায় হাত বুলিয়ে দিই।'

'আচ্ছা, তুমি কপালে একটি হাত রাখ, আর একটি হাত দিয়ে বুকে হাত বুলিয়ে দাও।'

'চোখ বুজিয়ে আছ কেন? ঘুম পাচ্ছে? (আপন মনে) বোধ হয় ঘুমিয়েছেন। আহা, কি রোগাই হয়ে গেছেন! মা দুর্গা, মা সতীরাণী, মুখ তুলে চাও মা। আমার পরমায়ু নিয়ে ওঁকে বাঁচিয়ে দাও মা।'

'শোভা?'

'বল।'

'তুমি কাঁদছ?'

'না।'

'এই যে তোমার চোখের জল এক ফোঁটা আমার বুকের এইখানটায় পড়েছে। কেঁদো না শোভা, লক্ষ্মী শোভা!'

'তুমি অমন করে আদর করে ডাকলে আমি যে আপনাকে সম্বরণ করতে পারিনে। চোখে জল যে আপনি ভরে আসে।'

'আচ্ছা শোভা, আমি চুপ করে থাক্‌ছি। তুমি যেন চলে যেও না। আর মাকে ডাক—মাও এসে আমার কাছে বসুন। মা!'

'এই যে যাই—কি বল্‌ছ বাবা, আমি এই পাশের ঘরে ছিলাম।'

'মা, তুমি এইখানটিতে আমার চোখের সামনে বস। শোভা, তুমি আমার পিঠের কাছে বসে বুকটায় হাত বুলিয়ে দাও ;—হ্যাঁ ঠিক হয়েছে।'

*   *   *

'মাঝে মাঝে এই রকম চোখ বুজছেন, একটু তন্দ্রা আস্‌ছে—আবার একটু পরে ভেঙ্গে যাচ্ছে। মা, সেরে যাবে?'

'ও কি মা! এখন ভেঙ্গে পোড়ো না। এখন যে বুকে দ্বিগুণ বল বাঁধতে হবে।'

(বহুক্ষণ দুইজনে নিদ্রিত ধীরেন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।)

'এবার বোধ হয় ঘুমটা গাঢ় হয়েছে, নয় মা?'

'হ্যাঁ!'

*　　　*　　　*

'গলায় একটা শব্দ হচ্ছে কিসের মা?'

'বোধ হয় নিঃশ্বাসের।'

'মা, ডাক্তার শেষে তোমাকে আলাদা করে ডেকে কি বললেন?'

(কানে কানে) 'বলেছেন, যদি আজকের রাতটা কেটে যায়, তাহলে ভয় নেই। আজ শেষ-রাত্রিটাতেই ভয়। সেই সময়ে তাঁকে ডাকতে হবে।'

'শেষ রাত্রি তো হয়েছে মা। চারটে বাজে।'

'হ্যাঁ, যাই মা। ডাক্তার তো আজ রাতে বাড়ী যান্‌নি, বাইরের ঘরেই শুয়ে আছেন। ডেকে আনি।'

৩

'কতক্ষণ থেকে এ ভাবটা হয়েছে?'

'আধঘণ্টার কিছু উপর।'

'ধীরেনবাবু! ধীরেনবাবু! শুন্‌ছেন্‌?'

'উত্তর দিচ্ছে না কেন বাবা?'

(নাড়ী দেখিয়া) 'এখন তো জ্ঞান নেই মা।'

'ও কি বাবা! থর্‌ থর্‌ করে সর্বশরীর কাঁপছে কেন? উঃ কি কাঁপুনি! কি হবে বাবা!'

'চুপ করুন মা! এখন আর মানুষের কোন হাত নেই। সম্পূর্ণ ভগবানের হাত!'

মা। (যুক্ত করে) মা—মা—দুর্গে বিপদবারিণি! রক্ষা কর মা, রক্ষা কর! বাছার প্রাণভিক্ষা দাও মা!

(মনে মনে জপ করিতে লাগিলেন।)

শোভা। (মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া) মা, মা, সতীরাণি, দয়া কর মা। আমার প্রাণ নিয়ে ওঁর প্রাণ দাও মা!

(মাটিতে মাথা রাখিয়া মনে মনে নাম জপ করিতে লাগিলেন।)

ডাক্তার। কেঁপে কেঁপে এতক্ষণ শরীর স্থির হয়েছে। এখন কি হবে কি জানি!

(ডাক্তার একদৃষ্টে রোগীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। গৃহের নিস্তব্ধতা কেবল ঘড়ির টিক্‌ টিক্‌ শব্দে ভঙ্গ হইতে লাগিল। ডাক্তার ঘন ঘন নাড়ী দেখিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। আকাশে কখন শুকতারা উঠিয়া ম্লান হইয়া গেল। পূর্বাকাশে ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিল। একটা শীতল বাতাসের ঢেউ জানালা দিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রদীপ নিভাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের আলোকে ঘর ভরিয়া গেল।)

ধীরেন্দ্র। (একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) মা—মা! সকাল হ'ল মা?

ডাক্তার। (নাড়ী দেখিয়া সহর্ষে) ভয় কি, আপনি সেরে গেছেন। মা উঠুন, বৌদিদি, উঠে আসুন—আপনাদের প্রার্থনা ভগবান্‌ শুনেছেন, আর ভয় নেই।

শোভা। (উদ্‌ভ্রান্তার মত আসিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে)—মা, মা, ওমা—মাগো!—

'আর তো ভয় নেই। মা আমার, লক্ষ্মী আমার, তোমার ভাগ্যেই তো ধীরুকে ফিরে পেলাম!'

ডাক্তার। (চক্ষু মুছিয়া) অনেক দুঃখ পেয়েছেন ধীরেনদা—এবার সুখী হোন্‌।

পৌষ ১৩৩৪

স্বামীর ভিটা

ফণীন্দ্রনাথ পাল

(১)

অমূল্যচরণ বসু মহাশয় ছাপরার একজন প্রবীণ উকিল। প্রসার ও প্রতিপত্তি তাঁহার বেশ ছিল। অশ্রুমতী তাঁহার একমাত্র কন্যা—বৃদ্ধবয়সের সন্তান, বড় আদরের মেয়ে। তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা এই লইয়া তাঁহাকে খুব ঠাট্টাতামাসা করিত। অমূল্যবাবু তাঁহাদের ঠাট্টাতামাসার উত্তরস্বরূপ শুধু একটু হাসিতেন!

সেদিন সকালবেলা অমূল্যবাবুর বৈঠকখানায় পাঁচ-সাতজন বন্ধুবান্ধব চা-তামাকের সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন, এমন সময় অশ্রুমতী ঘোড়-সোয়ারের পোযাকে সজ্জিত পর্যটকটুপি মাথায় দিয়া, হাতে একগাছি চাবুক লইয়া, তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বেণীটি তখন পৃষ্ঠের উপর দুলিতেছিল।

অষ্টমবৎসরের বালিকার এই অপরূপ সজ্জা দেখিয়া সকলে বিশেষ কৌতুক অনুভব করিলেন। পিতার মুখ হর্ষে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

একজন কহিলেন, "বাঃ, বেশ মানিয়েচে! কি গো মালক্ষ্মী, যুদ্ধ কর্‌তে চলেচ নাকি?"

অশ্রুমতী ঈষৎ হাসিয়া, মাথা হেঁট করিয়া, বেণী দুলাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। বাহিরে তাহার জন্য সহিস ঘোড়া লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

অমূল্যবাবুর একজন বৃদ্ধবন্ধু বলিলেন, "ওহে অমূল্য, মেয়েটার যে একেবারে মাথা খেয়ে দিচ্চ ; বিয়ে-থাওয়া ত দিতে হবে ; পরে ও কি আর শ্বশুর-ঘর কর্‌তে পার্‌বে?"

অমূল্যবাবু হাসিয়া বলিলেন, "না হে, আমার মা-লক্ষ্মী সে দিকে ঠিক আছে ;—ঘোড়ায় চড়ে বেড়াক, আর ছুটোছুটি করুক, কিন্তু আসল কাজে ঠিক। সে এর মধ্যে গেরস্থালীর কাজকর্ম্মও বেশ শিখেচে ; তরকারীকোটা, বিছানাকরা, ঘরঝাঁট দেওয়া, সব মা আমার বেশ গুছিয়ে কর্‌তে পারে।" এই কথা বলিতে বলিতে পিতার বুক গর্বে স্ফীত হইয়া উঠিল।

এমনই করিয়া অশ্রুমতী জনকজননীর অজস্র আদরের মধ্যে বর্ধিত হইতে লাগিল! তাহার হুকুম খাটিবার জন্য নিরন্তর দুইটি ঝি-চাকর তাহার সঙ্গেসঙ্গে থাকিত। সে সর্বদাই ঝি-চাকরের কোলেপিঠে চড়িয়া বেড়াইত। সাতবৎসর বয়স অবধি সে বোধ করি একবারও মাটিতে পা দেয় নাই। দিনের মধ্যে তাহার ফরমাইসেরও অন্ত ছিল না। তাহার জনকের আদেশে তাহার কোন দ্রব্য পাইতে মুহূর্ত বিলম্ব ঘটিত না।

অমূল্যবাবু 'দিলদরিয়া' লোক ছিলেন। তিনি বিস্তর উপার্জন করিতেন ; কিন্তু কিছুই সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। মাসের মধ্যে পঁচিশদিন তাঁহার বাড়ীতে 'যজ্ঞি' চলিত। তাঁহার দুই একজন বন্ধু তাঁহাকে একটু সতর্ক করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে মাঝে মাঝে বলিতেন, 'ওহে ভায়া, হাতটা একটু কম কর। আগে না হয় ছেলেপুলে ছিল না ; এখন ত একটা মেয়ে হয়েচে, শীগ্‌গির জামাইও হবে ; তাদের ত একটা ভালরকম সংস্থান ক'রে যেতে হবে।"

অমূল্যবাবু হাসিয়া বলিতেন, "ত্রিশবৎসরের অভ্যাস কি আর ছাড়া যায়! আচ্ছা তোমরা পাঁচজনে যখন বল্‌চ, তখন এবার থেকে একটু হিসেবী হ'তে হচ্চে।" তিনি মুখে এই বলিতেন সত্য, কিন্তু হয় ত সেই দিন সন্ধ্যার পরই তাঁহার বাটীতে দশবিশজন বন্ধুর প্রীতিভোজনের আয়োজন হইত।

দেখিতে দেখিতে অশ্রুমতী এগার বৎসরে পদার্পণ করিল। তখন হইতেই তাহার বিবাহের সম্বন্ধ চলিতে লাগিল। দুই একজন আসিয়া অশ্রুকে দেখিয়া গেলেন। কিন্তু রঙ্ কালো বলিয়া তাঁহারা পছন্দ করিলেন না। বলিয়া গেলেন "মুখশ্রী ভাল বটে, কিন্তু রঙ্ ময়লা। আচ্ছা, বাড়ীতে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া সংবাদ পাঠাইব।"

এই ঘটনার পর হইতে অমূল্যবাবু সকলকে বলিয়া দিলেন, এখন আর তিনি কন্যার বিবাহ দিবেন না।

আরও দুইমাস অতিবাহিত হইয়া গেল। অশ্রুর বিবাহের কথা একরকম চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু প্রজাপতি সকলের অলক্ষ্যে অশ্রুর বর নির্বাচিত করিতেছিলেন।

ক্ষেত্রনাথ মিত্র ছাপরার প্রথম সবজজ। কলিকাতার নিকটে তাঁহার বাসভবন। বাড়ীতে দোলদুর্গোৎসব হইত। তাঁহাদের বেশ নামডাকও ছিল। তাঁহারা সাত-আটটি ভাই। কেহ মুন্সেফ, কেহ বা ডাক্তার, কেহ বা উকিল। অমূল্যবাবুর এক বন্ধু-উকিল মধ্যস্থ হইয়া মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত অশ্রুর বিবাহ স্থির করিলেন। পাত্রটি তখন এন্ট্রান্স পাশ করিয়া এফ, এ পড়িতেছিল। দোহারা গঠন, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখশ্রীও মন্দ নয় ; মোটের উপর দেখিতে ভাল। অমূল্যবাবু পাত্রটিকে দেখিয়াই পছন্দ করিলেন। ক্ষেত্রবাবু কুল করিবেন, কুলের পাত্রী সুন্দরী পাওয়া কষ্টকর ; তাহা ছাড়া তিনি মেয়ে অত বাছিতেন না। অশ্রুর 'গড়ন' ও মুখশ্রী দুইই ভাল। তাহার উপর পিতার একমাত্র সন্তান! ক্ষেত্রবাবু অশ্রুকে দেখিয়া বলিয়া গেলেন "দিব্যি মেয়ে!"

তাহার পর এক শুভলগ্নে ক্ষেত্রনাথের পুত্র প্রভাতকুমারের সহিত অশ্রুর বিবাহ হইয়া গেল। অমূল্যবাবু মেয়েকে গা-ভরিয়া গহনা দিলেন। তাহা ছাড়া হাজার টাকা নগদ। বরের দামী ঘড়ি, চেন, আংটি, খাট, বিছানা, রূপার দানসামগ্রী ও বড়রকমের ফুলশয্যা। প্রায় এক সপ্তাহ ধরিয়া বিবাহের যজ্ঞ চলিয়াছিল। কেবল 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রবে সারাগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ফুলশয্যার তিনদিন পরে অশ্রু পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল এবং এক বৎসর পিতৃভবনেই রহিয়া গেল। জামাতা প্রভাতকুমার কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিল। অমূল্যবাবু প্রায় প্রতিমাসেই তাহাকে একবার করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। জামাই যখনই আসিত, এবং যে কয়েকদিন সেখানে থাকিত, সে কয়দিনই তাঁহার বাড়ীতে মহা ধুম পড়িয়া যাইত—সহরের প্রায় সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইতেন ; গরীব, দুঃখীও বাদ যাইত না।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। চাঁদের আলোয় সহরটি হাসিতেছিল! বাড়ীর সামনে খালিমাঠের উপর কয়খানি চেয়ার পাতা ছিল। অমূল্যবাবু ও তাঁহার কয়জন বন্ধু সেখানে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন।

সুধীরবাবু কহিলেন, "বেশ জামাই হয়েচে আপনার, দিব্যি ছেলেটি! ধীর, শান্ত, মুখে একটি কথা নেই।"

ব্রজেন্দ্রবাবু কহিলেন, "জামাইটি আপনার সত্যিই ভাল হয়েচে। আচ্ছা, কুটুম্ব কেমন হ'ল অমূল্যবাবু ; ওরা ত খুব নামকরা ঘর। আপনার জামাইটি বি, এল পাশ কর্‌লেই মুন্সেফ হ'য়ে যাবে।"

অমূল্যবাবু কহিলেন, "আমি থাক্‌তে থাক্‌তে বাবাজী যদি ল-টা কোনরকমে পাশ ক'রে ফেল্‌তে পারেন—তা হ'লে আমি এখানেই সুবিধা ক'রে দিতে পার্‌ব। মুন্সবি কর্‌বার হয় ত দরকারই হবে না।" তাহার পর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন, "নামকরা ঘর শুনেই ত এক-কথায় বিয়ে দিলাম, কিন্তু কুটুম তেমন সুবিধা হ'ল না। বেহাইয়ের আমার বড্ড হাতটান।"

কৃষ্ণবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া সকলের কথা শুনিতেছিলেন ; তিনি ক্ষেত্রনাথবাবুকে বিলক্ষণ চিনিতেন ; কহিলেন, "ক্ষেত্র মিত্তির ত, অমন কিরেট আর দুটি নেই ; বিয়ে ঠিক হবার আগে যদি আমি খবর পেতাম, তা হ'লে ও ঘরে কখনও বিয়ে দিতে দিতাম না। যাক্, জামাইটি ছেলে বড় ভাল। বাপের ধাঁজটি সে আদবেই পায়নি। প্রভাতের মা ছিল বড় ভাল। ক্ষেত্র মিত্তির কি কম পিশেচ, তাকে পয়সার কষ্ট দিয়ে একরকম মেরে ফেলেচে। যাক্, সে সব পুরান কথা। এবারকার গিন্নিটি শুনিচি ঠিক কর্তারই মত হয়েচে, বনেও ভাল।"

অমূল্যবাবু এতদিন সব কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন—কিন্তু কন্যা-সম্প্রদান করিবার পর হইতে বেশি একটু গম্ভীর হইয়াছিলেন। আজ গম্ভীরভাবে তিনি কহিলেন, 'আগে ত আমাকে ও কথা কেউ বলেনি। যদি ঘুণাক্ষরে জান্‌তে পার্‌তাম, তা' হ'লে কখনই ওখানে বিয়ে দিতাম না।"

এই ঘটনার মাসছয়েক পরে একদিন বৈকালে আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া অমূল্যবাবু বুকের মধ্যে কেমন বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো, একটু হাওয়া কর ত, বুকটা কেমন করচে।"

তাঁহার স্ত্রী তাড়াতাড়ি পাখা আনিয়া, হাওয়া করিতে গিয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ভীত হইয়া উঠিলেন। কি সর্বনাশ! মুখখানি একবারে শাদা হইয়া গিয়াছে! তিনি ভীতিকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "ওগো, তুমি অমন ক'রে চেয়ে আছ কেন—বড্ড অসুখ করেচে, ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠাব?"

অমূল্যবাবুর ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ কম্পিত হইল। তিনি কি যেন বলিতে চাহিতেছিলেন! কিন্তু কিছুই তাঁহার বলা হইল না। তিনি তেমনই নিষ্পলক-নেত্রে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; মস্তকটি তাঁহার বুকের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

তাঁহার পত্নী আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে, আমার কি সর্বনাশ হ'ল রে।"

তাঁহার চীৎকারে যে যেখানে ছিল, সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমূল্যবাবুকে ধরাধরি করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

ডাক্তার আসিয়া দেহপরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন, প্রায় অর্ধঘণ্টা পূর্বে হৃদ্‌রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

অশ্রু তখন শ্বশুরালয়ে। অভাগিনী একবার শেষ সময়ে পিতাকে দেখিতেও পাইল না! সে দারুণ সংবাদ যখন তাহার নিকট গিয়া পৌঁছিল, তখন জ্ঞানশূন্য হইয়া মেঝের উপর সে আছড়াইয়া পড়িল!

(২)

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না সত্য, কিন্তু সে মানুষের যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকে! অশ্রু পিতার শোক ক্রমে ক্রমে ভুলিতে লাগিল! নূতন সংসারে, অনেক বউঝিয়ের মধ্যে থাকিয়া, স্বামীর আদরে ডুবিয়া, অশ্রুর দিনগুলি বেশ কাটিতে লাগিল। তাহার জননীও ছাপরার বাসা তুলিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছেন! অমূল্যবাবু অশ্রুর বিবাহে যে সমস্ত ঋণ করিয়াছিলেন, সেই ঋণের পরিমাণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়া, তাঁহার ছাপরার বাড়ীখানি বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। হাজারদশেক টাকার জীবনবীমা ছাড়া নগদ এক কপর্দকও তিনি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই! ঐ টাকার কোম্পানীর কাগজের যাহা সুদ পাইতেন, তাহাতে অশ্রুর জননীর একরকম চলিয়া যাইত।

এমনই ভাবে আরও বৎসর তিন কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে মিত্রপরিবারের অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রবাবু এতদিন বিদেশে কাজ করিতেন, সম্প্রতি তিনি

কলিকাতায় বদলি হইয়া আসিয়াছেন। কলিকাতায় আসিবার মাস দুই পরেই তাঁহার অপর দুইভ্রাতা পথ দেখিলেন।

ক্ষেত্রবাবু একদিন প্রভাতকে ডাকিয়া বলিলেন, "অত নবাবী কর্‌লে ত আমি খরচ জুগিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ব না,—তোমার স্কুলের মাইনে, বইয়ের দাম, মোটাকাপড়, ভাত, এ অবশ্য আমি দেব ; কিন্তু তা ব'লে তোমার দু-দুটো ছেলেমেয়ের পাঁচদিন অন্তর হরলিক্স, এ ত আমি বাপু জুগিয়ে উঠ্‌তে পারব না। বউমাকে বল, তার মার কাছে থেকে যেন এ সব দাম চেয়ে নেয়। তোমার শ্বশুর ত ঢের টাকা রেখে গেছে।" প্রভাত নীরবে সমস্ত কথা শুনিল, এবং তেমনই নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। আজ প্রথম তাহার হৃদয়ের উপর চিন্তার রেখাপাত হইল।

এমনই দুঃখের মধ্যে প্রভাত মাত্র একটি নম্বরের জন্য দ্বিতীয়বার বি, এ, ফেল হইয়া, একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখনও বি, এ, পাশ এত সস্তা হয় নাই। হাড়ভাঙ্গা খাটিয়া, এমনই সামান্য একটি নম্বরের জন্য লোকে ফেল হইয়া যাইত। প্রভাত বড় আশা করিয়াছিল বি, এল, পাশ করিয়া মুন্সেফ হইবে ; কিন্তু এই বৎসর ফেল হইয়া তাহার মনে হইল, তাহার সমস্ত আশাভরসা বুঝি অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হইতে চলিল। পিতা হয় ত কলেজের মাহিনা দিবেন না।

তাহাকে বিমর্ষ দেখিয়া অশ্রুমতী কহিল, "কত লোকই ত ফেল হচ্চে ; তার জন্য তুমি অমন ক'রে ভাব্‌চ কেন? আবার পড়, ঠিক পাশ হ'য়ে যাবে।"

প্রভাত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আর পড়াশুনা কর্‌লে চল্‌বে না। তোমাদের ত খাওয়াপরার ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। বাবা আর কতদিন বসে-বসে খাওয়াবেন।"

অশ্রুমতী স্বামীর এ কথার অর্থ বুঝিল। সে জোর করিয়া কহিল, "যতদিন আমার একখানা গয়না থাক্‌বে, ততদিন তোমার পড়া ছাড়া হবে না।"

তাহার কথা শেষ হয় নাই, এমন সময় অশ্রুর ছোট দেবর, প্রভাতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, বাইরের-ঘর হইতে ডাকিয়া বলিল, "বউদিদি, এখনও ব'সে গল্প কর্‌চ। মা জিজ্ঞেস কর্‌চেন, তুমি আজ আর ঘর ঝাঁড়টাড় দেবে না, বিছানা করবে না।"

অশ্রু তাড়াতাড়ি স্বামীকে কহিল, "যাও, বাইরে পাঁচজনের সঙ্গে দুদণ্ড ব'সে গল্প করগে—অমন ক'রে ঘরে ব'সে থেক না, ওতে অসুখ কর্‌তে পারে।"

বাইরের-ঘর হইতে আবার তাহার দেবর চীৎকার করিয়া ডাকিল, "অ বৌদিদি, মা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কানের মাথা খেয়ে আছ। না পার, সোজা বল্‌লেই হয়, অত ভিট্‌কিলেমীতে কাজ কি।"

হায় অশ্রু! যাহার হুকুম-তামিল করিবার জন্য দুইটি ঝি-চাকর নিরন্তর হাজির থাকিত, আজ কাজে যাইতে একটু দেরী হইয়াছে বলিয়া তাহার এই লাঞ্ছনা! কোথায় আজ তোমার সেই স্নেহময় পিতা! বড় ঘর দেখিয়া যে তিনি তোমার এ ঘরের বধূ করিয়াছিলেন।

কিন্তু অশ্রু কাজ করিতে একদিনও এতটুকু মুখভার করিত না। পাঁচজন বন্ধুবান্ধবের সাম্‌নে একদিন অশ্রুর পিতা গর্ব করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, অশ্রু শ্বশুরবাড়ী আসিয়া পিতার সেই উক্তির সত্যতা সপ্রমাণ করিয়াছে। কাজকে সে ভয় করিত না ; সে শুধু সকলের একটু মুখের আদর চাহিত। শ্বশুরশাশুড়ীর মিষ্টকথার সে ভিখারী ছিল।

(৩)

প্রভাত সেবারে বি, এ পাশের খবর পিতাকে যখন জানাইতে গেল, পিতা গম্ভীর হইয়া উত্তর করিলেন, তা বেশ হয়েছে। এখন ল-ক্লাসে ভর্তি হওগে—আর যা'হক একটা চাক্‌রি-

বাক্‌রি জুটিয়ে নাও। তোমার ত এখন একটি রীতিমত সংসার হয়েচে, তিনটি ছেলে মেয়ে, বউমা,—এদের দুধ-জলখাবার, জামা-কাপড়, এর ব্যবস্থা তোমাকেই কর্‌তে হবে। আমি আর এখন পেরে উঠ্‌ছি না।"

প্রভাত মুখটি ভার করিয়া নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিতেই অশ্রু জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো, পাশ কর্‌লে, তবু মুখভার কেন? কেমন, আমি বলেছিলাম কি না, এবার তুমি ঠিক পাশ কর্‌বে। দেখ্‌লে আমার কথা সত্যি হ'ল কি না! এখন আমায় কি বক্‌সিস্ দেবে, বল? তবুও মুখভার ক'রে বক্‌সিস্ দেবার ভয়ে?"

প্রভাত এবার হাসিয়া ফেলিল। দুইবাহু প্রসারিত করিয়া, সে অশ্রুকে আপন বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইল। বক্ষের মধ্যে মুখ লুকাইয়া অশ্রু হাসিতে-হাসিতে কহিল, "এই বুঝি তোমার বক্‌সিস্!"

প্রভাত গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে কহিল, "আমার কি আছে অশ্রু, যা দিয়ে তোমার ঋণ শোধ কর্‌ব। আমি যে গরীব।"

অশ্রু কহিল, "যাও, আবার ঐ কথা। আমি কি তোমায় তাই বলছিলাম।" প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি বলছিলে অশ্রু।"

অশ্রু স্বামীর মুখপানে চাহিয়া কহিল, "কি আবার বল্‌ব!" প্রভাত দুইহাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া, বড় আদর করিয়া, চুম্বন করিলেন! অশ্রু স্বামীর দেহবেষ্টন করিয়া ধরিয়া কহিল, "যাও ;" মনে মনে কহিল, "আমি আর কিছু চাহি না, শুধু তোমার দুটি মিষ্টিকথা। আমার হাতের লোহা, আমার সিঁথীর সিন্দূরটা যেন থাকে ঠাকুর—আমি আর কিছু চাইনা।"

প্রভাতকুমার সকালবেলা ল-ক্লাসে পড়িত ও দশটা-পাঁচটায় আফিস করিত। চল্লিশ টাকায় তাহার বেশ চলিয়া যাইত। ক্ষেত্রনাথের পাঁচছয় ছেলে, দুই তিনটি মেয়ে, ছেলেদের বউ, ছেলে মেয়ে, একটি চাকর ও তাঁরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী। তিনি নিজে এমনই সূক্ষ্ম-হিসাব করিয়া মাছ তরকারীর পয়সা দিতেন, তাহাতে তাঁহার নিজের, দ্বিতীয়পক্ষের পুত্রকন্যার ও স্ত্রীর পর্যন্ত একটুকরা মাছ ভাতে পড়িত ; বড় দুই ছেলে, বউ, নাতি-নাত্‌নির ভাগে দুই একটা কুচো-চিংড়ি। তবে মেজছেলে নিজের মাছ তরকারী নিজে কিনিয়া আনিয়া, উপরে নিজের ঘরে ব্যবস্থা করিয়া লইতেন। ঠাকুর গিয়া শুধু চারটি ভাত ও ডাল দিয়া আসিত। প্রভাতকুমার যখন মাসে মাসে চল্লিশ টাকা করিয়া পাইতে লাগিল, তখন তাহার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কোন কষ্ট রহিল না। সেও পৃথক মাছ তরকারি কিনিবার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু অশ্রুর হাতে সে ভার থাকায়, তাহার একটু বেশী খরচ হইয়া যাইত।

একদিন খরচের হিসাব দিবার সময় অশ্রু আসিয়া বলিল, "আজও ক-পয়সার বেশী মাছ কিনে ফেলেচি। সত্যি, আমার ভারি লজ্জা করে ; ঠাকুরপোদের না দিয়ে কি কখনও নিজে খাওয়া যায়। ওর চেয়ে না খাওয়া ভাল। মেয়েমানুষ আমাদের যা-তা হ'লেই চ'লে যায়। রোজই ঠাকুরপোরা এসে জিজ্ঞেস করে, বউদি আজ কি রাঁধলে। কি করি, সেইজন্যে আগে থেকে তাদের মাছও কিনে আনাই। যদি দিতে না পার্‌তাম, তা হ'লে মনটা কেমন কর্‌ত বল ত?" প্রভাত হাসিয়া বলিল, "তা হবে না, তুমি কেমন লোকের মেয়ে! তোমার বাবা পাঁচজনকে খাইয়েই ফতুর হলেন!"

পিতার কথা উল্লেখ হইতেই অশ্রুর সেই সব পুরান কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার দুইচোখে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! আজিকার তাহার এই অবস্থার তুলনায় সে সব কথা তাহার নিকট যেন স্বপ্নের মত বোধ হইল! পাড়ার পাঁচটি ছেলেমেয়েকে ডাকিয়া, অশ্রু জোর করিয়া কত খাওয়াইয়াছে। তাহারা খাইতে চাহিত না—পারিত না ; তবুও অশ্রু জোর করিয়া তাহাদের পাতে হাতা-ভরিয়া মাছ ঢালিয়া দিয়াছে, আঁচল ভরিয়া তাহাদের কোঁচড় পূরিয়া সন্দেশ দিয়াছে! আর আজ!

তাহাকে হঠাৎ বিষণ্ণ দেখিয়া প্রভাত ভাবিল, বুঝি অশ্রু মনে করিয়াছে, সে বেশী খরচ করে বলিয়া সে তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছে। তাই সে প্রকাশ্যে কহিল, "মাসের মাইনে তোমার হাতে এনে ধ'রে দিই ; যা ইচ্ছে তাই তুমি খরচ কর ; আমাকে আবার হিসেব দেওয়া কেন? আমি কি তোমার কাছে হিসেব চেয়েচি?"

অশ্রুর কান্না আসিল। সে কান্না রোধ করিতে পারিল না। দুই চোখের কোণ বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অঞ্চল-প্রান্তে চোখ মুছিয়া সে কহিল, "আজ যদি বাবা থাক্‌তেন, তা হ'লে কি আর এত কষ্ট পেতে হ'ত!"

দুই বৎসর পরে প্রভাত বি-এল পাশ করিল। আজ সে সত্যিই ভারি আনন্দ পাইল। আর ভাবনা নাই। তিন বৎসর ওকালতি করিতে পারিলে, সে নিশ্চয়ই মুন্সেফ হইবে। মুন্সেফী নাই হইল, ওকালতি করিয়া সে কি উপার্জ্জন করিতে পারিবে না? কয়দিন সে মনে মনে কতই সুখের ছবি আঁকিল। অশ্রুমতীর সহিত কত পরামর্শ করিল ; কত তর্ক-বিতর্ক চলিল! অশ্রুমতী বলিল, "তোমার মুন্সেফ হ'য়ে কাজ নেই, তুমি ওকালতিই কর।" প্রভাত কহিল, "ওকালতিতে এখন পসার করা ভারি শক্ত। মুন্সেফ হ'তে পার্‌লে আর কোন ঝঞ্ঝাট থাকে না।"

অশ্রুমতী শেষে হাসিয়া বলিল, "তা, তুমি যা ভাল বোঝ কর। তবে ব'লে রাখ্‌চি, বিদেশে চাকরি কর্‌তে গেলে কিন্তু সেইদিনই আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, ফেলে যেতে পার্‌বে না। তোমার কাছ্‌-ছাড়া হ'য়ে আমি একদিনও থাক্‌তে পার্‌ব না!" প্রভাতকুমার হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি যদি দুদিন পরে ম'রে যাই, তা হ'লে তখন কি ক'রে থাক্‌বে।"

অশ্রুমতী দুই হাতে স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কাতরনয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ওগো, অমন কথা তুমি মুখে এন না, তোমার পায়ে পড়ি, বল আর অমন কথা তুমি আমায় বল্‌বে না?" প্রভাতকুমার অপ্রস্তুতের মত বলিল, "না, না, আর বল্‌ব না।"

অশ্রুমতী মনে মনে ঠাকুর-দেবতাকে ডাকিয়া বলিল, "দোহাই ঠাকুর, ওঁর যেন কিছু না হয়।" তাহার পর প্রকাশ্যে কহিল, "আচ্ছা, ঠাকুরঝিকে দেখ্‌লে বুক্‌টা ফেটে যায়। যেদিন সে হাত দুইখানি খালি ক'রে—থান প'রে গাড়ী থেকে নাম্‌ল,—আমি তাকে আন্‌তে গিয়ে, কেমন হ'য়ে গেলাম—চোখে কিছু আর দেখ্‌তে পেলাম না। উঃ, কি কষ্ট!—এমন সর্বনাশও মানুষের হয়। আচ্ছা, ঠাকুরঝি রোজই কাঁদে। শ্বশুরবাড়ী থেকে বিদেয় ক'রে দিয়েচে—হাতে একটি পয়সাও নেই, দুটি ছেলেমেয়ে। কি বল, তবু ত বাবা রয়েচে, ঠাকুরঝির ত দাঁড়াবার একটা জায়গা আছে।" বলিতে বলিতে অশ্রু কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর একটু থামিয়া কহিল, "আমি ঠাকুরঝিকে রোজই বলি, 'ঠাকুরঝি, তোমার বড়দাদা রয়েচেন, তোমার ছেলেমেয়েদের ভাবনা কি?' ঠাকুরঝি কেঁদে বল্লে, 'বউদিদি, স্বামী যার নেই, তার যে সংসারে আর কেউ থাকে না'।"

প্রভাত কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া বলিল, "ওর খাওয়াদাওয়ার তুমি সব জোগাড় ক'রে দিচ্চ ত। তার ছেলেমেয়েরা যেন একটুও কষ্ট না পায়। তুমি ছাড়া ওর আর দেখ্‌বার কেউ নেই।" অশ্রু কহিল, "খাবার ত আনি, কিন্তু খায় কে? খেতে কি মানুষ পারে—কত জোরজার ক'রে, কোনরকমে একটা মিষ্টি খাওয়াই।"

ছয় মাসের মধ্যে মিত্র-পরিবারে দুইটি দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে! প্রভাতকুমারের বিমাতা বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছে।

তাহার পর আজ দুইমাস হইল প্রভাতকুমারের ভগিনী কুড়িবৎসর বয়সে বিধবা হইয়া বাপেরবাড়ী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। কি করিয়া এই ঠাকুরঝির দুঃখের কিছু লাঘব হয়, তাহারই নূতন নূতন উপায় কল্পনা করিয়া কার্যে পরিণত করিতে অশ্রু প্রতিদিনই আপনাকে

ব্যস্ত রাখিত। ঠাকুরঝির ছেলেমেয়েদের সর্বদাই কাছে কাছে রাখিত ; তাহারা যাহা যখনই চাহিত, সে তখনই আনাইয়া দিত। এমন ভাবে আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল।

(৪)

রথযাত্রার একসপ্তাহ পূর্বে অশ্রু মাতার সহিত দেখা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, রাত্রে স্বামীকে কহিল, "মা বল্‌ছিলেন, তাঁর অনেকদিনকার ইচ্ছে, শ্রীক্ষেত্রের রথ দেখ্‌বেন। এতদিন তোমার পড়াশুনার ক্ষতি হবে, তাই বলেননি, এখন ত তোমার পড়া শেষ হয়েছে, আমাদের যদি একবার পুরী দেখিয়ে আন।" প্রভাত সাগ্রহে বলিল, "তা বেশ! কত খরচপত্র লাগ্‌বে, তার একটা যোগাড় ক'রে ফেলি।" অশ্রু বলিল, "টাকার জন্যে তোমার ভাব্‌তে হবে না, মা বলেছেনসে টাকা তিনিই দেবেন।" প্রভাত কহিল, "না না, সে ভাল হয় না—আমি ধার ক'রে চালিয়ে নেব।"

পুরী যাইবার সমস্ত স্থির হইয়া গেল। প্রভাত তাহার বিধবা ভগিনীকে সঙ্গে লইবার কথা বলিলে সে কহিল, "না, আমার পুরীটুরী গিয়ে কাজ নেই। শুনতে পাই, সেখানে নাকি বড় কলেরা হয়। আমি ম'রে গেলে ছেলেমেয়েদুটো কার কাছে থাক্‌বে?"

প্রভাত হাসিয়া বলিল, "তোর যেমন কথা, পুরী গেলেই বুঝি লোক কলেরা হ'য়ে ম'রে যায়।" কিন্তু সে কিছুতেই যাইতে রাজী হল না।

আষাঢ়ের শেষে রথ। রথের দুইদিন পূর্বে প্রভাতকুমার শাশুড়ী, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের লইয়া পুরীযাত্রা করিল। কি আনন্দে সেখানে দুইদিন কাটিল। সেই সমুদ্রের গর্জন শ্রবণ, সমুদ্রদর্শন, সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া সূর্য-ওঠা দেখা। রথের দিন—সে কি জনতা! অসীম সাগরবৎ জনসঙ্ঘ মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি করিতেছে। রথের মধ্যে মহাপ্রভু দর্শনমানসে ঐ বৃহৎ জনসঙ্ঘ যেন সত্যই উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। একজন আর একজনকে দলিয়া পিষিয়া চলিয়াছে, তাহাতে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। প্রহরীদের সপাসপ্ বেত্রাঘাতে কত লোকের পৃষ্ঠদেশ জর্জরিত হইয়া যাইতেছে ; রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে ; তবুও গ্রাহ্য নাই,—একবার মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে হইবে, রথের দড়ি স্পর্শ করিতে হইবে! এ অচলাভক্তি পুণ্যভূমি ভারতের হিন্দুনরনারীদের মধ্যে ছাড়া, বোধ করি, আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না!

কলিকাতায় ফিরিবার পূর্বদিন সন্ধ্যার পর প্রভাতকুমারের কোলের ছেলেটি বারদুই ভেদবমি করিয়া নেতিয়া পড়িল। তখন পুরীতে যাত্রীদের মধ্যে ওলাউঠার মহামারী সুরু হইয়া গিয়াছে। সকলে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। পুরীতে থাকা আর নিরাপদ নহে, বুঝিয়া সেই রাত্রে তাহারা পুরীর নিকটবর্তী একটি সহরে প্রভাতের এক আত্মীয়ের বাড়ী চলিয়া গেল। সেদিন রাত্রে খোকার আরও বারদুই ভেদবমি হইল। সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া কোন রকমে রাত কাটাইয়া দিল। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকাল হইতে সে অনেকটা সুস্থ হইল। ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গেলেন, আর কোন ভয় নাই, ও যাত্রা খুব সামলাইয়া গিয়াছে। সেদিন সারাদিন-সারারাত্রি খোকা বেশ ঘুমাইল। কিন্তু তখনও দুর্বল থাকায়, তাহারা সেখানে আরও দুই একদিন থাকিবার সঙ্কল্প করিল।

পরদিন দিনের বেলাটা সকলের বেশ আনন্দে কাটিল। সন্ধ্যার সময় প্রভাতকুমারের একবার ভেদবমি হইল। অশ্রুমতীর মুখখানি শুকাইয়া গেল। সে ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শরীর কি খুব খারাপ বোধ হচ্চে, ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়ে পাঠাই, অসুধ খাইয়ে দিয়ে যান। আমার বড্ড ভয় কর্‌চে।" প্রভাত হাসিমুখে কহিল, "ও কিছু নয়, অম্বলের জন্যে হয়েচে ; আর দুইএকবার বমি হ'লেই শরীরটা বেশ হাল্কা হ'য়ে যাবে। ভয় কিসের, অসুধ-টসুধ কিছু খাবার দরকার নাই।"

অশ্রুমতী সে কথায় নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না, তাহার মাথার মধ্যে কেমন আনচান্

করিতে লাগিল! তাহার বোধ হইতে লাগিল, সাম্‌নে রঙবেরঙের পোষাক পরিয়া কতকগুলা কি যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছে ; কানের মধ্যে কেবলই যেন কিসের শব্দ হইতেছে। সে মাঝেমাঝে একটু শব্দ শুনিয়াই চম্‌কিয়া উঠিতে লাগিল। কখনও বা সেই কল্পিত শব্দ লক্ষ্য করিয়া সে ছুটিয়া দেখিয়া আসিতেছিল, প্রভাত কি করিতেছে! প্রভাত তখন অদূরে বারান্দায় একখানি আরাম কেদারার উপরে চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল। এমনই করিয়া অশ্রু ঘরবাহির করিতে লাগিল ; থাকিয়া থাকিয়া তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

ঘণ্টাদুই পরে আরও বার দুই ভেদবমির পর প্রভাত শয্যা গ্রহণ করিল। তখন তাহার দুইটি চোখ একেবারে বসিয়া গিয়াছে, গলার স্বর অবধি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ওলাউঠা যে পূর্ণভাবে তাহার দেহ অধিকার করিয়াছে, তাহা আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। তখনই কলিকাতায় প্রভাতের মেজ-ভাইয়ের নিকট তার করা হইল, যেন তার-পাওয়ামাত্র সে রওনা হয়। বড় বিপদ! প্রভাতের কলেরা হইয়াছে। ডাক্তার ও ঔষধ লইয়া সে যেন তখনি চলিয়া আসে।

তার আসিয়া যখন প্রভাতের কলিকাতার বাড়িতে পৌঁছিল, তখন প্রভাতের মেজভাই প্রকাশ ও তাহার তিনচারিজন খুড়তুত জাটতুত ভাই বসিয়া খুব গল্প চালাইতেছিল। তার পড়িয়া তাহারা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর 'তাই ত' 'তাই ত' বলিতে বলিতে সকলে উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। প্রকাশ উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। তখনও রওনা হইলে অনায়াসে রাত্রের ট্রেনখানি ধরা যাইত, ঠিক ভোরে গিয়া সেখানে পৌছিতে পারিত! কিন্তু আপনি বাঁচিলে বাপের নাম, সে এই প্রবাদের শরণাপন্ন হইয়া না যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত মনে করিল। বাড়ীর ভিতর গিয়া পত্নীকে তারের কথা বলিয়া কহিল, "কি বল, দাদা ত বাঁচবেই না, আমি আর মিথ্যেমিথ্যে কি কর্‌তে সেখানে যাই!"

তাহার পত্নী তাড়াতাড়ি কহিল, "কি সর্বনাশ! সাধ ক'রে কে বিপদের মধ্যে যায়! কলেরা ভারি ছোঁয়াচে, খবরদার, ওখানে যাবার কথা মনেও এন না।"

প্রকাশ কহিল, "পাগল আর কি, আমি এমনই বোকা যে, সেখানে যাব! রাত্তিরে আর কোথায় কারে পাব, সকাল হ'ক ; হরিকে ডেকে আনিয়ে, কিছু ঔষধপত্র দিয়ে দশটার গাড়ীতে পাঠিয়ে দেব' খন।"

* * * *

অশ্রুর সিঁথীর সিঁদূর, হাতের লোহা চিরতরে ঘুচিয়া গিয়াছে। এক সন্ধ্যায় ওলাউঠা হয়, পরদিন ঠিক সন্ধ্যায় প্রভাত ইহধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তখনও তাহার বাড়ী হইতে কেহ আসিয়া পৌছে নাই। যখন সহরের চারিজন অপরিচিত ভদ্রলোক অশ্রুমতীর আড়ষ্ট, কঠিন বাহুবন্ধন হইতে প্রভাতের শবদেহ ছিনাইয়া লইয়া, খাটে শোয়াইল, তখন তাহার মেজভাইয়ের প্রেরিত হরিনাথ, একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে করিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল! ঐ ব্যাগের মধ্যে মায়ের পেটের বড় আদরের ছোটভাই দাদার জন্য ঔষধ পাঠাইয়াছিল! ছোটভাই নিজে আসিল না ; তাই বোধ করি বড় অভিমান করিয়া বড়দাদা চলিয়া গেল,—তাহার প্রেরিত ঔষধ খাইবার জন্য অপেক্ষা করিল না!

(৫)

প্রভাতের মৃত্যুর পর দুইমাস কাটিয়া গিয়াছে। অশ্রুমতীকে দেখিলে আর চেনা যায় না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে প্রায় অন্ধ হইয়া গিয়াছে। চোখে ভাল করিয়া দেখিতে পায় না। দিনরাত কেবলই চোখ দিয়া জল পড়ে। বুকের পাঁজরা কয়খানি শুধু যেন চামড়ায় ঢাকা— ভিতরে মাংসপেশী সব যেন শুকাইয়া গিয়াছিল। তবুও সে বাঁচিয়া আছে। একটু যত্ন করিলে হয় ত তাহার দেহে একটু মাংস লাগিত। কিন্তু কে যত্ন করিবে? অশ্রুমতী

শ্বশুরগৃহ ছাড়িয়া এক-পা কোথাও নড়িবে না। তাহার স্বামী যে শেষমুহূর্তে তাহাকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন,—"যত কষ্টই তোমার হ'ক না, তুমি আমার পৈতৃক ভিটে ছেড়ে কোথাও থেক না।" অথচ এখানে যত্ন করিবার কেহ নাই। এক বিধবা ননদ, সে বৌদিদির ধার দিয়াও ঘেঁসিত না। শ্বশুর মাসের প্রথমে বিধবা-কন্যার হাতে বধূকে দশটি করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিতেন ; এই ছিল অশ্রুর সারামাসের খরচ,—চারিটি ছেলের দুধ, জলখাবার, নিজের রাত্রির খাবার। অশ্রু তাহাতেই মহাসন্তুষ্ট! এই দশ টাকা সে সাতরাজার ধন মাণিক বলিয়া মনে করিত!

তৃতীয়মাসে অশ্রুর বিধবা ননদ তাহার পিতাকে কহিল, "হাঁ বাবা, বউদিদিকে তুমি দশটা টাকা কি কর্‌তে দাও? আমাদের মত একটা বিধবার দুটো-পয়সার কিছু খেলেই রাত কেটে যায়। চারটে ছেলেমেয়ে বই ত নয় ; গড়ে একটাকা ক'রে চারটাকা, আর না হয় তার উপর একটাকা বেশী দিলে রাজার-হালে চ'লে যাবে।"

ক্ষেত্রনাথ কন্যার সদ্‌যুক্তি গ্রহণ করিয়া সেই মাস হইতে ছয়টাকা করিয়া দিতে লাগিলেন। অশ্রুমতী তাহাতেও কোন কথা কহিল না।

সেদিন অশ্রু তাহার বড়ছেলেটিকে ডাকিয়া বলিল, "বাবা,—ঠাকুরদাদা আর ছোটকাকার কাছে গেছ্‌লে ত? সবসময় তাঁদের কাছেকাছে থেক, তাঁদের কথা শুনো। তোমার ভাই বোনদের সঙ্গে করে নিয়ে যেও। আজ নিয়ে গেছ্‌লে ত?"

বালকটি ধীরেধীরে কহিল, "হাঁ মা গেছ্‌লাম। আগে কাকাবাবুর কাছে গেলাম। কাকাবাবু তখন খাবার ঘরে বসেছিলেন—কাকীমা সবাইকে খাবার দিচ্ছিলেন। আমরা দাঁড়াতেই কাকাবাবু বল্লেন 'তোরা এখানে কি কর্‌তে এসেছিস্, নীচে যা নীচে যা'—আমি মা, তখনই ওদের নিয়ে চ'লে আস্‌ছিলাম। খোকাটা কিন্তু ভারি দুষ্ট, সে কিছুতেই আস্‌বে না। বুঝলে মা, সে ঐ দোরে প'ড়ে গড়াগড়ি কর্‌তে লাগ্‌ল—'আমি খাব, আমি খাব' ব'লে কাঁদ্‌তে লাগল। ওকে আমি আর কখ্‌খন নিয়ে যাব না। ওর জন্যে আমি শুধুশুধু কাকাবাবুর কাছে কানমলা খেলাম। কানটায় এমন জ্বালা কর্‌চে মা! সেদিন উঠনে প'ড়ে গিয়ে, কানটা ছ'ড়ে গেছ্‌ল ; কাল রাত্তির থেকে সেটা পেকে উঠেছে। কাকাবাবু ত জানেন ; তবু তিনি সেই কানটাই ম'লে দিলেন—সে জায়গাটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌ল! এখনও রক্ত থামেনি। মা, তুমি খোকাটাকে একটুখানি রাখ। আমি কলের নীচে কানটা পেতে দিইগে ; তা'হলেই রক্ত বন্ধ হ'য়ে যাবে'খন।" বলিয়া খোকাকে মায়ের কোলের উপর বসাইয়া দিয়া, নীচে চলিয়া গেল। অশ্রুমতী দুইহাতে খোকাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

ইহার পনরদিন পরে বিধবা ননদ আসিয়া অশ্রুকে কহিল, "বউদিদি, তোমার ছেলেদের দৌরাত্ম্যে মেজদাদা বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন। এমন ক'রে ছেলেপুলেদের লেলিয়ে দিলে, মানুষ কি ক'রে তেষ্ঠায় বলদিকি। কারু কিছু খাওয়ার যো নেই ; যখনই কেউ কিছু খাবে, তখনই তোমার ছেলেরা গিয়ে সেখানে তাদের মুখের দিকে চেয়ে হাঁ-ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। তাতে মানুষ খেতে পারে, না হজম হয়। আর, ছেলেমেয়েদের বা দোষ কি? তোমার দেখেই ত তারা শিখ্‌বে।"

অশ্রুমতী স্তম্ভিত হইয়া গেল! তাহার ছেলেপুলেরা পরকে খাইতে দেখিয়া হাঁ-করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে! সেই ত একদিনমাত্র তাহার অবুঝ খোকামণি একটু খাবারের জন্য তাহার কাকাবাবুর ঘরের দরজায় পড়িয়া আছড়া-আছড়ি করিয়া কাঁদিয়াছিল। তাহার পর হইতে সে ত তাহাকে খাবারের সময় ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিত। তবে কেন একথা উঠিল। পিতৃহীন, অনাথ-বালক এরা! এ কথা শুনিলে লোকে কি বলিবে! তাহারা নিশ্চয়ই মনে করিবে, অনাথ, অপগণ্ডগুলো নিজেরা খাইতে পায় না বলিয়া বাড়ীর পাঁচজনকেও খাইতে দেয় না।

তাহার শ্বশুর শুনিলেই বা কি মনে করিবেন। হা বিধাতাঃ!

সে প্রকাশ্যে কহিল, "ঠাকুরঝি, মেজঠাকুরপো এখনও বোধ হয় যায়নি। কদিনের জ্বরে আমায় এমনই কাহিল ক'রে ফেলেছে যে, আমার উঠে কোথাও যাবার শক্তি নেই। তুমি আমার চারটে ছেলেমেয়েকে নিয়ে যাও—মেজঠাকুরপোকে গিয়ে বল, ওদের যা ইচ্ছে হয় শাস্তি করুক, যেন বাড়ী ছেড়ে চ'লে যায় না।"

তাহার ননদ কহিল, "সে আর মিছে বলা, মেজদা ওসব কোন কথা শুন্‌বে না। সে বাড়ীটাড়ী ভাড়া ক'রে এসেচে, আজই তারা চ'লে যাবে।"

অশ্রুমতী কাঁদিয়া কহিল, "আমার বাছাদের তবে কে দেখ্‌বে ঠাকুরঝি—"

তাহার ননদ নাক সিঁট্‌কাইয়া কহিল, "সে খবর আমি কি করে জান্‌ব বউদিদি। কে আবার কাকে দেখে থাকে। এই আমার ছেলেমেয়ে দুটোকেই বা কে দেখচে? তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি বউদিদি।" বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

প্রকাশ সন্ধ্যার সময় নূতন-বাড়ী পৌঁছিয়া স্ত্রীকে কহিল, "আঃ, বাঁচা গেল। কি মুস্কিলেই পড়া গেছ্‌ল। ভাব দেখি, ওখানে থাক্‌লে কি আর রক্ষে ছিল—ও চারটে ছেলেমেয়ে ঠিক আমার ঘাড়ে পড়্‌ত। খুব বেরিয়ে পড়া গেছে। কি বল?"

তাহার স্ত্রী হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "তা আর বল্‌তে! বড়-বউঠাকুরুণ সোজা লোক নন ; ছেলেমেয়েগুলোকে কেমন গড়ে-পিটে তৈরী করেছিল, দেখেছ। গা'ল দাও, মার, সেই তোমার কাছে কাছে ঘুর্‌ত। হাঘরে দশা হ'লে ঐ রকমই হ'য়ে থাকে।"

প্রকাশ কহিল, "সে যা হবার, তা হ'য়ে গেছে।"

তাহার স্ত্রী কহিল, "হ'য়ে গেছে কি বল্‌চ ; আমি ব'লে রাখ্‌চি, ওরা ঠিক এখানে এসে জুটে যাবে।"

প্রকাশ অবজ্ঞাভরে কহিল, "তা আর হ'তে দিচ্চিনে। এ বাড়ীতে ঢুক্‌লেই মেরে বিদেয় করব ; অত মায়া কর্‌তে গেলে পরের জঞ্জাল বয়ে বয়েই সারাজীবনটা যাবে।"

(৬)

প্রকাশ বাড়ী ছাড়িয়া আসিবার দিনদুই পরে সন্ধ্যার সময় অশ্রুর শ্বশুর তাহার এ-পক্ষের ছোট দুইটি ছেলেকে মিট্‌মিটে প্রদীপের আলোর সম্মুখে বসিয়া পড়া বলিয়া দিতেছিলেন, অশ্রুর জ্যেষ্ঠপুত্র গিয়া সেখানে দাঁড়াইতেই ক্ষেত্রনাথ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া বিরক্তিভরে কহিলেন, "তুই আবার এখানে কি কর্‌তে এসেচিস্—তোকে না সেদিন বারণ ক'রে দিয়েচি, আমার এ ঘরমুখো হবিনি। ফের এয়েচিস্ যে! আচ্ছা হতভাগা ছোঁড়া ত। কথা বল্‌লে যেন গ্রাহ্যই নেই। দাঁড়িয়ে রইলি যে, চাস্ কি?"

ঠাকুরদাদার এই রূঢ় সম্ভাষণেও বিমল হতবুদ্ধির মত হইয়া গিয়াছিল। সে যে কথা বলিতে আসিয়াছিল, ভয়ে তাহা খানিকক্ষণ বলিতে পারিল না। কিন্তু না বলিলেও যে নয়। তাহার জননীর পীড়া যে বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে! সে অতি ভয়েভয়ে কহিল, "দিদিমা ব'লে পাঠালেন, মার বড্ড অসুখ, মাথার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট কর্‌চে, একবার ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠাতে।"

ক্ষেত্রনাথ বইখানি মুড়িয়া রাখিয়া, ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "তোর দিদিমাকে বল্‌গে যা, তোদের খেতে দিচ্চি এই ঢের, ডাক্তার, ওষুধ, ওসব খরচ আমি জোগাতে পার্‌ব না।"

বিমল মুখখানি কালি করিয়া চলিয়া গেল। তাহার দিদিমাকে গিয়া বলিল, "দাদাবাবু বল্‌লেন, ডাক্তার ডাক্‌তে তিনি পার্‌বেন না।"

অশ্রুর জননী বিমলের কথার অর্থগ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, হয় ত তিনি এখন কাজে ব্যস্ত আছেন ; তাই ও কথা বলিয়াছেন। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে, তিনি

ডাক্তার ডাকাইয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এই ভাবিয়া অশ্রুর ননদকে একবার ডাকিয়া পাঠাইলেন।

অশ্রু মাথার বিষম-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে-করিতে জননীর হাত চাপিয়া ধরিয়া, কাতরকণ্ঠে কহিল, "কেন তুমি মা, অমন ব্যস্ত হচ্চ—এরকম মাথার যন্ত্রণা আমার রোজই হয় ; আজ একটু বেশী হয়েচে। ও সেরে যাবেখন—আমার শ্বশুরকে মিছিমিছি কষ্ট দিও না। ডাক্তার ডেকে কি হবে মা?"

জননী কন্যার কথায় কান দিলেন না! অশ্রুর ননদ তখন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে কহিলেন, "মা, তুমি একবার বেয়াইকে গিয়া বল, অশ্রুর আমার বড় অসুখ ; ডাক্তারকে একবার যেন ডাকিয়ে পাঠান।"

অশ্রুর ননদ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "বাবাকে আমি ওসব কিছু বল্‌তে টল্‌তে পার্‌ব না।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

অশ্রুর জননী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তিনি যেন তাঁহার নিজের চোখকানকে বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। অশ্রু আবার তাহার জননীকে কহিল, "কেন মা, তুমি অমন করচ। আমার শ্বশুর শোকাতপা মানুষ, তাতে বয়েস হয়েচে ; তিনি একটুতেই রেগে যান। তাঁকে আর এরাত্তিরে বিরক্ত ক'র না—" এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়া, অশ্রু যেন হাঁপাইতে লাগিল। মাথার যন্ত্রণায় সে আরও বেশী ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। অশ্রুর জননী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বিমলকে সঙ্গে লইয়া তিনি নিজেই বেয়াইয়ের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। এই প্রথম তাঁহার বেয়াইয়ের সহিত পরিচয়। তিনি বাহিরে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিমল ভিতরে গিয়া ডাকিল, "দাদাবাবু!" ক্ষেত্রনাথ ধমক দিয়া উঠিয়া কহিলেন, "এ লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াটা ভারি জ্বালিয়ে তুল্‌লে দেখ্‌চি। কেবল দাদাবাবু, দাদাবাবু!—কি হয়েচে? ওর মার জন্যে এই রাত্তিরে সাহেব ডাক্তার আন্‌তে হবে না কি?" বিমল কম্পিতকণ্ঠে শুধু বলিল, "দিদিমা আপনাকে কি বল্‌তে এসেছেন।" ক্ষেত্রনাথ মহাবিরক্তির সহিত দরজার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দরজার পাশে কে একজন দাঁড়াইয়া আছে। অনুমানে বুঝিলেন, তাঁহার বেয়ান। তিনি একটু জোর গলায় কহিলেন, "কেন আমাকে বারবার বিরক্ত কর্‌চেন। আমি ত একবার বলে দিয়েছি, ডাক্তার অষুধের খরচ আমি জোগাতে পার্‌ব না। এই ত আমার মেয়েটা বিধবা হয়েই তার শ্বশুর তাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। বিধবা বউকে কজনে ভাত দিয়ে থাকে? আমি যে দিচ্চি, এইটাই আপনার যথেষ্ট মনে করা উচিত ; তার ওপরে আবার ডাক্তার, অষুধের কথা কি ব'লে বল্‌তে এসেচেন?"

অশ্রুর জননী আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াইলেন না। কন্যার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, দুইহাতে বুক চাপিয়া উপুড় হইয়া পড়িলেন।

এযাত্রা অশ্রুমতী বাঁচিয়া গেল। অমন বিধবার প্রাণ কি শীঘ্র বাহির হইতে চায়! এরা যদি মরিবে, পৃথিবীতে কষ্টভোগ করিতে কে রহিবে?

অশ্রুমতী এখন একটু উঠিয়া-হাঁটিয়া বেড়াইতে পারে। সেদিন বেলা প্রায় বারটা। বাড়ীর সকলেরই খাওয়া হইয়া গিয়াছে। অশ্রুর তখনও আলোচালের ভাত কয়টি নামে নাই। উনানের উপর ভাতের হাঁড়িটি চাপাইয়া, উনানের ধারে গালে-হাত দিয়া সে বসিয়া ছিল। এমন সময় তাহার সেজ-দেবরটি আসিয়া মহা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "বউদিদি, শীগ্‌গির এই পানকটা সেজে দাও ত," বলিয়া গোটাকয়েক পান তাহার হাতে ফেলিয়া দিল।

অশ্রু কহিল, "একটু পরে দিলে হবে না, ভাত কটা নামিয়েই যাচ্ছি।" তাহার সেজ-দেবর রুক্ষস্বরে কহিল, "অত দেরী সইবে না, তুমি দেবে কি না, বল?"

অশ্রু দ্বিরুক্তি না করিয়া পান কয়টি লইয়া উঠিয়া গেল। তখন ভাতের জল প্রায় মরিয়া

আসিয়াছিল। অশ্রু পান-সাজিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ভাত কয়টি একেবারে পুড়িয়া গিয়াছে। সেই পোড়া-ভাতের গন্ধ পাইয়া তাহার ননদ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভয়ে অশ্রুর মুখ শুকাইয়া গেল,—বুঝি কি অনর্থ ঘটিয়া বসে! কিন্তু সেদিন বোধ হয় ভাগ্যদেবতা অশ্রুর উপর কি হেতু প্রসন্ন ছিলেন ; তাই তাহার ননদ কহিল, "আহা ভাত-কটা তোমার পুড়ে গেল বউদিদি! যাই, দু'মুটো চাল, আর একটা আলু এনে দিই। কাল একাদশী, আজ দুটো না খেলে বাঁচ্‌বে কি ক'রে।"

অশ্রুর ননদের এ পরিবর্তনের একটু বিশেষ কারণ ঘটিয়াছিল। বিবাহের পর তাহার কন্যা প্রথম শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে। ছয়মাসের উপর হইয়া গেল, তাহাকে আর আনা হয় নাই। কন্যা মাতার নিকট আসিবার জন্য বার-বার চিঠি লিখিতেছে। ক্ষেত্রনাথকে এ কথা দুইতিনদিন সে জানাইয়াছে—দুইতিনদিনই তিনি বলিয়াছেন, "এত তাড়াতাড়ি কেন, বিয়ের পর মেয়েদের শ্বশুরবাড়ী থাকাই দরকার।" আজ সকালে সে আবার তাহার কন্যার নিকট হইতে পত্র পাইয়াছে। তাহার কন্যা আসিবার জন্য অনেক কাঁদাকাটি করিয়াছে। এই কথা পিতাকে জানাইতে গেলে, তাহার পিতা বিধবা কন্যার মুখের উপর বলিয়াছিলেন, "দেখ্‌, এই এখন এক বচ্ছরও হয় নি, প্রায় একহাজার টাকা খরচ ক'রে তোর মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে তাকে আন্‌বার জন্যে এত তাড়া-হুড়ো কেন? এখানে এলে খেতে তার খরচ লাগবে না?"

পিতার কথায় অশ্রুর ননদ যে আঘাত খাইয়া ফিরিয়া আসিল, আজ সেই আঘাত তাহাকে অশ্রুর দিকে ঠেলিয়া লইয়া গেল।

ক্ষেত্রনাথের শয়নকক্ষের ঠিক পাশেই ভাঁড়ার। অশ্রুর ননদের কাছে সেই ঘরের চাবি থাকিত। সে চাবি খুলিয়া, ঘরে ঢুকিয়া, চাউল বাহির করিতেছিল, এমন সময় ওঘর হইতে ক্ষেত্রনাথ চীৎকার করিয়া কহিল, "ভাঁড়ারঘরে কে?" ননদ উত্তর করিল, "আমি।"

ক্ষেত্রনাথ কহিলেন, "এমন সময় ভাঁড়ারঘরে কি দরকার?" সে কহিল, "বউদিদির ভাতগুলো পুড়ে গেছে, তাই তার জন্যে দুমুঠো চাল নিতে এসেছি।"

তিনি কহিলেন, "একটু সাবধান হ'লে অতগুলো চাল ত নষ্ট হ'ত না! শ্বশুরের চালের কি দাম নেই। আচ্ছা, এবারকার মত নিয়ে যা। তবে একটা কাজ কর্‌বি, ভাঁড়ারের চাবিটা আজ থেকে আমার কাছে রেখে যাবি।"

অশ্রুর ননদ দরজা বন্ধ করিয়া, চাবিটি পিতার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া কহিল, "বাবা, একটা আলু নিয়ে যাই।"

তাহার পিতা রুক্ষস্বরে কহিলেন, "ওবেলার আলু হিসেব করা আছে ; ওর থেকে নিলে চল্‌বে না। বিধবা মানুষের অত তরকারি খাবারই বা রোজ দরকার কি? একদিন নুন দিয়ে ভাত খেতে পারে না।" অশ্রুর ননদ আর কিছু না বলিয়া ম্লানমুখে নীচে চলিয়া গেল।

(৭)

ক্ষেত্রনাথ এতদিন ভাড়াটে-বাড়ীতে বাস করিতেন। সম্প্রতি তিনি নূতন দ্বিতলগৃহ নির্মাণ করিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন। অশ্রুমতী গৃহের নীচের একটি ঘর বাসের জন্য প্রাপ্ত হইল। তাহার শ্বশুরের ভিটার এই ঘরখানিতে সে আশ্রয় পাইল। যেদিন সে পিতৃহীন সন্তান-কয়টিকে সঙ্গে করিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, সেদিন বহুচেষ্টাতেও সে আপনাকে সামলাইতে পারিল না। স্বামী হারাইবার পর এই প্রথম সে চীৎকার করিয়া কাঁদিল! মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সে আর্তস্বরে কাঁদিতে লাগিল! এতদিন যাহা তুষের আগুনের মত তাহার বুকের মধ্যে অহরহ জ্বলিতেছিল, আজ তাহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মায়ের দেখাদেখি ছেলেমেয়ে কয়টিও তাহার আশেপাশে পড়িয়া, গড়াগড়ি করিয়া কাঁদিতে

লাগিল। তাহার দ্বাদশবর্ষের জ্যেষ্ঠপুত্রটি একবার চোখের জল মুছিতেছিল, মায়ের মাথায় তাহার কম্পিত হাতখানি বুলাইতেছিল "মা, ও মা, মাগো।"

ক্ষেত্রনাথ বাবু তখন তাঁহার দুইতিনটি বন্ধুকে বাড়ীটি দেখাইতেছিলেন। বধূর চীৎকারে তখন তিনি বিষম বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠপুত্রটিকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আজ শুভদিনে সে অমন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া যেন বাড়ীতে অমঙ্গলের সৃষ্টি না করে।" দেবর আসিয়া একথা বলিবামাত্র অশ্রু কান্না রোধ করিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার সত্যই মনে হইল, সে কাজটা ভাল করে নাই। দুঃখকষ্ট যাঁহার কাছে সে নিবেদন করিবে, তিনি ত চলিয়া গিয়াছেন। তিনি যে এখন বহুদূরে—যুগান্ত ব্যাপিয়া অহরহ চীৎকার করিলেও যে সে আর্তনাদ তাঁহার কানে পৌঁছিবে না। বাড়ীর আর পাঁচজনের কেন সে অমঙ্গলের কারণ হয়। সারা বুকটা তাহার ত খালি পড়িয়া আছে। এতদিন যেমন করিয়া সেখানে কাঁদিয়াছে, তেমনই করিয়া কাঁদিবে—সেখানে কাহারও অমঙ্গল সৃষ্টি করিবার ভয় নাই, বাধা দিবার কেহ নাই, নিষেধ করিবারও কেহ নাই।

অশ্রুর বিধবা-ননদটি আসিয়া তাহার নিকট বসিল। তাহার দুইচক্ষু বাষ্পাকুল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "বউদিদি তোমার ত তবু থাক্‌বার একটু স্থান হ'ল,—আমার—" তাহার চোখ বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

অশ্রু খানিকক্ষণ নিরুত্তর হইয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল, এ যে আমার চেয়েও অভাগিনী! শ্বশুরের ভিটায় পড়িয়া থাকিবার অধিকার হইতেও এ যে বঞ্চিতা! তাহার পর সে ধীরে ধীরে কহিল, "ঠাকুরঝি, আমরা দুটি বোনে এই ঘরটিতেই থাক্‌ব!" এই বলিয়া অশ্রু তাহার ননদকে নিজের ক্রোড়ের মধ্যে টানিয়া লইল। তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া তাহার ননদ ফুঁপাইতে লাগিল। এই স্নেহময়ী বউদিদিকেই সে আঘাত করিয়াছিল! সেই ত পিতাকে বলিয়া বউদিদির রাত্রের খাবারের পয়সা—অনাথা ভাইপো-ভাইঝিদের জলখাবারের পয়সা কমাইয়া দিয়াছিল। হায়! কেন তাহার তখন অমন মতি হইয়াছিল।

তখন বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। অশ্রুর বড়মাসি ঐপাড়ায় তাঁহার ছোটমেয়েটিকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। বাড়ী ফিরিবার পথে অশ্রুর শ্বশুরবাড়ী নামিয়া, অশ্রুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "কেমন আছিস্ অশ্রু!" অশ্রু তখন তাহার কোলের ছেলেটি ও তাহার উপরের মেয়েটিকে ধরিয়া বসিয়া ছিল। মাসিমা ঘরে প্রবেশ করিতেই, সে তাহাদের ছাড়িয়া দিয়া, উঠিয়া গিয়া মাথা নোয়াইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। ছেলেমেয়ে দুইটি ছাড়া পাইয়া ঘরের বাহির হইয়া যাইতেছিল, অশ্রু তাহাদের আবার ধরিয়া ফেলিল। তাহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "মা, ভাত খাব, ক্ষিদে।"

মাসিমা বলিলেন, "এত বেলা হ'ল এখনও ওদের খেতে দিস্‌নি! আহা, দুধের-বাছাদের এমনই ক'রে কষ্ট দিতে আছে মা! আমি না হয় ব'সে থাক্‌ব, তুই বাছা, আগে ওদের খাইয়ে নিয়ে আয়। আহা দেখ্ দেখি ওদের মুখ একবারে শুকিয়ে গেছে!"

অশ্রু কহিল, "খাবে'খন মাসিমা, তুমি একটু বস, ওদের রোজই এমনই বেলা হয়। দেরীতে খাওয়া ওদের অভ্যাস হ'য়ে গেছে ; এখন আর তেমন কষ্ট হয় না, শুধু কাঁদে। ও কিছু না।"

মাসিমা অবাক্ হইয়া বলিলেন, "তুই হয়েচিস্ কি, ওদের কান্না দেখেও তোর কষ্ট হয় না?"

অশ্রু শান্তভাবে কহিল, "কষ্ট হ'লে চল্‌বে কেন মাসিমা।"

মাসিমা কহিল, "ত, ওদের শুধু শুধু এ কষ্ট দেওয়া কেন? ভাত কি সকাল-সকাল হয় না?"

অশ্রু কহিল, "হাঁ মাসিমা, ভাত কোন্ সকালে হ'য়ে গেছে।"

মাসিমা আশ্চর্য হইয়া গেলেন। এ বলে কি? প্রকাশ্যে কহিলেন, "তোদের বাপু ঐ একটা মস্ত দোষ। এখনকার মেয়েদের যেন সবই কেমন উল্টো। আমার খুকিটাও ঠিক তোরই মত,—ছেলেমেয়ে দুটোকে কিছুতেই সময়ে খাওয়াবে না। তার শাশুড়ী সেইজন্যে কত বকাবকি করেন। তোকে ত আর তাড়া করবার কেউ নেই। যা, ব'সে রইলি যে, খাইয়ে নিয়ে আয়, আমি ব'সে আছি।"

অশ্রু তবুও ধীরেধীরে কহিল, "ওদের যে এখনও খাবার সময় হয়নি, মাসিমা।'

মাসিমা দুই গালে হাত দিয়া বলিলেন, "তুই তো অবাক্ কর্‌লি। দুপুর বাজে, এখনও ওদের সময় হয়নি। পিত্তি-পড়িয়ে একটা অসুখ না বাধিয়ে তুই দেখ্‌ছি ছাড়্‌বিনি।"

অশ্রুর ননদ তখন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে গড় হইয়া মাসিমাকে প্রণাম করিল। মাসিমা তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "ভাল আছ ত মা?"

ননদ ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "হ্যাঁ মাসিমা! আপনাদের বাড়ীর সবাই ভাল ত?"

মাসিমা উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ মা।" অশ্রুর ছেলেমেয়ে দুটি ক্ষুধায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, জননীর হাত ছাড়াইয়া রান্নাঘরের দিকে ছুটিয়া যাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছিল। অশ্রুর মাসিমা এবার সত্যই বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা অশ্রু তোর কি রকম আক্কেল বল্ ত। এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্, একটু নড়্‌বার নাম নেই—ছেলেমেয়ে দুটো যে গেল।" অশ্রু তবুও নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ননদ কহিল, "মাসিমা, এখনও যে বাবার ও ছোটভাইদের খাওয়া হয়নি। তাদের খাওয়া না হ'লে ওদের খাওয়াবার হুকুম নেই ; বউদিদি কি ক'রে খাওয়াতে নিয়ে যাবে।"

মাসিমা এ কথার কোন অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি অবাক্ হইয়া উভয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

অশ্রু কি বলিতে যাইতেছিল ; কিন্তু তাহার ননদ বাধা দিয়া কহিল, "দেখ মাসিমা, বউদিদি রোজই ঐ এক কথা বলে,—"উনি শোকাতাপা মানুষ—ওঁর যা হয়েচে, তা আর কেউ বড় বুঝতে পারবে না,—তা ত সব বুঝলাম। আচ্ছা, তুমিই বল ত মাসিমা, যত শোক এই কচি-কটার বেলা! নিজের ছেলেতিনটিকে রোজ কাছে নিয়ে বসিয়ে, ভাল ভাল মাছ রাঁধিয়ে খাওয়ান ত। বউদিদির বড় দুই ছেলে-মেয়ে, আর আমার ছেলেটা—তারা যা পায় তাই দিয়ে মুখ-বুজে খেয়ে উঠে আসে ; ছোট-দুটোর বোঝবার বয়েস ত হয়নি, মাসিমা, তারা 'মাছ্ খাব, মাছ্ খাব' ব'লে চেঁচায়!"

মাসিমা স্তব্ধ হইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। এ সব কথার আর কোন উত্তর ছিল না! অশ্রুর মেয়েটি এতক্ষণ চুপ করিয়া দূরে বসিয়া ছিল! এখন দিদিমার কাছে আসিয়া বসিয়া কহিল, "হ্যাঁ দিদিমা, সত্যি, খোকাটা ভারি দুষ্টু। জান দিদিমা,—সেদিন আমি ওকে কোলে ক'রে রান্নাঘরের দোরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সে কিছুতেই কোলে থাক্‌বে না। এমনই ছট্‌ফট্ করতে লাগ্‌ল—আমি তাকে নাবিয়ে দিলাম। সে এমন দুষ্টু ছুটে রান্নাঘরে ঢুকেই থালার ওপর থেকে একখানা ভাজামাছ তুলে নিলে। ভাগ্যিস্, ঠাকুর দেখতে পেয়ে হাত-চেপে ধর্‌লে ; না হ'লে দিদিমা; ও ঠিক মুখে-পুরে দিত। ছোটকাকা কি তাহ'লে তাকে আর আস্ত রাখ্‌ত! ওর জন্যে দিদিমা, আমি শুধু শুধু ধমক্ খেলাম। দাদাবাবু তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ; বল্লেন, 'দূর করে দে ওই মুখপুড়ীটাকে ; ওই ত পাঠিয়ে দিয়েছিল মাছ-ভাজা আন্‌তে!' সত্যি বল্‌চি দিদিমা, আমি ওকে পাঠাইনি!" এই বলিতে-বলিতে তাহার ভাসাভাসা চোখ দুইটি হইতে ঝরঝর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মাসিমা এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার কাছে অপর কেহ এ কথা বলিলে, তিনি তাহা গল্প বলিয়াই উড়াইয়া দিতেন। এ যে কত বড় সত্য, তাহা অশ্রু,

তাহার ননদ ও আট বৎসরের মেয়ে তাঁহাকে যেন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল! তিনি দুইহাত বাড়াইয়া অশ্রুর কন্যাটিকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া, সজলনয়নে, হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিলেন।

(৮)

আজ উপর্যুপরি তিনরাত্রি অশ্রুর খাওয়া হয় নাই। দেহটা অত্যন্ত দুর্বল বোধ হইতেছিল। সন্ধ্যার পর তাহার মাথার মধ্যে প্রত্যহই জ্বালা করিত ; তাহার মনে হইত প্রতিরাত্রেই যেন তাহার জ্বর হয়। তাহার জননী প্রত্যহ তাহার সংবাদ লইতে পাঠাইতেন ; প্রত্যহই সে বলিয়া পাঠাইত, 'ভাল আছি।' একটু অসুখের সংবাদ পাইলেই তাহার জননী যে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন। দুইএক দিনের জন্য যাইতে তাহার কোন আপত্তি ছিল না, এবং যতদিন ভাল ছিল, ততদিন মাঝে মাঝে গিয়াও ছিল ; কিন্তু যেদিন হইতে তাহার দেহের মধ্যে ব্যাধি অধিকার-বিস্তার করিতে লাগিল, সেইদিন হইতে সে শ্বশুরের ভিটা ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। যদি সেখানে গিয়া অসুখ বাড়িয়া যায়, যদি সে ফিরিয়া আসিতে না পারে?

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঘরের কোণে একটি মৃৎপ্রদীপ মিটিমিটি জ্বলিতেছিল। আর এক কোণে মেঝের উপর অশ্রু চুপটি করিয়া শুইয়া ছিল ; এমন সময় তাহার ছোটমাসির ছেলে সরোজ আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল! অশ্রু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। এই ভাইটিকে অশ্রু সবচেয়ে বেশী ভয় করিত। অশ্রু তাহাকে কতরকম করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝিতে চাহিত না।

সরোজ গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলিল, "আচ্ছা দিদি, সাধ ক'রে তোমার শ্বশুর-বুড়োকে গাল দিই ;—আজ তিনদিন তুমি না খেয়ে রয়েচ, তা একবার বুড়ো খোঁজ করলে না। এই বলে রাখ্‌চি দিদি, যেমন ও তোমায় কষ্ট দিচ্চে, তেমনই ফল ও ভোগ কর্‌বে। একএকখানা বুকের হাড় ওর গ'লে খ'সে প'ড়ে যাবে,--গলার ভেতর ঘা হ'য়ে, না খেতে পেয়ে, শুকিয়ে শুকিয়ে মর্‌বে!"

অশ্রু শিহরিয়া উঠিল! সে মিনতিস্বরে কহিল, "লক্ষ্মী ভাইটি আমার, তাঁর কি দোষ, দোষ ত আমার বরাতের। আহা, তিনি শোকতাপা মানুষ, তুমি তাঁকে শাপ দিয়ো না।"

সরোজ কহিল, "তুমি থাম দিদি, এখনও তোমার তার উপর টান গেল না। ও চামার, বাড়ী করার দোহাই দিয়ে আজ তিনদিন থেকে তোমার ছেলেদের জল-খাবারের পয়সা বন্ধ করে দিয়েচে। ও কথা কি আর চাপা থাকে। তমি কদিন লুকিয়ে রাখ্‌বে দিদি--তোমার রাত্তিরের খাবারের জন্যে শুন্‌লাম দুটো ক'রে পয়সা দেয় ; সেই পয়সা দিয়ে তুমি তিনদিন ছেলেদের মুড়ি কিনে খাইয়েচ। আর নিজে শুধু একঘটি জল খেয়ে তিনরাত কাটিয়েচ ; তবু একবার তুমি আমাদের বলনি।"

অশ্রু এবার ভারি বিপদে পড়িল! সরোজকে সে ভালরকমেই চিনিত। এ খবর যখন সে সংগ্রহ করিয়াছে, তখন সে একটা কিছু কাণ্ড না করিয়া ছাড়িবে না। হায়, কে তাহাকে এ সংবাদ দিল! কে এ বিপত্তির সৃষ্টি করিল!

অশ্রু ব্যগ্রভাবে কহিল, "লক্ষ্মী ভাই, তুাম ওঁকে গা'ল দিও না। কেন ওঁর ওপর রাগ কর্‌চ, শোকাতাপা মানুষ, তার ওপর অতবড় সর্বনাশ হয়েচে—"

সরোজ বাধা দিয়া কহিল, "ওর ওতে কিছু হয়নি। মানুষের চামড়া কি আছে, যে হবে। সে ত নিজের ছেলে তিনটে নিয়ে বেশ খায়, আর যত খরচ বাঁচান ঐ নাতি কটাকে না খেতে দিয়ে! কি বল্‌ব দিদি, কেবল তোমার জন্যে—"

অশ্রু বাধা দিয়া কহিল, "ওসব কি কথা ভাই! উনি যদি শোনেন, কি মনে কর্‌বেন, বল

ত? হাজার হ'ক গুরুজন! উনি যা ভাল বুঝেছেন, করচেন। আমার কপাল পুড়ে গেছে, তোমরা ভাই তাঁকে গাল দিলে কি আমার পোড়া-কপাল ফিরে আস্বে।"

সরোজ অবাক্ হইয়া তাহার দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এত সহ্যগুণ! এত ভক্তি! তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "দিদি, প্রকাশ তোমাকে দেখ্তে এয়েছিল?"

অশ্রু কহিল, "না ভাই, অনেকদিন তাদের কোন খবর পাইনি। তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল নাকি? তারা সবাই বেশ ভাল আছে?"

সরোজ কহিল, "আমি যখন ঢুক্‌ছি, তখন সে যে বেরিয়ে গেল! উঃ, কি পিশাচ, চামার! বাপের বেটা ত! ওরও কি শাস্তি হয়, তাও তুমি একদিন দিদি, শুন্‌তে পাবে—এই ব'লে রাখ্‌লাম। একলা পচে মরবে, কেউ একবার ফিরেও দেখ্‌বে না।"

অশ্রু ভাবিল, এ আবার এক নূতন বিপদের সৃষ্টি হইল! সে তাড়াতাড়ি কহিল, "তারই বা দোষ কি? আমার জন্যে কেন সবাই চিরজীবন জ্ব'লে মরবে! এখানে থাক্‌লে চোখের সাম্‌নে আমার এই ছেলে-মেয়েগুলোকে রোজ দেখতে হ'ত! সে যে গেছে, খুব ভালই করেছে! চোখের আড়ালে থাক্‌লে তবু দুদণ্ড শান্তিতে থাক্‌তে পারবে। আহা! ঠাকুরপোকে যেন কোনদিন শোকতাপ না পোহাতে হয়। তিনি যখন চ'লে যান, তখনও তার মুখে ঐ ভায়ের নাম। কি ভালই বাস্‌তেন! তোমরা ঠাকুরপোকে কিছু ব'ল না—সে কোনদিনই কষ্ট সইতে পারে না।"

ইহার উপর সরোজ আর কি বলিবে! তাহার দিদি পূর্বে কতরকম করিয়া তাহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু তাহাতেও সে ক্ষান্ত হয় নাই, বলিয়া আজ দিদি স্পষ্ট করিয়া সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন!

দিদির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিতে আজ সরোজের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! সে সেইভাবে একবার দিদির দিকে চাহিয়া দেখিল! কিন্তু তাহার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া, সহসা সে বিবর্ণ হইয়া গেল! সে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, তোমার অসুখটা বুঝি বেড়েচে?" অশ্রু কহিল, "না ভাই!"

সরোজের সে কথায় বিশ্বাস হইল না ; সে কহিল, "না দিদি, তোমার নিশ্চয়ই অসুখ বেড়েচে ; না হ'লে চেহারা কখন অমন খারাপ হয়। আমি গিয়েই মাসিমাকে সঙ্গে করে আন্‌চি।" অশ্রু বাধা দিয়া কহিল, "কেন ভাই মাকে এ রাত্তিরে কষ্ট দেবে। আমি বেশ আছি।"

(৯)

সরোজ চলিয়া যাইবার আধঘণ্টা পর হইতে অশ্রুর দেহ অত্যন্ত খারাপ বোধ হইতে লাগিল। সে কাহাকে কিছু না জানাইয়া একখানি চাদর মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিল! তিনরাত্রি অনাহারে গিয়াছে ; তাহার উপর আজও কিছু খাওয়া হইল না। আজ একটা পয়সার কিছু আনাইয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু জ্বর বৃদ্ধি হওয়ায় তাহা সে খাইতে পারে নাই। কাল আবার একাদশী!

ঘণ্টাখানেক পরে সরোজ অশ্রুর জননীকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি প্রায় দশটা। বাহিরে সদর-দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। অনেক ঠেলাঠেলির পর ভৃত্য আসিয়া মহাবিরক্তিভরে দরজা খুলিয়া দিল।

উপরের ঘর হইতে কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত্রিতে কে এল রে আবার?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "বড়বউঠাক্‌রুণের মা আর ভাই।"

কর্তা চেঁচাইয়া বলিলেন, "ভাল আপদ জুটেছে, রাত্তিরেও ঘুমোবার জো নেই! অত যদি মেয়ের উপর টান, বাড়ী নিয়ে যেতে পারে না। দুপুররাত্রিতে এসে দোর ঠ্যাঙাঠেঙি

কেন? এ কি বাসাড়ে বাড়ী পেয়েচে যে, যখন যার ইচ্ছে হবে, আস্‌বে!"

ক্ষেত্রবাবুর দ্বিতীয়-পক্ষের গৃহিণীর আমলের পুরাতন দাসীটি, বাবুর চৌদ্দ বৎসরের কোলের ছেলেটিকে আগ্‌লাইবার জন্য তাঁহারই ঘরের এককোণে পড়িয়া থাকিত। এমন শুভ অবসরে সেও নীরবে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিল না। বাহিরের বারান্দায় উপস্থিত হইয়া ভৃত্যকে ধমক দিয়া বলিল, "যে-সে দরজা ঠেল্‌বে, তুই অমনই গিয়ে খুলে দিবি ;— একবার গিয়ে বাবুকে,—না হ'ক, আমাকে গিয়েও ত জিজ্ঞেস কর্‌তে পার্‌তিস্! বাবুর ঘুমটা সবে আস্‌ছিল, সেই ঘুমটা কি না ভেঙ্গে দিলি। আমারই কষ্টের ভোগ! কত রাত্তির ব'সে ব'সে হাওয়া কর্‌তে হ'বে। কাল থেকে দেখ্‌চি, সদর দরজায় চাবি দিয়ে রাখ্‌তে হবে।"

সরোজ আর সহ্য করিতে পারিল না! ক্রোধে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। সে চীৎকার করিয়া কহিল, "জুতিয়ে মাগীর মুখ ভেঙ্গে দিলে তবে রাগ যায়। হারামজাদি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ;—কার দরজায় চাবি দিবি তা দেখ্‌ব'খন।"

দাসী উপর হইতে গর্জন করিয়া উঠিল, "তোমার বাবার বাড়ী পেয়েচ, এখানে মাতলামি করতে এসেছ।"

"তবে রে হারামজাদি" বলিয়া সরোজ ছুটিয়া উপরে যাইতেছিল, অশ্রুর জননী তাহার দুইটি হাত চাপিয়া ধরিলেন ; ধরিয়া কহিলেন, "ওরে কি করিস্, থাম, থাম। মেয়েটা আমার তা হ'লে বাঁচ্‌বে না।"

দিদির কথা মনে পড়িতেই সহসা সরোজ স্থির হইয়া দাঁড়াইল! সে অপমানের কথা ভুলিল! তাহার দিদির যে বড় অসুখ! সে নীরবে মাসিমাকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

(১০)

পরদিন সকাল হইতে না হইতেই অশ্রুর আত্মীয়স্বজনে তাহার কক্ষটি পূর্ণ হইয়া গেল। রাত্রি দুপুরের পর অশ্রুর মূর্চ্ছা হইয়াছিল ;—আধঘণ্টা হইল ঘোরটা একটু কাটিয়াছে; কিন্তু এখনও তাহার পাশ ফিরিয়া শুইবার শক্তি নাই। অশ্রুর বড়মাসি আসিতেই অশ্রুর জননী কহিলেন, "দিদি এসেচ। উঃ, কাল কি ভাবেই সরোজ আর আমি রাতটা কাটিয়েচি! সরোজ একবার ছুটে ডাক্তারের বাড়ী যায়, আবার ছুটে চ'লে আসে। একটা ডাক্তার পাওয়া গেল না, এমনই পোড়া অদৃষ্ট আমার। অনেকে সাড়া দিলে না ; যাঁরা বা সাড়া দিলেন— তাঁরা একশ টাকার কম কেউ আসতে চাইলেন না— তাও আবার আগাম। অত রাত্তিরে একশ টাকাই বা পাই কোথায়! অশ্রুর এক দেওরও ডাক্তার ; শেষে তাকে ডাক্‌তে পাঠালাম। সে ব'লে পাঠালে 'রাত্তিরে বেরুলে তার অসুখ কর্‌বে, কাল সকালে আস্‌ব'—কি করি, শেষে আমরা দুজনে সারারাত মাথায় জল দিতে, আর হাওয়া কর্‌তে লাগ্‌লাম। তোমরা আস্‌বার একটু আগে তবে সে ভাবটা একটু কেটেচে।"

এমন সময় ক্ষীণকণ্ঠে অশ্রু ডাকিল, "মা!"

জননী তাহার উত্তপ্ত-মস্তকে হাত রাখিয়া কহিলেন, "জলতেষ্টা পেয়েচে মা, একটু জল দেব?"

অশ্রু অতিকষ্টে কহিল, "আজ যে মা একাদশী!"

অশ্রুর জননী একথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সত্যই আজ যে একাদশী! তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। এই দৌর্বল্যের উপর আজ পেটে কিছু না পড়িলে মেয়েটাকে তিনি কি করিয়া বাঁচাইবেন। ভগবান্ এ কি করিলে!

অশ্রুর বড়মাসিমা কহিলেন, "একাদশী, তার হয়েচে কি? অসুখের সময় অত একাদশীর বিচার কর্‌লে চল্‌বে না।" বলিয়া একটি গ্লাসে করিয়া জল লইয়া অশ্রুর মুখের কাছে ধরিয়া কহিলেন, "লক্ষ্মী মা আমার, একটু জল খাও, গলা যে একেবারে শুকিয়ে

উঠেছে।"

অশ্রু আরও শক্ত করিয়া মুখ চাপিয়া রহিল। কেহই তাহাকে একফোঁটা জল মুখে দিতে পারিল না।

অনেক বেলায় ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া ঔষধের প্রিস্‌ক্রিপ্‌সান লিখিতে গেলে, অশ্রু তাহার জননীকে কহিল, 'মা, কেন মিছে অষুধ আন্‌বে. আজ আমি কিছুতেই খাব না।"

অগত্যা ডাক্তার দেহ ফুঁড়িয়া ঔষধ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। যাইবার সময় সরোজকে বলিয়া গেলেন, "আধঘণ্টার মধ্যেই রোগী বেশ চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌বে বটে ; কিন্তু অষুধের ফল বেশীক্ষণ থাক্‌লে হয় ;—যাহ'ক বিকালে এসে আর একবার না দেখ্‌লে কিছুই বল্‌তে পার্‌চি না। নাড়ীর অবস্থা তত ভাল ব'লে বোধ হচ্চে না।"

ডাক্তার চলিয়া যাইবার পর হইতে রোগী বেশ সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল! সকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন ; কিন্তু সরোজ মনে মনে ভারি উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল।

অশ্রু তখন সকলের সঙ্গে বেশ কথা কহিতেছিল।

তাহার বড়মাসিমা কহিলেন, "তখন ডাক্তারের ব্যবহারের কথা শুনে আমার একটা কথা মনে প'ড়ে গেল,—বুকটা কেমন ক'রে উঠ্‌ল। কি জানি হয় ত চোখের ওপর রোজই লোককে কষ্ট পেয়ে মর্‌তে দেখে ওদের মায়াদয়া ব'লে কোন জিনিষ আর থাকে না। নইলে একজন লোক মর্‌চে শুন্‌লে আসে না,—ঘরের ভিতর থেকে দরদস্তুর কর্‌তে থাকে! হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম ; তোমার মেজভগিনীপতি বড় সরকারী কাজ কর্‌তেন, অসুখ হ'লে ডাক্তার-সাহেব অবধি বিনা পয়সায় দেখে যেত, এক পয়সা নেবার জো-টি ছিল না। বোধ হয় সেইজন্যেই তারা এলাকাড়ি দিয়ে দেখ্‌ত। শেষের দুতিনদিন এই যায় ত এই যায়,—এমনই অবস্থা। ডাক্তারকে দিনের মধ্যে পাঁচবার ডেকে পাঠালে, তবে সে তার সময়মত একবার আস্‌ত। যেদিন সকালে তিনি মারা যান,—সেদিন ভোরবেলা, তখন কাক-কোকিল ডেকে উঠেচে—চারিদিক বেশ ফরসা হয়েছে—জগৎ ছুটে ডাক্তারকে ডাক্‌তে গেল —ডাক্তার সাহেব তখন সাজগোজ করছিলেন। জগতের মুখে শুনে কি বল্‌লে জান— 'তোমার বাবা ত দিনে তিনবার মর্‌চে। যাও যাচ্চি!' এদিকে ডাক্তার আসবার আগেই সব শেষ হ'য়ে গেল!"

অশ্রুর জননী কহিলেন, "কিন্তু দিদি, প্রভাতের অসুখের সময় যে ডাক্তারবাবু দেখেছিলেন—তিনি বোধ করি দেবতা। এমন যত্ন কর্‌তে আমি কখনও দেখিনি। অসুখের প্রথম থেকে শেষ অবধি তিনি ঠায় রোগীর শিয়রে বসে ছিলেন—তাঁর যত রকম অষুধ জানা ছিল, সব দিয়েছিলেন। ডাক্তারবাবুর কি সুন্দর চেহারা ছিল ; কিন্তু কি বলব দিদি, তিনি যখন দেখ্‌লেন অষুধে আর কিছু হ'ল না, তখন ব্রাহ্মণ পৈতে বের ক'রে নিজের হাতে জড়িয়ে, চীৎকার ক'রে ভগবান্‌কে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন, 'ভগবান্‌, আমার মুখ রাখ! এদের রক্ষে কর, একে বাঁচিয়ে দাও।' কি বল্‌ব দিদি, তাঁর অমন সুন্দর চেহারা তখন কেমন একরকম ভয়ানক হ'য়ে উঠেছিল।"

এমন সময় সরোজ আসিয়া ডাকিল, "মাসিমা, তোমরা ভেতরে এসে বোস, এরা সব বাড়ী যাচ্চেন, অশ্রু এখন বেশ ভালই আছে।"

বেলা দুইটা অবধি অশ্রু ভালই ছিল। এক সরোজ ও তাহার জননী ছাড়া আর সকলে তখন চলিয়া গিয়াছিলেন। আবার যেন অশ্রু কেমন ছট্‌ফট্‌ কবিতে লাগিল ; মাথার মধ্যে জ্বালা আরম্ভ হইল ; হাতপায়ে খিল ধরিতে লাগিল।

কালরাত্রে অশ্রুর যায়-যায় অবস্থা হইয়াছিল ; সরোজ সারারাত ঘরে-বাহিরে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে ; তবুও সে বাড়ীর একটা প্রাণীও একবার উঁকি মারিয়া দেখে নাই। আজ এতবেলা পর্যন্ত কেহ আসিয়া একবার জিজ্ঞাসা অবধি করিল না। বেলা আড়াইটার

সময় অশ্রুর শ্বশুরকে হঠাৎ এ ঘরের দিকে আসিতে দেখিয়া সরোজ একটু আশ্চর্য বোধ করিল। ঘরের দোরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কর্কশকণ্ঠে বৃদ্ধ ক্ষেত্রনাথ কহিলেন, "দেখ বউমা—আমার এ বাড়ীতে তোমার জায়গা হবে না। আমি বলে গেলাম, আজই বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবে, সন্ধ্যে অবধি সময় দিলাম, তার পরও যদি থাক, তা হ'লে অপমান হ'য়ে বেরুতে হবে। তোমার পাঁচ বেটা মাতাল ভাই এসে আমার বাড়ী চড়ওয়া হ'য়ে রাত্তিরে হাঙ্গামা কর্‌বে, আর তুমি সেই বাড়ীতে ব'সে ব'সে আমার ভাত গিল্‌বে, তা কখনই হতে দেব না। আমি কি আর কিছু বুঝি নে—ঝিকে গাল দিয়ে মারতে যাওয়াও যা, আর আমাকে মারাও তাই ;—পাজি নচ্ছার!"

সরোজ চুপ করিয়া সব শুনিল। তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই ক্ষেত্রনাথবাবু এই সব গালিগালাজ করিলেন, তাহা আর তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু তাহার দিদি যে মৃত্যুশয্যায় ; এ সময় তাহার হৃদয়হীন শ্বশুরকে কিছু বলিলে দিদিকেই যে আঘাত করা হইবে!

তখন অশ্রুর যন্ত্রণা খুব বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর শ্বশুর আসিয়া যখন তাহাকে ভিটে ছাড়িবার হুকুম করিলেন, তখন সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। শুধু স্বামীর শেষ-আদেশ পালন করিবার জন্য, সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া, নিজে আধ-পেটা খাইয়া, ছেলেমেয়েদের শুধু একটু ডালের-ঝোল দিয়া কড়কড়ে মোটা চালের ভাত খাওয়াইয়া, সে এই ভিটা আঁক্‌ড়াইয়া পড়িয়া আছে! এ ভিটা ছাড়িয়া সে কোথাও যাইতে পারিবে না! শ্বশুর ত টানিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিতে পারিবেন না! সে দুইহাতে জননীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "মা, কেন এমন হ'ল—আমি এ ভিটে ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাক্‌তে পার্‌ব না! আমাকে, তোমরা ধ'রে নিয়ে চল, আমি বাবার পা জড়িয়ে ধ'রে প'ড়ে থাক্‌ব, তা হ'লে বাবার দয়া হবে, তিনি আমায় তাড়াতে পার্‌বেন না।" তাহার পর সরোজের দিকে চাহিয়া ক্ষীণকাতরকণ্ঠে কহিল, "ভাই, কেন এমন কর্‌লে?"

অনুতাপের অনলে সরোজ দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। সে যদি কাল সহ্য করিয়া যাইত, তাহা হইলে আজ আর তাহার দিদিকে এ অপমান, এ যন্ত্রণা সহিতে হইত না! সরোজ প্রকাশ্যে কহিল, "দিদি, তখন রাগের মাথায় অতটা বুঝতে পারিনি, আমি এখুনি গিয়ে ক্ষেত্রবাবুর কাছে মাপ চাইচি।"

অশ্রুর রোগকাতর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! সে মনে মনে ভাইকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিল।

সরোজ গিয়া বৃদ্ধের কক্ষের দুয়ারে দাঁড়াইতেই, বৃদ্ধ ক্ষেত্রনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "পাজি মাতাল, এখানে আবার কি কর্‌তে এসেছিস্?"

সেই দাসীটি তখন বৃদ্ধের পাকাচুল বাছিয়া দিতেছিল। সরোজকে দেখিয়া সে একেবারে জড়সড় হইয়া গিয়াছিল। এইবার বুঝি তাহার দফা-রফা হইল! সে কাঁপিতে কাঁপিতে ডাকিল, "বাবু!" সরোজ তখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃদ্ধও ভীত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "ভাল আপদ্ যা হ'ক।" তাহার পর চীৎকার করিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া উঠিলেন।

সরোজ ততক্ষণে অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া, তাহার দুই পায়ে হাত দিয়া কহিল, "আমায় মাপ করুন। আর আমি কখ্‌খন অমন কথা বল্‌ব না।"

ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় ক্ষেত্রনাথের সাহস হইল ; তিনি পা টানিয়া লইয়া ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "বেরো বেটা মাতাল আমার ঘর থেকে ;—ওসব মাপ-টাপের ধার ধারি নে। আমার এক কথা ; যখন বলেচি আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, তখন যেতেই হবে।"

সরোজ তবুও আর একবার বৃদ্ধের পা ধরিয়া মাপ চাহিল, কিন্তু বৃদ্ধ আরও কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিলেন। সরোজ আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাহার মুখচোখ দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল।

এমন সময় নীচের ঘর হইতে অশ্রুর জননী আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ও সরোজ, বাবা সরোজ—কোথায় গেলিরে—ওরে আমার অশ্রু যে কেমন হ'য়ে গেছে।"

সরোজ ছুটিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

তখন সূর্য প্রায় ডুবু-ডুবু হইয়াছে। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু ঔষধের কোন ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। তিনি শুধু ভগবানকে ডাকিবার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন!

সন্ধ্যার সময় অশ্রুর এ ভিটা ছাড়িয়া যাইবার হুকুম হইয়াছে ; কিন্তু স্বামীর অন্তিম-আদেশ ঠেলিয়া সে যে শ্বশুরের আদেশ পালন করিতে অক্ষম! তাই বোধ করি তাহার ঠোঁট-দুখানি কাঁপিয়া কাঁপিয়া সেই কথাই জানাইতেছিল,—'বাবা আমায় ভিটেছাড়া করিয়ো না!' সেই ভয়ে ভীত হইয়াই বোধ করি তাহার চোখের তারা দুইটি সহসা অমন আড়ষ্ট, স্তব্ধ হইয়া গেল।

পৌষ ১৩২২

গরীব

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

লক্ষ্মণ জাতে মুচী, কিন্তু সে জাত-ব্যবসা করতো না। তেরো চৌদ্দ বছর বয়সে যখন তার বাপ মারা যায়, তখন সে পাঠশালে পড়ছিল। গাঁয়ের ভদ্রলোক মুরুব্বীরা লক্ষ্মণের বাপ মুকুন্দকে প্রায়ই বলতো—মুচীর ছেলের আবার পাঠশালা কেন রে? জাত-ব্যবসা শিখিয়ে নিজের কাজে লাগিয়ে দে।

ছেলেকে পাঠশালে দেওয়ার জন্য মুকুন্দ গাঁয়ের লোকদের কাছে প্রায়ই খোঁচা খেতো বলে তার মনের মধ্যে একটা জায়গা অত্যন্ত দুর্বল হোয়ে পড়েছিল, এইখানে আঘাত লাগলেই সে সঙ্কুচিত হোয়ে বলে ফেলতো—এইবার—এই কটা দিন গেলেই ছেলেকে কাজে লাগিয়ে দেবো।

মুচী হোয়ে ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার এত আগ্রহ দেখে তার স্বজাতি ও গ্রামের অন্য লোকেরা বিরক্ত তো হোতোই, বিস্মিতও বড় কম হোতো না।

মুচীর ছেলে হোলেও অতি শৈশব থেকেই পড়াশুনা করার দিকে লক্ষ্মণের বিশেষ ঝোঁক ছিল। গাঁয়ের ছোট-ছোট ছেলেরা যখন তল্পী বগলে নিয়ে পাঠশালার গল্প করতে করতে তাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে যেতো, তখন লক্ষ্মণ তার মার কাছে গিয়ে আব্দার ধরতো—মা আমায় পাঠশালে নিয়ে চল্।

বালকের আগ্রহ দেখে মুকুন্দ গ্রামের গুরুমশায় রঘুনাথ চাটুয্যের কাছে গিয়ে ধন্না দিয়ে পড়লো! তার ভয় ছিল যে, গুরুমশায় হয়তো মুচীর ছেলেকে তাঁর পাঠশালে নেবেন না। কিন্তু তিনি আগ্রহের সঙ্গে তার ছেলেকে নিতে রাজী হওয়ায় একদিন মুকুন্দ শিশু লক্ষ্মণের হাত ধরে পাঠশালায় দিয়ে এল।

রঘুনাথ চাটুয্যের তিন কুলে কেউ ছিল না। তাঁর কয়েক ঘর প্রজা ছিল, তারাই দয়া কোরে যা দিত তাই দিয়ে তাঁর গ্রাসাচ্ছাদন চলতো। ছেলে পড়ানো রঘুনাথের এক বাতিক ছিল। কবে থেকে যে তিনি এই কাজ করছেন তার সাক্ষী দেবার লোক গ্রামের মধ্যে ছিল না বল্লেও চলে। এখনকার পিতামহ-সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁর ছাত্র। রঘুনাথ গ্রামের কারো সঙ্গে মিশতেন না। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ছেলে পড়িয়ে তার পর নিজে হাতে রেঁধে খেয়ে অনেক রাত্রি অবধি পড়াশুনা কোরে তিনি শুয়ে পড়তেন। বহু দিন থেকে এই নিয়মই চলে আসছে। গ্রামের মধ্যে বাস কোরেও তিনি গ্রাম-ছাড়া গোছের লোক ছিলেন।

লক্ষ্মণ পাঠশালায় ভর্তি হওয়া মাত্র গ্রামের ভদ্র লোক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সোরগোল পড়ে গেল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বেনে, সোনার বেনে সকলের মুখেই এক কথা—এ্যাঁ! বল কি হে, মুচীর ছেলে পাঠশালায়!

গ্রামের কয়েক ঘর নমঃশূদ্র দু-পুরুষ থেকে লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোকের পৈঠায় উঠেছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মোটা মাইনের সরকারী চাকরী কোরে দু-পয়সার সংস্থানও করেছে। মুচীর ছেলে পড়তে সুরু করেছে শুনে তারাও বিস্মিত হোয়ে গেল—তাই তো বল কি হে?

গ্রামের মুরুব্বীরা রঘুনাথকে গিয়ে বল্লে—চাটুয্যে মশায় এটা কি ভালো হলো? বামুন, কায়েতের ছেলের সঙ্গে মুচীর ছেলে এক সঙ্গে বসে পড়বে! রঘুনাথ হেসে বল্লেন—তাতে

দোষটা কি হয়েছে! রঘুনাথের উত্তর শুনে আশ্চর্য হোয়ে তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো যেন দোষটা অন্যের মুখের ওপর লেখা আছে। মুখ দেখাদেখির পালা সাঙ্গ হোলে হরিহর ভট্টাচার্য এগিয়ে এসে বল্লে—তা হোলে আমাদের ছেলেদের আর এখানে রাখা চলে না।

হরিহরের কথা শুনে মুরুব্বীদের মুখে একটা প্রসন্নতার হাসি ফুটে উঠলো, ভাগ্যে হরিহর সঙ্গে এসেছিল।

হরিহরের কথা শুনে রঘুনাথ কিছুক্ষণ গুম্ হোয়ে বসে রইলেন। তার পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বল্লেন—সে তোমাদের অভিরুচি। ছেলে-পড়ানোর জন্য আমি কারো কাছ থেকে একটি কপর্দকও গ্রহণ করি না। মুকুন্দর ছেলের বুদ্ধি তোমাদের কারো ছেলের চেয়ে কম নয় ; আর কমই হোক্ কি বেশীই হোক, আমার কাছে সে যখন পড়তে এসেছে তখন আমি তাকে শিক্ষা দেবোই। এতে যদি আমার এখানে ছেলে পাঠাতে কারো আপত্তি থাকে সে যেন না পাঠায়।

মুরুব্বীরা আর বাক্য-ব্যয় না কোরে ফিরে এলেন, তাঁদের ছেলেরাও পাঠশালে যেতে লাগলো ; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামময় রাষ্ট্র হোয়ে গেল যে, লক্ষ্মণ মুচীনীর গর্ভে জন্মালে কি হবে, ও মুচীর ছেলে কখনই নয়। মুচীর ছেলের কখন অত বুদ্ধি হয়!

বাপের মৃত্যুতে লক্ষ্মণ দুনিয়া অন্ধকার দেখলে। একে সে জাত-ব্যবসা শেখেনি ; বাপের এমন সংস্থানও নেই যে, দু-দিন বসে খাওয়া চলবে। মুকুন্দর কয়েক বিঘে জমি ছিল, জাত-ব্যবসা ছাড়া সে ভাগে চাষও করতো। বাপের মৃত্যুতে লক্ষ্মণ নিজে চাষ-বাস সুরু করলে। সেই অল্পবয়সে সহায়হীন হোয়েও দুঃখে সুখে সে নিজের সংসার এক রকমে চালিয়ে নিয়ে চলেছিল, কারো কাছে হাত পাত্‌তে হয় নি।

বাপের মৃত্যুতে পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করতে হোলেও লেখাপড়ার চর্চা লক্ষ্মণ কোনো দিনই ছাড়ে নি। অবসর পেলেই সে তার গুরুমশায়ের কাছে গিয়ে বসতো, তাঁর কাছ থেকে নানা বিষয়ের বই নিয়ে এসে বাড়ীতে পড়তো ; কোনো জায়গায় বুঝতে না পারলে রঘুনাথকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতো। রঘুনাথ কলকাতা থেকে খানকয়েক দৈনিক কাগজ আনাতেন ; ইদানীং চোখের জ্যোতি কমে আসায় তিনি রাত্রে আর পড়তে পারতেন না। লক্ষ্মণ রোজ সন্ধ্যাবেলা গুরুর বাড়ী গিয়ে তাঁকে কাগজগুলো পড়ে শুনিয়ে আসতো। এই দুটি গুরু আর শিষ্যে, ব্রাহ্মণ আর মুচীতে এমন একটা বাঁধন কোথায় লেগে গিয়েছিল যেটা কোনও দিনই ছেঁড়ে নি কিংবা আল্‌গা হয় নি। রঘুনাথের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত লক্ষ্মণ সমান ভাবে তাঁর সেবা করেছিল।

গ্রামে আরও কয়েক ঘর মুচী ও হাড়ির বাস ছিল। এরা জাত-ব্যবসা ছাড়া সকলেই চাষ-বাস করতো। লক্ষ্মণ ছিল এদের মুরুব্বী। কোনো বিপদে পড়লে অথবা কোনো কাজের জন্য পরামর্শ করতে হোলে আগে তারা গ্রামের ভদ্র লোকদের শরণাপন্ন হোতো ; কিন্তু লক্ষ্মণ মাতব্বর হোয়ে ওঠার পর এরা পরামর্শের জন্য তার কাছেই যেতো এবং লক্ষ্মণ তাদের জাত হোয়ে তাদের মধ্যে থেকেই এমন যে একজন লায়েক হোয়ে উঠেছে সে জন্য মনে মনে গর্বও অনুভব করতো।

উপরি-উপরি দু-বছর অজন্মা হওয়ার পর খাজনা আদায়ের আগে জমিদারের নায়েব যখন বলে দিলেন যে, জমিদারের ছেলের বিয়ের জন্য এবার চার আনা কোরে মাথট দিতে হবে, তখন লক্ষ্মণের অনুগতরা এসে তাকে ধরে পড়লো—দাদা বাঁচাও, তুমি নায়েব মশায়কে বলে এ-বছরের খাজনাটা আমাদের রেহাই করিয়ে দাও।

অজন্মা হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্মণ জমিদারের খাজনাটা কোনো রকমে যোগাড় কোরে রেখেছিল। কিন্তু তার জাত-ভায়েরা বল্লে—তুমি যদি খাজনা দাও তা হোলে আমাদের ওপর

অত্যাচার হবে, নায়েব আমাদের জোত বেচে খাজনা আদায় করবে। তুমি আমাদের মুরুব্বী হোয়ে নায়েবকে গিয়ে বল।

ক-দিন ধরে পঞ্চায়েত বসবার পর একদিন বিকেলে লক্ষ্মণ নায়েবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য জমিদারী-কাছারীতে গিয়ে উপস্থিত হোলো। নায়েব তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—সংবাদ কি বাপু?

—আজ্ঞে নায়েব মশয়, দু-বছর উপরি-উপরি অজন্মা গিয়েছে, এবারও ফসল ভাল হয়-নি। আপনি সবই তো জানেন? এবারে আমাদের খাজনাটা রেহাই দিতে আজ্ঞা হোক।

নায়েব বল্লেন—হাসালে যে! ওদিকে জমিদার তাগাদা দিচ্ছেন খাজনার টাকা পাঠাও, মাথটের টাকা পাঠাও, আর এদিকে তোমরা বলছো খাজনা রেহাই দাও! ও সব হবে না, খাজনা যার যার দিয়ে যেতে বলো। হাঙ্গামা কোরো না, হাঙ্গামা করলে আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না।

—আজ্ঞে টাকা না থাকলে কোথা থেকে খাজনা দেবো? পেটে খেয়ে তবে তো জমিদারের খাজনা—

লক্ষ্মণের কথা থামিয়ে দিয়ে নায়েব একটা হুঙ্কার ছেড়ে বল্লেন—চোপ্‌রাও শূয়ার! যত বড় মুখ ততবড় কথা! আগে উনি পেটে খাবেন তবে জমিদারকে খাজনা দেবেন। টাকা না থাকে হাল গরু বেচে খাজনা দাও।

লক্ষ্মণ হাত জোড় কোরে বল্লে—আজ্ঞে এ বছর হাল গরু বেচে খাজনা দিলে ভবিষ্যতে যে কোনো দিনই খাজনা দিতে পারবো না।

লক্ষ্মণের কথা শুনে নায়েব স্তম্ভিত হোয়ে গেলেন। মুচীর সন্তানের এত বড় স্পর্ধা! তখুনি তাকে জুতিয়ে সিধে করবার একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছা তাঁর শিরায় শিরায় লাফালাফি করতে লাগলো। কিন্তু সদাশিব চৌধুরী নায়েবী কোরে চুল পাকিয়ে ফেলেছেন। জুতিয়ে সিধে করার আগে তিনি ভেবে দেখলেন যে, লক্ষ্মণ মুচীর সন্তান হোলেও লেখাপড়া জানা মুচী। তার ওপরে প্রায় দেড়শো-ঘর প্রজা তার বিশেষ অনুগত ; এক্ষেত্রে সদরে সংবাদ না দিয়ে এমন একজন মাতব্বর প্রজাকে সিধে করাটা যুক্তিসঙ্গত হবে না। রাগটা কোনো রকমে হজম কোরে ফেলে তিনি বল্লেন—খাজনা যদি দেবার ইচ্ছা না থাকে দিও না, কেমন কোরে খাজনা আদায় করতে হয় আমাদের তা জানা আছে।

এই কথার ওপরে আর কিছু বলা বৃথা মনে কোরে লক্ষ্মণ কাছারী থেকে ফিরে এসে সবাইকে জানিয়ে দিলে—খাজনা মাফ হবে না। যেমন কোরে পারো খাজনা দাও ; হাল গরু বেচে খাজনা দাও। তোমাদের পেট ভরুক আর নাই ভরুক, জমিদারের পেট ভরানো চাই।

বাড়ীতে ফিরে এসে লক্ষ্মণ ভাবতে বসলো—কি করা যায়! এই যে কয়েক-ঘর লোক, আমারই মত গরীব তারা, তাদের দুঃখে সহানুভূতি পাবে বলে আমাকে এসে ধরেছে—এর কি কিছুই করতে পারবো না। একে ঘরে অন্ন নাই, মহাজনের সুদ গুণে পেট-ভরে খাওয়ার কথা বেচারীরা ভুলেই গিয়েছে। কিন্তু এবার—? অর্ধাশন সহ্য করে বলে কি অনশন সহ্য হবে? বছরে-বছরে অজন্মা, অনাবৃষ্টি লেগেই আছে। দেবতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই যে গরীবরা বুকের রক্ত জল কোরে পাথরের মতন মাটি-চযে শস্য ফলায়, তাদের পেট কি কখনো ভরবে না! এর কি কোনো উপায় নাই? গরীব—তারা যে গরীব, তারা যে অভিশপ্ত। জন্মের সঙ্গেই ঈশ্বর তাদের কপালে অভিসম্পাতের টীকা পরিয়ে দিয়েছেন। ভেবে সে কিছুই ঠিক করতে পারছিল না, তার মাথা ঘুরতে লাগলো।

লক্ষ্মণের ছেলে উদ্ধব কোথা থেকে খেলা কোরে বাড়ীতে ফিরে এসে বাপকে বিষণ্ণ মুখে দরজার কাছে বসে থাকতে দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। খানিকক্ষণ বাপের মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে বল্লে—তামাক দেবো বাবা?

লক্ষ্মণ কোনো কথা না বলে ছেলের দিকে উদাস-দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। অস্ত-অচলের শিখরে তখন মহা-সমারোহে দিনের চিতা জ্বলে উঠেছিল ; সেই অগ্নি শিখার জ্বালাময়ী স্পর্শে সমস্ত আকাশটা ঝল্‌সে লাল হোয়ে এই শ্যাম ধরণীর শীতল পরশ পাবার জন্য উন্মুখ হোয়ে থর্-থর্ কোরে কাঁপছিল। সে ছেলের মুখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অবহেলায় একবার আকাশের দিকে চেয়ে আবার তাকে দেখতে লাগলো--ওরে আমার পাগলা ছেলে, ওরে আমার বংশের দুলাল, এই গরীবের ঘরে কেন এসেছিস্ বাবা? গরীবের কি দুঃখ তা তো তুই জানিস্ না। এই রক্ত মাংসের শরীরে ক্ষিদের যন্ত্রণা যে কি যন্ত্রণা তা তুই এখনো বুঝিস্ নি ; কিন্তু তোকে বুঝতেই হবে,--একদিন বুঝতেই হবে, কিছুতেই নিস্তার নেই। উদ্ধব বাপের অশ্রু-সজল চোখ দেখে আরও কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে--কি হয়েছে বাবা?

লক্ষ্মণের স্ত্রী বেঁচে নেই। সংসারে সে, তার মা ও একমাত্র ছেলে উদ্ধব। উদ্ধবকে বছর-খানেকের রেখে তার স্ত্রী মারা যায়, তার ঠাকুরমাকেই সে মা বলে জানতো। তাদের ঘরে নয় দশ বছরের ছেলে সংসারের ও বাইরের অনেক কাজই করে ; কিন্তু লক্ষ্মণ তাকে কিছু করতে দিত না। গরীবের ছেলে বেঁচে থাকলে সারাটা জীবনই তো খেটে মরতে হবে; তবুও শেষ-জীবনে কর্মক্লান্ত সন্ধ্যাবেলায় অতীতের কথা মনে কোরে দুর্বিসহ জীবনের কয়েকটা মুহূর্তও সুখে ভরে উঠবে, এই আশায় সে উদ্ধবকে এখনও কাজে লাগায় নি। এই স্মৃতি জপ করা গরীবের জীবনে যে কত বড় বিলাসিতা তা লক্ষ্মণ ভাল কোরেই জানতো। উদ্ধব কাছে এলে লক্ষ্মণ তাকে বল্লে--এইখানে বস, মনটা বড় খারাপ হোয়ে গেছে বাবা, তাই চুপ কোরে বসে আছি।

--তুমি নায়েব মশায়ের কাছে গিয়েছিলে বাবা?

--হ্যাঁ, কিন্তু কিছুই হোলো না, তিনি বলে দিলেন খাজনা সবাইকে দিতেই হবে, খাজনা জমিদার মাফ করবে না।

উদ্ধব কিছুক্ষণ চুপ কোরে রইলো। তারপর বল্লে--জমিদারের তো অনেক টাকা আছে বাবা, এইবারটি খাজনা মাফ করতে পারে না। লখীন্দর কাকা বলছিল তার ঘরে এক মুঠো চাল পর্যন্ত নেই--

পারে না রে পারে না। আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েই তবে না তার অনেক টাকা। সে তো আর আমাদের মতন গতর খাটিয়ে টাকা রোজগার করে না।

উদ্ধব তার শিশু যুক্তিতে এ কথার কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে বাপের পাশে আরও ঘেঁসে চুপটি কোরে বসে রইলো। তাদের চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই ঘনিয়ে উঠতে লাগলো। লক্ষ্মণ তখনো ভাবছিল কি করি--

উদ্ধব হঠাৎ বল্লে--একবার বাবুদের গিয়ে বল না বাবা, তাঁদের তো অনেক টাকা আছে।

লক্ষ্মণের মনে অনেকক্ষণ থেকে এই কথাটা উঁকি মারছিল। নায়েব তো চাকর মাত্র, জমিদার ইচ্ছা করলে সবই করতে পারেন। উদ্ধবের মুখে কথাটা শুনে সে আর কোনো জবাব না দিয়ে তাকে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

পরদিন সকালে লক্ষ্মণ সবাইকে জানালে যে, সে একবার জমিদারের সঙ্গে দেখা করবে, মিনতি কোরে বলে দেখবে ; তাতে যদি কোনো ফল না হয় তা হোলে কেউ এক পয়সা খাজনা কিংবা মাথট দেবো না--প্রাণ থাকতে নয়, এতে তোমরা রাজী আছ?

সবার সম্মতি নিয়ে লক্ষ্মণ সেই দিনই জমিদারের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় চলে গেল।

কলকাতায় গিয়ে বাবুর সাক্ষাৎ পাওয়া যে বিশেষ সোজা ব্যাপার নয়, সেটা লক্ষ্মণের আগেই জানা ছিল। বাবুর কর্মচারীরা তার কলকাতায় আসার কারণ জানতে পারলে বাবুর

সঙ্গে হয়তো দেখা নাও হোতে পারে, এই ভেবে সে জমিদারের নাপিতের সঙ্গে ভাব-সাব কোরে সকাল-বেলা তার সঙ্গে বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হোলো।

জমিদার রায় প্রদ্যুম্নপ্রকাশ অধিকারী, সাহেব তখন সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠে নীচের ঘরে এসে বসেছেন। রক্তচক্ষু তখনো স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে পায় নি। লক্ষ্মণ গিয়ে একেবারে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কোরে হাত জোড় কোরে দাঁড়ালো। জমিদার একবার মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কে? কি চাও তুমি?

লক্ষ্মণ হাত জোড় কোরে বল্লে—আজ্ঞে আমি আপনাদেরই আশ্রিত একজন প্রজা। আমার নাম লক্ষ্মণচন্দ্র দাস।

জমিদার সবে কাল যাদবপুর তালুকের নায়েবের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিলেন যে, বিষ্ণুগ্রামের লক্ষ্মণদাস নামে একজন মাতব্বর প্রজা বিদ্রোহী হয়েছে। নায়েব এ বিষয়ে কি কর্তব্য তার পরামর্শ চেয়েছিল। তিনি পত্রপাঠ তাকে জানিয়েছেন যে, বিদ্রোহীকে যেমন কোরে পার সায়েস্তা করো; না হোলে অন্য প্রজারাও খাজনা বন্ধ করবে। লক্ষ্মণের নাম শুনে জমিদার রক্তনেত্রে তার দিকে চেয়ে বল্লেন—তোমার নাম লক্ষ্মণ মুচী? তুমি খাজনা দেবো না বলেছো?

লক্ষ্মণ বল্লে—আজ্ঞে খাজনা দেবো না এমন কথা কি আমরা বল্‌তে পারি! দু-বছর উপরি-উপরি অজন্মা হয়েছে, কিন্তু আমরা ধার কোরে খাজনা জুগিয়েছি ; এবার মহাজনও টাকা দিতে চায় না, আর বীজ ধানও নেই যে বেচে টাকা দেবো! এ বছরের মত খাজনাটা মাফ কোরে দিতে আজ্ঞা হয়। ভগবান আপনার—

জমিদার ধমক দিয়ে বলে উঠলেন—দেখ, ছোটলোকের মুখে লম্বা-লম্বা কথা শুনলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। উনি বলবেন তবে ভগবান আমার মঙ্গল করবেন—আস্পর্ধা দেখো না।

লক্ষ্মণ ক্ষুব্ধস্বরে বল্লে—আমরা ছোটলোক, আপনাদের মর্যাদা রেখে কথা বলতে জানি না, মাফ কর্বেন!

—তারপর, কি বলতে চাও, খাজনা-টাজনা দেবে?

—হুজুর এবারের মত আমাদের মাফ করুন।

—মাফ হবে না বাপু, খাজনা আর মাথট দিয়ে দাও! সরকার তো আমায় মাফ করবে না।

—আজ্ঞে খাজনা কোথা থেকে দেবো! টাকা দূরের কথা, একমুঠো ধান যে কারো ঘরে নেই।

—খাজনা না দিলে বাস তুলতে হবে জেনে রেখো।

লক্ষ্মণ আর সহ্য করতে পারছিল না, অনেক কথা তার বলবার ইচ্ছা হোতে লাগলো। কিন্তু গ্রামের সেই ক্ষুধাতুর বন্ধুদের মিনতি-ভরা মুখগুলো মনে কোরে সে নিজেকে কোনো রকমে সম্বরণ কোরে শেষে বলে ফেল্লে—হুজুর দশ বছর হোলো এই তালুক কিনেছেন, আর আমরা দশ পুরুষ ধরে এই গ্রামে বাস করছি। আমাদের ভিটে ছাড়া করলে আপনাদের অকল্যাণ হবে।

লক্ষ্মণের কথা শুনে জমিদার বাবু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি হাঁক ছাড়লেন—তবে রে! কে আছিস্, পঞ্চাশ জুতো গুণে মেরে একে বাড়ী থেকে বের কোরে দে।

তখুনি কয়েকজন দরোয়ান এসে লক্ষ্মণকে মার্‌তে মার্‌তে বাড়ী থেকে বার কোরে দিলে।

রাস্তায় এসে লক্ষ্মণ স্তম্ভিত হোয়ে দাঁড়ালো। এতটা যে হবে তা সে ধারণায় আন্‌তে পারে নি। রাগে, দুঃখে, অপমানে, ক্ষোভে কাঁপতে কাঁপতে সে স্টেশনের দিকে এগিয়ে

চল্লো। পথ চল্‌তে চল্‌তে ভাবতে লাগলো যে, সে কি এমন কথা বলেছে, যার জন্য তাকে জুতো মেরে এমন কোরে তাড়িয়ে দেওয়া হোলো? এর কি কোনো প্রতিবিধান নাই? কি প্রতিবিধান হবে? ধনী যে সে যুগ-যুগ ধরে গরীবকে এমনি ভাবে জুতোই মেরে আস্‌ছে। গরীবকে দলন করার প্রবৃত্তি যে তার মজ্জাগত হোয়ে গিয়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের এই যে অস্বাভাবিক ব্যবহার, এ কি বিধাতারই নিয়ম!—দারুণ বিধাতা,—নিষ্ঠুর বিধাতা। বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখবো যে অসহায় বন্ধুরা আমার আশায় পথ চেয়ে বসে আছে, আমাকে দেখে আসায় তাদের অন্তর উৎফুল্ল হোয়ে উঠবে—তাদের গিয়ে কি বলবো?

লক্ষ্মণ যখন গ্রামে ফিরে এল তখনও সন্ধ্যে হোতে অনেক দেরী। সে উদ্ধবকে ডেকে বল্লে—তোর লখীন্দর কাকাকে বলে আয় আমি ফিরে এসেছি ; আজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়ীর সামনের মাঠে পঞ্চায়েত বসবে। সে সবাইকে যেন খবর দিয়ে এইখানে নিয়ে আসে।

লক্ষ্মণের মা জিজ্ঞেস করলে—জমিদার-বাড়ীতে গিয়ে কিছু সুবিধে করতে পারলি বাবা?

—কিছুই হোলো না মা, তারা আমাকে মেরে অপমান কোরে তাড়িয়ে দিলে।

বৃদ্ধা পুত্রের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লে—তারা বড়লোক, তাদের সঙ্গে কি ঝগড়া কোরে পারবি বাবা?

—ঝগড়া কোরে পারবো না, কিন্তু টাকা না থাকলে দেবো কোথা থেকে?

—নে তুই এখন নেয়ে খেয়ে নে। কাল সারাদিন নায়েব-কাছারি থেকে দু-বার পেয়াদা এসেছিল ডাক্‌তে।

লক্ষ্মণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লে—আর নায়েব-কাছারী! খাজনার জন্য যে কটা টাকা রেখেছিলুম কলকাতায় যেতে আসতেই তো তার অর্ধেক খরচ হোয়ে গেল। এখন কেটে ফেল্লেও আর একটি পয়সা বেরুবে না।

লক্ষ্মণের মা তাকে তাড়া দিয়ে বল্লে—যা তুই নাইতে যা, আমি ভাত চড়িয়ে দিয়েছি।

সন্ধ্যের পর লক্ষ্মণের বাড়ীর সামনে মাঠের ওপর দলে দলে লোক এসে জুটতে লাগলো। পঞ্চায়েতের খবর সদাশিব চৌধুরীর কানে সন্ধ্যের আগেই গিয়ে পৌঁছেছিল। তিনি দশ-বারো জন পাইক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ; কিন্তু তারা ফিরে এসে খবর দিলে যে, সেখানে প্রায় দুশো লোক জমায়েৎ হয়েছে। দু-দশ জন পাইকের কর্ম নয়, তাতে ঘায়েল হবার সম্ভাবনা আছে। সংবাদ নিয়ে নায়েব তাদের নিজের কাজে যেতে বলে নিশ্চিন্ত মনে ঘরে গিয়ে বসলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ নিবিড় হোয়ে এসেছে। লক্ষ্মণের চালা-বাড়ীর সামনে মাটির ওপর সব লোক বসে গিয়েছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, কেউ মাথা নাড়লে তবে বুঝতে পারা যায় যে লোক আছে। লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে সবাইকে সম্বোধন কোরে বল্লে—বন্ধু সব, একটা কথা জানাবার জন্য তোমাদের আজ এখানে ডেকেছি—

অনেকগুলো গলা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—বল, তোমার কথাই আমরা শুনবো—আমরা আর কাউকে জানি না—

লক্ষ্মণ বল্লে—সবার আগে তোমাদের জানিয়ে রাখি, আমি যে জন্য কলকাতায় গিয়েছিলুম সে কাজ কোরে আসতে পারি নি। জমিদার বলে দিয়েছেন খাজনা দিতেই হবে—না দিলে বাস তুলতে হবে। তার ওপর জমিদার আমায় জুতো মেরে বাড়ী থেকে বের কোরে দিয়েছে।

—কি বল্লে। জুতো মেরেছে?

একজন লোক দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—জুতো মেরেছে?

জুতো মারার কথা শুনে সবার মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সারা পড়ে গেল। কেউ বলতে লাগলো—গরীব বলে জুতো মারবে? কেউ বল্লে—আস্পর্ধা দেখেছো?

দেখতে দেখতে সবাই উত্তেজিত হোয়ে তৃণাসন ছেড়ে উঠে পড়লো। সকলের মুখে এক কথা—কিছুতেই খাজনা দেবো না—

হঠাৎ তাদের সকলের গলা ছাপিয়ে লক্ষ্মণের গলা উঠলো—শান্ত হও. মিথ্যে আস্ফালন কোরো না।

লক্ষ্মণের কথা শুনে আবার তারা বসে পড়লো, সভাক্ষেত্র আবার নীরব।

লক্ষ্মণ বল্লে—ভাই সব, আমরা গরীব, আমাদের দু-বেলা পেট ভরে অন্ন জোটে না—

অন্ধকারের বুক চিরে সহস্র বৎসরের ক্ষুধা করুণস্বরে আর্তনাদ কোরে উঠলো—গরীব, ভাই আমরা বড় গরীব ; পেট ভরে খেতে পাই না আমরা—

লক্ষ্মণ বলতে লাগলো—চুপ করো, আগে আমার কথা শেষ হোতে দাও। আমরা গরীব বটে, কিন্তু একবার ভেবে দেখো, আমরাই পৃথিবীর সমস্ত লোককে লালন-পালন করছি। মানুষের জ্ঞান হবার আগেই আমরা তাদের আনন্দের জন্য খেল্‌না তৈরি কোরে রাখি, তাদের সুখের জন্য দোল্‌না তৈরি কোরে দিই ; নিজের ছেলে ফেলে রেখে ধনীর ছেলেকে আমরা বুকে কোরে মানুষ করি। আমরা প্রাণপণ যত্নে খাবার তৈরি কোরে নিজে অনাহারে থেকে তাদের মুখের কাছে আমাদের অন্ন ধরে দিই। সমস্ত জীবন ধরেই তাদের বিলাসের সামগ্রী জুগিয়ে চলি। তারা মরে গেলে আমরা গরীবরাই তাদের শ্মশানে মুর্দাফরাসের কাজ করি। আমরা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের এইভাবে সেবা কোরে চলেছি। এর বিনিময়ে আমরা ধনীর কাছ থেকে দাম পাই বটে, কিন্তু আমরা যে বিশ্বস্ততার সঙ্গে যুগ যুগ ধরে তাদের ষোড়শোপচারে পূজো কোরে আসছি—তার পুরস্কার আমরা কি পেয়েছি—তাদের কাছ থেকে?

অন্ধকারের মধ্যে থেকে কে একজন লাফিয়ে উঠে বল্লে—জুতো—তার বদলে জমিদার তোমায় জুতো মেরেছে।

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে লক্ষ্মণ বল্লে—ঠিক বলেছো ভাই, আমাকে জুতো মেরে জমিদার সমস্ত গরীবকে জুতো মেরেছে। প্রাণদাতা, অন্নদাতাদের প্রতি সে এইভাবে তার কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছে।

—কিন্তু আর আমরা সইবো না—

—না, আর সহ্য করবো না, জমিদার বলেছে খাজনা দিতেই হবে, নায়েব বলেছে মাথট না দিলে মাথা যাবে—আমরা মাথাই দেবো।

—হ্যাঁ আমরা মাথাই দেবো, মাথট দেবো না। টাকা না থাকলে কোথা থেকে দেবো! পেটে খেতে পাচ্ছি না খাজনা দেবো কোথা থেকে!

সেদিনকার পঞ্চায়েতে ঠিক হোয়ে গেল, খাজনা কেউ দেবে না।

পরদিন সকালে লক্ষ্মণ কাজে বেরুচ্ছে এমন সময় কাছারী থেকে দু-জন পাইক এসে লক্ষ্মণকে ডেকে নিয়ে গেল। নায়েব আগেই জমিদারের কাছ থেকে হুকুম পেয়ে ঠিক হোয়ে বসে ছিলেন, তার ওপর লক্ষ্মণ যে তাঁকে অবজ্ঞা কোরে জমিদারের কাছে গিয়েছিল ও সেখান থেকে ফিরে এসে পঞ্চায়েত করেছিল, এ সমস্ত সংবাদই তিনি পেয়েছিলেন। লক্ষ্মণ আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি, পঞ্চায়েতে কি ঠিক হোলো? খাজনা দেবে?

লক্ষ্মণ ধীরভাবে বল্লে—আজ্ঞে খাজনা দেবার শক্তি আমাদের নেই, সে কথা তো আগেই জানিয়েছি।

নায়েব তাকে কোনো কথা না বলে হাঁক দিলেন—পদারৎ!

ডাক শুনে দু-তিন জন যমদূতের মত হিন্দুস্থানী এসে লক্ষ্মণকে ঘিরে দাঁড়ালো।

নায়েব বল্লেন—লে যাও ইস্কো।

হুকুম পাওয়া মাত্র তারা লক্ষ্মণকে ধরে নিয়ে গেল। কয়েক মিনিট পরেই তার আর্তনাদে কাছারী-বাড়ী ঝন্‌ঝনিয়ে উঠলো—বাবা গো, মেরে ফেল্লে গো—

দেখতে-দেখতে হাড়িপাড়ায় ও মুচিপাড়ায় খবর রটে গেল যে, জমিদারের পাইক এসে লক্ষ্মণকে ধরে নিয়ে গেছে, আর তার ওপরে অমানুষিক অত্যাচার হচ্ছে।

খবর পেয়ে উদ্ধব ছুটে কাছারী-বাড়ী গেল। একটু দাঁড়িয়ে থাকতে না থাকতেই সে বাপের আওয়াজ পেলে—ও বাবা গেলুম—

সে ছুটে বাড়ী এসে তার ঠাকুরমাকে বল্লে—মা, জমিদারের লোকেরা বাবাকে মেরে ফেল্লে।

লক্ষ্মণের লোকেরা অসহায়ের মত চারিদিকে ছুটোছুটি কোরে বেড়াতে লাগলো। কি করবে, কি করলে লক্ষ্মণকে এই অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে পারা যায়, কেউ স্থির করতে পারলে না। লক্ষ্মণের মাকে নানা লোকে নানা কথা বলে যেতে লাগলো।

কেউ বল্লে—তাকে খুন কোরে মহানন্দায় ভাসিয়ে দেবে।

কেউ বা বল্লে—জমিদারের সঙ্গে কি এঁটে ওঠা যায়—

লক্ষ্মণের মা এই আশীবছর ধরে একটা দুটো কোরে পয়সা জমিয়ে সতেরোটা টাকা জমিয়েছিল। বৃদ্ধা বিকেল নাগাদ টাকা সমেত সিঁদুর-চুপ্‌ড়ীখানা নিয়ে ছুটে গিয়ে সদাশিব চৌধুরীর পায়ে ধরে দিয়ে কেঁদে পড়লো—নায়েব মশায়, এই টাকা নিয়ে আমার নখেকে ছেড়ে দাও। আর যা পাওনা থাকবে আমি বৌমার তাগা বিক্রি কোরে শোধ কোরে দেবো।

নায়েব গম্ভীর ভাবে টাকা গুণে দেখলেন যে, চুপড়ীতে সতেরোটি টাকা আছে। নিতি খাজনা, মাথট, জরিমানা ইত্যাদি হিসাবে সব কটি টাকা নিয়ে লক্ষ্মণকে ছেড়ে দিতে হুকুম দিলেন।

বৃদ্ধা আজন্ম-সঞ্চিত টাকাগুলোর বদলে ছেলেকে ফিরে পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

লক্ষ্মণকে যখন ছেড়ে দেওয়া হোলো, তখন সে আর দাঁড়াতে পারছে না। প্রহারে সমস্ত অঙ্গ জর্জরিত, বেদনায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত কন্‌কন্ করছে। কোনো রকমে সে বৃদ্ধা জননী ও উদ্ধবের ওপর ভর দিয়ে বাড়ী এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

তখনো সন্ধ্যা হয় নি, বাইরে একটু আলো আছে। লক্ষ্মণের ঘরের মধ্যে একটু একটু কোরে সন্ধ্যার আবছায়া ঘনিয়ে উঠছিল। মূর্ছিতপ্রায় বাপের মাথায় উদ্ধব জলপটি লাগিয়ে দিয়ে তাকে ধীরে ধীরে বাতাস করছিল আর ভাবছিল। কত কথাই ভাবছিল তার কিছু ঠিক ঠিকানা নাই। লক্ষ্মণের কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে তাকে ঘুমন্ত মনে কোরে সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে নায়েবের কাছারীর দিকে ছুটলো। কাছারীর কাজ তখন শেষ হোয়ে গিয়েছে, নায়েব ও আরও দু-তিন কর্মচারী নিয়মমত সান্ধ্য-রসায়ন পান কোরে মেজাজটা একটু প্রফুল্ল করবার চেষ্টা করছেন। সদাশিবের মেজাজ আজ ভারী খুসী, লক্ষ্মণ শায়েস্তা হয়েছে, এখন আর কেউ খাজনা ফেলে রাখতে সাহস করবে না—এই ভেবে। এমন সময় উদ্ধব সেখানে গিয়ে হাজির হোলো। নায়েব তাকে দেখে একটু হেসে বল্লেন—কে রে? কি চাস এখানে?

উদ্ধব উদ্ধতসুরে বল্লে—তোমরা আমার বাবাকে মেরেছো কেন?

নায়েব চক্ষু বিস্ফারিত কোরে জিজ্ঞাসা করলেন—কে রে তুই? লক্ষ্মণ মুচীর ছেলে না?

—হ্যাঁ, তোমরা আমার মাকে ফাঁকি দিয়ে টাকা চুরি করেছো,—চোর কোথাকার—

তবে রে! বলে নায়েব টলতে টলতে উঠে এসে উদ্ধবের গালে এক চড় কষিয়ে দিলে। উদ্ধব ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ে গেল। কাছেই তামাক সাজবার জন্য আগুন-ভরা একটা

মালসা ছিল, উদ্ধব উঠেই সেই মালসাটা তুলে নায়েবকে লক্ষ্য কোরে ছুঁড়ে মারলে। মালসা নায়েবের গায়ে পড়লো না বটে, কিন্তু দপ্তরের ফরাশের ওপর আগুন পড়তেই সেখানে একটা হৈ চৈ বেধে গেল ;—সামাল সামাল। দরোয়ান, চাকর চারিদিক থেকে বেরিয়ে উদ্ধবকে ধরে ফেল্লে। তারপর তার ওপরে কীল, লাথি। শেষে মূর্ছিতপ্রায় উদ্ধবকে টেনে নিয়ে গিয়ে তারা কাছারী-বাড়ীর বাইরে ফেলে দিলে।

বাইরে বেরিয়ে দু-এক-পা যেতে না যেতেই সে অজ্ঞান হোয়ে একটা ঝোঁপের পাশে পড়ে গেল।

উদ্ধবের যখন জ্ঞান হোলো তখন অন্ধকার, চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার! নিশীথিনী হাজার পাঁয়জোর পায়ে দিয়ে পৃথিবী দাপিয়ে ছুটে চলেছে—ঝম্ ঝম্ ঝম্। উদ্ধব কোনো রকমে নিজের দেহটাকে টেনে নিয়ে সেই ঝিল্লী-মুখরিত বনপথ দিয়ে বাড়ী ফিরে চল্লো—মুচীর ছেলে—গরীবের ছেলে! বাড়ীর দরজা খোলা ছিল, সে দেয়ালে ভর দিয়ে কোনো রকমে লক্ষ্মণের ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। এমনিতেই সে চোখে দেখতে পাচ্ছিল না, তার ওপরে ঘরের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার ; তার মনে হোতে লাগলো বাইরের যত অন্ধকার যেন তার সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে দাঁড়ালো, তারপর একখানা হাত বাপের বুকের ওপর রেখে ডাকলে—বাবা!

ঘুমন্ত লক্ষ্মণ চমকে উঠে তার দু-খানা আহত হাত দিয়ে উদ্ধবের হাতখানা চেপে ধরে বল্লে—কে উদ্ধব? কোথায় গিয়েছিলি বাবা?

উদ্ধবের গলাটা কে যেন দু-হাতে চেপে ধরতে লাগলো। অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে সে বল্লে —ওরা আমায় মেরেছে বাবা—বড্ড মেরেছে—

লক্ষ্মণ উদ্ধবকে পাশ থেকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে তার জ্বরতপ্ত দেহ দিয়ে পুত্রের বেদনা শুষে নিতে লাগলো।

আশ্বিন ১৩২৯

ঝরা পাতা

গোকুলচন্দ্র নাগ

কি ভাব্‌ছ?

বিশেষ কিছুই না।

তবে অমন করে আছ কেন?

বিশ্রী কোন রকম একটা ভাব আমার মুখের ওপর ফুটে আছে না কি?

বিশ্রী কি সুশ্রী, তা জানি না ; কিন্তু তোমার মুখের দিকে তাকাতে পারছি না, সে আর...

তাকিও না।—ইচ্ছে করে নিজেকে অসুবিধেয় ফেলবার দরকার?

কি হয়েছে তোমার?

এমন কিছুই ত না।—ব্যস্‌! অমনি চোখ ছল্‌ছল্‌ করে এল...

কি করেছি আমি?

আর আমিই বা কি করেছি?—বোস, উঠে যেয়ো না।

ভাল লাগ্‌ছে না যে কিছু!

সে আর এমন আশ্চর্যের কি?—আমারও ত ভাল লাগে না কিছুই।...

কেন এমন হল?...

জানি না।

কি কর্‌ব আমি?...

ঠিক ঐ কথাটা আমিও ভাবি,—কি করব আমি...ঐ ছোট্ট কথাটার মধ্যে কি বিরাট একটা শূন্যতা আছে জানি না!...ভেবে ভেবে এমন কিছুই এখনও বার করতে পারিনি, যাকে আশ্রয় বলে ধর্‌তে পারি,—একটা কুটোর মতও না!...কি করব আমি?...কি দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছি আমার জগতকে!—কিছু নেই!...কেউ নেই!...মনে হয় তুমিও নেই আমার কাছে!—না, অমন কোর না তুমি। আমার যা মনে হচ্ছে, আমি তাই বল্‌ছি। এগুলোকে আমার শুধু কল্পনা ভেবো না।—দেখ আমাকে কষ্ট দিতে তোমার খুব ভাল লাগে,—না?

কি করেছি আমি?—

কি করেছ!...আমার চোখের সাম্‌নে বসে কাঁদ্‌ছ...তোমার চোখ ছাপিয়ে, গাল বেয়ে পড়ছে জল!...এ আমি দেখ্‌ছি। ঐ জলের ফোঁটাগুলো যে আমারই বুকের রক্ত...ওরা বেরিয়ে যাবার সময় আমার—

আর বোল না—আমি পার্‌ব না শুন্‌তে...আমায় দয়া কর—

মোছ চোখের জল।

তুমি মুছিয়ে দাও।...

না।

না?...কি চমৎকার কথাটা! ভারি মিষ্টি!...বুক ভরে গেল আমার,—কিন্তু আমিও পার্‌ব না।—ঝরুক যেমন ঝর্‌ছে।

ঠিক বলেছ! এত সহজ কথাটা আগে মনে হয় নি!...ঝরুক যেমন ঝর্‌ছে...বন্ধ করাটা

ঠিক নয়—তা সে চোখের জলই হোক, আর বুকের রক্তই হোক—ঝরুক যেমন ঝর্‌ছে।...

আরো কত দিন এমন করে চল্‌বে?

ও কি! এরি মধ্যে এত অসহ্য লাগ্‌ছে...মনে রেখো তোমার বয়েস—

মনে আছে বলেই ত বল্‌ছি।—কি করে কাটাব সমস্ত জীবনটা ;...তবে আমার সান্ত্বনা এই—যত দুঃখই পাই, সেটা তুমি আমার সঙ্গে ভাগ করে নেবেই।

কি করে বুঝলে—ইচ্ছে করে আমার সুখ-স্বার্থ ছেড়ে তোমার সঙ্গে দুঃখের বোঝা বয়ে বেড়াব, এমন কোন প্রতিজ্ঞা ত করিনি আজ পর্যন্ত—

তাই ত আমার ভরসা হচ্ছে।—প্রতিজ্ঞা কর্‌লে হয় ত তোমার ওপর এতটা নির্ভর করতাম না।

চমৎকার যুক্তি কিন্তু!...

তা যা'ই বল। তোমার কাছে আমি এমন জিনিস পেয়েছি, যা মানুষের মুখের কথার চেয়ে অনেক বড়—যার সমান আর কিছুই নেই।

সে আবার কি?...

তোমার চোখের দৃষ্টি।—ওরা আমায় সব বলে দেয়। মুখের কথা অনেক শুনেছি—ভুলেও গেছি।

এ দৃষ্টিও পার্‌বে এক দিন ভুল্‌তে—

না।

না?...কি করে জান্‌লে?...

তা জানি না ; কিন্তু যে মুহূর্তে তোমায় দেখেছি, সেই মুহূর্তেই মনে হয়েছে আমার ও-কথা ;—কিন্তু সব চেয়ে কষ্ট পাই কিসে জান?

কিসে?

অভিনয় করতে।—নিজের সমস্ত হীনতার ওপর ঝুটো আভরণ চড়িয়ে, প্রতিদিন মানুষের চোখের সাম্‌নে ভেসে বেড়ান...আমার ক্ষুধিত আত্মার কান্নার ওপর মিথ্যে হাসির ঢেউ খেলিয়ে, মন ভুলিয়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটান।...আমার এই অভিনয়ের সময় তোমাকেও হারাই...তখন আমার মত অসহায় এ পৃথিবীতে আর কেউ থাকে কি না জানি না।...তুমি বুঝ্‌বে না আমার ব্যথা—

না, কি করে বুঝ্‌ব?—অন্তত তুমি যদি ঐ ভেবে একটু শান্তি পাও, তা হলে ভাব্‌তে পার—আমার আপত্তি নেই।

রাগ কর্‌লে?...

না।

ঐ যে তোমার চোখ রাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌ল।...

ভয় নেই। আমার চোখ খুব পোষ-মানা। তোমার চোখের মত অবাধ্য নয়।...রাঙ্গা হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত, ঝরে না কোন দিন।...মনে হয়, ওর মধ্যে জল বলে কিছু আর নেই ;...শুক্‌নো—শুধু জ্বালা করে,...অমন অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলে যে আমার মুখের দিকে?

দেখ্‌ছি তোমাকে।...

পুরোনো হয়ে যাইনি তা হলে এখনও?...

বল্‌ব না—যাও। কিন্তু একটি কথার জবাব দেবে আমার?

কি?

তুমি শুন্তে পেয়েছিলে?...

শাঁখের শব্দ?—পেয়েছিলাম।

আশ্চর্য!—না?...

না, আশ্চর্য আর কি?

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কি করে হল?...

ওটা হওয়ার দরকার ছিল তাই ;—তোমার মনে আছে সব কথা?

মনে থাক্‌বে না?...সে কি ভুল্‌ব কোন দিন?—আমরা এসে পড়েছিলাম মাঠের ধারের পথটির মাঝখানে...কুয়াসায় সমস্তই ঢাকা পড়েছে।...নিস্তব্ধ চারিধার। অনেক দূর দিয়ে কা'রা গান করতে করতে যাচ্ছিল। তারই শব্দ শুধু ভেসে আস্‌ছিল। গাছটির নীচে, যেখানে অন্ধকার জমাট বেঁধে পড়েছিল, সেইখানে এসে তুমি দাঁড়ালে...আমার চলাও থাম্‌ল...

—তোমার একখানি হাত আমার মুখের ওপর দিয়ে গিয়ে আমার বুকের ওপর এসে পড়েছিল...আর একখানি হাত ছিল আমার মাথাটিকে ধরে, মনে আছে তোমার?...

না, তবে, তোমার মুখখানিকে তুলে ধরতেই, পাতার ফাঁক্ দিয়ে অল্প একটুখানি চাঁদের আলো তোমার কপালের ওপর এসে পড়েছিল দেখেছি...

তোমারও মাথার চুলে আর ডান দিক্‌কার গালে সে আলো লেগেছিল...আমি আর তাকিয়ে থাক্‌তে পার্‌লাম না।...আবার যখন এই মাটীর পৃথিবীতে ফিরে এলাম, তখন শুনি —শাঁখ বাজ্‌ছে!...

—কে আমাদের বরণ করে নিল?—অমন চম্‌কে উঠ্‌লে কেন?...কোথা যাচ্ছ?—

বাইরে।

বাইরে কোথায়?...

তা কি করে বল্‌ব?—যেখানে খুসী!...

যেখানে খুসী?...তুমি পার চলে যেতে?...পথে তোমার কোন বাধা নেই?...

না। ঐ পথে আমার একমাত্র মুক্তি—ওখানে আমার কোন বাধা নেই—আমি চলে যেতে পারি।

আর আমি?...

আশ্বিন ১৩২৯

আরোহণ ও অবরোহণ

জগদীশ গুপ্ত

যথোচিত চিন্তা করিয়া মহেন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে প্রস্তাবিত কাজটি যদি করা যায় তবে তাহা অসমীচীন হয় না। মহেন্দ্রনাথ স্বয়ং চিন্তা করিয়াছেন-- উপরন্তু তাঁর হিতৈষী বন্ধুগণও ঠিক্ তাঁরই মত যথোচিত চিন্তা করিয়া প্রস্তাবিত কাজে দুর্লঙঘ্য আপত্তির কারণ কিছুই দেখিতেছেন না।

একটিমাত্র আপত্তির কারণ যা আছে বলিযা মনে করা হইয়াছিল তাহাই আপত্তিজনক এবং তাহা এই যে, প্রস্তাবানুযায়ী কার্য করিলে এক-ঘর কুটুম্ব কমিয়া যাইবে অর্থাৎ বাড়িলে বাড়িতে পারিত কিন্তু বাড়িবে না।

কিন্তু কুটুম্ব বাড়িবার কথায় একটা বিদ্রূপাত্মক হাসির শব্দই উঠিল...

মহেন্দ্রনাথের বন্ধু দীনবন্ধু দত্ত বলিয়া উঠিলেন ঃ ছোঃ! তারপর ঠোঁট বাঁকাইয়া একটু হাসিলেন এবং তারপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুটির দৃষ্টি শাণিত করিয়া ভ্রূভঙ্গীপূর্বক বলিলেন-- কুটুম্ব বাড়িয়ে ত ঢের মজা হে! তিনটি কন্যা আর দুটি পুত্রের বিয়ে দিয়েছি--কুটুম্ব হয়েছে পাঁচ ঘর--শুন্‌তে ভারি মধুর, নয়? ঐ কুটুম্বদের আবার ডালপালা আছে--শাখাপল্লবে ছত্রাকার হয়ে সংসারময় ছড়িয়ে তাঁরা আমার মাথার উপর বিরাজ করছেন। মাথায় আমার তাপ লাগ্‌বার উপায় নেই। সুখ কত!... কুটুম্বের কেবল দাবি খাতির করো, আর যত পারো দাও আর খাওয়াও--বলিয়া দীনবন্ধু কুটুম্বিতা রক্ষার অর্থাৎ অন্যায় চাপের দরুণ একটি সশব্দ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সখারাম বলিলেন, ভারি একটা নিঃশ্বাসই ফেল্‌লে যে হে!

--তা ছাড়া আর উপায় কি! নিঃশ্বাসে যে শব্দ হয় তার বেশি শব্দ করতে পারিনে যে। না আছে কুটুম্বগণের মরণ, না আছে আমার মরণ।

দীনবন্ধুর এই কথায় হাসির শব্দ উত্থিত হইল।

দীনবন্ধুই পুনরায় বলিলেন, দিন-কাল যা দাঁড়িয়েছে, আর পাওনার দিকে মানুষের যেমন চোখ ফুটেছে তাতে কুটুম্ব যত কমে ততই সুখ।

কুটুম্বের সংখ্যাবৃদ্ধি যে নিছক্ আনন্দের কথা নয়, অতঃপর সবাই তা স্বীকার করিলেন।

কথাটা এই ঃ

মহেন্দ্রনাথের দুটি কন্যা সতী এবং উষা যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া একই সঙ্গে বিবাহযোগ্যা হইয়াছে--সতীর বয়স উনিশ, উষার বয়স সতের ; এবং মহিমগঞ্জের ইন্দ্রনাথবাবু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোরঞ্জনের জন্য সতীকে দেখিতে আসিয়া উষাকেও পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছেন--দেখিবার আয়োজন করিয়া দেখেন নাই, তবু পছন্দ করিয়া আসিয়াছেন ; পত্রে তিনি আরও লিখিয়াছেন যে তিনি তাঁর দুটি পুত্রেরই বিবাহ একই সঙ্গে দিতে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছেন--পূর্বে অভিলাষী ছিলেন না, মেয়ে দুটিকে দেখিবার পর অভিলাষী হইয়াছেন ; কারণ দুটি কন্যাই উত্তম, এমন কি অনুপম। মহেন্দ্রনাথের যদি অমত না থাকে তবে কথাবার্তা চালানো যাইতে পারে এবং তদনন্তর যুগলবধূকে একত্রেই গৃহে আনয়ন করা যাইতে পারে...

এই পত্র পাওয়ার পরই কুটুম্বের সংখ্যা-হ্রাসের অর্থাৎ সামাজিক বৃদ্ধি হানির আপত্তি

চাঞ্চল্যকর হইয়া উঠার উপক্রম হইয়াছিল ; মহেন্দ্রনাথ সামান্য দ্বিধাবোধ করিতেছিলেন, কিন্তু কুটুম্বগণের কিংবা ন্যূনকল্পে স্বীয় মৃত্যুকামনা করার সঙ্গে সঙ্গে একটি শোকনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া দীনবন্ধু সে আপত্তি আর দ্বিধা প্রায় ভস্মীভূত করিয়া দিলেন।

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন—দীনবন্ধু নেহাৎ মিছে বলে নাই।

তারপর আলোচনা আর হিসাব করিয়া দেখা গেল, কন্যার বিবাহের মত বৃহৎ ব্যাপার অপেক্ষাকৃত সুলভে সম্পন্ন নিশ্চয়ই হয় যদি ঐ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া দুটিকেই এক-সঙ্গে, সখারাম বলিলেন "পার করা যায়।"

ব্যয় হ্রাসের জায়-তফ্‌সিলও মুখে মুখেই খতাইয়া দেখা হইল ঃ

প্রীতিভোজ, বরানুগামী ভদ্রমহোদয়গণের আপ্যায়ন, গৃহে আত্মীয়সংগ্রহ প্রভৃতির খরচ দু বার বহন করিতে হইবে না—

দীনবন্ধু বলিয়া উঠিলেন—বিয়ে বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন যারা আসে, বাপ্‌ রে তাদের খিদে কত!...যাক্, তারপর?

তারপর, চেষ্টা করিলে পণ প্রভৃতি কিছু কমানো যাইবে না এমন নয় ; কারণ, একই ব্যক্তির নিকট হইতে দুই পুত্রের জন্য দ্বিগুণ আদায় না করিয়া ভদ্রলোক দেড়ামাশুলেই সন্তুষ্ট হইবেন আশা করা যায় ; কারণ চক্ষুলজ্জা সবারই কিছু আছে।

তারপর গার্হস্থ্য প্রীতি ও শান্তির উল্লেখ করিয়া তারাপদ বলিলেন, দুই ভগিনীর পরস্পরের মধ্যে যে প্রণয়বন্ধন বিদ্যমান্ জা সম্পর্ক দাঁড়াইলে তাহা দৃঢ়তর হইবে—তাহা না হইলেও সহসা তা ছিন্ন হইবে না ; কারণ ঈর্ষার উদ্ভব হইলে উহারা সংবরণ করিবে, কর্তৃত্ব লইয়া কলহ করিবে না এবং অপরিচিত ব্যক্তি নহে বলিয়াই সন্দেহের চক্ষে দেখিবে না ; পিতৃশাসনের ভয়েই ত্যাগ এবং আনুগত্য স্বীকারে কাহারও অনিচ্ছা প্রকাশ পাইবে না—ইত্যাদি।

তারপর বিবেচনার বিষয় হইল, পারিবারিক উত্থানপতন। উহা আছেই। একই সঙ্গে দুই ভগিনীর উত্থানপতন ঘটিবে ; কিন্তু স্বতন্ত্র স্থানে বিবাহ হইলে তাহা ঘটে না—নিজের নিজের অদৃষ্টই প্রবল হইয়া থাকে...

দীনবন্ধু বলিলেন, এ বিঘ্ন মারাত্মক নয়—দুই ভগিনী যদি সতীন হ'য়ে যায় তবে সেইটাই হয় ভয়ঙ্কর ; কিন্তু তাও লোকে দিত এবং বোধ হয় দিচ্ছেও।

শচীপতি বলিলেন—এ-ক্ষেত্রে পতনের কারণ কিছু দেখ্‌ছিনে—উন্নতির লক্ষণই ষোল আনা। দু ভাইই বিশেষ শিক্ষিত, উপার্জনে অক্ষম তারা কোনো দিনই হবে না। বাপের টাকা দু ভাগ হলেও ক্ষতি নেই—এক এক অংশে বিস্তর পাবে!...তার উপর ভেবে দেখ, ছেলের ধাপ্পাবাজ বাবা মেয়ের বাপ্‌কে ঠকিয়ে দাঁও মেরেছে, এ-দৃষ্টান্তও কম নয়—সম্পত্তি দেখায়, কিন্তু সে সম্পত্তি অন্যত্র আবদ্ধ ; ছেলে চরিত্রহীন। এমনতরো ঘটে না কি?

—ঘটে। সবাই সমস্বরে স্বীকার করিলেন।

দীনবন্ধু লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—লাখো লাখো।

শচীনাথ বলিলেন—তবে?

অর্থাৎ অভিজাত এবং ধন-সম্পন্ন আর নিষ্কলঙ্ক পরিবারে উভয় কন্যার বিবাহ দিতে দ্বিধা বোধ করিতেছ কেন?

মহেন্দ্রনাথের স্ত্রী কালিদাসীর প্রাণে আনন্দ উত্তাল হইয়া কল্লোলিত হইতেছে...এই যোগাযোগ যে ঘটিতেছে তাহার কারণ মেয়েদের পয়, না পূর্বপুরুষের পুণ্য, না দেবতার আশীর্বাদ, না কি এ? কালীদাসী চিন্তা করিয়া কূল পাইতেছেন না—

কিন্তু টাকা ; এইখানটায় একটু নরম হইয়া কালিদাসী বলিলেন—কিন্তু টাকার বেলায়

কিছু ছাড়বে ব'লে মনে হয় না। ছেলের কি পাইকারী দর আছে?

মহেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন—দাঁড় করাতে হবে। ছেলে দুটিই ভালো।

শুনিয়া কালিদাসীর নূতন করিয়া এত আনন্দ জন্মিল যে মুখ দিয়া কথাই বাহির হইল না—কথা এবং আনন্দ চোখের পথে উপচিয়া পড়িতে লাগিল...

মহেন্দ্র জানিতে চাহিলেন, এখানে ওরা চুলোচুলি করে না ত?

কালিদাসী বলিলেন—খেপেছ! গলায় গলায় ভাব।

শুনিয়া মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইলেন।

ইহা সত্যই যে, ছেলে দুটিই ভালো—

ইন্দ্রনাথের বড় ছেলে মনোরঞ্জন কৃতিত্বের সহিত এম্, এ, পাশ করিয়া বছরখানেক্ হইল সরকারী চাক্‌রিতে প্রবেশ করিয়াছে। বর্তমানে তাহার বেতন পঁচাত্তর টাকা—দ্রুত পদোন্নতি হইবে, মুরুব্বিগণ আশা দিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞানরঞ্জন এম্. এ. পড়িতেছে—মেধাবী ছাত্র বলিয়া তার সুনাম আছে ; তারও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—মুরুব্বিগণ তাহাকেও পদান্বিত করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন...

কালিদাসী এবং তাঁর সঙ্গিনীগণের বিশেষ আনন্দ এই যে, উল্টা কথা যে যতই বলুক, চাকরিতে দুধ-ভাতের বরাদ্দ অর্থাৎ যথার্থ শিক্ষার উপর লক্ষ্মীকান্ত ভগবানের সুদৃষ্টি এখনও আছে।

মনোরঞ্জন পিতামাতার প্রথম সন্তান। জীবজগতে স্ত্রী চাইতে পুরুষের কলেবর বৃহৎ ; শ্রী সম্বন্ধেও পুরুষই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া অনুমিত। পিতামাতার প্রথম সন্তান আকারে অবয়বে সামর্থ্যে মহত্তর হইলে তাহাকে প্রাকৃতিক নিয়মের সিদ্ধি বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে ; কারণ যৌবনের সহজ এবং আদিতম উল্লাস আর তেজ পূর্ণতম প্রভাব লইয়া দেখা দেয় প্রথম সন্তানের দেহেই। এই নিয়মের বশেই হউক, কিংবা দৈবাৎই হউক মনোরঞ্জন জ্ঞানরঞ্জনের চাইতে উৎকৃষ্টতর—

কিন্তু এদিকে দেখিতে ভালো উষা—মহেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা—দ্বিতীয়া কন্যা তাঁর তৃতীয় সন্তান। বড় মেয়ে সতীর বর্ণও খুবই উজ্জ্বল, সে-ও গৌরাঙ্গিনী ; তবু একটুখানি ছায়া-ম্লানিমা যেন তার রঙের উপর আছে—তা লক্ষ্য করিবার মত নয়, কিন্তু আছে বলিলে তা অস্বীকার করা চলে না। উষার রং আরও সুশ্রী—মুখখা৹ আরও ভালো—ছাঁদে খুঁত নাই ; কিন্তু সতীর মুখখানা একটু ভাঙ্গা-ভাঙ্গা-মত—চুপসে যাওয়ার আভাসটি হঠাৎ চোখে পড়ে না, কিন্তু মন দিয়া দেখিলে তা ধরা যায়। সতীর দৃষ্টি যেন, ভাববঞ্চিত বহির্মুখ ; উষার চক্ষু চমৎকার ভাবময়—নিবিড়-পক্ষের ছায়ার অভ্যন্তরে তার চক্ষু দুটি যেন মুকুলিত হইয়া আছে ; তার নিবিড়তার চক্ষু দুটির দৃষ্টি তীরের মত ছুটিতে জানে না—মনে হয়, সে দেখিতেছে ভাসা-ভাসা ভাবে, যাহাকে দেখিতেছে তাহাকে প্রীতিসিঞ্চিত করিয়া। কেহ কথা বলিলে সেই কথা শুনিবার অপরূপ একটি ভঙ্গিমা তার আছে—চোখের এবং গ্রীবার ; তার ঐ ভঙ্গিমাকে বাহন পাইয়া বক্তার বচন যেন সহজেই মনোরম হইয়া ওঠে। কিন্তু কণ্ঠস্বর সতীরই মধুরতর—আলাপের বেলায় তার ভীরু সুরকূজনের আবেশটুকু যেমন নিরীহ তেম্‌নি কোমল লাগে, আর তা প্রাণের অনুব ·ান দিয়া গ্রহণ করার মত।...সতীর চুল লম্বা বেশি, উষার চুল গাঢ় বেশি ; কিন্তু সকলের চাইতে লক্ষ্য করিবার মত উষার পদপৃষ্ঠ—ঠিক্ ততটা মাংসল যতটায় শিরাজাল কেবল আবৃত হইয়া থাকে ; ঐ সুন্দর পদপৃষ্ঠের ক্রমাবনতির শেষ হইয়াছে সুসজ্জ নখমালার প্রান্তে ; একটি ক্ষীণ-কোমল রক্তাভ তার নখমালার শুভ্রতাকে ভারি সরস স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ; অঙ্গুলিগুলি এমনি সুকুমার যে মনে হয়, দৈবাৎ কেহ স্পর্শ করিলে দেখিতে দেখিতে লজ্জাবতী লতার পল্লবের মত বুঝি তারা অনিচ্ছা আর অসুখের বেদনাভরে তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে ; তার পায়ের

গঠনলালিত্যের দরুণ মনে হয়, পৃথিবীর বুকে সে পা পাতিয়া দাঁড়ায় আপনার লোককে অশেষ প্রীতিভরে স্পর্শ দিবার মত করিয়া ; সতী দাঁড়ায় আল্গা হইয়া ; তার পা অত সুন্দর নয়—আঙ্গুলগুলি লম্বাটে।...সতীর ওষ্ঠাধর বিশেষত্বহীন অর্থাৎ ঐশ্বর্য বা গ্লানিজনক কিছু নাই ; কিন্তু উষার তা নয়—তার ওষ্ঠাধরে তার মনের বিলাসী স্তিমিত রূপটি ফুলের গায়ে আভার মত যেন প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। ওষ্ঠের মধ্যস্থলটি একটু বেশি বিস্তৃত, ওষ্ঠপ্রান্তবাহী বন্ধনীর মত সেই রেখাটি একটু বেশি স্পষ্ট, আর অধর একটু চাপা বলিয়াই বোধ হয় অমন মনে হয়।

অমনি ওদের রূপ—

এবং রূপের বিচার দুই ভগিনী মনে মনে করে বই কি! উষা নিশ্চয়ই জানে, দিদির চাইতে সে সুন্দরী...

প্রতিবেশিনীরা চোখে ঝাপ্সা দেখে না, আর তাদের রসনা অলস নহে—পানের ডাবর-বাটার সাম্‌নে বসিয়া মেয়েদের রূপের তুলনামূলক সমালোচনা তারা করিত...

"তোমার উষাই বোন্, দেখ্‌তে আরও ভাল।"

"সতীই বা মন্দ কি!" বলিয়া সতী এবং উষার মা কালিদাসী কন্যার রূপের গরবিনী হইয়া হাসিতেন ; আর, একসঙ্গে চম্‌কিয়া উঠিতেন নয়নতারা, সুখময়ী, গুরুদাসী প্রভৃতি প্রতিবেশিনীগণ...

অসহিষ্ণুভাবে পানের বাটায় একটা ঠেলা দিয়া অগ্রণী নয়নতারা বলিতেন, "মন্দ! মন্দ বল্‌বে কোন্ চোখখাগী! দেশ খুঁজে অমন আর-একটি কেউ আনুক দেখি"!—বলিয়া নয়নতারা পানের বাটা পুনরায় কোলের দিকে টানিয়া লইয়া নিঃশব্দে ধম্‌কাইতে থাকিতেন তাদের—যারা সতীর সম্বন্ধে ঐরূপ বিদ্রোহী মত্ প্রমাণাভাবসত্ত্বেও প্রকাশ করিতে পারে বলিয়া সন্দেহ হয়।

রূপের দিক্ দিয়া সে-ই বড় এমন ব্যাখ্যামূলক উক্তি ঐ রকমে উষা অনেক শুনিয়াছে—বুঝিবার মত বয়স যখন হইয়াছে তখন হইতেই সে শুনিয়া আসিতেছে...কিন্তু সে নির্বোধ নয়, অহংকার তার নাই—

সে বলে—দিদি, তোমার চাইতে আমি নাকি সুন্দর!—বলিয়া হাসিতে থাকে...যারা কাজের অভাবে ঐ অদরকারী বিচারের কাজে গা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া খায় তাদের মতের অকিঞ্চিৎকরত্বের উদ্দেশে সে হাসে।

সতী বলে ঃ তা সত্যিই ত। তোর বিয়েও হবে তেম্‌নি খুব বড় ঘরে।

—তোমার বুঝি গরীবের ঘরে হবে?

গরীবের ঘর কল্পনাতেও আতঙ্কজনক বই কি!

সতী বলে ঃ আচ্ছা ভাই, যদি দাঁত-পড়া বুড়ো হয়?

—তবে তোমার আগে আমি দেব গলায় দড়ি।

—আমার আগে মানে? আমি কি করব তা কি ক'রে জান্‌লি?

—কাঁদবে না?

হঠাৎ লজ্জা পাইয়া সতী বলে ঃ দূর! বলিয়া সে হাসে, উষাও হাসে।

কিন্তু বুড়ো বা গরীবের হাতে ওরা কেউই পড়িল না—একই ধনী ঘরের দুই ভাই মনোরঞ্জন এবং জ্ঞানরঞ্জনের সঙ্গে যথাক্রমে উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল—কিঞ্চিৎদধিক দেড়ামাশুলেই ইন্দ্রনাথ ওদের 'পার' করিয়া লইয়া গেলেন।

মুঠা মুঠা টাকা খরচ করিয়া মহেন্দ্রবাবু বৈবাহিক প্রভৃতিকে প্রকৃত সন্তোষ দান করিলেন...প্রাণভরা যুগপৎ দু'টি জামাই পাইয়া তিনি নিজেও সন্তুষ্ট হইলেন যথেষ্ট ; আর

মেয়েরা দুই বাসরঘরে ছুটাছুটি করিয়া ছুটাছুটির আনন্দে অস্থির হইয়া গেল এবং উঠানের এত মাটি ঘরে তুলিল যে তার ইয়ত্তা নাই।

দুটি বধূরই রূপলাবণ্য মনোমুগ্ধকর—ইন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্ত্রী এত তৃপ্ত হইলেন যে, মনে হইতে পারে ঐ সূত্রেই তাঁদের পরমানন্দের সঙ্গে পরমার্থও লাভ হইয়াছে—তাঁরা ধন্য হইয়াছেন। লোকের মুখে প্রশংসা ধরিল না...মেয়েরা যেন জয়োৎসব সুরু করিয়া দিয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল...

অর্থাৎ বধূদ্বয় আদৃত হইল যৎপরোনাস্তি—

এবং দেখা গেল গার্হস্থ্য কাজে উভয়েই সমান পটু, আদেশ পালনে সমান তৎপর, মুখের কথা আর আহ্বান সমান মিষ্ট ; ইন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্ত্রী আরও মনে হয়, বেশ হইয়াছে, বেশ সাজিয়াছে, যাবজ্জীবনের জন্য লাভবান হইয়াছি—আর, এত ভালবাসিতে ইচ্ছা করে যে তা বলিবার নয়—

অষ্টপ্রহরই ওঁরা গদগদ হইয়া থাকেন...

কিন্তু বউয়েরা চা খায় না ; বলে অভ্যাস নাই। শুনিয়া ইন্দ্রনাথ দুঃখিত হইলেন—প্রিয়জন অকারণে আনন্দে বঞ্চিত হইলে যে দুঃখ জন্মে ইন্দ্রনাথের এই দুঃখ সেই দুঃখ।

বলা বাহুল্য, ইন্দ্রনাথের পরিবার খানিক্ অগ্রগত পরিবার ; তা-ই বলিয়া অসংযম কিছু নাই ; কিন্তু ঘোম্‌টা দিয়া পরিবারেরই ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে অন্তরালের সৃষ্টি করা অযৌক্তিক এবং তাহার মূলে যে গুরু-লঘু-জ্ঞান থাকে তাহা অকারণ বলিয়াই তাঁর মনে হয়...এমন কি, কৌতুক জাগিয়া তাঁর একটু হাসিই পায় যখন তিনি ঘোম্‌টার কথা ভাবেন—আর মেয়েমানুষকে ভারি অপদার্থ ভীরু আর অস্বাভাবিক ক্রূর মনে হয়...ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া যাহাকে দূরে রাখা হয় সে হয়তো তাহার দরুণ একটা নিঃসঙ্গতার বেদনাই অনুভব করে...

এ-সব কথা তিনি প্রকাশ্যেই বলেন—

কিন্তু যা বলেন না তাহা এই যে, মনে হয় ঘোম্‌টা দেওয়া নারী যেন মনে মনে অবিরাম কলহে উদ্যত হইয়া থাকে ; আর, ঘোমটার ইঙ্গিতে ইহাই সে ঘোষণা, এমন কি, স্বীকার করিতে চায় যে পুরুষের সঙ্গে প্রণয়িনী সম্পর্ক ছাড়া আর-কোন সম্পর্ক তার ঘটিতে পারে না ; আর, পুরুষমাত্রেই নির্লজ্জ ত বটেই, দুর্বৃত্তও। পুরুষ সম্বন্ধে এ বিশ্বাস ভ্রান্ত বলিয়া অধুনা অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠিয়াছে এবং বিবর্জিত হইতেছে...

ইন্দ্রনাথ আরও বলেন যে, পারিবারিক মিলনের কেন্দ্রে থাকে চা। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজের নিজের কাজে ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যার পর এবং ঘূর্ণন সুরু হইবার পূর্বে প্রাতঃকালে চা-পান উপলক্ষে সকলের সমবেত হওয়ায় যে-আনন্দ আছে অন্য উপায়ে সে আনন্দ পাওয়া যায় না—

বলেন ঃ অভ্যাস নেই, এই আপত্তি ছাড়া তোমাদের অপর কোনও আপত্তি নেই ত বৌমা?

—না। সতী ও উষা জানায়।

—তবে খেতে সুরু কর।

এম্‌নি করিয়া পুনঃ পুনঃ আহূত এবং অনুরুদ্ধ হইয়া সতী ও উষা চা খাইতে স্বীকৃত হইল ; কিন্তু পুরুষবর্গের সম্মুখে যে ভারি লজ্জা করে!

কিন্তু সে-লজ্জাও তাদের ত্যাগ করিতে হইল—ইন্দ্রনাথ ডাকিয়া লইয়া আসরে বসাইয়া তাদের সে-লজ্জা ত্যাগ করাইলেন...

সতী ও উষা দেখিল ব্যাপারটা ভালই। প্রত্যেকেরই মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া ফিরাইয়া তাদের কৌতুকে আনন্দে রহস্যে উজ্জ্বল মুখ নিরীক্ষণ করা আর আনন্দের অংশ

গ্রহণ করা নিজেরই আনন্দবর্ধনের একটা উপযুক্ত উপায়—মন তাহাতে চমৎকার সরস হয়—আবহাওয়াটা ভারি উপভোগ্য...

কিন্তু তাঁদের চায়ের মজলিস টেবিলে বসে না—রান্নাঘরের পাশে যে খাবার-ঘর আছে সেই ঘরে সবাই পিঁড়িতে বসিয়া খান্—গৃহিণী চা বিতরণ করেন...

ইন্দ্রনাথ ত রীতিমতো আচমনই করেন—আর পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে ভোজ্য ও পানীয়ের মধুময় সারাংশ উৎসর্গ করিয়া দেন।

চা খাইতে খাইতে মনোরঞ্জন একদিন বলিল, মা যদি কোন কারণে কোন দিন অনুপস্থিত থেকে চা না দেয়, তবে আমরা কি ক'রে চা খাব তা'-ই মাঝে মাঝে হঠাৎ ভাবি।

জ্ঞানরঞ্জন বলিল, বৌদি দেবে—মায়ের পরই বৌদি...

অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর স্থান মায়ের অব্যবহিত নীচে ; কিন্তু মনোরঞ্জন আর কথা কহিল না—অনুমোদন করিয়া একটু হাসিলও না, যেন এই সেবাটুকু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার নেই, অথবা সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া গেছে...

উষা ইহা লক্ষ্য করিল এবং পুলকিত না হইয়া পারিল না, কিন্তু পুলকের কারণটি এত অস্পষ্ট যে অলীক বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে—অত্যন্ত আকস্মিক বলিয়াই বোধ হয় মনে মনে তাকে স্বীকার করিতেও বাধিল...

উষা তাকাইয়া দেখিল, সতী যেন একটু লজ্জা পাইয়াছে।

তার পরদিনই ইন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ছোট বৌমার একটা মত নিই। বলিয়া উষার দিকে চাহিয়া রহিলেন...

উষা বলিল—ভালই হবে। বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারি কি-না দেখ্‌ব।

ইন্দ্রনাথের মনে হইল, এই সপ্রতিভ উত্তরটি প্রখর বুদ্ধির লক্ষণ। বলিলেন,—বুদ্ধি তোমার চমৎকার, সে-পরিচয় আমরা পেয়েছি ; কিন্তু এ-টা বুদ্ধি খাটাবার বিষয় নয়, সংসারে থাক্‌তে হ'লে অনুকম্পার বশে ত্যাগ স্বীকার করা কর্তব্য কি-না, সেই সম্বন্ধে তোমাদের একটা মত চাই। বড় বৌমা, তোমারও মত্‌টা দিও। আমার সঙ্গে তোমাদের মত মিল্‌লে বুঝব...বলিয়া ইন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিলেন...ইন্দ্রনাথের ধরণই ঐ—কথার মাঝে হঠাৎ চুপ করিয়া যান।

—কি বুঝ্‌বেন, বাবা? উষা জানিতে চাহিল।

—হ্যাঁ ; না, তা নয় ; তবে বুঝব যে, বিজ্ঞ জুরীর বিচারে চক্ষুলজ্জাই বড়, কি স্বার্থই বড়। গরীব একটি ভাড়াটে আমার ছিল, পাঁচ মাসের বাড়ী ভাড়া না দিয়ে সে অন্য বাড়ীতে উঠে গেছে। নালিশ করেছিলাম—ডিক্রী হয়েছে। এখন বল, ডিক্রী জারি দিয়ে তার ঘটি বাটি ক্রোক করব, না ছেড়ে দেব?

উষা তৎক্ষণাৎ বলিল—ছেড়ে দিন্।

—বড় বৌমা কি বল?

সতী হঠাৎ স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া কি দেখিল কে জানে ; বলিল—উঁ হুঁ, টাকা আদায় ক'রে ফেরত দিন্।

ইন্দ্রনাথ জানিতে চাহিলেন, কেন?

—সে সত্যিই দিতে অক্ষম কি-না তা নিশ্চয় জানা নেই ; তার কুমত্‌লবও ত থাক্‌তে পারে। শিক্ষা হোক্।

ইন্দ্রনাথ পুনরায় উষাকেই সালিশ মানিলেন—ছোট বৌমা, কি বল?

উষা বলিল—এম্‌নি ক'রে শিক্ষা দিতে হ'লে যে লোকের অন্য কাজের আর অবসরই

থাকে না। অন্যায় লোকে করছেই। অন্যায়ের দরুণ তাদের প্রত্যেককে শিক্ষা দিতে হ'লে—

বাকিটা কল্পনা করিয়া লইয়া সবাই হাসিয়া উঠিল...

অন্যায়ের দরুণ অন্যায়কারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে হইলে কি রকম একটা বিপরীত গোঁয়ারতুমির কাণ্ড অবিরাম চালাইয়া যাইতে হয় তাহারই ছবি যেন সহসা উদ্‌ঘাটিত হইয়া একটা পরিণত কৌতুকরসের সৃষ্টি করিল...

সতী দেখিল, সমস্যার মীমাংসা করা হইল না—পূর্বাপরের সামঞ্জস্য রহিল না—তাঁহার সঙ্গে কাহার মতের মিল হইল তাহা ইন্দ্রনাথ বলিলেন না—বালসুলভ চপল একটা হাসির মধ্যে উষার জয়ধ্বনি করিয়া তাহাকে হাস্যাস্পদ করা হইল কেবল...

সতী অত্যন্ত আহত হইল।

বিবাহের পর মাস তিনেকের মধ্যেই দুই ভগিনীর কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল যে বাড়ীর সকলকার আগ্রহ উষার প্রতিই বেশি। তুচ্ছ তুচ্ছ কথায়, কাজের ফরমাইসে, আহ্বানের বাহুল্যে, অর্থাৎ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বড়কে ডিঙাইয়া ছোটকে স্মরণ হওয়ায়, মনে হয়, নিতান্ত ভদ্রভাবেই ওঁদের সম্বিতে এবং উভয় বধূর মধ্যে যেন একটা মিষ্টতার তারতম্য লক্ষ্য এবং রক্ষা করা হইতেছে—খুব বেশি ভাল লাগা—আর তার চাইতে একটু কম ভাল লাগার অতি সূক্ষ্ম একটি ছেদ-রেখা উভয় বধূর মাঝখানে বসানো হইয়াছে। ইহা লইয়া ঘোরতর গর্ব কি কলহ করা কি ইঙ্গিতেও অভিযুক্ত করা কিছুমাত্র চলে না, কিন্তু মনটাকে খুশী কি খারাপ করিয়া রাখা চলে যথেষ্ট...

বাড়ীর লোকের বিশেষ অপরাধ আছে বলিয়া মনে করা যায় না—ভাল লাগার ব্যাপারে মানুষের মন খেয়ালী না হোক্—অজ্ঞাতসারেই অত্যন্ত অবাধ, সেখানে তার অনিবার্য বিলাস ; মনকে ধম্‌কাইয়া নিবৃত্ত করা যায় না—কর্তব্য বুদ্ধির চাপ দিয়া দমন করা যায় না—ভাল লাগার আনন্দটুকু মানুষ কেবল অপরের মতামতের মুখ চাহিয়া নষ্ট করিতে চায় না। আবার এরূপ ক্ষেত্রে ইহাও সত্য যে, দৃষ্টির এই তারতম্য স্পষ্ট আর তীক্ষ্ণ হইয়া ধরা পড়ুক এ ইচ্ছাও কেহ করে না—চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলে হয়তো লজ্জিতই হইবে...

কিন্তু সতী কাহাকেও লজ্জা দিল না—

উষাকে একদিন বলিল—উষা, তোরই এ-বাড়ীর বড় বৌ হওয়া উচিত ছিল, আর আমার বিয়ে হওয়া উচিত ছিল অন্য কোথাও।

উষা যেন হঠাৎ বিভ্রান্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—কেন, দিদি? দাদা কিছু বলেছেন?

ভাসুরকে উষা দাদা বলে।

উষার প্রশ্ন শুনিয়া বিস্ময়ে সতীর চক্ষু নিষ্পলক হইয়া গেল—এ কি অন্যায় প্রশ্ন উষার? বলিল—তিনি কি বল্‌বেন? তোর কথার মানে আমি বুঝলাম না, উষা।

কিন্তু উষা ততক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রশ্নের অপরাধ উপলব্ধি করিয়াছে ; তার এ-বাড়ীর বড় বৌ হওয়া সম্বন্ধে বাড়ীর বড় ছেলে কি বলিতে পারে! যদি বলে তবে সে-বলা যে কত দোষের তার কি ইয়ত্তা আছে, না তা ক্ষমা করা যায়!...ভারি অপ্রস্তুত, ভারি কুণ্ঠিত আর ভারি বিষণ্ণ হইয়া সে বলিল—তুমি আমার ওপর রেগেছ দিদি ; কিন্তু আমি ত কোন অপরাধ করিনি! আমি তোমার ছোট বোন্, এখানেও সেখানেও। তুমি ত জানই আমি বড় একটু উপর-পড়া ছট্‌ফটে মানুষ। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

আর কথা হইল না—

কিন্তু সতীর মনে হইল, একই বাড়ীতে দুই ভগিনীর বিবাহ একই দিনে না হইলে ভাল হইত। দুজনেই একসঙ্গে আসিয়া আসন লইয়াছে—পূর্ববর্তিনীর সম্মান আর প্রতিষ্ঠা লাভের

সুযোগ আসে নাই ; জ্যেষ্ঠের গুরুত্ব আর তার দখল পাওয়ার অগ্রিম দাবি এখানে লক্ষিতই হয় নাই—একই পরিবার হইতে দুই সহোদরাকে বধূ করিয়া আনা হইয়াছে বলিয়া তুলনাগত একটা স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত দ্রুত আর স্বতই আসিয়া পড়া অসম্ভব হয় নাই—আপন বোন্ বলিয়াই বেপরোয়া হইয়া কর্তৃত্ব খাটানো যাইতেছে না—মাত্র দু বৎসরের ছোট বোনের নিকট হইতে বড় বোনের মর্যাদা আদায়ে দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়াও যেন কঠিনই—আজন্মের পরিচয়ও কেমন একটা বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়াছে যেন...বাপের বাড়ীতে গুরুত্বে তারা ছিল প্রায় সমান সমান। অন্য ঘরের মেয়ে হইলে চক্ষুলজ্জার ব্যাপারেও যে-জোর খাটিত হঠাৎ বড়-জা হইয়া ছোট বোনের প্রতি সে-জোর খাটে না এমন নয়, কিন্তু একত্র লালিত ছোট বোনের কাছে তা কৌতুকপ্রদ অবস্থা বিপাক-হিসাবে হাস্যকর হইয়া ওঠা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়—ঊষা হয়তো মনে মনে হাসেই—ঊষাই বড় হইয়া আছে, আর কোন কারণে নয়, ঊষার রূপ একটু বেশি, আর মুখ খানিক ধারালো বলিয়া।

সতী বড় ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে ; কিন্তু মনের কথা কাহাকেও জানিতে দেয় না—জ্যেষ্ঠত্ব স্থাপিত করার সুযোগ খুঁজিবার মত অধীরতা তার নাই।

এই প্রথম ওঁদের আলোকময় সরল স্বচ্ছ চলার সঙ্গে গাঢ় একটা ছায়া পড়িল, যাহার শোচনীয়তা এমনি যে, একটি সমগ্র দিন কাহার মুখে উচ্চ হাসি রহিল না। এই ঘটনার গুরুত্ব যেন অতিরিক্ত মাত্রায় ওঁরা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন জ্ঞানরঞ্জনের কাতরতা দেখিয়া...

জ্ঞানরঞ্জন এম্-এ পরীক্ষায় বসিয়াছিল—

সংবাদ আসিয়াছে, সে ফেল্ করিয়াছে।

দুর্দৈব সন্দেহ নাই ; কিন্তু ভগবানের দৃষ্টি একবার পড়িতেছে অদৃষ্টের এ-পিঠে, পরক্ষণেই পড়িতেছে অদৃষ্টের ও-পিঠে—তার এই দৃষ্টি কখনও বিরূপ, কখনও প্রসন্ন। তাঁরই কৃপায় এবং অত্যন্ত নিগূঢ় আর শুভ একটা যোগাযোগের ফলে মনোরঞ্জনের পদ-মর্যাদার সঙ্গে বেতন বাড়িয়া হইয়াছে একশো কুড়ি, অর্থাৎ প্রায় ডবল, এ-সংবাদও আসিল ঐ সংবাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—এবং দেখিতে দেখিতে উৎসাহের আর অন্ত রহিল না—

মনোরঞ্জন নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল।

জ্ঞানরঞ্জন ফেল্ করায় মনে অকস্মাৎ একটা ক্ষতিবোধ জাগিয়াছিল ; মনোরঞ্জনের বেতনবৃদ্ধিতে সে ক্ষতিবোধ বিলুপ্ত হইয়া পুলক অন্তর আর দৃষ্টি ছাপাইয়া উৎসারিত হইতে লাগিল...

ছেলেদের বাপ-মায়ের কথা আলাদা—তাঁদের সুখ দুঃখ আর অনুকম্পা যথার্থ আন্তরিক—ছেলের অকৃতকার্যতায় তাঁরা ছেলেকেই সান্ত্বনা দিবেন এবং ছেলের পদোন্নতিতে তাঁরা ছেলেকে অভিনন্দিত করিবেনই...

কিন্তু বউয়েরা গেল অন্যদিক দিয়া—

পিতামাতা নিশ্চেষ্টভাবে স্বীকার করিলেন অদৃষ্টকে এবং কৃতার্থ হইয়া গ্রহণ করিলেন ভগবানের প্রসন্নতাকে ; সতী এবং ঊষা স্বীকার করিল উঁহাদের কৃতিত্বকে এবং তার অভাবকে ; প্রশংসা অপ্রশংসাকে। একজনকে কাজের লোক এবং আর একজনকে অকর্মণ্য বিবেচনা করিয়া তারা বক্র ছোট-বড়র ভেদ-দৃষ্টি লইয়া পথ ধরিল...

সতী তাহার জ্যৈষ্ঠত্ব একটু জাহির না করিয়া পারিল না ; বলিল—ঠাকুরপো ফেল্ করলেন কেন। করতেন কি! তোর দোষ না পড়ে, ঊষা!

ঊষা বলিল, করতেন কি তা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো। আর, দাদার মাইনে বাড়ায় যেমন তোমার হাত নেই, ওঁর ফেল্ করায় তেম্নি আমার পরামর্শ নেই, প্রশ্রয়ও নেই।

সতী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—তা জানি। তবু...

—আমায় নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌তেন, আর আমি তাঁকে ছেড়ে দিতে না চেয়ে তাঁর ক্ষতি করেছি, এই ত তুমি বল্‌ছ? কি ক'রে তা জান্‌লে তুমি? আর আমাকে তোমার ধম্‌কাবার কারণটা কি?

সতী তেমনি অনুত্তেজিতভাবেই বলিল—সে যা-ই হোক্, তবু ফেল্ করার একটা অসম্মান ত আছেই। তোর উচিত ছিল ঠাকুরপোকে দূরে দূরে রাখা।...যাই। বলিয়া সতী চলিয়া গেল।

অসম্মানের কথায় উষা ভারি মলিন হইয়া উঠিল। দিদির তুলনায় তাহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হইয়াছে—এই সম্মান তার প্রাপ্য, রূপের দরুণ প্রাপ্য, গুণের দরুণ প্রাপ্য। তাহার সম্মান আর স্বামীর সম্মান একাকার করিয়া লইয়া সে পরম পুলকিত হইত ; কিন্তু দেখা গেল, ব্যাপার ঠিক্ তা নয়। তার সম্মানের স্থান আর মূল আলাদা—তা কেবল ঘরে পাওয়া যায় ; কিন্তু বাহিরের সম্মান আসে স্বামীর মারফৎ। এই সম্মান আদায় করিয়া লইয়া স্বামীর সহযোগে দিদি অভ্রান্তভাবে তার শ্রেষ্ঠত্ব আর জ্যেষ্ঠত্ব অনুভব করিয়াছে এবং করাইয়াছে—তাহাই সে জানাইতে আসিয়াছিল ; আর তা এমন সত্য যে অস্বাভাবিক উগ্রভাবে রীতিলঙ্ঘন না করিয়া তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—তার প্রতিবাদ করা চলে না।

অন্য ঘরে বিবাহ হইলে এই যন্ত্রণাটা সে পাইত না, ভাবিয়া উষা পিতার দুর্বুদ্ধিকে আর নিজের অদৃষ্টকে আরও ধিক্কার দিল।

রাত্রে উষা স্বামীর কাছে জানিতে চাহিল—তুমি ফেল্ কর্‌লে যে?

জ্ঞানরঞ্জন যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক একটা ঘৃণ্য অপরাধ করিয়াছে, উষার কথায় এম্‌নি একটা তীব্র ভর্ৎসনার সুর। কিন্তু জ্ঞানরঞ্জন তা ভ্রূক্ষেপ করিল না—সে জানে, স্বামীর লজ্জায় স্ত্রীরও লজ্জা এবং লজ্জা যে দেয় তার উপর অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। লঘুকণ্ঠে বলিল—অপরাধ যদি হ'য়ে থাকে তবে তার প্রায়শ্চিত্ত আজ রাত্রেই করব।

—তার মানে?

—ওদিকে মুখ ক'রে শুয়ে থাক্‌ব—তোমার উল্টো দিকে—প্রাণ ফাট্‌ফাট্ কর্‌বে, সারারাত ঘুম হবে না, তবু অম্‌নি ক'রেই পড়ে থাক্‌ব।

উষা বলিল—অকর্ম্মা লোকই ফাজিল আর বেহায়া হয় বেশি...

কণ্ঠ অত্যন্ত কঠোর।

জ্ঞানরঞ্জন বলিল—গা'ল দিচ্ছ! বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত আর বিস্মিত হইয়া রহিল। পরীক্ষায় ফেল্ করা এমন কি গর্হিত অপরাধ, আর তাতে এমন কি দুর্গতি ঘটিয়াছে যে স্ত্রীর মুখ দিয়া এমন তীব্র সুরে অসন্তোষের ভাষা নির্গত হইবে! বাবা-মা-দাদা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন ; বলিয়াছেন, "ঘাব্‌ড়াসনে, মন একটুও খারাপ করিস্‌নে।" তার অকৃতকার্যতার প্রসঙ্গে তাঁরা কেবল ঐ কথা বলিয়াছেন ; "ভাল করিয়া পড়।" বলিয়া আদেশ পর্যন্ত দেন নাই—তাহার বেদনা তাঁহারা অনুকম্পার চক্ষে দেখিয়া স্বাভাবিক বিবেচনার আর অপার স্নেহের পরিচয় দিয়াছেন ; কিন্তু উষার মনে এমন কি আঘাত বাজিল যে সে সহ্য করিতে পারিতেছে না—তার এমন কি ক্ষতিবৃদ্ধি যে এমন মর্মান্তিকভাবে ব্যাপারটাকে গ্রহণ করিয়াছে!

অতিশয় ভালমানুষ জ্ঞানরঞ্জন অতিশয় ম্লানচক্ষে আর অসহায়ের মত উষার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল...

কিন্তু তবু উষা তাকে আমল দিল না ; বলিল—আমাকে রায়গঞ্জে যেতে দাও একবার।

রায়গঞ্জে উষার পিত্রালয়।

জ্ঞানরঞ্জন মুদ্রিত চক্ষু খুলিয়া একবার উষার দিকে তাকাইল ; তারপর বলিল—মা আর বাবাকে বল। তাঁরা যেতে দেবেন হয়তো।

সকালবেলা যথারীতি চায়ের মজ্‌লিস বসিয়াছে—সকলেই উপস্থিত আছেন...ইন্দ্রনাথ আচমন করিয়াছেন—মনোরঞ্জন গল্প করিতেছে যে কোথাকার এক সাহেব বিষাক্ত সর্পের চাষ করিতে সুরু করিয়াছে—গরু ভেড়ার মত বাথান করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাপ সে পালন করে ; উদ্দেশ্য, বিষ বিক্রয় করিয়া টাকা পাইবে—কিন্তু পাইলে হয়! বিষ নিংড়াইতে গিয়া...

সর্পদংশনে প্রাণ হারাইতে পারে, এইরূপ মন্তব্য করার ইচ্ছাই বোধ হয় মনোরঞ্জনের ছিল—

কিন্তু উষা হঠাৎ মাঝখানে বলিয়া উঠিল—বাবা, আমি একবার রায়গঞ্জে যাব। পাঠিয়ে দিন্।

কণ্ঠস্বরে আর যা-ই থাক্, নববধূপযোগী নম্রতা নাই।

ইন্দ্রনাথ নড়িয়া উঠিলেন ; বলিলেন—কেন বৌমা? হঠাৎ এ-ইচ্ছা হ'ল কেন?

এ-ইচ্ছার উদয়ের কারণ উষা কিছু দেখাইত কি-না কে জানে—কিন্তু সতী তাকে অবসর দিল না ; বলিল—ঠাকুরপো ফেল করেছে বলে' উষা ভারি লজ্জা পেয়েছে।

—তা-ই নাকি? বলিয়া ইন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গে সবাই হাসিতে লাগিলেন, এমনভাবে যেন এমনধারা ছেলেমানুষী তাঁরা ইতিপূর্বে দেখেন নাই।

কিন্তু উষা ক্রোধে চঞ্চল হইয়া উঠিল ঃ দিদি তাহাকে অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্যেই তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে—সে নীরব থাকিলেই পারিত! দিদি প্রতিশোধ লইতেছে—তাহাকে এবং তাহার স্বামীকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করিতে দিদির অমানুষিক নির্মম আগ্রহ দেখা দিয়াছে...

তার মুখের দিকে চাহিয়া সকলেই হাস্য সম্বরণ করিলেন ; ইন্দ্রনাথ তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে বলিলেন—তা যেও মা, তোমার যেদিন ইচ্ছে, যখন ইচ্ছে...

বলিতে বলিতে তিনি চাহিয়া দেখিলেন সতী অন্যদিকে চোখ্ ফিরাইয়া প্রসন্নচিত্তে হাসিতেছে, আর উষা তাহার দিকে তাকাইয়া আছে এম্‌নি করিয়া—যেন তুমুল কলহের পর সে এইমাত্র থামিয়াছে, কিন্তু ক্রোধ সম্পূর্ণ প্রশমিত হয় নাই...সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন খুব।

পুলকে উচ্ছলকণ্ঠে সতী বলিল—বাবা, মাইনে বেড়েছে—একদিন দশজনকে ডেকে ভাল ক'রে খাওয়া দাওয়া হোক্।

—বেশ, হোক্।...এবং তারপর সতীকেই সর্বময়িত্বের দিকে আরও অনেকটা আগাইয়া দিয়া বলিলেন, ফর্দ কর। একটা ছুটির দিনে—

বলিতে বলিতে ইন্দ্রনাথ দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন যে, এই মনোরম উল্লসিত পারিবারিক পরিধির ভিতর হইতে তাঁর ছোট বৌমা উষা ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া যাইতেছে...

আশ্বিন ১৩৪৭

মুকুর

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

এক

ভাই অনিলা, চিঠি লিখি নে বলে তুমি অনুযোগ করেছ। কিন্তু ভাই, তুমি তো জান, অন্ধের পক্ষে নিয়মিত চিঠি লেখান কত মুশ্‌কিল।

ভাই, তোমরা কত সুখী, তোমরা চোখ চেয়ে এই সুন্দর পৃথিবীটা প্রাণভরে দেখতে পাও। দেখা,—হায় এই অসীম নীল আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, তাদের বিভিন্ন রঙের খেলা চোখে দেখতে পাওয়া কত সৌভাগ্যের কথা! একদিন সত্যসত্যই সেই সৌভাগ্য আমার হয়েছিল; কিন্তু যখন এ পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য থেকে ভগবান আমায় বঞ্চিত করেন, তখন আমার বয়স বড়জোড় আট বছর। সে বয়সে দেখবার শক্তিটাও প্রবল হতে পায় না। এখন আমার বয়স আঠারো। গত সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে আমার চারপাশের সব কিছুই গাঢ় জমাট অন্ধকারে আবৃত! প্রকৃতির দেওয়া সৌন্দর্য কল্পনার বলে উপভোগ করবার কত ব্যর্থ চেষ্টাই না আমি করেছি! আজ আমি প্রকৃতির সকল বর্ণ, সকল সৌন্দর্য—সব ভুলে বসেছি। আজ আমি গোলাপের গন্ধই শুধু শুঁকতে পাই, নেড়েচেড়ে তার আকৃতিও অনুমান করতে পারি, কিন্তু প্রাণভোলানো তার সেই অপরূপ সৌন্দর্য থেকে চিরদিনকার জন্যে আমি বঞ্চিত হয়েছি। এক-এক সময় এই গাঢ় কৃষ্ণ যবনিকার মধ্যেও আমার ক্ষুধিত প্রাণ সৌন্দর্য উপভোগের ব্যর্থ চেষ্টায় গুমরিয়ে ওঠে। ডাক্তাররা বলেন, এটা রক্তচলাচলের লক্ষণ, এবং একদিন আমার অন্ধত্ব দূর হতে পারে। হায় রে আশা! যে লোক আজ সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে জগতের সমস্ত আলো সমস্ত সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত সে যে আর পরলোকে যাওয়ার আগে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে, এও কি সম্ভব!

সেদিন কেন জানি নে, হাত্‌ড়াতে-হাত্‌ড়াতে আমি একখানা অব্যবহার্য আয়না খুঁজে পেলুম। সেই আয়নাখানা সুমুখে রেখে বসে পড়ে, আমার এলু-থালু চুলগুলি সুবিন্যস্ত করতে লেগে গেলুম। আমার তখনকার মনের অবস্থা যে কিরূপ, তা আজ আর তোমায় খুলে বলবার শক্তি আমার নেই। আমার মুখাবয়ব আয়নায় প্রতিফলিত দেখব,—কেমন আমার মুখখানা, চোখ দু'টো, ভ্রূ, সব কিছু দেখবার আমার সে কি উন্মাদ আগ্রহ! তখন সত্যিই আমার মাথা ঠিক ছিল না,—নইলে কেউ কি জেনে শুনে ওরূপ উন্মাদের মত কাজ করতে উদ্যত হয়!

ওঁরা আমায় তোমার চিঠিখানা পড়ে শোনালেন। তুমি জানতে চেয়েচ, আমার বাবার কারবার যে ফেল পড়েছে বলে প্রকাশ তা সত্য কি না। এ সম্বন্ধে আমি তো কিছুই জানি নে। ওঁরা আমায় কিছুই বলেন নি। কারবার ফেল পড়লে আমি বুঝতে পারতুম; কিন্তু আমার মনে হয়, ও সত্য নয়। কেন না আমার বিলাস-ব্যসনের এতটুকু কম্‌তি হয় নি। আমার কাপড়, জামা, শাড়ী—সবই দামী। প্রতি দিন নানাপ্রকার উপাদেয় খাদ্য, ফলমূল আমি খেতে পাই। এর থেকেই বুঝতে পারি যে, বাবার আর্থিক অবস্থার এতটুকু বিপর্যয় হয় নি।

মধ্যে-মধ্যে আমায় চিঠি লিখো। তোমাদের চিঠি পেলেও তবু আমার এ ব্যর্থ দুর্বহ জীবনে ক্ষণকালের জন্য তৃপ্তি লাভ করে থাকি। আশা করি, এ অন্ধ হতভাগিনীকে তুমি অন্তত ঘৃণা করবে না। ইতি—

দুই

ভাই অনিলা, তোমার চিঠি পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আজ তোমায় যে সংবাদ দিতে যাচ্ছি, তা শুনে তুমি নিশ্চয়ই হাস্য সম্বরণ করতে পারবে না। ভাববে, আমি নিশ্চয়ই উন্মাদ হয়ে গেছি। দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে-সঙ্গে আমার বিচার-বুদ্ধিও আমি হারিয়েছি। শুনে আশ্চর্য হবে নিশ্চয় যে, আমায় একজন ভালবেসেছেন!

হাঁ, সত্যি বলছি ভাই, অন্ধ আমি, আমাকেও আবার ভালবাসতে চায়! এর পর আর কি বলা চলে? প্রেম যে অন্ধ, সে কথাটি আজ মর্মে মর্মে অনুভব করছি। নইলে আমার ন্যায় রিক্ত নিঃস্ব যে, তাকেও আবার কেউ শুধু ভালবাসতে নয়—বিয়ে করতে চায়।

কি করে যে তিনি বাবার সঙ্গে পরিচিত হলেন জানি নে। এমন কি, তিনি কে, কি করেন,—তাও আমার জানবার সুবিধা হয় নি। তবে সেদিন বাবাতে আর মা'তে আমার বিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছিল,—আমি একখানা লাঠিতে ভর করে তখন গুটি-গুটি বারান্দায় এসে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিলুম। তাঁরা আমার উপস্থিতি টের পান নি,—অথচ, আমি তাঁদের সব কথাই শুনতে পেয়েছিলুম। বাবা বল্লেন, প্রশান্ত বাবু কালই আমায় পাকা দেখা দেখতে চান। অনেক কথা-কাটাকাটির পর মা রাজী হলেন।

পরদিন তিনি আমায় দেখতে এলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁর চেহারা কিরূপ—কালো না ফর্সা, বেঁটে কি ঢেঙা,—কিছুই আমার জানবার জো নেই। তিনি বিয়ে সম্বন্ধে আমার মতামত নেওয়া সঙ্গত মনে করে, বিয়ের কথা উত্থাপন করলেন।

আমি তাঁকে বল্লুম, "তা কি করে সম্ভব? অন্ধ আমি, আমায় বিয়ে করে লাভ কি?"

তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন, "চক্ষুষ্মান কি অন্ধ—তা নিয়ে আমি কি করব? হও না তুমি অন্ধ, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তোমার সৌন্দর্য—তোমার দেহের গঠন, আকৃতি, তোমার প্রকৃতি—আমায় মুগ্ধ করেছে। এটাই কি আমার তোমায় বিয়ে করবার কারণ হতে পারে না?" তাঁর স্বরে একটা দৃঢ়তা, সরল স্বাভাবিকতা ছিল।

তিনিই আমার অন্ধত্বকে বাদ দিয়ে আমার সৌন্দর্য সৌষ্ঠবের প্রশংসা করলেন। এরূপ প্রশংসায় অপরে কিছু বিশেষত্ব না পাক, আমার ন্যায় অন্ধের কাছে তা শুধু প্রেমিকের প্রেম জ্ঞাপন ছাড়া আরো কিছু বলে মনে হয় না।

আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, "আমি কি সত্যিই ওরকম প্রশংসার যোগ্য?"

—"নিশ্চয়ই, আমি শপথ করে বলছি।"

—"তবে এখন আমায় কি করতে বলেন?"

—"তুমি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হও। আমি তোমায় আমার সহধর্মিণীরূপে পেতে চাই।"

এ কথা শুনে আমি অবশ্য হাসব কি কাঁদব ভেবে পাই নি। একটু পরেই তাকে উত্তেজিত স্বরে বল্লুম, "আপনি কি এটা সত্যই মনে করেন যে, এক দৃষ্টিহীনার সঙ্গে এক চক্ষুষ্মানের, অর্থাৎ—দিনের সঙ্গে রাত্রির বিয়ে সম্ভব? আমি কেন আপনার জীবনটাকেও ব্যর্থ করে দেব? না, না, না, তা হতে পারে না। আর আমার বাবার অবস্থা এত খারাপ নয় যে, আমার একার ভার তিনি বইতে পারবেন না। না, তা হতেই পারে না!"

তিনি আর কিছু না বলেই চলে গেলেন। তিনিই আমায় জানালেন, যে আমি সুন্দরী। কেন না, এ জ্ঞান আমার কোন কালেই ছিল না। আমি তখন এটা ভেবে পাই নি যে, তিনি আমার জীবনে দর্পণের কাজ করচেন। কিন্তু পরে তা অন্তরে-অন্তরে অনুভব করেচি। তাই অজ্ঞাতে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা-ভক্তিটা বেড়ে গেছে। ইতি—

তিন

ভাই অনিলা, তোমায় আজ কি লিখব? কি অপ্রত্যাশিত দুঃখভার যে আমার জীবনে এসে গেছে. তা আর কি বলব। আমার যে কি হয়েচে, সে কথা লিখতে গিয়ে আমার চির-অন্ধ চোখ দুটি থেকেও জল ঝরে পড়ছে!

সেদিন প্রশান্তবাবুর সঙ্গে আলাপের পর একটা অজ্ঞাত কারণে আমার মনটা কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল। ভাল কথা, বলতে ভুলে গেছি, প্রশান্ত বাবুই এখন আমার বাইরের জগতের দর্পণ। সে যাই হোক, আমি সেদিন থেকে আর বড়-একটা ঘরের বাহির হই নে। আপনার মন নিয়ে আমার চির-অন্ধকার ঘরের এক কোণে বিছানায় পড়ে থাকি। সেদিনও আমি আমার ঘরে বসে-বসে আপনার অদৃষ্টের কথা ভাবছিলুম,—এমন সময়, আমার ঘরের জানালার দিকে যে পাশের বাড়ী, তারই একটা ঘরে দু'জনায় বসে যে কথাবার্তা হচ্ছিল, তাই আমার কানে এল। বলা বাহুল্য, তাঁদের কথাবার্তা যে কেউ শোনে, এটা অবশ্য তাঁদের ইচ্ছা নয়। তাঁরা ফিসফিস করেই কথা কইছিলেন। তুমি এটা সম্ভবত বেশ জান,—যার একটা ইন্দ্রিয় নেই, তাকে তার সে লোকসান পুষিয়ে দেবার জন্যে সৃষ্টিকর্তা তার অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি একটু অস্বাভাবিক প্রখর করেই তৈরী করে দেন। তাই যারা চোখে দেখতে পায়, তাদের চাইতে, যারা তা না পায়, তাদের শ্রবণ-শক্তিটা অস্বাভাবিক প্রখর হয়েই থাকে।

তারা বলছিল৷—"কি আশ্চর্য, মেয়েটাকে সুখী করবার জন্য মা-বাপের কি না চেষ্টা! মেয়েটা এখনো বুঝতে পারে নি যে, তার বাপের অবস্থা কত খারাপ! তাঁরা না খেয়েও অন্ধ মেয়ের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদে কত টাকাই না ব্যয় করেন।"

--"এর অর্থ?"

--"এর আবার অর্থ কি? মেয়েটা তার অন্ধত্বের দুঃখের উপর যেন দারিদ্র্যের দুঃখ না বুঝতে পারে, এজন্য পারিবারিক দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা তার কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে।"

ভাই অনিলা, এখন তুমি অবশ্যই আমার মানসিক দুঃখের কারণ স্পষ্টই বুঝতে পেরেচ। মা, বাবা আমাকে সুখী করবার জন্যে কি ত্যাগই না করছেন! আমি অন্ধ, তাই কত দুঃখ কষ্ট সয়েই না তাঁরা আমার বিলাসিতার সামগ্রী জোগাচ্ছেন। সন্তান-স্নেহ কি অসীম! পিতা-মাতার এ ঋণ কখনো কোন সন্তান পরিশোধ করতে পারে কি? তি—

চার

আমি যে এ গোপন কথা জানতে পেরেছি, তা অবশ্য কাউকেই জানতে দিই নি। কেন না, তা হলে আমাদের দারিদ্র্যের খবর আমার কাছ থেকে লুকোবার আপ্রাণ চেষ্টা তাঁদের ব্যর্থ হবে। ফলে মা, বাবা উভয়েই বিশেষ পীড়িত হবেন। তখনো আমার এ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের পারিবারিক অবস্থা বেশ সচ্ছল। কিন্তু এ সংবাদ শুনে আমি মনে মনে স্থির করলুম, তাঁদের মুক্তি দিতেই হবে যে করেই হোক।

কালও আবার তিনি এসেছিলেন। আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ হল। কথায়-কথায় আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, "এখনো কি আমার আমায় ভাল লাগে?"

—"নিশ্চয়। আমি আগেই বলেছি যে, তোমার মধ্যে যে স্বর্গীয় সুষমা ও মাধুর্য আছে, তাতেই আমি মুগ্ধ ; আর সেই কারণেই আমি আমাদের বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত করেছি।"

—"কিন্তু আমার আকার?"

—"সেও তো বলেছি আমায় মোহিত করেছে।"

এ কথা শুনে আমি হেসে উঠলুম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হাসছ যে?"

—"এটা ভেবে হাসছি যে, আপনি যেন আমার কাছে ঠিক একখানি আয়না। আপনার কথায় আমি আমার আকারটি যেন সত্যসত্যই প্রতিফলিত দেখতে পাই।"

—"আমিও তো চাই চিরদিনের জন্যে তোমার দর্পণ হয়েই থাকতে। সে অধিকার কি পাব?"

—"আপনি তবে সত্যিই—"

—"হাঁ, তোমার দর্পণ হতেই চাই। তোমার পিতা-মাতার সম্মতি পেয়েছি, এখন তোমার সম্মতি পেলেই হয়। আমার কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে। আমাদের কিছুরই অভাব হবে না। আমরা দিব্য সুখে-শান্তিতেই থাকতে পারব, আশা করি। তোমায় সুখী করতে পারলে আমিও সুখী হব।"

কথাগুলি শুনে ভাবলুম, এঁর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেই তো আমার মাতা-পিতাকে দারিদ্র্যের দুর্ভোগ থেকে কতকটা অব্যাহতি দিতে পারি। আমি বল্লুম, "কিন্তু আমাদের এ বিয়ে হলে আপনার যে ভারী লোকসান,—আমি যে অন্ধ!"

—"লাভ-লোকসানের কথা কি বলছ,—আমি যে তোমায় ভালবাসি। তোমায় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি—।"

—"বলুন।"

—"জগতে ব্যর্থতার ভার নিয়েই জন্মেছি। আমার আকারে কোনরূপ মাধুর্য নেই, গাড়ি ঘোড়া ঐশ্বর্যও নেই। এক কথায় আমি কুৎসিত, তার উপর মধ্যবিত্ত,—অর্থের প্রাচুর্য কোনকালেই ছিল না। তার উপর সম্প্রতি আমার বসন্ত হয়েছিল,—তাতে করে সর্ব দেহে বসন্তের দাগ রয়ে গেছে। সুতরাং অন্ধকে বিয়ে করতে আমার অমত হওয়া তো ঠিক নয়ই, পরন্তু তাতে স্বার্থ-ত্যাগও এতটুকু নেই।"

বলা বাহুল্য, এর পর আমি আমার সম্মতি জানালুম।

তিনি বল্লেন, "তুমি আমায় কুৎসিত দরিদ্র জেনেই গ্রহণ করো। তবে আমার ব্যবহার যে কিছুতেই অন্য রূপ হবে না, এ কথা আমি তোমায় জোর করেই বলতে পারি। আমার জীবনটা একটানা মরুভূমি,—তোমার ভালবাসা সে মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের কাজ করবে।"

তিনি চলে গেলেন। ভাই, বুঝতে পারছি নে যে, বিয়েতে সম্মতি দিয়ে ভাল করলুম কি মন্দ করলুম। সে যাই হোক, মাকে বাবাকে তো নিষ্কৃতি দেওয়া হবে—তাতেই আমার শান্তি। আমার মনে হয়, আমি ঠিক পথেই পা দিয়েছি। আজ আসি। ইতি—

পাঁচ

তোমার প্রীতিপূর্ণ চিঠিখানার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি তা'ছাড়া, আমাদের বিয়েতে তোমার আন্তরিক সম্মতি আছে জেনে আরো প্রীত হয়েছি।

হাঁ, দু'মাস হোল আমাদের বিয়ে হয়েছে। আজ আমার মনে হয়, আমার চাইতে ভাগ্যবতী খুব কমই আছে। আমি খুব সুখেই আছি। কিছুই আমার চাইতে হয় না। আপনা থেকেই স্বামী আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব দিয়ে থাকেন। আমার মাকে বাবাকেও তিনি তাঁর বাড়ীতে এনে রেখেছেন,—যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করেন। আগেই লিখেছি, তাঁর কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে,—তার আয় থেকেই আমাদের একপ্রকার বেশ চলে যাচ্ছে। এখন আর আমার অন্ধত্বের জন্য কোন দুঃখ নেই ; কেন না, আমি স্বামীর অফুরন্ত ভালবাসা একান্ত করেই পাচ্ছি।

আমাদের বাড়ীতে ছোট একটি বাগান আছে। প্রতি দিন বিকেলে তিনি আমার হাত ধরে আমায় নিয়ে বেড়িয়ে বেড়ান। আমি নানারকম ফুলের গন্ধ পাই। কিন্তু তাদের সে অপরূপ সৌন্দর্য চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার নেই। তা নাই থাকুক, স্বামী আমায় সমস্ত ফুলের

সৌন্দর্য্য এমনি করে বুঝিয়ে দেন, যাতে না দেখার দুঃখ আর আমার থাকে না,—আমার মনশ্চক্ষের সুমুখে তারা স্পষ্ট হয়েই ওঠে। পাখীরা ডাকে আমি কান খাড়া করে থাকি,—সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি তাদের পরিচয়, রূপ, গুণ, সব জলের মত বুঝিয়ে দেন। কোন-কোন দিন আমরা থিয়েটারে যাই,—দেখার যা কিছু, তা আমি ওঁর চোখ দিয়েই দেখে থাকি। তাঁর কুরূপে আমার তো কিছুই এসে যাচ্ছে না। সুন্দরই বা কি কুৎসিতই বা কি, আজ আমার মনে আর তা কোন ভাবই এনে দেয় না। তবে প্রেম ও প্রীতির পরিচয় আমি বেশ ভাল করেই পেয়েছি।

আজ আর না। আশা করি, তোমাদের খবর সব ভাল। পত্র দিয়ো। ইতি—

ছয়

ভাই, অনিলা, শুনে খুশী হবে, আমাদের একটি খুকী হয়েছে। কিন্তু দুঃখ এই, তাকে দেখতে পেলুম না! সকলে বলে, খুকী খুব সুন্দর। সে না কি দেখতে ঠিক আমারই মত ; কিন্তু আমি তো তাকে দেখতে পেলুম না। মাতৃস্নেহ কত অসীম, আজ তা বেশ বুঝতে পারছি। আজ বুঝতে পারছি, আমি অন্ধ,—নীলাকাশের অসীম অনন্ত রূপ, ফুলের অপরূপ সৌন্দর্য, পিতা-মাতা প্রিয়জন, এমন কি স্বামীর চেহারাও যে দেখতে পাই নে, সে কষ্টও বরং সহ্য করা সম্ভব, কিন্তু—কিন্তু আমার খুকীকে, যে আমার বুকের রক্ত থেকে বেরিয়ে এল, তাকে যে দেখতে পেলুম না, এ কষ্ট, এ বেদনা একেবারে অসহ্য! হায়, যদি এক মুহূর্তের জন্যে আমার দৃষ্টিশক্তি একবার বিদ্যুৎ-প্রকাশের মত শুধু একবার ফিরে পেতুম,—যদি সেই একটি মুহূর্তের জন্য একবার খুকীর চাঁদমুখখানা দেখতে—পেতুম—তা'হলে সেই ক্ষণিকের তৃপ্তিতে সেইটুকু সুখেই আমি এ ব্যর্থ জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারতুম!

এবার আর স্বামী আমার দর্পণের কাজ করতে পারলেন না। খুকীকে আমার মনশ্চক্ষের সুমুখে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হল না। তিনি খুকীর আকৃতি-প্রকৃতি যতই কেন না বর্ণনা করতে চেষ্টা করুন, আমার ক্ষুধিত মাতৃ-হৃদয় তাতে একটুকু তৃপ্তি পায় না। খুকীর না কি একমাথা কালো মিশমিশে কোঁকড়া কোঁকড়া চুল হয়েছে! কেমন সে পুটপুট করে তার ডাগর কালো-কালো চোখে সকলের দিকে হাসি-মুখে চেয়ে থাকে। এ শুনে আমার তৃপ্তি কোথায়! হায় অদৃষ্ট! হায় অন্ধত্ব! ইতি—

সাত

স্বামী আমার দেবতুল্য লোক। আজকাল তিনি কি করছেন জান? তিনি আমাকে না জানিয়ে আমার জন্য কত অর্থব্যয়, কত কষ্টই না সহ্য করছেন। দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনবার জন্যে কত প্রাণপাত পরিশ্রমই না করছেন। আমার চক্ষু-চিকিৎসার জন্যে তিনি নিজে বিশেষ করে চক্ষুরোগের চিকিৎসা-বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন। ইতিপূর্বেই তিনি স্বয়ং মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন—এ সব খবর আমি এতদিন জানতে পারি নি!

কাল কথায়-কথায় তিনি আমায় বল্লেন, "আমার কি আশা জান?"

আমি উত্তর করলুম, "কি শুনি!"

—"আমি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে চাই। তোমার মুখের সৌন্দর্য বাড়বে বলে যে ঔষধ তোমায় এতদিন ব্যবহার করিয়েছি, তা তোমার অস্ত্রোপচারের কাজে আসবে।"

—"কিসের অস্ত্রোপচার?"

—"তোমার চোখে যে ছানি পড়েছে তা সারাবার জন্যে চোখে অস্ত্রোপচার আবশ্যক হবে।"

—"তুমি অস্ত্র করতে পারবে? তোমার হাত কাঁপবে না?"

—"না, কাঁপবে না। আমি যে মনে-প্রাণে একান্ত করে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে চাই।"

—আমি উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলুম, "আমার ন্যায় নগণ্য হতভাগিনীর প্রতি তোমার এত করুণা! তিনি আমায় আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে, আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে উঠলেন, "না, না, ও কথা বলো না গো। এ যে আমার স্বামীর কর্তব্য, এ তো আমার করতেই হয়। আশা করছি, শীঘ্র ভগবানের দয়ায় দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পাবে।"

—"কিন্তু তার পর—"

আমার কথা শেষ না হতেই তিনি সরল হাসি হেসে বলে উঠলেন, "তার পর আমার কুরূপ দেখতে পাবে।"

কথা কয়টা যেন বন্দুকের গোলার ন্যায় আমার বুকে এসে বিঁধল। ওঁর এ কথাগুলিতে যেন আমার বুকে শত বৃশ্চিক একসঙ্গে এসে দংশন করলে। আমি তাঁকে বল্লুম, "আমার ভালবাসায় যদি তোমার এতটুকু সন্দেহ জন্মে থাকে, তো আমি যেন চিরকাল অন্ধ হয়েই থাকি। তোমার কুরূপ আমার মনে কল্পনায়ও এতটুকু পীড়াও দিতে পারে না। নগণ্য দাসীর প্রতি এত করুণা তোমার!"

তিনি কথা বল্লেন না,—কেবল আমার গালটা একটু জোরে টিপে দিলেন।

মা বলেছেন এক মাসের মধ্যেই আমার চোখে অস্ত্রোপচার হবার সম্ভাবনা আছে।

আমার স্বামীর সম্বন্ধে যাকে জিজ্ঞাসা করি, সে-ই স্বামীর কথায় সায় দেয়। মা বলেন, তিনি কুৎসিত কালো ; বাবা বলেন, ওঁর মুখে বসন্তের দাগ অনেক, মাথায় টাক ; মোক্ষদা ঝিও বলে যে, ওঁর বয়স অনেক।

বসন্তের দাগ—একটা আকস্মিক ব্যাপার, তাতে কারো হাত নেই ; মাথায় টাক-- জ্ঞানবানের লক্ষণ। এ কথা সেদিন মামা বলছিলেন। কিন্তু যদি সত্য-সত্যই তাঁর বয়স বেশী হয়, তা'হলে দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই। তার পর যদি তিনি আগেই চলে যান, তা'হলে যে তাঁকে ভাল করে ভালবাসবারও সুযোগ পাব না!

সত্য বলতে কি ভাই, তোমার হয় তো মনে আছে, স্কুলে আমরা একটা গল্প পড়েছিলুম। তুমি পড়েছিলে চোখ দিয়ে স্বর দিয়ে, আর আমি মনে প্রাণে। সেই "সৌন্দর্য্য ও পশুর" গল্প। আমার অবস্থাটাও ঠিক সেইরূপ নয় কি? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো যে, তাঁর দয়ায় যেন শীঘ্রই আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাই। ইতি—

শেষ

অনিলা, এ চিঠিটা আগাগোড়া না পড়ে আমার উপর অবিচার করো না। আর জীবনের দুঃখ, সুখ, পরিবর্তন—পর পর বুঝতে চেষ্টা করো, তা'হলেই তা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

এক পক্ষ কাল আগে আমার চোখে অস্ত্রোপচার হয়ে গেছে। একখানা কম্পিত হস্ত আমার চোখের উপর রক্ষিত হয়েছিল, তা বুঝতে পেরেছি। আমি দুবার প্রাণপণে চীৎকার করে উঠি ; তার পরেই যেন দিনের আলো, তার রং সমস্ত আমার কাছে প্রতিভাত হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আমার চোখ বেঁধে দেওয়া হল। সেই দিনই আমি সুদীর্ঘ এক যুগ পরে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছি। একটু ধৈর্য ও সাহস আবশ্যক হয়েছিল। স্বামী আমার, আমাকে সংসারের সাররত্ন—চক্ষুরত্ন দান করেছেন।

কিন্তু আমি একটা বোকামী করে বসেছিলুম, অবশ্য প্রাণের দায়ে। আমি তাঁর, আমার ডাক্তারের আদেশ অমান্য করেছিলুম! তিনি অবশ্য তা জানেন না। তা'ছাড়া আমার

বোকামীতে অবশ্য তেমন ক্ষতিও হয় নি। সেদিন মোক্ষদা ঝি খুকীকে নিয়ে আমায় কাছে এল। খুকু আমায় "মা" বলে ডাকতেই, আমি আর চোখের বাঁধন না খুলে পারলুম না।

আমি চীৎকার করে উঠলুম, "খুকুমণি, এই যে আমি, দেখতে পেয়েছি, দেখতে পেয়েছি তোমায়—" মোক্ষদা তাড়াতাড়ি আমার বাঁধন এঁটে দিলে। তা'হলেও তখন আর আমার মনে অন্ধত্বের কোন ব্যথাই রইল না। আমার মনে হল, আমার দৃষ্টির সকল সৌন্দর্য যেন আমি ফিরে পেয়েছি। যে মুহূর্তে খুকুর মুখখানা দেখতে পেয়েছি, সেই মুহূর্ত থেকেই আমার জীবনের অন্ধকার কালরাত্রির অবসান হয়েছে।

কাল মা আমায় বেশ করে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিলেন, একখানা সুন্দর শাড়ী পরিয়ে দিয়ে বল্লেন, "এবারে তোমার চোখের বাঁধন খুলে ফেলতে পার।"

মায়ের আদেশমত আমি বাঁধন খুলে ফেল্লুম। সে সময় সূর্য অস্ত যাচ্ছিলেন,—প্রায় অন্ধকার হয়ে আসছে। একবার চারিদিকে চেয়ে দেখে আমার মনে হোল, এর চাইতে সুন্দর কিছু আমি কখনো দেখি নি। আনন্দের আতিশয্যে মাকে বাবাকে খুকীকে আমার বুকে চেপে ধরলুম। বাবা বল্লেন, "তুমি নিজেকে ছাড়া আর সকলকেই তো দেখতে পেলে।"

—"উনি কোথায়।"

মা বল্লেন, "লুকিয়ে রয়েছেন।" মার কথায় ওঁর কুরূপ, টাক, মুখে বসন্তের দাগ—সব মনে পড়ে গেল।

—"তাঁকে ডেকে দাও। তাঁর চাইতে সুরূপ কি কিছু আছে!"

মা আমায় একটিবার দর্পণে আমার চেহারাখানা দেখতে বল্লেন। অদূরেই একখানা প্রকাণ্ড দর্পণ। আমি সেই দিকে ঝুঁকে পড়লুম ; তাতে কতকটা কৌতূহল, আর কতকটা গর্বও যে ছিল না, এমন কথা বলা চলে না। তাঁরা সঙ্গে-সঙ্গে আমার সঙ্গে দর্পণের সুমুখে এসে দাঁড়ালেন। আমি দর্পণের দিকে একবার চেয়েই আনন্দের আতিশয্যে চীৎকার করে উঠলুম। যদিচ আমি কতকটা কৃশকায়াই ছিলুম, কিন্তু আমার গায়ের রঙ, চোখ, ভ্রূ, গঠন—অনিন্দনীয়। এক কথায়, সত্যি বলতে গেলে, আমি প্রকৃতই সুন্দরী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দর্পণে আমার প্রতিকৃতিটা বেশ আরামের সঙ্গে দেখতে পারি নি,—কেন না, দর্পণখানা ক্রমাগত কেবলি কাঁপছিল। তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন, আনন্দে আমার প্রতিকৃতিও দর্পণে নৃত্য করছে।

দর্পণখানা কেন নড়ছে, তা দেখবার জন্য আমি দর্পণের পিছন দিকে চাইতেই, সেখান থেকে একটি অপরিচিত যুবক বার হয়ে এলেন। তিনি যে বেশ সুপুরুষ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ; তা'ছাড়া, তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদও বেশ মানানসই ও দামী। আগন্তুককে দেখে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছিল।

ভদ্রলোককে লক্ষ্য না করেই মা আমায় বল্লেন, "দেখ, তোমার আকৃতি কেমন সুন্দর!"

—"মা!—" আমার স্বরে একটা তীব্র ভর্ৎসনার সুর বেজে উঠল।

মা সে দিকে মোটেই মন দিলেন না,—আপনার মনে আমার সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে লাগলেন।

আমি মাকে বল্লুম, "আচ্ছা মা, তোমার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকতে নেই? তুমি ভাবছ কি বল দেখি, একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সুমুখে—"

—"অপরিচিত ভদ্রলোক! বলিস কি? এ যে তোর দর্পণ!"

—"আমি দর্পণের কথা বলছি নে, আমি বলছি এই ভদ্রলোকের কথা।"

বাবা রেগে গিয়ে বল্লেন, "দূর হাবা মেয়ে, এ যে প্রশান্ত,—জামাই!"

এ্যাঁ!...খানিকক্ষণ আমি আর কিছু বলতে পারলুম না, এক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে

চেয়ে রইলুম। তিনি এত সুন্দর! আমার এত সৌভাগ্য! অন্ধ আমি, বিশ্বাসের উপরই তাঁকে ভালবেসেছি। এই দেবতা, তিনি আমার জন্য সুখশান্তি সকল বিসর্জন দিয়ে, এমন কি পাছে আমি দুঃখ পাই এই ভয়ে আপনার সুরূপকে কুরূপ বলে এতকাল আমার কাছে প্রকাশ করে এসেছেন। আমার অন্ধত্বে সান্ত্বনা দেবার জন্যই না তিনি এ উপায় অবলম্বন করেছিলেন!

মা আঁচলে চোখ মুছে ঘর থেকে চলে গেলেন,—বাবা আগেই চলে গিয়েছিলেন!

স্বামী আমার গদ্‌গদ্‌স্বরে বল্লেন, "কি সুন্দর তুমি!"

ফাল্গুন ১৩২৯

পাঁকের ফুল

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

সহরের ভদ্র পল্লীর মাঝখানে, সন্ধ্যারা থাকে। সন্ধ্যার মা ছিল এক ভদ্রলোকের রক্ষিতা—তিনিই তাকে তাঁর বাড়ীর কাছাকাছি এ বাড়ীখানা কিনিয়া দিয়াছিলেন। এখন সন্ধ্যার মার বয়স হইয়াছে; কিন্তু মেয়ে যৌবনের গৌরবে ভরা। বাড়ীতে সন্ধ্যা থাকে ; আরও তিনটি মেয়ে থাকে। পতিতা হইলেও ইহারা হাপ-গেরস্থ। পাড়ার ভদ্র পরিবারের সঙ্গে এদের একেবারে সম্পর্ক নাই এমন নয়। চারিদিককার বাড়ীর জানালা হইতে বউ-ঝিরা এদের দিকে কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে ; গৃহিণীরা ডাকিয়া খুঁজিয়া কথাও কন। আর দুপুর বেলায় যখন কর্তারা বাড়ী না থাকেন, তখন মাঝে মাঝে এরা প্রতিবেশীদের কারও কারও বাড়ী গিয়া গল্প-সল্পও না করে এমন নয়।

*　　　　*　　　　*

সন্ধ্যার বয়স ষোল ; রূপে সে ঢলঢল করিতেছে। তার উপর তার পুরুষ-মাতান হাবভাব, চঞ্চলতার অবধি নাই। সেই গর্বে সে ধরাকে সরাজ্ঞান করে,—পুরুষ দেখিলেই তাকে কটাক্ষ হানে। তার কটাক্ষে ধরা না পড়িবে এমন কে আছে।

পাড়ার অনেকে পড়িয়াছিল। বেশীর ভাগ ছেলেছোকরারা ; যথা, বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর যোগেন, মিত্তিরদের বাড়ীর ললিত। এরা দুজনেই দ্বিতীয়বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া, পরম উৎসাহে তৃতীয় বার সেই ফাঁড়ি উত্তীর্ণ হইবার আয়োজন করিতেছে। সে আয়োজনের প্রধান উপাদান সন্ধ্যার বাড়ী গিয়া সময়ে অসময়ে আড্ডা দেওয়া।

ইহাদের সঙ্গে সন্ধ্যার সম্পর্কটা ঠিক ব্যবসার সম্পর্ক ছিল না। সন্ধ্যা তাদের মধ্যেই মানুষ হইয়াছে ; ছোট বয়সে তাদের অনেকের সঙ্গেই মেলা-মেশা করিয়াছে। যৌবনেও সেই ভাবটা চলিয়াছে,—স্বতন্ত্র রকমে। এরা কালে-ভদ্রে চুরী-চামারী করিয়া তাকে এক-আধটা উপহার দেয়, এই পর্যন্ত—তা ছাড়া তাদের সঙ্গে সন্ধ্যার টাকা-পয়সার সম্পর্ক নাই।

ভাবটা তার যোগেন বাঁড়ুয্যের সঙ্গেই বেশী। ললিত মিত্তির তাহা লইয়া তাকে খোঁচা দিতে ছাড়ে না ; কিন্তু তাতে যোগেন ও ললিতের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধে বাধে না।

যোগেনদের বাড়ীতে একটী গরীব আত্মীয় থাকিয়া লেখাপড়া করিত ; তার নাম সতীশ। ছেলেটি এমন কিছু হীরার টুক্‌রা নয় ; তবে পরিশ্রমী, কর্তব্যপরায়ণ। যোগেনের সঙ্গে তার খুব ভাব ; কেন না, তারা একসঙ্গে পড়ে, সর্বদা একসঙ্গে শোয়া-বসা করে। তারা দুজনে একসঙ্গেই বাইরের একটা ছোট ঘরে পড়ে ও শোয়। তবে যোগেন গোটা রাত্রিটা সে শয্যায় থাকে না, এই যা তফাৎ।

সতীশকে যোগেন গোপনে সন্ধ্যার কথা সব বলে ;—তার ভালবাসার কথা, আদর-যত্নের কথা, তার রূপ-গুণের কথা, কত কি। সতীশ শুনিয়া কিছু বলে না ; কালে-ভদ্রে একটু আধটু মৃদু আপত্তি করিয়া বলে যে মামা—যোগেনের কাকা—শুনিলে কি বলিবেন। কিন্তু যোগেন সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। বেচারা সতীশ বন্ধু-প্রীতির খাতিরে কথাটা কারও কাছে প্রকাশ করিয়া বলে না।

এক দিন ললিত আসিল যোগেনের কাছে। দুজনে মিলিয়া সেদিন সন্ধ্যার কথা বলাবলি করিতে লাগিল। সতীশ পড়িতেছিল ; তার বইখানা কাড়িয়া লইয়া ললিত বলিল, "আরে

এখন রেখে দে বই—এই বসন্ত-সন্ধ্যায় বই পড়াতে সব দেবতার অভিশাপ আছে।" বলিয়া তাকে দলে টানিয়া গল্প আরম্ভ করিল ; এবং ক্রমে দুজনে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল,—সতীশকে আজ একবার সন্ধ্যার কাছে যাইতেই হইবে, দেখিবে সে কি চমৎকার।

সতীশ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিল না। তার রাগ যাহা হইল সে মনের ভিতরেই চাপিয়া রাখিল। কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা, সকল প্রলোভন ব্যর্থ করিয়া দিল, তার শান্ত দৃঢ়তার বলে শেষ পর্যন্ত সে বলিল, "একবার তোমরা ভেবে দেখছো না—কি অন্যায় ক'রছো তোমরা? তোমাদের বাবা, খুড়ো তোমাদের পিছনে পয়সা খরচ ক'রছেন, তোমাদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য ; আর তোমরা তার এই প্রতিদান দিচ্ছ।"

তারা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ; কিন্তু মনের তলায় তাদের এতটুকু লজ্জা ও সঙ্কোচ হইল যে, আজ বাহির হইবার সময় তারা মিথ্যা করিয়া বলিল, তারা অন্যত্র যাইতেছে। কিন্তু গেল তারা সন্ধ্যারই কাছে।

* * *

তাদের কাছে সতীশের কথা শুনিয়া সন্ধ্যা হাসিয়া উঠিল ; কিন্তু তার মনে হইল রাগ।

সন্ধ্যাকে সতীশ না দেখিয়াছে এমন নয়। গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া অনেক দিন সন্ধ্যা সতীশকে দেখিয়াছে ; ও নিজের রূপ খুব ভাল করিয়াই দেখাইয়াছে ; কটাক্ষ হানিতেও কসুর করে নাই। তবু সে তাকে এত অবহেলা করে যে, এতটা টানাটানি পীড়াপীড়ি পর্যন্ত অগ্রাহ্য করিল ! সন্ধ্যা হাসিয়া বলিল, "একবার কোনও মতে আমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে পার রাত্রে? তার পর দেখি আমি—তার কেমন মুরোদ।"

যোগেন সাহস করিল না ; ললিত উৎসাহ দিল। শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হইয়া গেল। যোগেন বাড়ী গিয়া একবার সব পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিল।

তখন রাত্রি এগারটা। বাড়ীর লোক সবাই ঘুমাইয়াছে, সতীশ ছাড়া। নিঃশব্দে যোগেন ও ললিত সন্ধ্যাকে লইয়া তাদের বাড়ীতে ঢুকিল। যোগেন দুয়ারে আস্তে আস্তে ঘা দিল। সতীশ পড়িতেছিল, উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

ঝড়ের মত ঘরের ভিতর ঢুকিল সন্ধ্যা। বিশেষ করিয়া আজ সে সাজিয়া আসিয়াছে। মাথার চুল হইতে নখের ডগাটি পর্যন্ত সে শোভামণ্ডিত করিয়াছে ;—কিন্তু তার লজ্জা দেহের রূপ মোটেই আবরণ করে নাই। সতীশ তিন হাত পিছাইয়া গেল। দুয়ার বন্ধ করিয়া সন্ধ্যা হাসিয়া তার হাত ধরিয়া বলিল, "আমার উপর তোমার এত রাগ কেন, সতীশ বাবু?"

সতীশের আঠার বছরের যৌবন তার অন্তরের ভিতর ক্ষুধার্ত আর্তনাদ করিয়া উঠিল ; কিন্তু সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নীরবে মাটির দিকে সুধু চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যা তাহাকে টানিয়া কাছে আনিল। সতীশ তখন মুখ কাঁচুমাচু করিয়া করযোড়ে বলিল, "আমাকে দয়া কর—"

সন্ধ্যা বলিল, "দয়া ক'রতেই তো এসেছি। তোমার এই উঠতি বয়সের এত সুখ,—একে সুধু বই পড়ে পড়ে ঝাঁঝরা ক'রে দিচ্ছ ; তাই তো দয়া ক'রে তোমায় উদ্ধার ক'রতে এলাম।" বলিয়া সন্ধ্যা তার কাঁধের উপর মাথাটা এলাইয়া দিল।

সতীশের সমস্ত শরীরে লোমহর্ষণ হইল—বুক টিপ টিপ করিতে লাগিল ;—সে ধপ করিয়া সন্ধ্যার পদ্মের মত পায়ের উপর পড়িয়া কাতর স্বরে বলিল, "আমাকে ছেড়ে দাও—আমি—আমি বড় গরীব।"

সন্ধ্যা তাহাকে ছাড়িয়া দুই হাত পিছাইয়া গিয়া অভিমান করিয়া বলিল, "যাও, তুমি বড় বেরসিক! আমি কি টাকা-পয়সা চাইছি তোমার কাছে, যে, বলছো তুমি গরীব ! আমি সুধু চাই তোমাকে গো তোমাকে।"

এই বলিতে বলিতে সন্ধ্যা হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া তাকে বাহু-বেষ্টনে বাঁধিয়া আপনার

বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

সতীশ তখন একটা ঝট্‌কা মারিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া তফাতে ছিট্‌কাইয়া দুয়ারের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

কষ্টে নিঃশ্বাস চাপিয়া সে বলিল, "বেরোও তুমি—এক্ষুণি বেরিয়ে যাও ;—নইলে মামাবাবুকে ডেকে সব ব'লে দেব।"

বলিয়া সে হুড়কা খুলিয়া দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

যোগেন দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। রকম-সকম দেখিয়া সে ভয় পাইয়া বলিল, "চলে আয় সন্ধ্যা, চলে আয়,—আর বাড়াবাড়িতে কাজ নেই।"

সন্ধ্যাও ভয়ানক থতমত খাইয়া গিয়াছিল—সে নিঃশব্দে মাথা নীচু করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সকলে চলিয়া গেলে, সতীশ কম্পমান দেহে বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কেন সে এত কাঁদিল তার অন্তর্যামী জানেন।

* * *

তার পর ছ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার চঞ্চলতা কাটিয়া গিয়া সে ভয়ানক গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে।

ললিত মিত্তির মারা গিয়াছে। যোগেন পড়া ছাড়িয়া কালেক্টরীতে কেরানীগিরি করিতেছে। সতীশ পড়া বেশী দূর করিতে পারে নাই। সে মোক্তারী পাশ করিয়া প্র্যাকটিশ আরম্ভ করিয়াছে—একরকম চলিয়া যাইতেছে।

যোগেন এখনও সন্ধ্যার কাছে আসে, কিন্তু খুব বেশী নয়।

* * *

সেবার বসন্তের বড় উপদ্রব।

একদিন যোগেন আসিয়া বলিল, "সতীশকে মনে আছে তোমার?"

যেন মনে নাই এমনি ভাব দেখাইয়া ভুরু কুঁচকাইয়া সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করিল,"কোন্ সতীশ?"

"ওই যে আমাদের বাড়ীতে থেকে পড়তো—যার কাছে একদিন রাত্রে নাকাল হ'য়েছিলে তুমি।" বলিয়া যোগেন হাসিল।

সন্ধ্যার মুখখানা হঠাৎ রক্তজবার মত লাল হইয়া উঠিল ; সে বলিল, "হাঁ মনে পড়েছে—সে লোকটা পুরুষ নয়!"

"তা যা' ব'লেছ! সে এখানে মোক্তারী ক'রছে।"

এ খবর সন্ধ্যার অজানা ছিল না। কিন্তু সে খবর সে গোপন করিয়া বলিল, "তাই না কি?"

"হাঁ—বেচারা বড় বিপদে প'ড়েছে। তার স্ত্রীর হ'য়েছে বসন্ত—আজ পাঁচ দিন—আর এদিকে সে রক্তামাশয়ে ভয়ানক কাবু হ'য়ে প'ড়েছে। তাদের দেখবার একটা লোক নেই।"

মুখটা একটু কঠোর করিয়া সন্ধ্যা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কেন—তুমি?"

"আমি কি ক'রে যাই বল, বসন্তের রোগী তার বাড়ীতে—ছেলেপিলে নিয়ে বাস করি। তা' আমি যাচ্ছি, একবার হাসপাতালে ডাক্তারবাবুকে খবর দিইগে,—তিনি যদি ওদের দুটীর কোনও ব্যবস্থা ক'রতে পারেন।"

সন্ধ্যার মুখটা আর একটু শক্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, তা ক'রবে বই কি। তবে যাও তাই ; কি ক'রবে আর।"

সতীশ কি করে, কবে সে বিবাহ করিয়াছে, কোথায় সে থাকে, কি রকম তার আয়, এ সব কোনও কথাই সন্ধ্যার অজানা ছিল না। সে পরোক্ষে নানা উপায়ে এ সব সংবাদ

রাখিত। কেন, তা সেই জানে--হয় তো জানেও না।

* * *

দারুণ রক্তামাশয়ে সতীশ ভুগিতেছে, যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে--সর্বদা তার শুশ্রূষার দরকার ; অথচ থাকিবার মধ্যে আছে একটা চাকর--সে এখনও ছাড়ে নাই। ওদিকে স্ত্রী নিদারুণ বসন্ত রোগে কাতরাইতেছে। চাকরটা কেবল ঘর বাহির করিতেছে। ডাক্তার ডাকিতে যায় সে--ডাকিলে কেহ আসে না।

ভাবিয়া ভাবিয়া সতীশের চিত্ত ভয়ে দুঃখে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে ; এ বিপদ হইতে উদ্ধারের কোনও উপায়ই সে ভাবিয়া পাইতেছে না।

তখন সতীশ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া ছিল ; তার পিছনে দুয়ারটা ভেজান ছিল। চাকর গিয়াছে ডাক্তারের কাছে ওষুধ আনিতে। ডাক্তারবাবু আসেন না ; কিন্তু চাকরের মুখে অবস্থা শুনিয়া ওষুধ দেন।

দুয়ারটা একটু খুলিতে সে শব্দে সতীশের মোহ একটু ভাঙ্গিল, সে মুখ ফিরাইয়াই বলিল, "রামু এসেছিস--বিছানাটা নোংরা হ'য়ে গেছে, দে বাবা একটু পরিষ্কার ক'রে।" বলিয়াই আবার সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যে আসিয়াছিল সে যত্নের সহিত বিছানা পরিষ্কার করিয়া দিল। তার পর সে ঘর-দ্বার পরিষ্কার করিয়া ছিমছাম করিয়া ফেলিল। তার পর আবার বিছানা পরিষ্কার করিতে হইল। তার পর সে সতীশের স্ত্রীর ঘরে গেল।

সেখানে গিয়া ঘর-দ্বার যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া, যথাসাধ্য রোগিণীর আরামের ব্যবস্থা করিয়া গা ধুইতে গেল।

ঔষধের গুণে সতীশ সারারাত্রি ঘুমাইল। তার শিয়রে বসিয়া কে বাতাস দিতেছিল, তাহা সে দেখিতে পাইল না।

সকালে যখন তার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন তার শরীরটা একটু সুস্থ বোধ হইতেছিল। এদিক ওদিক চাহিয়া সে ঘরের পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া একটু আশ্চর্য হইয়া গেল।

মেঝের দিকে চাহিয়া সে দেখিতে পাইল, কে একটী নারী সুধু মেঝের উপর আঁচল বিছাইয়া ঘুমাইতেছে। তার মুখ ফেরান ছিল ; কিন্তু সতীশের বুঝিতে কষ্ট হইল না যে, মেয়েটি সুন্দরী। কে এ?

ক্ষীণকণ্ঠে সতীশ ডাকিল, "রামু!"

মেয়েটির নিদ্রা চট্ করিয়া ছুটিয়া গেল। সে ধাঁ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কেন, কি চাই?"

সতীশ অবাক্ হইয়া বলিল--"তুমি! সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যা--বেহায়ার শিরোমণি সে--কি এক অজানা লজ্জায় মুখ লাল করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল।

তার একটু পরে সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "খুব আশ্চর্য লাগছে, না? কি ক'রবো, কাল শুনলাম যোগেনের কাছে--তোমাদের স্বামী-স্ত্রী দুজনের অসুখ--দেখবার লোক নেই--তাই এলাম। এখন কিন্তু রাগ করো না সতীশ বাবু। তোমরা ভাল হ'লেই চ'লে যাব।"

এ কথার উত্তরে সতীশ কিছু বলিল না, বলিতে পারিল না। তার বুক ভরিয়া উঠিল, দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

সন্ধ্যা আস্তে আস্তে তার খাটের পাশে আসিয়া বসিল--চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পর সসঙ্কোচে সে তার আঁচল দিয়া সতীশের চোখ মুছাইয়া দিল। তার পর সে উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "যাই, দিদিকে দেখে আসি একবার।" বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

তখন তার চোখেও স্রোত বহিতেছে।

*   *   *

জীবনটাকে তুচ্ছ করিয়া সন্ধ্যা দুই রোগীর শুশ্রূষা করিল। এত পরিশ্রম, দিন-রাত সমান করিয়া এমন প্রাণপাত সেবা সে যে করিতে পারে, এ কথা সে নিজেই আগে বিশ্বাস করিত না।

তিন সপ্তাহ বাদে যখন স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল, তখন সন্ধ্যা বিদায় লইতে গেল।

সতীশের স্ত্রী বলিল, "দিদি, তুমি আমাদের জীবন দিয়েছ, তোমাকে আর কি বলবো। আশীর্বাদ কর, যেন এ জন্মে হ'ক আর-জন্মে হ'ক, তোমার ঋণ শোধ ক'রতে পারি।"

বালিকার ক্লিষ্ট শীর্ণ মুখখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সন্ধ্যা তাহাকে চুম্বন করিল। তার পর সে চক্ষু মুছিল।

সেখান হইতে সে বাহিরের ঘরে গেল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সতীশ একলা চুপ করিয়া বাহিরের ঘরে ফরাসে শুইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে;--

অন্ধকার সে ঘর, বাতি জ্বালার কথা তার মনে নাই।

সন্ধ্যা আসিয়া নিঃশব্দে তাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "এখন যাই সতীশবাবু।"

সতীশ যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিল। সে বলিল, "যেয়ো না, ব'সো।"

সতীশের পদপ্রান্তে বসিয়া সন্ধ্যা তার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

সতীশ উঠিয়া বসিল। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "যাবার দরকার কি সন্ধ্যা? থাক না তুমি এখানেই।"

হাসিয়া সন্ধ্যা বলিল, "সে কি গো বাবু, আমার বাড়ীঘর-দোর প'ড়ে র'য়েছে, লোকজন আছে—আমি এখানে থাকবো কি?"

সতীশ কপালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল, "কিছুতেই কি তোমায় রাখা যায় না সন্ধ্যা? যদি—যদি—"

সন্ধ্যা মাটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর সতীশ বলিল, "তুমি ছ' বছর আগে যা চেয়েছিলে সন্ধ্যা. আজ তা' আমি স্বেচ্ছায় তোমায় দিচ্ছি—তুমি আমাকে নেও—আর গিয়ে কাজ নেই।"

"ছিঃ," বলিয়া সন্ধ্যা আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর একটু সরিয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "যাই আমি—সতীশবাবু।"

বলিয়া অতি ধীর পদে দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সতীশের মনের মধ্যে একটা নিদারুণ ব্যথা মোচড় দিয়া উঠিতে লাগিল।

একটু পরে সন্ধ্যা আবার ফিরিয়া আসিল।—আবার সতীশের পায়ের কাছে বসিয়া পায়ে হাত দিয়া বলিল, "আমার উপর রাগ ক'রো না সতীশবাবু। ভুল বুঝো না। আমি যে তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি সে অভিমান ক'রে নয়—দেমাক ক'রেও নয়। তুমি আজ আমায় যা দিতে চাইলে, তোমার কাছ থেকে আমি তা কোনও দিনই নিতে পারবো না। সে এই জন্য যে, আমার জন্য তুমি খাটো হ'বে, এ আমি সইতে পারবো না. তা' ছাড়া, আমি যত মন্দই হই—তোমার কাছে মন্দ দিকটা আমার কিছুতেই দেখাতে পারবো না।" তার পর সে একটু হাসিয়া বলিল, "জানোয়ার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি তো দিনরাত ক'রছি। একটা মানুষ থাক আমার!"

বলিয়া সতীশের পায়ে তিনবার মাথা ঠুকিয়া সন্ধ্যা চলিয়া গেল।

আশ্বিন ১৩৩৪

রাজার জন্মদিন

রমেশচন্দ্র সেন

মধ্যযুগের কাহিনী।

প্রথমে ছিল বারজন রাজবন্দী, প্রত্যেকেই যুবক, সকলেই সম্ভ্রান্ত-বংশীয়।

প্রতি বৎসর মহারাজার জন্মদিনে এক একজন করিয়া খালাস পাইয়া তখন ছিল মাত্র তিনজন।

রক্ষীদের সঙ্গে কথা বলিবার হুকুম নাই। প্রকাণ্ড এই দুর্গে তাদের সঙ্গী ছিল তারা নিজেরা আর ছিল গাছের পাখী, আকাশের তারা, চন্দ্রসূর্যের আলো।

পূর্বে বন্দীদের রাখা হইত পৃথক পৃথক কুঠরীতে। কিন্তু সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় এবং কারাগারের নিয়ম ভঙ্গ না করায় এখন রাত্রেও তারা এক ঘরে থাকিবার হুকুম পাইয়াছে।

গল্পগুজব করিয়া, দাবা ও পাশা খেলিয়া, দৌড় ঝাঁপ করিয়া সময় তারা একরূপ কাটাইয়া দেয়। কখনও প্রেমের গল্প করে, কখনও আলোচনা করে রাজনীতি, সমাজনীতি বা সাহিত্যের।

রাজশেখর মাঝে মাঝে গান গায়, কোনও সময় স্তোত্র আবৃত্তি করে, কখনও বা বন্ধুদের শুনায় তার স্বরচিত চম্পূকাব্য।

একটী বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার সময় কারাধ্যক্ষ আসিয়া খবর দিলেন, রাত্রি প্রভাতে রাজশেখর মুক্তি পাইবে।

জয়ন্ত ও জীমূতবাহন সমস্বরে বলিয়া উঠিল "জয় রাজশেখরের।"

তাদের আনন্দের আর সীমা নাই, জয়ধ্বনি করিয়া, চেঁচাইয়া গান গাহিয়া তারা ঘরখানাকে সরগরম করিয়া তুলিল।

জয়ন্ত বলিল, 'মুক্তি ত' পাচ্ছ, কিন্তু মনে থাকে যেন চম্পার খবর আমাকে দিতে হবে।'

রাজশেখর কহিল, 'নিশ্চয়।'

জয়ন্ত একটু হাসিল। মুক্তি-প্রাপ্ত আরও দুই একজন বন্ধুকে এইরূপ অনুরোধ করায় তারাও কথা দিয়াছিল চম্পার খবর পাঠাইবে।

কিন্তু খবর সে পায় নাই।

রাজশেখর জীমূতবাহনকে জিজ্ঞাসা করিল, তার কোনও সংবাদ দিবার আছে কি না।

জীমূতবাহন বলিল, 'না।'

প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষী দরজা খুলিয়া দিলে তিনজনেই উঠানে আসিয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল,—প্রথমে জয়ন্ত, মধ্যে রাজশেখর, শেষে জীমূতবাহন। রাজশেখরের গলায় একটা ফুলের মালা।

চলিতে চলিতে সে গান ধরিল, "নমস্তে সতেতে জগৎ কারণায়।" বন্ধুরা মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিল, 'নমস্তে—'

দুর্গের ফটকে আসিয়া রাজশেখর দুই বন্ধুকে আলিঙ্গন করিল। তিনজনেই নির্বাক, তিনজনেরই চোখ আর্দ্র।

বাষ্পাকুল কণ্ঠে রাজশেখর কহিল, 'আসি ভাই।'

বিদায়ের পালা বোধ হয় আর একটু দীর্ঘ হইত, কিন্তু প্রহরী বলিয়া উঠিল, 'সময়

সংক্ষেপ।'

প্রহরীরা রাজশেখর ও বন্ধুদের মধ্যে লৌহ কপাটের যবনিকা টানিয়া দিলে জীমূতবাহন ও জয়ন্ত পরস্পরের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিতে ছিল গভীর হতাশা—এবং একের প্রতি অপরের একান্ত নির্ভরতা।

সেদিন আর তাদের বিশেষ কোন কথাবার্তা হইল না। সমস্ত দিন একটা অজানা বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল।

আজ তাদের আরম্ভ হইল একটা নূতন জীবন, উভয়ের একটা স্বতন্ত্র জগৎ, যেখানে সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে আর কোন সহায় নাই, সম্বল নাই।

ক্রমে ক্রমে এই নূতন জীবনে তারা অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। কেহই সুকণ্ঠ নয়, তবু মাঝে মাঝে গান ধরে ; কবি নয়, তবু কথাগুলিকে চেষ্টা করে ছন্দে বাঁধিবার।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে মাঠে দৌড়ায়, দুপুরে সাঁতার কাটে, খাওয়ার পর দাবা খেলে, কখনও বা নিদ্রা দেয়।

দুইটী প্রাণী থাকে পরস্পরের ছায়ার মতো। গোপন তাদের কিছু নাই, চিন্তায়, কর্মে সকল বিষয়েই একটা খোলাখুলি ভাব।

জীমূতবাহন চাপা ধরণের লোক, এতদিন নিজের প্রেমের ইতিহাস সে গোপন করিয়াই আসিয়াছে। এবার একদিন জয়ন্তের কাছে সে ধরা দিল, বন্ধুকে বলিল তার প্রেমের গল্প, জীবনের প্রথম ও শেষ প্রেম।

ঘটনাটা এইরূপ—

জীমূতবাহনের প্রেমাস্পদ ছিল তারই কোন বন্ধুর আত্মীয়া। পাছে বন্ধুর প্রাণে আঘাত লাগে, পাছে তার উপর বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়, সেই জন্য প্রেমের প্রতিদান পাইয়াও সে পিছাইয়া আসিয়াছিল।

সেই হইতে নারী সম্বন্ধে কোন ঔৎসুক্য কি কৌতূহল তার নাই।

ব্যথা সে পাইয়াছিল খুবই কিন্তু উপায় ছিল না,—এক দিকে বন্ধুত্বের মর্যাদা, আর এক্‌ দিকে প্রেম।

জীমূতবাহনের উপর জয়ন্তের অনুরাগ সেই হইতেই যেন আরও বাড়িয়া গেল—সেও যে প্রেমিক, সেও যে তার সহধর্মী!

আগে মনে করিত লোকটা অরসিক, তাই চম্পার কথা ততটা প্রাণ খুলিয়া বলিত না। কিন্তু এখন আর দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই।

কিছু দিন পরে জীমূতবাহনের অসুখ করিল,—জ্বর, বমি, মাথায় যন্ত্রণা।

প্রথমে মনে হইয়াছিল অল্পেই সারিয়া যাইবে। কিন্তু উপসর্গ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।

রাজধানী হইতে বিচক্ষণ বৈদ্য আসিলেন। নাড়ী পরীক্ষা করিয়া তিনি ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু বলিলেন, ব্যাধি গুরুতর ; জীবনের আশা কম।

জয়ন্ত জননীর মত সেবা করিতে লাগিল, বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই। নিজ হাতে সে মলমূত্র পরিষ্কার করে, রোগীর শয্যা ছাড়িয়া বড় একটা ওঠে না।

রাত্রে ঘুম নাই, অনেক সময় খাইতেও ভুলিয়া যায়।

তার অনলস এই সেবা দেখিয়া কারারক্ষীরাও মুগ্ধ হয়, পরস্পর বলাবলি করে, এই দৃশ্য অপূর্ব।

বৈদ্য তার জন্য ভীত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "এরূপ ভাবে চললে তোমারও অসুখ

করবে।'

কিন্তু জয়ন্ত ভ্রূক্ষেপ করে না, সেবার নেশা তখন তাকে পাইয়া বসিয়াছে। তার শুধু চেষ্টা কিসে জীমূতবাহন একটু আরাম পায়।

বন্ধুর শুশ্রূষাগুণে দু'মাস ভুগিয়া জীমূতবাহন নীরোগ হইয়া উঠিল, পথ্য পাইল। জয়ন্তের আনন্দ আর ধরে না, সে যেন একটা অকূল-পাথারে পড়িয়াছিল, এবার তার কূল মিলিয়াছে।

জীমূতবাহন কহিল, 'আর জন্মে তুমি আমার ভাই ছিলে—'

জয়ন্ত হাসিয়া উত্তর করিল, 'এ জন্মেই বা কম কিসে?'

এইরূপ সৌহার্দ্যের আনন্দে তাদের দিন কাটিয়া যায়, তারা ভুলিয়া থাকে অনেক দুঃখ কষ্ট।

জীমূতবাহন বলে, 'এই বন্ধুত্ব আমাদের কারা-ক্লেশের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।'

মাঝে মাঝে হয় মুক্তির কথা। সেই প্রসঙ্গ উঠিলেই একজনে কামনা করে অপরের মুক্তির।

জীমূতবাহন বলে, 'একজন নারী তোমার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছে, অতএব মুক্তি পাওয়া উচিত তোমার।'

'এত দিন যখন করেছে আরও এক বছর না হয় করুক, তোমার মুক্তির বিনিময়ে আমি খালাস হতে চাই না।'

জীমূতবাহন বলে, 'প্রেমিকের জীবনে এক বছরের মূল্য ত বড় কম নয়।'

সময় কাটাইবার আর পাঁচটা উপাদানের মধ্যে একটা উপায় তারা অবলম্বন করিয়াছে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা,—রাজার আগামী জন্মদিনে মুক্তি মিলিবে কার।

পরীক্ষা করে তাম্র কি রৌপ্য মুদ্রা ঘুরাইয়া, পাশার ঘুঁটি চালিয়া এবং আরও অনেক কিছুর সাহায্যে।

ভাগ্যলক্ষ্মী কখনও প্রসন্ন হন একের উপর, কখনও অপরের প্রতি। যার নাম ওঠে সে অপরকে বলে, 'না ভাই, আমি চাই—এ বছর তুমি মুক্ত হও।'

মুক্তির দিন ঘনাইয়া আসে, মাত্র মাস দেড়েক বাকী।

একদিন জয়ন্ত শৌচাগার হইতে ফিরিতেছিল, তার কানে গেল দুইটী প্রহরীর কথোপকথন।

একজন বলিতেছিল, 'এবার বন্দী ত খালাস পাবে একজন, আর একজন থাকবে কি করে?'

'কেন?'

'একা থাকা যে ভারী কষ্টের। এখানেই বছর পনের আগে একটী বন্দী নিঃসঙ্গ কারাবাসের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিল ঐ ওদেরই ঘরে।'

জয়ন্ত চলিয়া আসিল।

কিন্তু এই কথা কয়টা তার হৃদয়ে গাঁথিয়া রহিল—পাথরের দাগের মতন।

সে অনেক চেষ্টা করিল এই দুর্ভাবনাটাকে ঝাড়িয়া ফেলিবার। কিন্তু যখনই একা থাকে তখনই মনে পড়ে প্রহরীদের সেই কথাবার্তা।

ব্যাপারটাকে ত এ ভাবে কখনও ভাবিয়া দেখে নাই। অবশ্যম্ভাবী নিঃসঙ্গ কারাজীবনের বিভীষিকার কথা মনে হয় নাই দু'জনের কাহারও।

জয়ন্তের মনে পড়িল তাদের গ্রামের এক ভূস্বামীর কথা। নির্জন কারাবাসের ফলে ছয়

মাসের মধ্যে তার মাথা এতদূর খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে নিজের পুত্র কন্যাকেও সে চিনিতে পারে নাই।

জয়ন্ত মানুষটাকে দেখিয়াছিল—আজন্ম মস্তিষ্কহীনের চেয়েও কৃপার পাত্র, বদ্ধ উন্মাদের চেয়েও অসহায়।

অথচ এই মানুষই বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, ধনদৌলতে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে একদিন সমাজের শিরোমণি ছিল।

জয়ন্তের ভয় হয় তারও ত এইরূপ হইতে পারে। মাঝে মাঝে একলা বসিয়া সে কি যেন ভাবে।

জীমূতবাহন ব্যাপারটা লক্ষ্য করিল। সে বলিল, 'কি হয়েছে তোমার?'

জয়ন্ত সব কথা খুলিয়া বলিল।

জীমূতবাহন উত্তর করিল, 'আচ্ছা দু'জনের কারো যদি মুক্তি না মেলে?'

জয়ন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলিল, 'সে ত খুব ভাল কথা,—তবুও একসঙ্গে থাকতে পারবো।'

কিন্তু ভীতি তার কাটে না। সে ভাবে জিনিষটা কি সম্ভব? উভয়ের মুক্তি অথবা উভয়েরই আর এক বৎসর একত্র কারাবাস—যেন কল্পনারও অতীত।

তার এই হতাশ ভাব জীমূতবাহনের মনেও ধীরে ধীরে সংক্রামিত হয়। সেও মনে করে সত্যই ত'—এ দিকটা একেবারে উপেক্ষার নয়।

একদিন প্রভাতে সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশে একটা বাজ উড়িয়া যাইতেছিল।

জয়ন্ত বলিল, 'ওটা যদি নদীর দক্ষিণ বাঁকের দিকে যায় আমি মুক্তি পাব, বাঁয়ে গেলে তুমি।'

চক্রবাল রেখার সীমা অতিক্রম করিতে বাজেরও সময় লাগে। তারা একদৃষ্টে ততক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

উড়িয়া উড়িয়া পাখীটা প্রান্তরের প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছিয়া বাঁ দিকে চলিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তের মুখখানা ম্লান হইল।

ঐ যে পাখীটা অনন্ত নীল আকাশে একটা শিশির কণার মতো সেও মুক্ত, সেও বিচরণ করে স্বাধীনভাবে।

ঐ পাখীর সঙ্গে তুলনায় তার নিজের জীবন?

কিন্তু এখানেই ত' ইহার শেষ নয়, গভীরতর দুঃখ লইয়া ভবিষ্যৎ তাকে গ্রাস করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।

ঠিক এই সময় জীমূতবাহন গলা ছাড়িয়া আবৃত্তি আরম্ভ করিল—

"প্রলয় পয়োধি জলে ধৃত বানসিবেদং
বিহিত বহিত্র চরিত্র মখেদং—"

সে বোধ হয় চাহিয়াছিল ভগবানকে স্মরণ করিয়া মেঘের মতন নিজের মনের গ্লানিটুকুকে উড়াইয়া দিতে।

কিন্তু কারও মন হইতে সেই কালো মেঘটুকু আর উড়িল না. বরঞ্চ ক্রমেই তাদের মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইল।

সেই হইতে আর তারা ভাগ্য পরীক্ষা করিতে সাহস করে নাই, মুক্তির কথা পর্যন্ত মুখে আনে নাই।

সেই অকপট বন্ধুত্ব, প্রাণ খুলিয়া মেলামেশা একে একে সবই নষ্ট হইয়া গেল, রহিল ভদ্রতার একটা বহিরাবরণ মাত্র।

সেদিন দুপুরে তারা দাবা খেলিতেছিল।

খেলাটা বেশ জমিয়াছে—দু ঘণ্টা চলিয়াছে একটা বাজী, শেষ আর হয় না।

জয়ন্ত একটা ব'ড়ের চাল ফেরৎ নিতে চাহিলে জীমূতবাহন বলিয়া ফেলিল—'শুধু এ ব্যাপারে নয়, তোমার প্রকৃতির পরিচয় পাই প্রতি মুহূর্তে।'

'কি রকম?'

'তুমি মনে কর আমি তোমার মুক্তির প্রধান অন্তরায়।'

জয়ন্ত কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল, 'যাক, নিজের পরিচয় তুমি ভাল করেই দিলে।'

খেলা আর শেষ হইল না। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাদের বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ হইল।

কথা বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়েই পূর্ব নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। তারা স্নান করে পৃথক সময়ে, আহার করে পৃথক স্থানে, যথাসম্ভব একে অপরকে এড়াইয়া চলে।

রাত্রে একঘরে না থাকিলে নয় তাই থাকে, কিন্তু পৃথক থাকিতে পারে না বলিয়াও পরস্পরের প্রতি রাগিয়া যায়।

মন তাদের বিষাইয়া উঠে প্রত্যেকটী খুঁটিনাটি অবলম্বন করিয়া।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে কেহই ভাবে না যে সে নিজেও মুক্তি পাইতে পারে। একে ভাবে মুক্তি মিলিবে অপরের।

কাল রাজার জন্মদিন, আজ সন্ধ্যার পর মুক্তি সংবাদ আসিবে। দু'জনেই সাগ্রহে সূর্যাস্তের প্রতীক্ষা করিতেছে। মুক্তি একজনের হইবেই, যার হয় হৌক্—কিন্তু এ সংশয় আর ভাল লাগে না।

সন্ধ্যার কিছু পরেই কারাধ্যক্ষ আসিয়া ঘোষণা করিলেন, 'অশেষ গুণালঙ্কৃত সর্বশক্তিমান্ শ্রী শ্রীল শ্রীমন্মহারাজের পবিত্র জন্মতিথি উপলক্ষ্যে জীমূতবাহন মুক্তি পাইবেন। প্রভাতে কারাগৃহ হইতে বাহিরে যাইবার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকুন।'

রাজাদেশ শুনাইয়া কারাধ্যক্ষ চলিয়া গেলেন।

জীমূতবাহন কেমন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল। সে বুঝিতে পারিল না মুক্তির এই বাণী আনন্দের না বিষাদের।

আর জয়ন্ত?

প্রথমে যেন সে ঘোষণাবাণীর অর্থই উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ধীরে ধীরে কথাগুলি দুই দুইবার আওড়াইয়া সে হাসিয়া ফেলিল, নিজের অন্তহীন দুঃখের প্রতি একটা তীব্র বিদ্রূপের সুরে।

বাহিরে চাঁদের আলোর উপর শীতের কুয়াসা একটা পর্দা টানিয়া দিয়াছে।

প্রকৃতিকে দেখা যাইতেছে সদ্য শোকাতুরা বিধবার মতো।

জয়ন্ত ও জীমূতবাহনের মনের উপর কুয়াসার পর্দারই মতন একটা আবরণ।

দু'জনে দুটা জানালায় দাঁড়াইয়া, একজন পূবের—একজন দক্ষিণের।

জয়ন্তের কাছে সবই অর্থহীন সবই অস্পষ্ট,—মাতাল, যেমন রাত্রি প্রভাতে মাথায় একটা চিনচিনে বেদনা বোধ করে তার ঠিক সেই অবস্থা।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতেই সে স্বাধীন ইহা ভাবিয়াও জীমূতবাহনের মনে শান্তি নাই। তার খালি মনে হইত লাগিল—জয়ন্তের নিকট সে যেন কত বড় অপরাধী। ইচ্ছা হইল একবার তাহার হাত ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করে।

কিন্তু ভাষা যোগাইল না।

দু'জনেই নির্বাক,—একজন হতাশায়, অপরে সৌভাগ্যের সঙ্কোচে।

জয়ন্তের চোখের সামনে তখন ভাসিয়া উঠিতেছিল নিঃসঙ্গ কারাবাসের ছবি।

তার মনে পড়িল নিজের পরিচিত সেই হতভাগ্য ভূস্বামীকে, মনে পড়িল এই কক্ষেই একজন বন্দী গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল।

করিয়াছিল নির্জন কারাবাসের বেদনার পরিসমাপ্তি করিতে।

ভাবিতে ভাবিতে জয়ন্তের চোখ দুটো লাল হইয়া উঠিল।

জীমূতবাহন তখন তার দিকে চাহিয়া আশঙ্কা করিতেছিল—মানুষটা বুঝি-বা পাগল হইয়া গেল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, কতক্ষণ তার হিসাব নাই।

একটা পাখীর ডাক শুনিয়া দু'জনেরই চমক ভাঙ্গিল। এই পাখী ডাকে প্রতি প্রহরে।

এটা কোন্ প্রহরের ডাক, প্রথম না দ্বিতীয় প্রহরের?

অন্যবার এইদিন কত উৎসব, কত আনন্দ হয়। বন্দীরা গান করে, মুক্তি-প্রাপ্তের জয়ধ্বনি করে, তাকে কত বিচিত্র অনুরোধ করে, বাহিরে যাইয়া সে বন্ধুদের কি কি কাজ করিবে। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লাগিয়া যায় পরিপাটী করিয়া তার জিনিষ গুছাইবার।

এবার জীমূতবাহনের জিনিষগুলি পড়িয়াই আছে, সেও তাতে হাত দেয় নাই।

একটা তোরঙ্গের উপর বসিয়া বসিয়া সে ভাবিতেছিল বাহিরে যাইয়া জয়ন্তের মুক্তির জন্য কি কি পন্থা অবলম্বন করিবে, কাহাকে ধরিবে, কোন্ প্রতিপত্তিশালী অভিজাতের মারফৎ, রাজাব নিকট আবেদন করিবে।

জয়ন্ত তখন ঘরের মধ্যে পদচারণা করিতেছিল। মাথা একটু নাড়িতে নাড়িতে আপন মনে কি বকে, একবার ঘরের এদিক হইতে ওদিকে যায়, আবার ফেরে।

কখনও হাত তার মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আসে, কখনও বা ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটিয়া ওঠে একটু হাসি।

জীমূতবাহনের ঘুম পাইতেছিল। এমন সময় তার কানে গেল পাখীর তৃতীয় প্রহরের ডাক, আর প্রহরী পরিবর্তনের সময়ের অস্ত্রের ঝন্ঝন্ শব্দ।

অনেকটা সময় একই অবস্থায় থাকার পর এই সামান্য শব্দটুকুও ভাল লাগিল,—মনে হইল ইহা কত সুন্দর, কত অভিনব। ঘুমের ঘোরে সে মেজের উপর লুটাইয়া পড়িল।

হাঁটিতে হাঁটিতে জয়ন্ত একবার জীমূতবাহনের দিকে চায়, কি যেন ভাবিয়া দেওয়ালের উপর ঘুসি মারে, হাত ক্ষতবিক্ষত করে।

আপন মনে বলে, 'বাঃ বেশ শাস্তি।'

একবার ভাবে জীমূতবাহনকে ডাকিয়া তোলে, খুলিয়া তাকে সব কথা বলে।

আবার ভাবে, না, মুক্তির সংবাদ প্রাপ্তির পরও ত' জীমূতবাহন তার সঙ্গে একটা কথা বলে নাই।

হঠাৎ জয়ন্তের মাথায় একটা বুদ্ধি যোগাইল, একটা কাপড় পাকাইয়া প্রথমে সে নিজের পা বান্ধিল, তার পর দাঁত দিয়া কাপড়খানাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া হাত দু'টাকেও বাঁধিয়া ফেলিল।

সেও পড়িয়া রহিল মেঝের উপর।

রাজার জন্মদিন—

জয়ন্ত দরজার কাছে একটা চারপাইর উপর বসিয়া আছে। পরণে তার জীমূতবাহনের পোষাক, মাথায় তারই উষ্ণীষ।

দরজা খুলিবামাত্রই সে বাহির হইয়া যাইবে। যদি কেহ বাধা দেয় তবে রক্তগঙ্গা বহাইবে।

কিন্তু এ কী!

অন্যবার ভোরের সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীরা দরজা খুলিয়া দেয়। এবার এত বিলম্ব কেন?

ঘর যে আলোয় ভরিয়া গেল, এ আলো ত তার সহ্য হয় না।

একদৃষ্টে সে চাহিয়া রহিল দরজার দিকে।

দূরে পদশব্দ শোনা গেল, একজন, দু'জন—বহু লোকের পদশব্দ।

শব্দ ক্রমে স্পষ্টতর হইল,—একেবারে দরজার বাহিরে।

লৌহ-কপাট ঝনঝন শব্দে খুলিয়া গেল।

প্রথমে রাজার জন্মোৎসবের উপযুক্ত উজ্জ্বল পরিচ্ছদে ভূষিত কারাধ্যক্ষ, পিছনে প্রহরীর দল।

চৌকাঠের উপর পা দিয়াই কারাধ্যক্ষ বলিলেন,—শ্রীমন্মহারাজ তাঁর আদেশ পরিবর্তন করিয়াছেন। আপনারা দু'জনেই মুক্ত।

জয়ন্ত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'দু'জনেই?'

কারাধ্যক্ষ তার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। একটু আগাইয়া আসিয়া দেখিলেন, মেঝের উপর জীমূতবাহনের দেহ পড়িয়া আছে, তার মুখে, বুকের উপর এবং চোখের কোণে জমাট বাঁধা রক্ত। একটা কষ বাহিয়া রক্ত গড়াইয়া কালো শিরার মত দাগ পড়িয়াছে।

জয়ন্ত তখন ধীরে ধীরে আপন মনে বলিতেছিল,—'আমরা দু'জনেই মুক্ত।'

বৈশাখ ১৩৪২

অহিংসা

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পিনাকীলাল ক্রমশই বিলাতপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রসমাজের কৌতূহল ফেনাইয়া তুলিতেছিল। প্রায় সমবয়স্ক আটত্রিশটি ছেলের মধ্যে সে ছিল সকলের চেয়ে মাথায় খাটো, গায়ের জোরেও সে সবার পিছনে গিয়া পড়িত, রূপের লালিমা তাহাকে দেখিয়া মুখ ভ্যাংচাইয়া টিটকারী দিত ; কিন্তু বিতর্কের সময় এই খর্বাকৃতি ছেলে সভাজনের দৃষ্টি এমন ভাবে আকৃষ্ট করিত যে তখন তাহাকে আর পিছনে ফেলিয়া রাখা চলিত না। পিনাকীর চেহারার খর্বতা ও উক্তির উগ্রতা লক্ষ্য করিয়া অ-বাঙালী ছেলেরা বলাবলি করিত, 'কীন্ য়্যাজ মাস্টার্ড!' বাঙালী ছেলেরা বলিত, 'মাথায় খাটো হ'লে কি হবে, ঝাঁঝে কিন্তু ধানি লঙ্কা!' ইংরেজ ছেলেরা রুক্ষ স্বরে কহিত, Beware of 'Indian tongue-wagger!' পিনাকী তাহার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য কান পাতিয়া শুনিত, শুনিয়া মনে মনে খুশীই হইত।

তথাপি ছেলেদের সহিত পিনাকীর বনিবনাও হইত না ; কতকগুলি কারণে পিনাকীকে তাহারা মোটেই বরদাস্ত করিতে পারিত না। অধিকাংশ ছেলেই যে-পথ ও মত মানিয়া লইত, পিনাকী তাহার ঠিক উল্টা দিকটা ধরিয়া বিরোধ বাধাইতে চাহিত। কিন্তু বিরোধ-সূত্রে দলপুষ্ট বিরোধীদিগের প্রকৃতি যেই হিংস্র হইয়া উঠিত, পিনাকীলাল তৎক্ষণাৎ অহিংসার দোহাই দিয়া প্রতিযোগীদের নিকট এমন কায়দায় আত্মসমর্পণ করিত যে, তাহার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

এই সাঁইত্রিশটি প্রতিযোগীর মধ্যে পিনাকীর নিকট সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল সত্যব্রত ব্যানার্জী। বয়স চব্বিশ বছর পূর্ণ না হইতেই এই ছেলেটি ছয় ফিট লম্বা মাপের ফিতাটির সীমারেখা পার হইয়া গিয়াছিল ; তাই বলিয়া তাহার দেহটি প্রস্থকে সঙ্কীর্ণ করিয়া শুধু খাড়া হইয়া ওঠে নাই, বুকের ছাতিটিও সেই অ াতে বিস্তৃত ও পুষ্ট হইয়া অঙ্গের সৌষ্ঠবকে সুষ্ঠু ও সুশোভন করিয়া তুলিয়াছিল। সমবয়স্ক ইংরেজ সহপাঠীরাও হাতেকলমে নানা সূত্রেই এই গৌরকান্তি বলিষ্ঠকায় বাঙালী যুবাটির দৈহিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল—টাইগার অফ্ বেঙ্গল।

সুরেন্দ্রনাথ তখন বাঙলার নেতা, ভারতের মুকুটহীন সম্রাট ; সেই বৎসরই পুনায় কংগ্রেসে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া অগ্নিগর্ভ অভিভাষণে ভারতবাসীর যে দাবী তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার রেশ তখনও ভারতের আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে ; সারা ভারতের জনমত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভারত-রাষ্ট্রনায়কের প্রশস্তি গাহিতেছে, বিলাতী সংবাদপত্রগুলি পৃষ্ঠাতেও ভারতবর্ষ সংক্রান্ত আলোচনার স্তম্ভটি মিষ্টার এস-এন ব্যানার্জীর কার্যধারার সবটুকু দখল করিয়া রাখিয়াছে. এ অবস্থায় বিলাতের ছাত্রসমাজ তাহাদের সহপাঠী মিষ্টার এস-বি-ব্যানার্জীকেও ইণ্ডিয়ার বিখ্যাতনামা লিডার মিস্টার ব্যানার্জীর পরিজন সাব্যস্ত করিয়া লইয়া কত প্রশ্নই করে। মিস্টার ব্যানার্জী তোমার কে হন? তাঁর প্রাইভেট লাইফটা কি রকম? কোথায় তিনি থাকেন? কি তাঁর প্রিয়। এমনই কত সঙ্গত ও অসঙ্গত প্রশ্ন।

কি ভাবিয়া পিতামাতা সন্তানের নামের আগে 'সত্য' শব্দটির সংযোগ করিয়াছিলেন,

তাঁহারা ভিন্ন অন্যের পক্ষে তাহা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। কিন্তু নামের সহিত হুবহু ঐক্য রাখিয়া কথা কহিতে সত্যব্রতর কোন আগ্রহই দেখা যাইত না। সুতরাং ভারত ও ভারতের বিখ্যাত লীডারটির সহিত নিজের একটা কল্পিত যোগসূত্র রচনা করিয়া কত চমকপ্রদ উপাখ্যানই সে ইংরেজ সহপাঠীদিগকে শুনাইয়া চমৎকৃত করিয়া দিত। এ সম্বন্ধে সত্যব্রত তাহার ডাইরীতে এইরূপ কৈফিয়ৎ লিখিয়া রাখিত, 'বুদ্ধিমান কল্পিত বিষয়বস্তু সাজাইয়া অপরকে শুনায়, তাহাই গল্প হইয়া দশের মনের খোরাক জোগায়, রচয়িতা যশ পায়, অর্থলাভ করে। আমার দেশ ও নেতাকে আমিও যদি এইভাবে বাড়িয়া বিদেশীর কাছে বড় ক'রে দেখাই, সেটা কি দোষের?'

এইখানেই পিনাকীর সহিত সত্যব্রতর ঠোকাঠুকি বাধিত ; সে সত্যব্রতর কথার ছিদ্র ধরিয়া তাহাকে বিব্রত ও অপ্রস্তুত করিতে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইত ; প্রতি কথায় প্রতিবাদ তুলিয়া বলিত—প্রমাণ কোথায়? কিন্তু সত্যব্রতও সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বভাবসিদ্ধ কল্পনাশক্তি ফেনাইয়া এমন কায়দায় তাহার গল্পের শাখা-প্রশাখা বাহির করিত যে পিনাকীর প্রতিবাদ অধিকাংশ স্থলেই চাপা পড়িয়া যাইত।

কথা গুছাইয়া বলিবার ও বক্তব্য কথায় শ্রোতাদের আস্থা আকর্ষণ করিবার কৌশলটুকু জানিত বলিয়া, সত্যব্রতর সকল কথাই বিদেশী সহপাঠীরা স্বীকার করিয়া লইত। তাহারা বলিত, হবে না কেন, মিস্টার এস-এন-ব্যানার্জীর নেফিউ ত!

এদিকে পিনাকী দল পাকাইয়া প্রচার করিতে চাহিত,—সব বাজে কথা, আসলে হচ্ছে এ ছোকরা মিস্টার ব্যানার্জীর স্পাই, তাঁকে প্রচার করছে। মিস্টার ব্যানার্জী ইণ্ডিয়ান লীডার না ছাই ; লীডার হচ্ছে—মিস্টার গোখ্‌লে।

কথাটা সত্যব্রতর কানে যাইবামাত্রই সে গোখ্‌লের একটা বিখ্যাত বক্তৃতার অংশ সকলকে শুনাইয়া দিল। সবাই তখন জানিতে পারিল যে, মিঃ গোখ্‌লে বাঙলা ও বাঙালীর উদ্দেশে মুক্তকণ্ঠে কি প্রশস্তিই গাহিয়াছেন! প্রতিবাদটার পরিণাম যে এমন সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইবে—কেঁচো নামক কৃমি-জাতক প্রাণীটিকে বাহির করিতে গিয়া সহসা সরীসৃপ-শ্রেণীর জন্তুটি ফণা তুলিয়া দেখা দিবে, পিনাকী তাহা কল্পনাও করে নাই। বাঙলার সম্বন্ধে গোখ্‌লের কথাটা তাহার বুকে যেন বুলেটের মত বিঁধিল।

ইংরেজ সহপাঠীরা পিনাকীর নাম রাখিয়াছিল—'পিনেস্'। পিনাকী কথাটার অর্থ তাহারা বুঝিত না এবং উচ্চারণেও বাধিত। কিন্তু পিনেস্ (Pinnace) শব্দটি তাহাদের সুপরিচিত ; মধ্যে মধ্যে তাহারা 'পিনেস বা পান্‌সী' চড়িয়া টেম্‌স্ নদীর বুকে পাড়ী দিত। কাজেই পিনাকীলালকে পিনেস বলিয়া ডাকিতে তাহাদের সুবিধাই হইত।

টম নামে ছেলেটি বিদ্রূপের সুরে কহিল, মিস্টার ব্যানার্জীর নজিরটা নিষ্ঠুর হয়ে আমাদের প্রিয়তম পিনেস্‌কে দেখছি বানচাল ক'রে দিলে!

ল্যরেন্স নামে আর একটি ছেলে পিনাকীর পানে তাকাইয়া গোখ্‌লে মহাশয়ের বিখ্যাত উক্তিটি পুনরাবৃত্তি করিল, What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow.

সত্যব্রত এই কথাটা যখন তাহার কথার উপসংহারে বিশেষ জোর দিয়া সুর করিয়া বলে, মিস্টার ল্যরেন্স সেটা তাহার খাতায় টুকিয়া লইয়াছিল।

কিন্তু বাঙলা ও বাঙালীর দুর্ভাগ্য, এখানেও বিরোধটির নিষ্পত্তি হইল না। পিনাকী যতই খর্বাকৃতি হউক এবং তাহার জন্মভূমির অন্তর্গত প্রদেশটি প্রগতি সম্পর্কে যত তফাতেই পড়িয়া থাকুক, বাঙলাকে সে ভারতের জঞ্জাল বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিল এবং এই জঞ্জাল হইতে যাঁহারা জাহীর হইয়া জগতের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন দখল করিয়া বসিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করাই ছিল পিনাকীর লক্ষ্য। কিন্তু তাঁহার এই নিবিড় বিদ্বেষের মূলে যে বিষয়-বস্তুটি প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিত, তাহা যেমন সে প্রকাশ করিত

না, পক্ষান্তরে সেই গুহ্য বিষয়টি আবিষ্কার করিবার জন্য সত্যব্রতর আগ্রহেরও অন্ত ছিল না।

সত্যব্রতর মনটি যে পরিমাণে খোলা ছিল, পিনাকীর মনের ভিতরটা সেই অনুপাতেই চাপা থাকিত। এ সম্বন্ধে চাণক্য পণ্ডিতের বিখ্যাত নীতিবাক্যটি সে আত্মস্থ করিয়া লইয়াছিল—মনসা চিন্তিতং কর্ম, বচসা ন প্রকাশয়েৎ।

কিন্তু নানা সূত্রে সত্যব্রতর উপর পিনাকীর বিদ্বেষ ক্রমশই এরূপ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল যে, তাহার প্রসঙ্গ উঠিলেই সে সহপাঠীদিগের প্রতি তাকাইয়া বিড় বিড় করিয়া বলিত, মনুমেণ্ট্যাল লায়ার—মিথ্যার জাহাজ!

সত্যব্রতও ইহার পাল্টা উত্তরে পিনাকীর নামকরণ করিয়াছিল—seeker after truth—সত্য-সন্ধানী!

পিনেসের সম্বন্ধে সত্যব্রতর এই কথাটিও ইংরেজ-নন্দনদের বেশ মনে ধরিয়াছিল। ইহার পিছনে একটা কাহিনীও পূর্ব হইতেই রসসৃষ্টি করিয়াছিল। সেটি এইরূপ ঃ

বিলাতের বিখ্যাত এক অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে পলিটিক্স সম্বন্ধে লেকচার দিতেন। তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ এবং অকৃতদার। তাঁহার আচরণ ও চালচলনে পাদ্রীসুলভ মনোবৃত্তির প্রচুর পরিচয় পাওয়া যাইত। সর্বাপেক্ষা তাঁহার বিরাগ ও বিরক্তির বিষয় ছিল রঙ্গালয় ও অভিনেত্রী। ছেলেরা তাঁহার ক্লাসে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা তুলিলে তিনি এরূপ চটিয়া যাইতেন যে, তাঁহার পদোচিত সংযম তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িত। অতঃপর এই বিষয়টি লইয়া ছেলেদের পরামর্শ ও পরিকল্পনা চলে এবং তাহার ফলে একদা রঙ্গ মঞ্চের এক রূপসী অভিনেত্রীর বিচিত্র ভঙ্গীপূর্ণ আলেখ্যটি অধ্যাপক ক্লাসে আসিবার পূর্বেই তাঁহার টেবিলটি দখল করিয়া বসে। উদ্যোক্তারা সে সময় ক্লাসের সকল ছাত্রকেই সতর্ক করিয়া দিল—হুঁসিয়ার, পাদ্রীসাহেব যতই তম্বী করুক, সবাই বলবে—জানি না কে রেখেছে।

পিনাকীও ক্লাসে ছিল। সত্যব্রত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—ওকে আগে সামলাও, মিস্টার পিনেস 'গডের' এজেণ্ট, ও সব ফাঁশ ক'রে দেবে।

তৎক্ষণাৎ ডজন খানেক লাল মুখ পিনেসের কালো মুখখানার দিকে ঝুঁকিল ; সঙ্গে সঙ্গে হুমকি উঠিল, Beware Pinnace! সাবধান!

পিনাকী মুখটি বুজাইয়া কান দুটি খাড়া করিয়া সবই শুনিতেছিল ; এবার মুখ খুলিল, কণ্ঠ হইতে স্বর কঠিনভাবেই বাহির হইল, স্যরী! আই কাণ্ট্ ট্রুথ ইজ মাই গড—ইজ টু মী দি য়ুনিভারসেল ল্য অফ লাইফ—সত্য আমার ঈশ্বর, তারই সন্ধানে আমি এসেছি এখানে—মিথ্যা বলব আমি? নেভার!

কিন্তু ছেলেরা পিনাকীর এই সত্যনিষ্ঠার উত্তর দিবার পূর্বেই প্রফেসর ক্লাসে প্রবেশ করিলেন। উদ্যোক্তারা অমনই প্রসঙ্গটি পরিত্যাগ করিয়া ভালমানুষের মত যে-যাহার স্থানে গিয়া বসিল।

এদিকে প্রফেসর তাঁহার চেয়ারে বসিয়াই তড়িৎ স্পৃষ্টের মত লাফাইয়া উঠিলেন! কি সর্বনাশ! তাঁহার টেবিলে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীর তসবীর! আবার যেমন তেমন ছবি নয়—বেহায়া ছুঁড়ীটা অঙ্গ দুলাইয়া লাস্যলীলা দেখাইতেছে! কি স্পর্ধা!

তর্জনের সুরে প্রশ্ন করিলেন—কে করেছে এ কাজ? কে এনেছে এ ছবি? কে এখানে রেখেছে?

ছেলেরা চুপ, কাহারও মুখে কথা নাই, সমস্ত ক্লাস স্তব্ধ। কেবল পিনাকী নির্দিষ্টভাবে তাহার উদ্দেশ্যে পরবর্তী প্রশ্ন ও সেই সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত সুযোগটির প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহার ভাবভঙ্গীতে ইহাই ঈষৎ প্রকাশ পাইতেছিল।

কণ্ঠের স্বর উচ্চগ্রামে তুলিয়া অধ্যাপক কহিলেন, প্রকৃত দোষীকে আমি তোমাদের

ভেতর থেকে আবিষ্কার করবই।

তাহার পর তিনি ছেলেদের দিকে গিয়া এক এক জনকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন,' তুমি জানো? তুমি? তুমি—

একে একে সকলেই উত্তর দিল, জানি না স্যর!

কিন্তু সত্য প্রকাশ করিবার জন্য সত্যাশ্রয়ী পিনাকী এতক্ষণ চুলবুল করিতেছিল। এবার আসিল তাহার পালা। যেই তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি জানো?

পিনাকী অমনই তড়াক করিয়া জবাব দিতে উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আর এক অভিনব পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া তাহারই সত্য প্রকাশের পথে বিষম বাধার সৃষ্টি করিল।

'হ্যাঁ' কথাটি বলিবার জন্য যেমন পিনাকী হাঁ করিয়াছে এবং তাহার দুইটি কোটরগত চক্ষু অদূরবর্তী সহপাঠীদের দিকে বিস্ফারিত হইয়াছে, অমনই তাহাদের যুগপৎ শাসানি সেই মুহূর্তেই তাহাকে স্তব্ধ করিয়া দিল। সামনের বেঞ্চখানির লালমুখ ছেলেগুলি অধ্যাপকের পিছন হইতে শুধুই যে তাহাকে চোখ রাঙাইয়া শাসাইতেছিল—তাহা নহে, পরন্তু সত্যপ্রকাশ করিলেই যে তাহারাও সশস্ত্র অভিযান করিয়া প্রতিশোধ তুলিবে—হাতে-কলমেই তাহা দেখাইতেছিল। ঘুসি বাগাইয়া, ছুরিকে ছোরার মত ভাঁজিয়া, অটোমেটিক রিভলভারের চকচকে নলিটি নিশানা করিয়া তাহারা সত্যকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিবার যে নির্দেশ দিল, তাহাতে পিনাকী মুখটি বুজাইয়া ও দুই চক্ষু মুদিত করিয়া ধুপ করিয়া নিজের সীটে বসিয়া পড়িল। হায়, সত্যসন্ধানী পিনাকীর চক্ষুর উপর সত্য এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ধরা দিতে আসিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য পিনাকী মারের ভয়ে তাহাকে ধরিতে পারিল না ; অবাক-বিস্ময়েই সে সত্যের এই লাঞ্ছনা দেখিল! পিনাকীর পরবর্তী জীবনে অনুরূপ ঘটনা আরও কতবারই ঘটিয়াছে! পাঠকপাঠিকাগণ ধৈর্যসহকারে এই চমকপ্রদ চিত্রটির অনুসরণ করিলে সে সকল চিত্র-রেখাও তাঁহাদিগের চক্ষুর উপর প্রতিফলিত হইবে।

সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে এই ছেলেটির উপর অধ্যাপকের বিশেষ আস্থা ছিল। অবশেষে ইহাকেও ঝাঁকে মিশিতে দেখিয়া অগত্যা তাঁহাকে অপরাধী আবিষ্কারের দুশ্চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া দুর্নীতির প্রভাব সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা খাড়া করিতে হইল। বলা বাহুল্য, ছেলেরা ইতিমধ্যেই অভাগিনী অভিনেত্রীর আলেখ্যটি টেবিল হইতে তুলিয়া অধ্যাপকের সীটের পশ্চাতে হ্যাট-র‍্যাকে ঝোলানো টুপীটির ভিতর অতি সন্তর্পণেই চালাইয়া দিয়াছিল।

এই অধ্যাপকের পিরিয়ড শেষ হইবার পর ছেলেরা পিনাকীকে লইয়া পড়িল। কিন্তু পিনাকী দমিল না। সে বেশ গম্ভীরভাবেই কহিল—অহিংসাও ঈশ্বরের আর একটা রূপ ; পেছন থেকে হিংসা কামড়াবার জন্যে মুখ বাড়াচ্ছে দেখে মুখ আর খুললুম না, চুপ ক'রেই গেলুম।

সত্যব্রত কহিল, কথাটার মানে কিন্তু বুঝতে পারলুম না।

পিনাকী কহিল, মানে খুবই সোজা ; আমি যদি অধ্যাপকের কাছে কথাটা স্বীকার করতুম, ক্লাসশুদ্ধ তোমাদের সবারই সাজা হত ; তার মানেই হিংসা পেতো প্রশ্রয়। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে জানিয়ে দিলেন, সেটা ঠিক নয়। তাই দিলুম তখনই হিংসাকে গলাধাক্কা ; জয় হ'ল অহিংসার। অধ্যাপকের সামনে মুখ বুজিয়েছিলুম ঐ জন্যই ; তোমাদের ঘুসী দেখে নয়, ছুরিছোরার জন্যও নয়, রিভলভারের গুলীর ভয়েও নয়।

পিনাকীর যুক্তি শুনিয়া ছেলের দল একেবারে অবাক। তাহারা স্বীকার করিল, হ্যাঁ, এ একটা লজিক বটে?

সত্যব্রতই কেবল অধ্যাপকের মত মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল, আমার মতে, কতকটা লজিক, কতকটা ম্যাজিক।

ছেলেরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পিনাকী দুই চক্ষু পাকাইয়া সত্যব্রতর দিকে চাহিয়া কহিল, বাঙালী জাতটাই ম্যাজিসিয়ান।

সত্যব্রত পূর্ববৎ গম্ভীরভাবেই জানাইল, শুধু তাই নয়, রীতিমত লজিসিয়ান ; তাই আসল-নকল চেনে, ম্যাজিক দেখে চমকায় না।

পিনাকী তখন রুদ্ধরোষে ভবিষ্যদ্বাণী করিল, একদিন চমকাবে।

এবার সত্যব্রতর ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা ফুটিল, মৃদুস্বরে উত্তর দিল, দেখা যাবে।

ইহার পরও সত্য এবং অহিংসা সম্পর্কে কতবারই আলোচনা ও বিতর্ক হইয়াছে ; ঈশ্বরের এই দুটি আসল রূপের ওকালতি করিয়া পিনাকী ছেলেদিগকে কত নূতন কথাই শুনাইয়া তাক লাগাইয়া দিতে চাহিয়াছে ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এইটুকু যে, সত্যব্রত কোনও দিনই তাহাতে অভিভূত হয় নাই এবং পিনাকীর নূতন নূতন কথায় শুধু সে সায় না দেওয়াতেই ছেলেরা সেগুলি স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। সত্য ও অহিংসা সম্বন্ধে যে তথ্যটি পিনাকী নূতন বলিয়া প্রচার করিতে প্রয়াস পাইত, সত্যব্রত তৎক্ষণাৎ তাহাতে প্রতিবাদ তুলিয়া বলিত, বাঙলার ম্যাজিসিয়ানরা পঞ্চাশ বছর আগেই এ সব কথা বলে গেছেন। শুধু মুখের কথা নয়, সত্যব্রত প্রমাণ পর্যন্ত দাখিল করিবার দাবী জানাইত।

কিন্তু পিনাকী উপেক্ষার ভঙ্গীতে হাসিয়া তর্কের গতি রুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে উত্তর দিত, সত্য ও অহিংসার রূপ মিথ্যাবাদীর যুক্তির বাতাসে আকাশে মিশে যায় না।

অন্যান্য ছেলেরা সেদিন তর্কের উপসংহারটি দেখিয়া হতাশ হইয়াই বলিল, জবাবটা কিন্তু ঠিক হ'ল না মিস্টার পিনেস! ব্যানার্জী বলেছেন, তোমার কথাগুলো সব চুরি করা, আর চুরি করেছ ব্যানার্জীর দেশ বেঙ্গল থেকেই।

টম নামে দুর্মুখ ছেলেটি কথাটায় সায় দিয়া খোলাখুলি ভাবেই কহিল, অর্থাৎ তুমি বাঙালীর পকেট মেরে, যে বস্তুটি নিজের পকেটে পুরেছ, সেইটিই একটু বদলে-সোদলে আমাদের চোখের ওপর তুলে তাক্ লাগাতে চাইছ!

পিনাকীর দুইটি চক্ষুই যেন জ্বলিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে তাহার মুখ দিয়া যে জ্বালাময় কথাটা সশব্দে বাহির হইয়া আসিল, তাহার তাপটা কেহই অস্বীকার করিতে পারে নাই, এমন কি ইংরেজ ছেলেরা পর্যন্ত। টমের কথাটার উত্তরে সে খপ করিয়া বলিয়া ফেলিল, সত্য ও অহিংসা যেখানে নেই, সেখানে কোন পকেটই থাকতে পারে না।

আরউইন নামে নিরীহ প্রকৃতির একটি ছেলে সত্যব্রতর দিকে সকৌতুকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, শুনছ মিস্টার ব্যানার্জী, কত বড় লজিকের কথা মিস্টার পিনেস শুনিয়ে দিলে!

হেন্‌রী নামে ছেলেটি পিনাকীর উদ্দেশে প্রশ্ন করিল, তা হ'লে কথাটার মানে কি বুঝব?

পিনাকী গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল, ম্যাকলে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় মানেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এর ওপর আর কথা নেই।

সকলেই সত্যব্রতর দিকে চাহিল। কিন্তু এই সাংঘাতিক কথাটা যে তাহাকে কিছুমাত্র আঘাত দিয়াছে, তাহা বুঝা গেল না। অবিচলিত কণ্ঠেই সে কহিল, কথা একটু আছে। মৌমাছি ফুলের ভেতরে ঢুকে সত্যের সন্ধান করে, শকুনী পচা মড়ার ওপর পড়ে ঠোঁটের ঠোকর দিয়ে সত্য খোঁজে, কুকুর হাড় চিবিয়ে সত্য বার করে, মাছিগুলো শুকনো ঘায়ের ওপর মুখ ঘ'সে চাপা সত্যকে খুঁচিয়ে তোলে। যদিও এদের রূপ আলাদা, কিন্তু মনোবৃত্তি এক ; কোন তফাত নেই ; সবাই সত্যের সন্ধানী—অথাৎ seeker after the truth.

টম কহিল, তা হ'লে তুমি বলতে চাইছ মিস্টার ব্যানার্জী, মিস্টার পিনেস্ ঐ কয়টি প্রাণীর সম্মিলিত সংস্করণ?

সত্যব্রত কহিল, বড় দুঃখেই আমাকে বলতে হচ্ছে, এই মনোবৃত্তি নিয়েই মিস্টার পিনেস যদি ভারতবর্ষে ফিরে যায়, আর সেখানে ওর এই মনগড়া সত্যটির প্রচার করে, তা হ'লে এমন সর্বনাশ ভারতবর্ষের হবে—সে-যুগের জেঙ্গিস খাঁ, নাদীর শাহ্, কালাপাহাড় প্রভৃতির আমলেও তেমনটি হয় নি, আর এযুগে বৃটিশ কনজারভেটিভ পার্টি তার ধারেও এখনো যায় নি।

ক্লেভারিং নামে একটি ভারতবিদ্বেষী ছেলে উৎসাহের সুরে কহিল, তা হ'লে মিস্টার পিনেসের অতি সত্বরই সিবিলিয়ান হয়ে ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়া উচিত। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

কিন্তু যাহাকে লইয়া কথা চলিয়াছিল, সে তখন পাশ কাটাইয়া বুদ্ধিমানের মত স্থানত্যাগ করিয়াছে। পিনাকী ভাবিয়াছিল, সত্যব্রত আজ রীতিমতই ঘায়েল হইয়াছে, সে আর মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করিবে না। কিন্তু নিদারুণ আঘাত পাইয়াও আজ যেরূপ ধীরতার সহিত সে এক সাংঘাতিক শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিল এবং তাহা এমনই অব্যর্থভাবে পিনাকির মর্মস্থলে আসিয়া বিঁধিল যে, তাহার আর টুঁ শব্দটি করিবার উপায় ছিল না।

এদিনের দ্বন্দ্বের পরিণতি যাহাই হউক, সত্যব্রতর আবিষ্কৃত নামটি কিন্তু প্রত্যেকেরই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। এমন কি, পিনাকীও তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। প্রতি সায়াহ্নে লোকচক্ষুর অন্তরালে শহরের নিভৃত অংশে সহপাঠীদের অজ্ঞাত এক কক্ষে সংগোপনে ও অতি সন্তর্পণে যখন সে রোজ-নামচা লিখিত এদিনের ঘটনাটির বিবরণ তাহাতে এই ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল—উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে যদিও সত্যব্রত আমার সাংঘাতিক অন্তরায়, তথাপি আমি তাহার দূরদৃষ্টির তারিফ করিতেছি। তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক।

যে সময়ের চিত্র আমরা আঁকিতে বসিয়াছি, তখন সাম্প্রদায়িক বিরোধ অথবা প্রাদেশিকতা নামক সমস্যার ছায়াও বিশাল ভারতবর্ষের সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের কোন অংশেই পড়ে নাই; অথচ ভারতের বাহিরে বার্নাড স্ট্রীটের একটি মেসের মধ্যে ভারতীয় জনসাধারণের অগোচরে ইহা ধোঁয়ার আকারে কুণ্ডলীকৃত হইতেছিল। ভারতবর্ষে বসিয়া যে সকল মনীষী সে সময় বৃটিশ সরকারের নিকট দৃপ্তকণ্ঠে ভারতের দাবী ঘোষণা করিতেছিলেন, তাঁহারা তখন কল্পনাও করেন নাই যে, তাঁহাদের অজ্ঞাতে বৃটিশ রাজধানীর বুকে বসিয়া ভারতের এক সুবিধাবাদী সুসন্তান অদ্ভুত পরিকল্পনায় যে ধূম্রজাল রচনা করিতেছে, তাহাই একদিন নিবিড় মেঘে পরিণত হইবে এবং সেই মেঘনিঃসৃত বজ্রই তাঁহাদেরই কঠোর সাধনালব্ধ একতা ও সদ্ভাব ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবে।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে বার্নাড স্ট্রীটের 'ইণ্ডিয়া কটেজ'টি তখন সুপরিচিত ও প্রশংসিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভারতীয় ছাত্রদিগের অভিভাবকগণ বিলাতী মেলের টিকিট কিনিবার পূর্বেই এই কটেজের স্বত্বাধিকারিণী মিসেস ফ্লাণ্ডার্স এলায়ের সহিত ছেলেদের অবস্থিতি সম্বন্ধে কথাবার্তা পাকা করিয়া ফেলিতেন। আহার সম্পর্কে ছেলের রুচি ও অভ্যাস, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সব কথাই চিঠিতে অভিভাবকগণ খুলিয়া লিখিতেন। ছেলে যথাসময় লণ্ডনে পৌঁছাইয়া ও ইণ্ডিয়া কটেজে আশ্রয় লইয়া আনন্দ সহকারেই চিঠিতে লিখিত যে, ব্যবস্থার কোন নড়-চড় হয় নাই, বাড়ীর সুখ-সুবিধাই পাইয়াছে, সুতরাং পরিজনদের চিন্তা বা উদ্বেগের কোন কারণ নাই।

ইণ্ডিয়া কটেজের ইহাই ছিল বৈশিষ্ট্য এবং এই জন্যই ভারতীয় ছাত্রগণ এখানে ঢুকিবার জন্য হুড়াহুড়ি বাধাইত। ভারতীয় ছাত্র ব্যতীত কতকগুলি ইংরেজ ছাত্রও এই কটেজে থাকিয়া

পড়াশুনা করিত। এই সকল ছাত্রের অভিভাবকগণ বিলাতের বনেদী বড়লোক ও অভিজাতবংশীয় হইলেও এই উদ্দেশ্যে ছেলেদিগকে ইণ্ডিয়া কটেজের আবেষ্টনে রাখিয়াছিলেন যে, ভারতীয় ছাত্রদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা ও সাহচর্যের ফলে তাহারা ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টিগত ভাবধারার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইবে ;—সিবিল সার্ভিসে সাফল্যের তিলক পরিয়া ভারতবর্ষে কর্মক্ষেত্র রচনা করাই ইহাদের লক্ষ্য ছিল।

মিসেস ফ্লাণ্ডার্স এলাই নিজের নিখুঁত ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধানে এই কটেজটি এমন শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিতেন যে, ইংরেজ বা ভারতীয় ছেলেদের মধ্যে অভিযোগ তুলিবার কোন অজুহাত কখনই আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাইত না। মিসেস ফ্লাণ্ডার্স ফরাসী দেশের মেয়ে, ইঁহার স্বামী ছিলেন ইংরেজ, খাস লণ্ডনের বাসিন্দা ; কিন্তু ইঁহাদের দাম্পত্যজীবনের অধিকাংশ কাল ভারতবর্ষেই অতিবাহিত হয়। বিলাতের কোন এক বিখ্যাত সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের এজেণ্ট রূপে মিস্টার ফ্লাণ্ডার্স এলাই সস্ত্রীক ভারতবর্ষে প্রবাস-জীবন যাপন করেন। ভারতের প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীগুলিতে তাঁহাদিগকে অবস্থিতি করিতে হয়, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির সহিত কর্মসূত্রে ইঁহাদের মিলিবার মিশিবারও প্রচুর সুযোগ ঘটে। ভারতবর্ষেই ইঁহাদের একমাত্র কন্যা এলিজাবেথ জন্মগ্রহণ করে এবং ভারতবর্ষেই মিস্টার ফ্লাণ্ডার্সের কর্মজীবনের অবসান হয়। কন্যা এলিজাবেথ তখন দশ বছরের বালিকা। স্বামীর মৃত্যুর পর মিসেস ফ্লাণ্ডার্স বিলাতে ফিরিয়া অনেক মাথা খেলাইয়া ভারতবর্ষের সহিত তাঁহাদিগের কর্মস্মৃতি বজায় রাখিতে ইণ্ডিয়া কটেজ খুলিয়া বসেন। ইনিই এই কটেজটির সর্বময় কর্ত্রী এবং সর্বজনপ্রশংসিতা ল্যাণ্ড-লেডি। যে আটত্রিশটি ছেলের কথা আমরা গোড়াতেই বলিয়াছি, তাহারা সকলেই এই কটেজে মিসেস ফ্লাণ্ডার্সের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিয়া সন্নিহিত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পড়াশুনা করিতেছিল।

ইণ্ডিয়া কটেজে থাকিয়া প্রত্যেক ছেলেই যে বাড়ীর সুযোগ-সুবিধা পাইত, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মিসেস ফ্লাণ্ডার্স প্রাচ্য ও প্রতীচ্যেব রীতিনীতির সহিত আধুনিকতার লোভনীয় পদ্ধতির সংযোগ করিয়া এমন কতকগুলি ব্যবস্থা এখানে চালু করিয়াছিল যে, ছেলেদের নিকট তাহা অত্যন্ত প্রীতিকর ও উপভোগ্য হইয়াছিল।

একটা প্রকাণ্ড হলে পাশাপাশি টেবিলে এক সঙ্গে এই ছেলেগুলির ভোজের ব্যবস্থা, নিত্য নূতন ভোজ্যের তালিকা এবং ভোজনকারীদের বয়স ও রুচি অনুযায়ী গান বাজনার সহিত নানারূপ আলোচনা—ছেলেদিগকে উল্লাসমুখর করিয়া ত্ু ˊত। মিসেস ফ্লাণ্ডার্স সময় সময় নিজেও আলোচনায় যোগ দিতেন এবং ভারতবর্ষ সংক্রান্ত তাহার অভিজ্ঞতালব্ধ নানাবিধ চমকপ্রদ কথা ও কাহিনী ছেলেদের খুবই উপভোগ্য হইত।

ছেলেদের আর একটি আকর্ষণের বস্তু ছিল—মিসেস্ ফ্লাণ্ডার্সের কিশোরী কন্যা মিস ফ্লাণ্ডার্স এলাইয়ের সাহচর্য। মেয়েটির নীল চক্ষু, একরাশি সোনার বরণ চুল ও নিখুঁত সুন্দর মুখের একটানা হাসি ছেলেদিগকে নিরতিশয় আনন্দ দিত। ভাবতবর্ষের মেয়েদের বয়সের অনুপাতে অসঙ্কোচেই তাহাকে কিশোরী বা নবযুবতী বলা চলে, কিন্তু প্রতীচ্যের মাপকাঠিতে সে এখনও বালিকা মাত্র। চৌদ্দ-পনেরো বছরের কোন মেয়েকে কেহ এদেশে যুবতীর পর্যায়ে ফেলিলে তাহাকে জনসমাজে উপহাসের পাত্র হইতে হয়। আমাদের পিনাকীলালও এই মেয়েটির সম্বন্ধে এইরূপ একটা ভুল করিয়া যে কাণ্ড বাধাইয়া বসে, সেটিও তাহার প্রবাস-জীবনের আখ্যায়িকাটিকে সরস ও উপভোগ্য করিয়া রাখিয়াছে এবং এই চিত্রটির উপর মিস এলাইয়ের প্রভাবও বড় অল্প নহে।

এই মেয়েটি প্রজাপতিটির মত সাজিয়া গুজিয়া ছেলেদের সহিত অবাধ মেলা-মেশা করিত ; ছেলেরাও তাহার সহিত হাসি, ঠাট্টা কথা কাটাকাটি ও হুল্লোড় করিতে ছাড়িত না। মেয়ের মা এ সব দেখিয়া শুনিয়াও উপেক্ষা করিয়া বা এড়াইয়া যাইতেন। বিলাতের দৃষ্টিতে

নিজের সুন্দরী মেয়েটিকে তিনি নাবালিকার পর্যায়ে ফেলিয়া রাখিলেও তাহার জন্মস্থান যে ভারতবর্ষ ও জীবনের অধিকাংশই যে সেই রৌদ্রতপ্ত দেশটিতে কাটাইয়া সে যে অতিরিক্ত চতুর ও কথাবার্তায় পাকা হইয়া উঠিয়াছে, ইহাও তিনি গ্রাহ্য করিতেন না বা এ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই তাঁহার চিত্তপটে কোনরূপ সংশয়ের আঁচড় টানিত না। বরং ইহাদের ক্রীড়া কৌতুকের উচ্ছ্বাস ও চটুল হাস্য-পরিহাস তিনি সকৌতুকেই উপভোগ করিতেন।

প্রথম হইতেই মিস এলাইকে দেখিয়া পিনাকীর কি লজ্জা! এই মেয়েটিকে দেখিলেই সে কেঁচোর মত কুঁচকাইয়া পড়িত ; চোখাচোখি হইলে সে বুঝি মুখখানাকে নত করিয়া মেঝের কার্পেটটির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে চাহিত। ইহাতে অবশ্য পিনাকীকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না। কেন না, ভারতের যে প্রদেশটির সে অধিবাসী, সেখানে কন্যার বয়স নয় পার হইলেই সে বধূর মর্যাদা লইয়া স্বামীগৃহে অধিষ্ঠিতা হয়। পিনাকীও এমনই এক বধূর সহিত দাম্পত্য-বন্ধন দৃঢ় করিয়া তাহার পিতার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আসিয়াছে ; তাহার বয়স এখনও নয় বৎসর পূর্ণ হয় নাই। এ অবস্থায় পঞ্চদশী কন্যার অবাধ সাহচর্য কেমন করিয়া সে বরদাস্ত করিবে?

কিন্তু তাহার এই লজ্জাচ্ছন্ন অবস্থা ছেলেদের দৃষ্টি এড়াইত না, মিস্ এলাইয়েরও নয়। তাহাদের চোখে-চোখে বিদ্যুৎ খেলিত এবং কাঁচা মাথাগুলির মধ্যে দুষ্ট বুদ্ধি জাল পাকাইতে থাকিত।

মিস এলাই ভোজের টেবিলে যেই কোন কিছু খাদ্য পরিবেশন করিতে আসে, অন্যান্য ছেলেদের মুখে তখন কত কলরবই ওঠে, তাহার হাতের খাদ্য লইতে যেন কাড়াকাড়ি কাণ্ড। ঘটনাচক্রে এই রকম এক কাণ্ডের মধ্যেই একদা এক অবাক-কাণ্ড ঘটিয়া গেল। অবশ্য তাহার সহিত একটা পূর্বরচিত চক্রান্তও ছিল।

দলের মধ্যে পিনাকীই একমাত্র নিরামিষ ভোজী এবং তাহার টেবিলটি সারির শেষে একটু আলাদাভাবেই থাকিত। এই টেবিলে বসিয়া সেদিন পিনাকী মুখখানা নীচু করিয়াই অধিকাংশ সময় খাইতেছিল। হঠাৎ সে সুযোগমত অতি সন্তর্পণে একটি চক্ষু তুলিয়া ও তাহা একটু বাঁকাইয়া মিস এলাইয়ের ফুলের মত মুখখানি ও সোনালি রঙ্গের ছড়ানো চুলগুলির শোভাটুকু টুক্ করিয়া দেখিয়া লইত কিন্তু এমনই পিনাকীর দুর্ভাগ্য, তাহার এই লুকোচুরি মেয়েটির চোখে তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সে মুচকি হাসিয়া এবং মনে মনে কি একটা মতলব ঠিক করিয়া রন্ধনশালার দিকে ছুটিল।

পিনাকী এই ফুরসতে মুখখানা তুলিয়া ও অতিশয় গম্ভীর করিয়া চাপা কণ্ঠে তর্জন তুলিল, ভারী অন্যায়।

ছেলেদের ভিতর হইতে সত্যব্রতই প্রথমে প্রশ্ন করিল, কিসে?

পূর্ববৎ চাপাকণ্ঠে পিনাকী নির্দেশ দিল, দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।

টম দুই চক্ষু পাকাইয়া প্রশ্ন করিল, দুর্নীতিটা কি?

পিনাকী জানাইল সাঁইত্রিশটা রোমিও একটা জুলিয়েটকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছে, এটা দুর্নীতি নয়?

উত্তেজনার দমকে এবার কথাগুলি পিনাকী কণ্ঠে জোর দিয়াই বলে, কাজেই ভেজিটেবল চপের ডিস লইয়া মিস এলাই প্রবেশ করিতেই তাহার কানে মোটরের হর্নের মতই কথাগুলি বাজিয়াছিল। হলে ঢুকিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

সত্যব্রত তৎক্ষণাৎ বিখ্যাত অভিনেতা স্যর বীরভূম ট্রির অভিনয়ভঙ্গী ও আবৃত্তির নকল করিয়া কহিল, এ ডেনিয়েল্ হ্যাজ ক্যাম্ টু জাজমেণ্ট!

টমও সঙ্গে সঙ্গে কহিল, জুলিয়েট টু প্রেজেণ্ট।

এলাইকে দেখিবামাত্রই পিনাকীর উত্তেজনাপূর্ণ মুখখানি একনিমেষে লজ্জায় এতটুকু হইয়া

গেল এবং সামনের ডিসখানার উপর সে এমনই ঝুঁকিয়া পড়িল যে মিস এলাই তাহার সামনে আসিয়া হাতের ভোজ্যবস্তুটি পিনাকীর ডিসে চালান করিবার কোন রাস্তাই পাইল না। তখন সে এক কাণ্ড করিয়া বসিল ; ডিসের বস্তুটি অতি সন্তর্পণে পিনাকীর মাথার উপরেই ঢালিয়া দিল। উক্ত ভোজ্যবস্তুটি সদ্যভর্জিত অবস্থায় ডিসে উঠিয়াছিল ; সুতরাং সহসা একটা উত্তাপ অনুভব করিয়া পিনাকী এমন ভাবে লাফাইয়া উঠিল যে, এলায়ের হাতের ডিসখানা ঠিকরাইয়া টেবিলের মাঝখানে গিয়া পড়িল এবং এলাইয়ের চিবুকটির সহিত পিনাকীর টিকোলো নাসিকার নিদারুণ সংঘর্ষ রীতিমত একটা রোমান্সের সৃষ্টি করিল।

এমন বিপদে পিনাকী বুঝি আর কখনও পড়ে নাই! আসল ব্যাপারটি ত সে জানিতে পারে নাই ; যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া লইয়া সে ক্ষণকাল পুতুলের মতই খাড়া হইয়া রহিল। এক নারীর অঙ্গের সহিত তাহার নাসিকার প্রচণ্ড সংঘর্ষ, আবার সেই নারী তখনও প্রায় তাহার বক্ষলগ্ন হইয়াই স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এখন সে কি করবে?

টেবিল হইতে একাধিক কণ্ঠের স্বর হাসিয়া উঠিল, কলিস্যন বিটুইন পিনেস এণ্ড এলাই!

এলাই তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদের ভঙ্গীতে কহিল, নো ; কলিস্যন বিটুইন রোমিও এণ্ড জুলিয়েট!

পিনাকী এবার মুখখানি তুলিয়া এবং মনে ও কণ্ঠে প্রচুর শক্তি সঞ্চার করিয়া কহিল, স্যরি, মিস ব্যটারফ্লাই!

হো-হো করিয়া ছেলেরা এবার হাসিয়া উঠিল। সত্যব্রত কহিল, পিনাকী আমাদের জিনিয়াস, কে বলে ও পাদ্রী সাহেব, আসলে বর্ণচোরা আম, ভেতরটা রসে ভরপুর।

ভবানীশঙ্কর নামে এক মারাঠি ছেলে কহিল, তা হ'লে মিস এলাই আজ থেকে হলেন ব্যটারফ্লাই?

টম এলায়ের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, মিস্, তুমি রাজী? নূতন নামটা স্বীকার ক'রে নিচ্ছ ত?

মিস্ এলাই কহিল, নিশ্চয়ই, আমাদের ভেতর এতদিন ছিল আড়ি, আজ থেকে ভাব হয়ে গেল। এর পর আপনারা আমাকে মিস্ এলাই-এর ব'দলে মিস্ ব্যটারফ্লাই ব'লেই ডাকবেন।

সত্যব্রত কহিল, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই, যদিও এই লম্বা নামটা ডাকতে সেকেণ্ড দুই সময়ের অপব্যয় হবে, তা হোক ; মিস্টার পিনাকীর জন্য আমরা এই কষ্টটুকু স্বীকার করব।

অন্যান্য ছেলেরাও কথাটার সমর্থন করিল।

সত্যব্রত পুনরায় কহিল, কিন্তু মিস্ ব্যটারফ্লাই, মিস্টার পিনাকী, চপখানা যে মাঠেই মারা গেল!

মিস্ কহিল, যেতে দিন ওখানা, এরপরও আর ওঁকে অমন আলাদা হতে দিচ্ছি কি না! এই দেখুন না কি করি—কথার সঙ্গে সঙ্গে খাবার ঘরের এক ধারে একটা মারবেল পাথরের টিপয়ের উপর ডিসেভরা যে সব ভোজ্য ছি- মিস্ এলাই তাড়াতাড়ি সেখান হইতে খান কয়েক চপ আনিয়া পিনাকীর ডিসের উপর রাখিল ও খপ করিয়া তাহার হাতখানা টানিয়া কহিল, বসুন, খেতে হবে।

পিনাকী সেই যে উঠিয়াছিল, এ পর্যন্ত বসে নাই। পুনরায় তাহার হাতে নারীর হাতের পরশ, মধুর আহ্বান। অভিভূতের মত পিনাকী তাহার আসনে বসিল বটে, কিন্তু মৃদু স্বরে আপত্তি তুলিল, খাবার আর ইচ্ছা নেই।

এলাই কহিল, খেতেই হবে, নইলে মা রাগ করবে ; আপনি কি শেষে আমাকে সবার সামনে বকুনি খাইয়ে কষ্ট দিতে চান?

পিনাকীর সারা অন্তরটি বুঝি অমনি টন্‌টন্ করিয়া উঠিল ; আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, কারুর মনে কষ্ট দেওয়া মানে হিংসাকে প্রশ্রয় দেওয়া ; আমি অহিংসার উপাসক। আচ্ছা, না হয় খাচ্ছি।

তিনখানা চপ পিনাকী কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

এবার পিনাকীর ব্যাটারফ্লাই মুচকি হাসিয়া কহিল, হিংসাকে আজ থেকে আপনি ইণ্ডিয়া কটেজ থেকে তাড়িয়ে দিলেন ; আমার মাও বেঁচে গেলেন, তাঁর একটা ভয়ঙ্কর কষ্ট ও অসুবিধা কেটে গেল।

কথাগুলির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া পিনাকী মেয়েটির হাসিভরা মুখখানির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল।

মিস এলাই অর্থটা পরিষ্কার করিতে বলিল, কাল থেকে মাকে আর ভেজিটেবল ডিস্ সাজাতে হবে না।

—কেন? আমি যখন ভেজিটেরিয়্যান—

—কিন্তু ঐ ভেজিটেবল চপখানার দুর্গতি দেখে তিনখানা মাছের চপ এনে আপনার ডিসে দিয়েছিলুম, তা বুঝি টের পান নি?

—মাছের চপ? আমার ডিসে? মছ্‌লী, বাঙালীরা না তারিফ ক'রে খায়? কি সর্বনাশ!

—বা-রে! আপনিও ত তারিফ করে খেলেন, আর খেয়ে যে খুশী হয়েছেন, আপনার মুখ দেখেই তা বোঝা গেছে!

—কাজটা ভারি অন্যায় হয়েছে, আমি মিসেস ফ্লাণ্ডার্সের কাছে নালিশ করব।

মুখখানি .ম্লান করিয়া এলাই কহিল, তার মানে—মায়ের কাছে আপনি আমাকে বকুনি খাওয়াবেন, এই ত? কিন্তু এই বয়সে মেয়েরা বকুনি খেলে কি করে তা বোধ হয় আপনার জানা নেই?

পিনাকী নির্বাক দৃষ্টিতে মেয়েটির ম্লান মুখখানির দিকে চাহিল, অমনি তাহার ছলছল চোখ দুটির সহিত পিনাকীর অর্থপূর্ণ দৃষ্টির সংযোগ ঘটিল। এলাই তাহার কণ্ঠের স্বর গাঢ় করিয়া কহিল, মার কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করবার আগে আপনি আমাকে খানিকটা পটাসিয়াম সায়োনাইড আনিয়ে দেবেন, এইটুকুই আমার রিকোয়েস্ট।

সভয় বিস্ময়ে পিনাকী কহিল, সর্বনাশ! অন্যের ওপর রাগ ক'রে আপনি হিংসাকে প্রশ্রয় দেবেন? আপনার আত্মাকে হত্যা করবেন?

মিস্ এলাই কহিল, এ ছাড়া আর উপায় কি?

পিনাকী দৃঢ়স্বরে কহিল, উপায় আছে। হিংসাকে ঠেকাবার জন্য আমি করব আত্মত্যাগ, আপনাকে আত্মহত্যা করতে হবে না। অহিংসার খাতিরে আমার আহার সম্বন্ধে যা-কিছু বিধিনিষেধ, আজ থেকেই আমি সে সব তুলে দিলুম।

ছেলেরা উল্লাসের সুরে সমস্বরে কহিয়া উঠিল—ব্রাভো! Birds of a feather flock together.

পিনাকী ভাবিল, তাহার এই আত্মত্যাগে অহিংসার জয় হইল। ছেলেরা জানিল, তাহাদের চক্রান্তই জয়যুক্ত হইল।

মাঘ ১৩৪৬

মায়ের দিন

মণীন্দ্রলাল বসু

রাতের অন্ধকার যখন পাৎলা হয়ে আসে, শুকতারাটা দপ্‌দপ্‌ করে তেল-ফুরিয়ে-যাওয়া প্রদীপের শিখার মত, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস বয়, আর মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা-ফেলা গাড়ীগুলোর চাকার ঝনঝনানি শব্দে ঘুমন্ত নগরের জনহীন পথ আকুল হয়ে ওঠে, তখন কমলার ঘুম ভেঙে যায়। সেই সময়ে তার স্নেহঘেরা কোলে ছোটখুকীর চোখ থেকেও ঘুম চলে যায় ; গাছের পাতা-ঢাকা নীড়গুলিতে পাখীদের গান গেয়ে ওঠার সময় স্নিগ্ধ ভোরবেলায় ছড়ানো বিছানাতে মা ও মেয়ের খেলায় মায়ের দিনের আরম্ভ হয়। তরল অন্ধকারে মায়ের বড় মুখখানির দিকে চেয়ে সদ্য-জাগা পাখীর ছানার মত 'অ্যাঁ' 'অ্যাঁ' শব্দ করে খুকী আপন মনে হাত-পা ছোঁড়ে, কমলা তার নবীনকোমল অধরে চুম্বন দিয়ে এলানো শাড়ীটা কোনমতে জড়িয়ে বিছানা থেকে ওঠে, ছেলেমেয়েদের গায়ে বিছানার চাদরটা টেনে দেয়। সন্ধ্যেবেলায় যে চাদরটা বিছানাতে পাতা হয়েছিল, ভোরবেলায় সে চাদরটা যে কি করে কুণ্ডলী পাকিয়ে মেঝেতে গিয়ে পড়ে, ছেলেমেয়েদের নিদ্রা-পদ্ধতির সে এক রহস্য। স্বামীর খাটের পায়ের দিকের জানলাটা বন্ধ করে দেয়, ভোরের আলো ও ঠাণ্ডা বাতাস যেন স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত না করে। তার পর, সে আবার বিছানাতে শুয়ে ছোটখুকী চাঁপুকে বুকে টেনে নেয়, তার তুল্‌তুলে পায়ে হাত বুলিয়ে চাঁপার কলির মত আঙুলগুলি নিয়ে খেলা করে। সারা দিনের কাজে খুকীকে যে একটু আদর করবে তারও সময় হয় না,—এই ভোরবেলা হচ্ছে কমলার মাতৃ-স্নেহলীলার সময়। খুকী মায়ের মুখের দিকে চেয়ে হাসে আর দুধ খায়,—মাঝে মাঝে সুর করে বলে' ওঠে—অ্যাঁ, অ্যাঁ, অ্যাঁ।

—দুষ্টু চাঁপু, চুপ্‌, এক্ষুনি বাবার ঘুম ভেঙে যাবে। চাঁপু তার ফুলের কুঁড়ির মত চোখ দু'টি নাচায়।

খাটের ওপর স্বামী শোন ; তলায় মেঝেতে লম্বা বিছানা,—এক দিকে খুকী আর খুকীর মা, তার পর লাখী, তার পর রাণু, তার পর মনা, তাব পর শোভা,—বয়সের বাড়তি অনুসারে শোয়, মাঝে একটি করে পাশ-বালিশ ব্যবধান। এই পাশ-বালিশ হচ্ছে প্রত্যেকের বিছানা-বাসের সীমানা। লাখীর কিন্তু দু'দিকে দুই পাশ-বালিশ ও পায়ের দিকেও একটা বালিশ চাই,—তার বয়স চার কি না,—সেজন্যে চারটে বালিশ না হলে তার চোখে ঘুম আসে না। রাণু কিন্তু ভারি লক্ষ্মী। সে বলে, তার একটা পাশ-বালিশও চাই না। কি হবে মা, বাজে বালিশ নিয়ে, আমি ত আর লাখীর মত ছোট নেই যে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে যাবো। ছ'বছর তার বয়স, এরি মধ্যে গিন্নি। সবচেয়ে দুষ্টু হচ্ছে মনা। তার ওপর রাতে ঘুমের ঘোরে সে ঘুরপাক খায়,—শোভা বোনাকে লাথি মেরে তার ওপর দিব্যি পা তুলে মহানন্দে ঘুমোয়। শোভা যে সবার বড়দিদি এই গর্বটুকু বজায় রাখবার জন্যে সে আর নালিশ করে না,—ছোট ভাই ঘুমের ঘোরে হাত পা ছোঁড়ে, তা কি করা যায়। সে মাঝে মাঝে বলে বটে, মা, ও চর্‌কির পাশে আমি শোব না, কিন্তু সন্ধ্যে-বেলায় আর আলাদা বিছানা করতে দেয় না, সে মনার পাশেই শোয়।

দু'টো মোটা পাশ-বালিশের দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে শোভা ভাবে আজ নিরাপদে ঘুমানো

যাবে ; কিন্তু রাতে যখন চরকি ঘোরে,—কোথায় থাকে পাশ-বালিশ, কোথায় বা থাকে মাথার বালিশ,—মনার এক পা চলে যায় শোভার বিছানাতে, আর এক পা চলে যায় মেঝেতে,—চাদরটা তালগোল পাকিয়ে থাকে,—কিন্তু কারুর ঘুমের কোন কম্‌তি বা ব্যাঘাত হয় না।

খুকীর দুধ খাওয়া শেষ হলে খুকীর চোখ ধীরে ধীরে বুজে আসে, আবার সে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু খুকীর মায়ের আর ঘুমানো চলে না। কমলা ধীরে উঠে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে, চুলগুলো মাথায় কুণ্ডলী করে বেঁধে, ঘুমন্ত ছেলেমেয়েগুলির দিকে সস্নেহ নয়নে চেয়ে দেখে। ইচ্ছে করে প্রত্যেককে বুকে জড়িয়ে চুমো খায়, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না। লাখীকে সোজা করে শুইয়ে দিয়ে তার চার-পাশে চারটি বালিশ ঠিক করে রাখে। রাণু কি শান্ত ভাবে ঘুমোচ্ছে,—তার কোলের পুতুলটিরও নড়চড় হয় নি। মনাটাকে মেজে থেকে তুলে বিছানাতে শুইয়ে দেয়,—মনা কি বিড়বিড় ক'রে বকে ওঠে—'গোল' 'গোল', আর সঙ্গে সঙ্গে পা ছোঁড়ে—সারা বিকেল ফুটবল খেলে তার আশ মেটে নি।

চারি দিক নিঝুম, সবাই ঘুমোয়,—ভোরের আলো পূবের পাঁচিল দিয়ে আসে—ময়নাটা খাঁচায় উসুখুস করে। কমলা ময়নাটাকে বলে, গোলমাল করিস না। তার পর ঝি-চাকরদের জাগাতে নীচে চলে যায়। মধুটা কোন দিন যদি সকালে ওঠে,—দালান বারান্দা সিঁড়ি সব ধুতে হবে,—ধুয়ে শুকিয়ে যাবার আগে যদি সবাই উঠে পড়ে, পায়ে পায়ে কাদা হয়ে যায়। এই ধোওয়া নিয়ে স্বামীর সঙ্গে কত গোলমাল না হয়েছে। স্বামী বলেন, 'আচ্ছা, কলকাতা সহরের সব বাড়ীর দালান বারান্দা সিঁড়ি উঠান সব জল দিয়ে যদি ধুতে হয়, কত জল লাগে বল ত! অত জল মিউনিসিপ্যালিটি দেবে কি করে?'

কমলা বলে, 'তা হিঁদুর বাড়ী আমি ম্লেচ্ছপনা করতে দেবো না।'

মধুর ঘরের শিকলি ঝন্‌ঝন শব্দে বেজে ওঠে।—'হতভাগা ওঠ্ না, কলে জল এসেছে কতক্ষণ।'

—'উঠি মা!'

কমলা নিজেই বাল্‌তি ও ঝাঁটা নিয়ে সিঁড়ি ধুতে আরম্ভ করে,—জানে, ঝাঁটার শব্দ না শুনলে মধু উঠবে না। আর মা ধুচ্ছেন জানলে সে আর শুয়ে থাকতে পারবে না। চোখ রগড়াতে রগড়াতে মধু ছুটে আসে—'মা আমায় দিন্, আমায় দিন্।'

কমলা দরজা খুলে রান্নাঘরে ঢোকে,—সব ঠিক আছে,—রাতে তাহলে বেড়াল ঢোকে নি। উনানের ছাই নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে বাহির হয়ে আসে—ওসব ক্রীম, পাউডারে দাঁত মাজা তার পোষায় না।

মুখ ধুয়ে কমলা ওপরে উঠে আসে,—সব দরজার গোড়ায় জল-ছড়া দেয়,—শাশুড়ী ঠাকরুণের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে,—'মা, রাতে কেমন ঘুম হল।' উত্তর আসে, 'ভাল না মা।' কয়েক দিন হল শাশুড়ীর হাঁপানিটা বেড়েছে। শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়ায়, খুকীর সুখস্বপ্নহাস্যভরা মুখখানি দেখে, তার পর মনাকে ডাকে, 'খোকা খোকা'। মনা রোজ মাকে বলে, মা ভোরে উঠিয়ে দিও, পড়া মুখস্থ করবো ; কিন্তু কোন দিন সে ভোরে উঠতে পারল না। কমলা দু'তিনবার ডাকে, হাত ধরে ঝাঁকুনি দ্যায়। মনা গাঁইগুই করে বসে, আবার শুয়ে পড়ে। ঘুম-ভরা ছেলেকে টেনে তুলতে কমলার মনে বাজে,—বলে, ঘুমোক, কত পড়বে!

স্বামীর, ছেলেমেয়েদের দাঁত-মাজার সরঞ্জাম ঠিক করে রেখে, ওপরের ঠাকুর-ঘর মুছে, উনানে আগুন দিয়ে, স্নান করে কমলা যখন রান্নাঘরে ঢোকে, তখন সূর্য উঠে গেছে—অরুণ-রথচূড়া পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে গয়লার কাছ থেকে দুধ মেপে নেয়। মধুর সিঁড়ি বারান্দা ধোওয়া হয়ে গেছে,—সে এসে দাঁড়ায়—

'মা, চা, বাবু যে হাঁকছেন।' 'হাঁকতে দে, জল বসিয়েছি। চায়ের বাটি না হলে বিছানা থেকে উঠতে পারেন না, কিন্তু ছেলেমেয়েগুলির যে মাথা খাচ্ছেন। হ্যাঁ রে ছেলেমেয়েগুলোর সব মুখ ধোওয়া হয়েছে?'

'মুখ ধোওয়া কোথায় মা, সব এখন যুদ্ধু হচ্ছে।'

'যুদ্ধু কি রে?'

'বালিশ ছোঁড়াছুঁড়ি।'

'আবার আজ হচ্ছে, রোস দেখাচ্ছি!'

বিছানা ধামসানো বা বালিশ ছোঁড়া কমলা মোটেই পছন্দ করে না,—তার বুকে যেন বাজে,—হনহন করে সে ওপরে চলে যায়।

শোবার ঘরে দু'পক্ষে যুদ্ধ চলে,—এক দিকে মনা আর লাখী, অপর দিকে শোভা আর রাণু,—তাদের বাবাও মাঝে মাঝে যোগ দ্যান। মনা সব চেয়ে ওস্তাদ,—তার তাগটা ঠিক হয়। লাখী বেচারার ছোট বালিশগুলিই সবাই টেনে টেনে ছোঁড়ে। সে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমার বালিশ, আমার বালিশ।' তার পর নিজের পক্ষের জয় হচ্ছে দেখে হেসে ওঠে। এই যুদ্ধক্ষেত্রে চাঁপু কিন্তু সুখে নিদ্রা যায়।

মাকে দেখে যুদ্ধটা হঠাৎ থেমে যায়,—মনা কিন্তু হাতের বালিশটা শোভাকে ছুঁড়ে মারতে ছাড়ে না।

—'হতভাগা ছেলেরা, সকালে উঠে কাণ্ড দেখ না, মেরে'—

সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে—'মা, মনাই ত আরম্ভ করলে'—

'আমি! বাঃ, বাবা ত প্রথমে'—

'মা দেখো না, আমার বালিশ, এই তুলো বেরিয়ে গেল।'

'মনা শীগ্‌গীর ওঠ, হতচ্ছাড়া ছেলে—আর হ্যাঁ গা, তুমি বুড়ো মিনসে, তুমি কি শিং ভেঙে বাছুরের দলে'—

স্ত্রীকে দেখেই স্বামী শুয়ে পড়েন,—তিনি নীরবে চোখ বোজেন। মনা দৃপ্ত ভাবে উঠে চলে যায়,—জানে মা এখন স্নান করে কাচা কাপড় পরে, সুতরাং তার ওপর কোন চড় বা চাপড় পড়ার আশঙ্কা নেই।

স্বামীর চা ও ছেলেমেয়েদের সিদ্ধ ওটমিল-মিশ্রিত দুগ্ধের বাটিগুলি সাজিয়ে মধুর হাতে দিয়ে কমলা ভাঁড়ার ঘরে তরকারি কুটতে বসে,—ঠাকুর এখনি এসে পড়বে। মধু এসে দাঁড়ায়,—'বাজার কি আনতে হবে মা।' ঝি ঝামা দিয়ে কড়া মাজতে-মাজতে কলতলা মুখর করে তোলে। লাখী এসে দাঁড়ায়, সঙ্গে শোভা।

'দেখ মা, লাখী দুধ খাচ্ছে না।'

'মা, আমায় বাবা একটু চা দিচ্ছে না কেন।'

কমলার সামনে বঁটি,—চারি দিকে তরকারির পাহাড়,—আলু চেরা, পটল কাটা চলছে। তার সঙ্গে হুকুম করা,—ছেলেমেয়েদের অভিযোগের মীমাংসা করা,—বামুনঠাকুরের ফরমাজ শোনা, সব চলেছে।

'লক্ষ্মী লাখু, দুধ খাও গে, আমার সঙ্গে চা খেও। ওই রে চাঁপু জেগেছে,—রাণু, নিয়ে আয় ত মা দুধটা খাইয়ে দে'না।'

শোভা হচ্ছে পড়ুয়ে মেয়ে—সে সংসারের কাজে ঘেঁসে না। রাণুর প্রথম ভাগ শেষ হয়েছে,—'ঐক্য বাক্য' আর তার পোষাচ্ছে না,—মূর্খতার অখ্যাতি সে বহন করতে রাজী আছে,—বিদুষী বলে সে বিখ্যাত হতে চায় না। সেজন্যে সংসারের একটু কাজ করতে পারলে সে খুসি,—ততক্ষণ ত মাস্টার মহাশয়ের কাছে পড়াটা ফাঁকি দেওয়া যায়। সে সর্বদাই মাকে সাহায্য করতে ব্যস্ত,—চাঁপু কাঁদলেই সে পড়ার ঘর থেকেও ছোটে।

ঠাকুরের চাল ডাল বের করে, তরকারি বুঝিয়ে কমলাকে একবার ওপরে যেতে হয়। বাড়ীখানা এতক্ষণে সরগরম হয়ে উঠেছে। পড়ার ঘরে মনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাণু চেঁচাচ্ছে,—কলতলায় ক্ষেত্তরের মা বাসন মাজার সঙ্গে বক্‌বক করছে,—রান্নাঘরে তেলের কল্‌কল শব্দ হচ্ছে,—আর শোবার ঘরে কেষ্টো খাটের বিছানা তুলছে,—তলায় বিছানাতে লাখীতে চাঁপুতে স্বামীতে মিলে হাসাহাসি চেঁচামেচি চলছে,—বারান্দাতে ময়নাটাও তার সঙ্গে ডেকে উঠছে। কমলা শোবার ঘরের দিকে এখন যায় না,—চাঁপু 'মা' বলে চেঁচালে, তাকে কোলে না নেওয়া দু'পক্ষের পক্ষেই কষ্টকর ব্যাপার হবে, শেষে ক্রন্দনের জয়ই হবে। সে সিঁড়ির পাশে ঠাকুর ঘরে চলে যায়,—সকাল থেকে ঠাকুর-দেবতার একটু নাম করবার সময় পায় নি। সাদা শাড়ীটা ছেড়ে একটা তসরের কাপড় পরে ; কিন্তু আহ্নিক করতে বসে নীচের কলরব কানে আসে,—মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। নীচে মধুর গলা শোনা যায়। কি—মাছ পেল, কত পয়সা ফিরলো,—এ সব জানতে মন উসখুস্ করে,—আহ্নিক তাড়াতাড়ি সেরে চলে আসতে হয়।

মাছ কত ভাগ করে কুটতে হবে বলে, রান্নাঘরটা পরিদর্শন করে' ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকে কমলা দেখে, শাশুড়ী ঠাকরুণ নীচে নেমে এসে ভাঁড়ার-ঘরের এক কোণ দখল করে বসেছেন,—তাঁর স্নান-আহ্নিকও হয়ে গেছে। শাশুড়ী বলেন, 'দাও বৌমা, পানগুলো আমিই সাজছি ; না, বাপু, তোমার এ মেয়ের জ্বালায় পারা গেল না।' চাঁপু ঠাকুরমার কোলে চড়ে নেমে এসেছে, এখন কোল থেকে নামতে চায় না, আলুর খোসা দিয়ে তাকে ভুলোতে হয়।

সকালের ঘড়ির কাঁটাগুলো ছুটে চলে,—ঠাকুরের ঝোল সাঁত্‌লানো হতে না হতেই কলের ঘরে ছেলেমেয়েদের ভিড় লেগে যায়।

লাখী দিগম্বর হয়ে এসে বলে, 'মা, আমায় কেউ ছান করিয়ে দিচ্ছে না।'

মনা বলে, 'আমার খদ্দরের সার্ট কোথায় মা?'

শোভা বলে, 'আমি কোন্ শাড়ী পরব?'

রাণু মুখ লাল করে বলে, 'মা, আজ এক মেম আমাদের স্কুল দেখতে আসবেন, আমি সেই সোনালী ফ্রকটা পরব?'

শোভা মনে মনে বলে ওঠে, 'সিল্কের শাড়ী পরে গেলে আবার হেড মিস্‌ট্রেস্ চটেন, —নিজেরা ত বিকেলে কত সাজ গোজ করে বেরুন হয়।'

'হ্যাঁ রে, স্কুলে যাবি, আবার সাজগোজ করে যাওয়া কি রে।'

রাণুর ইচ্ছা আজ ফ্রক না পরে শাড়ী পরে যায়, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না।

•

দিদিদের দয়া হলে তারা লাখীকে স্নান করিয়ে দেয়। কিন্তু স্নানের সময় লাখী এত জল ছোঁড়ে, দুষ্টুমি করে,—একবার গা মুছিয়ে দিয়ে আবার গা মোছাতে হয়,—দেরী হয়ে যায়,— সেজন্যে সহজে তারা কেউ লাখীকে স্নান করাতে রাজী হয় না। কমলাকে স্নান করাতে হয়। এই নবনী-কোমল দেহে তেল রগড়ানো, সাবান মাখানো, ধোয়ানো, জল মোছানোতে আনন্দ আছে, কিন্তু রোজ সে সুখ উপভোগ করবার সময় কোথায়, মধুকে ডাকতে হয়— 'দে বাবা লাখীকে চান করিয়ে।' কমলা চাঁপুকে স্নান করায়।

তার পর দালানে আসন-পিঁড়ে সশব্দে পড়ে যায়। 'ঠাকুর ভাত দাও।' 'শীগ্‌গীর!' ছেলেমেয়েরা গোগ্রাসে গিলতে থাকে।

'হ্যাঁ রে মনা, এই ত সাড়ে ন'টা , আস্তে খা'—

'মা, আমার আজ পরীক্ষা।' ওজর একটা আছেই কিন্তু পরীক্ষা আছে বলে আধ ঘণ্টা আগে স্কুলে যাবার কারণ সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিল না। মনার মনে শুধু জাগে, কাল দুটো লাট্টু হারিয়েছি, আজ সেগুলির উদ্ধার করতে হবে।

ছেলেমেয়েরা খেতে বসে, একটু দেখবারও সময় নেই,—কমলা তোলা-উনানে তাড়াতাড়ি পটল ও লুচি ভেজে এ্যালোমিনিয়মের বই-এর মতন টিফিনের বাক্স সাজায়। বামুন-ঠাকুরের আলুর দম এখনও হয়ে ওঠেনি! ভাঁড়ার ঘরের দরজার চৌকাটে বসে ঠাকুমা কিছু তদারক করেন।

'গাড়ী আয়া বাবা।' শোভা আর রাণু ঝড়ের মত ছোটে,—পিঠের ওপর বেণী দোলে,—জুতোর হিলগুলো সিঁড়িতে খট্‌খট্ করে,—বুঝি হিল-ওয়ালা জুতো শুদ্ধ ঠিকরে পড়ে। ওরে খাবারের বাক্স? সেদিকে তাদের হুঁস থাকে না,—খাতা-বইগুলো বুঝি হাত থেকে পড়ে যায়। মধু টিফিনের বাক্স নিয়ে পেছনে ছোটে, কমলাও উঠে এসে ভাঁড়ার-ঘরের জালতি-দেওয়া জানলা দিয়ে দ্যাখে,—মেয়ে দুটো উঠল, দরজা বন্ধ হল, বাস্ চল্ল।

'মা, স্কুলে যাচ্ছি।' বইভরা চামড়ার ব্যাগটা দুলিয়ে মনা সামনে এসে দাঁড়ায়। 'আজ পরীক্ষা বুঝি?' 'হ্যাঁ মা,' বলে সে তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম সেরে নেয়।

পরীক্ষার দিন মাকে প্রণাম করে গেলে ফলটা ভাল হবেই, এ বিশ্বাস তার দৃঢ়। কমলা তার সার্টের কলারটা ঠিক করে দেয়, গলার বোতামটা আঁটতে চায়। 'থাক মা, ওটা খুলে রাখা ফ্যাসান, আর যা গরম।' নিমেষের মধ্যে খোকা অন্তর্হিত হয়ে যায়। এ দিকে স্বামী খেতে বসেন ; তাঁর পাশে লাখী ও চাঁপু।

চাকরদের জলখাবার দিয়ে, এক হাতে এক বড় পেতলের বাটিতে চা ও আর এক হাতে পাখা নিয়ে কমলা স্বামীর কাছে এসে বসে। চা নয়, চায়ের সরবৎ—তাতে চায়ের চেয়ে দুধ ও চিনির ভাগই বেশী,—এতেই বেলা একটা পর্যন্ত চলবে।

মায়ের সঙ্গে চা খাবে, না, বাবার সঙ্গে গরম মাছ-ভাজা খাবে,—এ সমস্যা সমাধান করে উঠতে পারে না। 'চা ছাই না' বলে' গরম মাছ-ভাজাই খেতে আরম্ভ করে। তারপর মায়ের গলা জড়িয়ে চায়ের বাটির দিকে এমন ভাবে চায় যে চা একটু দিতেই হয়। চাঁপু কিন্তু একটু আলু খেয়েই সন্তুষ্ট,—লক্ষ্মী মেয়ে!

পান নিয়ে যখন কমলা উপরে আসে, স্বামীর অর্ধেক সাজগোজ হয়ে গেছে,—মধু পাখার বাতাস করছে। সে মাকে দেখেই পাখাটা রেখে অকারণে চলে যায়। কমলা পাখা করতে করতে দু'একটা সংসারের কথা বলে। সকালের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর এই মিলন,—আফিসের পোষাক পরার অবসরে পাখার বাতাসে সাংসারিক প্রেমালাপ হয়। কমলা কোটটি ধরে, স্বামী দু'টো হাত তাতে ভরে বলেন,—থ্যাঙ্ক ইউ ডিয়ার।' তারপর এক হাতে কমলার ঠাণ্ডা নরম গালে আদর করেন। কমলার গাল-দুটিতে রক্ত ফেটে পড়ে, বলে, 'যাও, ঢং করতে হবে না।'

স্বামী বলেন, 'সংসার-সংগ্রামে রণক্ষেত্রে যোদ্ধার বেশ পরিয়ে পাঠাচ্ছো,—বিজয়-তিলক দাও।' কমলা একটু ঘাড় বেঁকিয়ে দরজার কাছে যেন পথ রোধ করে দাঁড়ায়। এই ভঙ্গীতে তাকে বড় সুন্দর দেখায়। কোন দিন বা উচ্ছ্বাসের আবেগে স্বামী একটি চুমো খেয়ে ফেলেন। কমলার সমস্ত দেহে পুলকের শিহরণ লাগে।

'তবে আসি প্রিয়ে।'

স্বামীর জুতোর শব্দ মিলিয়ে যায়,—সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ কানে আসে,—ঘরের মাঝে কমলা উদাসভাবে যেন স্বপ্নের ঘোরে দাঁড়িয়ে থাকে,—সব কাজ ভুলে যায়। বাড়ীখানা স্তব্ধ, নিঝুম, মনটা ভারী হয়ে আসে। আঁচল দিয়ে খাটের পায়াগুলো ঝাড়ে,—অকারণে কুলুঙ্গি থেকে তেলের ঔষধের শিশিগুলো নামিয়ে ঝাড়তে আরম্ভ করে, কিন্তু কাজে মন থাকে না। সকালের সেই কর্মময়ী কমলা যেন বদলে গেছে কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

দালানের কোণ থেকে একটা ডাক আসে—'মা, মা, দেখো না—'

কমলা চমকে ওঠে, মনের কুয়াসা কেটে যায়, বলে—'যাই, বাবা, ঠাকুরকে জিজ্ঞেস কর ত—মাগুর মাছের ঝোল হয়েছে কি?'

'হয়েছে মা।'

সাবান দিয়ে ধোবার জন্যে রুমাল, গেঞ্জি, মোজা, খুকীর জামা সব জড় করে মধুকে দিয়ে কমলা লাখীকে মাগুর মাছের ঝোল ভাত খাওয়াতে বসে। লাখী একটু পেটরোগা,—বাবা মা দাদা দিদিদের সঙ্গে বার বার খাওয়াই তার কারণ। মুখ তার সারা দিন টুক্‌টাক্ চলছে। স্বামী তার জন্যে বকেন, আবার নিজেই দিতে ছাড়েন না,—খাবার সময় সামনে এসে বসলে কিছু মুখে না দিয়ে থাকা যায় না।

লাখীকে খাওয়াতে বসলেই চাঁপু কোথা থেকে টলতে টলতে চলতে চলতে এসে থালার কাছে থপ্ করে বসে পড়ে বলে,—'ম্যা ম্যা, ভত্ ভত্', তএর ওপর এমন একটা জোর দেয় যে না হেসে থাকা যায় না।

সকালে কাজ হচ্ছিল দ্রুতগতিতে, যেন মেলগাড়ীর ইঞ্জিন ছুটে চলেছে। এখন কাজ চলে ঢিমেতেতালে। ভাঁড়ার-ঘরের খুঁটিনাটি, বসার ঘরের টেবিল সাজানো, শোবার ঘরের ঝাড়পোঁছ চলে অলস ভাবে। এই ধুলোঝাড়া, গোছানো, সাজানো, মোছা যেন পরম উপভোগের সুখকর কাজ।

গির্জের ঘড়িতে বারোটা বাজে,—দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে,—গলির জনস্রোত, গাড়ি চলা মন্দ হয়ে আসে। খাঁচার ময়নাটা ছাতু ছোলা খেয়ে ঝিমোয়, শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ মাঝে মাঝে হাঁক দেন, 'বৌমা, আর কত বেলা করবে।'

'এই যে মা, ছাদের কাপড়গুলো তুলে যাচ্ছি।'

ছাদের সিঁড়ির মাঝে জানলার কোণে কিন্তু দাঁড়াতে হয়,—পাশের বাড়ীর একটি মেয়ের অসুখ,—খবরটা নেওয়া দরকার। জানলায় দাঁড়াতেই পাশের বাড়ীর বৌ ডাকে, 'দিদি, এখনও খাওয়া হয় নি?'

'দেখ না ভাই, কাজের কি আর শেষ আছে।'

'আর তোমার আবার যে রকম ঝরঝরে কাজ ভাই।'

তার পর জানলায় দাঁড়িয়ে সংসারের সুখ-দুঃখের কথা আরম্ভ হয়। পাশের বাড়ীর বৌ বলে, মেয়েটার জ্বর আর ছাড়ছে না,—বাঙ্গালীর ঘরে অসুখ কি লেগেই থাকবে? বউয়ের মেজাজ আজ ভাল ছিল না,—সংসারের টানাটানি। তার পর কমলার কাছ থেকে দশ টাকা ধার চেয়ে বসে। কমলা জানায়, পাঁচ টাকা সে কোন মতে দিতে পারে,—সন্ধ্যে-বেলায় যেন বৌ আসে। কিছু টাকা পাওয়া যাবে শুনে বৌএর মলিন মুখ একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—মেয়েটার ঔষধ-পথ্য টাকার অভাবে হচ্ছে না। তার পর পাড়ার গল্প ওঠে,—কার ছেলে পিকেটিং করে জেলে গেছে,—কার মেয়ে রোজ পিকেটিং করতে যায়, এত সাহসও আজকাল মেয়েদের! এবার পুজোয় খদ্দর ছাড়া কিছু কিনবে না ঠিক করেছে, কিন্তু খদ্দরের যা দাম—তারপর কমলার নতুন চুড়ির প্যাটার্নটা দেখতে চায়।

একটা ছেলের কান্নার শব্দ আসে,—দুপুররে জানলায় নিভৃত আলাপ ভেঙে যায়।

শাশুড়ী ঠাকরুণকে খাওয়াতে বসিয়ে নিজে খেতে বসতে দেড়টার আগে হয় না,—বাহিরে দালানে ঝি-চাকররাও একসঙ্গে খেতে বসে।

খাওয়ার পরও কি কাজের বিরাম আছে,—একগাদা। সেলাই পড়ে,—ছেলেমেয়েগুলো কাপড় ছিঁড়তে ওস্তাদ। তার পর এ সব খদ্দরের কাপড় সেলাই করাও হাঙ্গামা। মনা কিন্তু খদ্দর ছাড়া কিছু পরবে না, আর সেই বেশী ছেঁড়ে। তবু হ্যাপ-প্যাণ্ট করে ছেঁড়া কিছু

কমেছে।

নিঝুম অপরাহ্ণ, চাঁপু মেজেতে একটা কাঁথার ওপর ছোট বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুমোয়। লাখী পাশে বসে অসম্ভব সব কথা বলে, 'মা, আচ্ছা তুমি বড় না বাবা বড়? আচ্ছা, তোমার ত বাবার মত গোঁফ নেই, মেয়েদের থাকে না বুঝি—' লাখীকে বুকে টেনে চুমো খেয়ে কমলা বলে, 'চুপ কর লাখী, একটু ঘুমো না বাছা।' লাখী তার জন্তু-জানোয়ারের রঙীন ছবিভরা এ, বি, সি, ডির বইখানি নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নিজের মনে মনে কথা কয়। কখন তার চোখ ঢুলে পড়ে, কমলা তাকে কোলে টেনে সরু সুরে গান গেয়ে ঘুম পাড়ায়। ছাদে দু' একটা পায়রা বক্‌বকম্ করে।

চারি দিক নীরব। জনহীন পথে একটা ফিরিওয়ালার ডাক করুণ সুরের মত ঘুরে ঘুরে ফেরে। একটা চিল ছাদ দিয়ে উড়ে যায়। নীচে চাকরেরা ও ওপরে ছেলেমেয়েরা ঘুমোয়। বাড়ীখানা স্তব্ধ, যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি, একটা মাছি ভন্‌ভন্ করে ঘোরে।

লাখীকে শুইয়ে দিয়ে কমলার আর সেলাই করতে ভাল লাগে না। আলমারীটা যেন টানে, যাদুমন্ত্রে ভুলোয়। আলমারী খুলে সে সাজানো কাপড়গুলি আবার সাজাতে আরম্ভ করে। কিন্তু আলমারী সাজানো আসল ব্যাপার নয়,—আলমারীর ওপরের তাকের পেছনে নীল সিল্কের রুমাল মোড়া দুটি ছোট্ট জামা বাহির করে,—সে দু'টির দিকে চেয়ে মেজেতে বসে পড়ে,—তার মন কোন্ অজানা দেশে উড়ে যায়—এই সময়টা তার দিন-রাতের সুখ-দুঃখের কর্মের বাহিরে। জামা দু'টি তার প্রথমা কন্যার,—এক বছর হতে না হতে নিউমোনিয়াতে সে মারা গেছল ;—সে কতদিন,—পনেরো ষোল বছর হবে। সেই প্রথম-জাতাকে হারানোর সুপ্তলোক অপরাহ্ণের নিস্তব্ধ প্রহরে মনের অতল থেকে জেগে ওঠে,—এখন সে লোকের দুঃখজ্বালা নেই,—বেদনা গভীর নয়,—রহস্যময়,—মন কোন্ স্বপ্নলোকে চলে যায়। কমলা ভাবে, সে যদি আজ বেঁচে থাকতো, পাড়ায় নীলিমার মত হয় ত সুন্দরী হত, হয় ত তার এতদিনে বিয়ে হয়ে যেত, -ফুটফুটে খোকার মা হত। হয় ত সে কিন্তু তাকে বড় করে ভাবতে যেন সে পারে না,—সেই এক-বচ্ছরের ননীর পুতুলটিই চোখে ভেসে ওঠে,—চোখ ছলছল করে।

জামা দুটি ভাল করে পাট করে তুলে রেখে আলমারী বন্ধ করে মেজেতে আঁচল পেতে সে বসে। এই অলস মধুর অপরাহ্ণটুক্ তার স্বপ্ন দেখার, স্বপ্নবোনার, মন নিয়ে খেলা করার সময়—কত কথা কত সাধ মনে হয়—ঘুমন্ত লাখীর ও .ক চাঁপুর দিকে চেয়ে—সাদা মার্বেলের ওপর কালো চুল এলিয়ে সবুজ পাড় ছড়িয়ে শোয়, কখন ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে। বারান্দার ঘড়িটা টিক্‌টিক করে,—সময় কেটে যায়,—বাড়ী নীরব,—যেন রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যার স্বপ্নপুরী।

ঝনঝন শব্দে কড়ার শব্দ হয়, সদর দরজা নড়ে ওঠে। মধু ছুটে গিয়ে দরজা খোলে। দুড়দাড় করে ছুটে, দালান পেরিয়ে, সিঁড়িতে খট্‌মট শব্দ করতে করতে মনা স্কুল থেকে আসে,—সমস্ত বাড়ী জেগে ওঠে। কমলার ঘুম ভেঙে যায়, চাঁপু চীৎকার করে কেঁদে ওঠে,—ঘুম থেকে জেগে একটু কাঁদা তার স্বভাব। বইয়ের ব্যাগটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে মনা তাকে ভুলোতে বসে। চাঁপু চুপ করলে মনা লাখীর চুল ধরে টানে. কমলা বকে উঠলে, মনা পকেট থেকে দুটো পেয়ারা বের করে বলে, 'তোমার জন্যে এনেছি মা।' কমলার আর বকুনি দেওয়া হয় না। শুধু বলে, 'জুতো খোল, সার্ট ছেড়ে হাত মুখ ধুতে যা, ভূত কোথাকার।'

'মা বড্ড ক্ষিদে

'হাত মুখ ভাল করে সাবান দিয়ে ধুগে, পথের যত ময়লা গায়।'

একটু পরেই মেয়েরাও স্কুল থেকে এসে পড়ে। কাপড় জামা না ছেড়েই রাণু চাঁপুকে আদর করতে বসে,—স্কুল থেকে একটি ফুল এনেছে, সেটি তার হাতে দেয়।

কমলার সংসারের কাজ আবার আরম্ভ হয়। ছেলেমেয়েদের কাপড়-ছাড়া, হাত মুখ-ধোওয়া তদারক করতে হয়। তার পর সবাইকে জলখাবার দিয়ে চাঁপু ও লাখীকে দুধ খাওয়াতে বসে।

বেলা গড়িয়ে যায়, রান্নাঘরে আগুন পড়ে, বাড়ী ধোঁওয়াতে ভরে ওঠে। কমলা ঝিকে বকে, 'এত দেরীতে আগুন দিস্, এখন যদি বাবু এসে পড়েন।' স্বামী আসার আগে চুল বেঁধে গা ধুয়ে নিতে হয়। শাশুড়ী ঠাকরুণ বলেন, 'এসো বৌমা, চুলটা বেঁধে দি।' 'নিজেই বেঁধে নিচ্ছি মা।' আয়না নিয়ে চুল বাঁধতে বসে। চাঁপু এসে আয়নায় উঁকি মারে, আপন মনে হাসে, মাথার ফিতেটা টানে—চুল বাঁধতে দেরী হয়ে যায়।

'বড় জ্বালাতন করিস্ চাঁপি'। চাঁপুর কিন্তু বকুনিতে গ্রাহ্য নেই, নিজের মুখখানা আয়নায় দেখতে সে ব্যস্ত, চিরন্তনী নারী!

কোন দিন শাশুড়ী ছাড়েন না,—চুল বাঁধতে বসেন। চুল বাঁধা হলে সীমন্তে সিন্দূররেখা টেনে বলেন, 'জন্ম এয়োস্ত্রী থাকো, আশীর্বাদ করি।' মুখ রাঙা করে শাশুড়ীর পায়ের ধুলো সীমন্তে মুছে কমলা গা ধুতে যায়, বুক দুরদুর করে।

স্বামী আসার আগেই কমলা ফলের রেকাব, জল-খাবারের রেকাব সাজিয়ে ধোওয়া কাপড় গুছিয়ে ঘরে বসে থাকে,—টুকটাক কাজ করে, যেন প্রতীক্ষা করছে না, কাজ করছে।

ঘরে ঢুকেই খাবারের রেকাব দেখে স্বামী খুসি হন, কমলার সদ্য সাবান-ধোওয়া গালে আদর করে বলেন, 'সাঙ্গ হয়েছে রণ! তুমি এস এস নারী, আন তব হেমঝারি!'

'যাও! হ্যাঁগা, এ প্যাকেটটাতে কি?'

'তোমার জন্যে নতুন শাড়ী।'

'হ্যাঁ! খালি ঠাট্টা! খোকার বিস্কুট এনেছ?'

'ওই ভুল হয়ে গেল।'

'দশটা টাকা দিতে হবে আজ।'

'কাউকে দিতে হবে বুঝি!'

'না, আমার হাতে কিছু টাকা নেই।'

'দেখ, কি সময় পড়েছে, এ টানাটানির বাজার, কিছু টেনে খরচ করতে হয়।'

এই রকম সাংসারিক প্রেমালাপ কিছুক্ষণ চলে। বেশীক্ষণ চলতে পারে না। সাজগোজ ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে খাবার খেয়ে স্বামী যান বেড়াতে অর্থাৎ মিত্তিরদের বাড়ীর তাসের আড্ডায় অথবা ইউনিয়ান ক্লাবে।

'ওগো, আজ সকাল সকাল এসো।'

'হ্যাঁ, বেশী রাত হবে না।'

কিন্তু সাড়ে ন'টা দশটার আগে আর বাড়ী ফেরা হয় না।

তার পর ভাঁড়ার-ঘরে রান্না ঘরে কাজের অবধি থাকে না। ঠাকুরকে সব রান্নার জিনিষ দিতে, রান্না বুঝিয়ে দিতে সন্ধ্যে হয়ে আসে। সন্ধ্যার শাঁখ বাজিয়ে ছাদে তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করে। তার পর তার আর কাজের বেগে নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না—দুধ জ্বাল, রুটি লুচি বেলা, কত কাজ! কাজের মাঝে মন উস্‌খুস্ করে, রাণু, লাখী ও চাঁপুকে নিয়ে মধু পাড়ার পার্কে কখন বেড়াতে গেছে, এখনও ফিরল না কেন, মনাও এখনও হকি খেলে আসে নি, শোভাটা পাড়ার কোন্ বাড়ীর ছাদে আড্ডা দিচ্ছে। হাতের লেচিগুলো কমলা তাড়াতাড়ি পাকায়।

কলরব করতে করতে ছেলেমেয়ের দল বাড়ীতে ঢোকে, সব মুখ রাঙা, ঘর্মাক্ত। নানা অভিনয়, অভিযোগ, আবদারে রান্নাঘরের সামনে দালানটা মুখর হয়ে ওঠে। কমলার সে সব শোনার অবসর থাকে না, সে রুটি ব্যালে। ঠাকুমা সিঁড়ির ওপর মালা জপতে জপতে মাঝে মাঝে বলে ওঠেন, 'ওরে গোলমাল করিস না।' মধু লাখীকে টানতে টানতে এসে বলে, 'মা, লাখুর ঘুম পেয়েছে।'

'দু'খানা গরম লুচি খাইয়ে দে না বাবা।'

চোখ রগড়াতে রগড়াতে লাখী বলে, 'আমাল পটল ভাজা কৈ?'

খেতে বসে কিন্তু লাখীর সব ঘুম চলে যায়, সে আর রান্না-ঘর ছেড়ে উঠতে চায় না। দাদা-দিদিরা যখন মাস্টার মশাই-এর কাছে পড়াশোনা সেরে দালানে খেতে বসে, তখন তার মুখ চলছে। সবার খাওয়া শেষ না হলে সে উঠতে চায় না। খাওয়া শেষে শোভা নিজে মুখ ধুয়ে লাখীর হাতমুখ ধুইয়ে দেয়, বলে, 'চ, শুতে।'

দল বেঁধে হল্লা করে সবাই শুতে যায় ; চাঁপুর দুধের বাটি নিয়ে কমলা ওপরে আসে,— সবাই কোথায় কি রকম শুল তদারক করে। চারটে বালিশ চার ধারে ঠিক আছে কি না তা দেখে লাখী নিশ্চিন্ত মনে শোয়। মনা স্কুলের গল্প করে ; রাণু বলে ওঠে, 'বেশী বক্‌বক্ করিস নে, ঘুমোতে দে।' হঠাৎ লাখী উঠে বসে, বলে, 'বিছানা বড় ঠাণ্ডা।' অয়েল-ক্লথের ওপর কাঁথা দিয়ে সে শোবে না, সে কি চাঁপুর মত ছোট।

মনা অম্নি বলে ওঠে, 'কিন্তু রাত্তিরে বিছানা ভেজাতে'—

রাণু বলে, 'তুমিও ত বাপু সেদিন'—

'যাঃ! সে বুঝি আমি'—কথাটা তোলা যে ভুল হয়েছে, তা মনা বুঝতে পেরে চুপ করে।

চাঁপু মায়ের কোলে শুয়ে দুধ খায়, ছেলেমেয়েদের চোখে ঘুম ভরে আসে, ঘরের আলো নিভে যায়, দালানের আলোটা মিটমিট জ্বলে, আবার বাড়ী নিঝুম নিদ্রিত হয়।

ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে কমলা সিঁড়ির পাশে দালানের কোণে একটা সেলাই বা একখানা বাংলা মাসিক পত্রিকা নিয়ে বসে। আজ সন্ধ্যেতে অজিত, কি নির্মল, কি সারদা, কেউ আসে নি সেই কথা মনে পড়ে। এরা হচ্ছে পাড়ার ছেলে, তাকে দিদি বলে ডাকে। সন্ধ্যেবেলায় দালানে প্রায়ই তাদের বৈঠক বসে। কেউ ফার্স্ট ইয়ার, কেউ থার্ড ইয়ারে পড়ে। কচি বয়স, তরুণ মন। সবাই এসে দিদির কাছে কত সংবাদ দেয়, কত অভিযোগ কত আবদার জানায়—সঙ্গে সঙ্গে চা, খাবার, মাঝে মাঝে মাংসের কচুরি বেগুনি লাভ হয়। কি তর্ক করতে পারে ছেলেগুলো! এখন দেশের কাজে বড় ব্যস্ত।

বাংলা মাসিকের একটা গল্প কমলা পড়তে আরম্ভ করে—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হচ্ছে না, স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে—এই রকম প্লটের একটা গল্প। কি করে স্বামীকে সংসারকে ছেড়ে মেয়েমানুষ চলে যেতে পারে, কমলা তা কল্পনা করতে পারে না। সেই দুঃখিনী হতভাগিনীর জন্যে তার চোখে জল আসে, গল্প পড়তে ভাল লাগে না, পত্রিকা মুড়ে রাখে। সিঁড়িতে মস্‌মস্ জুতোর শব্দ হয়, কমলা চমকে ওঠে, তার চোখের তন্দ্রা চলে যায়, স্বামী আসছেন।

স্বামীকে খাইয়ে নিজে যখন খেতে বসে রাত এগারোটা বেজে যায়। তার পর ঝি চাকর খেলে রান্নাঘর ধোওয়া হয়। সদর দরজা বন্ধ আছে কি না দেখে, ভাঁড়ার-ঘরে কুলুপ দিয়ে পান চিবোতে চিবোতে কমলা যখন ওপরে ওঠে, দেখে, স্বামী দিব্যি খাটে শুয়ে, নাসিকা-গর্জন হচ্ছে।

দালানে একটু চুপ করে বসে, আকাশে তারাগুলো ঝিলমিল করে, গাছের পাতা কাঁপিয়ে মৃদু বাতাস বয়। সুখনিদ্রা-শান্ত শিশুগুলির দিকে সস্নেহ নয়নে চেয়ে সে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করে, 'প্রভু, এদের তুমি সুখে শান্তিতে রেখো।'

'ওগো শুতে এসো, রাত যে একটা হবে।' বলে স্বামী পাশ ফেরেন।

ধীরে ঘরে ঢুকে কমলা চাঁপুর পাশে শুয়ে নিমেষের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে।

এম্নি করে মায়ের দিনের পর রাত, রাতের পর দিন কেটে যায়।

কিন্তু সেদিন যে কি অঘটন ঘটল কমলা তা নিজেই প্রথমে বুঝতে পারে নি। মেথরের দল মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা-ফেলা গাড়ী হাঁকিয়ে অনেকক্ষণ চলে গেছে। মধু নিজেই উঠে সিঁড়ির বারান্দা ধুয়েছে। বাইরে রোদ উঠে গেছে, কমলার তখনও ঘুম ভাঙে নি. যখন সে জাগল, লজ্জিত ভাবে দেখল, স্বামী উঠে খাটে বসে,—ছেলেমেয়েরাও জেগেছে, তবে মায়ের ঘুম ভেঙে যেতে পারে ভেবে গোলমাল করছে না,—ফিস্‌ফাস কথা হচ্ছে।

স্বামী বল্লেন, 'কি গো, এত দেরী আজ, শরীরটা খারাপ?'

'কেন, একদিন দেরী হতে পারে না! আমি কি কল না কি যে রোজ এক সময়ে উঠতেই হবে, না আমি কলের কুলি যে ভোরের ভোঁ বাজলেই কাজে ছুটতে হবে!'

'না, তা বলছি না।'

কারুর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কমলা নীচে নেমে গেল। মায়ের মেজাজ আজ সুবিধের নয় দেখে ছেলেমেয়েরা সেদিন হল্লা বা বালিশ ছোঁড়াছুঁড়ি করতে সাহস করলে না।

সারা সকাল কোন কাজে কমলার মন লাগল না,—দেহ শ্রান্ত, মনটা কেমন ভার,—গত রাতে ভাল ঘুম হয় নি।

দেরীতে উঠে সব বিশৃঙ্খল হয়ে গেল সেদিন ; দশটা প্রায় বাজে, সব রান্না হল না, ছেলেমেয়েরা শুধু ডাল ভাত ও ভাজা খেয়ে স্কুলে গেল। কমলা আপন মনে বলে উঠল, 'আমি কি মাইনে-করা চাকরাণী, আমার যেমন খুসি আমি কাজ করবো।' স্বামী স্নান করে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন, 'ঠাকুর, যা হয়েছে দাও।'

সেদিন কমলা বিশেষ কিছু খেলে না, খেতে অরুচি। মধু ও বামুনঠাকুর খাওয়াতে কত পীড়াপীড়ি করলে, তাদেরও ভাল করে খাওয়া হল না। শাশুড়ী ঠাকরুণ বল্লেন, 'আজ শরীরটা ভাল নেই বৌমা, শুয়ে থাকগে।' কমলা মনে মনে বল্লে, 'অ্যাঁ, শুয়ে থাকবো, সংসারের কাজ কে করবে।'

অপরাহ্ণে সে নিজের ঘরে এলিয়ে শুয়ে পড়ল, কোন সেলাই বা বই হাতে নিলে না। লাখী একটা আবদার করতে গিয়ে থাপ্পড় খেয়ে কেঁদে ঘুমিয়ে গেল।

কমলার মন বড় চঞ্চল মনে হল ; তার সেই প্রথম-জাতা কন্যার কথা বার বার মনে পড়তে লাগলো। তার ছোট জামা দুটি বাহির করে বুকে জুড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতে আরম্ভ করলে। কেন যে কাঁদছে, তা সে নিজেও বুঝতে পারলে না, কোন অজানা বেদনা শান্ত হল। কাঁদতে কাঁদতে মন হাল্কা হয়ে আসতে লাগলো, বিদ্যুতের ঝিলকির মত তার মন চমকে উঠল, ততক্ষণে সে বুঝতে পারল তার কি হয়েছে আজ ; মুখ প্রথমে গম্ভীর হল, তার পর রহস্যময় মধুর সুন্দর হয়ে উঠল।

সারা দিনের কাজ সেরে রাতে যখন কমলা শুতে গেল, সে শোবার ঘরে ঢুকল না, সামনের বারান্দায় লালপাড়-ওয়ালা আঁচল পেতে শুয়ে পড়ল,—তারা-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে রইল, একটা তারা খসে পড়ল।

স্বামী কখন পাশে এসে বসেছেন জানতেই পারে নি। স্বামী তার মাথায় হাত বুলাতে সে স্বামীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলে, স্নিগ্ধ স্বরে বল্লে—'ওগো।'

—'কি!'

স্বামীর মুখ তার মুখের ওপর নত হয়ে পড়তে সে স্বামীর কানে কানে কি কথা কয়ে রহস্যময় হেসে উঠল, তারা-ভরা আকাশ ঝিকমিক করতে লাগলো।

স্বামী হেসে বল্লেন—'এই ব্যাপার, আবার আর একটি।' যেন কমলাই একমাত্র দায়ী!

অধরে আদর করে বল্লেন, 'তা বেশ, কাল দিদিকে চিঠি লিখে দেব।'

'না গো না, অত তাড়াতাড়ি নেই, এখনও অত অকর্মণ্য হই নি।'

স্বামী তার তাম্বুল-রঞ্জিত আবেগ-কম্পিত ওষ্ঠে চুম্বন করলেন।

প্রথম রাতে কমলার চোখে ঘুম হল না। একবার ছাদে ঘুরে এল, দালানে-ঝোলানো বিদ্যাসাগর, গান্ধী, চিত্তরঞ্জনের বাঁধানো ফটোগুলির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রণাম করলে। অমন কোন মহাপুরুষ তার গর্ভে জন্মাবে, অত পুণ্যবতী নয় সে,—তবু গর্ভবতী মাতার মানস-স্বপ্ন কে বলতে পারে!

তারাগুলির দিকে চেয়ে কত কথা ভাবতে ভাবতে গভীর রাতে কমলা ঘুমিয়ে পড়ল।

পৌষ ১৩৩৭

চাটুয্যে-সংবাদ

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আশা করি আমার প্রিয় পাঠকেরা—আমার চীনযাত্রার জাহাজী সঙ্গী চাটুয্যেকে বোধ হয় ভুলে যান নি। পূজনীয় কবিও যখন একদিন তাঁর সম্বন্ধে কিছু শুনতে বা জানতে চেয়েছিলেন, তখন সে বস্তু যে ভোলবার নয় এমন অনুমান করা অন্যায় হবে না। সুতরাং এখানে আবার তাঁর পরিচয় রিপিট্ ক'রে তাঁকে খাটো করতে চাই না এবং তা অনাবশ্যকও।

তিনি আমাদের সেই চাটুয্যে যাঁকে আমরা সুদূর সমরাভিযানে যাত্রার অকূল সমুদ্রে অবলম্বনরূপে পাই। সেইদিনের সেই চিন্তা, শঙ্কা ও বিচ্ছেদ-বেদনা-মথিত অবস্থায় তিনি যেন ভগবৎ-প্রেরিত সঞ্জীবনীর মত উপস্থিত হন্।

লর্ড ক্লাইভ নামক রয়েল্ মেরিন্ ছিল আমাদের দুস্তর ভবপারের বাহক। সেখানি ক্রমে নোয়াজ্-আর্কে পরিণত। ভারতে ও ভারতের বাইরের বাছাই করা বিবিধ মূর্তি তাতে যেন বীজ রক্ষার্থে সংগ্রহ করা হয়েছিল। আজব-ঘর বা মিউজিয়ম্ খোলবার মালও বলা চলে।

হেনকালে চাটুয্যের আবির্ভাব—সকলকে একাগ্র ক'রে দেয়। মস্তকে—বাঙালির বাড়ির পরিচয়-লিপির মত—ডুরে সাড়ির খানিকটা ছিন্নাংশ জড়ানো। গায়ে আদময়লা গোল আস্তিনের আজানু জামা। বাম স্কন্ধে—পৃষ্ঠ ও বক্ষ চাপা, দুইটি পূর্ণগর্ভ চটের থলি ; দক্ষিণ কক্ষে টিনের একটি দড়ির সেফ গার্ড জড়ানো পুরাতন তোরঙ্গ। পাদুকার পরিচয় অনাবশ্যক—পৌঁছুতে পারলে সব কাজ ফেলে সর্বাগ্রে চীনেমুচী খুঁজতে হবে!

ঠাকুর বলতেন—"কাজলের ঘরে যাতায়াত থাক্‌লে—বেদাগ্ কেউ বেরিয়ে আসতে পারে না। যতই সাবধান হও, দেহে একটু দাগ নিয়ে আসতেই হয়।" রংয়ের গাঢ়ত্বে আগন্তুক কিন্তু সে শঙ্কা হ'তে মুক্ত! বিপদ-সঙ্কুল সুদূর যাত্রায় সকলেই নিজেদের দলপুষ্টি চায়। এক্ষেত্রে কিন্তু সে আগ্রহ কারো জাগে নাই! অনেকেই অনেক অনুমান ক'রেছিলেন—সকলেরই ভাবটা ছিল—প্রত্যাখানের দিকে। মজুমদার ভায়া বলেন—"বোধ হয় কালিমাখা কাবুলী—মেওয়া বেচতে বা খোলা দেখাতে যাবে।"

শেষ আমাদেরই ভাগ্য প্রসন্ন হ'ল। তিনি বাঙালী! অর্ডার পেয়ে, বেঙ্গল থেকে ভায়া ক্যাল্‌কাটা চীনে চলেছেন। সঙ্গে থলিভরা ফ্রেশ্-ফ্রুট ; তার ডিটেল্ অনেকেরই স্মরণ থাকা সম্ভব—লঙ্কা হ'তে আধখানা কাঁটাল পর্যন্ত! শুনেছিলেন সমুদ্র সফরে সী সিক্‌নেস্ এড়াবার উহাই ব্রহ্মাস্ত্র বা মহৌষধ। যে কারণেই হউক—না যেতে, না আসতে সী সিক্‌নেস্ তাকে ছোঁয়নি।

২

চীন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর—পনেরো-ষোলো বৎসর কেটে গিয়েছে। যেখানে কোনো সুবিধাই হ'ল না—'রণে মলে নাকি স্বর্গ হয়', আমরাও গেলুম, হত্যাকাণ্ডও থেমে গেল—স্বর্গপ্রাপ্তির পথও ঘুচে গেল! একটি মাত্র উপায় রইল—কাশী। সেই আশায়—অবসর গ্রহণান্তে কাশী এসে রইলুম। একটা কিছু নিয়ে থাকা চাই! অনভ্যস্ত পূজা, জপ, গঙ্গাস্নান নিয়ে অনির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা করাও বড় 'বোরিং'!

এমন সময় একটি বন্ধু জুটলেন—তিনি ভাদুড়ী মশাই—জীবন্ত তিলভাণ্ডেশ্বর। তাঁর একখানি লিপি-ফটো বা জীবনী চাই।—ফিল্ম ফাঁদা গেল—বৎসর দুই সময় কাটাবার খোরাক জুটলো। তাই নিয়ে থাকি।

জয়নারায়ণ স্কুলের সামনে, রেউড়িতলায় বাসা—দ্বিতলেই থাকি। প্রীতিভাজন তরুণেরা আসেন—কেহ লেখক, কেহ সাহিত্যপ্রেমিক—বেশ একটি আনন্দ-বৈঠক্ নিত্যই বসে—সাময়িক-সাহিত্য-কথা চলে। তারা যেন নবযুগের বার্তাবাহক—চোখে মুখে আনন্দ, উত্তেজনা ও প্রাণশক্তির চাঞ্চল্য। কিছু সৃষ্টির জন্য উৎসুক। ভাবতুম—এই তো যৌবন, একেই বলে যৌবন! এরাই তো জগতকে নূতন রূপ দিতে আসে—জগতের যৌবন রক্ষক! ভারী আনন্দ পেতুম। তাদের তর্ক ও সমালোচনাদি নূতন ধারা ধ'রে চল্‌তো—আমি উপভোগ করতুম। নব যুগের আগমন বার্তার সাড়া পেতুম!

আমি বারাণ্ডায় বসে' পথের লোক-চলাচল দেখছি আর ভাদুড়ী মশায়ের কথা ভাবছি। সেটা ছিল মঙ্গলবার—দুর্গাবাড়ীতে দুর্গাদর্শনে যাবার দিন। বহু রহিস্, মহাজন ও জনসাধারণ গিয়ে থাকেন—যাচ্ছেনও। কেহ বা দর্শনান্তে ফিরছেন। ফিরতি জনতার মধ্যে একজনকে দেখে চম্‌কে উঠলুম। চাটুয্যে না! সে মূর্তি—'লাখে না মিলে এক্'! নাকে, কপালে, গালে—সিন্দূর! স্থির নিশ্চয় না হ'লেও না ডেকে পারলুম না—"চাটুয্যে নাকি?"

চাটুয্যে থম্‌কে দাঁড়িয়ে—বারাণ্ডার দিকে চাইলে। যোল বৎসর পরে চারি চক্ষুর মিলন! একমুখ হাসি—সেই গজদন্ত বিকাশ!—"বাঁড়ুয্যে মশাই নাকি?"

"—দাঁড়াও, যাচ্ছি।"

পরিবার ছুটে এসেছিলেন—"কে—কে গা?" বললুম—"চট্ কোরে এক কেট্‌লি চায়ের জল চড়িয়ে দাও, আর চাকরটাকে আধসের গরম জিলিপি—দেরী না হয়।"

"একজন না?"

"হ্যাঁ—হোল্‌কারের বড়কুমার—আমার চীনের চাটুয্যে। বলতে বলতে নেবে গেলুম।

—"এসো, এসো ভায়া। অ্যাঁঃ—বেঁচে আছো? ভারী আনন্দ হচ্ছে..."

"আগে বলুন তো—হনুমানের বিষ আছে?"

চাটুয্যের প্রশ্নাদি ওইরূপই। তাই বললুম—"আগে খুবই ছিল রে ভাই, কিন্তু রাবণ বংশ ধ্বংস করতে—সবটুকু ঝ'রে গিয়েছে—এখন সব ঢোঁড়া হনুমান। এ প্রশ্ন কেন বলো দিকি?"

ম্লান মুখে কাতর কণ্ঠে বললে—"বড় বিপদ বাঁড়ুয্যে মশাই এই দেখুন হাতে হনুমানে কামড় দিয়েছে।"

কি সর্বনাশ! তখনও রক্ত ঝরছে। তাকে সাহস দিয়ে বললুম—"কিছু ভেব না ভাই, হত্যার পাপ থেকে মুক্ত রাখবার জন্যেই মহর্ষি গৌতম বলে' গিয়েছেন—গো ব্রাহ্মণ আর হনুমানের বিষ থাকবে না। এরা তিনই চিরদিন এক পর্যায়ভুক্ত থাকবে। খবরদার, ঋষিবাক্যে বিশ্বাস হারিয়ো না ভাই।"

তিন বৎসর চীনে অবস্থানকালে প্রায়ই চাটুয্যের একটা না একটা অদ্ভুত সন্দেহের, শোকের বা স্বপ্ন-সমাধানের বড় প্রব্লেম্ আমাকে মেটাতে হ'ত। আমার শাস্ত্রজ্ঞানে তার অসীম বিশ্বাস ছিল। তার ভয় ভাংলো। হাতটা ভাল কোরে ধুয়ে, 'আয়োডিন্' লাগিয়ে বেঁধে দিলুম। সাবান দিয়ে মুখ ধোবার পর পাকা রং বেরিয়ে এলো—বে-ভেজাল্ চাটুয্যেকে পেলুম। তারপর একথাল জিলিপি আর এক পট্ চা—অতল স্পর্শে চল্‌লো। খান সাতেক পেটে পড়বার পর বললুম—"তিনি কোথা?—সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ হচ্ছে শাস্ত্র বাক্য—"

"সবই তো করেছিলুম মশাই," বলেই চাটুয্যে একদম বিমর্ষ—অভ্যাসবশে কেবল জিলিপি খাওয়া বন্ধ হয়নি। আমি ভীত হয়ে বললুম—"কেনো, কি হোলো—ভিড়ে হারিয়ে ফেলেছ নাকি?"—তার দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়।

"সবই নয়—আধখানা গিয়েছে মশাই।"—

"বলো কি? সে কি রকম! তিনি কোথায়?"

"বেশ হয়েছে মশাই—ভালই হয়েছে। যেমন তীর্থ-তীর্থ ক'রে মরছিলেন—"

"ব্যাপারটা খুলে বলো ভাই।"

"আর মশাই—শাস্ত্র মানতে তো কসুর করি না—পঞ্জিকা না দেখে শ্বশুরবাড়ী পর্যন্ত যাই না। পঞ্জিকা বলেন—আপনারাও ডিটো দেন—ত্রয়োদশীর মত যাত্রার ভালো দিন আর নেই—সর্ব কর্ম সিদ্ধি। শ্রীরামপুর, 'গুপ্ত প্রেস্, বাগচি—সবারই এক রা। পরিবার পা বাড়িয়েই ছিলেন, ত্রয়োদশীতেই বেরিয়ে পড়া গেল—সোজা একেবারে বৃন্দাবন। সাঁটেই বলিই—যমুনা স্নানান্তে গোবিন্দজী দর্শনে যাবো। যমুনাকে নিবেদন করবার তরে একছড়া পাকা কলা কোঁচায় বেঁধে ছিলুম। কিন্তু জল কোথায়, থাকলেও তাতে নাবে কার সাদ্দি—কচ্ছপের মোচ্ছপ লেগে আছে। সন্তর্পণে জলস্পর্শ করছি, একটানে কোমর থেকে কাপড়খানা খসিয়ে নিয়ে একটা বাঁদর ছুটে পালালো, থপ্ কোরে বসে পড়লুম। ভাগ্যে গামছাখানা ছিল—তাই কোনো প্রকারে গোবিন্দজী দর্শন সেরে বাসায় ফিরি। পাণ্ডাজী বললেন—'আপ্ বড়া ভাগ্ বান্ হায়, লালাজী (শ্রীকৃষ্ণ) লীলা কিয়া।' ভাবতে লাগলুম—আচার্য শঙ্করের নিশ্চয়ই এই দশা ঘটেছিল—তাই বারবার—কৌপীন বন্ত খলু ভাগ্যবন্ত—ব'লে গিয়েছেন!—"

"তিন দিনে হাড়ির হাল্ কোবে ছাড়লে—কাপড় গেলো, চটি গেলো, দুদিন রুটিও গেলো। পরিবারকে পাণ্ডার জিম্মে কোরে নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম। তীর্থ নয়—বাঁদরের একটি বিশিষ্ট আড্ডা, মুহূর্তের শান্তি নেই মশাই। ডাঙ্গায় বাঁদর, জলে কচ্ছপ। হ্যাঁ—মিথ্যে কথা বলব না—বৃন্দাবনের সেরা চিজ বটে—রাবড়ি!—"

—"তারপর প্রয়াগে পলায়ন। সেখানে রামের পল্টনের নম্বর কিছু কম। মুণ্ডনের মাহাত্ম্যই ধর্মের সেরা। রক্তারক্তি চল্ছে! কেশের কন্ট্রাক্টার কড়া পাহাড়া দিচ্ছেন—এক কাঁচ্চা চুল না কেউ সরায়!—আমি সঙ্গমে স্নান করতে সরে পড়লুম।"

"ফিরে এসে তাঁকে খুঁজছি—একটি স্ত্রীলোক কাঁদ্তে কাঁদ্তে হাজির। বললুম—এখন কিছু হবে না, আগে আমাদের কাজ সারা হোক্,—পয়সাকড়ি সব তাঁর কাছে।—স্ত্রীলোকটি ঝঙ্কার দিয়ে বলে' উঠলো—তুমি কি মরেছ', চিনতে পারছ না!—আমি গো।—"

—"সর্বনাশ—কে চিনবে মশাই—যমকেও ফাঁকি দেওয়া যায়! হুলিয়া হার মানে!—আপনাকে বলি—ভাগ্যে এক চোখ ট্যারা ছিল, না হ'লে আমার বাবারও চেনবার সাদ্দি ছিল না ; তায় শুনেছি—তীর্থস্থান প্রবঞ্চকের প্রফিট্ হাউস্!—আমার কান্না পেলে।—এইস্ত্রী মানুষ হ'য়ে এ তুমি করলে কি—আমি না ম'লে তুমি দেশে ফিরবে কোন্ মুখে?"

"ঘাটে মড়াকান্না পড়ে গেল—মাঝে মাঝে ঝঙ্কার—তুমি ছিলে কোথায়, তুমি তো মরেই ছিলে। তুমি থাকলে (পাণ্ডাকে দেখিয়ে) এ পোড়ারমুখো মিন্সে, শ্লোক আউড়ে, ভজন সাধন দিয়ে—মায়ি অসংখ্ পুন্ হোবে—অহল্লিয়া মায়ি ভি—আরো কত কি বললে।"

"পাণ্ডার দিকে চাইতে সে উত্তেজিত ভাবে বললে—বাবু, তীরথ্ মে ঝুটমুঠ্ গোলমাল্ না কিজিয়ে, হামলোগ্ গণক্ নেহি, হাত গিণনে নেহি জানতে। আপলোগকা বিধ্বা সধ্বা কোন্ পয়চানে? সবকোই কিনারাদার সাড়ী আউর গলেমে হাতমে জোর রাখতে, কেশমে কুণ্ডলিনী (কুন্তলীন) লাগাতে। প্রয়াগজীমে মুণ্ডন্ প্রধান কর্তব্য হ্যায়—উন্‌কা ভালেকে ওয়াস্তেই করায়া গিয়া। আওর পাঁচ্‌কো পুছিয়ে—বোলে—হাঁক্ দেওয়ায়, যে পাঁচ পল্টনীমূর্তি এলো আর রুক্ষ স্বরে বললে—ক্যা,—ক্যা ঝুটমুঠ্ 'বল্‌বা' হায়। যো হুয়া, সো ভালাকে ওয়াস্তে হুয়া ;—আর দচ্ছিনাকে দো রূপেয়া রাখকে, যাঁহা যানা হায় চুপ্‌চাপ্ চলে যাইয়ে—ইত্যাদি।—"

"তাদের মারমূর্তি দেখে—তা ভিন্ন উপায় ছিল না। এদের চেয়ে বাঁদর ভালো ছিল

মশাই। খাওয়া দাওয়া শিরস্থ হয়েছিল—প্রথম ট্রেনেই কাশী! তাঁর এক পিসি কাশীবাস করেন—সোনারপুরায়। সেখানে উপস্থিত হয়ে মুখে পেটে কিছু দিয়ে বাঁচি।"

"তিনি এখন বাসায় বদ্ধ—অসুখ অস্বস্তির সীমা নেই। আমি তাঁর পানে চাইতে পারি না, চাইলেও চিনতে পারি না। পিসি পণ্ডিতদের বাড়ী কাটান্‌ছিড়েনের জন্যে ছুটোছুটি করছেন—কারো সুখ নেই।"

"আবার গ্রামে তা-বড় তা-বড় মহামহোপাধ্যায়রা আছেন। তাঁদের কাছে উদ্ধারের ছাড়পত্র এ জন্মে মিলবে না। সুতরাং তাঁকে এখন তিন-চার মাস এখানে থেকে, অন্তত বব্‌ড্‌ হেয়ার বানিয়ে যেতে হবে।—"

—"আমি বাইরে বাইরে পাগলের মত ঘুরছি। তার ওপর এই বাঁদুরে কামড়! আপনাদের ত্রয়োদশীকে শতকোটী নমস্কার মশাই! সস্ত্রীক তীর্থে আসার মত মুক্ষুমি আর নেই—এর চেয়ে সোঁদর বনে গেলে ঢুকে যেতো! প্রয়াগকে আপনারা তীর্থরাজ বলেন—সব ঝুট্‌বাৎ মশাই—আমি স্বচক্ষে দেখে এলুম—পাণ্ডারাজ বা গুণ্ডারাজ।"

এই অদ্ভুত কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমি সত্যিই সম্বিৎহারা, স্তম্ভিত ও নির্বাক মেরে গিয়েছিলুম। বলবার কিছু পাচ্ছিলুম না—ফাঁকও নয়। চাটুয্যে তখন পাপড়ি ভাংচে—আস্তো আর চলছে না।

বললে—"আপনাকে পেয়ে আমি আর ভাবছি না চীনে তিন বছর আপনি আমার ভয়ত্রাতা ছিলেন, মানুষ—বানিয়ে দিয়েছেন—মহা মহা বিপদে রক্ষা পেয়েছি—এইবার বাঁচান—যা করবার হয়—করুন। দু-তিন দিনের বেশী তো আমার থাকা চলবে না—ওঁর একটা ব্যবস্থা, পাঁচ মেয়ের বিবাহ, জ্যাঠতুতো ভায়ের সাত বিঘে লাখরাজের দখল লওয়া, সবই করতে হবে। তা ছাড়া চীনের চোদ্দো হাজার প্রসিদ্ধ সলিসিটার-প্লাণ্ডারার ব্রাদার্সের পাল্লায় পড়ে রয়েছে! উঃ—আজই স্টার্ট করলে ভাল হয় ; ত্রয়োদশী নয় তো!...

বললুম—"কি সব পাগলের মত বকচো, এতো তাড়া কিসের? এখনো তো তোমার ছুটি রয়েছে। যা বললে, ওসব তো দু-চার দিনের কাজও নয়..."

"আজ্ঞে, ব্যাপারটি যে খাঁটি শাস্ত্রীয়, ক্যাপ্টেন্‌ বার্ক্রে ছুটি দিয়েছেন বটে, কিন্তু কর্নেল্‌ শমনের তো দিনক্ষণ নেই! কন্‌ট্রাক্টারের কড়া কটাক্ষে যে নাপতে বেটা ভুলেও একগাছি চুল্‌ রাখে নি। ভগবানেরও ভুল হয় মশাই—টাকের মাঝে মাঝে দু-এক গাছা থেকে যায়, এ বেটা একদম্‌ মাইক্রস্‌কোপিক্‌ চাঁচন্‌ দিয়েছে যে!—সিঁদুর পরার পথও রাখে নি—আমি আর ক'দিন!"

"ওঃ তুমি বুঝি ওই ভণ্ডদের ভূয়ো কথাটা নিয়ে এখনো ভাবচো! আমার তো কোনো শাস্ত্র জানতে বাকি নেই—ও কথা কোথাও পাবে না। সামুদ্রিকের চেয়ে সেরা শাস্ত্র তো আর নেই!—চীনে যাকে যা বলেছি কোনটা নিষ্ফল হয়েছে কি?—দাও ডান্‌ হাতটা দাও দেখি। নিরেট্‌দের কথায় মিছে ভেবে মরচো!"

"সত্যিই তো—বিপদে পড়ে সে কথা ভুলে গেছি মশাই।" বলে, হাত বাড়িয়ে দিলে। নিবিষ্ট ভাবে দু'পিঠ নেড়ে চেড়ে পনেরো মিনিট নিষ্পলক নিরীক্ষণান্তে—রংয়ের কল্যাণে পেলুম—নিবিড় অন্ধকার এবং দু'পিঠই সমান! বেশ গম্ভীরভাবে বললুম—"যাও, মিছে দুর্ভাবনা নিয়ে থেক না—সবাইকে জ্বালিও না। এই দেখছ না—তর্জনীর নিম্নে বৃহস্পতির ক্ষেত্র হতে—আয়ুরেখা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিক্রমান্তে নেবে প্রাণনাড়ী স্পর্শ করেছে—এ ভারি বিরল—দেখা যায় না—ভেরী র‍্যায়ার্‌। একমাত্র ত্রৈলঙ্গ স্বামীর ছিল। তোমাকে মারে কে! তিরান্নবয়ের পূর্বে যমেরও সাধ্য নেই। পাঁচ-সাতদিন পরে দেশে গেলেও চলবে। গিয়ে বোলো—কয়দিন তার জ্বর হয়েছে, ছাড়ছে না—পেটটাও নরম। ডাক্তারেরা 'টাইফয়েড্‌' বলে সন্দেহ করছেন। তার সব ব্যবস্থাদি কোরে, তাঁকে তাঁর পিসির কাছে রেখে এলুম। থাকতে

পারলুম না।—চাকরি যে টাইফয়েডের চেয়েও কঠিন অসুখ!—বাবা বিশ্বনাথ রক্ষা করেন তো তিন মাস পরে তাঁকে আনবো।—টাইফয়েডে অনেককেই নেড়া হ'তে হয়। তিন মাসে লোকের সামনে বেরবার মত চুলও গজিয়ে যাবে।"

"আঃ—বাঁচালেন বাঁড়ুয্যে মশাই—এরূপ অকাট্য কথা—আর কার কাছে পেতুম—জয় বিশ্বনাথ!—"

চায়ের পট্ নিঃশেষ করলেন। এতক্ষণে মেঘ ফুঁড়ে হাসি ফুট্‌লো।—"আমাকে তো চিন্তামুক্ত করলেন, এখন তাঁর ভাবনাই ভাবছি মশাই—বাঙালীটোলার সেই স্যাঁৎসেতে সোনারখনির মধ্যে তিন-চার মাস বন্দীর মত কাটাবে কি কোরে—সত্যিকার টাইফয়েড্ যে টেনে আনবে..."

"তার উপায়ও ভেবেছি ভাই—"

"আপনি ছাড়া আমার ভাবনা আর কে ভাববে।...ভাবতো বটে এক সম্বন্ধী—সে ওই চোদ্দো হাজার পাচার করবার চেষ্টায়। এখন পরলোকে গিয়ে পস্তাচ্ছে"...

"যাক্ ও কথা।—এখানে 'বান্ধব সমিতি' বোলে বেশ জমকালো থিয়েটার পার্টি আছে। তাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এই সেদিন 'উর্ব্বশী'র জন্যে তাঁরা ফার্স্ট ক্লাস্ পরচুলো আনিয়েছেন। বন্ধুত্ব আর মূল্য—দুয়ে মিশিয়ে তা পাওয়া যাবে।—পর্‌লে কারো সাধ্য নেই যে পরচুলো বলে বোঝে। তাই পোরে সারাদিন বেড়ান্ না, কেবল শোবার সময় খুলে রাখা চাই, আর স্নানের সময়। ইচ্ছা হয় রাত্রে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে' আসতে পারেন—তখন আর কে কার নেড়া মাথা দেখতে যাচ্ছে, আর তাঁকে চেনেই বা ক'জন!"

চাটুয্যে একদম চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌লো।—"ভগবান আপনাকে কি মাথাই দিয়েছিলেন—আমাদের কেবল মুণ্ডু বয়ে' বেড়ানো! আমিও তো থিয়েটারে পার্ট নিয়েছি তিন-তিন্‌বার—অশ্বমেধের ঘোড়া সেজেছি, কই আমার মাথায় তো ও কথা আসে নি।—বস্—মার্ দিয়া, আর ভাবি না মশাই। উঃ—এমন সহজ উপায় রয়েছে—আর আমি কি-না...তবে দু-তিন দিনের বেশী থাকা চলবে না মশাই, তা হ'লে আর ট্রেন্‌ভাড়া থাকবে না।—"

"কেনো?"

"মশাই সতেরোখানা সন্দেশের দোকান, সবই সেরা পাক্! দিন—দেড় টাকা কোরে খস্‌ছে! তীর্থস্থান বটে! আবার চম্‌চম্ বোলে কি চিজই বানিয়েছে! সে দিন চাখ্‌তে-চাখ্‌তে বার-আনা খসে গেলো!—আর নয় মশাই..."

বললুম—"রাত্রে আজ এইখানেই একসঙ্গে আহার।" একগাল হেসে বললে—"আমি নিজেই বলতুম বাঁড়ুয্যে-মশাই, একটু ইতস্তত ছিল—কাশীবাস করেছেন, রুটিন্ না ফ্যাকাসে মেরে থাকে! ত্রয়োদশীতে যাত্রা কোরে এক প্রকার উপোসই চলছে, পুরি আর হালুয়া মেরে জিভ্ অসাড় আর মুখ ঘৃতপক্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সিগারেটে শেষটান মারতে সাহস হয় না মশাই, আধখানা থাকতে ফেলে দি—মুখাগ্নি না হয়ে যায়!"

"ভয় নেই ভাই, কাশী ভোগের স্থান—ত্যাগের বালাই বড় দেখতে পাই না। চল না একসঙ্গেই বাজারে যাওয়া যাক্।"

পথে—একটু নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—"মটন্ মেলে না?"

"এসো না, সব মেলে—যেবা ইচ্ছা হয়।"

"ওঃ—তাই এত ভিড় আর বড় বড় বিল্ডিং। বড় বড় সব টাকার-মুটে সকাল থেকে মাছ-মাংসের বাজার ঘুঁটে বেড়াচ্ছেন—সেরা মাল না উঠে যায়। মণিকর্ণিকা মনে পড়তে দেয় না—বেশ আছেন!—আর তিনটে বছর কাটাতে পারলেই আসছি মশাই—"

তার পছন্দ মতই বাজার করা গেল। প্রায় দুসেরের ওপর এক পিস্ মটন্ লওয়া হ'ল। বর্ণনাবাহুল্যে আর কাজ নেই।

তার পর তার অন্যান্য ব্যবস্থাদি শেষ কোরে চতুর্থ দিনে তাকে রওনা ক'রে দিলুম। চোখ্ ছল্ ছল্ করছিল, বারবার বললে—"আপনি দেখ্বেন," আর মধ্যে মধ্যে "আজ ত্রয়োদশী নয় তো বাড়ুয্যে মশাই?"

"না হে না, কোনো দুর্ভাবনা রেখ না।"

ট্রেন্ ছাড়লো। মুখ বাড়িয়ে—"আসল কথা বলতে ভুলেছি মশাই—কি চিজ্ই দিয়েছেন—তাঁর মুখে হাসি দেখে যেতে পারলুম! পরচুলো কি ফিট্ই করেছে মশাই..."

আর শোনা গেল না।

দুর্গা—দুর্গা।

অগ্রহায়ণ ১৩৪৭

টিনের গাড়ী

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ফাঁকা একটি মাঠের মধ্যে ছোট্ট রেল-স্টেশন। লাল মাটি ও কাঁকরের দেশ। চারিদিকে অসমতল ভূমিখণ্ডের উপর লাল লাল ফুলে ঢাকা পলাশের গাছ। বহুদূরে এক-আধটা কয়লাকুঠির পাল্লা দেখা যায়। দুপুরের রৌদ্রে চারিদিক যখন ঝাঁঝাঁ করে, স্টেশনের বারান্দায় বসিলে তখন ঘুম পায়—এত সুন্দর ফুর্‌ফুরে হাওয়া!

কিন্তু শুধু হাওয়া খাইয়া মানুষ বাঁচে না, অথচ গ্রামও দূরে, শহরও দূরে। খাবার জিনিসের অভাব বড় বেশি। না পাওয়া যায় মাছ, না পাওয়া যায় দুধ-ঘি।

তা একদিক দিয়া মন্দ নয়। স্টেশন-মাস্টারের যৎসামান্য বেতন। এত চেষ্টা করিয়াও বড় ছেলেটাকে স্কুলে 'ফ্রি' করিতে পারে নাই। দুইটি বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত মাসের পর মাস তাহার মাহিনা জোগাইতে হইয়াছে। তাহার উপর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফি! অতগুলি ছেলে-মেয়ে লইয়া ভালমন্দ খাইতে হইলে ছেলে পড়ানো চলিত না। তাও ভাগ্য ভাল যে, দশটার সময় যে-ট্রেনখানা শহরে যায় তাহার গার্ড-সাহেব বাঙ্গালী এবং বিশিষ্ট ভদ্রলোক। ছেলেটাকে টিকিট করিতে হয় না, বিনা ভাড়াতেই তিনি লইয়া যান, আবার বৈকালের ট্রেনে লইয়া আসেন। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলার পড়াশুনা যে কেমন করিয়া হইবে কে জানে। স্ত্রী তাহাদের যতটুকু পারিয়াছে পড়াইয়াছে, এখন আর বিদ্যায় কুলায় না। তাই তাহারা চব্বিশ ঘণ্টা রেল্-রেল্ খেলিয়া বেড়ায়। পলাশবনের ভিতরে তাহাদের ট্রেন চলে। টিনের রেলগাড়ী, 'স্প্রিং'টা খারাপ হইয়া গিয়াছে বলিয়া দড়ি বাঁধিয়া সেটাকে টানিয়া লইয়া যাইতে হয়। অনুষ্ঠানের ত্রুটি কিছুই নাই। স্টেশন হইতে ভাঙা একটি ইস্পাতের টুকরা তাহারা লইয়া গিয়াছে, তাই দিয়া তাহারা টিকিটের ঘণ্টা বাজায়, গার্ড-সাহেব 'হুইসিল্' দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দেয়। বিনুটু, সনটু, টুনী আর পাঁচি—চারজনেই স্টেশন-মাস্টার। খালাসী হইতে কেহ চায় না। তবে এক-একদিন ভাই-বোনে ঝগড়া হইলে বিনটু ও সনটু একজোট্ হইয়া বলে যে, টুনী আর পাঁচি মেয়েছেলে, নানুয়া-খালাসীর বৌএর কাছ হইতে তেঁতুলের আচার তাহারা যদি আনিয়া দিতে না পারে ত তাহাদের দু'জনকেই আজ হইতে খালাসী করিয়া দিবে।

মাস্টারের বড় ছেলে বাসুদেব ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করিয়াছে। এইবার তাহাকে কোথায় পড়াইবে ইহাই হইয়াছে গুরুতর সমস্যা। রেল-কোম্পানীতে ঢোকানো সহজ, কিন্তু সারাজীবন ধরিয়া যে-ঝক্‌মারি সে নিজে পোহাইল, ছেলেকে আর সে-চাক্‌রিতে ঢুকাইতে তিনি চান না। ইচ্ছা হয় অনেক-কিছু করিতে। কখনও মনে হয়, আজকাল রোগ-ব্যারামের ছড়াছড়ি, ছেলেকে যদি কোনোরকমে একটা ডাক্তারি পাশ করাইয়া দিতে পারে ত' রোজগার তাহার মন্দ হইবে না। আবার মনে হয়, ল' পড়াইয়া কোনোরকমে একটা উকিল করিয়া দিতে পারিলেও হয়। ইঞ্জিনিয়ারিংও মন্দ নয়। স্কলারশিপ্ লইয়া যদি একবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে ত'—বাস্, আর দেখিতে হইবে না, এই যে তাহার এত কষ্ট, ছেলেগুলা ভাল করিয়া দুবেলা খাইতে পর্যন্ত পায় না, সে-সব তখন দূর হইয়া যাইবে, নিজে ত' চাকরি ছাড়িয়া দিবেই, তা ছাড়া বাসুদেবের মা হয়ত একটা ঝি রাখিয়া হাত-পা

ছড়াইয়া একটুখানি বিশ্রাম করিতে পাইবে।

ভবিষ্যতের সুখের ছবি কল্পনা করিতে দোষ কি? ডাউন ট্রেনখানা পার করিয়া দিয়া স্টেশনের বারান্দায় চেয়ারখানা টানিয়া আনিয়া চোখ বুজিয়া রমেশবাবু নিজের ভবিষ্যৎ কল্পনা করেন। আর চার-পাঁচটা বৎসর কোনোরকমে পার করিয়া দিলেই তাঁহাকে আর কিছু ভাবিতে হইবে না। সময়ের উপযুক্ত ছেলে মানুষ এইজন্যই চায়। বেশি কিছু তিনি চান না। একখানি দোতলা বাড়ী, ধানের কিছু জমি-জায়গা, একখানি মোটরকার, আর ব্যাঙ্কে কিছু টাকা!

পশ্চিম দিগন্তে রাঙা সূর্য তখন অস্ত যাইতেছে। পলাশবনের মাথার উপর সারা আকাশ জুড়িয়া বিচিত্র বর্ণের সমারোহ। ফুর্ ফুর্ করিয়া মিষ্টি মিষ্টি বাতাস আসিয়া গায়ে লাগিতেছিল। রমেশবাবুও মনে-মনে কল্পনা করিতেছিলেন—অদূর ভবিষ্যতে এমনি একটি স্নিগ্ধ শান্ত অপরাহ্ণে স্ত্রী পুত্র-পুত্রবধূ কন্যা-জামাতা নাতি-নাৎনী লইয়া নিজের বাড়ীর দোতলার বারান্দায় বসিয়া বসিয়া রহস্যালাপে মত্ত হইয়া উঠিবেন, পুত্রের কল্যাণে তখন আর তাঁহাকে এমন করিয়া অর্থাভাবে উৎপীড়িত হইতে হইবে না, নাতি নাৎনীরা গল্প শুনিতে চাহিবে, তিনি বলিবেন—'এক যে ছিল স্টেশন-মাস্টার, বেচারি মাইনে পেতো মোটে তিরিশটি টাকা, সংসার তার কিছুতেই চলতো না।'

চিন্তায় বাধা পড়িল। টেলিগ্রাফের কল বাজিয়া উঠিয়াছে। রমেশবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—'আঃ ঝক্‌মারি কাজ বাবা, একটু যে জিরিয়ে নেবো, তারও উপায় নেই।'

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া কিছুই হইবার নয়। বাসুদেবকে অন্তত বছর-দুই কলেজে পড়িতেই হইবে। কিন্তু এইখানে এই শহরের ইস্কুলের শুধু বেতন জোগাইতেই যাঁহাকে হিম্‌সিম খাইতে হইয়াছে, কলিকাতায় তাহাকে তিনি কলেজেই বা পড়াইবেন কেমন করিয়া!

শেষে এক মতলব ঠাওরাইলেন। স্টেশন হইতে ক্রোশখানেক দূরের একটি গ্রামের এক ভদ্রলোক কলিকাতায় লোহার কারবার করেন। দু'তিন পুরুষ ধরিয়া তাঁহাদের এই কারবার চলিতেছে। ভদ্রলোকের অবস্থা বেশ ভালই বলিতে হইবে।

রমেশবাবু ভাবিলেন, তিনি মাসে দু'বার করিয়া বাড়ী আসেন এবার যেদিন ট্রেন হইতে নামিবেন, তৎক্ষণাৎ বাসুদেবকে সঙ্গে লইয়া তিনি তাঁহার হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিবেন।—'ব্রাহ্মণের এ উপকারটুকু করুন দাদা! ছেলেটা আপনার বাসায় থেকে দুবেলা দুমুটো ভাত...আর কলেজের মাইনেটা...তার জন্যে ছেলেদের পড়াবে, আপনার কাজকম্ম করে' দেবে, আপনি যা বলবেন ও তাই করবে দাদা, আপনার গোলাম হয়ে থাকবে।'

এমনি করিয়া ধরিয়া বসিলে হয়ত তিনি আর 'না' বলিতে পারিবেন না।

বাসুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাঁরে বাসু, পারবি ত' বাবা? একটু কষ্ট করে' পড়তে হবে বাবা, কি আর করবি বল্।

বাবার মুখের চেহারা দেখিয়া বাসুদেবের চোখ দুইটা ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়িয়া 'হ্যাঁ' বলিয়া সে সেখান হইতে পলায়ন করিল।

কলিকাতার সেই কারবারী ভদ্রলোক নিমরাজি হইয়াছেন। বলিয়াছেন—'আচ্ছা তাই ছেলেকে আপনারা নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে' কলকাতায়। দেবো একটা যাহোক্ কিছু করে।'

এ্যাসিস্‌টেন্টের হাতে স্টেশনের সমস্ত কাজের ভার দিয়া রমেশবাবু স্থির করিলেন—আগামী রবিবার দিন বাসুদেবকে সঙ্গে লইয়া তিনি নিজেই যাইবেন কলিকাতায়। বাসুদেব ছেলেমানুষ, কলিকাতার কিছুই সে জানে না। অথচ রমেশবাবুও তথৈবচ। জীবনে মাত্র

দু'বার তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন। যাই-হোক, এ অবস্থায় অত বড় শহরের মাঝখানে ছেলেকে একেবারে একা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়।

শনিবার রাত্রে স্টেশন হইতে বাসায় ফিরিয়া গিয়া রমেশবাবু তাঁহার স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন।—'দ্যাখো, ছেলেটা যে পরের বাড়ীতে থাকবে, দু'জোড়া কাপড় ত' চাই। একজোড়া ধোপা বাড়ী দেবে আর একজোড়া পরবে। অন্ততপক্ষে দুখানা জামা। বাক্সও একটা না হ'লে চলবে না। তার ওপর আবার কলেজে ভর্তি হ'লে বই কেনা আছে। অনেকগুলি টাকার খরচ।'

স্ত্রী বলিলেন, 'দাওগে যাও, ওই দু'টিই ত' আছে সম্বল। বাসু আমার লেখাপড়া শিখে যখন রোজগার করবে তখন আবার ও-ই গড়িয়ে দেবে।'

থাকিবার মধ্যে ছিল ওই দুহাতে সোনার দুগাছা চুড়ি। বাকি গহনা একে-একে সবই গিয়াছে। রবিবার সকালে রমেশবাবু ট্রেনে চড়িয়া শহরে গিয়া তাহা বিক্রি করিয়া আসিলেন। তাহার পর সেই টাকা লইয়া সেইদিনই বৈকালে বাসুদেবকে লইয়া তিনি কলিকাতা চলিলেন। বাড়ী হইতে আগে বাহির হইলেন রমেশবাবু, তাহার পর বাসুদেব। মা দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ছেলেমেয়েগুলা তাহাদের সঙ্গে কলিকাতা যাইবার জন্য চেঁচামেচি করিতেছিল। বাসুদেব তাহাদের জন্য কলিকাতা হইতে বড় রেলগাড়ী আনিয়া দিবে বলিয়া চুপ করাইয়াছে।

যতক্ষণ তাহাদের দেখা গেল, মা একদৃষ্টে সেইদিক পানে তাকাইয়া রহিলেন। ছেলেমেয়েরা দাদাকে গাড়ীতে চড়াইবার জন্য স্টেশন পর্যন্ত ছুটিয়া গেল। গাড়ী আসিল। বাসুদেব গাড়ীতে চড়িল। রমেশবাবু ছেলেমেয়েদের বলিলেন, 'এবার তোমরা বাড়ী যাও।'

'যাচ্ছি।'. বলিয়া ছেলেমেয়েরা সতৃষ্ণ নয়নে দাদার দিকে তাকাইয়া রহিল। ভাবিল, দাদার মত বড় হইলে তাহারাও অমনি গাড়ীতে চড়িয়া পড়িতে যাইবে।

গাড়ীখানি তাহাদের বাসার পাশ দিয়াই পার হইয়া গেল। বাসুদেব দেখিল, মা তাহার তখনও তেমনি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। রমেশবাবু দেখিলেন, ছেলেমেয়েরা তখন লাল কাঁকরের রাস্তা ধরিয়া ছুটিতে ছুটিতে বাসায় ফিরিতেছে।

বাসুদেবকে কলিকাতায় রাখিয়া রমেশবাবু একাই ফিরিলেন। আবার সেই ছোট্ট রেল-স্টেশন। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে পলাশগাছে-ঘেরা খাঁচার মত ছোট্ট কোয়াটার। ছেলেমেয়েদের জন্য কোথায় কোন্ স্টেশন হইতে রমেশবাবু চার পয়সার পাকা কলা কিনিয়া আনিয়াছিলেন। কলা খাইতে খাইতে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, দাদা কোথায়? আমাদের জন্যে রেলগাড়ী আনবে ত?'

রমেশবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, রেলগাড়ী আনবে, বাঁশী আনবে, আরও কত-কি আনবে বাবা! দেখবে, যখন দাদা তোমার পাশ করে' চাকরি করে' মস্ত বড়লোক হবে তখন আর আমাদের কোনও ভাবনা থাকবে না।'

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁগা, বেশ ভাল করে' রইলো ত?'

'তা রইলো বই-কি! যাঁর বাড়ীতে রেখে এলাম তিনি মস্ত লোক গো! বললেন, ছেলেটেলে পড়াতে হবে না, আমিই ওর সব খরচ দেবো।'

'আসবার সময় কি বললে? নতুন জায়গায় গিয়ে মন কেমন করবে না ত?'

রমেশবাবু বলিলেন, 'একবস্ত্রেই ত' গেল, তাই আমি আসবার সময় বললাম, চল্ তোর কাপড় জামা কিনে দিয়ে আমি ওই পথেই স্টেশনে চলে যাব।'

গৃহিণী বলিলেন, 'ওই পথেই চলে এলে বুঝি?'

'হ্যাঁ। এলাম বটে, কিন্তু কাপড় জামা আর কিনে দিয়ে আসা হলো না। দোকানের

একটা ঘড়িতে দেখলাম, ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। বাসু বললে, তুমি যাও বাবা, তাড়াতাড়ি না গেলে আর ট্রেন পাবে না। কি আর করি! তারই হাতে টাকা দিয়ে বললাম, কাপড় জামা তাহ'লে নিজেই কিনে নিস্। আর রোজ বিকেলে দু'পয়সার কিছু কিনে খাস্ বাবা। এই বলে' তাড়াতাড়ি আমি ট্রামে গিয়ে উঠলাম। ট্রাম থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখি, যতক্ষণ দেখা গেল, মুখখানি শুক্‌নো করে' বাসু সেই রাস্তার ধারে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

বলিতে বলিতে চোখদুইটি তাঁহার সজল হইয়া উঠিল। দেখিলেন, স্ত্রীর চোখেও তখন জল আসিয়াছে। একটা ঢোঁক গিলিয়া অতিকষ্টে অশ্রু দমন করিয়া কহিলেন, 'সারারাস্তা সেই মুখখানি মনে করতে করতে এলাম।'

মা তাঁহার চোখ মুছিয়া নীরবে শুধু একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

রমেশবাবু বলিলেন, 'বড় বড় লোকের জীবনী পড়েছি...এই যেমন ধর—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাও ঠিক এমনি করেই লেখাপড়া শিখেছিল। তারপর বড়লোক হলো। তখন তাদের পয়সা খায় কে!'

মা বলিলেন, 'হ্যাঁগা, দুপাঁচটা টাকা তার হাতে বেশি দিয়ে এসেছ ত? রোজ বিকেলে ওর ক্ষিদে পায়। আবার চিঠি লিখে দিও—কিছু কিনে কেটে খায় যেন।'

'বলে' ত' দিয়ে এসেছি, কিন্তু ও যা ছেলে, ও কি আর খাবে? ভাববে হয়ত বাবা গরীব মানুষ...'

বলিয়াই তিনি ম্লান একটুখানি হাসিলেন। বড় দুঃখের হাসি। বলিলেন, 'ছেলেকে আজ দুটো পয়সার জলখাবার দিতে পারছিনি, আর ওই ছেলেই একদিন এত এত টাকা রোজগার করে' আনবে।'

মা তাঁহার মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলেন, 'হে ঠাকুর, তাই যেন হয়!'

কলেজে ভর্তি হইল কিনা জানাইয়া তাহার পরের দিনই বাসুদেবের চিঠি লিখিবার কথা। কিন্তু চিঠি আসিল না।

একদিন গেল, দু'দিন গেল, তিনদিনের দিনেও তাহার চিঠি নাই। রমেশবাবু অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। স্ত্রী তাঁহার বলিতে লাগিলেন, 'পোস্টকার্ড তুমি দিয়ে আসোনি। তোমার যেরকম ভোলা মন!'

'আরে, পোস্টকার্ড কি আর কলকাতায় কিনতে পাওয়া যায় না?' রমেশবাবু বলিলেন, 'ভর্তি হতে হয়ত দেরি হচ্ছে। ভেবেছে একেবারে ভর্তি হয়েই চিঠি লিখব।'

স্ত্রীকে কোনো রকমে বুঝাইয়া দিয়া স্টেশনে আসিয়া তিনি শুধু বাসুদেবের চিঠি না দেওয়ার কথাই ভাবিতে লাগিলেন।...পাশা-পাশি এখনই দুইটা ট্রেন এক সঙ্গে আসিয়া দাঁড়াইবে। একটা কলিকাতা যাইবার, একটা কলিকাতা হইতে আসিবার। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, যদি কোনও গ্রামের কোনও লোক আজ এই ট্রেনে চড়িয়া কলিকাতায় যায় ত' তাহাকে তিনি একবার দয়া করিয়া তেরো নম্বর শ্যামপুকুর স্ট্রীটে বাসুদেবের খোঁজ লইতে বলিবেন। বলিবেন, চিঠি না পাইয়া বাবা তাহার ভাবিতেছে, আজই যেন সে একখানি পোস্টকার্ড লিখিয়া পাঠায়।

টিকিটের ঘণ্টা বাজিবার আগেই তিনি বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কলকাতার টিকিট কেউ করবেন কি আপনারা?'

মাত্র চার পাঁচজন যাত্রী। এ উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া প্রায় সকলেই ঘাড় নাড়িল।—'আজ্ঞে না, কলকাতা কেউ যাবে না।'

কলিকাতা যাইবার ট্রেন আবার সেই রাত্রি দশটায়। হতাশ হইয়া রমেশবাবু ভিতরে

গিয়া বসিলেন। এ্যাসিস্‌টেণ্ট ছোকরাটিকে বলিলেন, 'টিকিট ক'খানা তুমি দিয়ে দাও নবীন।'

টিকিট দিতে দিতেই হুস্ হুস্ করিয়া ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইল। দুদিকে দু'খানা ট্রেন এক সঙ্গেই আসিয়া দাঁড়ায়। যাত্রীদের টিকিট আদায় করিতে হইবে—'তুমিই নিয়ে এসো ভাই, আমি আর পারি না!'

নবীন টিকিট আনিতে গেল। ঘরের মধ্যে রমেশবাবু একাকী বসিয়া। জানালার বাহিরে দ্বিপ্রহরের তীব্র রৌদ্র তখন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে।

—টক্কা টক্কা টরে-টক্কা টরে-টক্কা...

—'জ্বালাতন করলে দেখছি! আর পারি না বাবা!'

খাতা পেন্সিল লইয়া রমেশবাবু টেলিগ্রাফের মেসিন্ ধরিলেন।

টেলিগ্রাফ আসিতেছে।—'রমেশচন্দ্র সেন, স্টেশন মাস্টার, সুজনপুর রেলওয়ে স্টেশন। আপনার পুত্র বাসুদেব কাল রাত্রে হঠাৎ কলেরায় মারা গিয়াছে।'...

টেলিগ্রাফের মেসিন্ তখনও থামে নাই। টক্ টক্ করিয়া আরও অনেক কথাই বাজিয়া চলিয়াছে। কিন্তু সে-সব তখন কে-ই বা শোনে আর কেই বা লেখে!

বাহিরে যাত্রীর কোলাহল, গাড়ী ছাড়িবার হুস্ হুস্ শব্দ, গার্ড-সাহেবের হুইস্‌ল্,—সব কিছু মিলিয়া মিশিয়া রমেশবাবুর কাছে তখন একাকার হইয়া গেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ঘরে ঢুকিয়া নবীন তাড়াতাড়ি টিকিট মিলাইতে বসিল। এই কাজটি সারিয়া লইতে পারিলেই সে বাসায় যাইতে পাইবে।

এমন সময় অপরিচিত একজন লোক বোধ করি ট্রেন হইতে নামিয়া স্টেশনের দরজায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'রমেশচন্দ্র সেন—স্টেশন মাস্টার কোথায় মশাই?'

নবীন তাহার হাতের পেন্সিলটি বাড়াইয়া রমেশবাবুকে দেখাইয়া দিয়াই আবার তাহার নিজের কাজে মন দিল।

রমেশবাবু টেবিলের উপর মাথা গুঁজিয়া পড়িয়াছিলেন, পাগলের মত একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

লোকটির হাতে ছিল টিনের একটি ছোট 'সুট্-কেশের' মত নূতন বাক্স। বাক্সটি টেবিলের উপর নামাইয়া বলিল, 'গগনবাবু আমায় পাঠালেন। বললেন, টেলিগ্রাম করছি আমরা শ্মশান থেকে ফিরে এসে। তবু যা তুই একবার নিজে গিয়ে খবরটা দিয়ে আয়, আর এই বাক্সটি অমনি...। বাজার থেকে দু'পয়সার খাবার কিনে খেয়েছিল মশাই, বাস্, দুপুর থেকে সেই যে ভেদ-বমি আরম্ভ হ'লো—সন্ধ্যে হ'তে না হ'তেই...'

অন্যমনস্কের মত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রমেশবাবু বাক্সটি খুলিয়া ফেলিলেন। বাক্স হইতে বাহির হইল এক জোড়া নূতন ধুতি, একখানি নূতন জামা, খান দুই-তিন পোস্টকার্ড, আর একটি রঙ-করা টিনের রেলের গাড়ী!...

পৌষ ১৩৩৯

ব্যাধি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সূর্যোদয়ের পূর্বেই পাখীর প্রভাতী কলরবের সঙ্গে সঙ্গেই সেতারপর্ব শেষ হইয়া গিয়াছিল। এখন তানপুরায় ঝঙ্কার তুলিয়া হারাণ আচার্য সাধিতেছিল একখানি ভৈরবী। আবেশে তাহার চোখ দুটী মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছে। তানপুরার উপর গাল রাখিয়া সে গাহিতেছিল—'চরণে চন্দন রাঙা জবা দিলে কে-রে!'

রুদ্রমূর্তিতে একগাছা লাঠী হাতে ও-পাড়ার শ্যাম ঘোষাল আসিয়া বিনা ভূমিকায় হুঙ্কার ছাড়িয়া ডাকিল—হারাণে—শালা—!

তানপুরাটা স্ফীত উদরের উপর বাঁ হাতে তালি মারিয়া হারাণ তাল দিতেছিল। ফাঁকের ঘরে বাঁ হাত তুলিয়া হারাণ ইসারা করিল—সবুর। গানটা উপভোগ্যরূপে জমিয়া উঠিয়াছিল। ঘোষাল বসিল। যথাসময়ে গান শেষ করিয়া হারাণ তানপুরাখানি সযত্নে পাশে রাখিয়া দিতে দিতে কহিল—কি?

ঘোষালের রাগের সময় বোধ করি পার হইয়া গিয়াছিল। সে কাকুতি করিয়া বলিল—হারাণ, আমার ঠাকুর?

হাতের মেজরাপটা খুলিয়া হারাণ কহিল—জানি না ত।

ঘোষাল যোড়হাত করিয়া বলিল—দে ভাই,—কোথা রেখেছিস—কি ফেলে দিয়েছিস, বল!

হারাণ বলিল—তোমার ঠাকুর ত আমি দেখেছি বাপু; আনা-টেক সোনার একটা পুট-পুটে পৈতে ছিল। সে আমি হাত দিই নাই। ছুঁচো মেরে হাত-গন্ধ আমি করি না।

ঘোষাল আরও মিনতি করিয়া বলিল—তোর পায়ে ধরি ভাই, আমার তিন-পুরুষের শালগ্রাম শিলা,—দে ভাই। বল্ কোথায় ফেলে দিয়েছিস?

হারাণ কহিল—বিশ্বাস না কর ত কি বলি বল। সত্যিই অ: জানি না।

ঘোষাল আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না, সে রোষে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, কহিল—কুষ্ঠব্যাধি হবে, মুখ দিয়ে পোকা পড়বে। চণ্ডাল—চোর—ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে—।

হারাণ কোন উত্তর দিল না। সে তানপুরাটা আবার কোলের উপর উঠাইল।

ঘোষাল সরোষে কহিল—দিবি না তুই? আমি পুলিশে খবর দেব—

হারাণ অবিচলিত ভাবে তানপুরার তারের উপর আঙুল চালাইয়া দিল। সুরঝঙ্কারে যন্ত্রটা সাড়া দিয়া উঠিল।

অকস্মাৎ ঘোষাল তাহার পায়ের গোড়ায় ক্ষিপ্তের মত মাথা কুটিতে কুটিতে কহিল,—মরব, আমি তোর পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

তাহার স্বর অবরুদ্ধ, চোখ দিয়া দরদর ধ..র জল ঝরিতেছিল।

হারাণ বলিল—কেন মিছে আমার পায়ে মাথা খুঁড়ছ ঘোষাল? যাও না, ভাল ক'রে সব খুঁজে পেতে দেখ না গিয়ে। গোল পাথর ত, গড়ে টড়ে প'ড়ে গিয়ে থাকবে হয় ত। পুষ্পকুণ্ড-টুণ্ডগুলো দেখগে যাও।

ঘোষাল চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে পরম আশ্বাসের হাসি হাসিয়া প্রশ্ন করিল—পাব—পাব—, পুষ্পকুণ্ডের মধ্যেই পাব হারাণ?

—দেখই না গিয়ে।

ঘোষাল দ্রুতপদে চলিয়া গেল, হাতের লাঠীগাছটা সেইখানেই পড়িয়া রহিল। যন্ত্রটায় ঝঙ্কার তুলিয়া হারাণ এবার ধরিল একখানি বাগে-শ্রী। গান চলিতেছিল, নিশি স্বর্ণকার আসিয়া দাওয়ার উপর নীরবে বসিল। গান শেষ করিয়া হারাণ বলিল—একবার তামাক সাজ দেখি নিশি।

হারাণের ঘরদুয়ার নিশির পরিচিত, সে তামাক টিকা লইয়া তামাক সাজিতে বসিল। যন্ত্রের তারগুলি শিথিল করিয়া দিয়া কাপড়ের খোলের মধ্যে সযত্নে যন্ত্রটিকে পুরিয়া দেওয়ালে পোতা পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিল।

নিশি কলিকায় ফুঁ দিতেছিল, সে কহিল—একজন খরিদ্দার এসেছে দাদাঠাকুর। কিছু সোনা বেচবে! দরও এখন উঠেছে—চব্বিশ দশ আনা পাকা বিকুচ্ছে।

হারাণ রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

নিশি ডাকিল—দাদাঠাকুর!

মৃদুস্বরে উত্তর হইল—না।

মৃদুস্বরেই নিশি বলিল—কি করবে এত সোনা নিয়ে? আমিই ত তোমার গলিয়ে বাট তৈরী করে দিয়েছি—দেড় সের সাত পো' ত হবেই। কিছু ছেড়ে দাও এই সময় বুঝলে?

—টাকা নিয়েই বা কি হবে আমার?

—জমি-টমি কেন। কিম্বা দাদন-পত্র কর। এইবার একটা বিয়ে-টিয়ে কর বুঝলে। আজন্মই কি এমনি করে কাটিয়ে দেবে না কি?

হারাণ নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। নিশি কলিকাটা কোলের কাছে নামাইয়া দিল, বলিল—খাও।...আরও একটা কথা দাদাঠাকুর,—ও সব কাজ এইবার ছাড় আর কেন? ঠাকুর দেবতার অলঙ্কার—ও আর ছুঁয়ো না। ও হচ্ছে কাঁচা পারা—হজম কারও হয় না।

এতক্ষণে হারাণ কথা কহিল। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া মৃদুস্বরেই বলিল—এই দেখ বাবা—হাত দেখ—পা দেখ, শরীর দেখ, খসেও যায় নি, রোগও হয় নি। আর নিতেই যদি হয় তবে দয়াল দেবতার নেওয়াই ভাল। ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে দেখে, ধরে না—কাউকে বলে দেয় না, চ্যাঁচায় না, দুঃখ করে না।...কাঠ আর পাথরের গায়ে রাজ্যের সোনা-দানা—রামচন্দর!...কাল রাত্রে বুঝলি, ওই ঘোষালদের ঠাকুরঘরে ঢুকেছিলাম। গোল একটা নুড়ি, তাকে বেড় দিয়ে একটা সোনার পৈতে নিলাম টেনে ছাড়িয়ে, তারপর ভাবলাম দিই ছুঁড়ে ফেলে। আবার ভাবলাম, থাক, এই পুষ্প-কুণ্ডের মধ্যেই থাক। আবারও ত পৈতে গড়িয়ে দেবে—সেইটাই হবে হাতের পাঁচ।...নে, কল্কে নে।

নিশি কহিল—আচ্ছা এসব যে তুমি করছ—কি জন্যে—কার জন্যে করছ বল ত? না করলে সংসার, না কিনবে সম্পত্তি,—কি হবে এতে তোমার?

হারাণ বলিল—কল্কেটা পাল্টে সাজ,—ওটাতে আর কিছু নাই। তারপর গুন্ গুন্ করিয়া রাগিনী ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

নিশি আবার তামাক সাজিতে বসিল। টিকেতে আগুন ধরাইতে ধরাইতে বলিল—জিনিষগুলো যত্ন করে রেখেছে ত দাদাঠাকুর? দেখো, চোরের ধন বাটপারে না নেয়!

মৃদু হাসিতে হাসিতে হারাণ বলিল—সে এক ভীষণ কেলে সাপ—ইয়া তার ফণা—আমি যে ওস্তাদ, আমাকেই বলে,—দুইটী হাতের তালু পাশাপাশি যোগ করিয়া ফণার পরিধি বর্ণনা করিতে করিতে হারাণ সভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

* * *

দিন দশেক পর।

সেদিনও নিশি বসিয়া তামাক সাজিতেছিল। হারাণ কতকগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা কাঠী লইয়া ছোট ছোট আঁটী বাঁধিতেছিল। নিশি কহিল—এর মধ্যে নবগ্রহের ন রকম শুক্‌নো কাঠ কোথা থেকে যোগাড় করলে দাদাঠাকুর? তোমাদের দৈবজ্ঞিদের সন্ধান বটে বাপু!

হারাণ বলিল—তুইও যেমন, দেবে ত চার আনা পয়সা, তার জন্যে বনবাদাড় ভেঙে কোথায় আকন্দ কাঠী কোথায় এ—কোথায় তা, যোগাড় ক'রে বেড়াই আমি। নিয়ে এলাম শুকনো ডাল একটা—তাই বেঁধে আঁটী ক'রে দিচ্ছি। এই কি দিতাম? বছরে বছরে রায়পুরের বাবুদের বাড়ী একটা ক'রে পার্বণী দেয়, তাই নইলে—হ্যাঃ।

—কিন্তু দেবকায্যের জিনিষ, শান্তি-স্বস্ত্যেন করবে তারা।

মৃদু হাসিয়া হারাণ বলিল—আমাকে ত সবাই জানে বাবা, জেনে-শুনে সব আমার কাছেই বা আসে কেন? গ্রহের ফেরে যজ্ঞ তাদের পূর্ণ হবে না, তার আর আমি কি করব?

একটী লোক আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আজ্ঞে 'নব-গেরোণে'র কাঠ নিতে এসেছি।

হারাণ বলিল—এই যে বাবা কাঠ বেঁধে বসে আছি আমি ; তোমার বাড়ী রায়পুর ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—পয়সা এনেছ—চার আনা পয়সা?

লোকটী একটা সিকি ফেলিয়া দিয়া কাঠ লইয়া চলিয়া গেল।

হুঁকা কলিকা হারাণের হাতে দিয়া নিশি বলিল—এ কিন্তু তোমার ভাল নয় দাদাঠাকুর, যাই বল তুমি। এত দিন বিদেশে বিভূঁয়ে গিয়ে যা করেছ ধরতে পারে নাই কেউ, এবার তুমি গাঁয়েও আরম্ভ করলে? আবার এই লোক ঠকান—

হারাণ হুঁকায় টান দিয়া বলিল—আর বুঝি জল হয় না,—মেঘ ধরে গেল। সে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। নিশি বিরক্ত হইয়া চুপ করিল। কিছুক্ষণ পর সে বলিল—ঘোষাল পুলিশে ডায়রী করেছে শুনেছ?

হারাণ বলিল—মিছে কথা। হলে এতদিন খানাতল্লাস হয়ে যেত। আর করলে ত করলে, সাক্ষী প্রমাণ ত চাই।

একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ী বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল। ও প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া হারাণ প্রশ্ন করিল—কোথাকার গাড়ী হে?

গাড়োয়ান গাড়ী নামাইতেছিল। ছইএর মধ্য হইতে একটী বিধবা মুখ বাড়াইয়া কহিল—ভাল আছ দাদা?

হুঁকা হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হারাণ সবিস্ময়ে কহিল—কে রে,—হৈম? তুই হঠাৎ যে?

গাড়ী হইতে হৈম নামিয়াছিল পিছনে তাহার বালক পুত্র তমোরীশ। দাদার পদধূলি লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হৈম বলিল—

বন্যেতে বাড়ী ঘর সব পড়ে গিয়েছে দাদা। এমন আচ্ছাদন নাই যে মাথা গুঁজে দাঁড়াই। কোথা, কার কাছে দাঁড়াব বল? অবস্থা ত জান—ঘর যে আবার করে নিতে পারব—সে সম্বলই বা কোথা? ভগবান শেষ কালে তোমারই কাছে দাঁড়া করালেন আমাকে।

হারাণ কহিল—তা বেশ বেশ। তোরও ত বাপের ঘর! আয় ভাই আয়। বেশ করেছিস। তমোরীশেরই ত সব—দুদিন আগে আর পরে।

নিশি কহিল—তা' বৈকি, এ গুষ্ঠীর অধিকারীই ত উনি।

হৈম আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে ছেলেকে ভর্ৎসনার সুরে বলিল—মামাকে প্রণাম কর তমোরীশ! ছিঃ, এত বড় ছেলে, এও বলে দিতে হবে?

কোলের কাছে ফুট্‌ফুটে ছেলেটীকে টানিয়া লইয়া হারাণ বলিল—বকিস নে হৈম, অচেনা জায়গা—আমিও অচেনা—

মৃদু অনুযোগ করিয়া হৈম বলিল—চেনা না দিলে চিনবে কেমন করে বল? এই ত দশ

কোশের মাথায় থাকি। মলাম কি থাকলাম বোনের খোঁজও ত নিতে হয়। শেষ গিয়েছে তুমি, আমি বিধবা হলে—সে আট বছর হল। তমোরীশ তখন দু বছরের ছেলে, কেমন করে চিনবে বল?

লজ্জিত হইয়া আচার্য কহিল—আয় আয় ভাই, বাড়ীর ভেতরে আয়।

তমোরীশকে সে কোলে তুলিয়া লইল।

গৃহিণীহীন গৃহখানিতে আবর্জনা না থাকিলেও মার্জনার পারিপাট্য নাই, অভগ্ন-অবয়ব হইলেও সম্পূর্ণ নয়, গৃহের মধ্যে যে একটী শ্রীময়ী মমতা থাকে—তাহা নাই।

হৈম বলিল—মায়ের আমলে কি রূপই ছিল এই ঘরের। সেই ঘর! সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

হারাণ নিশিকে ডাকিয়া কহিল—চার পয়সার ভাল মিষ্টি এনে দে দেখি নিশি। ছেলেটা প্রথম এল—

সিকিটা হাতে লইয়া নিশি বলিল—ডাল নুন তেল কি আর কিছু যদি আনতে হয়, একেবারে আনতে দাও না।

—দৈবজ্ঞের বাড়ী রে এটা, ভুজ্যির ডাল নুন আছে। দু পয়সার তেল আনিস বরং। আর ভাবছি—মশারী একটা চাই আবার, যে মশা এখানে। বার আনার কমে হবে না কি বলিস? তোর ঘরে বাড়তি নেই রে?

খিড়কী হইতে ফিরিয়া হৈম কহিল—ছি ছি দাদা, ঘাট-পাঁদারগুলো ক'রে রেখেছ কি? জঙ্গলে যে মানুষ ডুবে যায়। বিয়েও করলে না—না দাদা এবার তোমার বিয়ে দোব আমি।

আচার্য নিশিকেই বলিল—না থাকলে কি আর হবে। তা হ'লে রামা তাঁতীকে বলবি একটা মশারীর জন্যে। নিয়েই বরং আসবি। ওর ছেলের রাশি-চক্রটা দিয়ে যেতে বলবি, কুষ্ঠী ক'রে দেব।

নিশি বলিল—সে আমি পারব না বাবু। তুমি একটা মিথ্যে যা তা কুষ্ঠী করে দেবে, সে পাপের ভাগী আমি হই কেন? তার চেয়ে আমি নিজে দায়ী হয়ে নিয়ে আসব। তুমি পয়সা পরে দিয়ো আমাকে।

সে চলিয়া গেল।

নিশি চলিয়া যাইতেই হৈম বলিল—একটী কাজ তুমি করতে পাবে না দাদা। তোমার পায়ে আমি হত্যে দেব। ঠাকুর দেবতার জিনিষ—

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া আচার্য কহিল—না, সে ত আমি আর করি না।

* * *

নিশীথ-রাত্রে হ্যারিকেনটী অনুজ্জ্বল করিয়া দিয়া হারাণ খিড়কীর ঘাটে গিয়া নামিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে আলোকটীকে উজ্জ্বল করিয়া দিল। তার পর ঘাটের বাঁ পাশে ভাঙিল। ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটী আকন্দ গাছের তলা খুঁড়িয়া বাহির করিল একটী ঘটী। সেটীকে লইয়া সে নিবিড়তর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

* * *

থানা পুলিশের সংবাদটা সত্য বলিয়াই বোধ হইল। দফাদারটা দিন দুই হইল গান শুনিবার ছলে বসিয়া অনেকক্ষণ আলাপ করিয়া গেল।

গত রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া মানুষের চিহ্ন অনুসন্ধান করিতে গিয়া হারাণের নজরে পড়িল দুটী মানুষ।

সে চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিল—কে?

উত্তর হইল—আমরাই গো।

আচার্য আবার প্রশ্ন করিল—আমরাই কে হে বাপু?

—আমি রামহরি দফাদার আর থানার মহুরীবাবু! রোঁদে বেরিয়েছি।

সকালে উঠিয়া রাগিণী আলাপ তেমন জমিল না। তমোরীশ বসিয়া আছে ; প্রথম দিন হইতেই যন্ত্র-ঝঙ্কার উঠিলেই সে আসিয়া বসে। নিশিও নিয়মিত আসিয়াছিল। গান শেষ করিয়া আচার্য নীরবে তামাক টানিতেছিল।

হৈম আসিয়া দাঁড়াইল। সে বোধ হয় দাদার নিকট হইতে প্রথম সম্ভাষণ প্রত্যাশা করিয়াছিল। কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া শেষে সেই প্রথমে ডাকিল—দাদা!

আচার্য মুখ তুলিয়া চাহিল।

—আজ তমোরীশকে ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়ে আসবে।

হারাণ বলিল—উঁহু—আজ দিন ভাল নয়।

হৈম দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল—কাকে কি বলছ? আমিও যে দৈবজ্ঞের ঘরের মেয়ে দাদা। দিন ভাল মন্দ—

সপ্রতিভ ভাবে হারাণ বাধা দিয়া বলিল—না,—মানে—পয়সা নেই হাতে আজ। আর ভাল দিন ত আরও আছে।

ছোট একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হৈম কহিল—তাই হবে। কিন্তু বই ক'খানা কিনে দাও।

ঘাড় নাড়িয়া হারাণ বলিল—দেব।

হৈম চলিয়া গেল।

যন্ত্রগুলায় আবরণ পরাইতে পরাইতে আচার্য কহিল—তমোরীশ, ভেতরে যাও ত বাবা!

বালকের বিলীয়মান পদধ্বনির প্রতীক্ষা করিয়া হারাণ মৃদুস্বরে নিশিকে কহিল—আমার বাড়ীটা তুই কিনবি নিশি? যা দাম দিস তুই। পুলিশ বড্ড আমার পেছনে লেগেছে।

নিশি চমকিয়া উঠিল। আচার্য বলিল—ভবী মিস্ত্রীকে দিলে দুশো টাকায় সে এখুনি নেয়। কিন্তু শালা পুলিশের গুপ্তচর—ঠিক বলে দেবে। তুই নে,...এক-শো টাকা তুই আমাকে দিস —না—একশো পাঁচ।

নিশি কহিল—দিদিঠাকরুণ, তমোরীশ, এরা কোথা যাবে?

হারাণ আর কথা কহিল না।

পরদিন সকাল বেলা আর হারাণের সেতার বাজিল না। নিশি আসিয়া ফিরিয়া গেল। তমোরীশ আবিষ্কার করিল মামার যন্ত্রগুলির মধ্যে তানপুরাটা নেই।

সন্ধ্যায় নিশি আসিয়া দেখিল—হৈম বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। পাশেই ম্লানমুখে কয়খানি নূতন বই হাতে তমোরীশ বসিয়া ছিল।

নিশি শুনিল হারাণ ভবী মিস্ত্রীকে পঁচানব্বুই টাকায় বাড়ী বেচিয়া কাশী চলিয়া গেছে। যাইবার সময় কয়খানি বই তমোরীশকে দিবার জন্য দিয়া গেছে।

* * *

আচার্য কিন্তু কাশী যায় নাই। সে বর্ধমান জেলা পার হইয়া মুর্শিদাবাদে গিয়া পড়িল। নিতান্ত পথে পথে যাত্রা। কাঁধে এক কম্বল, একটী পুঁটলী, হাতে তানপুরা।

একখানা গ্রামে প্রকাণ্ড দালান ঠাকুরবাড়ী দেখিয়া সে ঢুকিয়া পড়িল।

মুর্শিদাবাদে আমিরী চালের জন্মভূমি ; বানিয়াদী চাল—পুরানো বন্দোবস্ত আজও এখানে মরে নাই। এ বাড়ীর বন্দোবস্তও পুরানো। অতিথিকে এখানে মানুষের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে হয় না, দেবতার প্রসাদ কামনা করিয়া দাঁড়াইলেই পাওয়া যায়।

অপরাহ্নে বেলায় নজরে পড়িল বনিয়াদী চালও এখনও সেখানে আছে।

ঠাকুরবাড়ীর পাশেই বাবুদের বৈঠকখানায় বড় হলে আসর পড়িতেছে, ঝাড়ে দেওয়ালগিরিতে বাতি বসান হইতেছে।

হারাণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া ছিলমচী খানসামার ঘরে ঢুকিয়া তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল। প্রকাণ্ড বড় ছিলমদানীটা কলিকায় কলিকায় ভরিয়া গেছে।

খানসামা বলিল—বড় সেতারী এসেছেন,—মজলিস বসবে আজ।

হারাণ কহিল—আমাকে শুনবার একটু সুবিধে করে দিতে হবে ভাই। তানপুরাটা সে ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিল. সেটার দিকে লক্ষ্য করিয়া খানসামা কহিল—আপনিও কি ওস্তাদ না কি?

আচার্য বলিল—গান-পাগলা মানুষ দাদা। ওস্তাদ টোস্তাদ কিছু নই।

* * *

মজলিসে স্থান সে পাইল।

দুগ্ধফেননিভ ফরাসের উপর সারি সারি তাকিয়া পড়িয়া ছিল। সোনারূপার সাত আটটা ফুরসী গড়গড়া পড়িয়া আছে। রূপার পরাতে প্রচুর পানের খিলি, আতরদানে আতর ও তূলা শোভা পাইতেছিল। দুই তিনটা গোলাপপাশ হইতে গোলাপজল ছিটান হইতেছিল। প্রকাণ্ড চারিটা হাতপাখা লইয়া চারিজন খানসামা চারি কোণে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছিল। সুগন্ধি ধূপ ঘরের চারিদিকে জ্বলিতেছে। ফরাসের এক কোণে সে বসিল। প্রথমেই বিতরণ করা হইল পান ও আতর। সম্মানী সম্ভ্রমী ব্যক্তিদের গলায় ফুলের মালা দেওয়া হইল।

তার পর আরম্ভ হইল সঙ্গীত। ওস্তাদের সুনিপুণ অঙ্গুলী স্পর্শে সেতার সত্য সত্যই গান গাহিয়া উঠিল। জোয়ারীর তারগুলির ঝঙ্কারে মানুষ, আলো, এমন কি ঘরখানার জড় উপাদান পর্যন্ত যেন মোহাবিষ্ট হইয়া গেল। ঘরের জানালার গরাদেতে হারাণ হাত দিয়াছিল, সে অনুভব করিল লোহার গরাদের মধ্যেও সে ঝঙ্কার প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সঙ্গীতের গতি দ্রুত হইতে আরম্ভ হইল, দুনে বাজনা চলিল। আঙ্গুলের ছোঁয়ায় তারের মধ্য হইতে সুরের ফুলঝুরি যেন ছড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

মধ্য পথেই কিন্তু সঙ্গীত শেষ করিতে হইল। যন্ত্রী তবলচীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—আপকো হাঁত আর নেহি চলেগা।

বাদক লজ্জিত হইয়া বলিল—আমার শিক্ষা সামান্যই।

অবসর পাইয়া খানসামা সরবৎ ধরিয়া দিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুরা। ফুরসী গড়গড়ার ডাকে মজলিসটা মুখরিত হইয়া উঠিল। ধুতুরা ফুলের মত লম্বা একটী রূপার কলিকা আসিল ওস্তাদের জন্যে। ওস্তাদের হাত হইতে কলিকাটা ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইল।

ওস্তাদজী আবার সেতার তুলিয়া কহিলেন—আওর কই হ্যায় সঙ্গীত করনেকো লিয়ে।

মালিক মনোহর সিংহ চারিদিকে চাহিলেন, অবশেষে লজ্জিতভাবেই বলিলেন—দুসরা আদমী ত কোই নেহি হ্যায়!

হারাণ উঠিয়া পড়িল। আভূমিনত এক নমস্কার করিয়া যোড়হাতে কহিল, হুজুর—হুকুম হয় যদি, তবে আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।

গৃহস্বামী স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন,—পারবে তুমি?

ওস্তাদ কহিলেন—আইয়ে—বয়ঠিয়ে!

একজন বলিয়া উঠিল—পাগল নয় ত?

ওস্তাদ কহিলেন—কোকিল বনমে রহে বাবুজী—রং ভি কালা উস্কা। লেকেন গানেওলাকে বাদশা ওহি।

গৃহস্বামী আতর পানে মান্য করিয়া হারাণকে সঙ্গত করিতে অনুমতি দিলেন। সঙ্গত আরম্ভ হইল।

আচার্যের হাতে চর্মবাদ্য সেতারের সুরে সুর মিশাইল। অপূর্ব সমন্বয়ে সুসঙ্গত রূপে সঙ্গত শেষ হইল। ওস্তাদ যন্ত্রখানি পাশে রাখিয়া তারিফ করিয়া উঠিলেন—বহুৎ আচ্ছা। বহুৎ মিঠা হাত আপকা।

মালিক একগাছি মালা আচার্যের গলায় পরাইয়া দিয়া কহিলেন—ওস্তাদজীর কোথায় বাড়ী? কি নাম আপনার?

যোড়হাত করিয়া হারাণ কহিল—ভবঘুরে হুজুর আমি। গানবাজনা করেই বেড়াই। নাম আমার নারায়ণচন্দ্র রায়।

এ নামটা পথে পা দিবার সময়ই সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল।

সেতার সঙ্গতের শেষে ওস্তাদের অনুরোধে হারাণ গানও গাহিল। খুসী হইয়া মনোহরবাবু হারাণকে সুরাপাত্র আগাইয়া দিলেন।

পাত্রটী কপালে ঠেকাইয়া হারাণ সসঙ্কোচে নামাইয়া রাখিল, করযোড়ে কহিল—হুজুর, সুরের কারবারী আমি, সুরা আমার গুরুর নিষেধ।

ওস্তাদজী কহিলেন—বহুৎ আচ্ছা। সাচ্চা আদমী আপ্।

মনোহরবাবু জড়িতকণ্ঠে বলিলেন—মদ না খাও, মাতলামী কিন্তু করতে হবে।

হারাণ কহিল—নাচব হুজুর? বাইজী নাচ?

চারিদিক হইতে রব উঠিল—বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা।

*　　　*　　　*

মনোহরবাবুর আশ্রয়েই হারাণ আচার্য থাকিয়া গেল। এমনি একটী আশ্রয়ই যেন সে খুঁজিতেছিল। জীবনের চারিদিকে বিলাসের আরামে তাহার যেন ঘুম আসিল। কর্মের দায়িত্ব নাই, শুধু বাবুর মনস্তুষ্টি করিলেই হইল। বাবু ঘামিলে সে বাতাস করে, অকারণে ছিলমচী খানসামাকে ধমক দিয়া নূতন কলিকা দিতে আদেশ দেয়। মনোহরবাবু শিকারে যান, সঙ্গে হারাণ থাকে। সে অবিকল তিতিরের ডাক ডাকে, বনমধ্য হইতে তিতির সাড়া দিয়া উঠে। সন্ধ্যায় সেতার শোনায়, গান গায়, পাখীর মাংস রাঁধিয়া দেয়। রান্নাতেও হারাণের হাত বড় মিঠা। যায় না সে শুধু বাঘ শিকারের সময়। যোড়হাত করিয়া বলে—আজ্ঞে আমার কত্তাবাবাকে বাঘে ধরে খেয়েছে। জ্যান্ত বাঘ দেখা আমাদের বংশে নিষেধ আছে।

মনোহরবাবুর জীবনে সে অপরিহার্য হইয়া উঠিল। নারায়ণ রায় ভিন্ন একদণ্ড তাঁহার চলে না। হারাণের জীবনও বড় সুখেই কাটিয়া যায়। মধ্যে-মধ্যে সে কেমন হইয়া উঠে। বারবার ঠাকুরবাড়ীতে যায়, চারিদিকে চায়, পাথরের মন্দিরের প্রতি পাথরটী যেন মনে আঁকিয়া লয়। দ্বারের সশস্ত্র প্রহরীটাকে দেখিয়া অকারণে শিহরিয়া উঠে।

সেবার শিকারের পর্বটা প্রবলভাবে জমিয়া উঠিয়াছিল। খাঁটী আমিরী চালে সমস্ত চলিতেছিল। বন্ধু, বাইজী, সঙ্গীত, সুরা, হাতিয়ার, হাতী, কিছুরই অভাব ছিল না। সন্ধ্যার পর হইতে নাচ-গানের আসর বসে। বাইজী নাচে, রায়জী সঙ্গত করে। রজনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রায়জী সঙ্গত ছাড়িয়া বাইজীর পদধূলি মাখিয়া গড়াগড়ি দেয়।

সেদিন মনোহর বাবু তারিফ করিয়া কহিলেন—বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা।

রায়জী কাঁদিয়া আকুল হইল—হুজুর আমার পরিবার বড় ভাল নাচত। আহা-হা—সে মরে গেল! দেখবেন সে নাচ হুজুর?

সাঁওতাল নাচ নাচিতে সুরু করিল সে।

সুরার অবসাদে ক্রমশ ক্রমশ উত্তেজনা কোলাহল স্তিমিত হইয়া আসিল। বাইজীর দল চলিয়া গেল। ঘুমে সব অচেতন। হারাণ উঠিয়া তাঁবুর দরজার পর্দাটা টানিয়া দিল। তার পর মনোহরবাবুর পাশে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে আরম্ভ করিল। মনোহরবাবুর নাক ডাকিতেছিল। বাতাসের আরামে সে ধ্বনি আরও গভীর হইয়া উঠিল। পাখাখানি রাখিয়া

হারাণ তাঁহার বুকে হাত দিল। মোটা সোনার চেনটা সে খুলিতেছিল। অকস্মাৎ তন্দ্রারক্ত চোখ মেলিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে বকিতে মনোহরবাবু পাশ ফিরিয়া শুইলেন। হারাণের বুকটা গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল।

মনোহরবাবু উঠিয়া বিরক্তিভরে কহিলেন—এগুলো রাখ ত রায়জী। এই ঘড়ি চেন—বোতাম—বুকে লাগছে আমার।

হারাণের সর্বাঙ্গ স্বেদাপ্লুত হইয়া উঠিল।

বাবু বলিলেন—নাও না হে খুলে!

হারাণ তাঁবুর দুয়ারের দিকে তাকাইল। জাগ্রত প্রহরীর পদশব্দের বিরাম নাই। জিনিষগুলি হাতের অঞ্জলিতে আবদ্ধ করিয়া সে নির্বাক ভাবে বসিয়া রহিল। প্রভাতে মনোহরবাবু উঠিতেই সে দুই-হাতে জিনিষগুলি লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

বাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—ওগুলো তোমার বকশিশ রায়জী। কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে বলতে ভুলে গিয়েছি।

হারাণ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

মনোহরবাবু বলিলেন—গুণী লোক তুমি রায়জী, তোমাকে এর চেয়ে ঢের বেশী দেওয়া উচিত। কিন্তু সিংহবংশের আর সে দিন ত নেই।

হারাণ ধীরে ধীরে কহিল—আমাকে কি বিদেয় ক'রে দিচ্ছেন বাবু?

হাসিয়া মনোহরবাবু বলিলেন—বামুনজাত কি না, দক্ষিণে পেলেই ভাবে বিদেয় করে দিল বুঝি। যাও—বলে দাও দেখি, খেয়ে দেয়েই তাঁবু ভাঙতে হবে। আজই উঠতে হবে।

* * *

গজভুক্ত কপিত্থের মত সিংহবাড়ীর অন্তঃসার বহুদিন হইতেই নষ্ট হইতে বসিয়াছিল। সে দিন একটা বড় মহলের নায়েব সংবাদ লইয়া আসিল—বৎসর বৎসর নিয়মিতরূপে রাজস্ব না পাইয়া জমিদার বড় রুষ্ট হইয়াছেন—অষ্টম নালিশ দায়ের করিয়াছেন। মহলের টাকা ইতিপূর্বেই আদায় হইয়া সদরে আসিয়াছে। সুতরাং এখন সদর হইতে টাকা দিয়া মহল রক্ষা করিতে হইবে।

মনোহরবাবু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সদানন্দময় মুখে তাঁহার চিন্তার ঘন বিষণ্ণ ছায়া ঘনাইয়া আসিল।

কেঁয়ে বেটার কাছে একবার দেখে আসুন তা' হ'লে। দশহাজার টাকা হলেই ত হবে।

নায়েব নতমুখে বসিয়া রহিল। বাবু বলিলেন—কালই যান তাহ'লে। কি বলেন?

ধীরে ধীরে নায়েব কহিল—লোকটা বড় পাজী। যা তা বলে। ওর কাছে টাকাও নেওয়া হ'ল অনেক।

মনোহরবাবু শুধু কহিলেন, হুঁ।

তার পর আবার মৃদুস্বরে বলিলেন—থাক তা হ'লে।

নায়েব প্রশ্ন করিল—কিন্তু অষ্টমের কি হবে?

—যাবে। কি করব—উপায় কি?

—অন্য কোথাও দেখব চেষ্টা ক'রে?

—দেখুন। কিন্তু—। সজাগ হইয়া তিনি নল টানিতে আরম্ভ করিলেন। নায়েব চলিয়া গেল।

সন্ধ্যায় মজলিস বসিল। মনোহরবাবু হুকুম করিলেন—আজ করুণ রসের গান তুমি শোনাও রায়জী। মন যাতে উদাস হয়, চোখে জল আসে।

সুরা সেদিন তিনি স্পর্শ করিলেন না।

রাত্রে মজলিস ভাঙিল। পারিষদের দল চলিয়া গেল। বাবু বাড়ীর মধ্যে যাইবার জন্য

উঠিলেন। হারাণ যোড়হাত করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

মনোহরবাবু হাসিয়া বলিলেন—কি রায়জী?

—একটা নিবেদন আছে হুজুর।

—কি বল।

—একটু নির্জন—

মনোহরবাবু আলোক-ধারী খানসামাটাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাহার পশ্চাতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া হারাণ কহিল—

—হুজুর অভয় দিতে হবে আগে।

—কি ভয় তোমার? বল তুমি বল।

—গরীব ভিক্ষুক আমি হুজুর, আপনার অন্নে বেঁচে আছি আমি। হুজুর—আমার—আমার...

মনোহরবাবু বলিলেন—বল, ভয় কি?

হারাণের জিভটা যেন শুকাইয়া আসিতেছিল, সে কহিল—আমার কিছু টাকা আছে হুজুর—হাজার দশেক হবে বোধ হয়। হুজুরের দরকারে যদি লাগে—

মনোহরবাবু স্থির দৃষ্টিতে হারাণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হারাণ বলিল—পরে আবার আমাকে দেবেন হুজুর।

মনোহরবাবু রুদ্ধকণ্ঠে শুধু কহিলেন—রায়।

তার পর আর তিনি কিছু বলতে পারিলেন না। অন্ধকারের মধ্যেই তিনি অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। আলোকের কথা তাঁহার আজ খেয়াল হইল না।

হারাণের চোখ দিয়া জল আসিল। বাবুর নীরব ধন্যবাদের ভাষা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। চাকরটাকে আলো লইয়া বাবুর সঙ্গে যাইতে বলিয়া দিয়া গুন্‌গুন্ স্বরে সে ধরিল একখানি বেহাগ।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে হারাণ উঠিয়া চলিল পতিত আবর্জনাভরা একটা স্থান লক্ষ্য করিয়া। নির্দিষ্ট একটী স্থান খুঁড়িয়া বাহির করিল ধাতুময় পাত্র একটী। তাহার মুখাবরণ খুলিয়া হারাণ বাহির করিল—সোনার বাট একখানি। অন্ধকারের মধ্যে উজ্জ্বল স্বর্ণ বর্ণ ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। সেখানা রাখিয়া তুলিল আর একখানি সেও তেমনি উজ্জ্বল। ওগুলি ছাড়া আরও দুইটী বস্তু ঝক্ ঝক্ করিতেছিল—সে তাহার নিজের চোখ।

সকালে উঠিয়া কিন্তু হারাণকে আর পাওয়া গেল না। তাহার তানপুরাটাও নাই।

মনোহরবাবু বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন—সে চলে গিয়েছে। আর আসবে না।

*　　*　　*

হারাণ এবার আসিয়া উঠিল কাশীতে।

ভাগ্যগুণে অবিলম্বে আশ্রয়ও একটা জুটিয়া গেল। পথেই সে গিরিমাটীতে কাপড় ছোপাইয়া লইয়াছিল। গেরুয়ার উপর তানপুরা দেখিয়া লোকে তাহাকে শ্রদ্ধার উপর ভালবাসিল। তাহার সঙ্গীত শুনিয়া ডাকিল তাহাকে একটা মঠে আশ্রয় দিল।

চারিদিকে ধর্মের সমারোহ। সেই সমারোহের আবর্তের মধ্যে পড়িয়া হারাণ যেন ডুবিয়া গেল। সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মন যেন তাহার পবিত্র হইয়া গেছে। দিবারাত্রি শিব নামের কলরোলের মধ্যে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। সন্ধ্যায় যোগীরাজের স্তব করে সে ধ্রুপদ ধামারের মধ্য দিয়া। তার আচারে, ব্যবহারে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গেল যেন। ইতর রসিকতা আর মুখ দিয়া বাহির করিতে কেমন লজ্জা করে। সংযত মৃদুভাবে সে কথা কয়।

এদিকে অল্প দিনের মধ্যেই গানের জন্য তাহার খ্যাতি রটিয়া গেল। নানা মঠ হইতে নিমন্ত্রণ আসিতে আরম্ভ করিল। সাধু সন্ন্যাসীরা গানে মুগ্ধ হইয়া সাদরে কোল দিয়া বলেন

—বিশ্বনাথকো কৃপা আপকো পর হো গিয়া।

হারাণের চক্ষে জল আসে। সে জোর করিয়া তাঁহাদের পায়ে ধূলি লইয়া বলে—আশীষ করিয়ে মহারাজ।

কিন্তু দুটী মানুষের মুখ অহরহ তাহাকে পীড়া দেয়।

তমোরীশের অসহায় কচি মুখখানি মনে পড়ে ;—যখনই অনুদিত প্রাতে উষার আলোয় সে সেতার লইয়া বসে তখনই মনে হয় তমোরীশ কুরঙ্গ শিশুর মত নীররে মুগ্ধ চক্ষু দুটী মেলিয়া গান শুনিতেছে। আর মনে পড়ে মনোহরবাবুর মুখ। তাঁহার সেই অবরুদ্ধ কণ্ঠের দুটী কথা 'রায়', তাঁহার সেই ছল ছল চোখ—সব মনে পড়ে।

তবু সে ভগবানকে ধন্যবাদ দেয় যে অন্তরে একটা পরিবর্তন আসিয়াছে।

মঠের ফটকে বসিয়া ভিক্ষা করে এক অন্ধ। পদশব্দ শুনিলেই সে চীৎকার করে—অন্ধকে দয়া কর বাবা। বিশ্বনাথ তোমার কল্যাণ করবেন বাবা! হারাণের পদশব্দেও সে ভিক্ষা চায়। হারাণ হাসিয়া বলে—আমিরে বাবা।

ভক্তিভরে অন্ধ কহে—সাধু বাবা, প্রণাম বাবা!

হারাণ আশীর্বাদ করে।

এক এক দিন আক্ষেপ করিয়া অন্ধ বলে—আজ আর কেউ কিছু দিলে না বাবা!

—কিছু পাও নি? একটু চিন্তা করিয়া হারাণ সেইখানে দাঁড়াইয়াই গান ধরিয়া দেয়। চারি পাশে মুগ্ধ পথিকের দল ভিড় জমাইয়া দাঁড়ায়। গান শেষ করিয়া হারাণ সকলকে অনুরোধ করে—এই অন্ধকে একটা ক'রে পয়সা দিয়ে যান দয়া করে।

পয়সা পড়িতে থাকে। ভিড় ভাঙিয়া গেলে হাত বুলাইয়া পয়সাগুলি তুলিতে তুলিতে অন্ধ কৃতজ্ঞতাভরে বলে—বাবা—সাধুবাবা!

হারাণ অন্যমনস্কভাবে অন্ধের দিকে চাহিয়া থাকে ; তার পর অকস্মাৎ দ্রুতপদে সে চলিয়া যায়।

অন্ধটা রাত্রে মঠের মধ্যেই এক পাশে পড়িয়া থাকে। ছেঁড়া একটা কম্বল ও চামড়ার একটী বালিশ তাহার সম্বল।

সেদিন অন্ধটা বলিল—সাধুবাবা!

—কি রে?

—আমার একটী কাজ ক'রে দেবে বাবা?

—কি?

একটু ইতস্তত করিয়া অন্ধ বলিল—কাল বলব।

পর দিন চলিয়া গেল। অন্ধও কিছু বলিল না, হারাণেরও সে কথা মনে ছিল না। তাহার পরদিন অন্ধ আবার কহিল—আমার কথা শুনলেন না সাধুবাবা?

হারাণ হাসিয়া বলিল—কই, তুমিও ত কিছু বল্লে না।

অন্ধ বলিল—আজ বলব।

—বল।

অন্ধ প্রশ্ন কবিল—কে রয়েছে বাবা এখানে?

চারিদিক দেখিয়া হারাণ কহিল—কই—কেউ ত' নাই।

অতি মৃদুস্বরে অন্ধ বলিল—আমায় কিছু সোনা কিনে দেবে বাবা?

হারাণ চমকিয়া উঠিল।

চামড়ার বালিশটা কোলের কাছে টানিয়া লইয়া অন্ধ কহিল—তামা, রূপো বড় ভারী হয় বাবা। আগে ক'বার এক সাধু আমায় এনে দিয়েছিল। কিন্তু শেষকালে—

সে চুপ করিয়া গেল। হারাণের হাত পা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

অন্ধ বলিল—তার ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম বাবা।

চামড়ার বালিশটা ওপাশে সরাইয়া কনুইএর চাপ দিয়া সে বসিল। কহিল—সাধু বাবা!

—হুঁ।

—এনে দেবে বাবা?

হারাণ কহিল—দেব। কাল দেব।

পরদিন প্রাতে অন্ধটার কাতর ক্রন্দনে মঠের মধ্যে ভিড় জমিয়া গেল। তাহার সেই চামড়ার বালিশটা খোয়া গিয়াছে। সেই বালিশটীর মধ্যেই তাহার জীবনের সঞ্চয় সঞ্চিত ছিল, কয়খানি সোনার বাট, কিছু টাকা—কিছু পয়সা।

অন্ধ বার বার বলিতেছিল—সেই চোর সাধু—সেই বদমাস—

দীনতা ও হীনতার তাড়নায় গালাগালির অশ্লীলতায় স্থানটাকে কদর্য করিয়া তুলিল। বুক চাপড়াইয়া, পাথরের চত্বরে মাথা কুটিয়া নিজের অঙ্গ ও পবিত্র দেবভূমি রক্তাক্ত করিয়া তুলিল।

* * *

মাস চারেক পরে মনোহর বাবু একখানা পত্র পাইলেন।

বর্ধমান হাসপাতাল হইতে রায়জী পত্র লিখিয়াছে—

মৃত্যু শয্যায় শুইয়া আজ আপনাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা হইতেছে। আজ দুই মাস হইল অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া হাসপাতালে মরিতে আসিয়াছি। একবার দয়া করিয়া আসিবেন। ইতি—

আশ্রিত
নারায়ণচন্দ্র রায়।

পরিশেষে হাসপাতালের চিকিৎসক জানাইয়াছেন—আসিলে সত্বর আসিবেন। এক সপ্তাহের অধিক রোগীর জীবনের আশা করা যায় না।

মনোহর বাবু রায়ের এ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার পরদিনই বর্ধমান যাত্রা করিলেন। অপরাহ্ন বেলায় তিনি হাসপাতালে হারাণের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন—রায়জী!

সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া হারাণ পশ্চিমাকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইল। বাবুকে দেখিয়া ঠোঁট দুইটী তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

বাবু কহিলেন—ভয় কি? ভাল হয়ে যাবে তোমার।

বহুক্ষণ পর আপনাকে সংযত করিয়া হারাণ কহিল—আর না ; বাঁচবার কথা আর বলবেন না। আমার জীবন যাওয়াই ভাল।

মনোহর বাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

তাঁহার হাত দুটী ধরিয়া মিনতি ভরে হারাণ বলিল, আমাকে মাপ করুন বাবু!

অম্লান হাসি হাসিয়া বাবু কহিলেন—সে কথা কোন দিন মনে করি নি রায়জী। তা ছাড়া তোমার আশীর্বাদে সম্পত্তি আমার রক্ষা হয়েছে।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া হারাণ বলিল—অপরাধ আমার আছে। আমি আপনাকে ঠকিয়েছি, আমি পাপী। আমার নাম নারাণ রায় নয়—

বাধা দিয়া মনোহর বাবু বলিলেন—জানি, তোমার নাম হারাণ আচার্য। সে থাক।

কথায় কথায় বেলা পড়িয়া আসিল। বাবু কহিলেন—একটা কথা বলব রায়জী?

জিজ্ঞাসু নেত্রে হারাণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মনোহর বাবু বলিলেন—পাপের ধনটা দিয়ে এবার ভাল কাজ তুমি করে যাও যাবার

সময়।

দুই হাতে বাবুর হাত ধরিয়া ব্যগ্রতাভরে হারাণ বলিল—উদ্ধার করুন বাবু আমায় উদ্ধার করুন। ওগুলো যেন বুকে চেপে বসে আছে আমার,—প্রাণ আমার বেরুচ্ছে না।

বাবু কহিলেন—হাসপাতালেই টাকাগুলো তুমি দিয়ে যাও। এই হাসপাতালেই দিয়ে যাও।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হারাণ সংযত ভাবে ধীরে ধীরে বলিল—বর্ধমান স্টেশনের ধারেই একটা ছোট বাড়ি শেষে করেছিলাম। সেই ঘরের মেঝেতে।

সে নীরব হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর আবার কহিল—এবার কটা বাঘ মারলেন?

আরও কয়টা কথা কহিয়া বাবু উঠিলেন—বলিলেন—কাল আবার আসব।

আরও একখানা পত্র গিয়াছিল তমোরীশের নামে। হৈম তমোরীশকে লইয়া আসিয়াছিল। সন্ধ্যার পর তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। হৈম কাঁদিয়া কহিল অসুখ হলে আমার কাছে গেলে না কেন?

তমোরীশকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে দুটী জলের ধারা তাহার গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ পর কহিল—তমোরীশ, আমার টাকা আছে তোকে বলে যাই।

হৈম বলিল—না দাদা, ব্যস্ত হয়ো না। ভাল হয়ে ওঠ আগে।...

হৈমর মুখের দিকে হারাণ চাহিয়া রহিল।

ঔষধ দিবার সময় হইয়াছিল। একজন নার্স আসিয়া ঔষধ দিতে গিয়া রোগীর গায়ের উত্তাপ অনুভব করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। আবার সে একজন ডাক্তারকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। অবস্থা দেখিয়া একটা ইনজেকসন দিয়া ডাক্তার কহিলেন—তোমার যদি কোন কথা বলবার থাকে কাউকে—তবে বলে রাখাই ভাল।

হৈম কহিল—দাদা?

মুখের দিকে চাহিয়া হারাণ বলিল—নিশি কেমন আছে হৈম?

হৈম সে প্রশ্ন গ্রাহ্য করিল না, কহিল—তমোরীশকে কি বলবে বলছিলে দাদা।

পাশ ফিরিয়া শুইয়া হারাণ কহিল—'কাল—কাল বলব। ঠিক বলব।'

* * *

সেই রাত্রেই হারাণ মারা গেল। হৈম তমোরীশ কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেল। গোটা ঘরখানা খুঁড়িয়া, দেওয়াল ভাঙিয়াও কিছু না পাইয়া মনোহরবাবু একটী সকরুণ হাসি হাসিলেন। সে ধনটা কিন্তু ছিল—ছিল অদূরে নিবিড় একটা জঙ্গলের মধ্যে।

পৌষ ১৩৪০

ভিখারীটা

বনফুল

ভিখারীটা একজন বড়লোকের দাওয়ায় বসেছিল। রোদে কাঠ ফাটছিল চতুর্দিকে। পিচের রাস্তাগুলো গরমে নরম হয়ে গিয়েছিল। বেচারা এই রোদে আর হাঁটতে পারছিল না। হেঁটে লাভ হ'ত না কিছু। এই দুপুরে সকলের বাড়ির কপাট বন্ধ। কে তাকে ভিক্ষা দেবে। হাঁকাহাঁকি করলে দূর ছাই করে' তাড়িয়ে দেবে, সবাই ভাত খেয়ে ঘুমের সময় তো এটা, এ সময় বিরক্ত করা উচিত নয়। সকাল থেকে অনেক হেঁটেছে বেচারা, কিন্তু বেশী কিছু পায় নি সে। আজকাল নয়া পয়সার যুগ, নয়া পয়সাই দেয় সবাই। দু'মুঠো ছাই খেতে গেলেও চার আনা পয়সা চাই। এক নয়া পয়সা ভিক্ষা পেলে পঁচিশটা নয়া পয়সা চাই। পঁচিশ জন সহৃদয় লোকের দেখা পাওয়া কি সহজ আজকাল? এই সবই ভাবছিল বেচারা বসে' বসে'। লোকটা বুড়ো। অস্থিচর্মসার চেহারা। পরণের কাপড়টা ময়লা, শতছিন্ন। এত ছোট যে উরুত দুটোও ঢাকে নি ভাল করে। মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা গোঁফদাড়ি। ছোট ছোট কোটরগত চোখ। এর সঙ্গে বেমানান কিন্তু তার পায়ের জুতো জোড়া। ছেঁড়া বটে, কিন্তু ভাল চামড়ার। তার আভিজাত্যের চিহ্ন এখনও তার সর্বাঙ্গে বর্তমান। একজন ধনী যুবক জুতো জোড়া দান করেছিল তাকে কিছুদিন আগে। দয়া-পরশ হ'য়ে ততটা নয়—যতটা তার শু র‍্যাক (Shoe rack) খালি করবার জন্যে। তার জুতো রাখবার জায়গায় আর স্থান ছিল না। ও জুতো বিক্রিও করা যেত না, তাই দানই করতে হয়েছিল।

ভিখারীটা ঢুলছিল বসে' বসে'। হঠাৎ তার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

"পৌলিশ, পৌলিশ"

ভিখারী দেখলে একটা রোগা ছেলে জুতো পালিশের সরঞ্জাম ঘাড়ে করে' রোদে রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"পৌলিশ, পৌলিশ—"

চারিদিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাইতে লাগল। রাস্তায় কেউ নেই। এই রোদে কে জুতো পালিশ করাতে বেরুবে? কি বোকা! হাসল ভিখারীটা।

"এই শোন—"

ছোঁড়াটা এগিয়ে কাছে আসতেই ভিখারীটা যা বলল তা অবিশ্বাস্য।

"আমার এই জুতোটা পালিশ করে' দে।"

"তুমি জুতো পালিশ করাবে?"

একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটি-ফুটি করতে লাগল ছোঁড়ার চোখের দৃষ্টিতে।

"হ্যাঁ করাব—"

"চার পয়সা লাগবে"

"চার পয়সা মানে ছ' নয়া পয়সা তো? দেখি।"

"হ্যাঁ, আছে আমার কাছে। পালিশ করে' দাও জুতোটা—নাও, আগেই দিয়ে দিচ্ছি।"

সেদিন সারা সকাল ঘুরে ছ'টি নয়া পয়সাই রোজগার করেছিল সে।

ছোঁড়াটা জুতো পালিশ করতে লাগল।

অর্ধ-নিমীলিত নয়নে স্মিত মুখে ছোঁড়াটার মুখের দিকে চেয়ে বসেছিল ভিখারিটা। কল্পনা করছিল। বছরখানেক আগে তার ছোট ছেলে নুলিয়া পালিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। সে নাকি এখন কলকাতার রাস্তায় জুতোপালিশ করে' বেড়ায়। নুলিয়ার মুখের সঙ্গে এ ছেলেটার মুখের কোনও সাদৃশ্য নেই। ভিখারীটার কিন্তু মনে হচ্ছিল আছে। এক দৃষ্টে চেয়ে রইল সে ছেলেটার মুখের দিকে। ছোঁড়াটা মুচকি মুচকি হাসছে। নুলিয়াও ওই রকম হাসত।

আষাঢ় ১৩৬৯

শবরী

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অনেকক্ষণ ধরে স্বরটা কানে আসছিল।

প্রথমে শুধু কণ্ঠটাই একটু চমকে দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, তারপর কথাগুলোও কৌতূহলী করে তুলেছে।

তবু পেছন ফিরে তাকাই নি। শুধু অভদ্রতা হবে মনে করে যে তাকাইনি তা নয়। হয়ত আশাভঙ্গ হবে এই ভয়েও খানিকটা। তা ছাড়া আজকাল ওধরণের দু চারটে ঝকমকে বুলি মুখস্থ রেখে কিছুক্ষণের জন্যে আসর জমাবার কায়দা অনেকেরই জানা। ওপরের ওই তবকটুকু একটু নাড়া চাড়াতেই উঠে যায়।

বৃষ্টিটা ধরবার আশায় চৌরঙ্গী পাড়ার একটা রেস্তোরাঁয় কফি আর কিছু আনুষঙ্গিক নিয়ে বসেছি। হাল ফ্যাশনে সাজানো গুছোন হলেও রেস্তোরাঁটি নেহাৎ সঙ্কীর্ণ অপরিসর। এক পাশে সিঁড়ি দিয়ে নকল একটা দোতলা তুলেও জায়গার বিশেষ সুসার হয় নি। টেবিলগুলো প্রায় গায়ে গায়ে লাগানো। তার ফাঁকে ফাঁকে গলে চেয়ার নিয়ে বসা একটা কসরৎ। চেনা অচেনায় ঠেসাঠেসি না হোক ঘেঁসাঘেঁসিটা একটু অস্বস্তিকর হয়।

সন্ধ্যার পর ভিড়টা প্রতিদিন একটু বেশী থাকে, আজ বৃষ্টির কল্যাণে আর তিলধারণের জায়গা নেই। বাড়তি চেয়ার দেবার জায়গা থাকলে তা দিয়েও যে চাহিদা মেটানো যেত না। কাঁচের দরজা ঠেলে উৎসুক খরিদ্দারের উঁকিপিরা দারোয়ানের সেলাম নিয়ে ঢোকা আর হতাশভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে বেরিয়ে যাওয়া থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোন রকমে একটু আগে থাকতে ঢুকে একটা চেয়ার যে পেয়েছি, এই ভাগ্যের কথা। ভাগ্যটা অবিমিশ্র নয়। চারজনের বসবার টেবিল। বাকি তিনটি আসনে অপরিচিত একটি অবাঙালী পরিবার আমার অবাঞ্ছিত উপস্থিতিতে নিজেদের অপ্রসন্নতা ক্ষণে ক্ষণে ভাবে ভঙ্গিতে এমন কি ভাষাতেও প্রকাশ করছেন। তাঁদের সৌজন্যের অভাব অত উগ্র না হ'লে এক প্রস্থ কফি খেয়ে হয়ত সত্যিই রেস্তোরাঁর অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বারান্দার নিচে ফুটপাথে গিয়ে বৃষ্টি ধরার জন্যে অপেক্ষা করতাম।

রেস্তোরাঁর চেয়ে বাইরের বৃষ্টির ছাটলাগা জনাকীর্ণ ফুটপাথও শ্রেয় মনে করবার অন্য কারণও ছিল। এই নতুন ধরণের রেস্তোরাঁগুলির বেশীর ভাগই ইদানীং সঙ্গীত পরিবেষণ একটা আকর্ষণ করে তুলেছে। অপরিসর রেস্তোরাঁর একটি কোণে সামান্য উঁচু একটি বেদী গোছের থাকে। জায়গায় কুলোলে তাতে একটি পিয়ানো স্থান পায়। নইলে বিলাতী কয়েকটি মুখে বা হাতে বাজাবার যন্ত্র শুধু। তাদেরই সহযোগিতায় সাধারণত অত্যন্ত কদর্য বেশবাসে একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে মাইকের সাহায্যে সস্তা বিলাতি গানের অক্ষম নকলে ভোজনশালার সিগারেটের ধোঁয়া ও ভোজ্যদ্রব্যের গন্ধে ভারী বাতাস দুঃসহ করে তোলে। যে গায়িকার যত কর্কশ পুরুষালি গলা, তার নাকি তত খাতির। আপাতত এখানেও সেই অবাঞ্ছিত উপদ্রব সুরু হবার উপক্রম দেখেই মনটা পালাই পালাই করছিল। শুধু আমার টেবিলের অচেনা সঙ্গীদের স্বার্থপর অভদ্রতাতেই জেদ করে জ্বালা ধরাবার জন্যে আরেক প্রস্থ কফির অর্ডার দিয়ে গ্যাঁট হয়ে নিজের আসনে বসে রইলাম।

তা না থাকলে দ্বিতীয় সুমিতার সঙ্গে দেখা হত না।

পেছনে যে কণ্ঠস্বর এতক্ষণ কৌতূহলী করে তুলেছিল তা যে সুমিতারই তা অবশ্য তাকে চোখে না দেখা পর্যন্ত ভাবতে পারি নি।

ভাববই বা কি করে।

আমি এ কণ্ঠস্বর যার মধ্যে একদিন শুনেছিলাম, স্বরটুকু বাদে তার ভাষা শুধু নয়, বাচন ভঙ্গিও আলাদা। এমন অবিরাম কথার নির্ঝর প্রবাহিত করে রাখা তার পক্ষে অবিশ্বাস্য।

তা ছাড়া তার নামও সুমিতা ছিল না।

যতক্ষণ সঙ্গীত সুধার স্রোত বইছিল ততক্ষণ অন্য কোন দিকে কান দেবার সুযোগ পাইনি।

প্রাণমন তখন ত্রাহি ত্রাহি।

সে কণ্ঠামৃতে কফিটাও বিস্বাদ লাগবার ভয়ে ধীরে ধীরে রয়ে সয়ে পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলাম।

গান ও তার অভিনন্দনে করতালি-ধ্বনি থামবার পর গায়িকা মেয়েটি আমারই সামনের দিকে একটি টেবিলে একজন বাদক সঙ্গীর সঙ্গে এসে বসল। গানে প্রাণ ঢেলে দেওয়ার পর সে প্রাণের ঘাটতি পূরণ করতে কিঞ্চিৎ রসদের অবশ্যই প্রয়োজন। রেস্তোরাঁর কর্তৃপক্ষই তা যোগান।

টেবিলের ওপর ভোজন পর্বের প্রাথমিক উপকরণ সাজানো যখন চলছে, গায়িকা মেয়েটি এদিক ওদিক চাইতে চাইতে হঠাৎ আমারই পেছনের দিকে কাকে যেন দেখতে পেয়ে উল্লাসে হাত তুলে হর্ষধ্বনি করে উঠল।

ধ্বনিটা ঠিক বোধগম্য না হলেও আকারান্ত একটা নামের আভাস তার মধ্যে পেয়ে বুঝলাম সম্বোধনটা কোন পুরুষকে নয়।

পেছনের ভাষণ থেমে গিয়ে সেখান থেকেও 'হ্যালো লরা!' শুনে বুঝলাম কিছুটা উৎসুক যা করে তুলেছিল, এ সেই একই কণ্ঠস্বর।

শুধু সম্ভাষণ-বিনিময়েই ব্যাপারটা শেষ হলে এ কাহিনী লেখবার আর কোন কারণ থাকত না। কিন্তু প্রাথমিক ভূমিকার পর লরা তার টেবিলেই আমার পশ্চাৎবর্তিনীকে নিমন্ত্রণ করে বসল তার সঙ্গে অন্তত একটু কফি খাবার জন্যে।

অদৃশ্যমান একবার বুঝি মৃদু আপত্তি জানালেন।

কিন্তু লরার কাছে সে আপত্তি টিকল না। তার টেঁসু উচ্চারণে পশ্চাৎবর্তিনীর নামটাও বিকৃতভাবে এবার পাওয়া গেল। নামটা বাংলায় সম্ভবত সুমিতা।

পিছন থেকে সুমিতা দেবী লরার টেবিলে গিয়ে বসবার সময় আমি শুধু নয় সমস্ত রেস্তোরাঁই বোধহয় কৌতূহলী হয়ে তাঁকে লক্ষ্য করল। লরার সঙ্গীত নিত্য যাদের প্রাণে সুধা বর্ষণ করে সে সব মুগ্ধ ভক্তেরা নিশ্চয় তখন ঈর্ষান্বিত।

আমি কিন্তু তখন রীতিমত বিস্মিত ও সংশয়াচ্ছন্ন।

প্রথমত নবযৌবনা লরার বান্ধবী হিসাবে সমবয়সী কাউকেই দেখা যাবে আশা করেছিলাম। কিন্তু সুমিতা দেবী পশ্চাতের অপরিচয় থেকে লরার টেবিলে যাবার সময় সম্মুখের আলোয় দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বুঝলাম পোশাকে প্রসাধনে আধুনিকা হলেও যৌবন-সীমা পার হ'তে তাঁর দেরী নেই।

বিস্মিত ও সংশয়াচ্ছন্ন শুধু ওইটুকুতে অবশ্য হইনি।

চালচলন পোশাক-আশাক ভাবভঙ্গি এমন কি শিক্ষাদীক্ষায় ও নামেও আলাদা বলে চাক্ষুষ দেখার পরও এঁকে এত চেনা কেন মনে হয় বুঝতে না পেরেই অবাক ও চিন্তিত হ'লাম।

বাইরের কোন মিল না থাকা সত্ত্বেও আর একজনের কথা এঁকে দেখে এমন করে

স্মরণে আসে কেন?

আমার দ্বিতীয় প্রস্থ কফিও ইতিমধ্যে ফুরিয়ে এসেছে।

আমাকে তাড়াতে না পেরে আমার টেবিলের অনিচ্ছুক বখরাদারেরা নিজেরাই পাওনা চুকিয়ে এবার উঠে পড়লেন।

বাইরে বৃষ্টি থেমেছে বলে মনে হ'ল।

আমার সুতরাং আর এখানে বসে থাকার কোন মানে হয় না। 'বয়'কে বিল আনতে বলে যতটুকু পারি সুমিতা দেবীকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে আমার অদ্ভুত ধারণার হেতু বোঝবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

সুমিতা দেবী তখন লরা ও তার বাদক সঙ্গীর সঙ্গে রহস্যালাপে মত্ত।

মাঝে মাঝে হাস্যধ্বনির সঙ্গে যে দু একটা কথার টুকরো কানে আসছিল তাতে বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে পরিধানে স্কার্টের বদলে শাড়ী থাকলেও সুমিতা দেবী ওই ইঙ্গফেরঙ্গ সমাজের আপনার লোক না হলেও অন্তরঙ্গ একজন।

এ সুমিতা দেবীর সঙ্গে আমি যাঁর কথা ভাবছি তাঁর কোন সম্পর্ক থাকা অসম্ভব।

সে বিষয়ে একরকম নিঃসন্দেহ হলেও স্মৃতির অদ্ভুত অযৌক্তিক আলোড়নে নিজের ওপর একটু বিরক্ত হয়ে রেস্তোরাঁর পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বাইরে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু পথ ঘাট যানবাহনের অবস্থা শোচনীয়। ট্রাম বন্ধ, বাসে ওঠা সাধ্যাতীত, ট্যাক্সি তপস্যাতেও দুর্লভ। কাতারে কাতারে নিরুপায় জনতা ফুটপাথে অলৌকিক উপায়ে কোন যানবাহনে জায়গা পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করছে।

তাদের সঙ্গেই অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই জেনে, ফুটপাথ-ঢাকা বারান্দার একটি থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম।

খাড়া সেপাইএর মত এই ভাবে কতক্ষণ কাটাতে হবে কে জানে।

আমার কিছুক্ষণ পরেই সুমিতা দেবীকেও রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ভীড়ের মধ্যে দাঁড়াতে দেখে একটু বিস্মিত হলাম। সুমিতা দেবীর চেহারা পোশাকে চালচলনে একটা অন্তত ছোটখাটো মোটর নেপথ্যে থাকার আভাস যেন পেয়েছিলাম। সে আভাস তাহলে অলীক!

সুমিতা দেবী খানিক দাঁড়িয়ে থেকে একবার বুঝি হেঁটে যাবার সঙ্কল্পেই কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ওই কয়েক পা-ই। যেখানেই তাঁর গন্তব্য হোক এই কোথাও আধ-ডোবা কোথাও পেছল রাস্তা দিয়ে যাওয়া সাধ্য হলেও সমীচীন নয় বুঝেই বোধহয় তিনি আবার ফিরে এসে বারান্দার নিচে দাঁড়ালেন।

ক'টা রাস্তার ছেলে প্রতিদিন ট্যাক্সি ডেকে দিয়ে বা দেবার নামে এখানে যাত্রীদের কাছে কিঞ্চিৎ বখশিষ রোজগার করে। চেহারা পোষাক দেখে আজও তারা ট্যাক্সি ডাকবার আশ্বাস কাউকে কাউকে দেবার চেষ্টা করছে বখশিষের আশায়!

কিন্তু ট্যাক্সি আজ কোথায়, যে ডাকবে!

সুমিতা দেবীকে কটা ছোকরা গিয়ে 'ট্যাক্সি ডাকব মেমসাব!' বলে বিরক্ত করায় তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমারই ভাগ্যে অমন অলৌকিক আবির্ভাব ঘটবে কে জানত!

যে থামটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম সেটা একেবারে রাস্তার ধারে ফুটপাথের একটি কোণে। হঠাৎ পাশে চাকার শব্দ শুনে চমকে ফিরে দেখি—যা স্বপ্নেও অভাবিত সেই ফ্ল্যাগ-তোলা ললাটে বহ্নিলিপি জ্বালানো একটি ট্যাক্সি আমারই পাশের রাস্তা থেকে এসে মোড় ফিরছে।

মুখে 'ট্যাক্সি' বলে হাঁক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরজার হাতলটা ধরে ফেলেছিলাম, নইলে মরীচিকা-মায়ার মত সে ট্যাক্সি মিলিয়ে যেতে বোধহয় দেরী হ'ত না।

কিন্তু দরজার হাতল ধরে দাবী সাব্যস্ত করা সত্ত্বেও দখল প্রায় যাবার উপক্রম।

সুমিতা দেবীকে যে কটি ছোকরা জ্বালাতন করছিল, তাদেরই একজন চক্ষের নিমেষে আমার প্রায় পর মুহূর্তেই ছুটে এসে ট্যাক্সির সামনের দরজাটা তখন ধরে ফেলেছে।

দরজা খুলে ভেতরে উঠতে যাবার মুখেই সে ছোকরার কথায় সমস্ত শরীর একেবারে জ্বলে গেল।

এ ট্যাক্সি হামনে পহেলা লিয়া সাব!

ট্যাক্সির ঝগড়া কি কুৎসিত এমন কি সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে জানতে আমার বাকি নেই।

কে আগে ট্যাক্সি ডেকেছে তার মীমাংসায় ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাক্ষ্যই চূড়ান্ত ও অকাট্য। এ ছোকরা সুমিতা দেবীর হয়েই ট্যাক্সি ধরেছে বোঝা মাত্র ড্রাইভারের ধর্মজ্ঞান কতখানি টনটনে থাকবে বলা খুবই শক্ত। ছোকরার পক্ষেই মাথাটা একবার হেলালে আর উপায় নেই। ফুটপাথের এই জনতাই আমার বিরুদ্ধে রায় দেবে।

'তুমনে লিয়া!' বলে তাই রাগে প্রায় ফেটে পড়ছিলাম, এমন সময় সুমিতা দেবী নিজেই সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

তাঁকে দেখে সত্যি প্রমাদ গণলাম।

সে ছোকরা ত তখন সাপের পাঁচ-পা দেখেছে। গলার স্বরে যেটুকু সমীহ আগে ছিল এবার তাও বিসর্জন দিয়ে চড়া গলায় রুখে উঠল।

জরুর লিয়া। মেমসাবকে লিয়ে। পুছিয়ে ড্রাইভারকো!

ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলে ফল কি হ'ত বলা যায় না। কিন্তু তার দরকার হ'ল না। সুমিতা দেবীই আশাতীত ভাবে সমস্যা মিটিয়ে দিয়ে বিমূঢ় করে দিলেন।

প্রথমে ছোকরাকে ধমক দিয়ে জানালেন যে তাকে গাড়ি ডাকতে তিনি বলেনওনি, আর গাড়িও সে আগে থাকতে ধরেনি। আমাকে আগে গাড়ি ধরতে তিনি নিজে দেখেছেন বলে আমাকেই তিনি এবার অনুরোধ জানালেন তাঁকে আমার ট্যাক্সিতে বেশী দূরে নয় এই ফ্রি স্কুল স্ট্রীট পর্যন্ত যদি আমি একটু পৌঁছে দিয়ে যাই।

এ দুর্যোগে ট্যাক্সি পাওয়ার অসুবিধা সম্বন্ধে তিনি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। ড্রাইভারের অসহিষ্ণুতায় এবং সেই সঙ্গে নিজের কৃতজ্ঞতায় তাঁকে থামিয়ে দিয়ে গাড়ির দরজাটা খুলে ধরে বললাম, কিছু আর বলতে হবে না। আসুন।

ফ্রি স্কুল স্ট্রীট বেশী দূরে নয়। একরকম ফিরিঙ্গি পাড়াই বলা চলে। সুমিতা দেবীর চেহারা চরিত্রের মহিলার সেই অঞ্চলেই বাসা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু পৌঁছে দিতে গিয়ে বাসার বদলে একটা দোকান দেখে একটু বিস্মিতই হলাম।

এইটুকু পথ ট্যাক্সিতে আসতে আসতে সামান্য যা সৌজন্য বিনিময় হয়েছে তাতে ট্যাক্সি থামবার পর সুমিতা দেবী আমায় হঠাৎ একটু নামতে অনুরোধ করবেন এটাও কল্পনা করতে পারি নি।

একবার ট্যাক্সি ছাড়লে আর পাওয়ার অনিশ্চয়তার কথা জানিয়ে যেটুকু আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম সুমিতা দেবী তা খণ্ডন করে বললেন—আপনার কোন ভাবনা নেই। ট্যাক্সি আপনাকে পাইয়ে দেবই। না পেলেও জলে পড়বেন না। বিপদে যে সাহায্য করেছেন তাতে আমার দোকানটা আপনাকে একটু না দেখিয়ে ছাড়ছি না।

এই পোশাক-আশাকের দোকান আপনার!

শুধু সুমিতা দেবীর অনুরোধে নয়, নিজেরও অতৃপ্ত কৌতূহলে সত্যিই অনিশ্চিতের

আশায় নিশ্চিতকে বিসর্জন দিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে তাঁর দোকানে ঢুকতে ঢুকতে বিস্ময় প্রকাশ করলাম।

সুমিতা দেবী আমার আপত্তি সত্ত্বেও নিজেই তখন ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়েছেন। আমার ভেতরে নিয়ে গিয়ে পার্টিশনের পেছনের একটি কামরায় বসিয়ে একটু হেসে বললেন,—হ্যাঁ আমারই! নইলে রেস্তোরাঁয় লরার অত খাতিরের বহর কি দেখতে পেতেন! লরা-কে যা পরে' গান গাইতে দেখলেন তার দামটাও এখনো বাকি!

লরার খাতিরের রহস্য জেনে নয়, সম্পূর্ণ অন্য একটি ব্যাপারে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আমি যে ও রেস্তোরাঁয় ছিলাম আপনি জানেন?

তা জানি বই কি!—বলে সুমিতা দেবী রহস্যময়ভাবে একটু হেসে অনুরোধ করলেন—আপনি দুমিনিট এই কাগজপত্রগুলো একটু দেখুন। দোকান বন্ধ করবার সময় হয়েছে। আমি সে ব্যবস্থা করেই আসছি।

আপত্তির একটু ভাণ করে বললাম—কিন্তু আমায় বসিয়ে রেখে লাভ কি বলুন। মেয়েদের বিলিতি পোশাকের এ দোকানে নিজে ত খরিদ্দার কস্মিনকালে হ'ব না, কাউকে জোটাতেও পারব না। আমি যাঁদের জানি তাঁদের দৌড় রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলেজ স্ট্রীটের বাইরে নয়।

আমার চোখের দিকে চোখ রেখে সুমিতা দেবী একটু বিদ্রূপের স্বরেই বললেন, খদ্দের বাগাবার জন্যে আপনাকে ধরে রাখিনি। আপনি কলেজ স্ট্রীট, রাসবিহারী অ্যাভেনিউর মানুষ, তাই জানেন না যে আমার এ দোকানের কিছু সুনাম তার নিজস্ব মহলে আছে। যা ফরমাশ আমরা পাই তাই মিটিয়ে উঠতে পারিনা। সুতরাং আপনাকে ধরে রাখাটা নিছক কৃতজ্ঞতাই মনে করতে পারছেন না কেন?

সুমিতা দেবী পার্টিশনের অপর দিকে চলে যাবার পর বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়েই বসে থাকতে হ'ল।

সেদিন বাড়ি ফিরতে খুব বেশী রাত হয়নি। সুমিতা দেবী নিজেই পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁর ট্যাক্সিতে। দোকান থেকে প্রতি রাত্রে তার রাউডন স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবার জন্যে একটি ট্যাক্সির সঙ্গে তাঁর চুক্তি আছে। সেই চুক্তি করা ট্যাক্সির ভরসাতেই তিনি আমাকে নিজের ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে বলার সাহস পেয়েছিলেন।

সুমিতা দেবীর দোকানের নাম ঠিকানা দেওয়া কার্ড আমার কাছে আছে। আর কোন দিন তাঁর সে দোকানে বা রাউডন স্ট্রীটে তাঁর ফ্ল্যাটে হয়ত যেতে পারি।

কিন্তু গিয়ে বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না।

সুমিতা দেবীর মধ্যে রহস্য যদি কিছু থাকে তা সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হবার নয়।

একটি কুজ্ঝটিকার যবনিকা আমার স্মৃতিকে চিরকালই বুঝি ব্যঙ্গ করবে।

সেদিন এই যবনিকা সরাবার চেষ্টাই করেছিলাম। সুমিতা দেবী তাঁর দোকান বন্ধ করার কাজ সেরে ফিরে আসবার পর জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কতদিন আপনি এ ব্যবসা করছেন?

আমার পাশের সোফায় বসে তিনি হেসে বলেছিলেন—প্রায় দশ বছর। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন? ইনকামট্যাক্সে খবর দেবার জন্যে যদি হয় তাহলে জেনে রাখুন সেখানে আমার ফাঁকি নেই।

সুমিতা দেবীর লঘু পরিহাসটুকু অগ্রাহ্য করে গম্ভীর মুখে বলেছিলাম,—কেন জিজ্ঞাসা করছি, শুনুন তাহলে। প্রায় পোনোরো বছর আগে একটি মেয়ের সঙ্গে সামান্য পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু পরিবারের বজ্রকঠিন তেজস্বিনী একটি মেয়ে। কোর্ট থেকে একটা কমিশনে তাঁর জবানবন্দী নিতে কদিন তাঁর বাড়িতে যেতে

হয়েছিল। তিনি যাকে পর্দানশীন বলে তা ঠিক নয়, তবে কোর্টে গিয়ে দাঁড়াতে নারাজ। তাঁদের বাড়ীর মর্যাদায় তাতে আঘাত লাগে। মেয়েটি যেমন একটু অসাধারণ, কেসটাও ছিল তেমনি একটু বিচিত্র। তাই ভুলিনি। মেয়েটি মস্ত বড় এক ধনীর একমাত্র কন্যা। নাম ধরুন উমা। বাপ যথাযোগ্য পাত্রে উমার বিয়ে দিয়ে ছেলেটিকে বিলেত পাঠাবার ব্যবস্থা করেন নিজের খরচেই। ছেলেটি কিন্তু সেখানে গিয়ে সত্যভ্রষ্ট হয়। একটি বিদেশী মেয়েকে সেখানে সে লুকিয়ে বিয়ে করে। কিছুদিন বাদেই ব্যাপারটা জানতে পারলেও বাপ বা মেয়ে ছেলেটির বিরুদ্ধে দেশে বা বিদেশে কোথাও কোন প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা করেননি, উমা শুধু বাপের শিক্ষায় ও উপদেশে নিজেকে একান্তভাবে কঠোর ধর্মাচরণে আর শাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত করেন।

ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে কিছুদিন বাদে উমার স্বামীর বিদেশিনী পত্নী মারা যায়। উমার বাবাও তখন গত হয়েছেন। স্বামী দেশে ফিরে এসে উমার কাছে ক্ষমা চেয়ে পূর্বের সম্পর্কে আবার ফিরে যাবার আবেদন জানায়। উমা কিন্তু বজ্রকঠিন। স্বামীর সমস্ত অনুনয় বিনয়ে সে বধির। তার জীবনে অবিশ্বাসী ম্লেচ্ছাচারী স্বামীর আর কোন স্থান নেই এই তার বক্তব্য।

চরম হতাশায় ঝোঁকের মাথায় ছেলেটি একদিন স্বামীত্বের অধিকার দাবী করে' আদালতে কেস করে বসে। সেই মামলা বাবদই জবানবন্দী নিতে কদিন আমাদের মেয়েটির বাড়িতে যেতে হয়েছিল। শুদ্ধ পবিত্র নিষ্ঠাবতী এবং আগুনের শিখার মত তেজস্বী যে মেয়েটিকে তখন দেখেছিলাম, আপনাকে দেখে কেন তার কথা মনে পড়ে গেল কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।

সুমিতা দেবী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ম্লান একটু হেসে বলেছিলেন,—গল্পটা দেখছি নেহাৎ জোলো নয়। সেই মেয়েটির তারপর কি হয়েছে জানেন?

না তা জানি না। খবর রাখবার চেষ্টা করিনি। তবে কেসটা মীমাংসা পর্যন্ত গড়ায়নি তা জানি। উমার স্বামীই নিজে থেকে একদিন মামলা তুলে নিয়ে আবার বিলেতে ফিরে চলে যায়।

সুমিতা দেবী কেমন একটু অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন,—এইখানেই গল্প আপনার শেষ? এ ত কমা-সেমিকোলন মাত্র, ভালো রকম দাঁড়িও পড়ল না।

না তা পড়ল না।

কিন্তু আমায় দেখে সেই আপনার শুদ্ধ পবিত্র নিষ্ঠাবতী আর সঙ্কল্পে বজ্রকঠিন উমার কথা মনে পড়ল, এ তো বড় আশ্চর্য! কোনো সম্পর্ক কি আমাদের মধ্যে থাকা সম্ভব?

তা নয় বলেই ত অবাক হচ্ছি!

উমাকে আমার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হলে কি করতে হয় জানেন?—সুমিতা দেবীর গলার স্বর লঘু কৌতুকেই বুঝি কেমন অস্বাভাবিক শুনিয়েছিল,—উমাকে একদিন পূজা জপতপের ও কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে নিজের হৃদয়কে অকস্মাৎ আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হতে হয়। যাকে নির্মম হয়ে সে ফিরিয়ে দিয়েছে সাগর পারে, তার কাছেই আত্মসমর্পণ করবার জন্যে সমস্ত দেহ মন তার উন্মুখ এ সত্য নিজের কাছে আর গোপন করা যায় না। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে স্বামীকে হয়ত দ্বিধা সঙ্কোচ জয় করে শেষ পর্যন্ত তাকে চিঠিই লিখতে হয়। কিন্তু সে চিঠির উত্তর আসে না। উমা তবু হতাশ যেন না হয়। স্বামীকে সেই বিদেশে গিয়েই খুঁজে বার করবার জন্যে সে তখন প্রস্তুত। নিজেকে স্বামীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই তখন তার সাধনা। যে ম্লেচ্ছাচারের জন্যে স্বামীকে সে ঘৃণা করেছে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাই তাকে দিয়ে বরণ করাতে হয়। এতদিনের শুদ্ধাচার ও সংস্কার ছেড়ে উমা আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার আচার আচরণে নিজেকে নতুন করে তৈরী করতে

যেন মেতে ওঠে।

সংসারে সমাজে তার নামে কুৎসা কলঙ্কের তুফান তুলতে হয় এইবার। সব কিছু আয়োজন সম্পূর্ণ করে স্বামীর সন্ধানে সাগর পারে পাড়ি দেবার জন্যে যখন সে প্রস্তুত, তখন আনতে হয় লুব্ধ নীচ জ্ঞাতিকুটুম্বদের তরফ থেকে তার সম্পত্তির অধিকার নিয়ে মামলা। গৃহবিগ্রহের নামে উৎসর্গ করা দেবোত্তর সম্পত্তিই ধরা যাক। স্বার্থের কুটিল ষড়যন্ত্রে আর আইনের জটিল প্যাঁচে ধর্মচ্যুত বলে সে সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করা খুব কঠিন না হ'তে পারে। সমাজ সংসার থেকে বিতাড়িত প্রায় নিঃসম্বল উমার বিদেশে স্বামীর সন্ধানে যাওয়া আর হয় না। নিজের জীবিকা অর্জনই তখন তার কাছে সমস্যা হ'তে পারে। এই উমাকে এবার একটু টেনে বুনে ইঙ্গ-ভারতীয় ফিরিঙ্গি সমাজে সুমিতা দেবী বলে যে পরিচিত তার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া বোধহয় যায়।

একটু থেমে বেশ উচ্চৈস্বরেই হেসে উঠে সুমিতা দেবী বলেছিলেন,—কিন্তু এমন আজগুবি মিল কি কখনো সম্ভব? সুমিতা দেবীর মাঝখানে সেই আপনার তপস্বিনী উমাই নিরুদ্দেশ ম্লেচ্ছ স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষায় এখনো মিথ্যা আশায় দিন গুনছে, এ কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে!

যথা সময়ে সুমিতা দেবীর চুক্তি-করা ট্যাক্সি এসে বাইরে হর্ন দিয়েছিল।

বেরিয়ে যাবার পথে দেয়ালে টাঙানো একটা ফটোর সামনে একটু দাঁড়িয়েছিলাম। সুমিতা দেবী তখন রাত্রে দোকান পাহারা দেবার জন্যে যে পরিচারক সেখানে থাকে তাকে কি নির্দেশ দিচ্ছেন।

নির্দেশ দেওয়া সেরে তিনিই এবার আমায় তাড়া দিয়েছিলেন,—যাবার জন্যে,—আসুন আসুন, ট্যাক্সিওয়ালাদের মেজাজ ত জানেন।

ফটোটা ভালো করে দেখা হয়নি।

হয়ত দেখবার মত কিছু তা নয়।

আষাঢ় ১৩৬৯

পয়লা আষাঢ়

গোপাল হালদার

আমাদের সন্ধ্যাবেলাকার আড্ডায় আমরা এই পয়লা আষাঢ়ের উৎসবটা সমাপ্ত করতুম। মন্দাক্রান্তার লীলা-চঞ্চল গতির ভিতরে। সংস্কৃতে যে আমরা সবাই খুব পটু ছিলুম তা নয়,—তরুণ হৃদয়ের অনির্দেশ আকুলি-বিকুলিটাও আমাদের অনেক আগেই গৃহ-কোণের এক-একটি অঞ্চলের প্রান্তে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল ;—তবু কত কালের মৃত কবির সেই পরম আদরের দিনটিকে আমরা শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারতুম না। তাই, আমরা পয়লা আষাঢ়ের সন্ধ্যাটিকে 'মেঘদূতের' কবির কণ্ঠে অভিনন্দন করতুম।

ভবেশ তখন গলাটা শাণিয়ে মেঘদূতখানা নিয়ে বসেছে,—এমনি সময়ে বঙ্কিম ঘরে ঢুকেই বললে, "ওহে, দাঁড়াও।"

ভবেশ বিরক্ত হয়ে—"মাটি করলে। গোড়াতেই একটা বাধা" বলে মুখ তুলে চাইল।

"আজ আর মেঘদূত নয় ; তার চেয়ে এই পয়লা আষাঢ়ের সন্ধ্যার জন্য নতুন একটা কিছু এনেছি।"

"কিন্তু মেঘদূত ছাড়া কি 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসটা' ব্যর্থ করব না কি?"

"ব্যর্থ হবে না হে। এ কাহিনীটির ভিতরে কালিদাসের কবি-কণ্ঠের সাড়া পাবে না সত্য,—কিন্তু তেমনি একটা ব্যথিতের দীর্ঘশ্বাস পাবে। তবে এটাতে শিপ্রার তীর নেই, অলকাপুরী নেই ; তার কারণ, এর ঘটনাস্থল হচ্ছে কলকাতা, আর এর কাল বর্তমান।"

"সংক্ষেপে, সেই উজ্জয়িনী ও অলকা ছেড়ে আস্‌তে বল্‌ছ কলকাতার ধূলির ও ধোঁয়ার রাজত্বে।"

"সেটা ঠিক। কিন্তু ঘটনাটা সত্য। এই আষাঢ়-সন্ধ্যায় একদিন সেকাল ছেড়ে একালে ফিরে এলে, আমাদের আড্ডায় নতুনত্ব দেখা দিবে।"

সংস্কৃত আমাদের অনেকেরই বুঝতে কষ্ট হ'ত ;—অনেকটা তারই জন্য, আর অনেকটা একটা সত্যিকার কাহিনী শুনবার আশায়,—আমরা বঙ্কিমের গল্প শুনতে রাজি হলুম। ভবেশ চটে গিয়ে, আমাদের মডার্ন কালের দিঙনাগাচার্য আখ্যা দিয়ে, চুপ করে গোঁ ধরে বস্‌ল।

বঙ্কিম পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করে বল্‌লে, "আমার বন্ধু নীরেন্দ্রকে তোমরা জানো একটা ছিট-গ্রস্ত প্রফেসর বলে। তোমরা দেখেছ, কাব্য ও কবিতার সে সমস্ত জীবনটা ধরে স্তুতি করে এল ; অথচ লোক-সমাজে তার বে-রসিক নাম বেড়েই যাচ্ছে। তার কারণ, যে তরলতা আমাদের পাঁচজনার কাছে রসিকতা নামে বাহবা পায়, নীরেন্দ্রের সুগভীর সাধনার নীচে তা কবে তলিয়ে গেছে! আমাদের আড্ডায় সে একদিন এসেছিল ; কিন্তু তোমরা দেখেছ, কেমন বিশ্রী ঠেকেছিল তার বোবার মত মুখ বুজে থাকাটা। তবু যে আমি তার সঙ্গ ছাড়তে পারি নি, তার কারণ, আমি তার কলেজ-জীবনের বন্ধু,—আর তাই বেশ জানতুম, আজকের এই স্বল্পভাষী গম্ভীর-প্রকৃতির কাব্য-কীটটি চিরদিন এমনি ছিল না ;—তার উজ্জ্বল হাসি-তরঙ্গের নীচে তলিয়ে না যেত এমন লোক আমার চোখে পড়ে নি। কলেজের অধ্যাপনা তাকে গ্রাস করে ফেলেছে—এ কথা আমি অনেক দিন বলেছি ;—শুনে সে শুধু মৃদু হাসত।

তার আশে-পাশে যে সব লোক ঘুরে বেড়াত, তাদের বেশীর ভাগই তার সাহিত্যের

ছাত্র। বন্ধুদের মধ্যে আমিই শেষ পর্যন্ত টিকে আছি। আমার ধৈর্য তাকে জয় করেছে ;—তার আগল দেওয়া হৃদয়-দুয়ারটার ফাঁকে মাঝে-মাঝে আমার দৃষ্টি-নিক্ষেপের অবসর জুটেছে,—সেও আমায় দিয়েছে।

আজ সকালে স্নান করতে যাওয়ার মুখেই একটা চিঠি এসে পৌঁছাল। নীরেন্দ্র লিখেছে, বিকালে একটু বেলা থাক্‌তেই আমি যেন তার ওখানে চা খেতে যাই। সমস্ত কাজের অন্তরালেও আমার তার কথাটা মনে জাগছিল। তাই বেশ সকাল করেই কোর্ট থেকে ফিরে তার বাড়ী গেলুম। দেখলুম, নীরেন্দ্র আমার অপেক্ষায় দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, অনেক কাল পরে যেন তার মুখে সেই পুরোনো সরসতার অনেকটা আজ ফিরে এসেছে। তার কথা-বার্তার ভিতর দিয়েও যেন আজ একটা স্ফূর্তির সুর বাজছে। আমি মনে মনে বেশ একটু আরাম পেলুম।

নীরেন্দ্র আমাকে ধরেই তার পড়বার ঘরে নিয়ে গেল। জীবনে তার একমাত্র passion হয়ে উঠেছিল পড়া আর বই ; তবু আমি তার বই-এর সংখ্যা দেখে চম্‌কে গেলুম। কথাটা তুলতে না তুলতেই সে বাধা দিয়ে বলল, 'তোমাকে আমার বই দেখাবার জন্য ডাকি নি।'

'তা হয় ত ডাক নি। কিন্তু বই-ই যখন দেখছি, তখন তার কথাটা বলাই স্বাভাবিক।'

'সে তুমি আর একদিন এসে বেশ ধীরে-সুস্থে বিবেচনা করে বোলো। কিন্তু, আপাততঃ আমার আর একটুকু দরকারী কাজ ঠেকেছে।'—বলে, ড্রয়ার থেকে এই কাগজের তাড়া বের করে বললে, 'শোন, এটা একটা গল্প। এ তোমার না শুন্‌লেও চল্‌ত, কিন্তু আমার চল্‌ত না। কেন না, একজন অন্তত লোক চাই, যার কাছে হৃদয়াবেগগুলা কিছু না কিছু ঢেলে দেওয়া যায়। তুমি, ইচ্ছা হলে, এটা যাকে খুসী তাকে বল্‌তে পার ; কিন্তু আমার সে সুবিধা নেই, সে সৌভাগ্যও নেই।'

এই কথা বলে নীরেন্দ্র আমাকে চাএর পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে, প্লেটে করে খানকত লুচি ও কিছু মিষ্টি সাজিয়ে বলল, তুমি খেতে থাক ;—আমার চেয়ে দেখবার মত অবসর আর থাক্‌বে না।'—তার পর তার কাহিনী চলল। আমারই একজন বন্ধুর জীবনের বলে হোক্,—আর সত্যসত্যই এর অন্তরের নিজস্ব সৌন্দর্যে হোক,—এ কাহিনী আমায় এমনি মুগ্ধ করেছে যে, আজকের সন্ধ্যায় তোমাদের তা না শোনাতে পারলে আমার নিস্তার নেই।'

বঙ্কিম পড়তে লাগল ;—আজ সাত বছর ধরে ক্রমাগত লানা-হানি রণারণির পরে মনে হচ্ছে, শান্তির মোহনায় এসে পৌঁছেছি। আজ বিশ্বাস হচ্ছে, এ সাত বছর যে ছোট একটু ঘটনার জের টেনেছে, তাকে আমি সত্যিকার দৃষ্টিতে দেখতে পারব। তাই এমনি করে একটা গোপন গুহার ওপর থেকে কুয়াসার পর্দাটা সরিয়ে নিতে সাহসী হচ্ছি।

মফস্বল কলেজের চাকুরিটি ছেড়ে যে আমি কলকাতায় এলুম, তার কারণ, কলকাতায় খুঁজলে পরে মনের মত একটা মনোজগতের আবহাওয়া পাওয়া যায় ; কিন্তু মফস্বলে অনেক স্থানেই তা মেলা ভার। এই মহানগরীকে আমি বারম্বার প্রণাম করি ; আমি জানি, সে আমার শরীর-মনে কতখানি ঘুম ধরিয়েছে ; কিন্তু তার বাইরেও আমি শান্তি পাই নি।

যে বাড়ীটাতে উঠলুম, সৌভাগ্যক্রমে তার খান-তিন বাড়ী পরেই পাওয়া গেল একটী চেনা লোককে।—সে অশোক। সরকারী কাজে তার বাবা কয়েক বছর আমাদের ওই পূর্ব-বাংলার সহরটাতে ছিলেন ; এবং আমাদের পাশের বাড়ীতেই ছিলেন। অশোক পড়ত আমার দুটো ক্লাস ওপরে ;—কিন্তু তাতে আমাদের অবাধ মেলামেশার কোনো দিন অসুবিধা হয় নি। তার বাবা ভগবতীবাবু তখন পেন্‌সন্ নিয়ে কলকাতায় ছিলেন ; আর অশোক তখন হাইকোর্টে যাওয়া-আসা করছিল,—অদূর-ভবিষ্যতে মুন্সেফ হবার আশায়।

অশোকের সাথে দেখা হতেই, সে আমায় বাড়ী নিয়ে গিয়ে, তার মা ও বাবার সামনে হাজির করলে।—এমন কি, সে ছেড়ে দেওয়ার সময় বার-বার আফশোষ করলে যে, তার

স্ত্রী এখন বাপের বাড়ীতে,—নইলে সে শুভ কার্যটুকুও বাদ যেত না। পরে অবশ্য সে কর্মটুকু যত শীঘ্র সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু তার পূর্বেই তার মা ও বাবা আমাকে একেবারে আপনার করে নিয়েছিলেন। আমার এই বিদেশে অসহায়,—কেন না আমি অবিবাহিত,—জীবনটা তাঁদের যেমনি উদ্রেক করেছিল দয়া, তেমনি উদ্রেক করেছিল স্নেহ। ও-দুটি জিনিস দিয়ে তাঁরা একেবারে আমায় টেনে নিলেন।

ভগবতী বাবুর পরিবারে বছর-দুই আগে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল ;—সে যখন তাঁর মেয়ে অণিমা বিধবা হয়। অণিমাকে আমরা দেখেছিলুম, বছর দশ-বারোর একটি চঞ্চল, সুন্দর, বালিকা,—চঞ্চল কিন্তু তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি। আর সেদিন তাকে দেখলুম, বিশ বছরের এক শোক-তপ্ত বিধবা,—যার ফুটন্ত যৌবন বিষাদের বাতাসে ঝরে পড়ে গেছে।

অশোকের কাছে শুনলুম, অণিমা যখন স্বামী-হারা হয়ে ফিরে আসে, তখন ভগবতী বাবু তাকে আবার বিয়ে দেবার জন্য ইচ্ছা করছিলেন। তিনি বিয়ে প্রায় ঠিক করেছিলেন-ও। সমস্ত যখন প্রায় ঠিক, তখন তিনি অণিমাকে ডাকালেন তার মতামত শুনতে। নত-শিরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, সে অশ্রু-টল-টল আঁখি দুটি তুলে শুধু দৃঢ় স্বরে বললে, 'না'। সে 'না' ফিরলো না। ভগবতী বাবু হার মান্‌লেন। তার পর থেকে অণিমা তার বাবার কাছে সংস্কৃত শিখতে সুরু করে দিলে। এখন তার কাজ হচ্ছে, দুপুরে ও রাত্রে বাবাকে গীতা ও রামায়ণ পড়ে শোনানো, আর দিনের বাকী সময়টুকু ইংরাজি শেখায় ও ধর্মগ্রন্থ পাঠে কাটানো।

অণিমার সাথে আমার কথাবার্তা চল্‌ত মন্দ নয় ; কিন্তু তা একটু ঘনিয়ে উঠ্‌ল এমনি করে।—

অশোকের ঘরে বসে আমাদের তর্ক চল্‌ছিল।—এমনি সময়ে সে ঘরে ঢুকল। একটু চমকিত হয়ে সে অশোককে বল্‌লে, "আর একটা নতুন কিছু বই দাও, দাদা।"

"কি বই দোব, বল। আচ্ছা, এই যে প্রফেসর আছ,—বল ত একখানা বই-এর নাম।"

আমি বেশ একটু লজ্জিত হলুম।

"সত্যি বলছি হে, কি বই পড়তে বলব, বল।"

"তুমিই একটা ঠিক কর।"

"আমি পারলে আর তোমায় বলছি কেন?"

বেচারী অণিমা দেখছিল, মাঝখান থেকে তার কথাটা মাঠে মারা যাচ্ছে।

"যা হোক্‌, ভালো দেখে একখানা বই ঠিক করে দিন আপনারা" বলে সে আমার দিকে তাকাল।

অগত্যা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হল, "আচ্ছা, আপনি Pilgrim's Progress পড়েছেন?"

"ওকে-ও আপনি!" বলে অশোক সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি অপ্রতিভ হয়ে 'হাঁ' 'না' করতে লাগলুম। এমন সময় অণিমা বল্‌লে, "না, Pilgrim's Progress আমি পড়ি নি।"

"তা' হলে ওটা পড়ুন না? কি বল অশোক?"

"নিশ্চয়ই"! বলে অশোক বললে, "সাধে কি বলেছিলুম হে প্রফেসর। ওটা তোমারই জুরিস্‌ডিক্‌সন।"

তার পর থেকে অণিমা একেবারে আমাকেই ধরে বসত। সাহিত্যে আমার যতই রুচি থাকুক, সদুপদেশভরা সাহিত্যের খোঁজ আমি কমই রাখতুম। In Imitation of Christ ও Bibleএর গুটিকয় Psalm ছাড়া ইংরেজি সাহিত্যের আর কোনো গুরু-গম্ভীর কথাই আমায় বড় বেশী আনন্দ দিতে পারে নি। কাজেই অল্প ক'দিন যেতে না যেতেই আমায় মুস্কিলে

পড়তে হল। নিত্য-নতুন ধর্ম-কাহিনীর খোঁজ না পেয়ে, আমি একদিন অণিমাকে Les Miserablesখানা পড়তে বললুম। সে শুনেছিল, ওখানা উপন্যাস। উপন্যাস সে পড়তে চায় না জেনে আমি বললুম, "দেখ, নাটক বা নবেলের মধ্যে যে শুধুই কতকগুলো অকেজো গল্প থাকে, তা নয়। অনেক নবেল আছে, যদিও সেগুলো প্রধানত নবেলই, তবু নীতি-কথায়ও তাদের জুড়ি মেলে না। Les Miserables তেমনি একখানা বই ;—একটা সুন্দর অথচ বৃহৎ আদর্শের বাণী ওর বুক ছাপিয়ে উঠেছে।"

অনেক কথায় সে নবেল পড়তে স্বীকার হল। Les Miserables নিয়ে সেদিন সে প্রস্থান করলে। আজ পর্যন্ত এমন লোক আমার চোখে পড়ে নি—সংক্ষিপ্ত অনুবাদের ভিতর দিয়েও ফরাসী সাহিত্যের অমর উপন্যাসখানি যাকে মাতিয়ে না দিয়েছে। নবেল পাঠে অণিমার যতই না বিতৃষ্ণা থাক, তাকে স্বীকার করতেই হল, ভারি কথার বহরে যে সব নীতি-কথা লোক-সমাজে আদর পায়, তাদের চেয়ে এই নবেলখানার সুর কোনো নীচু সপ্তকে বাঁধা নয়। এবার তাকে আর একখানা বই দিলুম,— বোধ হয় Quo Vadis.

এই রূপে ধীরে-ধীরে কখন যে সে নবেলের একজন ভক্ত হয়ে দাঁড়াল, তা আমার-ও নজরে পড়ে নি, তার-ও খেয়াল হয় নি। তখন নবেল আর বিশেষ একটা শ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ রইল না,—কোনো একটা মরালের খোঁজে সে নবেলের দিকে ধেয়ে যেত না। অতীতের ও বর্তমানের, দেশী ও বিদেশী সমস্ত নবেলই তখন অণিমা একমনে পড়তে শুরু করলে।

ইতিমধ্যে আমারও কখন একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বিকালের দিকে আমি প্রায় প্রতিদিনই অশোকদের বাড়ীতে অণিমার পড়ার অজুহাতে গিয়ে হাজির হতুম। নবেল পড়াটা কঠিন নয় ; কিন্তু বিদেশী ও স্বদেশী কবিদের কবিতা বোঝা সব সময় সহজ নয়। তাই অণিমাকে আমার বিকালের দিকে একটু Shakespeare, Shelley, Browning, ও রবীন্দ্রনাথ আদির চর্চায় সাহায্য করতে হ'ত। তাই, আমার বিকালবেলা তাদের বাড়ীতে না গেলেই চলত না। আমাদের আলোচনায় মাঝে-মাঝে অশোক এসে জুটে পড়ত,—তাতে তর্কটার জোর বাঁধত বেশী। আমার সহযোগী বন্ধুর দল বলত যে, বিকালের দিকে না সিনেমায়, না ময়দানে, কোথাও আমাকে আর দেখা যায় না।

একদিন ভগবতীবাবু আমাদের বল্লেন, "দেখ, তোমরা কেবল বিদেশের রত্নই খুঁজলে। আমাদের দেশী সংস্কৃত জিনিসগুলো যাচাই কবে দেখলে হত না?"

কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যে আমার কম অনুরাগ ছিল না। আমি বললুম, "তা ঠিক। কিন্তু অণিমা ত শুনেছি গীতা রামায়ণ আদি অনেক সংস্কৃত বই-ই পড়েছে।"

"তা' ছাড়াও ত ঢের সংস্কৃত বই আছে—সেগুলো তোমরা ওকে পড়তে সাহায্য করো না?"

"সংস্কৃত সাহিত্যের ধর্ম ও নীতি-কথার আড়ম্বর আমি পড়ি নে,—পড়্তে আমার ভালো লাগে না। একমাত্র কালিদাসের মত জন-কয় কবি আমায় পরিপূর্ণ আনন্দ দিতে পেরেছে। তাঁদের কিছু-কিছু পড়তে আমি সাহায্য করতে পারি।"

ভগবতীবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আচ্ছা, কালিদাস তুমি পড়াতে চাও পড়াও। আমি দেখি, দুপুরে আরগুলো নিয়ে ওকে পড়াতে পারি কি না।"

সেদিন থেকে সুরু হল সংস্কৃতের পালা।

ইতিমধ্যে একদিন অশোকের স্ত্রী সরোজ এল। তার বয়স বছর আঠারো। অনেক আবেদন, নিবেদন ও সলজ্জ হাসির ভিতর দিয়ে তার সাথে-ও আমার পরিচয় জমে উঠ্‌ল। বিকালে গৃহকর্মের অন্তরালে সময় পেলেই সে এসে আমাদের সাথে জুটত। সে সাহিত্যালোচনার বড় বেশী যে রসদ যোগাত তা নয় ; তবে সে থাক্‌লে, রহস্যালাপে, আলোচনাটি কালেজি হত না,—বেশ একটু মধুর রসে ভিজে উঠ্‌ত। আমার পঁচিশ বছরের

অবিবাহিত জীবনটার পিছনে যে রোমান্স কোথায় আছে, তা খুঁজে বের করতে সে যতই উদ্‌গ্রীব হত, আমি ততই তাকে বিঁধে মারতুম হাসির রঙ্গে। মোটের উপর, সন্ধ্যাগুলো রাঙা হয়ে উঠ্‌ত।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অণিমা শকুন্তলা পড়ছিল। আমরা দুজন ছাড়া সে ঘরে আর কেউ ছিল না। পঞ্চমাঙ্ক পড়া হচ্ছিল ; আমি হঠাৎ বলে ফেললুম, "আমার মনে হয়, মানুষের স্বভাবই এই—প্রিয়জনকে দুদিন না দেখলেই ভুলতে চাওয়া, আবার সে ভুলের জন্য কেঁদে খুন হওয়া।"

অণিমার সাথে যে মানুষের জীবনের এই দিকটা নিয়ে তর্ক চলে না, তা আমি জান্‌তুম ; আর এই কথাটি যে সাক্ষাৎ-সূত্রে শকুন্তলার আখ্যায়িকার সাথে জড়িত নয়, তাও আমি স্বীকার করি। কিন্তু মানব মন যে অদেখা অলি-গলির ভিতর দিয়ে যাতায়াত করছে, লজিক্ তার সমস্ত বিধি-নিয়ম নিয়েও তার সন্ধান পায় না। কাজেই, কথাটা ফস করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

অণিমা একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "এই মানুষের স্বভাব?"

আমি কথা ফিরাতে পারলুম না।—"আমার ত সেই রূপই মনে হয়।"

কিছুক্ষণ মুখ নুইয়ে থেকে সে ধীরে-ধীরে বললে, "হয় ত তাই। আমার নিজের-ও একদিন মনে হয়েছিল যে, হৃদয়ের ভাবের ধারাটা এক মুখেই চলে। আজ মনে হচ্ছে, সে চলে ঘূর্ণীপাকে।"

আমি জিজ্ঞাসু ভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।—"আমার স্বামীর ফটোখানি আমি আগে-আগে স্নানের পর প্রতিদিনই দেখতুম। সেদিন হঠাৎ একটা কথা আমায় সে ফটোখানির বিষয়ে সচেতন করে তুললে। তোরঙ্গটা খুলতেই দেখলুম,—ক'দিন ধরে কিসের তাড়ায় আমার তা দেখবার আগ্রহটা কমে এসেছিল,—ফটোখানি অনেকগুলো নবেলের তলায় ঠাঁই নিয়েছে।"

অণিমার সেদিনকার অকপট কথাগুলো আমাকে সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র করে রাখল। সেই প্রথমবার আমি সমস্ত হৃদয় দিয়ে তার দুর্ভাগ্যের ভারটাকে একবার অনুভব করতে চাইলুম। একজন হিন্দু নারী, বিধবা ;—তাঁর সম্মুখে রয়েছে তার প্রচণ্ড যৌবন,—বিশাল প্রতপ্ত মরুভূমির মত ;—তার চোখের সামনে জাগছে তারই বয়স্কা শত-শত রমণীর জীবনের বর্ণোজ্জ্বল ছবিটা,—ভগবান যার ওপর কোনো অভিশাপের মসী-রেখাই টেনে দেন নি। আর সে? তার জীবনে নামিয়া আসিয়াছে, এক নিষ্ঠুর অকাল-সন্ধ্যা!

বড় একটা আদর্শ মানুষকে টানতে পারে, আমি মানি ; কিন্তু সে টান চিরদিন বজায় থাকে না। সে আদর্শকে সে দেখে সম্ভ্রমের চোখে,—শ্রদ্ধায় অবনত শিরে। কিন্তু প্রতিদিনকার তুচ্ছতম জিনিসেরই প্রতি মানুষের আসল টান। তাকে দেখে সে ভালোবাসার চোখে,—বিমুগ্ধের দৃষ্টিতে। বড়কে মানুষ গ্রহণ করে বুদ্ধি দিয়ে,—আর ছোটকে প্রাণ দিয়ে।

পরদিন থেকে আমি আমার সমস্ত হৃদয় ঢেলে দিলুম, তার অশান্ত চিত্তে একটু শান্তি সেচনের আশায়। আমার সমস্ত চপলতা, সমস্ত হাসি-রঙ্গ হঠাৎ উপ্‌ছে গেল ; তার স্থলে অণিমা পেলে একটী করুণ ক্রন্দন,—একটু আন্তরিক সহমর্মিতা। আমি দেখেছি, শোকাচ্ছন্ন হৃদয় দরদী প্রাণকে চিনে ফেলে,—সে যতই মৌন হোক্ না। আমাকে অণিমা তেমনি গ্রহণ করলে। সরোজ বার-বার নাড়া দিয়ে দেখলে আমার হাসির উৎসের মুখে কোথায় পাথর-চাপা পড়েছে ; অশোক বার-বার ঠোকর দিয়ে দেখলে, তা শতগুণ করে ফিরিয়ে দিতে আমার আর আগ্রহ নেই। এমন একটা জাগ্রত বেদনাতুর হৃদয়কে দেখেও যে তারা দেখত না, এতে আমি যেমনি হতুম দুঃখিত, তেমনি হতুম রুষ্ট। একটি প্রাণের কথা ভাবতে বসে আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে, আর দুটি প্রাণ তখনো তরুণ, তখনো সবুজ।

একদিন হঠাৎ আমার হাতে একখানা ফটো দিয়ে অণিমা বললে, "এই দেখুন, আমার স্বামীর ফটো।"

আমি দেখছিলুম, বছর বাইশের একটি তরুণ যুবক,—বেতের চেয়ারে বসে, একটা পায়ের ওপর একটা পা তুলে ; পাশেই একগাছি ছড়ি ও হাতে একখানা বই। তার গায়ে ঢোলা হাতার পাঞ্জাবী ও একখানা শাদা চাদর। বেশ দেখতে। আমি আনমনে দেখছিলুম, এমন সময় অণিমা বললে, "দেখুন ত, এরূপ কোনো চেহারা আপনার মনে আসে কি না?"

আমি আশ্চর্য হলেম, কিন্তু কিছুই মনে করতে পারলুম না।

"এঁর পোষাক-পরিচ্ছদের কোনো কায়দার সাথে-ও কি আপনাদের কায়দা মেলে না?"

আমি লক্ষ্য করে বললুম, "একমাত্র চাদর জড়ানোর ধরণটি, আর পাঞ্জাবী ও চশমা—এ তিনটির সাথে একটু মিল দেখা যায়।"

অণিমা অন্য দিকে চোখ রেখেই বললে, 'মানুষ তার নিজের চেহারা ঠিক্ বুঝে উঠতে পারে না। আমার নিজের ফটো দেখলে বোধ হয় আমিও নিজেকে চিনতে পারতুম না।"

আমি তার মুখের দিকে তাকালুম ; কিন্তু সে মুখ ফিরাল না,—দেখাল, যেন এ একটা অতি সাধারণ মন্তব্য। মাথাটা নুইয়ে আমি কিছুক্ষণ তার অর্থ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করলুম। কিছুই ঠিক্ পাওয়া গেল না। চোখ তুলতেই দেখলুম, সে আমার মুখের উপর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিটি মেলে বসে আছে।

পরদিন সমস্তটা দিন আমি ভাবলুম। বিকালের দিকে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিলুম, "আমার শরীর ভালো নেই ; আজ যেতে পারব না।" সন্ধ্যা যেতে না যেতেই অশোক এসে হাজির ;—"কি হে, ব্যাপার কি? কি অসুখটা বল, দেখি, শুনি? বাড়ী ফিরতেই ত অণি বললে তোমার অসুখ।"

"না, তেমন কিছু নয়। এই কেমন একটু জ্বর-জ্বর।"

"তা স্নান-ও ত করেছ ; আর তোমার চাকরই ত অণির কাছে স্বীকার করেছে, তুমি আজ কলেজে গিয়েছিলে।"

"দুপুরের দিকেই শরীরটে খারাপ বোধ হল। প্রথম দুটো ঘণ্টামাত্র আজ ক্লাস ছিল। তাতে কোনো কষ্ট হয় নি।"

অশোক আর বেশী তাড়া দিলে না। আমি বাঁচলুম। ঘণ্টা-খানেক গল্প করে সে সকাল-সকাল বিদায় নিলে। বলে গেল, কাল কেমন থাকি যেন অতি অবশ্য জানাই। অথচ, সত্য-সত্যই সে যখন আমাকে না-যাওয়ার জন্য বেশী তাড়া দিল না, তখন বুকের ভিতর কোন জায়গায় যেন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম।

পরদিনই আমি অশোকদের বাসায় আবার গেলুম।প্রথম-প্রথম কেমন যেন একটু দ্বিধা নিয়ে যেতুঁম ; কিন্তু আলাপের ভিতর দিয়ে তা শীঘ্রই ধুয়ে-মুছে গেল।

পয়লা আষাঢ়। সেদিনকার কথা আর আমি ভুলব না। ঘটনাক্রমে কালিদাসের মেঘদূত নিয়েই তখন আমাদের আলোচনা চল্‌ছিল। সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে বাদল নাম্‌ল। ঘরের ভিতর কতক্ষণ বন্ধ থেকে ছট্‌ফট্ করে, আমি শেষটায় বেরিয়ে পড়লুম।

অণিমাদের বাড়ীতে তখন কেউ ছিল না। অশোক ও ভগবতী বাবু দুজনেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। অণিমা আমাকে ভিজে-ভিজে ঘরে ঢুকতে দেখে, চমকিত ও হৃষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। আমি স্পষ্ট দেখলুম, তার চোখের কোণে একটা বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল। আমার নিজের চোখ-ও বোধ হয় তাতে সাড়া দিয়েছিল।

"এক পেয়ালা চা আনছি এখনি" বলে সে উঠে দাঁড়াল। আমি বাধা দিয়ে বল্‌তে গেলুম, চা আমি খেয়ে এসেছি,—তবু সে চলে গেল।

মিনিট দশ পরে সে যখন চা নিয়ে ঘরে ঢুকল, তখন আমি বেশ দেখতে পেলুম, তার

সমস্ত মুখ আগুনের আভায় রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এই অনাবশ্যক কষ্টের জন্য আমার কেমন একটু লজ্জা হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনটা বেশ একটু আনন্দে দোলা খেলে।

চায়ের পেয়ালা শেষ করে আমরা মেঘদূত নিয়ে বসলুম। আমরা পড়ছিলুম, বিরহ-বিধুর অন্তরের সে আকুল ক্রন্দন,—সে উজ্জয়িনীর বাতায়নবর্তিনী পুরাঙ্গনাদের কথা,—সে অলকাপুরীর বেদনা-মথিত হৃদয়ের বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস! আমার মানস-চক্ষে ফুটে উঠ্‌ছিল, সেদিনকার ভারতবর্ষের সেই প্রসাধন,—সেই বিলাস রচনা! আমরা দেখছিলুম, সেই 'কুরুবকের মালা', সেই বঙ্কিম-চাহনি, সেই সলীল-গতি! মন্দাক্রান্তার তালে-তালে হৃদয় নেচে উঠ্‌ছিল। দুনিয়ার বুক থেকে সমস্ত মুছে গিয়ে শুধু ফুটে উঠ্‌ছিল সেই অনন্ত কালের প্রেমিক-প্রেমিকার ছবি।—তাদের প্রতীক্ষার সেই দুরু-দুরু হিয়া,—তাদের মিলনের সেই থর-থরি দেহলতা,—তাদের বিরহের সেই টল্‌-টল্‌ আঁখি!

পড়তে-পড়তে কি একটা অস্পষ্ট অভাবে আমার বুক ছাপিয়ে উঠ্‌ছিল।—আমার ব্যথাতুর স্বর কাঁদছে,—আমার কম্পমান হাত শিউরে উঠছে,—আমার ঝাপসা চোখে সবই অস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে। ওগো সেদিনকার মেঘভার! সেদিনকার বারি-ঝর-ঝর সঙ্গীত! সেদিনকার নিষুতি সন্ধ্যা! কেন তোমরা আমায় টেনেছিলে সেদিন?—

আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

"থামো" বলে কে একটা আকুল সুরে আমার মুখের কাছ থেকে বইখানাকে টান্‌ মেরে ফেলে দিয়ে হাতখানা চেপে ধরলে। আমার মুখ,--আমার সেই কোন্‌ অদেখা যক্ষের ব্যথায় বিধুর মুখ তুলে আমি দেখলুম, অণিমা আমার হাতখানাকে সজোরে ধরেছে! তার সমস্ত শরীর আমার হাতখানার উপর ঝুঁকে পড়েছে,--তার সমস্ত দেহ কাঁপছে,—চোখ দুটি অশ্রু-সায়রে পদ্মের মত ফুটে উঠছে!

"শোন, আজকের সন্ধ্যায় তোমাকে একটা কথা না বলেই আমি সোয়াস্তি পাচ্ছি না,—খুন করে ফেললে-ও আর কোনো দিন একে আবিষ্কার করতে পারতে না,—কোথা দিয়ে তুমি আমার মনের গোপন-বেদীটি জুড়ে বসেছ। বোধ হয়, তুমি অনেকটা আমার স্বামীর মতই দেখতে বলে।"

আজ আমি ঠিক বলতে পারি, তার স্বামীর চেহারার সাথে আমার চেহারার কোথাও মিল নেই,—এক কণাও না। কিন্তু আমার তখন এ কথা বিচার করার মত মানসিক অবস্থা ছিল না। অপরিসীম বিস্ময়ে আমি অবাক্‌ হয়ে গেলুম,—একবারে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম। আমার সম্বিৎ যখন ফিরে এল, তখন আমি শুধু ছোট একটি কথা বলতে পারলুম, "সে কি?"

"হাঁ, তাই," বলে সে দৃঢ় স্বরে কহিতে লাগল, "একদিন অসহ্য ঔৎসুক্যে ও-কথাটারই ইঙ্গিত করেছিলুম ; কিন্তু সেদিনই দেখেছিলুম, তোমার দুর্নিবার দ্বিধা। এ কথাটাকে আমি সে দিন থেকে শাসিয়ে, তাড়িয়ে, ঝেঁটিয়ে মনের কোণ থেকে ঝেড়ে-মুছে ফেলতে চেয়েছিলুম। কিন্তু, দেখেছি যে কথা ভুলতে চাওয়া যায়, সে কথা ভোলাই সবচেয়ে অসম্ভব। তার বদলে নিদারুণ বিধি আমার মন থেকে ধীরে-ধীরে সরিয়ে নিয়ে গেছে তারই স্মৃতির সে গন্ধটুকু,—যেটুকুকে বুকে করে আমি আমার দুস্তর যৌবনটাকেও সগর্বে পাড়ি দিতে বুক বেঁধেছিলুম।"

আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না। আমি যদি এর নিরপেক্ষ শ্রোতা হতুম, হয় ত গম্ভীর ভাবে বলতে পারতুম, 'খুবই স্বাভাবিক,' হয় ত মনে-মনে আমার তখনকার সৌভাগ্যকে ঈর্ষাও করতুম। আর আমি যদি বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতুম, হয় ত এ কাহিনী শুনে বেশ উল্লসিত হতুম,—নেচে উঠতুম,—আমার এতদিনের বন্ধ হৃদয়-কপাট খুলে

দিতুম। কিন্তু আমি তখন ছিলুম স্তম্ভিত,—ইংরেজিতে যাকে বলে stunned.

অণিমা আবার সুরু করলে, "তুমি ভাবছ, কি বলছে এ ? দেবীর আবার মানবতার ওপর লোভ কেন?—কিন্তু জেনো, আমি তোমার কাছে কোনো কিছুর প্রার্থী নই,—কোনো কিছু চেয়ে আমি তোমায় বিব্রত করব না,—শুধু আজকের এই ক্ষণিকের জন্য চাই এইটুকু, —অনন্ত-জীবন যার স্মৃতিটুকু জাগিয়ে রাখব,—শুধু এইটুকু,—"

—ধীরে-ধীরে একটু-একটু করে আমার হাতখানাকে সে তুলে নিলে,—আমি কোনো বাধা দিলুম না। তার পর অল্পে-অল্পে নুয়ে পড়ে, অতি কোমল অঙ্গুলিতে একটির পর একটি করে আমার পাঁচটি আঙ্গুল তুলে নিয়ে, অতি আদরের, অতিসঙ্কোচের, অতি মধুর পুলক-ভরা সুকোমল পরশটুকু বুলিয়ে দিলে। কি ব্যথাতুর. কি মদিরাময়, কি সশঙ্ক, সঙ্কোচ সুন্দর সেই স্পর্শটুকু! মনে হোলো, সে আমার শিরায় নিমেষ মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিলে। আমার সমস্ত চিন্তা মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল,—আমি আপাদমস্তক জ্বলে উঠ্‌লুম।

"এইটুকু" বলে সে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। খপ করে তার হাতখানা ধরে ফেলে, আমিও দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললুম, "দাঁড়াও।"

মুখ তুলে আমার চোখের উপর দৃষ্টি রেখে সে দাঁড়াল।—

"আমার কথাটা-ও তবে শুনে যাও। জানা ও অজানা ভাবে আমি তোমার চারিদিকের আব্‌হাওয়াকে ছাড়িয়ে কবে তার অন্তঃপুরের বাণীকেও যে ভালবেসে ফেলেছি,—সে কথা তেমন করে নজর করার কারণ আজকের আগে আমার ঘটে নি। কিন্তু আজ যদি হঠাৎ তোমার অন্তরের আবরণ খসে পড়ল, তবে আমারই আবরণ শুধু দম্ভ-ভরে অটুট রেখে লাভ কি?"

আমার চোখের অসম্ভব দীপ্তি বোধ হয় তার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সে চোখ নামিয়ে নিলে। আমি দেখ্‌লুম, আবেশে তার সমস্ত মুখে একটা নিদ্রার সুশ্যাম ছায়া ঘনিয়ে উঠ্‌ছে। আমি হাত ছেড়ে, গলার ওপর একখানা হাত রেখে, ধীরে-ধীরে বললুম, "শুধু চাই, একটা—"

বিদ্যুতের মত সে ত্বরিত-পদে আপনাকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে গেল। মুখ ফুটে বেরুল শুধু একটা আকুল মিনতি, "না,—না,—না।" আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দেখ্‌ছিলুম তার শঙ্কা-জড়িত বেদনা মুখের দীপ্তিকে কণামাত্রও নিবাতে পারে নি।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার চেতনা হল। আমি বাড়ী যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামলুম। নাম্‌তেই অশোকের মায়ের সাথে দেখা হল। তিনি বললেন, "এত সকালেই চললে আজ?"

আমি অন্যমনস্ক ভাবে শুধু বল্লুম, "হুঁ।"

"অশোক ত আজ জলের জন্য এখনো ফিরলে না। তাই তোমাদের গল্প জম্‌ল না বুঝি?"

"বাড়ীতেও একটু তাড়া আছে।"

"একটু সবুর কর, জলটা থামুক।"

"কালকের পড়াটা একটু শক্ত। আজই তৈরী করে রাখতে হবে।"

আর একটু পীড়াপীড়ির পর আমি চলে এলুম।

যদি বলি, সেদিনকার সমস্ত রাত্রি আমি ঘুমোই নি, তা হলে অল্পই বলা হবে।—আমি বিছানায় শুলুম না পর্যন্ত। টেবিলের ওপর ভর দিয়ে, হাত দুটোর ভিতর মাথাটা রেখে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ারে বসে রইলুম। এই মাথাটার ভিতরে হাজার রকমের ভাবনা এসে উঁকি-ঝুঁকি মারলে ; তারা সবগুলিই বিদ্রোহী, অসংযত, বিশৃঙ্খল। হঠাৎ একটা ভাবনাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য মাথা তুলতেই নজরে পড়ল, টেবিলের ওপর ব্রাউনিংএর কবিতার বইখানা। আমার শত অবসর ও শত উৎসবের প্রিয় সাথী, ওগো কবি! আজ

আমায় লক্ষ ভাবনার নাগপাশ থেকে মুক্তি দাও।

পাতা উল্টাতেই চোখে পড়ল, The Statue and the Bust—পড়লুম। একবার, দুবার, তিনবার। হে নিষ্ঠুর কবি! এ কি পরিহাস আমার সাথে? তোমার কবিতামৃত উপছে গিয়ে, চিন্তার কালকূটই কি আমার ভাগ্যে জুটল? নৈরাশ্যে আমি বইখানাকে ছুঁড়ে ফেলে, স্থির হয়ে বস্‌তে চাইলুম। কিন্তু আবার ফিরে কুড়িয়ে নিয়ে, সেই কবিতাটিই পড়লুম। কখন ভোরের আকাশ রাঙা হয়ে উঠছিল, জানি নে,—পাখীর ডাকে আমার চৈতন্য হল। বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে, আমি কাল্‌কের-পরা-জামা-গায়েই সাম্‌নের একটা স্কোয়ারে হাওয়া খেতে বেরিয়ে পড়লুম। বাসায় ফিরে এসে দেখলুম, গরম জল চাপিয়ে চাকরটা সবিস্ময়ে পথ চেপে দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। চা খেতে-খেতে বললুম, "দেখ্ আমার শরীরটা আজ ভালো নেই। কাল রাত্রিতে ঘুম হয় নি। কলেজের বেলা হলে এ চিঠিখানা কলেজে দিয়ে আসিস্। বলিস্, আমি আজ কলেজ যাব না।"

সমস্ত দিন বিছানায় শুয়ে রইলুম। যত কবির যত গল্প উপন্যাস আমার ঘরে ছিল,—একখানা-একখানা করে তুলে নিলুম, আর ফেলে দিলুম। আমার মন বসল না। আবার ব্রাউনিং খুললুম। অন্যান্য কবিতাগুলো একটির পর একটি পড়তে গেলুম ; কিন্তু আজ বহুবারের-পড়া সে কবিতা আমি বুঝতে পারলুম না। বিকাল যতই এগুতে লাগল, অতিষ্ঠতা ততই বাড়ল। একটু বেলা পড়তেই, আমি জোর করে একটা স্কোয়ারে হাওয়া খেতে যাওয়া ঠিক করলুম। দুপাক ঘুরতে-না-ঘুরতেই মনে হল, বড় বেশী লোক। কোথায় যাব, আবার ভাবতে লাগলুম। সিনেমায়? বিশ্রী সেই ছেলে-মানুষী রোমান্স। ঈডেন গার্ডেনে?—সেখানেও বড় বেশী লোক। ময়দানে?—বড় বেশী দূর এখান থেকে। কোথায় যাওয়া যায়? যে কথাটা সর্বাগ্রে জেগেছিল, তাকেই চেয়েছিলুম এড়াতে। অবশেষে সেইটেই ধীরে-ধীরে এসে উদয় হল। না, কালকের পরে আর আজকে যাওয়া চলে না। কিন্তু...তেমন abrupt কিছু বলে ঠেক্‌বে না ত অশোক প্রভৃতির কাছে? তার চেয়ে যাওয়া যাক প্রতিদিনের মত। অবিশ্যি যত শীঘ্র পারি উঠে পড়ব।

একেবারে সরাসরি অণিমাদের পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। দেখলুম, অণিমা বই কোলে করে বসে আছে। একটু বিপন্ন হয়ে যতদূর সম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললুম, "অশোক কোথা?"

"বাড়ী নেই।"

সে কথা শুনবার আগেই কখন আমি বসে পড়েছিলুম। তখন-তখনই উঠতে কেমন বাধ বাধ ঠেকল। আমি একটা জানালা দিয়ে পথের দিকে চেয়ে রইলুম। অণিমা কিছুই বলল না, বই-এর ওপর চোখ দুটি রেখে চুপ করে বসে রইল।

দু' হাত মাত্র ব্যবধান! তবু আমারা কেউ নড়্‌লুম না,—কেউ একটি ছোট কথাও বললুম না। দুজনে দুদিকে চেয়ে বসে রইলুম। আমাদের দৃষ্টি পর্যন্ত মিলল না। অথচ দুজনেই বুঝলুম, দৃষ্টি আমাদের যতই না পরস্পরকে এড়িয়ে চলুক, হৃদয় আমাদের সমতালে নাচছে,—দুজনেরই অস্ফুট বেদনা একই ভাষাহীন সুরে গাঁথা। কথা কইলুম না—তার নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত আঘ্রাণ পেলুম না,—তবু আমার হৃদয় অপার আনন্দে ভরে উঠ্‌ল। মনে হল, এই ভালো এই ভালো।

কোথা দিয়ে বিকাল নিঃশেষ হয়েছিল দেখি নি। সন্ধ্যার আঁধার জমে উঠ্‌ছিল। পূবের একটা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরটাকে একটু আলোকিত করে তুলল। তবু আমাদের হুঁশ হল না। বিকালের বেড়ানোর পালা সেরে ফিরতে, হঠাৎ ভগবতী বাবুর গলা শোনা গেল, "তাই ত রে, এ ঘরটাতে আজ যে এখনো আলো দেওয়া হয় নি।"

দ্রুতপদে অণিমা ঘর ছেড়ে বাহির হয়ে গেল। সেই মুহূর্তেই ভগবতী বাবুর ডাক শোনা

গেল, "কিরে, আজ যে ঘরে আলো দিস্ নি? পড়ছিস্ নে যে? নীরেন আসে নি বুঝি?"

"এখনই আলো নিয়ে আসছি, বাবা," বলে তাড়াতাড়ি আলো জ্বালাতে বেরিয়ে গেল। সে আলো নিয়ে ঘরে ফিরবার একটু পরেই, ভগবতী বাবু-ও ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বললেন, "হ্যালো, আজ যে আমায় দুপুরে গীতা পড়ে শোনালি নে?—এই যে নীরেন! কখন এলে?"

আমি হাসি টেনে বললুম,—"এই, এক মিনিটও হয় নি।"

আমার হাসি তাঁর চোখে ধরা পড়ে গেল। "সে কি! তোমার মুখ বড় শুক্‌নো-শুক্‌নো দেখাচ্ছে যে? কোনো অসুখ-বিসুখ করে নি ত?"

"সে কথা বল্‌তেই ত আজ এসেছি। আমার শরীরটা কলকাতা এসে অবধিই ভালো নেই,—রাত্রিতে-রাত্রিতে একটু-একটু জ্বর-ও হয়। ডাক্তার বললেন, একটু চেঞ্জে যেতে। তাই এসেছি সবার সাথে দেখা করতে।"

উৎকণ্ঠিতচিত্তে বৃদ্ধ আমায় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আমি জানালুম, কালই যাচ্ছি, আপাতত একমাসের ছুটীতে পুরী। অণিমা আমার মুখের দিকে ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাল। আমি শুধু শাদা চোখ দুটি দিয়ে অনায়াস দৃষ্টিতে তার জবাব দিলুম। একটু পরেই আমি বললুম, "তা হলে এখন আমি উঠি। কালই যাব, সমস্ত গুছিয়ে নিতে হবে।"

অণিমা বল্লে, "কিন্তু, দাদার সাথে দেখা করে গেলে না?"

"কাল তাকে আমার ওখানে যেতে বলো," বলে আমি বাড়ীর আর সবার সাথে দেখা করতে গেলুম। অশোকের মা বললেন, "কাল দুপুরের দিকে একবার না হয় এসো, বাবা।" আমি দেখলুম, অণিমার চোখে মিনতি ফুটে উঠেছে।

"সময় পেলে আসব," বলে আমি নমস্কার করে বিদায় নিলুম। তাঁরা দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে এসে আমায় বিদায় দিলেন। রাস্তার একটা গ্যাস-পোস্টের অস্পষ্ট আলোকে-ও আমি দেখতে পেলুম, অণিমার চোখ দুটি তেমনি আমার ওপর তখনো বদ্ধ রয়েছে। আমি ঠিক্ জানি, সে চোখে যেমনি ছিল বেদনা, তেমনি ছিল তাকে জয় করবার একটা দৃঢ় সঙ্কল্প। একটু পরেই যে চোখের পাতা সিক্ত হয়ে উঠেছিল, হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে বান ডেকেছিল, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ; কেন না আমার পুরুষের দৃঢ় হৃদয়টাই তখন টলে গলে যাচ্ছিল।

কলেজে বলে-কয়ে এক মাসের ছুটী নিলুম। সন্ধ্যা-বেলা পুরী এক্সপ্রেস্ ধরবার জন্যে যখন গাড়ীতে অশোকদের বাসা পেরিয়ে যাচ্ছিলুম, তখন জানি নে, কেমন করে আমার বুভুক্ষু চোখ দুটোকে একেবারে দোতলার বারান্দায় চালিয়ে দিলুম ;—জানি নে কেন, গাড়ী থেকে মুখ বার করে গাড়োয়ান্‌কে তাড়াতাড়ি চালাবার হুকুম দিয়ে, সেই বারান্দার দিকেই একভাবে চেয়ে রইলুম। সে কি সেই ম্লান আঁধারে দণ্ডায়মানা নিভৃত নারীমূর্তির কাছে বিদায় মেগে?—তবে বিকালে একবার সে বাড়ীতে গেলেই ত হ'ত?

এক মাসের ছুটী তিন মাসে বাড়িয়েও আর কলকাতায় ফিরলুম না। বাংলার বাহিরে একটা কলেজে আমি চাকুরী নিয়ে চলে গেলুম। কিন্তু শান্তি আমি পেলুম না। সেই পয়লা আষাঢ়ের একটা সন্ধ্যা!—তারই ছায়া আমার পিছনে পিছনে এ ক'বছর ধরে দিবা-নিশি ঘুরছে। জীবনে আর আমি মেঘদূত ছুঁই নি। আমি হাজার বারের উপর The Statue and the Bust পড়েছি।—কিন্তু, কোনো কূল-কিনারা পাই নি। আমার জীবনের যত কিছু অনাবশ্যক আনন্দ-উল্লাস ছিল, কবে তা ধীরে-ধীরে ঝরে গেল ; আমার বিরস চিন্তাক্লিষ্ট মুখ কত বন্ধুদের ব্যথিত বিরক্ত করে তুলল ; আমার অবিবাহিত এ জীবন কত জনের ব্যঙ্গের, সন্দেহের, কৃপার বস্তু হয়ে দাঁড়াল।

সাত বছরের ভাবনার শেষে মনে হচ্ছে একটা সত্যের খোঁজ আমি পেয়েছি। তাই আমি

আজ এ কথা সকলকে জানাতে চাই।—আমার সন্দেহের সমাধান হয়েছে। সেদিনকার ত্যাগের মধ্যে আমার ছিল না কিছু মাত্র দ্বিধা, কিছুমাত্র ভীরুতা, কিছুমাত্র মিথ্যাচার। আমি আজ বুঝেছি, আমি তাকে ছেড়েছি নিবিড়তর করে পাওয়ার জন্য। চিরজীবনের জন্য আমাদের জীবন গাঁথা হলে, হয় ত কবে সংসারের ঘূর্ণী বায়ুতে পড়ে আমরা দুজন দুজনার কাছ থেকে ছিট্‌কে যেতুম ; হয় ত তার মন্থনে আমাদের ভাগ্যে উঠত গরল ; হয় ত আমাদের এই অদেখা হৃদয়ের বাঁধন হয়ে উঠত ফাঁসির দড়ি।—আজও সেদিনকার শুভ-মুহূর্তটির কথা মনে পড়তেই, আমার আঙ্গুল পাঁচটি গর্বে, সোহাগে, আনন্দে নেচে ওঠে,—আমার সমস্ত বাহু স্ফুরিত হয়, আমার সমস্ত মন একটি অতি মধুর, অতি তীব্র, অথচ অতি সুন্দর আনন্দে ভিজে উঠে। কিন্তু সেই পুণ্যক্ষণের জের টানবার লালসায় যদি আমি বসে থাকতুম, তবে সেই অতি-বাঞ্ছিত, চির-সুকুমার স্পর্শটি হয়ে উঠত তুচ্ছ, মামুলি, মধুহীন।

The Statue and the Bust খুব ভালো। কিন্তু তারও চেয়েও ভালো The Last Ride Together—সেই, 'জীবনে যত পূজা হল না সারা'র গান। অলকাপুরীর যক্ষকে আমি জানি নে ; হয় ত অভিশাপ-শেষে কুবেরের ধন আগলাতেই তার সময় যেত। কিন্তু শিপ্রার তীরের সেই বেদনাতুর হৃদয় আমার ঢের বেশী প্রিয়, আমার ঢের বেশী আপনার। তাকেই আমি করি প্রণতি।

—বঙ্কিম মুখ তুলে আমাদের দিকে চাইল।

শ্রাবণ ১৩২৯

ছি ছি

প্রবোধকুমার সান্যাল

পাড়া গাঁ নয়—শুধু পাড়া ; শহরের কাছেই। 'ডেলি প্যাসেঞ্জারে'র কৃপায় টাট্‌কা খবর রেলে চড়িয়া আসে। আবহাওয়াটা এমনিই।

ব্যাপারটা যে শোনে সেই ছি ছি করে। তা তলাইয়া কেহ বুঝুক আর নাই বুঝুক।

ঘটনাটা পাড়ার মধ্যেই। কে একটা ছোকরা নাকি একটি মেয়েকে লইয়া কলাবাগানের সেই ভাঙ্গা বাড়ীটা আশ্রয় করিয়াছে। মেয়েটীর মাথায় সিঁদুর নাই কিন্তু নীলাম্বরী পরে।

অনেকে কানাকানি করিয়া বলিল—দেখেছি হে, ছোঁড়াটাকে কলকাতার শহরে ঘুরতে দেখেছি—ওই আমাদের আফিস-পাড়ায়।

একজন বলিল—আমিও যেন দেখলাম একদিন ; স্বদিশী-স্বদিশী ভাব,—লক্ষ্মীছাড়া চেহারা—রুক্ষ!

একটা মানুষকে ঘিরিয়া এমনি আন্দোলন চলে।

কিন্তু ওই পর্যন্তই।

খবরটা মেজ বৌও শুনিল। তার মন্তব্য শুনিবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। লেখা-পড়া-জানা মেয়ে।

বলিল—এত বড় আস্পর্দ্ধা! এই পাড়ায় সকলের মাঝখানে এসে একটা বিধবাকে নিয়ে—শাস্তির ভয় নেই? অপমানের ভয় নেই?

সে যেন সমাজ-রীতির জ্বলন্ত শিখা!

ভাসুর-পো থাকে পাশের ঘরে। নাম ভানু। আজ বিশ বছর কি একটা রোগে পঙ্গু হইয়া আছে। সেও বসিয়া বসিয়া বাহিরে আসিয়া বলিয়া গেল—রোগটা যদি আমার না হত, দেখে নিতাম বেটাকে।

সে মনে করে, রুগ্ন না হইলে সে পৃথিবী জয় করিতে পারিত।

আলো জ্বালিয়া, সন্ধ্যা দিয়া মেজ বৌ তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়া বলিল—সুবোধ জেগে আছিস্—সুবোধ?

সুবোধ বিছানায় শুইয়া ছিল। বলিল—কেন?

তুই কি কেবলই ঘুমুবি? ঘুম ভিন্ন কাজ নেই তোর?

না। কি বলচিস্—বল্ না?

বাহিরে তখনও গোলমাল মিটে নাই। সেই দিকে তাকাইয়া সুবোধ আবার বলিল—ব্যাপার কি রে চন্দ্রা?

চন্দ্রা তাহার প্রায় সমবয়সী বৈমাত্রেয় বড় বোন। কখনও নাম ধরে—কখনও বা দিদি বলে। মা-বাপ নাই। বোনের শ্বশুরবাড়ী ভাই আসিয়াছিল কালীপূজা বাবদে—আর যায় নাই। কোথাও গেলে সে আর নড়িতে চায় না। যেখানে সেখানে গিয়া থাকিতে তাহার লজ্জা করে।

চন্দ্রা বলিল—দ্যাখ্ না বাইরে গিয়ে। ঘরের বাইরে এত বড় পৃথিবীতে কি তোর কোনও কাজই নেই?

উঠিয়া আসিয়া সুবোধ কহিল—কি, হল কি?

চন্দ্রা তাহাকে সব খুলিয়া বলিল। সুবোধ কহিল—ভারি অন্যায় ত।

চন্দ্রা কহিল—এত বড় সাহস কার? এই বামুন-পণ্ডিতের পাড়ায়,—একবার দেখে আয় ত। সব ঠিক ঠিক বলবি কিন্তু।

সুবোধ কহিল—সে যদি তার স্ত্রীই হয়?

স্ত্রী হলে ক্ষেতি নেই—কিন্তু বিধবা-স্ত্রী হবে কোন্ সাহসে? যা তুই একবার।

জামা কাপড় পরাইয়া ঠেলিয়া ঠুলিয়া চন্দ্রা সুবোধকে বাহিরে পাঠাইল।

ঘণ্টাখানেক বাদে সুবোধ ফিরিয়া দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রা তাহারই অপেক্ষায় আলো জ্বালিয়া বসিয়া ছিল। গলা বাড়াইয়া বলিল—আড়ালে কেন? সুমুখে আয়।

অপরাধীর মত সুবোধ সরিয়া আসিল।

কি হল,—যা শুনলাম—সত্যি?

হল না।

হল না কি? যাস্ নি বুঝি? এমন ভীতু—এমন লাজুক তুই?—এতক্ষণকার রাগটা সুবোধের উপরেই পড়িল,—মানুষের সাম্‌নে গিয়ে কি কোন দিন দাঁড়াতে শিখবি নে? ঘরই চিনেচিস শুধু মেয়েদের মতন?

সুবোধ বলিল—গেলাম ত।

কদ্দূর? গিয়ে আবার ফির্‌লি কেন?

বিছানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সুবোধ বলিয়া উঠিল—কি বলতে হবে শিখিয়ে দিয়েছিলি তুই যাবার সময়?

ও হরি! এই তোমার ইংরিজি লেখা-পড়া শেখা?

কথায় কথায় শিক্ষা-দীক্ষা এবং পুরুষের পৌরুষকে খাটো করা চন্দ্রার একটা কাজ ছিল।

সুবোধ বেচারা ফাঁপরে পড়িয়া গেল। না পারে কথা কহিতে—না পারে ঘরের বাহির হইতে। দুনিয়ার যে দিকটায় কোলাহল, ও যেন তার আড়ালে থাকিতে চায়।

শুধু তাই নয়। মানুষের যে-কোনও একটা অন্যায় দেখিলেই তাহার লজ্জা করে। ও-পাড়ায় কে বিধবাকে লইয়া ঘর করিতেছে,—তাহার লজ্জার একশেষ! সেদিন শহর হইতে ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছিল,—লজ্জায় সুবোধ দুই দিন মুখ দেখায় নাই।

চন্দ্রা এক সময় ডাকিয়া বলিল—সারাদিনই যে তোর কুম্‌ড়োর মাচা নিয়ে কেটে গেল রে? বাড়ী ঢুক্‌বি নে?

ঘরের পাশেই ছোট্ট বাগান। সেখান হইতে মুখ তুলিয়া সুবোধ কহিল—কেন রে?

নন্দর বৌ তোকে ডাকছিলো একবার।

আমাকে?

হ্যাঁ। ওই যে তার একখানা চিঠিতে ঠিকানাটা লিখে দেবার জন্যে। দ্যাখ্ না—হয়ত বাইরে এখনও বসে আছে।

সুবোধ লুকাইয়া ভিতরে আসিয়া ঢুকিল। বলিল—না—না, তুই বল্‌গে যা ভাই, বল্ আমি ঘুমুচ্ছি। ও-সব আমি পারি না—লজ্জা করে।

তার নিজের ঘরটিই পৃথিবী ; আর সব অন্ধকার!

চন্দ্রা চুপ করিয়া রহিল। সুবোধ ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ সেদিনকার কথাটা পাড়িল। বলিল—আমিও ভাবচি, এত বড় অন্যায়টা কি চেপে যাওয়া উচিত? ও-সব লোককে আস্কারা দেওয়া—তুই-ই বল্ না দিদি?

চন্দ্রা কহিল—তোর এ সব কথায় থাকবার দরকার নেই।

না, তাই বলচি, তুই সেদিন বলছিলি কি না ; আর আমিও ভেবে দেখলাম, উঃ কি

অন্যায়! ইচ্ছে করে ওর মাথাটা গুঁড়িয়ে দিই।—বলিয়া সে বিছানায় গিয়া ঢুকিল।

চন্দ্রা বলিল—কার মাথা?

ওই হতভাগা,—ওই যার বৌ বিধবা?

কেন? কিই-বা দোষ করেছে সে? দুজনের সুখ-শান্তির জন্যে বিয়ে যদি তাদের হয়েই থাকে,—অন্যায়টা কি?

অন্যায় নয়? খুব অন্যায়, একশো বার—হঠাৎ দিদির মুখের দিকে চাহিয়া সুবোধ বলিয়া উঠিল—আচ্ছা, না হয় ধরে নেওয়া গেল—

কিন্তু কথা বাড়াইতে আর তাহার সাহস হইল না। ফস্ করিয়া বিছানা ছাড়িয়া সে ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

শহরের রাস্তাটা সটান্ সিধা গিয়াছে। তাহারই এক পাশ দিয়া সুবোধ এম্‌নি খানিকটা চলিতেছিল। সে এমন যায় প্রায় রোজই। বেশি দূর যায় না—খানিকটা ঘুরিয়া ঘরে আসিয়া ঢোকে। লোকের ভিড় দেখিলে তাহার মাথা গোলমাল হইয়া যায়।

ফিরিবার মুখে নজরে পড়িল, একটি লোক ছোট একটি মুদির দোকানের সুমুখে দাঁড়াইয়া জামার পকেট হাতড়াইতেছে।

পুরুষ মানুষের এমন অপরূপ সুন্দর চেহারা সুবোধ আর কখনও দেখে নাই। সৌন্দর্যের পুঞ্জ পুঞ্জ ঐশ্বর্য—এ যেন বিধাতার দান নয়,—তাঁহার সৌন্দর্যের ভাণ্ডারে এ যেন ডাকাতি।

হাতের ইসারা করিয়া লোকটা হঠাৎ সুবোধকে ডাকিল। সে ডাক উপেক্ষা করিবার নয়।

কাছে গিয়া সুবোধ কহিল—কি বলচেন?

আনা চারেক পয়সা দিতে পারো?

চার আনা! আনা দুই আছে—নেবেন?

দোকানি অবাক্ হইয়া চাহিয়া ছিল। লোকটি বলিল—চাল কি না ; কিন্তু—এত কম পয়সায়, আচ্ছা দাও, দু আনাই দাও—সিগারেট কেনা আর হবে না দেখছি।

সুবোধ পয়সা বাহির করিয়া দিল। সবচেয়ে মূল্যবান যদি কোনও বস্তু তাহার নিকট থাকিত, তৎক্ষণাৎ সে বাহির করিয়া দিত।

লোকটা হাসিতে হাসিতে পান সিগারেট কিনিতে লাগিল। সুবোধ পিছনে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতেছিল।

পরণে এই শীতের দিনে একটি ছেঁড়া খদ্দরের পাঞ্জাবি ময়লা একখানি বিলাতী কাপড়। রুক্ষ মাথায় একমাথা ঝাঁক্‌ড়া-ঝাঁক্‌ড়া চুল। খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাড়ি। গায়ে এক পরদা ময়লা। ছেঁড়া জুতার ফাঁক দিয়া পায়ের আঙুল বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। তবুও তাহার সেই জ্যোতিষ্মান দেহে কোথাও রূপের কার্পণ্য নাই।

সিগারেট ধরাইয়া সে বলিল—দেবো আর একদিন তোমার পয়সা দু আনা। এ রাস্তায় আবার দেখতে পাবো ত?—আসি।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে হেলিয়া দুলিয়া চলিতে সুরু করিল।

সুবোধেরও ওই পথ—।

অনেকদূর পর্যন্ত লোকটি নিজের মনেই চলিতে লাগিল, একবার পিছন ফিরিয়াও চাহিল না।

সুবোধের মনে হইতে লাগিল, লোকটির চলনের ভঙ্গীটিতেও যেন একটা চুম্বক আছে।

ক্রমে রাস্তা জনশূন্য হইয়া আসিল। সঙ্কীর্ণ রাস্তার দুইধারে গাছের ছায়ায় ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দুজনেরই পায়ের শব্দ হয়।

লোকটি হঠাৎ পিছন ফিরিল। সুবোধকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—তুমিই না দু আনা

পয়সা দিলে একটু আগে?

সুবোধের কথা বাহির হইল না। মুখ তুলিয়া বোকার মত চাহিল।

তুমিই বটে!—লোকটি হাসিয়া আবার বলিল—পুলিশের গোয়েন্দা হলে এ সময় অন্তত বেশ কায়দা করে একটা জবাব দিত।—তাদের ঠেঙে এমন অনেক পয়সা নিয়েছি কি না। আর তাছাড়া ভুলে যাওয়াই বা আশ্চর্য কি! এমনিই হয়। সেই মুদির দোকানের সুমুখে যদি কোন দিন তোমাকে দেখতাম তবেই মনে পড়ত ; সেইখানেই তুমি একান্ত ; আর নৈলে মানুষের স্রোতে মিশে গেলে,—তখন তোমার কোনও পরিচয় নেই।

সুবোধ সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। লোকটি যেন এক মুহূর্তে তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়া আপনার মনে বলিতে লাগিল—আজ তুমি যে আমার একটুখানি উপকার করলে, এর জন্যে কোন দিন গর্ব করো না ভাই। এ তোমার গৌরব! আজ তুমি ধন্য হয়ে গেলে!

সুবোধ যেন তাহার কথাগুলি গিলিতে লাগিল। মুখে কহিল—কোন্ দিকে যাবেন?

মুখ বিকৃত করিয়া লোকটা সহসা বলিল—ছি ছি, এই তোমার কথা? কোন্ দিকে যাবো, আমরা কে, কি নাম আমাদের, কি করি—এ সব প্রশ্ন কেন মনে আসে? আমরা আছি—শুধু এইটুকু জেনে রেখো।—চললাম।

গলির একটা বাঁকে মোড় ফিরিয়া সে চলিতে লাগিল।

সুবোধ কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর গলা বাড়াইয়া বলিল—কাল আবার দেখা হবে কি?

অন্ধকারে লোকটা গলার শব্দ করিয়া হাসিল। কহিল—হবে বৈ কি! পয়সা দু আনা দিয়ে তুমি যে আমায় কিনে রাখলে!

সুবোধের মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল।

খানিকদূর গিয়াছে—পিছন হইতে লোকটি আবার আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিল। সুবোধ বিমূঢ়ের মত বলিল—এ কি...আবার আপনি...?

লোকটি কহিল—মানুষকে আঘাত দিতে ভাল লাগে ; কিন্তু চোখেও আবার জল আসে—দেখবে?

অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই লোকটা তাহার বড় বড় দুইটা চোখে স্পষ্ট হু হু করিয়া জল আনিয়া ফেলিল। তার পর বলিল—তোমার যখন ইচ্ছে এস, ওই কলাবাগানে—

কলাবাগানে! কোন্ বাড়ী?

সে হাসিয়া বলিল—ওই ত একটিই বাড়ী ভাই কলাবাগানে..কখন্ হুড়মুড় করে পড়ে। এক দিকে শেয়াল-কুকুরের বাস, আর এক দিকে—তোমার চমকাবার কারণ আমি জানি।—বলিতে বলিতে লোকটা আবার গলির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ব্যাপারটা কিন্তু হজম করা শক্ত। বিশেষত চন্দ্রার পক্ষে।

কিন্তু এ যুগে প্রতিপক্ষে দাঁড়াইবার মত কেই বা আছে। তবু এর গুরুত্বটা চন্দ্রাই যেন বেশি করিয়া নিজের ঘাড়ে লইল।

দেবর ও ভাসুরের চার পাঁচটি ছেলে-পুলে। কেহ স্কুলে, কেহ-বা কলেজে পড়ে। যে ছেলেটি এবার বি-এ পরীক্ষা দিবে, সে কহিল—ননসেন্স! ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যুগে এসব তোমার কি রকম কথা, মেজখুড়ি?

চন্দ্রা রাগে ফুলিতে লাগিল ; কিন্তু ছেলেরা তাহার সমবয়সী,—কিই-বা বলা যায়!

বন্ধ ঘরের জানলায় মুখ বাড়াইয়া ভানু সবই দেখিতেছিল ; এবার হাতের উপর ভর দিয়া কোনও রকমে বাহিরে আসিয়া বলিল—খুড়িমা, আপনি আমার মায়ের মতন—মার চেয়েও বেশি—আমি যদি ভাল থাকতাম তাহলে দেখতেন—দেখতেন তাহলে ওর ওই

সাহসের কত বড় শাস্তি—শাস্তি দিতাম। কি বলব—কি বলব খুড়িমা, আপনার ওই সোনার মুখখানিতে আমি—আমি হাসি ফুটিয়ে দিতাম। কিন্তু—

সেই অকর্মণ্য, পঙ্গু, পরিত্যক্ত, ত্রিশ বছরের জোয়ান ছেলেটি অকস্মাৎ ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

চন্দ্রার চোখেও হয় ত তখন জল দেখা দিয়াছে। কাছে আসিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল—দীর্ঘজীবী হও বাবা, তুমিই আমার মান রাখলে।

সেই কদাকার, শীর্ণ, অশ্রুসিক্ত মুখখানা তুলিয়া হঠাৎ ভানু বলিল—কি বললে?

চন্দ্রা চুপ।

হাতের উপর ভর দিয়া কোনওরূপে ভানু আবার ঘরের ভিতর গেল। ভিতর হইতে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। তার পর দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া, চীৎকার করিয়া, কাঁদিয়া, মাথার চুল ছিঁড়িয়া বলিয়া উঠিল—তুমি আমায় দীর্ঘজীবী হতে বল? আমায় কেন মারলে না, কেন খুন—খুন করলে না ; ও কথা—ও কথা কেন বললে তুমি?

তার সে ভীষণ চীৎকার আর কান্না! দেহের শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া তাহার বন্দী নিপীড়িত আত্মা যেন বাহিরে আসিয়া মাথা কুটিতে চায়।

কিসে কি হইল। এক মুহূর্তে বাড়ীর মধ্যে যেন কি একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

সুবোধের সব কিছু একেবারে বিশৃঙ্খল! এ যেন কোথাকার একটা ঝড়ো হাওয়া আসিয়া তাহার সব ওলোট পালট করিয়া দিল।

দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি—সব যেন নিতান্ত একঘেয়ে। চন্‌মন্‌ করিয়া শুধু শুধু এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। সেদিন সন্ধ্যাবেলা ধরা পড়িয়া গেল।

গলার আওয়াজে পিছন ফিরিয়া দেখিল, লোকটি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। কাছে আসিয়া বলিল—চলে যাচ্ছ যে? লজ্জা কেন অত?

না, লজ্জা আর কি!

সে কহিল—তোমার বৌদি ডাকচেন তোমাকে।

বৌদি! আমার বৌদি ত নেই!

আছে বৈ কি! এত বড় পৃথিবীতে খুঁজে পেতে দেখলে এক-আধটা বৌদিও কি মেলে না?—বলিয়া সুবোধের হাত ধরিয়া বলিল—একটা দাদাও মিলে যেতে পারে—এস।

কাঁধের উপর হাত রাখিয়া সুবোধকে সে লইয়া গেল।

লোকটাকে ভালও লাগে—আবার ভয়ও করে।

কলাবাগানের সেই বাড়ী। বাহিরের অন্ধকার নোংরা কুটুরিগুলা পার হইয়া সে কহিল—এই সিঁড়ি, দেখতে পেয়েছ? খুব সাবধানে ভাই, ডানদিকে দেয়াল ঘেঁষে—ইয়া।

কোনও রকমে দুইজনে উপরে উঠিল! সুবোধের গা ছম্‌ছম্‌ করিতেছিল। অপরিচিত কোনও লোকের বাড়ী তাহার এই প্রথম প্রবেশ।

আসনের বালাই নেই ভাই, মাটিতেই যা'হ'ক করে—দেখো, জল প্যাচ প্যাচ কচ্ছে, জামাটা যেন তোমার,—হাসিয়া আবার বলিল—মানুষকে সাবধান করবার মত মুদ্রাদোষ আমার নেই। তবে পরিচয়টা প্রথম কি না, তাই একটুখানি—

যা'হ'ক করিয়া সুবোধ সেইখানেই বসিল। এলোমেলো কতকগুলো বই, খবরের কাগজ সেখানে ছড়ানো। অনেকগুলি বইএর ইংরাজি হরপ, কিন্তু ভাষা তাহাদের ইংরাজি নয়।

সুবোধ চাহিয়া চাহিয়া বলিল—এ-সব পড়ছেন আপনি!

শুধু পড়েছি, পড়ে জেল খেটেছি।

জেল খেটেছেন? কেন?

লোকটা শুধু হাসে। হেসে বলে—ইংরাজ রাজত্বে কি আর 'কেন'র উত্তর পাওয়া যায়?

আগাগোড়া অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হইতেই সুবোধ উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিল। এ অন্ধকারে পলাইবার কোনও উপায় নাই। পথ দেখাইয়া না দিলে সমস্ত রাত্রির চেষ্টাতেও হয় ত সে এখান হইতে বাহির হইতে পারিবে না। চীৎকার করিলেও কেলেঙ্কারী।

মুখে বলিল—খুব ত আপনি?

লোকটা আবার হাসিতে থাকে। তাহার এই নিরর্থক হাসি, এই অন্ধকার, ওই মিট্‌মিটে আলো, চারিদিকের অবরুদ্ধ নোংরা গন্ধ, সমস্ত মিলিয়া সুবোধকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

হঠাৎ সে কহিল—যাই এবার। দিদি আবার এর পর—

তবে এসেছিলে কেন? বৌদির প্রতি লোভটা খুব প্রবল হয়েছিল বুঝি?

উক্তিটা একেবারে লজ্জাহীন। সুবোধের কান দুইটা ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল। কিন্তু সে মৃদুকণ্ঠে কহিল—ঘর থেকে বেরোনো আমার অভ্যেস নেই কি না, তাই। তাছাড়া, দিদি আমাকে কোন দিন—

দিদি-ময় যে! বলি, পুরুষ মানুষ ত? না কি বিধাতা ভুল করেছিলেন, শোধরাবার সময় পান নি—বল না হে?

এই অপমানকর প্রশ্নের আর কি-ই বা উত্তর দেওয়া যায়।

বেশ একটা রোমান্সের আঁচ্‌ পেয়েছিলে—না? দুনিয়ার আড়ালে থাকি, ভবঘুরে লোক, বিধবাকে নিয়ে ঘর করি,—বেশ লাগছিল তোমার—নয়? কিন্তু তোমার দিদিই যে সব মাটি করে দিচ্ছেন ; এমন রাজযোটক অবস্থাটার প্রতি তাঁকে একটু কৃপা-দৃষ্টি দিতে ব'লো—বুঝলে?

সুবোধ কহিল—আপনি জানলেন কি করে যে দিদি আপনার বিরুদ্ধে—?

সে হাসিয়া বলিল—মানুষ চেনার কাজেই এই তিরিশটা বছর কাটিয়ে দিলাম। তোমার চেয়ে তোমার দিদিকেই যে বেশি চিনি হে। ভেতর ভেতর তাঁর ক্রিয়া-কলাপ—

আপনি কি তাঁকে দেখেছেন?

দেখলে কি আর চিনতাম? ওদের যে না দেখেই স্পষ্ট চেনা যায়। অমন অনেক দিদির কবল থেকে যে মুক্ত হয়ে এসেছি,—বলিতে বলিতে হঠাৎ ভিতরের দিকে চাহিয়া সে পুনরায় বলিল—কি বল মলিনা, আমার চেয়ে তোমার হাড়ে তাদের পরিচয়টা একটু বেশিই ঠোকাঠুকি হয়েছিল—না?

মলিনা!

কিন্তু যাহার উদ্দেশে প্রশ্ন—সে সম্পূর্ণ নিরুত্তর।

আড় হইয়া সে শুইয়া পড়িল।

বইগুলি সুমুখে পড়িয়া রহিল ; আলো জ্বলিতে লাগিল। চোখ বুজিয়া সে ডাকিল—সুবোধ?

সুবোধ কহিল—আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?

এ-কথার উত্তর সে দিল না। চোখ বুজিয়াই হাসিয়া সে কহিল—তোমার দিদি আমাদের দেখতে পারে না—না?

সুবোধ চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পূর্বে চন্দ্রার প্রতি সেই শ্লেষটা তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল।

জড়িত কণ্ঠে লোকটি আবার কহিল—আচ্ছা সুবোধ, এমনও ত হতে পারে, এতক্ষণ তোমায় যা বলেছি সে সব আমার ভেতরের কথা নয়।

সুবোধ মনে মনে পথ হারাইয়া গেল। বিভ্রান্তের মত এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল—এবার আমি যাই—কেমন?

যাবে? তা যাও।—সে যেন ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল—ঝড়ের রাতে আমার আকাশে তোমরা এমনি করে এক একবার জ্বলে উঠেছ, আবার ঠিক এমনি করেই মিলিয়ে গেছ! এ জীবনে শুধু দুহাতে অন্ধকারই ঠেলে চললাম!

সুবোধ ততক্ষণে উঠিয়া সিঁড়ির কাছে আসিয়াছে। লোকটি অকস্মাৎ উঠিয়া বসিয়া কহিল—দিদিকে তোমার ব'লো, তার ওপর আমার ভক্তি দিন দিন,—এমনি একটা কিছু ব'লো—বুঝলে?

আবার সে আড় হইয়া শুইল।

নেশাখোর!

সেই বীভৎস অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া সুবোধ নামিয়া আসিল। ইতিমধ্যে দুইবার মাথা ঠুকিয়া গেছে। কোন্ দিকে যাইবে তাহার ঠিক পাইতেছিল না। সহসা দেখিতে পাইল, উপরের পাঁচিলের পাশ দিয়া তাহার পথের প্রতি কে আলো বাড়াইয়া ধরিয়াছে।

সুবোধ কিন্তু চোখ আর নামাইতে পারিল না।

সুগোল সুন্দর একখানি নারীর হাত! চিক্‌চিকে একগাছি চুড়ি আঁটা। কিন্তু সেই অপরূপ হাতখানির অধিকারিণী আড়ালেই রহিয়া গেল। সুবোধ দুতিনবার ঢোঁক গিলিয়া ফেলিল।

তার পরই কখন্ চোখে ধাঁধাঁ লাগাইয়া আলোটি সরিয়া গেল।

অন্ধকার...

অতি কষ্টে সুবোধ পথ দেখিয়া রাস্তায় নামিয়া আসিল।

পলাইয়া আসিয়াও স্বস্তি নাই। চকিত দৃষ্টি আর সাগ্রহ মন ওইদিকে উন্মুখ হইয়া থাকে,—কম্পাসের কাঁটার মত!

খানিকক্ষণ রাস্তায় ঘোরাঘুরি করিল। কেহ আর দেখিতে পায় না।

শেষে সাহস করিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া ডাকিল—দাদা আছেন?

ভিতরে কোথায় কিসের শব্দ হইতেছিল। তবুও তাহার মৃদু কণ্ঠস্বর শুনিয়া দাদা ডাকিল—এস সুবোধ!

তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া দাদার সেই ঘরের কাছে আসিয়াই চট্ করিয়া সুবোধ থমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

মেয়েটি পলাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দাদা তাহাকে যাইতে দিবে না।—

এস হে, ভেতরে এস। লজ্জা কি! একটি বৌদি মিলিয়ে দেবার কথা ছিল যে তোমার সঙ্গে।

লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া সুবোধ ভিতরে গিয়া বসিল। দাদা কহিল—তোমারই নাম কচ্ছিলাম এতক্ষণ! কদিন আর দেখা নেই কেন? আমার সঙ্গে এত অল্প পরিচয় হয়েই কেউ যে আমার নেশা কাটিয়ে উঠতে পারে, এমন লোক ত আজও আমার চোখে পড়ল না। যাই হোক—সেদিন, আর আসবে না বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিলে,—আজ কি শত্রুপক্ষের উপবাসী দুখানি শুকনো মুখ দেখতে এলে নাকি?—তা দেখবে ত দেখ!—বলিয়া সে পাশেই সেই মেয়েটির মাথার ঘোমটাটা হট্ করিয়া খুলিয়া দিল, পরে তাহার লজ্জানত সুন্দর মুখখানি তুলিয়া ধরিল।

সুবোধ মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, মেয়েটির মুদ্রিত চক্ষু দুটির কোলে তখনও জল শুকায় নাই,—আর একদিকে দাদা তাহার আঁচল চাপিয়া আছে। কিন্তু সে তখনকার মত কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল—আপনাদের কি এখনও খাওয়া-দাওয়া—?

আরে সেই জন্যেই ত ঝগড়া হে! বলছিলাম, দুজনের প্রেমালাপের ফাঁকে ফাঁকে খাওয়া-দাওয়ার কথাটা আর নাই-বা তুললে, শুয়ে বসে বেশ ত দিন কেটে যাচ্ছে?—বলি,

ও মলিনা বিবি,—তোমার কদিনকার উপবাসের তালিকাটি দেবরের কাছে একবার মেলে ধর না গো।

কিন্তু মলিনা বিবি আর নড়ে চড়ে না। মাথার ঘোমটাটিও আর মাথায় তুলিয়া দেয় নাই। সুবোধ অলক্ষ্যে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার সেই নতমুখখানি বাহিয়া ঠোঁটের কাছে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিয়াছে।

হয়ত অপমানে—

হয়ত-বা লজ্জায়! হয়ত-বা নিষ্ফল ঘৃণায়!

দাদা নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল। সুবোধ ক্ষুদ্র একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া হঠাৎ মৃদুকণ্ঠে কহিল—ছি!

মেয়েটি এবার চোখ মুছিয়া মাথায় কাপড় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর টানিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বাহির হইয়া গেল। সুবোধ পিছন হইতে দেখিল, সেদিন হাতে দুগাছি চুড়ি ছিল, আজ তার বদলে কাপড়ের ফালি বাঁধা!

খানিকক্ষণ পরে সুবোধ উঠিয়া নীচে নামিয়া আসিল। হঠাৎ শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল—ডানদিককার ঘরটায় পিঞ্জরাবদ্ধ বন্য জন্তুর মত দাদা পায়চারি করিতেছে।

আপনি, ওখানে—কি?

আগুনের ডেলার মত চোখ ফিরাইয়া দাদা চাহিল। মনে হইল তাহার ভিতরের কোথায় পুঞ্জীকৃত বিষের জ্বালা মাথায় চড়িয়াছে।

বলিল—মেয়েদের চোখের জল মানুষকে কেমন করে নষ্ট করে, জানো? বিয়ে করেছিলাম ওকে তিন-আইনে। সেদিন অসহায় বিধবার চোখের জল অস্বীকার কর্তে পারলাম না। বদমাইস বাপটার অত্যাচার থেকে মেয়েটাকে উদ্ধার করে আনলাম! কিন্তু মহত্ত্ব কি দেখালেই হল? সেদিনকার সেই ভুলের শাস্তি আজও—

খামখেয়ালীর গল্পের মত দাদা সেখানে দাঁড়াইয়া আপনার কাহিনী সুরু করিল।

একবার একটা ডাকাতের দল পুলিশের ভয়ে পথে ছত্রভঙ্গ হয়।

দাদা লুকাইল বাঙলার বাহিরে কোথায় এক পার্বত্য প্রদেশে। অনেকদিনের কথা। গাঁয়ে এক গৃহস্থের খোঁজ পায়। ভাব-আলাপের পর নিমন্ত্রণ খাওয়া এবং বক্তৃতা দেওয়া চলে। একদিন গৃহিণী মারা পড়িলেন। বড় আদরের বিধবা মেয়েটি তখন একা। বাপটা মাতাল। দূরে কোথায় সাঁওতালি পাড়ায় গিয়া রাত কাটায়। মাঝে মাঝে মদ খাইয়া আসিয়া মেয়েটাকে প্রহার করে। বেশ উপযুক্ত অবসর!

দাদা হাসিয়া বলিল—আমার প্রতি মেয়েটির গোপন প্রেম না কি প্রথম দর্শনের পর থেকেই ফল্গুধারার মত,—তারপর একদিন দূরে জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ি ঝরণার পাশে বসে উনি খামকা কাঁদতে সুরু করলেন! অর্থাৎ নাটুকে কায়দায় প্রেম-নিবেদন আর কি! কি করি—বললাম, চোখের জল ফেলো না, তোমায় আমি বাঁচাতে পারি কিন্তু। ও বললে, বাঁচাও, তোমার পায়ে পড়ি। ব্যস্—কুড়ি টাকায় দুটি বোতল ওর বাপকে কিনে দিয়ে ওকে ছাড়িয়ে আনলাম!

তার পর?

তার পর বোষ্টমী বললে, তোমার দুটি শ্রীচরণ ছেড়ে কোথাও যাব না। তার পর থেকে যেখানেই ভেসে যাই, উনি আমার গাধাবোট!

এ ছাড়া আপনাদের মধ্যে আর কিছু—?

দাদা কহিল—বললাম, বোষ্টমি, এ জন্মটা তুমি বিধবা হয়েই থাক, মা হয়ে আর দরকার নেই।

সে কি?

অর্থাৎ একটি সুসন্তান হয়েছিল ; কিন্তু দিলাম সেটাকে কুড়ি টাকায় ঝেড়ে, ডাক্তার বাবুদের সেই কোচোয়ানটার কাছে!

সুবোধের মুখখানা দেখিতে দেখিতে সাদা হইয়া গেল। আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে সে বাহির হইয়া গেল।

নিয়মের ব্যতিক্রম বৈ কি!

যেখানে ছিল অন্ধকার গুহা, সেখানে ফাটল দেখা দিল ; নীল আকাশের আলো আসিয়া পড়িল। ষড়ঋতুর যেখানে যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল, এখন সেখানে বাতাস চলাচল করে। জড়ের মধ্যে গতির বেগ দেখা দেয়!

চট্ করিয়া সুবোধ বাহির হইয়া যায়, আর শীঘ্র ফেরে না। রাস্তায় রাস্তায় খানিকক্ষণ ঘুরিয়া আসে। হয়ত-বা কোনদিন পায়ে হাঁটিয়াই শহরে যায়।

সেদিন দাদার নজরে পড়িয়া গেল। বলিল—কি হে অভিমানী বালক! আর যে ওদিক মাড়াও না?

সুবোধ কহিল—কোথায় চলেছেন?

চল না—যাবে? ও কি মাথায় তোমার তালি মেরে দিলে কে?

চুল কেটেছি।—সুবোধ কহিল।

এঃ কাঁচির দাগ হয়ে গেছে যে! দিদি কেটে দিলে বুঝি?

আপনি জানলেন কি করে?

জানতে পারি বৈ কি! পুরুষের চুল সম্বন্ধে মেয়েদের ভয়ানক হিংসে! রাগ করে কেটে দিলে না কি?—কেন?

আমি না কি লোকের দেখে দেখে চুল রাখাচ্ছিলাম!

দাদা হাসিয়া বলিল—আমিই বুঝি সেই লোক?

এমনি করিয়া পথ চলিতে চলিতে গল্প হয়। সে কেবল এক পক্ষের ব্যক্তিগত গল্প!

সুবোধ ভাবিল, এ পথ যেন আর না ফুরায়।

ক্রমে বেলা গেল, গাছের মাথা হইতে আলো ফুরাইল, শহরের দোকান পসারিতে আলো জ্বলিয়া উঠিল।

শেষে দাদা দূর পথের দিকে চাহিয়া আপনাকেই যেন আপনি শুনাইতে লাগিল—কিন্তু যা দেখছ ভাই, এসব মিথ্যে। মানুষকে কোনদিন যেন বিশ্বাস কর না ; ভগবানকে মানার চেয়ে একটা আদি বৈজ্ঞানিক শক্তিকে স্বীকার করো ; পুণ্যকে এড়িয়ে চলো কারণ তার রং শুধু সাদা, কিন্তু পাপকে ভালবেসো,—তার মধ্যে রঙয়ের খেলা পাবে, বৈচিত্র্যের সন্ধান মিলবে। যদি প্রেমে পড় তাহলে আনন্দ পাবে ; কিন্তু প্রেমের ব্যর্থতা না ঘট্‌লে পরিপূর্ণ রসের আস্বাদ পাবে না। আত্মার বন্ধন কোনদিন স্বীকার কর না—কারণ তাই তোমার মৃত্যু!

সুবোধ স্তব্ধ হইয়া তাহার কথা শোনে।

দাদা তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া হঠাৎ বলে—আচ্ছা, মলিনাকে দেখতে কি খুব ভাল নয়? কিন্তু আমি যে ওর স্বামী—এ ত আমি সইতে পারিনে। ওকে আল্‌তা পরতে দিই না, পান খেতে দিই না, তেল মাখতে দিই না,—আমার ভয়, পাছে ও ভাল দেখতে হয়! সিঁদুর পরাই না ভাই,—ওকে স্ত্রীর মত ভাবতে আমার গা কাঁপে! কিন্তু তবু ত ভাই, মলিনা ভাল! আমার দিকে যখন আনমনে চায়, ভাবি—আমি যদি কাব্য লিখতে পারতাম!

তাহার মুখের প্রতি সুবোধ খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিল,—তাহার রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে কোনও কথা বাহির হইল না।

দাদা আবার বলিল—একখানির বেশি কাপড়ও ভাই আমি তাকে দিই না, পাছে তার রূপের বৈচিত্র্য ঘটে, পাছে আরও ভালও দেখতে হয়। সেই নীলাম্বরীখানি মাত্র সম্বল ; তার যে কত জায়গায় ছেঁড়া,—ছেলেমানুষ তুমি, কি আর বলব। কিন্তু এর জন্যে এতটুকু অনুযোগ কোনদিন করে না।

কিছুই বলেন না?

বলে ভাই, চার পাঁচদিন উপবাসের পর আর থাকতে পারে না। ছেলেমানুষ ত হাজার হক, তখন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁদে—এই যেমন সেদিন—

ক্রমে মলিনার সঙ্গে পরিচয় হয়। আগে দেখিলে পলাইত ; এখন আর পলায় না। যে ঘরে সুবোধ বসে, সে-ঘরে যাতায়াত করে। দাদা বলে—লজ্জা বটে! একেবারে গুণ চটের আবরণ,—ছিঁড়তে চায় না।

তারপর একদিন আগল খুলিয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়া সুবোধ নামিয়া যাইতেছিল। মলিনা এদিক-ওদিক তাকাইয়া চুপি চুপি বলিল —দেখুন আপনি...আপনি ওঁর সঙ্গে আর বেড়াবেন না। ভারি বিপদে পড়বেন একদিন।

ঘরে ফিরিয়া সুবোধের সেদিন চোখে জল আসিয়াছিল। অকারণ চোখের জল!

বার-বাড়ীর যে দিকটা প্রায় খালিই পড়িয়া থাকে, সেখানে সেদিন সুবোধ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

তখন সন্ধ্যা।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে চন্দ্রা আসিয়া বলিল—বসে আছিস এখানে? বড় বিপদ যে!

তাহার ভয়-ব্যাকুল আলুথালু অবস্থার দিকে চাহিয়া সুবোধ বলিল—কি রে?

ভানু কেমন কচ্ছে, হয়ত বাঁচবে না। শ্বাস আরম্ভ হয়েছে।

অমন হয়েছিল ত দুতিনবার! আবার ত—

না, না—সেদিন আমার সঙ্গে ঝগড়ার পর থেকে কেমন যেন—

বাড়ীতে পুরুষ মানুষ তখন কেহই নাই। ইস্কুল কলেজের ছুটি ফুরাইতে ছেলেরা শহরের বাসায় চলিয়া গেছে। বড় কুর্তা গেছেন শিষ্যবাড়ী। মেজ গেছেন মামলার তদ্বির করিতে কলিকাতায় ; ফিরিতে আরও দুএকদিন। ওদিককার বড় বৌ আর ছোট-বৌ ছেলেমেয়ে লইয়া ভাইয়ের সঙ্গে গেছেন তীর্থ করিতে।

সুবোধ দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রা শুধু মুমূর্ষু ভানুর প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কাছে গিয়া চন্দ্রা দেখিল—মুখ গুঁজিয়া মরিয়া আছে।

চন্দ্রা শুধু বলিল—এখন উপায়?

তাই ত!

নিয়ে যাবার লোক ত কোথাও—। খবরই বা কাকে দিই?

সুবোধ কি ভাবিয়া বলিল—যদি রাজি হস্ ত বলি।

কি?

দাদাকে খবর দেবো? ওই কলাবাগানের—

সে কি রে? এ বাড়ীর মড়া সে ছোঁবে? এঁরা এসে বলবেন কি ; যদি জাতে ঠেলে আমাদের?—তাছাড়া যে শত্রুতা করা হয়েছে তাদের সঙ্গে, আমাদের সাহায্যে সে আসবে কেন?

সে রকম লোক সে নয়!

খানিক ভাবিয়া চন্দ্রা বলিল—তবে দেখ্ তাই। যদি সে আসে দয়া করে'।

সুবোধ বাহির হইয়া গেল।—মড়া আগ্‌লাইয়া চন্দ্রা সেইখানে বসিয়া রহিল।

খানিকক্ষণ পরে মানুষের সাড়া পাইয়া চন্দ্রা নড়িয়া উঠিল। মাথার ঘোমটা টানিয়া সে একপাশে উঠিয়া হেঁট হইয়া দাঁড়াইল।

দাদা হেলিতে দুলিতে ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিল। তারপর অনুমানে চন্দ্রার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল—ভায়া গেলেন ডোম পাড়ায় পালঙ্কের সন্ধানে। শুনলাম সবই,—এই জড়পিণ্ডটিকে জয়যাত্রায় নিয়ে যেতে হবে! বেশ বেশ—এটা আমার চিরদিনের অভ্যেস।

মাথা হেঁট করিয়া চন্দ্রা সবিনয়ে বলিল—আপনার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েছে ; কিন্তু যে উপকার আজ পেলাম—

মুখের একটা শব্দ করিয়া দাদা বলিল—মানুষ আর কি অন্যায় কর্বে আমার ওপর, কতটুকু তার শক্তি! আর উপকার? ওটা আমি খুব পারি।

তামাসা করিবার উপযুক্ত সময় বটে!

হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়া দাদা কহিল—নিন্, মাথার দিকটা ধরুন—আমি ধরছি পায়ের দিকটা —চ্যাংদোলা করে বাইরে নিয়ে যাওয়া যাক্ ততক্ষণ!

চন্দ্রা সরিয়া আসিয়া শবদেহটির মাথার দিকটা তুলিয়া ধরিতেই—

আলো পড়িয়াছিল দুইজনেরই মুখে।

অকস্মাৎ চন্দ্রার দৃষ্টি পড়িল তাহার মুখের উপর।

চলুন—নিয়ে যাই ; দেরি কচ্ছেন কেন? এর পর আবার,—

চোখ নামাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চন্দ্রা মৃতের মাথার দিকটা পুনরায় ধরিতেই দাদা খানিক হাসিল।

হাসিয়া কহিল—পূর্ব স্মৃতির আলোড়ন—না চন্দ্রা?

চন্দ্রা চমকিয়া উঠিল। বলিল—কাকে কি বলচেন?

* * * *

খানিক বাহিরে ঘুরিয়া আসিয়া দাদা বলিল—তোমাকে হঠাৎ তখন ছুঁয়ে ফেললাম—না? না ছুঁলেই ভাল হত চন্দ্রা, এ জীবনে অনেক পাপ করেছি।

অবরুদ্ধ কণ্ঠে চন্দ্রা শুধু বলিল—আপনি কবে যাবেন এ পাড়া থেকে? কাল সকালেই না হয়—

শবদাহ শেষ করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত দুইজনে শেষরাত্রে ফিরিতেছিল।

দাদা ডাকিল—সুবোধ?

সুবোধ মুখ তুলিল।

আজ আমার জীবনের রহস্যটি তোমায় শোনাবার দিন ছিল, কিন্তু কথা বলতে পাচ্ছিনে, ভাই।

তাহলে কাল শুনবো। বলবেন ত?

দাদা চুপ করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

... ...

তার পরদিন। বেলা তখন অনেক। কল্‌কাগানে সেই বাড়ীর উপর তলাকার নির্জন ঘরে সুবোধ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

মলিনাকে লইয়া দাদা কখন চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় তাহাকে একবার বলিয়াও যায় নাই।

পায়ের শব্দ পাইয়া মুখ তুলিতেই সুবোধ দেখিতে পাইল—চন্দ্রা!

চন্দ্রা থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল—তুই এখানে? খুঁজছিলাম যে! খবর পেলাম—এরা চলে

গেছে বুঝি? এমন ভাঙ্গা বাড়ীতে ছিল কি করে? কোনও মতে সে আপনার মুখভাবকে গোপন করিতে চেষ্টা করিল।

ওকি—যাস্ কোথা?

খুঁজতে।

কাকে খুঁজতে?

দাদাকে। তার শেষ কথাটি শুনতেই হবে। যেখানেই সে থাকুক—আমি তাকে,—

চন্দ্রা কহিল—যদি না পাস্?

না পাই, আর ফিরবো না।

তাড়াতাড়ি সে পথে নামিয়া আসিল।

রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ পথ। বৈরাগীর মত উদাসীন। কিন্তু তাহার সেই বিস্তৃত বাহুর আড়ালে এই ছেলেটি হয়ত চিরদিনের মত আপনাকে হারাইয়া ফেলিল।

* * * *

দিন কয়েক বাদে কাহারা দাদাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল। অনেকে বলে পুলিশের লোক। কেউ কেউ বলে, গোয়েন্দা! একটা জালিয়াতি আসামী না কি এই পাড়ায় কোথায় আসিয়া লুকাইয়া ছিল। কেউ বলে--এ তারই কাজ।

বার বার মাথা নাড়িয়া চন্দ্রা বলে—না, না—কিছুতেই না ; আমি জানি সে—

বাসুর পিসি বলে—না বৌমা, এ সেই ঝাঁকড়া-চুলোরই কাজ।

চন্দ্রা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলে—সত্যি? তা হলে কিন্তু—এ যে ভারি, ছি ছি—

ভাদ্র ১৩৩৫

আত্মহত্যার অধিকার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষাকালেই ভয়ানক কষ্ট হয়।

ঘরের চালটা একেবারে ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে।

কিছু নারিকেল আর তাল-পাতা মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়াই কুড়াইয়া সংগ্রহ করা গিয়াছিল। চালের উপর সেগুলি বিছাইয়া দিয়া কোন লাভ হয় নাই। বৃষ্টি নামিলেই ঘরের মধ্যে সর্বত্র জল পড়ে।

বিছানাটা গুটাইয়া ফেলিতে হয়, ভাঙ্গা বাক্স পেঁটরা কয়টা এ কোণে টানিয়া আনিতে হয়, জামা-কাপড়গুলি দড়ি হইতে টানিয়া নামাইয়া পুঁটুলি করিয়া, কোথায় রাখিলে যে ভিজিবে কম, তাই নিয়া মাথা ঘামাইতে হয়।

বড় ছেলেটা কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। আদর করিয়া তাহার কান্না থামানো যায় না, ধমক দিলে কান্না বাড়ে। মেয়েটা বড় হইয়াছে, কাঁদে না ; কিন্তু ওদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া এমন করিয়াই চাহিয়া থাকে যে নীলমণির ইচ্ছা হয় চড় মারিয়া ওকেও সে কাঁদাইয়া দেয়। এতক্ষণ ঘুমাইবার পর এক ঘণ্টা জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইল বলিয়া ও কি চাহনি? আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে, ঘরের চাল সাত বছর মেরামত হয় নাই। ঘরের মধ্যে জল পড়াটা নীলমণির এমন কি অপরাধ যে মেয়েটা তাকে ও-রকম ভাবে নিঃশব্দে গঞ্জনা দিবে?

ছোটছেলেটাকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া নিভা একবার এধার একবার ওধার করিয়া বেড়াইতেছিল।

হঠাৎ বলিল 'ওগো, ছাতিটা একবার ধরো, একেবারে ভিজে গেল যে! লক্ষ্মী, ধরো একবার ছাতিটা খুলে ওরও কি শেষে নিমুনিয়া হবে?'

নীলমণি বলিল, 'হয়তো হবে। বাঁচবো।'

নিভা বলিল, 'বালাই ষাট।—শ্যামা, তুইও তো ধরতে পা ', ছাতিটা একটু?'

শ্যামা নীরবে ভাঙ্গা ছাতিটা নিভার মাথার উপর ধরিল। ছাতি মেলিবার বাতাসে প্রদীপের শিখাটা কাঁপিয়া গেল। প্রদীপে তেল পুড়িতেছে। অপচয় কিন্তু উপায় নাই। চাল ভেদ করা বাদলে ঘর যখন ভাসিয়া যাইতেছে তখনকার বিপদে প্রদীপের আলোর একান্ত প্রয়োজন। জিনিষপত্র নিয়া মানুষগুলি একোণ ওকোণ করিবে কেমন করিয়া?

'একছিলুম তামাক দে শ্যামা।' নীলমণি হুকুম দিল।

শ্যামা বলিল 'ছাতিটা ধর তবে?'

নীলমণি আকাশের বজ্রের মত ধমকাইয়া উঠিল ; 'ফেলে দে ছাতি, চুলোয় গুঁজে দে। আমি ছাতি ধরব তবে উনি তামাক সাজবেন, হারামজাদি!'

তামাক অবিলম্বেই হাতের কাছে আগাইয়া আসিল। ঘরের পশ্চিম কোণ দিয়া কলের জলের মত মোটা ধারায় জল পড়িয়া ইতিমধ্যেই একটা বালতি ভরিয়া গিয়াছে। সেই জলে হাত ধুইয়া শ্যামা বলিল 'তামাক আর একটুখানি আছে বাবা।'

দুঃসংবাদ!

এত বড় দুঃসংবাদ যে সংবাদ-প্রদানকারিণীকে একটা গাল দিবার ইচ্ছা নীলমণিকে অতি

কষ্টে চাপিয়া যাইতে হইল।

নীলমণি ভাবিল ঃ বিনা তামাকে এই গভীর রাত্রির লড়াই জিতিব কেমন করিয়া? ছেলের কান্না দুই কানে তীরের ফলার মত বিঁধিয়া চলিবে, মেয়েটার মুখর চাহনি লঙ্কাবাঁটার মত সারাক্ষণ মুখে লাগিয়া থাকিবে, নিমুনিয়ার সঙ্গে নিভার ব্যাকুল কলহ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে শিহরিয়া শিহরিয়া মনে হইবে বাঁচিয়া থাকাটা শুধু আজ এবং কাল নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্প্রয়োজন,—আর ঘরে এখন তামাক আছে একটুখানি!

তামাক আনানো হয় নাই কেন জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া নীলমণি চুপ করিয়া রহিল। প্রশ্ন করা অনর্থক, জবাব সে পরশু হইতে নিজেই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে—পয়সা নাই। ছেলেটা বিকালে এক পয়সার মুড়ি খাইতে পায় নাই—তামাকের পয়সা কোথা হইতে আসিবে! নিজে গেলে হয়ত দোকান হইতে ধার আনিতে পারিত, কিন্তু—

নীলমণি খুশী হয়। এতক্ষণে ছুতা পাওয়া গিয়াছে।

'তামাক নেই বিকেলে বলিসনি কেন?'

'আমি দেখিনি বাবা।'

'দেখিনি বাবা! কেন দেখিনি বাবা? চোখের মাথা খেয়েছিলে?'

'তুমি নিজে সেজেছিলে যে? সারাদিন আমি একবারও তামাক সাজিনি বাবা!'

'তা সাজবে কেন? বাপের জন্য তামাক সাজলে সোনার অঙ্গ তোমার ক্ষয়ে যাবে যে!'

নীলমণির কান্না আসিতেছিল। মুখ ফিরাইয়া সহসা উদ্‌গত অশ্রু সে দমন করিয়া লইল। না আছে তামাক না থাক্। পৃথিবীতে তার কীই বা আছে যে তামাক থাকিলেই সব দুঃখ দূর হইয়া যাইত!

বাহিরে যেন অবিরল ধারে জল পড়িতেছে না, ঘরের বায়ু যেন সাহারা হইতে আসিয়াছে, নীলমণির চোখমুখ এত জ্বালা করিতেছিল। খানিকক্ষণ হইতে তাহার হাঁটুর উপর বড় বড় ফোঁটায় জল পড়িতেছিল—টপ্‌টপ্। অঞ্জলি পাতিয়া নীলমণি গুণিয়া গুণিয়া জলের ফোঁটাগুলি ধরিতে লাগিল। সিদ্ধ করা চামড়ার মত ফ্যাকাশে ঠোঁট নাড়িয়া সে কি বলিল, ঘরের কেহই তাহা শুনিতে পাইল না। ছেলেমানুষের মত তাহার জলের ফোঁটা সঞ্চয় করার খেলাটাও কেহ চাহিয়া দেখিল না। কিন্তু হাতে খানিকটা জল জমিলে তাই দিয়া মুখ ধুইতে গিয়া নীলমণি ধরা পড়িয়া গেল।

নিভা ও শ্যামা প্রতিবাদ করিল দু'জনেই।

শ্যামা বলিল 'ও কি করছ বাবা?'

নিভা বলিল 'পচা গলা চাল-ধোয়া জল, হ্যাঁগা, ঘেন্নাও কি নেই তোমার?'

নীলমণি হঠাৎ একটু হাসিয়া বলিল 'হোক না পচা জল। চাল-ধোয়া জল তো! এও হয় ত কাল জুটবে না নিভা!'

ইহাকে সূক্ষ্ম রসিকতা মনে করিয়া নীলমণি নিজের মনে একটু গর্ব অনুভব করিল। এমন অবস্থাতেও রসিকতা করিতে পারে, মনের জোর তো তার সহজ নয়! ঘরের চারি দিকে একবার চোখ বুলাইয়া আনিয়া নিভার মুখের দিকে পুনরায় চাহিতে গিয়া কিন্তু তার হাসি ফুটিল না। নিভার দৃষ্টির নির্ম্মমতা তাকে আঘাত করিল।

অবিকল শ্যামার মত চাহিয়া আছে! এত দুঃখ, এত দুর্ভাবনা ওর চোখের দৃষ্টিকে কোমল করিতে পারে নাই, উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই, রূঢ় ভর্ৎসনা আর নিঃশব্দ অসহায় নালিশে ভরিয়া রাখিয়াছে।

নীলমণি মুষড়াইয়া পড়িল।

সব অপরাধ তার। সে ইচ্ছা করিয়া নিজের স্বাস্থ্য ও কার্যক্ষমতা নষ্ট করিয়াছে, খাদ্যের প্রাচুর্যে পরিতুষ্ট পৃথিবীতে নিজের গৃহকোণে সে সাধ করিয়া দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে, ঘরের চাল

পচাইয়া ফুটা করিয়াছে সে, তারই ইচ্ছাতে রাতদুপুরে মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। শুধু তাই নয়। ওদের সমস্ত দুঃখ দূর করিবার মন্ত্র সে জানে। মুখে ফিস ফিস করিয়া হোক, মনে মনে নিঃশব্দে হোক, ফুস মন্তরটি একবার আওড়াইয়া দিলেই তার এই ভাঙ্গা ঘর সরকারদের পাকা দালান হইয়া যায়, আর ঘরের কোণার ওই ভাঙ্গা বাক্সটা চোখের পলকে মস্ত লোহার সিন্দুক হইয়া ভিতরে টাকা ঝম ঝম করিতে থাকে ;—টাকার ঝমঝমানিতে বৃষ্টির ঝমঝমানি কোনমতেই আর শুনিবার উপায় থাকে না।

কিন্তু মন্ত্রটা সে ইচ্ছা করিয়া বলিতেছে না।

ঘণ্টাখানেক এমনি ভাবে কাটিয়া গেল।

নিভা এক সময় জিজ্ঞাসা করিল 'হ্যাঁগা, রাত কত?'

'তা হবে, দু'টো তিনটে হবে।'

'একটা কিছু ব্যবস্থা কর? সারারাত জল না ধরলে এমনি বসে বসে ভিজব?'

'বসে ভিজতে কষ্ট হয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজো।'

নিভা আর কিছু বলিল না। ছেঁড়া আলোয়ানটি দিয়া কোলের শিশুকে আরও ভাল করিয়া ঢাকিয়া রুক্ষ চুলের উপর খসিয়া-পড়া ঘোমটাটি তুলিয়া দিল। স্বামীর কাছে মাথায় কাপড় দেওয়ার অভ্যাস সে এখনো কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

ছাতি ধরিয়া আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া শ্যামা তার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল মধ্যে মধ্যে তার শিহরণটা নিভা টের পাইতে লাগিল।

'কাঁপছিস কেন শ্যামা? শীত করছে?'

শ্যামা কথা বলিল না। একটু মাথা নাড়িল মাত্র।

নিভা বলিল 'তবে ভাল করেই ছাতিটা ধর্ বাবু, খোকার গায়ে ছিটে লাগছে।'

আঁচল দিয়া সে খোকার মুখ মুছিয়া লইল। ফিস্ ফিস্ করিয়া আপন মনে বলিল, 'কত জন্ম পাপ করেছিলাম, এই তার শাস্তি।' নীলমণি শুনিতে পাইল, কিন্তু কিছু বলিল না। মন তার সজাগ, নির্মম ভাবে সজাগ, কিন্তু চোখের পাতা দিয়া দুই চোখকে সে অর্ধেক আবৃত করিয়া রাখিযাছে। দেখিলে মনে হয়, একান্ত নির্বিকার চিত্তেই সে ঝিমাইতেছে।

কিন্তু নীলমণি সবই দেখিতে পায়। তার স্তিমিত দৃষ্টিতে সরলার মুখ তেরচা হইয়া বাঁকিয়া যায়, প্রদীপের শিখাটা ফুলিয়া ফাঁপিয়া ওঠে, দেয়ালের গায়ে ছায়া সহসা জীবন পাইয়া দুলিয়া উঠিতে সুরু করে। মুখ ফিরাইয়াই নীলমণি দেখিতে পায়, ঘরের ও-কোণে গুটানো রাখা বিছানার উপর উপুড় হইয়া নিমু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিরক্তির তার সীমা থাকে না। তার মনে হয় ছেলেটা তাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। দুই পা মেঝের নদীস্রোতে প্রসারিত করিয়া দিয়া আকাশের গলিত মেঘে অর্ধেকটা শরীর ভিজাইতে ভিজাইতে ওইটুকু ছেলের অমন করিয়া ঘুমাইয়া পড়ায় আর কি মনে হয়? এর চেয়ে ও নাকী সুরে টানিয়া টানিয়া শেষ পর্যন্ত কাঁদিতে থাকিত তাও নীলমণির ভাল ছিল। এ সহ্য হয় না। সন্ধ্যায় ও পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই ; ক্ষুধার জ্বালায় মাকে বিরক্ত করিয়া পিঠের জ্বালায় চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ঘুমাইয়াছিল। হয় ত ওর রূপকথার পোষা বিড়ালটি এই বাদলে রাজবাড়ীর ভাল ভাল খাবার ওকে চুরি করিয়া আনিয়া দিতে পারে নাই। হয় ত ঘুমের মধ্যেই ওর গালে চোখের জলের শুক্‌নো দাগ আবার চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। এত রাত্রে দুঃখের এই প্রকৃত বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে ও তবে ঘুমায় কোন্ হিসাবে?

'নিমুকে তুলে দে' ত শ্যামা।'

নিভা প্রতিবাদ করিয়া বলিল 'কেন, তুলবে কেন ঘুমোচ্ছে ঘুমোক।'

'ঘুমোচ্ছে না ছাই। ইয়ার্কি দিচ্ছে। ঢং করছে।'

'হ্যাঁ, ইয়ার্কি দিচ্ছে! ঢং করছে! যেমন তোমার! ঢং করার মত সুখেই আছে কি'না।'

আধঢাকা চোখ নীলমণি একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিল। ওরা যা খুসী করুক, যা খুসী বলুক। সে আর কথাটি কহিবে না।

খানিক পরে নিভা বলিল 'দ্যাখো, এমন করে থাকা তো যায় না। সরকারদের বাইরের ঘরটা উঠিগে চল।'

নীলমণি চোখ না খুলিয়াই বলিল 'না।'

নিভা রাগ করিয়া বলিল 'তুমি যেতে না চাও থাকো। আমি ওদের নিয়ে যাচ্ছি।'

নীলমণি চোখ মেলিয়া চাহিল।

'না—যেতে পাবে না। ওরা ছোটলোক। সেবার কি বলেছিল মনে নেই?'

'বললে আর করছ কি শুনি? রাতদুপুরে বিরক্ত করলে অমন সবাই বলে থাকে।'

নীলমণি ব্যঙ্গ করিয়া বলিল 'বলে থাকে। রাতদুপুরে বিপদে পড়ে মানুষ আশ্রয় নিতে গেলে বলে থাকে,—এ কি জ্বালাতন? ওইটুকু শিশুর জন্য একটু শুকনো ন্যাকড়া চাইলে বলে থাকে কাপড় জামা সব ভিজে? ময়লা হবার ভয়ে ফরাস তুলে নিয়ে ছেঁড়া সতরঞ্চি অতিথিকে পেতে দেয়?—যেতে হবে না। ব্যস্।'

নিভা অনেক সহ্য করিয়াছে। এবার তার মাথা গরম হইয়া গেল।

'ছেলে মেয়ে বৌকে বর্ষাবাদলে মাথা গুঁজবার ঠাঁই দিতে পারে না, অত মান অপমান জ্ঞান কি জন্যে? আজ বাদে কাল ভিক্ষে করতে হবে না?'

নীলমণি বলিল 'চুপ্।'

এক ধমকেই নিভা অনেকখানি ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

'চুপ করেই আছি চিরটা কাল। অন্য মানুষ হলে—'

হাতের কাছে, ঘটিটা তুলিয়া লইয়া নীলমণি বলিল 'চুপ। একদম চুপ। আর একটি কথা কইলে খুন করে ফেলব।'

'কথা কেউ বলছে না।' নিভা একেবারে নিভিয়া গেল।

শ্যামা ঢুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বাপের গর্জনে সে চমকাইয়া সজাগ হইয়া উঠিল। কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল 'মা, ভুলু দরজা আঁচড়াচ্ছে।'

গরীবের মেয়ে, হা-ঘরের বৌ, নিভার মেরুদণ্ড বলিতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না, কিন্তু তার বদলে যা ছিল নিরপরাধ মেয়ের উপর ঝাঁঝিয়া উঠিবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

'আঁচড়াচ্ছে তো কি হবে? কোলে তুলে নিয়ে এসে নাচো!—ভালো করে ছাতি ধরে থাক শ্যামা, মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেব!'

নীলমণি বলিল 'আমার লাঠিটা কই রে?'

শ্যামার মুখ পাংশু হইয়া গেল. সে মিনতি করিয়া বলিল 'মেরো না বাবা। দরজা না খুললে ও আপনিই চলে যাবে।'

'তোকে মাতব্বরি করতে হবে না, বুঝলি? চুপ করে থাক।'

বাঁ পা'টি আংশিক ভাবে অবশ, হাতে ভর দিয়া নীলমণি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের কোণায় তার মোটা বাঁশের লাঠিটা ঠেস দেওয়া ছিল, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া লাঠিটা সে আয়ত্ত করিল। উঠানবাসী লোমহীন নির্জীব কুকুরটার উপর তার সহসা এত রাগ হইয়া গেল কেন কে জানে! বেচারী খাইতে পায় না, কিন্তু প্রায়ই অদৃষ্টে প্রহার জোটে, তবু সে এখানেই পড়িয়া থাকে, সারারাত শিয়াল তাড়ায়। শ্যামা একটু করুণার চোখে না দেখিলে এত দিনে ওর অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া যাইত। কিন্তু নীলমণি কুকুরটাকে দেখিতে পারে না। ধুঁকিতে ধুঁকিতে লাথি ঝাঁটা খাইয়া মৃত্যুর সঙ্গে ওর লজ্জাকর সকরুণ লড়াই চাহিয়া দেখিয়া

তার ঘৃণা হয়, গা জ্বালা করে।

শ্যামা আবার বলিল 'মেরো না বাবা, আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি।'

নীলমণি দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল 'মারব? মার খেয়ে আজ রেহাই পাবে ভেবেছিস্? আজ ওর ভবযন্ত্রণা দূর করে ছাড়ব।'

ভবযন্ত্রণা নিঃসন্দেহ, কিন্তু শ্যামা শুনিবে কেন? পেটের ক্ষুধায় এখনো তার কান্না আসে, ছেঁড়া কাপড়ে তার সর্বাঙ্গ, লজ্জায় সংকুচিত হইয়া থাকে, তার বুকে ভাষা আছে, মনে আশা আছে। ভবযন্ত্রণা সহ্য করিতে তার শক্তির অকুলান হয় না, বরং একটু বাড়তিই হয়। ওইটুকু শক্তি দিয়া সে বর্তমান জীবন হইতেও রস নিংড়াইয়া বাহির করে,—হোক পান্‌সা, এও তুচ্ছ নয়। ভুলুর মত কুকুরটিও মরিবার অথবা তাকে মারিবার কল্পনা শ্যামার কাছে বিষাদের ব্যাপার। তার সহ্য হয় না।

ছাতি ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া শ্যামা নীলমণির লাঠি ধরিল। কাঁদিবার উপক্রম করিয়া বলিল 'না বাবা, মেরো না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি বাবা!'

নীলমণি গর্জন করিয়া বলিল 'লাঠি ছাড় শ্যামা, ছেড়ে দে বলছি! তোকেই খুন করে ফেলব আজ।'

শ্যামা লাঠি ছাড়িল না। তারও কি মাথার ঠিক আছে? লাঠি ধরিয়া রাখিয়াই সে বার বার নীলমণির পায়ে পড়িতে লাগিল।

নিভা বলিল, 'কি জিদ মেয়ের! ছেড়েই দে না বাবু লাঠিটা।'

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে নীলমণি বলিল 'জিদ বার করছি।'

লাঠিটা নীলমণিকে মেয়ের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইল ; কিন্তু বেড়ার ঘরের বেড়ার অনেকগুলি বাতাই আলগা ছিল।

মেয়েকে মারিয়া নীলমণির মন এমন খারাপ হইয়া গেল বলিবার নয়। না মারিয়া অবশ্য উপায় ছিল না। ও-রকম রাগ হইলে সে কখনো সামলাইতে পারে নাই, কখনো পারিবেও না। মন খারাপ হওয়ার কারণটাও হয় ত ভিন্ন! কে বলিতে পারে? মেয়েকে না মারিয়াও তো মাঝে মাঝে তার মরিতে ইচ্ছা করে!

জীবনে লজ্জা, দুঃখ, রোগ, মৃত্যু, শোকের ত অভাব নাই। মন খারাপ হইবার, দশ বছর জ্বর ভোগ করিয়া যেমন হয় তেমনি মন খারাপ হইবার কা' জাগিয়া থাকার প্রত্যেকটি মুহূর্তে এবং ঘুমানোর সময় দুঃস্বপ্নে!

বিশ বছর জ্বর ভোগ করিয়া ওঠা উহারই একটা সাময়িক বৈচিত্র্য মাত্র।

কয়েক মিনিট আগে বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিয়াছিল ; হঠাৎ আবার আগের চেয়েও জোরে আরম্ভ হইয়া গেল। নীলমণির মান অপমান জ্ঞানটা এবার আর টিকিল না।

'লণ্ঠনে তেল আছে শ্যামা?'

শ্যামা একবার ভাবিল চুপ করিয়া থাকিয়া রাগ আর অভিমান দেখায়। কিন্তু সাহস পাইল না।

'একটুখানি আছে বাবা।'

'জ্বাল তবে।'

নিভা জিজ্ঞাসা করিল 'লণ্ঠন কি হবে?'

'সরকারদের বাড়ী যাব। ফের চেপে বৃষ্টি এল দেখছ না?'

যেন, সরকারদের বাড়ী যাইতে নিভাই আপত্তি করিয়াছিল।

শ্যামা বলিল 'দেশলাই কোথা রাখলে মা?'

নিভা বলিল 'দেশলাই? কেন, পিদিম থেকে লণ্ঠন জ্বালানো যায় না। চোখের সামনে

পিদিম জ্বলছে চোখ নেই?'

নীলমণি বলিল 'ওর কি জ্ঞান-গম্মি কিছু আছে!'

নিজের মুখের কথাগুলি খচ্ খচ্ করিয়া মনের মধ্যে বেঁধে! এ যেন তোতাপাখীর মত অভাব মানানসই মুখস্থ বুলি আওড়ানো। বলিতে হয় বলে বলা ; না বলিলে চলে না সত্য ; কিন্তু আসলে বলিয়া কোন লাভ নাই।

সাত বছরের পুরানো লণ্ঠন জ্বালানো হইল।

নিভা মাথা নাড়িয়া বলিল 'না বাবু, ছাতিতে আটকাবে না। আর একখানা কাপড় জড়িয়ে নি দে' ত শ্যামা, একটা শুকনো কিছু দে' ত! আর একটা কাজ কর—দুটো তিনটে কাপড় পুঁটলি করে নে ওখানে গিয়ে সব্বাইকে কাপড় ছাড়তে হবে। আমার দোক্তার কৌটো নিস্।'

নীলমণি একটু মিষ্টি করিয়াই বলিল 'হুঁকোটা নিতে পারবি শ্যামা? লক্ষ্মী মা'টি আমার, --পারবি? ফেলেই নে না, ওখানে গিয়ে ভরে নিলেই হবে। কি অভাব!--তামাকটুকু ফেলে যাস নে ভুলে।'

সব ব্যবস্থাই হইল। নিমুর কান্নায় কর্ণপাত না করিয়া তাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া দাঁড় করাইয়া পিঠে একটা ছেঁড়া চটের বস্তা চাপাইয়া দেওয়া হইল।

দরজা খুলিয়া তারা উঠানে নামিয়া গেল। উত্তরের ভিটার ঘরখানা গত বৎসরও খাড়া ছিল, এবারকার বৈশাখী ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে ; সময় মত অন্তত খুঁটি বদলাইতে পারিলেও এটা ঘটিত না। ভুলু বোধ হয় ওই ভগ্ন স্তূপটির মাঝেই কোথাও মাথা গুঁজিয়া ছিল। মানুষের সাড়া পাইয়া বাহির হইয়া আসিল। তখন ঘরের দরজায় তালা লাগানো হইয়া গিয়াছে। দরজা আঁচড়াইয়া ভুলু সকরুণ কান্নার সঙ্গে কুকুরের ভাষায় বলিতে লাগিল 'দরজা খোলো, দরজা খোলো।'

বাড়ীর সামনে একহাঁটু কাদা, তার পরেই পিছল এঁটেল মাটি। ছেলে লইয়া আছাড় খাইতে খাইতে গিয়া নিভা দেবতাকেই গাল দিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কম—নীলমণিরই বেশী ; শুকনো ডাঙ্গাতেই বাঁ পায়ের পদক্ষেপটি তাকে চট্ করিয়া ডিঙ্গাইয়া যাইতে,—এখন তার পা আর লাঠি দুই কাদায় ঢুকিয়া যাইতে লাগিল।

লাঠি টানিয়া তুলিলে পা আটকাইয়া থাকে, পা তুলিলে লাঠি পোতা হইয়া যায়। নিভার তাকাইবার অবসর নাই। শ্যামার ঘাড়ে কাপড়ের পুঁটুলি, হুঁকা লণ্ঠন আর নিমুর ভার। তবু শ্যামাই নীলমণির বিপদ উদ্ধার করিয়া দিতে লাগিল।

ঘোষেদের পুকুরটা পাক দিলে সরকারদের বাড়ী। পুকুরটা ভরিয়া গিয়া পাড় ছাপাইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম কোণের প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছটার তলা দিয়া তিন-চার হাত চওড়া এক সংক্ষিপ্ত স্রোতস্বিনী সৃষ্টি হইয়াছে। তেঁতুল গাছটার জমকালো আবছা চেহারা দেখিলে গা ছম ছম করে। ভরপুর পুকুরের বুকে শ্যামার হাতের আলো যে লম্বা সোনালী পাত ফেলিয়াছে, প্রত্যেক হাজার বৃষ্টির ফোঁটায় তাহা অজস্র টুকরায় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

নীলমণি থমকিয়া দাঁড়াইল। কাতর স্বরে বলিল 'ও শ্যামা, পার হ'ব কি করে!'

শ্যামা বলিল 'জল বেশী নয় বাবা, নিমুর হাঁটু পর্যন্তও ওঠে নি। চলে এসো।'

সুখের বিষয় স্রোতের নীচে কাদা ধুইয়া গিয়াছিল, নীলমণির পা অথবা লাঠি আঁটিয়া গিয়া তাকে বিপন্ন করিল না। তবু, এতখানি সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও, নীলমণির দু'চোখ একবার সজল হইয়া উঠিল। বাহির হওয়ার সময় সে কাপড়টা গায়ে জড়াইয়া লইয়াছিল, এখন ভিজিয়া গায়ের সঙ্গে আঁটিয়া গিয়াছে। খানিকক্ষণ হইতে জোর বাতাস উঠিয়াছিল, নীলমণির শীত করিতে লাগিল। জগতে কোটি কোটি মানুষ যখন উষ্ণ শয্যার ঘুমে পাশ ফিরিয়া পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিতেছে,--সপরিবারে অক্ষম দেহটা টানিয়া টানিয়া সে তখন

চলিয়াছে কোথায়? যে প্রকৃতির অত্যাচারে ভাঙ্গা ঘরে টিকিতে না পারিয়া তাকে আশ্রয়ের খোঁজে পথে নামিয়া আসিতে হইল, সেই প্রকৃতিরই দেওয়া নির্মমতায় হয় ত সরকাররা দরজা খুলিবে না, ঘুমের ভান করিয়া বিছানা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। না, নীলমণি আর বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তার শক্তি নাই, কিন্তু আক্রমণ চারি দিক হইতে ; পেটের ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধা, শীত, বর্ষা, রোগ, বিধাতার অনিবার্য জন্মের বিধান,—সে কোন্ দিক সামলাইবে? সকলে যেখানে বাঁচিতে চায়, লাখ মানুষের জীবিকা একা জমাইতে চায়, কিন্তু কাহাকেও বাঁচাইতে চায় না, সেখানে সে বাঁচিবে কিসের জোরে?

স্রোত পার হইয়া গিয়া লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিয়া শ্যামা দাঁড়াইয়া আছে। পাশেই ভরাট পুকুরটা বৃষ্টির জলে টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। নীলমণি সাঁতার জানিত না। কিন্তু জানিত যে পুকুরের পাড়টা এখানে একেবারে খাড়া! একবার গড়াইয়া পড়িলেই অথই জল, আর উঠিয়া আসিতে হইবে না।

নিভা তাড়া দিতেছিল। শ্যামা বলিল 'বাবা, চলে এসো? দাঁড়ালে কেন?'

নীলমণি চলিতে আরম্ভ করিল ; ডাইনে নয় বাঁয়েও নয়। সাবধানে, সোজা শ্যামার দিকে।

হঠাৎ শ্যামা চীৎকার করিয়া উঠিল 'মাগো, সাপ্!'

পরক্ষণে আনন্দে গদ-গদ হইয়া বলিল 'সাপ নয় গো সাপ নয়, মস্ত শোল মাছ! ধরেছি ব্যাটাকে। ইঃ, কি পিছল!'

তাড়াতাড়ি আগাইবার চেষ্টা করিয়া নীলমণি বলিল 'শক্ত করে ধর, দুহাত দিয়ে ধর,—পালালে কিন্তু মেরে ফেলব শ্যামা!'

সরকাররা বছর তিনেক দালান তুলিয়াছে। এখনো বাড়ীসুদ্ধ সকলে বাড়ী বাড়ী করিয়া পাগল। বলে 'বেশ হয়েছে, না? দোতালায় দুখানা ঘর তুললে, বাস্, আর দেখতে হবে না।'

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর সরকারদের বড় ছেলে বাহিরের ঘরের দরজা খুলিল। বলিল 'ব্যাপার কি? ডাকাত না কি?'

নীলমণি বলিল 'না ভাই, আমরা। ঘরে তো টিঁকতে পারলাম না ভায়া, সব ভেসে গেছে। ভাবলাম, তোমাদের বৈঠকখানায় তো কেউ শোয় না, রাতটুকু ওখানেই কাটিয়ে আসি।'

বড়ছেলে বলিল 'সন্ধ্যা বেলা এলেই হ'ত!'

নীলমণি কষ্টে একটু হাসিল ঃ 'সন্ধ্যায় কি বিষ্টি ছিল ভাই? দিব্যি ফুটফুটে আকাশ—মেঘের চিহ্ন নেই। রাতদুপুরে হঠাৎ জল আসবে কে জানত।'

নিভা ছাতি বন্ধ করিয়া ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মাসিকের ছবির সদ্যস্নাতার অবস্থায় পড়িয়া শ্যামা লজ্জায় মার অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। নিভার এটা ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু বড়ছেলের সামনে কিছু বলিবার উপায় নাই।

বড়ছেলে বলিল, বেশ থাকুন। কিন্তু চৌকী পাবেন না, চৌকীতে আমার পিসে শুয়েছে। আপনাদের মেঝেতে শুতে হবে।'

'তা হোক ভাই, তা হোক। ভিজতে না হলেই ঢের। একখানা কম্বলটম্বল—?'

'ওই কোণে চট আছে।'

বড় ছেলে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

নীলমণি ঝাঁঝালো হাসি হাসিয়া বলিল 'দেখলে? তখনি বলেছিলাম শুধু জুতো মারতে বাকী রাখবে।'

নিভা বলিল 'ঘরে যে থাকতে দিয়েছে তাই ভাগ্যি বলে জেনো!'

নীলমণি তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া বলিল 'তা ঠিক।'

ঘরের অর্ধেকটা জুড়িয়া চৌকী পাতা, বড় ছেলের পিসে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া তাহাতে কাত হইয়া শুইয়া আছে। শ্যামা লণ্ঠনটা মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া চৌকীর উপরে আলো পড়ে নাই, তবু এ বাড়ীর আত্মীয়কেও ফরাস তুলিয়া শুধু সতরঞ্চির উপর শুইতে দেওয়া হইয়াছে, এটুকু টের পাইয়া নীলমণি একটু খুসী হইল। বড় ছেলের পিসে!—আপনার লোক। সে যদি ও-রকম ব্যবহার পাইয়া থাকে তবে তারা যে লাথি ঝাঁটা পায় নাই, ইহাই আশ্চর্য!

চারি দিকে চাহিয়া নীলমণির খুসীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। সুখশয্যা না জুটুক, নিবাত, শুষ্ক, মনোরম আশ্রয় তো জুটিয়াছে। ঘরের এদিকে একটিমাত্র ছোট জানালা খোলা ছিল, নিভা ইতিমধ্যেই সেটি ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বাস্, বাহিরের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নাই। আকাশটা আজ একরাত্রেই নিঃশেষ হইয়া যাক, ঝড় উঠুক, শিল পড়ুক, পৃথিবীতে সমস্ত খড়ের ঘরগুলি ভাঙ্গিয়া পড়ুক,—তারা যে পাইবে না।

নীলমণির মেজাজ যেন ম্যাজিকে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। তার কণ্ঠস্বর পর্যন্ত মোলায়েম শোনাইল।

'ও শ্যামা, দাঁড়িয়ে থাকিস্ নি মা, চটগুলো বিছিয়ে দে চট করে। একটু গড়াই। আহা, ভিজে কাপড়খানা ছেড়েই নে আগে, তাড়াতাড়ির কি আছে! এতক্ষণ গেল, না হয় আরও খানিকক্ষণ যাবে। ওগো, শুন্‌ছো দাও না, খোকাকে চৌকীর এক পাশেই একটু শুইয়ে দাও না, দিয়ে তুমিও কাপড়টা ছেড়ে ফ্যালো।' খোকাকে নামাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া 'ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন, লজ্জাটা কিসের শুনি? লজ্জা করে দরজা খুলে বাইরে চলে যাও না!'

কাপড় ছাড়া হইল। বাহিরে এখন পুরাদমে উঠিয়াছে। ঘরের কোথাও এতটুকু ছিদ্র নাই, বাতাসের কান্না শোনা যায়। চাপা একটানা শব্দ। তাদের,—নীলমণি আর তার পরিবার নাগালের মধ্যে না পাইয়া প্রকৃতি যেন ফুঁসিতেছে।

নীলমণির মনে হইল, এ এক রকম পঞ্চভূতের মধ্যে যার ভাষা আছে সে ক্রুদ্ধ ফেলিয়া ফেলিয়া বলিতেছে, আজ বাঁচিয়া যে কিন্তু কাল? কাল কি করবে? পরশু? পরদিন? তারও পরের দিন?

শ্যামা চট বিছাইতেছিল, বলিল 'মাগো, কি গন্ধ।'

নিভা বলিল 'নে, ঢং করতে হবে না, তাড়াতাড়ি কর।'

নীলমণি বলিল 'ঝেড়ে ঝেড়ে পাত না।'

নিভা বলিল 'না না, ঝাড়িস্ নি! ধুলোয় অন্ধকার হয়ে যাবে।'

নিভা ছেলেকে স্তন দিতেছিল, কথাটা শেষ করিয়া সে দমক মারিয়া চৌকীর দিকে পিছন করিয়া বসিল।

নীলমণি চাহিয়া দেখিল, বড় ছেলের পিসে চাদর ফেলিয়া চৌকীতে উঠিয়া বসিয়াছে। লণ্ঠনের আলোয় পিসের মূর্তি দেখিয়া নীলমণি শিহরিয়া উঠিল। একটা শব যেন সহসা বাঁচিয়া উঠিয়াছে। মাথার চুল প্রায় ন্যাড়া করিয়া দেওয়ার মত ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, চোখ যেন মাথার অর্ধেকটা ভিতরে চলিয়া গিয়াছে, গালের ঢিলা চামড়ার তলে হাড় উঁচু হইয়া আছে। বুকের সবগুলি পাঁজর চোখ বুজিয়া গোণা যায়। বুকের বাঁ পাশে কি ঠিক চামড়ার নীচেই হৃৎপিণ্ডটা ধুক ধুক করিতেছে।

পিসে নিশ্বাসের জন্য হাঁপাইতেছিল। খানিক পরে একটু সুস্থ হইয়া ক্ষীণস্বরে বলিল 'একটা জান্‌লা খুলে দিন!'

নীলমণি সভয়ে বলিল 'দে তো শ্যামা, জানালাটা খুলে দে।'

শ্যামা আরও বেশী ভয়ে ভয়ে বলিল 'ঝড় হচ্ছে যে বাবা!'

'হোক, খুলে দে।'

শ্যামা পশ্চিমের ছোট জানালাটি খুলিয়া দিল। ঝড় পূর্বদিক হইতে বহিতেছিল, মাঝে মাঝে এলোমেলো একটু বাতাস আর ছিঁটে-ফোঁটা একটু বৃষ্টি ঘরে ঢোকা জানালাটি খুলিয়া দেওয়ায় বিশেষ কোন মারাত্মক ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ভীরু নিভা ছেলের গায়ে আর এক পরত কাপড় জড়াইয়া দিল।

পিসে বলিল 'ঘুমের ঘোরে কখন চাদর মুড়ি দিয়ে ফেলেছি, আর একটু হলেই দম আটকাত! বাপ্!'

নীলমণি জিজ্ঞাসা করিল 'আপনার অসুখ আছে না কি!'

পিসে ভর্ৎসনার চোখে চাহিয়া বলিল 'খুব মোটা-সোটা দেখছেন বুঝি? অসুখ না থাকলে মানুষের এমন চেহারা হয়? চার বচ্ছর ভুগছি মশায়, মরে আছি একেবারেই যম ব্যাটাও কাণা, এত লোককে নিচ্ছে আমায় চোখে দেখতে পায় না। যে কষ্টটা পাচ্ছি মশায়, শত্রুও যেন—'

'ব্যারামটা কি?'

পিসে রাগিয়া বলিল 'টের পান না? এমন করে শ্বাস টানছি দেখতে পান না? পাবেন কেন, আপনার কি! যার হয় সে বোঝে।'

বোঝা গেল, পিসের মেজাজটা খিটখিটে।

নীলমণি নম্রভাবে সান্ত্বনা দিয়া বলিল 'আহা সেরে যাবে, ভাল মত চিকিচ্ছে হলেই সেরে যাবে।'

পিসে বলিল 'হুঁ, সারবে। আমকাঠের তলে গেলে সারবে। চিকিচ্ছের কি আর কিছু বাকী আছে মশায়? ডাক্তার কবরেজ জলপড়া কিচ্ছুটি বাদ যায় নি। আজ চার বছর ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছি, কোনো ব্যাটা সারাতে পারল!'

কথার মাঝে মাঝে পিসে হাপরের মত শ্বাস টানে, এক একবার থামিয়া গিয়া ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতই চোখ কপালে তুলিয়া খাবি খায়। নীলমণির গায়ে কাঁটা দিতে লাগিল। বাতাস! পৃথিবীতে কত বাতাস! তবুও ফুসফুস ভরাইতে পারে না। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে সে উপবাসী, পঞ্চাশ মাইল গভীর বায়ুস্তরে ডুবিয়া থাকিয়া ওর দম আটকাইল।

পিসে বলিল ' কি করে জানেন? বলে, ভয় কি, সেরে যাবে। বলে, সবাই টাকা নেয় চিকিৎসে করে, শেষে বলে না বাপু, তোমার ব্যারাম সারে না, এসব ব্যারাম সারে না। আমি বলি, ওরে চোর ডাকাত ছুঁচোর দল! সারাতে পারবি না তো মেরে ফ্যাল্, দে মরবার ওষুদ দে।'

উত্তেজনায় পিসে জোরে জোরে হাঁপাইতে লাগিল। নীলমণি কথা বলিল না, তার বিনিদ্র আরক্ত চোখ দুটি কেবলি মিট্ মিট্ করিয়া চলিল।

তেল কমিয়া আসায় আলোটা দপ্ দপ্ করিতেছে, এখনই নিভিয়া যাইবে। ছেলেকে বুকে জড়াইয়া হাতকে বালিশ করিয়া নিভা দুর্গন্ধ ছেঁড়া চটে কাত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শ্যামা বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে।

নীলমণির হুঁকা কল্কি শ্যামা জানালায় নামাইয়া রাখিয়াছিল। আলোটা নিভিয়া যাওয়ার আগে নীলমণি বাকী তামাকটুকু সাজিয়া লইল। তার পর দেয়ালে ঠেস দিয়া আরাম করিয়া বসিয়া পিসের শ্বাস টানার মত সাঁ সাঁ শব্দ করিয়া জলহীন হুঁকার তামাক টানিতে লাগিল।

পৌষ ১৩৪০

মৃত্যু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সকালবেলা নিচে বৈঠকখানায় বসে' লোকেশ একটা রেগুলার-আপিলের গ্রাউণ্ডস্ ড্রাফ্ট্ করছে, একজন ভদ্রলোক খোলা দরজা দিয়ে সরাসরি তার কাছে এসে একটু কুণ্ঠিত গলায় বললে,—আপনার একটা চিঠি।

লোকেশ তার দিকে এমন তাচ্ছিল্যে তাকালো যে মাত্র ঐ একটা চাউনিতেই যেন তার সমস্ত অন্তরাত্মা হ'লো উদ্‌ঘাটিত। ভদ্রলোক কী বুঝলো ভদ্রলোকই জানে, কিন্তু আমরা দেখলাম তার ডাঁটালো নাকে, চওড়া কপালে, চাপা চিবুকে নিষ্ঠুর, নির্লজ্জ ঔদাসীন্য। সামান্য একটা চিঠির মোড়ক খুলতে অলক্ষিতে আঙুলে যে ঈষৎ অসহিষ্ণুতা জাগে তার যেন ততোটুকু উৎসাহও সহ্য হ'বে না। চিঠির মধ্যে অপ্রত্যাশিতের যে বিস্ময় আছে তার স্নায়ুমণ্ডলী তা মানতে রাজি নয়। কী জানি কা'র চিঠি!

খামটা ছিঁড়ে ফেলে চিঠিটা সে নিশ্বাসের অর্ধপথেই পড়ে' ফেল্‌লে। নথি-পত্রের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে নির্লিপ্ত গলায় বললে,—আপনার ভুল হয়েছে, এ বাড়ি নয়।

ভদ্রলোক চঞ্চল হ'য়ে বললে,—ভুল, ভুল কেন হ'তে যাবে? আপনিই কি লোকেশলোচন—

—চক্রবর্তী। হ্যাঁ, খামের ওপরে আমারই নাম দেখছি বটে। লোকেশ তবুও এতোটুকু চিন্তিত হ'বার চেষ্টা করলে না, বললে—তা আমার name-sake ডাক্তার অনেক থাকতে পারে, মশাই। আমি ডাক্তার নই, উকিল। আপনার ঠিকানা ভুল হয়েছে।

ভদ্রলোক জোর-গলায় বললে,—না, আমার ভুল হয় নি। আমি উকিল লোকেশবাবুর কাছেই এসেছি।

—তা আসুন, আপত্তি নেই ; কিন্তু আমাদের কাছে আসবেন ব্রিফ্ নিয়ে, মামলা জিতিয়ে দেবো। রুগীর প্রেস্‌কৃপশানের আমরা কী জানি!

প্রেস্‌কৃপশান নয়, ভদ্রলোক নিরীহ, নিস্তেজ গলায় বল্‌লে,—সীতেশবাবু আপনাকে একবার যেতে বলে' দিয়েছেন।

—তা তো চিঠিতেই দেখতে পাচ্ছি। লোকেশ চিঠিটায় দ্বিতীয়বার চোখ বুলোলো, ঠাট্টায় ঠোঁটের বাঁ কোণটা একটু বেঁকিয়ে বল্‌লে,—তা আপনার বাবু দেখছি বেজায় রসিক। তাঁর স্ত্রী মরতে চলেছেন, সেখানে আমি গিয়ে কী করবো? স্ত্রীর কোনো উইল-টুইল করতে হ'বে নাকি? কই, তা-ও তো কিছু চিঠিতে লেখা নেই। যান্, আপনার বাবুকে গিয়ে একবার জিগ্‌গেস করে' আসুন।

ভদ্রলোক কাতর মুখভার করে' বিবর্ণ গলায় বল্‌লে—মা-ঠাকরুণ সত্যিই বেশিক্ষণ আর নেই। আপনি দয়া করে' একবারটি চলুন।

—কিন্তু আমি গিয়ে করবো কী তাই বলুন শুনি। কে না কে সীতেশবাবু, তাঁর স্ত্রী বসেছে মরতে, সেখানে আমার কী করবার আছে। ব্যাপারটা যে আপনারা মশাই, যাচ্ছেতাই ঘোরালো করে' তুললেন। দেখুন আরেকবার ভেবে। লোকেশ অমনোযোগী হ'বার চেষ্টা করলে ঃ আপনার বাবু নিশ্চয়ই শোকের মাথায় কা'র ঠিকানা লিখতে আর-কা'র ঠিকানা লিখে দিয়েছেন। অবস্থা খারাপ বুঝলে, আমি ড্রাইভার সমেত আপনাকে গাড়ি দিচ্ছি, চট্

করে' জেনে আসুন গে। আমি নই, মশাই। এ কখনো হ'তে পারে?

—আপনিই। ভদ্রলোকের কথাটা এবার একটা কঠিন তিরস্কারের মতো শোনালো : মা-ঠাকরুণ আপনাকে একবারটি দেখতে চেয়েছেন।

গলা ছেড়ে লোকেশ হঠাৎ হেসে উঠলো ; টেব্‌লে একটা চড় মেরে বল্‌লে,—এ বলে কী! আপনি কি দিনে-দুপুরে পাগল হ'লেন নাকি মশাই? মাননীয় ভদ্রলোকের স্ত্রী, মর্‌তে বসেছেন ব'লে কি মাথা তাঁর এমনি খারাপ হয়েছে যে চেনেন না—শোনেন না কোথাকার এক উকিলকে দেখবার জন্যে আবদার করবেন? এ যে মশাই, উপন্যাসেও পড়া যায় না।

হাসি থেমে গেলে সহসা ঘরের শূন্যতা যেন ভীষণ নিঃশব্দে হাহাকার করে' উঠলো। গলা নামিয়ে লোকেশ জিগ্‌গেস করলে ; আপনার মা-ঠাকরুণের নাম বলতে পারেন?

—পারি।

—কী?

—শ্রীযুক্তা—

—নাম, নাম।

—লীলাবতী—

—লীলা? তাই বলুন। মোকদ্দমা-সম্পর্কে নতুন একটা কেস্‌-ল'র নজির পাওয়ার মতো প্রায় সে যেন একটা ইন্‌টেলেকচুয়েল আরাম অনুভব করলে : That Lily? হুঁ। বিয়ে করেছিলো শুনেছিলাম। ও! আপনার ঐ সীতেশবাবুকে বুঝি? কী করেন ভদ্রলোক?

ভদ্রলোক বল্‌লে—সাতক্ষীরার ওদিকে তাঁর জমিদারি আছে। আমি তাঁর সরকার—এই পঁচিশ বছর, তাঁর বাবার আমল থেকে কাজ করে' আসছি।

—লীলা, লীলা, নামটা টেনে-টেনে বার দুই উচ্চারণ করে' লোকেশ কাগজপত্রে ফের মন দিলে ; বল্‌লে,—গোড়ায় সেই কথাটা বললেই হ'তো। আপনাকে, তা হ'লে মিছিমিছি আর পাগল ঠাওরাতুম না।

প্রায় আপ্যায়িত হ'বার ভঙ্গি করে' সরকার বললে,—না,না, তাতে কিছু আমি মনে করিনি।

—কিন্তু মেয়েদের সব-সময়েই স্বামীর নামে পরিচয় দিতে হ'বে এ অত্যন্ত কুপ্রথা, মশাই। কে-না-কে এক সীতেশবাবুকে বিয়ে করেছে ব'লেই লীলা চিরজীবনের জন্যে সীতেশবাবুরই স্ত্রী থাক্‌বে, এ-ও এক চমৎকার আবদার দে হ। লোকেশ রেখাহীন, নিশ্চিন্ত মুখে জাজ্‌মেণ্টের সার্টিফাইড কপি-র উপর নীল পেন্সিলে মোটা-মোটা দাগ টানতে লাগ্‌লো।

সরকার নরম, ভিজা গলায় বল্‌লে,—কিন্তু সেই জীবন আর বেশিক্ষণ নেই। আপনি একবারটি চলুন, বোধ হয় ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সব শেষ হ'য়ে যাবে।

—সব শেষ হ'য়ে যাবে। শব্দ কয়টা আবৃত্তি করার মতো ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করে' লোকেশ বললে,—সব তো কবেই শেষ হ'য়ে গেছে। এখন আমি গিয়ে করবো কী? আমার আর কী কাজ?

—মা-ঠাকরুন যে আপনাকে ভারি দেখতে চাইছিলেন।

—তাই বলুন। লোকেশ মুখ তুলে সোজা হ'য়ে বসলো, মুচকে একটু হেসে বল্‌লে,—কিন্তু আপনার বাবু চিঠিতে সে কথাটা বেমালুম চেপে গেছেন দেখছি। লিখেছেন, দেখুন না এই চিঠিটা : আমার স্ত্রী মৃত্যুশয্যাশায়ী, আপনি আসিয়া দয়া করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব একবার তাহাকে দেখিয়া যাইবেন।

—ও তাই হ'লো, সরকার অস্থির হ'য়ে ঝাঁজালো গলায় বললে,—এতো বড়ো বিপদের সময় বাবুর ভাষার ভুল ধরবেন না। আপনি চলুন।

চিঠিটা একপাশে সরিয়ে রেখে লোকেশ আবার পেন্সিল নিলে ; বললে,—সীতেশবাবুর স্ত্রীর কী হয়েছে?

—সে অনেক-কিছু, ভুগছেন আজ প্রায় তিনমাসের ওপর—ডাক্তাররা অনেক সব উদ্ভট নাম বাৎলালে, কিন্তু কিছুতেই কিছুর কিনারা হ'লো না। কাল রাত বারোটা থেকে অবস্থা একেবারে খারাপের দিকে চলে' গেছে, আজ সকালবেলা শ্বাস সুরু হয়েছে দস্তুরমতো।

লোকেশ ঠোঁটের কোণটা আবার কুঁচ্‌কোলো : শ্বাস উঠেছে অথচ স্পষ্ট নাম-ঠিকানা মনে করে' কাউকে দেখতে চাইছে, এযে দেখছি মশাই অদ্ভুত রুগী। আপনাদের কিচ্ছু ভয় নেই, এ-রুগী ঠিক সেরে উঠবে।

নিদারুণ বিরক্ত হ'য়ে সরকার বললে,—কথা না-হয় কাল রাত থেকে বন্ধ হয়েছে. কিন্তু তাই বলে কাউকে দেখবার ইচ্ছাটা আর আগে জানানো যায় না?

—তাই বলুন। লোকেশ পিঠ সোজা করে' চেয়ারে হেলান দিলে : তা হ'লে অনেক আগে থেকেই আমাকে দেখতে চেয়েছে। আপনার বাবু শেষকালে কিনা আমাকেই দয়া করতে বলছেন। কিন্তু এখন, এই শেষ সময়ে গিয়ে আমি কি করবো? আমায় কে চিনবে?

—কেন চিনবেন না? বাবু-ই তো আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন—আমি সঙ্গে করে' নিয়ে গেলে কেন তিনি আপনাকে চিনতে পারবেন না?

কথাটা যেন ভীষণ উপভোগ করবার মতো—লোকেশ এমনি গভীর সরলতায় গলা ছেড়ে হেসে উঠলো। বল্‌লে—তা, সঙ্গে না-হয় আমি আমার একখানা ভিজিটিং-কার্ডও নিয়ে যাবো। কিন্তু আমি গেলে কারু কোনো কিছু লাভ হ'বে বলতে পারেন? আমি প্রোফেশ্যনাল্ মোর্নার নই, মড়ার খাটে আমি কাঁধও দিতে পারবো না। আর কারু শোকে ধর্‌তাই বুলি পেড়ে সান্ত্বনা দেয়া --Oh horrible, আমি সমস্ত শরীর দিয়ে তা ঘৃণা করি। আপনাদের বিপদের মাঝে আমি গিয়ে করবো কী? ও-সব হৈ-চৈ আমায় পোষায় না, মশাই।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের আপদ-নখ দেহ রাগে ও ঘৃণায় থরথর করে' কেঁপে উঠলো। ব্যাপারটা সে কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারলো না। জমিদারি কাজে এতো দীর্ঘ সময় ব্যাপৃত থেকেও এতো বড়ো একটা আমানুষিকতা সে মরে' গেলেও কল্পনা করতে পারতো না। বর্বরতম অপরাধ করে' যে ফাঁসি যায় সেও বোধ করি মানুষত্বের নামে এর চেয়ে বেশি করুণা দাবি করতে পারে।

ভদ্রলোক কঠিন করে' বললে,—আপনার সঙ্গে বাজে কথা বলার আমার সময় নেই। আপনি যাবেন কিনা বলুন।

—বাজে কথা বলার আমারই কি সময় আছে নাকি?

ন'টা প্রায় বাজে, খেয়ে-দেয়ে আমাকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কোর্টে যেতে হ'বে। লোকেশ ড্রয়ার টেনে সিগারেটের একটা টিন বা'র করলো : কেউ মরছে শুনে সমস্ত পৃথিবী তো মশাই, হাত-পা গুটিয়ে বসে' থাকতে পারে না! একমাত্র মরা-ই তো আর মানুষের কাজ নয়।

ঝুঁকে পড়ে' লোকেশ আবার কাগজপত্র ঘাঁটতে সুরু করলে।

ভদ্রলোক আর দাঁড়ালো না। দরজার কাছে এসে তেতো, রুক্ষ গলায় বললে,—তা হ'লে বাবুকে গিয়ে বলবো আপনি ফি পাবেন-না বলে' এলেন না।

—আপনার যা খুসি বলতে পারেন। আমার কাজ আগে, না বিলাসিতা আগে?

—ছি-ছি, ভদ্রলোক ততোক্ষণে বাইরে চলে' এসেছে : একজন মরতে বসেছে, সে সাত শত্রু হ'লেও তো, মানুষে শেষ সময়ে তা'র সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, আর এ কি না একজন শিক্ষিত উকিল—এতো যা'র নাম-ডাক—ছি-ছি-ছি--

ভদ্রলোক সঙ্গে একেবারে একটা গাড়ি নিয়ে এসেছিলো। ভদ্রলোক উঠতেই গাড়ি স্টার্ট দিলে।

এতোদিন ধরে' যাকে সে মনে-মনে ঘৃণা করে' এসেছে তাকেই যে সে কোন একদিন সর্বাঙ্গ ভরে ভালবেসেছিল সে-কথা লোকেশের নতুন করে' আজ মনে পড়লো। বহু বৎসর পরে জন্মভূমিতে ফিরে আসার মতো যেন মনোরম লাগছে। গুণে' হিসেব করে' দেখলো লীলার বিয়েছে হয়েছে আজ ছ' বচ্ছর—বিয়ে হয়েছে মানে শরীর নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, লোকেশের প্রেমকে করেছে অপমানিত, প্রত্যাশাকে করেছে রূঢ় অপঘাত। সেদিনের সেই অকালস্বপ্নভঙ্গের পর লোকেশ তার চারপাশে ধীরে-ধীরে পৃথিবীর নতুন পরিবেশ রচনা করলে ঃ তার প্রেমের তিরোধানের শূন্যতা বিস্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো। প্রথম-প্রথম সে-প্রেম রূপান্তরিত হ'য়ে উঠলো প্রবলতম ঘৃণায়, পাশবিক প্রতিহিংস্রতায় ঃ সেখানেও সেই সমান উন্মাদনা, সমান দাহ। যা ছিলো মধুর, তা-ই হ'য়ে উঠলো বিষ ঃ যা ছিলো নেশা, তাই হ'য়ে উঠলো মত্ততা। লীলাকে তার জীবন থেকে বাদ দেবার জন্যে সুরু হ'লো তার নতুন সমারোহ—ত্যাগের তীব্রতা। যে বিদায় নিয়ে গেছে, তার ছায়ার প্রহরায় সে জীবন কাটাতে পারবে না—যেখানে যতোটুকু স্মৃতির ধূলিকণা সঞ্চিত হ'য়ে ছিলো সব সে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে—তার এই বাঁচবার বেগের হাওয়ায়। ছিঁড়লো সব তার চিঠি-পত্র, ভুললো সব তার স্পর্শ ও সামীপ্যের ইতিহাস। মনে-মনে তার নামোচ্চারণ করা পর্যন্ত পাপ, রাত্রে তাকে স্বপ্নে দেখলে মনে করতে হ'বে স্বাস্থ্যবিকৃতি। তার জীবন্ত থাকার পরোক্ষ অভিজ্ঞতাটা পর্যন্ত অপবিত্র। তার পাতিব্রত্যের চেয়ে সামান্য একটা রূপোপজীবিনীর ধর্মভীরুতায় বেশি সত্য, বেশি নিষ্ঠা। সমগ্র শরীরকে রক্ষা করতে হ'লে এই গলিত প্রত্যঙ্গটা সে অনায়াসে কেটে বাদ দিতে পারবে।

শেষে এই ঘৃণা পর্যবসিত হ'য়ে এলো নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে। লীলাকে ঘৃণা করাও যেন তাকে অন্যায় মর্যাদা দেয়া, তার বিচ্ছেদকে স্বীকার করে' নেয়া মানে তার অস্তিত্বকে দেয়া মূল্য। ঘৃণা যেন প্রেমেরই উলটো পৃষ্ঠা, তাই প্রেমের এই প্রতিবেশিতা লোকেশের সহ্য হ'লো না। লীলা হ'য়ে উঠলো মাত্র একটা নাম, তা'র সঙ্গে তা'র সম্পর্কটা মাত্র একটা খবরের কাগজের সংবাদ। লীলার সঙ্গে তার কী ঘটেছিলো না ঘটেছিলো সব যেন একটা মাসিক-পত্রের গল্প। সে বেঁচে আছে কি নেই, তার চেয়ে মোকদ্দমার ফলাফলে লোকেশের বেশি কৌতূহল। সে তার কাজ নিয়ে এতো মশ্‌গুল্‌ যে সা- ন্য একটা বিয়ে করতে পর্যন্ত তার সময় হয় নি।

সেই লীলা আজ এতোদিনের অজ্ঞাতবাস কাটাতে হঠাৎ লোকেশের সামনে আবির্ভূত হ'লো। তাকে সে দেখতে চায়, চিরকালের জন্যে চলে' যাবার আগে তাকে একটিবার সে কাছে পেতে চায়, তার স্বামীকে দিয়ে সে চিঠি লিখে পাঠিয়েছে।

এই বুঝি—এতোদিনে বুঝি তার প্রতিশোধ নেবার সময় এসেছে।

লোকেশের মনে পড়লো বিয়ের অনেক আগে লীলার একবার অনেক দিন ধরে' প্রায় একটা মরণান্তর অসুখ হয়েছিলো। লোকেশ ছিলো তখন তার একান্ত কাছে—রাত্রে-দিনে, তার ঘরে, তার বিছানায়। করতো তাকে অজস্র সেবা, একটা দৈত্যের মতো অক্লান্ত, অমানুষিক পরিচর্যা। তারপর গভীর রাতে, কিছুতেই যখন তার আর ঘুম আসতো না, লোকেশ ছাদে চলে' আসতো অন্ধকারে আলুলিত আকাশের নিচে। মনে-মনে তার প্রার্থনা উঠতো পুঞ্জীভূত হ'য়ে যে-ঈশ্বর লীলার দেহের অণুতম ব্যাক্‌টিরিয়াম্‌ থেকে সুরু করে' বিরাট মহীরুহে পর্যন্ত প্রাণক্রিয়া সঞ্চারিত করে দিয়েছেন, যে-প্রাণ সামান্য পিঁপড়ে থেকে অতিকায় গণ্ডারে, স্পঞ্জে, শামুকে, সাপে, অক্টোপাসএ, লিচেনথেকে তিমিতে, মাকড়সা থেকে প্রজাপতিতে, ঘাসে, আগাছায়, চাঁপার কোরকে—লোকেশ সমস্ত দেহ-মন দিয়ে

লীলার দেহে কামনা করতো সেই প্রাণ, সেই দ্রুত তীক্ষ্ণ স্পন্দমানতা। ঈশ্বরের কাছে সে আর কিছু ভিক্ষা করতো না, শুধু লীলা বেঁচে উঠুক, মাত্র শরীরে বেঁচে উঠুক, এই ছিলো তার আপ্রাণ প্রার্থনা। লীলার কাছে কিছুই যেন তার আর চাইবার নেই—শুধু তার দেহে থাক্ প্রাণবহনের দীপ্তি, মাত্র একটা যান্ত্রিক ছন্দোবদ্ধতা! আর সে কিছু চায় না, লীলা শুধু বেঁচে উঠবে, আবার খিল্‌খিল্ করে হাসবে, ঘরে-বারান্দায় ছুটোছুটি করে' বেড়াবে, সেতার বাজাবার সময় আধখানা শরীর এলিয়ে তেমনি পা বেঁকিয়ে বস্‌বে। আবার তেমনি পিঠে ভেঙে পড়বে খোঁপার স্তূপ, শরীরের রেখায়-রেখায় পিছলে পড়বে লাবণ্য। আর সে কিছু চায় না, শুধু লীলা বেঁচে উঠুক। তার চেয়ে বড়ো কীর্তি যেন লীলার আর কিছু থাকতে পারে না। আকাশের সীমান্তে প্রতি রাত্রে যেমন একটি তারা জেগে থাকে, তেমনি পৃথিবীর একপ্রান্তে সে বেঁচে থাকলেই যেন যথেষ্ট।

সত্যি-সত্যি, তার সেবায় হোক্, প্রার্থনায় হোক, লীলা বেঁচে উঠলো। বেঁচে উঠলো, কিন্তু তার প্রেম গেলো মরে'। চোখের জল ও মুখের হাসিতে জীবনের একটা প্রান্তে বিচিত্রিত রামধনুর মতো ক্ষণকাল জেগে থেকে মিলিয়ে গেলো সে বিস্মরণের অন্ধকারে।

সেই থেকে সজ্ঞান সচেষ্টতায় লীলাকে সে এড়িয়ে চলেছে; স্বচক্ষে কোনোদিন দেখে নি তার মুখ, যার ললাটে কলঙ্কবিন্দুর মতো সিন্দুর হয়েছে অলঙ্কার, স্মৃতিতে করেনি তার ধ্যান যার নামের আবহাওয়ায় পর্যন্ত দুর্গন্ধ পঙ্কিলতা। কিন্তু, আশ্চর্য, তবু সে লোকেশকে ভোলে নি, তার অস্তিত্বের অন্তরালে কঠিন কঙ্কালের মতো সে সেই অতীত আজো পর্যন্ত লালন করে' এসেছে : আজ কিনা সমস্ত অন্তরাত্মা অনাবৃত করে' তাকে সে একবার দেখতে চাচ্ছে! মরতে বসেছে বলে'—ভেবেছে—এই এক কণা করুণা থেকে হয়তো সে বঞ্চিত হ'বে না।

লোকেশ হাঁক দিলো : বিনোদ!

সোফার হাজির।

—গাড়ি বা'র করো শীগগির, আমায় এক্ষুনি একটু বেরোতে হ'বে। হ্যাঁ, ঠিকানা? লোকেশের মুখ-চোখ ত্রস্ত, বিমর্ষ হ'য়ে উঠলো : ঠিকানা জেনে রাখিনি তো? কী হ'বে? লোকটা একটা bluff দিয়ে গেলো নাকি?

বিনোদ বল্‌লে,—যে-লোকটা গাড়ি করে' একটা চিঠি নিয়ে এসেছিলো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিঠি। চিঠিতে নিশ্চয়ই ঠিকানা আছে। এই যে—সেই টালিগঞ্জ। মুদিয়ালি রোড। চেনো? তবে তৈরি হ'য়ে নাও চটপট, আমি আসছি ওপর থেকে।

উপর থেকে লোকেশ দস্তুরমতো সাজগোজ করে' এলো—বিয়ে-বাড়িতে সে যেন নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছে। পাঞ্জাবির ঢিলে হাতা আর লুটোনো লম্বা কোঁচায় তার পরিপাটী শৈথিল্য, ঘন করে' চুল ফেরানো, পায়ের জুতো আয়নার মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। কতো দিন পরে লীলার সঙ্গে আবার তার দেখা হ'বে।

নিচে, ড্রয়ার খুলে সিগারেট-কেসে সে সিগারেট ভরে' নিচ্ছে, বিনোদ দেখা দিলো।

—চলো। ঠিকানাটা মনে আছে তো?

গাড়ি ট্রাম-ডিপো পার হ'য়ে চললো আরো দক্ষিণে। লোকেশ বল্‌লে,—টার্ন নিয়ে সোজা রাস্তার মধ্যে ঢুকে পড়ো না। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে। কাছাকাছি এলে বলো।

বিনোদ ক্লাচ্ টিপে বল্‌লে,—এইবার আরেকটু সামনে মুদিয়ালি রোড।

—আচ্ছা, দাঁড়াও।

গাড়ি দাঁড়ালো।

লোকেশ একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে,—শোনো! তুমি একবার যাও ও-বাড়ি। চুপি-

চুপি কাউকে জিগ্‌গেস করে' খবর নিয়ে এসো ও-বাড়ির গিন্নি-মা'র এখন কেমন অবস্থা। যদি শোনো এখনো প্রাণ আছে, সটান্ আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, আমার কোর্টের বেলা হ'য়ে গেলো—আমি ওখানে গিয়ে করবো কী?

বিনোদের গলা কেঁপে উঠলো : আর যদি শুনি—

ধোঁয়ায় পর-পর কয়েকটা ring তৈরি করে' লোকেশ বললে,—আর যদি শোনো, হ'য়ে গেছে, তা হ'লেও আমাকে এসে তাড়াতাড়ি খবর দেবে। আমি একবার তাকে দেখবো।

বিনোদ সাত-পাঁচ কিছু অনুধাবন করতে না পেরে আস্তে-আস্তে বাড়ির সন্ধানে বেরিয়ে গেলো।

একটা সিগারেট পুড়তে প্রায় আট মিনিট সময় লাগে—বিনোদ তার মধ্যে ফিরে এলো না। নিশ্চয়ই এখনো প্রাণ যায় নি, তাকে তা হ'লে সোজা বাড়িই ফিরে যেতে হ'বে আর-কি। শেষকালে সমস্ত আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়ে একটা মরণোন্মুখ নারীর কাতরোক্তিতে মুগ্ধ হ'য়ে সে লীলার চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, আর তার এই পৌরুষের পরাজয় দেখে লীলার নিষ্প্রভ চক্ষু হঠাৎ তৃপ্তির জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে—এ অসম্ভব। ফিরেই সে যাবে ঠিক, তার একটা পার্ট-হার্ড কেস্ আছে, পরের একটা তুচ্ছ খেয়ালের জন্যে সে তার কর্তব্যে অবহেলা করতে পারে না। কিন্তু, লোকেশ আরেকটা সিগারেট ধরালো, এতো দূর এসেও যদি লীলাকে তার দেখবার সুযোগ না হয়,—না, ঐ বিনোদ এসে পড়েছে!

—কী বাড়ি পেলে খুঁজে? কি খবর? আছে কেমন?

খবরটা এমন নয় দশ-বিশ গজ দূর থেকে তা চেঁচিয়ে বলা যায়। বিনোদ লোকেশের ঘনিষ্ঠ হ'য়ে দাঁড়ালো ; ভারি, ম্লান গলায় বল্‌লে,—এই খানিক আগে মারা গেছেন।

—যাক্। যেন বুক থেকে কঠিন একটা পাথর নেমে গেছে এমনি স্বচ্ছন্দ চাঞ্চল্যে লোকেশ মোটরের দরজাটা খুলে ফেল্‌লো। ফুটপাথে নেমে এসে বললে,—কী করে' টের পেলে?

স্তম্ভিতের মতো লোকেশের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বিনোদ বল্‌লে,—তুমুল কান্নাকাটি পড়ে' গেছে।

লোকেশ চাপা গলায় প্রায় একটা গর্জন করে উঠলো : বোকা! সে তো মরবে ভেবেও বাড়ির লোকেরা কান্নাকাটি করতে পারে। পৃথিবীতে কান্নার কিছু দুর্ভিক্ষ আছে নাকি?

—না, আমি একজনকে জিগ্‌গেসও করেছিলাম—এতো কান্নাকাটি কিসের? সে বল্‌লে, আধঘণ্টাটাক্ আগে এ-বাড়ির বড়ো গিন্নি আজ মারা গেলেন।

—যাক্। লোকেশ যেন আরো হাল্কা হ'লো। কোঁচাটা বার দুই ঝেড়ে সে বললে,—তুমি তা হ'লে গাড়িতে বোস, আমি গিয়ে একটিবার তাকে দেখে আসছি। কদ্দূর যেতে হ'বে বলো দিকি?

—বেশি নয়, বাঁ হাতি দু' তিনটে বাড়ির পরেই। গাড়িতেই চলুন না।

—না, গাড়ি লাগ্‌বে না। তেল লাগলে মোড়ের দোকান থেকে গ্যালন দুই নিয়ে নাও চট্ করে'। আমি আসছি।

দরজার সামনে যারা ভিড় করে' দাঁড়িয়ে ছিলো, সম্ভ্রান্ত আগন্তুক দেখে তারা একসঙ্গে পথ ছেড়ে দিলো। তাদের মুখের চেহারা দেখে লোকেশের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না যে পরমতম ঘটনাটা নির্বিঘ্নে ঘটে গেছে। কে কী ভাবলো কে জানে, সিঁড়ি গুনে-গুনে লোকেশ উপরে উঠে এলো, অল্পদগ্ধ সিগারেটটা সামনে যে জানলা পেলো, দিলো তার বাইরে ছুঁড়ে। বারান্দা পেরিয়ে, কান্নার উত্তালতা পরিমাপ করে'-করে' সে একেবারে লীলার শোয়ার ঘরে ঢুকে পড়লো।

বহু লোকের জটলা চলেছে, ঘরের মধ্যে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে শোকের তরঙ্গ। তার মধ্যে খাটের উপর স্তূপীকৃত বিছানা-বালিশের মাঝখানে অপরিমাণ নিঃশব্দতার সমুদ্র নিয়ে লীলা শুয়ে আছে। সেই লীলা। লোকেশ এক পা দু' পা করে' খাটের কাছে এগিয়ে এলো। নিজের-নিজের শোক নিয়ে সবাই এতো বিভোর, কেউ তাকে বিশেষ লক্ষ্য করলো না। মৃত্যু আজ যেন সকল দুয়ার অবারিত করে' দিয়েছে।

সেই লীলা। লীলার মৃত্যুর উদ্দেশ্যে তাকে যদি একটা ফরমায়েসি কবিতা লিখতে হ'তো তো তাকে সে অনায়াসে তুলনা দিতো নিরুত্তর এক নদীতটের সঙ্গে। তার আজকের এই পৃথিবীময় অকূল চিহ্নহীনতার যেন তুলনা নেই। একদিন তার মন থেকে সে মুছে গিয়েছিলো, আজ গেলো দেহ থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে। পৃথিবীতে কোথাও আর সে নেই, পৃথিবীর বাইরে সৌরজগন্মণ্ডলে কোনো দূরতম গ্রহ-তারাও নেই এই পার্থিব প্রাণের পরিচয় ; নিঃশেষে সে থেমে গেছে, ফুরিয়ে গেছে, শূন্য হ'য়ে গেছে। লীলার কাছে তার যেন এইটুকুই পাওনা ছিলো,—বাকি ছিলো লীলার শুধু এই শেষ উদ্‌ঘাটন। গভীরতম তৃপ্তিতে লোকেশের সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলো ঃ নিরর্থকতার এতো বড়ো একটা সুন্দর পরিণতি সে যেন এর আগে কোনো দিন কল্পনা করতে পারতো না।

নীরক্ত বিবর্ণতা—লীলা মাত্র তার কঙ্কাল নিয়ে শুয়ে আছে, আর তার প্রাণহীন তাপহীন রুক্ষ চুলের মধ্যে মুখ গুঁজে কে-একজন—এই হয়তো সীতেশ—অসহায় শিশুর মতো কান্নায় উঠছে ফুঁপিয়ে। মৃত্যুর কাছে তার এই শোক যেন কতো বড়ো লজ্জার, মৃত্যুর কাছে তার প্রেমের এই পরাজয় যেন কতো হীন, কতো অপৌরুষেয়। অন্তরতম আনন্দে লোকেশের সমস্ত রক্তস্রোত যেন তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, মুখে ফুটে উঠলো সেই আনন্দের উদ্দীপ্ত নৃশংসতা। লীলার স্বামী দেখছে মৃত্যু, সে দেখছে অবিনশ্বরতা। লীলা নেই, তার অর্থ লোকেশের জীবনের অনপনেয় কলঙ্ক হয়েছে অপসারিত ঃ তার পরাভবের, তার ব্যর্থতার। লীলা নেই, তার অর্থ সে আজ মুক্ত, অ-সীমাবদ্ধ, ফিরে পেয়েছে সে যেন তার হৃত ঐশ্বর্য, লুপ্ত প্রতিষ্ঠা। লীলার কাছে তার পরিচয়ের মাত্র এইটুকুই ছিলো বাকি, একজনের অভাবে এতোদিনে চারদিকে তার উপচে পড়চে চিত্তের পূর্ণতা। লীলা যে এতো সুন্দর, এতো রমণীয় যে তার মৃত্যুর মালিন্য, তার চিরস্থায়ী নিস্তব্ধতা, তার নিঃশেষ অপসরণ, এ-কথা লোকেশ নিজেই এতোদিন উপলব্ধি করে নি। আজ তাই আর তার অহঙ্কারের অন্ত পাওয়া ভার—লীলা আর নেই তার পরিচয়কে খণ্ডিত করতে ; সে এতোদিনে দিয়ে গেছে তার পরম প্রতিদান।

কে আরেকজন সীতেশের গায়ের উপর হাত রেখে সজল কণ্ঠে বল্‌লে,—শত মাথা খুঁড়লেও তো আর তাকে ফিরে পাবে না। ছি সীতেশ, তুমি ছেলেমানুষ নাকি? ছেড়ে দাও এবার লক্ষ্মীটি, অবুঝ হয়ো না। তুমি তো চেষ্টার ত্রুটি করো নি, হাজারে-হাজারে টাকা খরচ করেছ, সহরের নাম করা যেতে পারে এমন কোনো ডাক্তার, কোনো চিকিৎসা বাকি রাখো নি। সাধুসন্নেসি, যাগযজ্ঞ, মানত-হত্যে, সব করে' দেখেছ—ভগবান যাকে নেবেন তা আর কী করে' ফিরে পাবে বলো? মা ছিলেন আমার সাক্ষাৎ ভগবতী, এমন সতীসাধ্বী মা আমার সেই দিব্যধামে চলে' গেছেন। তার জন্যে শোক করছ কী, সীতেশ?

সান্ত্বনার হাওয়া লেগে সীতেশের শোক-শিখা যেন আরো লেলিহান হ'য়ে উঠলো। খেলনা নিয়ে ছোট ছেলে যেমন আকুলি-বিকুলি করে, তেমনি সে আদর করতে লাগলো সেই নিষ্প্রাণ মৃন্ময় পুতুলটাকে। এই ভেবেই তার দুঃখ আজ অসীম যে, যে-দেহ ছিলো একদিন যৌবনে বিহ্বল, লাস্যে তরঙ্গায়িত, তাপে ঘ্রাণে রোমাঞ্চে অরণ্যের মতো শিহরায়মান, তা আজ এতো কুৎসিত, এতো বীভৎস হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু লোকেশের তাতে একবিন্দু সমবেদনা নেই। সে দেখছে যে-দেহ ছিলো এতোদিন বিশ্বাসঘাতকায় কলঙ্কিত,

যান্ত্রিক একটা অভ্যাস-পালনে জড়ত্বপ্রাপ্ত, ক্ষুধায় কামনায় আরামে আমোদে কলুষ-ক্লিষ্ট, তা আজ মৃত্যুতে কতো সুন্দর, কতো অবর্ণনীয় ঐশ্বর্যশালী হ'য়ে উঠেছে। লীলা মরলো বটে, কিন্তু ফিরে পেলো সে যেন তার প্রথম যৌবনের সেই ক্ষণিক মৃত্যুহীনতা। তার মৃত্যুতে আজ লোকেশের মতো কেউ পরিপূর্ণ সুখী নয়।

কে-একটি মহিলা শোকার্ত কণ্ঠে চীৎকার করে' উঠলেন : তোমরা সব কৌটো ভরে' সিঁদুর নিয়ে এসো, নিয়ে এসো আলতার পাতা। বৌমাকে সেই তার বিয়ের বারাণসী-খানা পরিয়ে দাও, হাতে দাও সেই কাজললতা। রাজলক্ষ্মী মা-কে আমার আমি নিজ হাতে সাজিয়ে দেবো। ফুল কই, বাগান উজোর করে' ফুল নিয়ে আস্‌তে বল্‌, সীতেশ।

লোকেশ আর সেখানে দাঁড়ালো না। যেমনই এসেছিলো তেমনি অলক্ষিতে, একটা সিগারেট ধরিয়ে আস্তে-আস্তে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

আশ্বিন ১৩৪০

মন্দাক্রান্তা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

জোড়জোড় করিয়া ছবি আরম্ভ করিতে বর্ষা নামিল।

বোম্বাই বর্ষা—একেবারে চাতুর্মাস্য। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি হঠাৎ একদিন মেঘগুলা পশ্চিমের সমুদ্র হইতে আরব্য উপন্যাসের জিনের মতো উঠিয়া আসে এবং কয়েকদিন ঘোরাফেরা করিয়া বর্ষণের কিছু নমুনা দিয়া চলিয়া যায়। অতঃপর দিন দশেক পরে তাহারা দলে দলে পালে পালে ফিরিয়া আসিয়া সেই যে আসর জমকাইয়া বসে তখন তিন মাসের মধ্যে আর সূর্যের মুখ দেখিবার উপায় থাকে না। দিনগুলাকে তখন রাত্রির কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মনে হয় এবং জল ও স্থলের প্রভেদ এতই অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায় যে মানুষগুলাকে জলচর জীব বলিয়া মানিয়া লইতে আর কোনই কষ্ট হয় না।

কবি বলিয়াছেন—এমন দিনে তারে বলা যায়। কবির কথা মিথ্যা নয়, উপযুক্ত পাত্রপাত্রী পাইলে নিশ্চয় বলা যায় ; একবার নয়, বারবার বলা যায়, ঘুরিয়া ফিরিয়া মন্দাক্রান্তা ছন্দে ইনাইয়া বিনাইয়া বলা যায়। কিন্তু বলা ছাড়া আর কোনও উদ্যম-সাপেক্ষ কাজ করিবার ইচ্ছা বোধকরি কাহারও মনে উদয় হয় না। দেহ মনের এমন একটি আলস্যমন্থর জড়তা উপস্থিত হয় যে কবির শরণাপন্ন না হইলেও বলিতে ইচ্ছা করে—সমাজ সংসার মিছে, সব মিছে এ জীবনের কলরব।

এই তো গেল আটপৌরে ব্যবস্থা। তার উপর মাঝে মাঝে যখন সাইক্লোন আসিয়া উপস্থিত হয় তখন বর্ষার ঢিমা আসর একমুহূর্তে জমাট বাঁধিয়া যায়। তখন মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাতাস চৌদলে ছুটিতে থাকে, দিগঙ্গনার নৃত্যে সভাতল আলোড়িত হইয়া ওঠে এবং আকাশের মৃদঙ্গ হইতে যে বোল্ উত্থিত হইতে থাকে তাহাকে কোনও মতেই ধামার বা দশকুশীর সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

কিন্তু ইহা যেমন আকস্মিক তেমনি ক্ষণিক। আবার ধীরে ধীরে সভা ঝিমাইয়া পড়ে ; ঝিল্লীরব শোনা যায় ; কেতকীর গন্ধবিমূঢ় বাতাস নেশায় ঝিম্ হইয়া থাকে।

এদিকে পৃথিবী ঘুরিতেছে ; জড় জগতে অণু পরমাণুও চুপ করিয়া বসিয়া নাই। সুতরাং মানুষকেও কিছু-না-কিছু করিতে হয়। কিন্তু সব কাজই মহাক্রান্তা ছন্দে বাঁধা, গুরুগম্ভীর মন্থরতায় আরম্ভ হইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষাকৃত দ্রুত লয়ে চলিবার পর আবার শিথিল হইয়া এলাইয়া পড়ে। পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল—

যাহোক সোমনাথের কাজ একরকম ভালই চলিতেছিল। তাহার নূতন কাজে হাতেখড়ি, তাই সে আটঘাট বাঁধিয়া কাজে নামিয়াছিল। পাণ্ডুরঙের সহিত সকল বিষয় পরামর্শ করিয়া সে কাজ করিত, পাণ্ডুরঙ্ ছিল তার দক্ষিণ হস্ত। তা ছাড়া ইন্দুবাবু প্রায়ই সেটে আসিয়া বসিতেন এবং কালোপযোগী উপদেশ দিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেন। রুস্তমজিও কদাচিৎ আসিয়া বসিতেন এবং নীরবে তাহাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেন। রুস্তমজির একটি মহৎ গুণ ছিল, একবার যাহার হাতে কার্যভার অর্পণ করিয়াছেন তাহার কার্যে আর হস্তক্ষেপ করিতেন না।

সোমনাথ মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এবার ছবির খরচ সে কিছুতেই দেড় লক্ষ টাকার উপরে উঠিতে দিবে না। রুস্তমজি অবশ্য আড়াই লক্ষ পর্যন্ত খরচ করিতে

প্রস্তুত ছিলেন ; কিন্তু সোমনাথ লক্ষ্য করিয়াছিল, ছবি নির্মাণ ব্যাপারে অনেক অনাবশ্যক খরচ হয়, অনেক টাকা—ন দেবায় ন ধর্মায়—যায়। এবার সে কিছুতেই তাহা ঘটিতে দিবে না। তাহার ছবি ভাল হইবে এ বিশ্বাস তাহার ছিল ; কিন্তু ভাল হইলেই ছবি চলিবে এমন কোনও কথা নাই। তাই খরচ যদি কম হয় তাহা হইলে লোকসানের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়। লাভ যদি না হয়, অন্তত খরচটা উঠিয়া আসিতে পারে।

অত্যন্ত সতর্কভাবে সদা শঙ্কিতচিত্তে সোমনাথ কাজ করিয়া চলিল। মাঝে মাঝে ভগবানের কাছে অতি সঙ্গোপনে প্রার্থনা জানাইতে লাগিল—হে ভগবান, আমি অতি অধম, কিন্তু যদি এতবড় সুযোগটা দিয়াছ, মাথায় পা দিয়া ডুবাইয়া দিও না।

এদিকে সোমনাথের পারিবারিক পরিস্থিতিতেও কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। আবার মাসের শেষের দিকে জামাইবাবু হঠাৎ পুণায় বদলি হইলেন ; ঘোর বর্ষার মধ্যে তিনি দিদিকে লইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু বাড়ীখানা ছাড়া হইল না। কারণ জামাইবাবুর আবার শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা আছে, তাছাড়া সোমনাথেরও একটা আস্তানা চাই। সোমনাথ ভরা বাদরে শূন্য মন্দিরে পড়িয়া রহিল।

মাঝে মাঝে পাণ্ডুরঙ্ আসিয়া তাহার বাসায় রাত্রিবাস করিয়া যাইত। দুইবন্ধু একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত ছবির কথা আলোচনা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িত। তারপর সকালবেলা আবাব একসঙ্গে কাজে বাহির হইত। রুস্তমজি সোমনাথকে একটি দ্বিতীয় পক্ষের মোটর কিনাইয়া দিয়াছিলেন। পুরাতন হইলেও গাড়ীটি বেশ কর্মক্ষম, এই ভরা সময়ে ভারি কাজে লাগিতেছিল।

এই সময় সোমনাথের আর একটি উপসর্গ জুটিয়াছিল। এতদিন তাহার জীবনে চিঠি লেখালেখির কোনও পাঠ ছিল না ; এখন চারিদিক হইতে তাহার কাছে চিঠি আসিতে আরম্ভ করিল। অধিকাংশ পত্রলেখকই অচেনা, কিন্তু দু'চারজন পরিচিত ব্যক্তিও আছেন। সোমনাথ বুঝিল, তাহার প্রথম চিত্র সাধারণে প্রকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে তাহার কীর্তি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

অপরিচিত পত্র-লেখকগণ—তাঁহাদের মধ্যে তরুণীর সংখ্যা কম নয়—কেবল অনুরাগ ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা আবার আর একটু দূর গিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ ও কলিকাতায় সোমনাথের পরিচিত ব্যক্তির অভাব ছিল না, এতদিন তাঁহারা তাহার খোঁজখবর লওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কিন্তু এখন কোনও অলৌকিক উপায়ে তাহার ঠিকানা আবিষ্কার করিয়া তাঁহারা পত্রাঘাত করিতে সুরু করিলেন। তাঁহাদের সহৃদয়তা ছাপাইয়া একটি ইঙ্গিত কিন্তু খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিল ঃ সুযোগ এবং সুবিধা পাইলে তাঁহারাও সিনেমায় যোগ দিয়া অবিনশ্বর কীর্তি অর্জন করিতে প্রস্তুত আছেন। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের আগ্রহ সব চেয়ে বেশী। তিনি সোমনাথের কলিকাতাস্থ ব্যাঙ্কের একজন প্রবীণ কেরাণী, শীঘ্রই কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। যৌবনকালে তিনি সখের থিয়েটার করিতেন ; এই অজুহাতে তিনি সোমনাথকে ধরিয়া পড়িয়াছেন, কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে যেন সোমনাথ তাঁহাকে সিনেমায় টানিয়া লয়। ভদ্রলোক একেবারে নাছোড়বান্দা।

এই সব অপ্রত্যাশিত পত্রবৃষ্টির ফলে সোমনাথ প্রথমটা কিছু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ক্রমে পাণ্ডুরঙের উপদেশ পাইয়া ধাতস্থ হইল। পাণ্ডুরঙ্ বলিল, সিনেমায় সিদ্ধিলাভের ইহা একটি অনিবার্য পরিণাম এবং মানসিক শান্তি বজায় রাখিতে হইলে পত্রগুলির উত্তর না দেওয়াই সমীচীন। চিঠি লেখার অভ্যাস সোমনাথের কোনও কালেই ছিল না, সে পরম আগ্রহের সহিত পাণ্ডুরঙের সারগর্ভ উপদেশ গ্রহণ করিল।

কেবল একখানি চিঠি পড়িয়া সোমনাথ কিছু বিমনা হইল। কলিকাতা হইতে তাহার এক

সমবয়স্ক বন্ধু লিখিয়াছে, বন্ধুটি আবার দূর সম্পর্কে জামাইবাবুর আত্মীয় হয়। বেচারা স্কুলের শিক্ষক, চিত্রাভিনেতা সাজিবার দুরভিসন্ধি তাহার নাই ; নিতান্তই বন্ধুপ্রীতির বশবর্তী হইয়া চিঠি লিখিয়াছে। চিঠিখানি অংশত এইরূপ—

'—ছবিটা চমৎকার হয়েছে ; কলকাতার লোক হুম্‌ড়ি খেয়ে দেখছে। বন্দনা দেবীর ছবি অবশ্য জনপ্রিয় হয়, কিন্তু হিন্দী ছবি বাঙালীরা বেশী দেখে না। এবার বাঙালীরাও দেখছে। তার কারণ বোধহয় এই যে, তুমি বাঙালী এবং তোমার অভিনয় সুন্দর হয়েছে। ছবিখানা বার তিনেক দেখেছি।

একটা খবর দিই। যে তিন দিন আমি তোমার ছবি দেখতে গিয়েছিলাম সেই তিনদিনই রত্নাকে সিনেমায় দেখলাম ; সেও ছবি দেখতে গিয়েছিল। রত্না সিনেমা পছন্দ করে না জানতাম। ব্যাপার কি? শুনলাম কিছুদিন আগে সে বোম্বাই গিয়েছিল। এর ভেতরে কোনও নতুন তত্ত্ব আছে নাকি? যদি থাকে, ইতর জনের দাবী এখন থেকে জানিয়ে রাখছি—

বন্ধুসুলভ চটুলতা বাদ দিয়া খবরটা দাঁড়ায়—রত্না তিনবার তাহার ছবি দেখিতে গিয়াছিল ; তিন বারের বেশীও হইতে পারে। এখন প্রশ্ন এই, কেন গিয়াছিল? খুব বেশী ভাল না লাগিলে একই ছবি কেহ তিনবার দেখে না। রত্না স্বভাবতই সিনেমার প্রতি বিরূপ ঃ তার উপর সম্প্রতি বোম্বাইয়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে সে সহসা সিনেমার অনুরাগিণী হইয়া পড়িবে এরূপ মনে করাও কঠিন। সোমনাথের প্রতিও তাহার মন সদয় নয়। তবে, যে ছবিতে সোমনাথ নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে সেই ছবি বারবার দেখিবার অর্থ কি? ছবিতে এমন কী অনিবার্য আকর্ষণ আছে যে রত্না না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছে না?

অনেক চিন্তা করিয়া সোমনাথ একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। পর-চিত্ত অন্ধকার ; উপরন্তু রমণীর মন চিরদিনই গভীর রহস্যে আবৃত। সোমনাথ বিমর্ষচিত্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, রত্নার ছবি দেখার কার্য-কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করা তাহার কর্ম নয়।

২

কয়েকদিন ধরিয়া কোলাবা'র আবহ-মন্দির হইতে ভবিষ্যদ্‌বাণী হইতেছিল—আরব সাগরের বায়ুমণ্ডলে সাম্য নষ্ট হইয়াছে. সুতরাং শীঘ্রই একটা ঝড়ঝাপটা আশা করা যাইতে পারে। এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী নিয়মিত আবহ-মন্দির হইতে বাহির হইয়া থাকে এবং সংবাদপত্রে ছাপা হয় ; কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে এরূপ নজির না থাকায় কেহই উহা গ্রাহ্য করে না।

যাহোক, ঝড়ে কাক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে। আবহবার্তা তিন দিনের বাসি হইয়া যাইবার পর একদিন অপরাহ্ণের দিকে একটা এলোমেলো বাতাস উঠিল। বৃষ্টি সারাদিন ধরিয়াই পড়িতেছিল, এখন যেন আর একটু চাপিয়া আসিল। ক্রমে যতই সন্ধ্যা হইতে লাগিল ততই অলক্ষিতে বায়ুর বেগ বাড়িয়া চলিল।

সারা দিন ষ্টুডিওতে সোমনাথের শুটিং ছিল। সন্ধ্যা ছ'টার সময় কাজ শেষ করিয়া সে বাহির হইল। পাণ্ডুরঙ্কে বলিল—'চল, আজ রাত্রে আমার বাসায় থাকবে।'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'উঁহু। আকাশের গতিক ভাল নয়। রাত্রে সাইক্লোন দাঁড়াতে পারে। আমার বউটা খাণ্ডার ; আজ রাত্রে যদি বাড়ি না ফিরি, কাল আর আমাকে আস্ত রাখবে না।'

সোমনাথ বলিল,—'বেশ, চল তাহলে তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাই।'

পাণ্ডুরঙ্কে বাসায় পৌঁছাইয়া সোমনাথ যখন নিজের বাসায় ফিরিল তখন দিনের আলো আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। বায়ুর বেগ আর একটু বাড়িয়াছে। রাস্তার গাড়ী ও মানুষের চলাচল অনেক কমিয়া গিয়াছে। কেবল রাস্তার আলোকস্তম্ভগুলি অসহায় ভাবে দাঁড়াইয়া

ধারাস্নান করিতেছে।

গারাজে মোটর বন্ধ করিয়া সোমনাথ তাড়াতাড়ি বাড়ীর বারান্দায় আসিয়া উঠিল। বারান্দা অন্ধকার ; জলের ছাট্ আসিয়া মেঝে ভিজাইয়া দিতেছে। সদর দরজার তালা বন্ধ ছিল ; সোমনাথ পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া সন্তর্পণে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

তালা খুলিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবে এমন সময় স্ত্রীকণ্ঠের আওয়াজ আসিল,—'সোমনাথবাবু!'

সোমনাথ চমকিয়া উঠিল। এতক্ষণে তাহার চক্ষু অন্ধকারে অভ্যস্ত হইয়াছিল ; রাস্তা হইতে আলোর একটা ক্ষীণ আভাও আসিতেছিল। সোমনাথ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিল, দ্বারের অনতিদূরে বারান্দার দেয়াল ঘেঁষিয়া একটি স্ত্রীলোক সুট্কেসের উপর বসিয়া আছে। তাহার পাশে বর্ষাতি হোল্ড-অলের মতো একটা কিছু পড়িয়া রহিয়াছে।

সোমনাথ শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল—'কে?'

স্ত্রী মূর্তি উঠিয়া দাঁড়াইল—'আমি রত্না।'

মুহূর্তের জন্য সোমনাথের মাথাটা একেবারে খালি হইয়া গেল, তাহার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল—'রত্না!'

অন্ধকারে রত্নার মুখ দেখা গেল না, কিন্তু তাহার কণ্ঠের তীক্ষ্ণ অধীরতা গোপন রহিল না—'হ্যাঁ। ব্যাপার কি? দাদা—বৌদি কোথায়?'

সোমনাথের মস্তিস্ক আবার ইঞ্জিনের বেগে কাজ করিতে আরম্ভ করিল। সে দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি কয়েকটা সুইচ টিপিয়া ঘরের ও বারান্দার আলো জ্বালিয়া দিল। তারপর আবার বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল।

রত্নার কাপড়চোপড় বৃষ্টির ছাটে ভিজিয়া গিয়াছে ; কিন্তু তাহাব মুখ কঠিন, চোখের দৃষ্টিতে শুষ্ক বিরক্তি। ক্ষিপ্ত চক্ষে একবার সোমনাথের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া সে বলিল,—'দাদা বৌদি কোথায়?'

সোমনাথ দুই হাতে রত্নার সুট্কেস ও বিছানা তুলিয়া লইয়া বলিল,—'বলছি, আগে ভেতরে এস! একেবারে ভিজে গেছ যে। কতক্ষণ এসে বসে আছো?'

উভয়ে ঘরে প্রবেশ করিল। রত্না বলিল, তিনটের সময় ট্রেন এসেছে ; বাড়ী পৌঁছতে চারটে বেজেছে। তারপর থেকেই বসে আছি।'

'কি সর্বনাশ! তিন ঘণ্টা বাইরে বসে আছ?'—সোমনা- লটবহর এক পাশে নামাইয়া রাখিল।

'হ্যাঁ। কিন্তু দাদা বৌদি কি বোম্বায়ে নেই?'

'জামাইবাবু আজ দশ দিন হল পুনায় বদলি হয়ে গেছেন। কেন, তোমরা খবর পাওনি?'

রত্না কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠা ভরা চোখে সোমনাথের মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল,—'না আমি খবর পাইনি। আমি কলকাতায় ছিলাম না, এলাহাবাদে এক বন্ধুর কাছে বেড়াতে এসেছিলাম। সেখান থেকে আসছি।—তাহলে এখন তুমি একা বাড়িতে আছো?'

সোমনাথ বলিল,—'হ্যাঁ।'

নতমুখে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া রত্না মুখ তুলিল,—'বাড়ীতে চাকর-বাকরও কি নেই?'

সোমনাথ বলিল,—'চাকর-বাকর? হ্যাঁ আছে বৈকি। একটা চাকর আর বামুন আছে। আমি সকাল বেলাই বেরিয়ে যাই, তারাও খেয়ে দেয়ে দুপুরবেলা বেরোয়। কিন্তু সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসে। আজ কি জানি এখনও ফেরেনি। ওঃ—মনে পড়েছে—'

'কী?'

'আজ সকালে ওরা দু'জনে যোগেশ্বরীর গুহা দেখতে যাবে বলে ছুটি চেয়েছিল, সেখানে নাকি কোন্ সাধু এসেছেন। যোগেশ্বরী বেশী দূর নয়, কিন্তু ট্রেনে যেতে হয়। হয় তো ঝড় বাদলে আটকে পড়েছে।'

'বেশ যা হোক। এখন আমি কি করি?' বলিয়া রত্না একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

সোমনাথ একটু ইতস্তত করিয়া বলিল,—'আপাতত ভিজে কাপড়চোপড়গুলো ছেড়ে ফেলতে পারো।'

বিরক্তি-কণ্টকিত কণ্ঠে রত্না বলিল,—'তা যেন পারি। কিন্তু আজ রাত্রে আমি থাকব কোথায়?'

সোমনাথ কিছুক্ষণ রত্নার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর প্রশ্ন করিল—'এ বাড়ীতে থাকা কি চলবে না?'

রত্না উত্তর দিল না, গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। এমন মুস্কিলে সে জীবনে পড়ে নাই।

সদর দরজাটা এতক্ষণ খোলাই ছিল, হাওয়ার দাপটে কপাট দুটা বারবার আছাড় খাইতেছিল। সোমনাথ গিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল। সে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলে রত্না মুখ তুলিল—'আজ রাত্রে পুণার ট্রেন পাওয়া যায় না? পুণা তো কাছেই।'

সোমনাথ ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসিল, নীরস কণ্ঠে বলিল,—'পুণা এখান থেকে একশো কুড়ি মাইল। ট্রেন যদি বা পাওয়া যায়, পৌঁছুতে রাত দুপুর হবে। জামাইবাবুর ঠিকানা তোমায় দিতে পারি, কিন্তু এই ঝড়ের রাত্রে বাড়ী খুঁজে পাবে কিনা সন্দেহ। স্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাত কাটাতে হবে। তোমার যদি তাতেই সুবিধে হয়—'

রত্না নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—'কাল সকালেই যাব তা হলে। কি শুভক্ষণে বোম্বাইয়ে পা দিয়েছিলাম।' বলিয়া নিজের সুটকেসটা তুলিয়া লইয়া স্নানঘরের অভিমুখে চলিয়া গেল।

সোমনাথ আরও কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর সেও একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। বাড়ীতে অতিথি, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

আজ বারান্দায় রত্নাকে চিনিতে পারিয়া ক্ষণকালের জন্য সোমনাথের মস্তিকের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল ; তারপর বাঁধ-ভাঙা স্রোতের মতো তাহার মনের মধ্যে অহেতুক আনন্দের বন্যা বহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহাও ক্ষণকালের জন্য। রত্নার মুখের ভাব ও তাহার কথা বলার ভঙ্গী তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল যে সোমনাথ রত্নার দাদার শ্যালক এবং রত্না সোমনাথের দিদির ননদ ; ইহার অধিক সম্পর্ক তাহাদের মধ্যে নাই।' মাঝে একটা নূতন সম্পর্কের সূত্রপাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু রত্না তাহা এতই রূঢ়ভাবে ভাঙিয়া দিয়াছে যে তাহা স্মরণ করিতেও মন সঙ্কুচিত হয়। এরূপ অবস্থায়, কেবল লৌকিক সম্বন্ধটুকু বজায় রাখিয়া চলাই ভাল, রত্না খবর না দিয়া এবং খবর না লইয়া বোম্বাই উপস্থিত হইয়া যে বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব করিয়াছে তাহা যথাসম্ভব সহজ ও মামুলি করিয়া আনাই সোমনাথের কর্তব্য। অতীত প্রত্যাখানের কাঁটা বুকের মধ্যে খচ্ খচ্ করে করুক, বাহিরে কিছু প্রকাশ করা চলিবে না।

৩

আধ ঘণ্টা পরে বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিয়া, রত্না স্নানঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিল টেবিলের উপর এক পট্ চা এবং প্লেটের উপর রাশীকৃত পাঁউরুটি ও মাখন রহিয়াছে। রত্না একটু বিস্মিত হইয়া বলিল,—'এ কি, চাকর বামুন ফিরে এসেছে নাকি?'

সোমনাথ বলিল,—'না। কিন্তু তাদের ভরসায় থাকলে আজ আর কিছু জুটবে না।

তোমার নিশ্চয় খুব ক্ষিদে পেয়েছে। নাও, আরম্ভ করে দাও।' বলিয়া পেয়ালার চা ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল।

রত্না মুখে একটু হাসি ফুটিল।

'তুমি আজকাল ঘরকন্নার কাজ খুব শিখেছ দেখছি।'

সোমনাথ চায়ের পেয়ালা তাহাকে দিয়া হঠাৎ গর্বের সহিত বলিল,—'ঘরকন্নার কাজ আমি অনেক দিন থেকে জানি। খেয়ে দ্যাখো চা ঠিক হয়েছে কিনা।'

রত্না পেয়ালার প্রান্তে একবার ঠোঁট ঠেকাইয়া বলিল,—'মন্দ হয় নি।' তাহার স্বর নিরুৎসুক।

দু'জনেরই বিলক্ষণ পেট জ্বলিতেছিল, সেই দুপুর বেলার পর আর কিছু পেটে পড়ে নাই। অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া উভয়ে চা ও মাখন পাঁউরুটিতে মনোনিবেশ করিল। ক্ষুন্নিবৃত্তির ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা কথা হইতে লাগিল—

'কলকাতার খবর কি?'

'ভালই।'

'তুমি কোন্ কলেজে ভর্তি হলে?'

'ভর্তি হইনি। তোমার কেমন চলছে?'

'মন্দ নয়। চন্দনাদের কোম্পানী ছেড়ে দিয়েছি, শুনেছ বোধহয়।'

'না—শুনিনি। এখন কোথায় কাজ করছ?'

'এখন নিজে ছবি তৈরি করছি।'

'ও।'...

'আর চা নেবে? এখনও অনেকখানি আছে।'

'দাও।'

বাহিরে ঝড়বৃষ্টির মাতামাতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে ; কিন্তু ঘরের ভিতরটা শান্ত, কোনও চাঞ্চল্য নাই। দুইটি উদাসীন যুবক-যুবতী চা পান করিতেছে ও ছাড়া ছাড়া গল্প করিতেছে। তাহারা যেন এরোপ্লেনে চড়িয়া চলিয়াছে, বাহিরের প্রচণ্ড গতিবেগ ভিতরে অনুভব করা যায় না। যাত্রীদের মনে হয় তাহারা নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে।

'লেখাপড়া কি ছেড়ে দিলে?'

'না। এবার কলেজে যায়গা পেলাম না।'

'ও ; তোমাকে এবার একটু রোগা দেখাচ্ছে।'

'তা হবে। তোমার স্বাস্থ্য তো ভালই দেখছি।'

'হ্যাঁ। খাট্‌লে-খুট্‌লে শরীর ভাল থাকে।'

'সত্যি। তার ওপর যদি মনের মতো কাজ হয়—'

সোমনাথ একটু ফিকা হাসিল। কাজ মনের মতো কিনা এ কথা লইয়া তর্ক করিয়া লাভ নাই।

চায়ের পর্ব শেষ হইলে রত্না বলিল—'এখনকার মতো তো হল। কিন্তু রাত্তিরের কি ব্যবস্থা হবে?'

সোমনাথ বলিল,—'সে তুমি ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ঠিক হবে কি করে? বামুনের তো দেখা নেই।'

'তা হোক, হয়ে যাবে।'

রত্না ভ্রূ তুলিল। 'তুমি রাঁধবে নাকি?'

'আমি কি রাঁধতে জানি না? খুব ভাল রাঁধতে জানি। খেয়ে দেখলে বুঝবে।'

'দরকার নেই আমার। বোম্বাই এসে অবধি অনেক দুর্গতি হয়েছে, তার ওপর তোমার

রান্না সহ্য হবে না।' বলিয়া রত্না ভাঁড়ার ঘর তদারক করিতে গেল।

সোমনাথ ক্ষুণ্ণভাবে সিগারেট ধরাইল। কিছুক্ষণ পরে রত্না ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'খিচুড়ি আর ডিম ভাজা ছাড়া আর কিছু হবে না। শুধু চাল ডাল আর ডিম আছে।'

সোমনাথ বলিল,—'আমার ভাঁড়ারের দৈন্য দেখে লজ্জা পেলাম।' অবশ্য খিচুড়ি আর ডিম ভাজা আমার পক্ষে যথেষ্ট। তোমারই কষ্ট হবে...

রত্না বলিল,—'তা হোক। আমি কিছু মনে করব না।'

'সে তোমার মহত্ত্ব। কিন্তু রান্নাটা আমি করলেই ভাল হত। ভেবে দ্যাখো তুমি আমার অতিথি। তুমি রাঁধবে আর আমি খাব—এ যে বড় লজ্জার কথা।'

'আমি কাউকে বলব-না।'

সোমনাথ বসিয়া রহিল ; রত্না আঁচলটা গাছ-কোমর করিয়া কোমরে জড়াইয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

উনান ধরানোর কোনও হাঙ্গামা ছিল না, রান্নাঘরে গ্যাসের উনান। রত্না ক্ষিপ্রহস্তে যোগাড়যন্ত্র করিয়া রান্না চড়াইয়া দিল।

রাত্রি দশটার সময় বসিবার ঘরের একটা সোফায় যথাসম্ভব লম্বা হইয়া শুইয়া সোমনাথ মুদিত চক্ষে ঝড়ের শব্দ শুনিতেছিল। বাহিরে বাতাসের মত্ততা বাড়িয়াই চলিয়াছে ; মাঝে মাঝে তাহার উন্মত্ত পাক্‌সাটে বাড়ীখানা মড়্ মড়্ করিয়া উঠিতেছে। পশ্চিম দিক হইতে একটা গভীর একটানা গর্জন বাড়ীর বন্ধ দরজা জানলা ভেদ করিয়া কানে আসিতেছে—

রত্না আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

'বাঃ বেশ মানুষ! ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

সোমনাথ উঠিয়া বসিল।

'ঘুমোই নি। চোখ বুজে ঝড়ের মনের কথাটা শোনবার চেষ্টা করছিলাম।'

রত্নার চোখে বিদ্রূপ খেলিয়া গেল—'তাই নাকি? তা কী শুনলে?'

'এলোমেলো কথা, ভাল বুঝতে পারলাম না।'

'তাহলে এবার খাবে চল। খাবার তৈরি।'

দু'জনে গিয়া খাইতে বসিল। তপ্ত খিচুড়ির ঘ্রাণ নাকে যাইতেই সোমনাথের মন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু সে তৃপ্তির ভাব গোপন করিয়া বিচারকের ভঙ্গীতে চামচের আগায় একটু খিচুড়ি তুলিয়া মুখে দিল।

রত্না জিজ্ঞাসা করিল,—'কেমন হয়েছে খিচুড়ি?'

সোমনাথের এবার জবাব দিবার পালা, তাহার অধরে একটি চকিত হাসি খেলিয়া গেল। সে আর একচামচ খিচুড়ি মুখে দিয়া গম্ভীরভাবে বিবেচনাপূর্বক বলিল,—'মন্দ হয়নি।'

রত্না চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল, তারপর হাসিয়া ফেলিল। তাহারই মুখের কথা এতক্ষণ পরে তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে।

কিছুক্ষণ নীরবে আহার চলিল। সোমনাথ ভাবিতে লাগিল—রত্না এত ভাল রাঁধিতে শিখিল কেমন করিয়া? আজকালকার মেয়েরা তো লেখাপড়া লইয়া থাকে কিম্বা সিনেমা দেখে, রান্নাঘরের খোঁজ রাখে না। রত্না কোন ফাঁকে এমন রাঁধিতে শিখিল? অথবা মেয়েদের হাতে কোনও সহজাত ইন্দ্রজাল আছে, তাহারা স্পর্শ করিলেই অন্নব্যঞ্জন সুস্বাদু হইয়া ওঠে? অথবা সোমনাথ দীর্ঘকাল ধরিয়া বামুন ঠাকুরের রান্না গলাধঃকরণ করিতেছে তাই আজ রত্নার নিরেস রান্নাও তাহার সরস মনে হইতেছে? কিম্বা—

'ঝড় আর কতক্ষণ চলবে?'

'ঠিক বলতে পারি না। শুনেছি পাঁচ-ছয় ঘণ্টার বেশী থাকে না।'

'ওটা কিসের শব্দ হচ্ছে—ঐ যে গোঁ গোঁ শব্দ?'

'ওটা সমুদ্রের গর্জন।'

'ও—' রত্না সোমনাথের পানে একটা তির্যক কটাক্ষপাত করিল—'তা—সমুদ্রের মনের কথা কিছু শুনতে পাচ্ছ নাকি?'

'পাচ্ছি।'

'সত্যি? কি শুনলে?'

সোমনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—'রাগ আর ভালবাসা—ভালবাসা আর রাগ।'

ক্ষণেকের জন্য দু'জনের চোখে চোখে বিদ্যুৎ বিনিময় হইয়া গেল, তারপর দু'জনেই চক্ষু সরাইয়া লইল।

আহারান্তে বসিবার ঘরে আসিয়া সোমনাথ বলিল,—'তোমার সাবেক শোবার ঘরে বিছানা পেতে দিয়েছি।'

রত্না চোখ মেলিয়া সোমনাথের মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর ভ্রূকুটি করিল।

'তোমার বিছানা পাতবার দরকার ছিল না। আমি নিজেই পেতে নিতে পারতাম।'

সোমনাথ বলিল,—'তা পারতে জানি। কিন্তু আমারও তো কিছু করা চাই। যাহোক, সাড়ে দশটা বেজে গেছে, তুমি শুয়ে পড় গিয়ে। একে ট্রেনের ক্লান্তি, তার ওপরে রান্নার পরিশ্রম—'

রত্না আর কোনও কথা না বলিয়া শয়নকক্ষে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। খাটের উপর বিছানা পাতা বিছানার পদপ্রান্তে একটি গায়ের চাদর সযত্নে পাট করা। রত্নার হোল্ড-অলে একজোড়া বেড্-রুম শ্লিপার ছিল, সে দুটি খাটের নীচে রাখা রহিয়াছে।

রত্না কিয়ৎকাল শয্যার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর উষ্ণ-অধীর একটি নিশ্বাস ফেলিয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাহিরে সমুদ্রের রাগ-মিশ্রিত ভালবাসার দুরন্ত আক্‌সানি কিছুতেই শান্ত হইতেছে না—বাড়ীখানা থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে—

ক্লান্ত হইয়া অবশেষে রত্না আলো নিভাইয়া শুইতে গেল। কিন্তু ঘর বড় অন্ধকার, অন্ধকারে বাহিরের শব্দগুলা যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। রত্না ফিরিয়া আসিয়া আবার আলো জ্বালিল, তারপর আলো জ্বালিয়া রাখিয়াই চাদর গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িল।

সোমনাথও নিজের ঘরে আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। বিছানাটি ভারি ঠাণ্ডা, একটা গায়ের কাপড় হইলে ভাল হইত। কিন্তু নিজের গায়ের কাপড়টি সে রত্নাকে দান করিয়াছে। যাহোক, যদি নিতান্তই প্রয়োজন হয়, বিছানার চাদর টানিয়া গায়ে দিলেই চলিবে।

রত্না না মনে করে—সোমনাথের কাছে সে অনাদৃতা হইয়াছে। সোমনাথ কোনও অবস্থাতেই রত্নাকে অনাদর করিতে পারিবে না। কিন্তু রত্না আসিয়া পর্যন্ত বারবার তাহাকে আঘাত করিতেছে কেন? পূর্বে যাহা ঘটিয়াছিল—এক সহরের বর-বধূ অভিনয়—তাহার জন্য তো সোমনাথ দায়ী নয়। আর বর্তমানে জামাইবাবু পুণায় বদলি হইয়াছেন, ইহার জন্যই বা তাহাকে কি প্রকারে দোষী করা যাইতে পারে? কিন্তু সে যা-ই হোক রত্না যে এই রাত্রে ইস্টিশানে গিয়া বসিয়া থাকে নাই, সে যে এই শূন্য বাড়ীতে তাহার সহিত একাকী রাত্রি কাটাইতে সম্মত হইয়াছে ইহাই ভাগ্য বলিতে হইবে।

আজিকার রাত্রিটা সোমনাথের সুখের রাত্রি, না দুঃখের রাত্রি? ঝড়ের ঝাপ্‌টায় বাসা-ভাঙা পাখী যেমন অন্ধভাবে উড়িয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে আশ্রয় লয়, রত্না তেমনি তাহার গৃহে আশ্রয় লইয়াছে ; আবার কাল সকালে ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটিতে উড়িয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু তবু, সুখের হোক বা দুঃখের হোক, আজিকার রাত্রিটা সোমনাথের চিরদিন মনে থাকিবে। রত্না যখন পরের ঘরণী হইয়া বহু দূরে চলিয়া যাইবে, আর তাহাকে বিরক্তভাবেও স্মরণ করিবে না, তখনও আজিকার রাত্রিটি সোমনাথের মনে জাগিয়া থাকিবে।

রাত্রি তখন একটা কি দেড়টা।

সোমনাথ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চমকিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। অন্ধকার বিছানায় উঠিয়া বসিয়া সোমনাথ অনুভব করিল, চারিদিকে ভীষণ খট্‌খট্‌ ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হইতেছে ; যেন একদল ডাকাত যুগপৎ বাড়ীর দরজা জানালাগুলোকে আক্রমণ করিয়া ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে।

ঘুমের মধ্যে এই শব্দগুলা সে অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিতেছিল, সুতরাং তাহার ঘুম ভাঙার কারণ এই শব্দগুলা নয়। সোমনাথ কান পাতিয়া শুনিল, ঝড়ের শব্দের সহিত মিশিয়া আর একটা শব্দ হইতেছে—কেহ তাহার দরজায় ধাক্কা দিতেছে ; ইহা ঝড়ের ধাক্কা নয়, মানুষের হাতের ধাক্কা।

এক লাফে বিছানা হইতে নামিয়া অন্ধকারেই সে দরজা খুলিয়া দিল।

'রত্না?'

জলে অনেকক্ষণ ডুবিয়া থাকিবার পর মাথা জাগাইয়া মানুষ যেমন হাঁপাইয়া নিঃশ্বাস টানে তেমনি ভাবে হাঁপাইয়া রত্না বলিল,—'হ্যাঁ। আলো নিভে গেছে।'

'আলো নিভে গেছে?'

দ্বারের পাশেই আলোর সুইচ। সোমনাথ হাত বাড়াইয়া সুইচ টিপিল, কিন্তু আলো জ্বলিল না। সে বলিল,—'ইলেকট্রিক তার ছিঁড়ে গেছে।'

রত্নার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—'কী হবে? বাড়ী কি ভেঙে পড়বে?'

'না না, তুমি ভয় পেয়ো না। সাইক্লোনে বাড়ী ভাঙতে পারে না। রাস্তায় কোথাও গাছের ডাল ভেঙে ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে দিয়েছে, তাই আলো নিভে গেছে।'

রত্না বলিল,—'তুমি কোথায়? কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া দু'জনে কিছুক্ষণ হাত্‌ড়াইল ; তারপর হাতে হাত ঠেকিল। সোমনাথ হাত ধরিয়া রত্নাকে ঘরের ভিতরে আনিল। রত্না কতকটা যেন নিজ মনেই ভাঙা ভাঙা গলায় বলিল,—'আলো জ্বেলে ঘুমিয়েছিলাম, হঠাৎ চারদিকে মড়্‌মড়্‌ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল—দেখি আলো নিভে গেছে—'

সোমনাথ অনুভব করিল রত্নার হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা, অল্প অল্প কাঁপিতেছে। সে সাহস দিয়া বলিল,—'হঠাৎ অন্ধকারে ঘুম ভেঙেছে বলে ভয় পেয়েছ; নৈলে ভয়ের কিছু নেই। এবার আস্তে আস্তে ঝড়ের বেগ কমবে।'

'যদি বাড়ে?'

'আর বাড়তে পারে না।—তুমি দাঁড়াও, আমি দেশলাই আনি। আমার জামার পকেটেই আছে।'

অনিচ্ছা ভরে রত্না হাত ছাড়িয়া দিল। সোমনাথ শয়নের পূর্বে গায়ের জামা খুলিয়া আলনায় টাঙাইয়া রাখিয়াছিল, এখন ঠাহর করিয়া গিয়া জামাটা পাইয়া পরিয়া ফেলিল। তারপর পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালিল।

অমনি রত্না ছুটিয়া আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। দেশলায়ের আলোতে রত্নাকে দেখিয়া সোমনাথের বুকের ভিতরটা চমকিয়া উঠিল। তাহার চক্ষুদুটি বিস্ফারিত, মুখে রক্তের লেশমাত্র নাই ; গায়ে বিস্রস্ত বসনের উপর চাদরটা কোনও মতে জড়ানো। এ রত্না যেন তাহার পরিচিত আত্মপ্রতিষ্ঠ অচপল রত্না নয় ; প্রকৃতির ভয়ঙ্কর প্রলয় মূর্তির সম্মুখে একান্ত অসহায় এক মানবী। প্রকৃতির বিরাট শক্তি দেখিয়া মানুষ কেবল ভীতই হয় না, নিজের অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্রতাও অনুভব করে। তখন তাহার সঙ্কুচিত সত্তার অঙ্গ হইতে দর্পের আভরণও খসিয়া পড়িয়া যায়।

সোমনাথের ইচ্ছা হইল রত্নাকে ভীত শিশুর মতো বুকে জড়াইয়া সান্ত্বনা দান করে। কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করিয়া সে একটু আশ্বাসজনক হাসি হাসিবার চেষ্টা করিল।

'অন্য সময় মনে হয় না যে দেশলায়ের কাঠিতে এত আলো হয়। কাঠি কিন্তু বেশী নেই—'

'অ্যাঁ! কি হবে তাহলে?' বলিতে বলিতে কাঠি নিভিয়া গেল।

দ্বিতীয় কাঠি জ্বালিয়া সোমনাথ বলিল—'তুমি এখানে এসে বোসো'—বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া খাটের উপর বসাইয়া দিল।

'মোমবাতি নেই?'

'যতদূর জানি নেই। তবে মনে হচ্চে একটা টর্চ আছে। তুমি যদি একটু একলা থাকো, আমি খুঁজে দেখতে পারি ; বোধহয় দিদির ঘরে আছে।'

শঙ্কা বিলম্বিতকণ্ঠে রত্না বলিল,—'আচ্ছা—বেশী দেরী কোরো না।'

কয়েক মিনিট রত্না অন্ধকারে শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল, তারপর সোমনাথের ফিরিয়া আসার পদশব্দ শুনিতে পাইল।

'পেলে?'

উত্তরে সোমনাথ দপ্ করিয়া রত্নার মুখের উপর টর্চ জ্বালিয়া ধরিল। টর্চের আলো খুব উজ্জ্বল, প্রায় সাধারণ বিদ্যুৎ-বাতির সমান। সোমনাথ হাসিয়া বলিল,—'এই নাও আলো। আর ভয় করছে না তো?'

রত্না আলোর দিক হইতে চোখ সরাইয়া লইয়া একবার ঘরের চারিদিকে তাকাইল। টর্চের ছটায় বাহিরেও ঘরটি আলোকিত হইয়াছে। রত্নার অধরোষ্ঠ একবার কাঁপিয়া উঠিল, সে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—'না, ভয় আর করছে না—তবে—'

'তবে?' বলিয়া জ্বলন্ত টর্চটি শয্যার ওপর রাখিয়া সোমনাথ একপাশে বসিল।

রত্না একবার তাহার পাশে তাকাইল তারপর হঠাৎ বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

স্ত্রীজাতির স্নায়বিক বিপর্যয় সম্বন্ধে সোমনাথের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু সে বুঝিল, ইহা ভয়ের কান্না নয়, ভয়-ত্রাণের কান্না। হয়তো সেই সঙ্গে নিবিড়তর কোনও মনস্তত্ত্ব মিশিয়াছিল, হয়তো লজ্জা বা পশ্চাত্তাপের আগুনে হৃদয়ের অবরুদ্ধ বাষ্প উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু তাহা নির্ণয় করিবার মতো বিশ্লেষণী শক্তি সোমনাথের ছিল না। তাহার হৃদয় স্নেহে ও করুণায় বিগলিত হইয়া গেল। সে রত্নার পিঠের উপর হাত রাখিয়া ডাকিল,—'রত্না—কেঁদো না লক্ষ্মীটি—রত্না—'

রত্নার কান্না কিন্তু থামিল না।

মিনিট পনেরো পরে রত্নার ফোঁপানি যখন অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে তখন সোমনাথ হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল,—'রত্না, এস এক কাজ করা যাক।'

রত্না চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। চোখের জলে ভিজিয়া মুখখানি আরও নরম হইয়াছে ; সে ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করিল,—'কী?'

সোমনাথ বলিল,—'এস চা তৈরি করে খাওয়া যাক। ভারি মজা হবে কিন্তু। খাবে?'

রত্না ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। সোমনাথ খাট হইতে নামিয়া বলিল—'আচ্ছা, তুমি তাহলে বোসো আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা তৈরি করে আন্ছি।'

রত্নাও খাট হইতে নামিল।

'না, আমি চা তৈরি করব।'

'বেশ, দু'জনেই তৈরি করি গে চল। একলা ঘরে বসে থাকার চেয়ে সে বরং ভাল হবে।'

দু'জনে রান্নাঘরে গিয়া টর্চের আলোতে চা তৈয়ার করিল, তারপর চায়ের বাটি হাতে আবার খাটে আসিয়া বসিল।

সোমনাথ এক চুমুক চা খাইয়া হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল,—'বাঃ, কি সুন্দর চা হয়েছে। তোমার ভাল লাগছে না?'

রত্না মৃদুস্বরে বলিল,—'খুব ভাল লাগছে।'

প্রতি চুমুকের সঙ্গে চায়ের আতপ্ত মাধুর্য তাহাদের স্নায়ু শিরায় সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

সোমনাথ ভারি উৎসাহ অনুভব করিতে লাগিল। সে উঠিয়া টর্চটাকে খাটের ছত্রিতে ঝুলাইয়া দিল ; টর্চের আলো শূন্য হইতে চন্দ্র কিরণের মতো শয্যার উপর ছড়াইয়া পড়িল।

রত্নার মুখখানি শান্ত। সে সহজ কণ্ঠে বলিল,—'তুমি চায়ের সঙ্গে সিগারেট খাও না?'

'খাই—চায়ের সঙ্গে সিগারেট জমে ভাল।'

'তবে খাচ্চ না কেন?'

'খাবো?'

'খাও।'

সোমনাথের মনও মাধুর্যে ভরিয়া উঠিল। সে সিগারেট ধরাইল।

চা খাওয়া শেষ হইলে রত্না খাটের শিয়রের দিকে গুটিসুটি হইয়া শুইয়া পড়িল। সোমনাথ বলিল,—'রত্না, শুনতে পাচ্ছ, ঝড়ের শব্দ ক্রমে কমে আসছে?'

রত্না বলিল,—'হুঁ।'

'এদিকে দুটো বেজে গেছে। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে যাবে।'

রত্না চোখ বুজিয়া বলিল,—'হুঁ।'

'যাই বল, আজকের রাত্তিরটা মনে রাখবার মতো। মনে হচ্ছে যেন মস্ত একটা অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেল।—ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

মুদিতচক্ষে রত্না বলিল,—'না, তুমি কথা বল আমি শুনি।'

সোমনাথ এতক্ষণ সহজ ভাবে কথা বলিতেছিল এখন আবার আত্মসচেতন হইয়া পড়িল। কথা বলিতে হইবে মনে হইলেই আর কথা যোগায় না। রত্নার শুনিতে ভাল লাগে এমন কী কথা সে বলিবে? রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিবে? ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা? কিম্বা—শয়ন শিয়রে প্রদীপ নিভেছে সবে, জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল রবে? কিন্তু না, রত্নাকে কবিতা শোনানো বর্তমান ক্ষেত্রে উচিত হইবে না, রত্না এরূপ আচরণের কদর্থ করিতে পারে। তবে এখন সে কি কথা বলিবে?

একটা কথা বলা যাইতে পারে, রত্না নিশ্চয় কিছু মনে করিবে না। সোমনাথ মনে মনে একটু ভণিতা করিয়া লইয়া বলিল—'আমার প্রথম ছবিটা বাজারে বেরিয়েছে—বেশ নাম হয়েছে।'

রত্না নীরব রহিল। সোমনাথ তখন সাহস করিয়া বলিল,—'কলকাতাতেও ছবিটা চলছে। তুমি—তুমি দেখেছ নাকি?'

রত্না সাড়া দিল না। সোমনাথ উত্তরের জন্য কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া রত্নার মুখের দিকে ঝুঁকিয়া দেখিল, রত্নার চক্ষু-পল্লব স্থির, শান্ত ভাবে নিশ্বাস পড়িতেছে। রত্না ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সোমনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর সন্তর্পণে বিছানা হইতে নামিল। ক্লান্ত হইয়া রত্না ঘুমাইয়াছে, তাহাকে জাগানো উচিত হইবে না। কিন্তু এ-ঘরে সোমনাথের থাকা কি ঠিক হইবে? বরং সে গিয়া রত্নার বিছানায় শুইয়া কোনও মতে রাত্রিটা কাটাইয়া দিবে।

কিন্তু—দ্বার পর্যন্ত গিয়া সোমনাথ আবার ফিরিয়া আসিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া রত্না যদি

দেখে সোমনাথ নাই, সে হয়তো ভয় পাইবে—ঝড় কমিয়াছে বটে, কিন্তু থামে নাই—

সোমনাথ আবার সন্তর্পণে খাটের একপ্রান্তে উঠিয়া বসিল। রত্না নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতেছে ; তাহার একটি হাত গালের নীচে চাপা রহিয়াছে। সোমনাথ একবার সেইদিকে তাকাইল ; তারপর বাহু দিয়া দুই হাঁটু জড়াইয়া লইয়া উর্ধ্বে আলোর দিকে চাহিয়া রহিল। এমনি ভাবে বসিয়াই সে বাকি রাতটা কাটাইয়া দিবে।

টর্চের ব্যাটারি দীর্ঘকাল জ্বলিয়া নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল। তাহারও চক্ষু যেন ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছে—

পরদিন বেলা সাতটার সময় ঘুম ভাঙিয়া সোমনাথ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দেখিল, রত্না কখন উঠিয়া গিয়াছে।

বাহিরে ঝড় স্তব্ধ হইয়াছে। বৃষ্টি পড়িতেছে না, আকাশ থমথম করিতেছে।

মুখ হাত ধুইয়া সোমনাথ যখন বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন রত্না বাহিরে যাইবার সাজ পোষাক পরিয়া বসিয়া আছে। সে সোমনাথের মুখের পানে না তাকাইয়া বলিল— 'আমি এখনি পুনা যাব।'

সোমনাথ নীরবে চাহিয়া রহিল। এ সেই পুরোনো পরিচিত রত্না, কাল রাত্রে হঠাৎ যে-রত্নাকে দেখিয়াছিল সে-রত্না নয়। মুখের ডৌল দৃঢ় এবং নিঃসংশয়, কোথাও এতটুকু দুর্বলতার বহ্নিমাত্র নাই। এই রত্নাই কি তাহার বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল? কাল রাত্রে যে ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল তাহা কি সত্য, না স্বপ্নের মরীচিকা-বিভ্রম?

রত্না বলিল,—'টাইম টেব্‌ল্ দেখেছি, সাড়ে আটটার সময় একটা ট্রেণ আছে—'

সোমনাথ লক্ষ্য করিল, রত্না তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিতেছে না ; বোধ হয় চোখে চোখ মিলাইতে লজ্জা করিতেছে। কিন্তু লজ্জা করিবার কিছু আছে কি?

রত্না আবার বলিল—'আর দেরী করলে ট্রেন পাব না। একটা গাড়ী কি ট্যাক্সি—

সোমনাথ চোখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া বলিল,—'চল, আমি তোমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

মোটরে যাইতে যাইতে কেবল একবার কথা হইল ; রত্না জিজ্ঞাসা করিল,—'এ মোটর কার?'

সোমনাথ কেবল বলিল,—'আমার।'

ট্রেন ছাড়িবার আধ মিনিট আগে রত্না গাড়ীর জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া সোমনাথের জামার বুক-পকেটের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল—'তোমার আতিথ্যের জন্য ধন্যবাদ।' বলিয়া ভিতর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

কাল গভীর রাত্রে সোমনাথের অন্তর-গহনে যে ভীরু ফুলটি সঙ্গোপনে ফুটিয়াছিল তাহা এতক্ষণে সম্পূর্ণ শুকাইয়া টুপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

ট্রেন চলিয়া গেল। আকাশে যে মেঘগুলা এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাহারা আবার ধীরে ধীরে বর্ষণ সুরু করিল।

সোমনাথ ফিরিয়া গিয়া মোটরে স্টার্ট দিল ; তারপর ক্লান্ত দেহমন লইয়া স্টুডিওর দিকে চলিল। আজও সারাদিন শুটিং আছে।

চৈত্র ১৩৫৫

নীড়ের মায়া

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

তিন দিনের জ্বরে যখন দ্বিতীয়া গৃহিণী কাঞ্চনমালাও বনমালীকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, তখন বনমালীর বয়স একান্ন কি বাহান্ন। কচি কচি ছেলেমেয়েগুলিকে তিনি কোলে তুলে নিলেন বটে, কিন্তু তারপরে কি যে করবেন ভেবে পেলেন না।

বড় ছেলেটি বছর পোনেরোর। তার জন্যে ভাবনা নেই। নিজের খবরদারী নিজেই করবার বয়স তার হয়েছে। মেজটি মেয়ে, বয়সও বছর এগারো-বারো। তারও জন্যে না হয় ভাবনা নেই। কিন্তু পরের দুটি? তারা যে নিতান্তই বাচ্চা! ছোটটি তো সবে হাঁটতে শিখেছে।

ভগবান যার সর্বনাশ করেন, বুঝি এমনি ক'রেই করেন। বড়টি যদি মেয়ে হ'ত, তা হ'লে এত বিপদ হত না। পোনেরো বছরের বাঙালী মেয়ে স্বচ্ছন্দে সংসারের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে সকলকে নিশ্চিন্ত করতে পারত। কিন্তু ওই বয়সের একটা ছেলে নিতান্তই অকর্মণ্য। সংসারের বোঝা বইবার তার শক্তিও নেই, অবসরও নেই।

সম্বল একটি বৃদ্ধা পিসিমা। তিনি দিনে মরছেন, রাতে বাঁচছেন। মৃত্যু যদি এঁকে নিয়ে তাঁর কাঞ্চনমালাকে রেহাই দিত, কি সুখেরই না হ'ত!

বনমালী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই পিসিমারই ঘরের দিকে চললেন। এ ক'দিন যদি বা তিনি উঠে-হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন, কাঞ্চনমালা যাওয়ার পর থেকে একেবারে শয্যা নিয়েছেন।

তাঁর বিছানার পাশে ব'সে বনমালী শাস্ত্রের অনেক নিগূঢ় তত্ত্বকথা শোনালেন। এই জীবন যে নলিনীদলগত জলের মতো তরল—এই পৃথিবী যে পান্থনিবাস, মানুষ এখানে দু'দিনের জন্যে আসে এবং কাজ ফুরিয়ে গেলেই চলে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক শাস্ত্রীয় বাক্যে পিসিমার অশ্রুস্রোত কিছু পরিমাণে নিরুদ্ধ হ'ল সত্য, কিন্তু তিনি উঠে বসতে পারলেন না। শাস্ত্রবাক্য মনকে প্রবোধ দিতেই পারে, দেহে শক্তিসঞ্চার করতে পারে না। বনমালী বুঝলেন, এ বিপদে পিসিমার কাছ থেকে কয়েক গ্যালন অশ্রু ছাড়া আর কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। এই বানচাল সংসার-তরণী চালাতে তিনি নিতান্তই অশক্ত।

প্রথম পক্ষের দুটি মেয়ে আছে বটে, কিন্তু তারা ঘরণী-গৃহিণী। দুজনেরই সম্পন্ন গৃহস্থ-বাড়ীতে বিবাহ হয়েছে। ক্ষেত-খামার, জোত-জমা, জন-মজুর প্রচুর। তাদের পক্ষে বড় জোর দু-দশ দিনের জন্যে এখানে আসা সম্ভব। তার বেশী নয়।

পত্নী-শোকের চেয়ে এই সব দুশ্চিন্তাই বনমালীর মনে প্রবল হয়ে উঠল। রাঁধা-বাড়া করবে কে? ছেলেপুলেদের নাওয়াবে-ধোয়াবে কে? বনমালী সম্পন্ন গৃহস্থ। তার সংসারটি ছোট নয়, কাজও কম নয়। কাঞ্চনমালা দিনরাত্রি খিটমিট করত ব'লে বনমালী কত বিরক্ত হতেন। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে কতদিন কত ঝগড়াই হয়েছে। আজ বনমালী বুঝতে পারলেন, এতবড় বোঝা যাকে দিনের পর দিন বইতে হয়, শনিবার নেই, রবিবার নেই, ছুটি নেই, তার পক্ষে মেজাজ ঠিক রাখা সত্যিই বড় কঠিন।

বনমালীর দূর সম্পর্কের বিধবা একটি বোন আছে। সম্পর্কটা দূর হলেও ক্রমাগত যাওয়া-আসা, মেলা-মেশায় সম্বন্ধটা নিকটই। নির্ঝঞ্ঝাট বিধবা স্ত্রীলোক, ছেলে-মেয়ে নেই।

দেওর-ভাসুরের ঘরে উদয়াস্ত নিরবকাশ পরিশ্রমের বিনিময়ে দু'বেলা নির্যাতন এবং এক বেলা দুটো খেতে পায়। সেই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কাঞ্চনমালার জীবিতকালে একবার সে কিছুদিনের জন্যে এখানে এসেছিল। ইচ্ছা ছিল, বৈধব্য জীবনের অবশিষ্টকাল ভায়ের আশ্রয়েই কাটিয়ে দেবে। কিন্তু মুখরা কাঞ্চনমালার জন্যে তার এখানকার অবস্থিতিকালও দীর্ঘ হতে পারেনি।

সেই বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস স্মরণ ক'রে বনমালী দমে গেলেন। যেদিন সুরবালা চৌর্যপরাধে বিতাড়িত হয়েছিল, সেদিন বনমালী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখেছিল। তাকে রক্ষা করতে পারেনি, একটা সান্ত্বনার কথাও বলতে পারেনি। অথচ কলঙ্কটা যত বড়ই হোক, অপরাধটা তত বড় ক'রে দেখতে অন্তত বনমালী পারেনি।

দেবরের শিশুপুত্রের ঘুড়ির পয়সা জোগাবার জন্যে সুরবালা যদি সামান্য কিছু চাল চুরি ক'রে গোপনে বিক্রিই ক'রে থাকে, সেটা এমন একটা অপরাধ নয় যে তার জন্যে পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে এনে পঞ্চায়েৎ বসাতে হবে। বনমালী ইচ্ছা করলে তাকে রক্ষা করতে পারত। কিন্তু তার কেমন মনে হ'ল, স্বামীগৃহে নির্যাতিতা যে বিধবা ভ্রাতৃগৃহে এসেও দেবরপুত্রের মমতা বিস্মৃত হতে পারে না, দেবর-ভাশুরের লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তার অবলম্বনহীন জীবনের মূল শিকড়টি যে আসলে ওই নিষ্করুণ স্বামীগৃহের মাটিতেই আবদ্ধ তাতে আর ভুল নেই। সেইখানেই তার ফিরে যাওয়া উচিত।

সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত যে ভগিনীর একটা খোঁজ নেওয়ার পর্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করেনি, আজকে তারই কাছে গিয়ে কি ক'রে সে দাঁড়াবে সেই ভেবে সে বিব্রত হয়ে উঠল।

কিন্তু বনমালীকে বিশেষ বিব্রত হতে হ'ল না।

একদিন সকালে মড়াকান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে উঠেই দেখে, তারই বাড়ীর উঠানে ব'সে সুরবালা অতি করুণ কণ্ঠে মৃতা ভ্রাতৃজায়ার উদ্দেশে শোক নিবেদন করছে।

বনমালী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। কোঁচার খুঁটে অশ্রুমার্জনা ক'রে বললেন, সুরবালা এলি?

কান্না থামিয়ে সুরবালা বললে, থাকতে পারলাম কই দাদা? কিন্তু কাছেই তো থাকি, সে সময় একটা খবর দিয়ে আনতেও তো পারতে।

অপ্রস্তুত হয়ে বনমালী বললেন, তখন সময় ছিল না দিদি। এখন সময় হতে তোকে আনবার কথাই ভাবছিলাম। বেশ হ'ল, তুই নিজেই এলি। এই তো দেখছিস্ ঘর-দোরের ছিরি। ওই দেখ ছেলেমেয়েগুলোর চেহারা। পিসিমা বোধ হয় এখনও ওঠেননি। এই সব দেখে-শুনে নিয়ে আমাকে এ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দে ভাই, শেষ বয়সে এ আর আমার সহ্য হবে না।

শেষের দিকে তাঁর গলার স্বর ভারি হয়ে এল।

কান্নার শব্দে ছেলেমেয়েরা ইতিমধ্যেই পিসিমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সুরবালা দু'হাত দিয়ে তাদের বুকের মধ্যে টেনে নিলে।

বনমালী সেদিকে একবার চেয়ে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। পত্নীবিয়োগের এত দিন পরে কান্না তাঁর গলার কাছ পর্যন্ত ঠেলে উঠল। এতদিন পরে নিজেকে সম্বরণ করা তাঁর পক্ষে যেন অসম্ভব হয়ে উঠল।

তারপরে পিসিমা উঠলেন। পাড়া-প্রতিবেশী গৃহিণীরা এলেন। কর্মহীন দু-চার জন উলঙ্গ শিশুরও সমাবেশ হ'ল।

সবাই বললেন, বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। তুই আসবি না তো কে আসবে? ওই তো

পিসিকে দেখছিস্। ওর কি আর শক্তি আছে? যদ্দিন না নতুন বৌ আসছে, তদ্দিন সব দেখ্ শোন্, ছেলেমেয়েদের সময়ে দুটো খেতে দে, থাক্।

বনমালী ফিরে এসে দেখলেন, উঠান ঝরঝরে নিকানো। ঘরের মেঝে, বারান্দা ঝকঝক করছে। অনেকদিন পরে বাড়ীর আবার শ্রী ফিরেছে। পত্নীবিয়োগবেদনা ভুলে বনমালী ঠোঁটে পরিতৃপ্তির আভাস জাগল।

বারো বছর বয়সে সুরবালার বিবাহ হয়েছিল। পোনেরো বছরে বিধবা হয়। ছেলেপুলে হয়নি। স্বামীকে চেনবার সবে সুযোগ পেয়েছিল। নীড় বাঁধবার সাধ প্রতিপদের শশিলেখার মতো মনের আকাশে উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে গিয়েছিল। স্বামীর মৃত্যুর পরে তার কাজ হ'ল দাসীর। যা-কিছু শ্রমসাধ্য সেই সব কাজের ভার পড়ল তার উপর। তার কাজ শুধু খাটবার, শুধু হুকুম তামিল করবার। দেবার-থোবার সাজাবার-গোছাবার কাজ তার জায়েদের। তাদেরই ঘর, তাদেরই সংসার। সে শুধু এক বেলা দু'টি অন্নের বিনিময়ে খাটে।

বনমালীর সংসারে এবারে এসে সে প্রথম গৃহিণীত্বের স্বাদ পেলে। বৃদ্ধা পিসি বিছানা ছেড়ে বড় একটা ওঠেন না। বনমালী বাইরে বাইরেই ঘোরেন। ঘুম থেকে উঠে ঘরে দোর নিকোনো থেকে আরম্ভ ক'রে শয্যা গ্রহণ করার পূর্বে বনমালীর কনিষ্ঠ সন্তানটিকে দুধ খাওয়ানোর হাঙ্গামা পোয়ানো পর্যন্ত সব কাজ একা তার। তাকে হুকুম করার কেউ নেই। যেটি সে নিজে না করবে সেইটিই হবে না। বাঁধবার জন্যে এমনি একটা ঘরেরই কল্পনা বোধ হয় তার অবচেতন মনের মধ্যে ছিল। তার আনন্দের আর সীমা রইল না।

প্রত্যেকটি ঘর সে আবার নতুন ক'রে নিজের মনের মতো সাজিয়েছে। এদিকের খাট ওদিকে গেছে। ছবিগুলো ঝেড়ে-মুছে ফের নতুন ক'রে সাজিয়েছে। বনমালীর শোবার ঘরে জোড়া-খাট ছিল। কাঞ্চনমালার মৃত্যুর পরে তার আর দরকার নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি অন্য ঘরে তার কাছে শুচ্ছে। একখানি খাট সে সরিয়ে নিয়ে গেল পিসিমার ঘরে। গদির বিছানায় শুয়ে পিসিমা বড় সুখী। এতদিন তাঁকে মেঝের উপর শুতে হ'ত! খুশি হয়ে তিনি সুরবালার মাথায় হাত দিয়ে অনেক আশীর্বাদ করলেন।

বনমালীর জোড়াখাটের আর দরকার নেই সত্যি। তবু এত তাড়াতাড়ি একখানা খাট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁর ভালো লাগল না। বহুকাল ধরে ওঘরে দু'খানি খাট পাতা ছিল। দুপুরে শুতে এসে তাঁর বড় ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হ'ল।

জিজ্ঞাসা করলেন, সে-খাটখানা আবার কোথায় চালান করলি সুরো?

সুরবালা বললে, পিসিমার ঘরে। নীচেয় শুতে তাঁর বড় কষ্ট হচ্ছিল। বুড়ো মানুষ।

বনমালী আর কিছু বলতে সাহস করলেন না। সুরবালা এবারে আর ভিক্ষুকের মতো আসেনি। বনমালীর গৃহে আজকে তার প্রয়োজন অবিসম্বাদী। বনমালী চুপ ক'রে রইলেন। কিন্তু দুপুরে আর তাঁর ঘুম হ'ল না। তাঁর কেমন মনে হ'ল, শুধু পিসিমার প্রয়োজনেই খাটখানি ওঘরে অপসৃত হয়নি। এর মধ্যে আরও যেন কিছু আছে। এর মধ্যে কাঞ্চনমালার বিগত ব্যবহারের প্রতিশোধের প্রচ্ছন্ন ঝাঁঝও যেন পাওয়া যায়। কাঞ্চনমালার স্মৃতি অনন্তকাল ধ'রে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এমন পণ অবশ্য বনমালী করেনি। তাই ব'লে এত শীঘ্র তার হাতের সমস্ত স্পর্শ মুছে ফেলে দেবার প্রয়াসও তার শোভন মনে হ'ল না।

কিন্তু বনমালীর মনের কথা সুরবালা টের পেলে কি-না বোঝা গেল না। সে যথাপূর্ব নিজের একচ্ছত্র গৃহিণীপনায় মনোনিবেশ করলে। সে গৃহিণীপনা শান্ত এবং অনুচ্ছল না হতে পারে। ভরা বর্ষার উন্মত্ত নদীর মতো তাতে উপদ্রব থাকতে পারে। কিন্তু তাকে তিরস্কার করা চলে না। পরিচ্ছন্ন গৃহসজ্জায়, ছেলেমেয়েগুলির দেহশ্রীতে তার পরিচয় এতই স্পষ্ট। এমন কি এই ক'মাসে বনমালীর শুষ্ক দেহেও একটুখানি নেয়াপাতি ভুঁড়ির উন্মেষও হয়েছে। এ নিয়ে বন্ধুমহলে আজকাল তাঁকে কিছু কিছু বিদ্রূপও সহ্য করতে হয়।

বনমালী হাসে।

কাঞ্চনমালার হাতের রান্না সুরবালার মতো এমন সুন্দর ছিল না। তার খাওয়ানোও ছিল নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার। তাতে আন্তরিকতা যদি বা ছিল, এমন যত্ন ছিল না। আর এ যেন সুরবালার গৃহে তার প্রাত্যহিক নিমন্ত্রণ।

কিন্তু এত ক'রেও সুরবালার মনের ভয় যায় না।

কে জানে তার এ গৃহিণীপনা কতদিনের। কবে হয়তো শুনবে, বনমালীর বিবাহের দিন স্থির হয়েছে। একে বনমালীর বুড়ো বয়সের বিয়ে, তাতে এ কালের মেয়ে, নিতান্ত ছোট মেয়ে তো আর আসবে না। বিয়ের পরে সংসারের ভার নিজের হাতে তুলে নিতে তার বেশী দিন হয়তো লাগবে না।

তখন?

আবার যে-কে-সেই। দু'বেলা মুখ-ঝামটা খেয়েও এই ছেলে-মেয়েগুলি তাকেই মা ব'লে ডাকবে। তারই পিছু পিছু ঘুরবে। সুরবালা উদয়াস্ত খাটবে-খুটবে, ফরমাসমত রাঁধবে-বাড়বে। কিন্তু সুমুখে বসিয়ে কাউকে খেতে দিতে পারবে না। সেই যেমন কাঞ্চনমালার রাজত্বে ছিল। যেমন তার দেবরের সংসারে ছিল। অথচ সুমুখে বসিয়ে নিজের হাতে পরিবেশন ক'রে মেয়েমানুষ যদি খাওয়াতেই না পারে, তবে আর তার ইহজীবনে রইল কি?

এত সুখেও সুরবালার সুখ নেই। তার কেবলই ভয় করে তার দুর্ভাগ্যে এত সুখ বুঝি সইবে না।

এই ভয় ক্রমে উপসর্গে পরিণত হ'ল।

বাইরের ঘরে বনমালীকে বন্ধুবান্ধব নিয়ে পরিহাস করতে শুনলেই সে সব কাজ ফেলে রেখে আড়ি পেতে শোনে, কি কথা হচ্ছে। কোনো অপরিচিত লোককে আসতে দেখলেই ভয়ে তার বুক কেঁপে ওঠে। কে যে কি মতলবে আনাগোনা করে কে বলতে পারে। বনমালীর মনের মধ্যেই যে ধীরে ধীরে আবার কি আকাঙ্ক্ষা দানা বেঁধে উঠছে, তাই বা কে জানে?

অবশেষে কৌশলে একদিন সুরবালা নিজেই কথাটা পাড়লে।

সুরবালা সেদিন অনেক যত্নে একটা নতুন তরকারি রেঁধেছিল। তার আস্বাদ গ্রহণ ক'রে বনমালী পুলকিত চিত্তে বললেন, তুই রাঁধিস বড় চমৎকার সুরো। সবাই বলছে, তোর হাতের রান্না খেয়ে আমার শরীর সেরে উঠেছে।

—আচ্ছা, হয়েছে!—বলে লজ্জায় আনন্দে সুরবালা তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

ওর লজ্জা দেখে বনমালী হেসে ফেললেন।

বললেন, সত্যি রে। লোকের কথা ছেড়ে দে, আমি নিজেই তো বুঝতে পারছি।

—ছাই পারছ!

ব'লে রান্নাঘর থেকে আর একটু তরকারি নিয়ে এসে সুরবালা ওর পাতে দিলে।

একটু পরে বেশ ভব্যযুক্ত হ'য়ে বললে, আমার মামাশ্বশুরের একটি মেয়ে আছে, বেশ বড়-সড়। হাসছ যে, বিশ্বাস হচ্ছে না?

হাসি থামিয়ে বনমালী বললেন, বিশ্বাস হবে না কেন? অনেকের মামাশ্বশুরেরই তো বড় মেয়ে থাকে। তার পর কি হ'ল বল।

—বলছিলাম কি, তুমি অমত কোরো না। আমি বিয়ের জোগাড় করি। যদি দেখতে

যেতে চাও তো—

—কিছু দরকার হবে না। কিন্তু তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে সুরো? আমি এই বয়সে আবার বিয়ে করতে যাব কোন্ দুঃখে?

—এ বয়সে কি কেউ বিয়ে করে না?

—করুক গে। কিন্তু আমার অদৃষ্টে যদি বউ নিয়ে সংসার করাই থাকত তা'হলে পর পর দুটো বউ মরবে কেন?

—তাই ব'লে—

সুমুখের ভাতগুলি তাড়াতাড়ি কোলের দিকে টেনে নিয়ে বনমালী বললেন, না, না সুরো। ওসব পাগলামি করিস নে। যে ক'টা দিন বাঁচি, এমনি ভাল-ভাল রান্না রেঁধে খাওয়া, ছেলে-পুলেদের দেখ্-শোন্। ব্যস্।

বনমালীর কথা শুনে সুরবালা খুশি হ'ল, কিন্তু সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হতে পারলে না। পুরুষমানুষের মন বদলাতে কতক্ষণ। তাদের যত দরদ সংসারের উপর, তত দরদ ছেলে-মেয়ের উপর! তারা যে কি চায়, তা নিজেই জানে না। পুরুষমানুষকে সে বয়স্ক শিশু ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। শিশুর মত তাদের চিন্তার সামঞ্জস্য নেই, বুদ্ধিরও স্থিরতা নেই।

দেখতে দেখতে চারিদিক থেকে বনমালীর উপর আক্রমণ আরম্ভ হ'ল। বন্ধু-বান্ধব তো আছেই, সেদিন মুখুয্যেগিন্নিও এই নিয়ে যথেষ্ট অনুরোধ ক'রে গেলেন।

বললেন, ব্যাটা ছেলে বিয়ে করবে না, এই কি কখনও হয় ঠাকুরপো? কি বল্ সুরো?

শান্তকণ্ঠে সুরো বললে, তোমরাই বল বৌদি। আমি ব'লে-ব'লে হয়রাণ হয়েছি।

বনমালী হেসে ফেললেন। বললেন, হয়রাণ হয়েছিস তো আবার ওঁকে ডেকে এনেছিস কেন?

এই প্রসঙ্গ ওঠামাত্র সুরবালার মুখ শাদা হয়ে গিয়েছিল। সেদিকে লক্ষ্য না ক'রেই মুখুয্যেগিন্নি বললেন, আমাকে কেউ ডেকে আনেনি ভাই, আমি নিজেই এসেছি। পাড়াশুদ্ধ লোককে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ, আমি উচিত কথা বলছি কি—না।

বনমালী হাত জোড় ক'রে বললে; পাড়াশুদ্ধ লোককে জিজ্ঞেস করতে হবে না বৌদি, কিন্তু আপনিও বলুন আমার বয়সটা কত?

—কত শুনি?

—পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে।

জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে মুখুয্যেগিন্নি সুরবালার দিকে চেয়ে বললেন, শুনলি কথা? পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। পঞ্চাশ বছর আবার ব্যাটাছেলের একটা বয়স নাকি?

মুখুয্যেগিন্নির বোধ হয় কোনো স্বার্থ ছিল। কিন্তু তিনি সুবিধা করতে পারলেন না। পিসিমার চোখের জল ব্যর্থ হ'ল। এমন কি, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দলও একে একে হতাশ হয়ে ফিরে গেল। শেষ পর্যন্ত বন্ধুর দলও হাল ছেড়ে দিলে!

এমনি ক'রে প্রতিপক্ষ দলের সর্বদিকের আক্রমণ বনমালী প্রতিহত করলেন সত্যি। তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরেও গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে বনমালীর মনোদুর্গের কতখানি ক্ষতি ক'রে দিয়ে গেল তা তখন টের পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু কিছু দিন পরেই টের পাওয়া গেল।

বনমালী তখন রোগশয্যায়।

সাধারণ জ্বর। কঠিন কিছু নয়। কিন্তু উত্তাপ ৯৯ ছাড়ালেই আর বনমালীর জ্ঞান থাকে না। গানে-বক্তৃতায় হাসিতে কান্নায় চীৎকারে সে বাড়ীশুদ্ধ লোককে অস্থির ক'রে তোলে।

সুরবালা একা মেয়ে, কি করবে? তবু ওরই মধ্যে দশবার এসে ওষুধটা খাইয়ে যায়, সাগুর বাটিটা এনে মুখে ধরে, দু'টো ফল কুটে দিয়ে যায়। কখনও বা একটু ব'সে মাথায় বাতাসও করে। আসলে ছেলেগুলো হয়েছে দুষ্টুর শিরোমণি। সুস্থ অবস্থায় বাপের কাছে গিয়ে যদি বা একটু বসত, এখন আর কেউ তাঁর ছায়া মাড়ায় না। সুরবালা সেজন্যে তাদের তিরস্কারও করে, যদিও জানে শিশুর মন রোগীর কাছে কিছুতে বসে না।

এমনি একটা সময়ে ক'দিন রোগ ভোগের পর বনমালী একদিন সুরবালাকে ডেকে বললেন, তোর সেই মামাশ্বশুরের মেয়ে না কে আছে বলছিলি সুরো, সেইখানেই বরং চেষ্টা কর্। আর তো কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এই অসুখের সময় স্ত্রী না হলে...

সুরবালার মুখের সমস্ত রক্ত নিমেষের মধ্যে যেন কোথায় উড়ে গেল।

বনমালী বলতে লাগলেন, রাত্রিটা কি ক'রে যে কাটে আমিই জানি। তেষ্টায় মরে গেলেও এক ফোঁটা জল দেবার কেউ নেই। ছেলেমেয়েগুলোও এমনই হারামজাদা হয়েছে যে, কেউ একটা উঁকি মারে না। সত্যি বলছি তোকে, আমার আর বিয়ের বয়স নেই সে ইচ্ছেও নেই। কিন্তু তাই ব'লে এমন বেঘোরেও তো মরতে পারব না। রাত্রে একা থাকি, যদি ম'রেও যাই ভোর না হ'লে একটা খবর পর্যন্ত কেউ পাবে না।

সুরবালার সমস্ত শরীর থর থর ক'রে কাঁপছিল। নিজেকে সামলাবার জন্যে সে দরজার একটা পাটি শক্ত ক'রে ধ'রে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

বনমালী আপন মনেই বলে চললেন, এখন বুঝছি, তোদের সকলের কথা অমান্য ক'রে ভালো করিনি। তা সে যা হবার হয়েছে, এখন তুই যা খুশী কর্, আমি বাধা দোব না।

সুরবালা কঠিনভাবে হাসলে। বললে, সে তো পরের কথা দাদা। এখনই তো আর তোমার বিয়ে হ'তে পারে না। বউও কিছু এখনই এসে তোমার সেবায় ব'সে যেতে পারবে না।

নিজের অশোভন ব্যগ্রতায় লজ্জিত হয়ে বনমালী বললেন, না,না, সেই পরের কথা বলছি।

সুরবালা নিঃশব্দে রান্নাঘরে ফিরে এল।

ভালো তরকারি রান্নার আগ্রহ আর তার নেই। কিন্তু এই কয় মাস স্বাধীন এবং অবারিত গৃহিণীপনায় যে আনন্দের স্বাদ সে পেয়েছে তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় কি ক'রে? আনন্দসরোবরের জলে নেমে আবার সে ফিরে যাবে তার পুরাতন পচা নরককুণ্ডে?

সুরবালার মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

বনমালী বিয়ে করবার জন্যে মনঃস্থির করেছেন। তাঁকে সে ভালো ক'রেই জানে। এর অর্থ, একবার তাঁর সেরে উঠতে দেরী। তারপর সব চেয়ে কাছে যে দিন পাওয়া যাবে সেই দিনই বিবাহ স্থির হবে। তার পর নববধূ আসবে। হয়তো সে কাঞ্চনমালার মতো তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে, নয়তো সদয় ব্যবহারই করবে। কিন্তু এই অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহের অর্থ কি? উভয় ক্ষেত্রেই তার অবস্থা পরিচারিকা অথবা আশ্রিতা আত্মীয়ার উপরে তো আর উঠবে না।

হায় ভগবান! যদি সুরবালাকে বনমালী আত্মীয়া ক'রেই পাঠিয়েছিলে, আরও নিকটতর আত্মীয়া ক'রে পাঠাওনি কেন? তা হ'লে বনমালীর এই অসুখে আরও বেশী শুশ্রূষা করা সম্ভব হ'ত। রাত্রে তাঁর নির্জন রোগশয্যায় একাকী উপস্থিত থাকাও অসম্ভব হ'ত না। কিন্তু এ কি!

সুরবালা বনমালীর বড় পিসিমার জা-এর মেয়ে। নিজের জা-ও নয়, স্বামীর খুড়তুত ভায়ের স্ত্রী। স্বামীর মৃত্যুর পর সেই জা বনমালীর বড় পিসিমার আশ্রয়েই ওঠেন এবং আরও কিছুকাল পরে তাঁরই হাতে আট বছরের সুরবালাকে সমর্পণ ক'রে স্বামীর অনুগমন

করেন। সেই থেকে সুরবালা তার জ্যাঠাইমার কাছে মানুষ। সেই সূত্রেই বনমালীর সঙ্গে আত্মীয়তা। সেই জ্যাঠাইমা আজ নেই। আছে সুরবালা আর বনমালী, আর সেই ছিন্ন তারের নতুন ক'রে জোড়া তালি দেওয়া আত্মীয়তা। তারই উপর নির্ভর করে বনমালীর রোগশয্যায় রাত্রি কাটানো চলে কি-না সংশয়ের বস্তু।

সমস্ত দিন ধ'রে সুরবালা কত কি ভাবলে, তার মাথাও নেই মুণ্ডুও নেই। ছেলেগুলো কে যে পেট ভরে খেলে, আর কে খেলে না—চোখেও দেখার সময় পেলে না। খাওয়ার শেষে পিসিমা একটুখানি আচারের জন্যে গলা ভেঙ্গে ফেললেন, তবু পেলেন না। তিন বারের ওষুধ বনমালী দু'বারে খেলেন। আর সে নিজে ভাত বেড়ে সে ভাত হাঁড়িতেই ঢেলে রাখলে।

তারপরে সন্ধ্যাবেলায় অনেকদিন পরে চুলগুলো পরিপাটী ক'রে বাঁধলে। মুখে একটুখানি সাবানও গোপনে দিলে। রাত্রে ছেলেমেয়েদের খাইয়ে-শুইয়ে বনমালীর ঘরে এল।

তার পায়ের শব্দে চোখ মেলে বনমালী আশ্চর্যের সঙ্গে বললেন, সুরো?

সুরবালা নীচে মেঝেয় নিজের জন্যে একখানা মাদুর পাতছিল। সংক্ষেপে বললে, হুঁ।

—এইখানেই শুবি নাকি?

—হুঁ।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বনমালী বললেন, আমি বসতে পারছিলাম না সুরো, কিন্তু জ্বর অবস্থায় একলা শুতে আমার বড় ভয় করে। তোর বৌদিকে কেবল স্বপ্ন দেখি। দেখে ভয় পাই। ভালোই হ'ল তুই এলি।

সুরবালা তাঁর মাথার শিয়রের বালিশটা ঠিক ক'রে দিয়ে ললাটে হাত বুলিয়ে বললে, এখন তো জ্বর নেই। ঘুমোও।

কোমল হাতের স্পর্শে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে এল। সুরবালার ঠাণ্ডা হাতখানি চোখের উপর রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কটা বাজে সুরো?

--কি জানি। দশটা বাজে বোধ হয়।

বনমালী আর কিছু বললেন না। শুধু ললাটে, মুখে, বুকে পরম আগ্রহে সেই শীতল হাতের স্পর্শ উপভোগ করতে লাগলেন।

সুরবালা কাঠের মতো শক্ত হয়ে সেইখানে ব'সে রইল।

ভোরবেলায় ছেলেরা উঠে দেখল, সুরবালা বারান্দায় একটা খুঁটি ঠেস দিয়ে ঊর্ধ্বমুখে ব'সে আছে। মুখ মড়ার মতো শাদা, চোখে পলক পড়ে না, দুই কোণে দু'বিন্দু অশ্রু জমে আছে।

ছোট খোকা একটা ঠেলা দিয়ে ডাকলে, আমাকে খেতে দেবে না পিসি?

সে ডাকে সুরবালা একবার চমকে উঠল।

তারপর তাকে বুকে জড়িয়ে বললে, চল্।

ভাদ্র ১৩৪৭

যাত্রা-সঙ্গী

গিরিবালা দেবী

এম-এ, এম-এস্‌সি পরীক্ষার ফল বাহির হয় নাই। যাদের জানিবার তারা জানিয়াছে।

বেণু বাবার কাছে বায়না ধরিল, "এবারে আমাকে বিলেত পাঠাবার ব্যাস্থা কর বাবা, তোমাদের ওজোর আপত্তি আমি আর শুনচি নে।"

বাবা আশ্বাস দিলেন, "হবে বেণু, ব্যস্ত কি? আগে গেজেট বেরুক, তোমার মা'র মত নাও, তবে না যাবে?"

বেণু আবদার করিতে লাগিল, "না বাবা, এখন থেকে পাস্‌পোর্টের চেষ্টা না করলে দেরী হয়ে যাবে। গেজেট দিয়ে আমাদের দরকারই বা কি? পাশ ত হয়েচি। মা'কে তুমি বলগে, আমি বলতে গেলে ঐ এক কথা—'একলা যেতে দেব না।' এদেশের মায়েরা একলার ভয়েই সারা হলেন। তোমায় সত্যি বলচি বাবা, মা'র ঘ্যান ঘ্যান আমার ভাল লাগে না।"

"ভাল না লাগলেও তাঁর মত তোমায় নিতে হবে বেণু। তিনি সেকেলে, অল্পশিক্ষিতা হ'লেও তোমার মা ; তাঁকে অগ্রাহ্য ক'রে কিছু করতে গেলে চলে কি? তোমার-আমার মত যাই হোক, তবু তাঁকে অবহেলা করতে পারি নে।"

বেণু ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "তাহলে চল বাবা, মা'র কাছে যাই। এখুনি বুঝিয়ে বলিগে। শোন বাবা, তুমি কিন্তু আমার পক্ষে কথা ক'য়ো। খবরদার, মা'র পক্ষ নিও না।"

বেণুর বাবা প্রিয়তোষবাবু হাসিলেন, "আমি ত বরাবরই তোমার পক্ষে আছি বেণু, তুমি আমাদের প্রথম সন্তান ; তোমার উপরে আমার সমস্ত আশা ভরসা। আমার এত বড় কারখানা, সাবান সেন্টের কারবার দেখার লোক চাই। তোমার ছোট ভাই, বাবুল, কাবুল দুটো নেহাৎ নাবালক ; কাজেই ব্যবসা চালাবার যোগ্যতা তোমাকেই অর্জন করতে হবে। সেইজন্যে আমার ইচ্ছা তোমায় বাইরে থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে আনি। তা চল, তোমার মা'র সঙ্গে আগে কথাবার্তা ঠিক হোক।"

তাদের এত বড় প্রতিষ্ঠানের শীর্ষদেশে বাবা তাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষী জানিয়া বেণুর গর্বের সীমা রহিল না। সে আনন্দে উদ্দাম হইয়া প্রিয়তোষবাবুর হাত ধরিয়া মা'র নিকটে চলিল।

মস্ত বাড়ী, মস্ত গাড়ী, মস্ত কারবারের মালিকের গৃহিণীকে কোন দিক দিয়া মস্ত বলা চলে না। বিরাজমোহিনী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের ছোটখাট মানুষটি, চালচলন নিতান্ত সাধারণ। স্বভাবটি যেমন কোমল, হাসিটি তেমনই মধুর।

বেণুর বাবার সহিত বেণুকে দেখিয়া তাঁর অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে বেণু, পাহাড়ের আড়াল থেকে তীর ছুঁড়তে এসেচিস? বিলাত যাবার কথা ত? না, নতুন কিছু?"

বেণু মুখ ভার করিয়া জবাব দিল, "নতুন আবার কি? তুমি ত আমায় বলেই রেখেছিলে, আমি এম-এস্‌সি পাশ করলে বিলেতে পাঠিয়ে দেবে। এখন অমত করলে ত চলবে না মা। কেবল আমারই ইচ্ছা নয়, বাবাও পাঠাতে চাচ্ছেন?"

প্রিয়তোষবাবু মাথা চুলকাইয়া সায় দিলেন, "হাঁ, বেণুকে শিখিয়ে পড়িয়ে আনা দরকার।

বাবুল, কাবুল ছোট, ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে বেণুকেই আমি তৈরি ক'রে নিতে চাই।"

"তুমি যা চাইছ, তাতে আমি অমত করব কেন? তবে আগেও আমি যা বলেচি, এখনও তাই বল্‌চি, সঙ্গীছাড়া একলা বেণুকে যেতে দেব না।"

প্রিয়তোষবাবু কাশিয়া জবাব দিলেন, "হাঁ, তা তুমি বলেচ বটে, বরাবর বলেচ সঙ্গীছাড়া যেতে দেবে না। তা বেণু, তুমি তোমার যাত্রা-সঙ্গী বেছে নাও। আমার টাকার অভাব নেই। দু'জনার খরচ অনায়াসে বহন করতে পারব। তোমায় তৈরি ক'রে আনা কারবারের কাজ, খরচও কারবারের। হাজার হোক মায়ের প্রাণ, একলা যখন পাঠাতে চাচ্ছেন না ; কাজেই একজন যাত্রা-সঙ্গী চাই।"

বেণু রাগে জ্বলিয়া উঠিল, "আমি যেন মা'র বাবুল কাবুল হয়েছি। দিনরাত আঁচলের নীচে লুকিয়ে রাখা। বড় হয়েছি, চার চারটে পাশ করেছি, এমনই নাকি? আমি একলা যাব, একলা আসব, কারুকে আমার দরকার নেই। আজ বলচেন যাত্রা-সঙ্গী চাই, কাল বলবেন ভোজন-সঙ্গী আন। পরশু ধরবেন শয়ন-সঙ্গী না হ'লে চলবে না। এত কথা আমি শুনব না ; যাব কি, যাব ; একলা যাব।"

বেণুর উত্তেজনায় প্রিয়তোষবাবু গলিয়া গেলেন। একে তিনি সাদাসিধে নিরীহ মানুষ, তায় বেণু তাঁর অতি আদরের, অতি স্নেহের। বেণুর স্বাধীন মতবাদের বিরুদ্ধে মা সময় সময় অন্তরায় হইলেও তিনি কখনও হন নাই। নদীর তরঙ্গের মত স্বাচ্ছন্দ্য সাবলীল গতিতে বেণুকে বহিয়া যাইতেই সাহায্য করিয়াছেন। নিষেধের উপলখণ্ডে কোথাও বাধে নাই। এখন বাধার সৃষ্টি করিলে সে মানিবে কেন?

প্রিয়তোষবাবুর কিন্তু দুই দিকেই সমান দুই জায়গাতেই দুর্বলতা, তিনি বেণুকে ক্ষুণ্ণ করিতে চাহেন না। আবার বেণুর মাকেও ব্যথা দিতে পারেন না। নিরুপায় ভালমানুষটি মহাসমস্যায় পড়িয়া কেশবিরল মস্তকে কেবলই হাত বুলাইতে লাগিলেন।

স্বামীকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখিয়া বিরাজ হাত বাড়াইয়া বেণুকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। তার মুখখানি বুকে চাপিয়া স্নেহস্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "বেণু, রাগ করে কি? রাগ ক'রো না। তুমি যেতে চাইছ নিশ্চয় যাবে। তোমার অনেক বন্ধু, অনেকেই তোমায় ভালবাসে, তাদের ভেতর থেকে যাঁকে তোমার ভাল লাগে, বিশ্বাস হয়, সাথী হিসাবে বেছে নাও। তোমার পাশের উপলক্ষে একদিন বরং সকলকে চায়ের নেমন্তন্ন করি।"

এতক্ষণে প্রিয়তোষবাবু অকূল সমুদ্রে যেন কূল পাইলেন। তিনি সাগ্রহে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "হাঁ, হাঁ, তা ত করতেই হবে। বেণুর পাশের খাওয়া না দিলে চলবে কেন। এম-এস্‌সি পাশ কি সোজা কথা? ক'জনা পারে? গেজেট বেরুলেই আত্মীয়বন্ধুদের ডেকে খাইয়ে দিও।"

বেণু তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট উল্টাইল, "ভারী ত পাশ, সেকেণ্ড ক্লাশ পেয়ে, এত ঘটা কিসের? আমি চাইনে কাউকে ডাকতে, চাইনে চা খাওয়াতে।"

বিরাজ বেণুকে সান্ত্বনা দিলেন, "এ কি কথা বেণু? তোমার ফল খুব ভাল হয়েছে। এর চেয়ে খারাপ হ'লেও আমি দুঃখিত হতাম না।"

বেণু কহিল, "তুমি ত বলবেই মা ; কম নম্বর পেয়ে আমার যে কি হ'য়েচে তা আমিই জানি। কত খেটেছিলাম, চেষ্টা ক'রেছিলাম, তোমার বাপের বাড়ীর দেশের ছেলে রণজিতের সমান হ'তে। তা হ'ল না, ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হ'য়ে সে-ই রইল।"

মা বলিলেন, "তাতে দুঃখ কি বেণু? পরীক্ষার ফলাফল ভাগ্যের ওপর নির্ভর ক'রে। কত ভাল ছেলে কম নম্বর পায়, মন্দ ছেলে হঠাৎ উতরে যায়। পরীক্ষার ফলের জোরে রণজিতকে ক'রে খেতে হবে। তোমার ত সে ভাবনা নেই।"

প্রিয়তোষবাবু কহিলেন, "তা ঠিক, তুমি মন খারাপ ক'রো না বেণু ; বেশ করেচ, সুন্দর

করেচ। রণজিতের কথা ছেড়ে দাও, ও কি ছেলে। ছেলে নয় বিদ্যুৎ, অমনটি আর চোখে পড়ে না। কি ধার, কি বুদ্ধি। তেম্‌নি কি সৎস্বভাব। ওর বাবা ললিত ছিল আমার বাল্যবন্ধু ; আহা, বেচারা অল্প বয়েসে মারা গেল। রণজিতকে অনেক দিন দেখি না ; এখন আসে না বুঝি? বেণু, তুমি তাকে ডাক না কেন? সে ত তোমারও বন্ধু।"

বেণু ঝাঁঝের সহিত উত্তর করিল, "না বাবা, সে আমার বন্ধু নয়। যার অত অহঙ্কার, অত তেজ সে কারুর বন্ধু হ'তে পারে না। মা'র বাপের বাড়ীর দেশের লোক, তোমার বন্ধুর ছেলে, তাই তোমরা দু'জন মিলে ওকে যতটা বাড়াও, আসলে ও ততটা নয়। ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হ'য়ে মাটিতে পা পড়ে না। অমন কাজ উনি ভিন্ন আর যেন কেউ পারে নি।"

প্রিয়তোষবাবু এ আক্রোশের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। বিরাজমোহিনী নীরবে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন পরে গেজেট বাহির হওয়া মাত্র একখানা গেজেট লইয়া বেণুকে অভিনন্দন করিতে আসিলেন নবীন ব্যারিস্টার মিঃ চৌধুরী। বেশভূষার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি, মার্জিত রুচিসম্পন্ন, বাক্যালাপে বিচক্ষণ, ধনী পিতার ধনগৌরবে গৌরবান্বিত। চৌধুরীর ওজন করা হাসি, ওজন-করা শিষ্টাচার শেষ হইতে না হইতেই সদ্যপ্রকাশিত গেজেট হস্তে আগমন করিলেন মিঃ রায়। ছেলেটি বলিষ্ঠ, দেখিতে ভাল, অল্প দিন হইল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। চাকরীর বাজার মন্দা বলিয়া এখনও কর্মখালির বিজ্ঞাপন খুঁজিতে হইতেছে। চৌধুরীর ন্যায় আভিজাত্যে পরিপক্ক না হইলেও রায় অভদ্র নহে। দিব্য হাসিখুশী সপ্রতিভ।

রায়ের অভিনন্দন অভিবাদনের মধ্যে কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝটিকার বেগে আবির্ভূত হইলেন মিঃ মজুমদার। লোকটির যেমন ছুঁচালো চেহারা, তেমনই ধারালো কথাবার্তা। বহুকাল বিদেশে থাকিয়া বীমা সম্বন্ধে বহু সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন।

মজুমদার এটাচিকেস হইতে সযত্নে আনীত গেজেটখানি বাহির করিয়া সহাস্যে আরম্ভ করিলেন, "আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, আনন্দজ্ঞাপন করতে এসেছি ; ভগবানকে ধন্যবাদ, আপনার সাফল্য যে এতদূর এগিয়ে যাবে, আশা করি নি। যে দুর্বল শরীর নিয়ে আপনি পরীক্ষা দিয়েছিন, তাতে এ হ'ল গিয়ে আশাতীত ফল!"

বেণু সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি ভুল করেছেন মিঃ মজুমদার, এবার আমার শরীর ভালই ছিল। অসুখ হ'য়েছিল বি-এসসি পরীক্ষার আগে।"

চৌধুরী হাসিলেন, "কোথায় ভাল ছিলেন? মোটেই না। নিজে বুঝতে পারেন নি, আমরা পেরেছি।"

রায়ের বয়স কম, কথা বলে কম, তবু দুইজনার কথার পৃষ্ঠে কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। মৃদুস্বরে বলিল, "পরীক্ষার পড়ার চাপে শরীরের দিকে লক্ষ্য থাকে না। অসুখ হলেও অনুভূতি চলে যায়।"

মজুমদার অভয় দিলেন, "শরীর এবারে ভাল হয়ে যাবে। ঝঞ্ঝাট ত মিটে গেল। শুনলাম, আপনি নাকি লণ্ডনে যাচ্চেন? মা একলা যেতে দেবেন না। ঠিকই ত, ছেলেমানুষ, একা কি অতদূরে যায়? আপনার সঙ্গী হবার সৌভাগ্য আমাকে যদি দেন, তাহলে কোন ভাবনা থাকবে না। লণ্ডনই বলুন, আর নিউ ইয়র্ক, জর্মনী, প্যারিস, বার্লিনই বলুন, আমি ছয় ছয়টা বছর তন্ন তন্ন ক'রে ঘুরে এসেছি, কোথাও বাকী রাখি নি।"

রায় বলিল, "আমিও ছিলাম চার বছর, দেখাশোনা বেড়ানো আমারও ঢের হয়েছে ; অনুমতি পেলে আমিও আনন্দের সঙ্গে আদেশ পালন করতে প্রস্তুত আছি।"

চৌধুরী সগর্বে রায় দিলেন, "বছরের কথা কি বলচেন ম'শায়? প্রচুর টাকা না থাক্‌লে ওদেশে যাওয়া বিড়ম্বনা। ছিলাম বটে দু বছর, তার ভেতরে এমন কোন জায়গা নেই,

যেখানে যাই নি, এমন কোন উৎসব ছিল না, য়াতে আমি যোগ দিই নি। ও অঞ্চলের সবাই আমার নাম রেখেছিল ধনকুবের। আমিও যেতে পারি বেণুর সঙ্গী হিসাবে। কাজের জন্যে আমার যাওয়ারও দরকার হয়েচে।"

বেণু তার সম্মুখে উপবিষ্ট তিনটি মূর্তির পানে চোখ তুলিয়া বলিল, "বেশ ত, আপনাদের ভেতরে যে-কেউ হোক যাবেন আমার সাথে। আমায় ক'দিন ভাববার সময় দিন ; ভেবে চিন্তে পরে বলব।"

বেণুর আশ্বাসে তিনখানি মুখে আশার আলো জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। ইহারা তিনটি বেণুর অবসর-সঙ্গী, চায়ের টেবিলের একনিষ্ঠ ভক্ত। ইহাদের আশা অফুরন্ত, আকাঙ্ক্ষা অপরিমিত। ইহারা জানে, বেণুর বাবার মস্ত বাড়ী, মস্ত গাড়ী, মস্ত বড় কারবার কারখানা। বেণু বাবার বড় আদরের, বড় স্নেহের।

সত্যিকারের বেণুর জন্য যতটা না হোক, তাদের বাহ্যিক সম্পদের সৌরভে লুব্ধ ভ্রমরের মত অনেকেই আসিল আভিবাদন জানাইতে, অভিনন্দন দিতে। হাসি, গল্পে, মিষ্টান্নে চা'এ সমারোহ পড়িয়া গেল।

একে একে সকলের পালা শেষ হইল ; শেষ হইল না কেবল রণজিতের পালা ; সে না আসিল অভিনন্দন দিতে, না আসিল খবর লইতে।

একদিন বিরাজমোহিনী বলিলেন, "রণজিতের একটা খোঁজ নিতে হয় বেণু, কোথায় কি ভাবে রয়েচে। মাঝে শুনেছিলাম, চাকরীর চেষ্টায় ব্যস্ত। ছেলে পড়িয়ে মেসের খরচ চালাচ্চে। আহা, বড় ভাল ছেলে, দুঃখী মায়ের বুক-জোড়া মাণিক। বেঁচে থাকুক।"

বেণু তিক্তকণ্ঠে উত্তর করিল, "তোমাদের দেশের ছেলে তুমি মাথায় তুলে নাচগে মা, আমার দায় পড়েছে খোঁজ নিতে। আমাদের কারখানায় কত লোকের চাকরী হয় ; আমার বাবা কত লোকের উপকার করেন। বাবার কাছে এসে দাঁড়াতে যার মাথা কাটা যায়, সে ছেলে পড়িয়ে খাবে না ত খাবে কে?"

বিরাজ বেণুকে বুঝাইয়াছিলেন—দুনিয়ার সকলেই এক ধাতের নয়, করুণার ভিক্ষা সকলেই লইতে পারে না। যারা আত্মনির্ভরশীল, আত্মনিষ্ঠ তারাই প্রকৃত মহৎ।

মা'র মহত্ত্বের উদাহরণ লইয়া বেণু চিন্তা করে নাই। কোথাকার কে, বাবার বন্ধুর ছেলে, মা'র বাপের দেশের লোক, তাকে দিয়া বেণুর কিসের প্রয়োজন? সেই একদিন আসিয়াছিল ; অযাচিত অনাহূতভাবে বেণুর সহিত মিশিয়াছিল। তার আগ্রহে বেণুর রসায়নশাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ।

তার পর কোথা দিয়া কি হইল, বেণু তা জানে না। জানিবার মধ্যে এইটুকু জানিয়াছে, দূরের মানুষ কাছে আসে, কাছের মানুষ দূরে যায়। এমনই যাওয়া-আসা লইয়া সংসার। ইহার নিমিত্ত বেণু ব্যস্ত নহে, ব্যাকুল নহে। বেণুর কি আর কেহ নাই? যারা আছে, তাদের সাজানো হাসি, সাজানো বাক্যের অন্তরাল হইতে স্বার্থের কঙ্কাল মূর্তি উঁকিঝুঁকি দিলেও স্তব স্তুতির মূর্ছনা কিছু মন্দ শোনায় না। ইহাতে বেণুর আর কিছু হোক বা না হোক, লোকের অন্তরের অন্তস্থল শান্ত দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। বেণু এখন অনেক জানে অনেক চেনে।

এত বেশী জানিবার চিনিবার সুযোগ পাইয়া বেণু স্তাবকের দলদের জন্য মনে মনে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে প্রবল বিরাগ, বিতৃষ্ণা, অকথ্য ঘৃণা। যাকে বিদ্বেষ করে, অবহেলা করে, সামান্য সংবাদটা পর্যন্ত লইতে চাহে না, তাহার জন্য হৃদয়ের গোপন গহনে কি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে তাহা কেহ জানে না। জানে শুধু বেণু।

সেদিন সন্ধ্যায় অকাল-বর্ষার রিমিঝিমি সুরের গুঞ্জনে বেণুর চিত্তে জাগিল সুপ্ত সঙ্গীতের রেশ। হাঁ, আর একটা কথা বলা হয় নাই। পরীক্ষায় বেণু দ্বিতীয় শ্রেণীর নম্বর পাইলেও গান

গাহে প্রথম শ্রেণীর। বন্ধুমহলে এবার বেণুর সঙ্গীত-সাধনায় মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজের গলার মালা খুলিয়া বেণুর গলায় পরাইয়া দিয়াছিলেন। সেই সম্মানে বেণু নাকি রবীন্দ্র-সঙ্গীত ভিন্ন অন্য কিছু গাহে না।

অনেক দিন পর বেণু তার বেহালার তার বাঁধিয়া মুক্ত জানালার নীচে গিয়া বসিল। সামনে মেঘে মেঘে মেঘময় আকাশ, পাতায় পাতায় বাদল ঝরিতেছে—টিপ-টিপ টুপ-টাপ। সজল শীতল বাতাস অব্যক্ত বেদনায় কাঁদিয়া সারা।

বেণুর গলাটা কেবলই ধরিয়া আসিতেছিল ; সেই ধরা গলায় বেণু গাহিতে লাগিল—

"আমি, নিতি নিতি কত রচিব শয়ন, আকুল পরাণ রে,
নিতি নিতি কত করিব যতনে কুসুম চয়ন রে।
কত শরত যামিনী বিফলে যাবে, বসন্ত যাবে চ'লে,
কত উদিয়া তপন, আশার স্বপন প্রভাতে যাবে ছ'লে।"

বেণুর গলায় আজ যেন কি হইয়াছিল? গাহিতে গাহিতে থামিয়া গেল। মুখর বাতাসে চালিত বৃষ্টির ছাট আসিয়া সর্বাঙ্গ ভিজাইয়া দিতে লাগিল। বেণু উঠিল না। বারিসিক্ত নয়নে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

দ্বারের ভারী পর্দা সরাইয়া বিরাজমোহিনী আসিয়া ডাকিলেন, "বেণু!"

বেণু চমকিয়া ঘাড় ফিরাইল ; মা একাকী আসেন নাই, তাঁর পিছনে রণজিত। বেণুর মনের মধ্যে কি হইতেছিল, কে জানে? বাহিরে মুখের একটি রেখাও পরিবর্তন হইল না।

বেণু রণজিতের পানে চোখ তুলিয়া শুষ্কস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এতকাল পর কি মনে করে আসা হয়েচে? আগের মত এলে গেলে পাছে আমাকে পড়াতে হয়, পাছে আমি বেশী নম্বর পেয়ে ভাল ছেলের নাম ডুবিয়ে দিই, সেই ভয়ে পালিয়ে থাকার কারণ আমার জানতে বাকী নেই।"

রণজিত নির্বাক স্তম্ভিত হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। চা আনিবার ছুতায় মা হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেলেন।

বেণুর কি সোজা রাগ, সোজা অভিমান? তার অশেষ বিদ্বেষের পাত্রকে নিকটে পাইয়া সে কি সহজে ছাড়িতে পারে?

কোলের বেহালাটাকে মেঝেয় নামাইয়া বেণু রণজিতের সামনে মুখোমুখি বসিয়া কহিল, "এখানকার ফল যাই হোক, লণ্ডনের পি এইচ ডি আমায় হতেই হবে। তুমি এ পরীক্ষায় আমায় সাহায্য না করলেও আমি অপদার্থ হয়ে থাকব না। ভারী ত পাশ করেছ, ভারী ত জান, এত গুমোর কিসের? তোমার মত আর কি কেউ নেই? না, থাকতে পারে না?"

রণজিত ধীরে জবাব দিল। "কে বলেছে নেই, থাকতে পারে না? আছে বলেই না আমি স'রে রয়েচি। পরীক্ষার সময় আমায় যদি তোমার মত অত দরকারই ছিল বেণু, তবে ডাকো নি কেন?"

বেণু গর্জিয়া উঠিল, "ডাকব কেন? আমার কিসের দায়? না ডাকলেও আমার কাছে কত জন আসে। তারা নেহাৎ হেলাফেলার নয়।"

'জানি বেণু, হেলাফেলার লোক আসে না। আমার চেয়ে উঁচুদরের জনসমাগমেই না আমি সরে গিয়েচি। আমি আর যাই হই, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে আলাদীনের স্বপ্ন দেখি না। তোমাতে আমাতে বন্ধুত্ব অসম্ভব, অসমান সমুদ্রে নালায় যতটা প্রভেদ, তেমনই।"

বেণু বিগলিত হইল। নরম গলায় কহিল, "কিসের প্রভেদ? যারা আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আসে, তারা কোন দিক দিয়েই তোমার সমান হতে পারে না। তোমার সবচেয়ে বড় দোষ, তুমি নিজেকে ভারী ছোট করো, নিজের অধিকার জোর ক'রে নিতে পারো না। যাদের যোগ্যতা নেই কাণাকড়ির, তারাই আসে। ঘেন্নায়, লজ্জায় আমি যে ম'রে যাই, তা

কি তুমি দেখতে পাও না?"

"কেমন ক'রে দেখব বেণু? দেখবার সাহস হয়নি। থাকুক ওসব কথা ; তুমি কবে যাচ্ছ? মা তোমায় একলা যেতে দেবেন না, কাকে নিয়ে যাবে?"

বেণু চিন্তিত মুখে বলিল, "এখনও তা ঠিক করিনি। তোমারও পি এইচ ডি দেওয়া দরকার। ওটা দিয়ে ফেলে ডিএসসিটাও দিও। আমি জানি, তুমি পারবে, কোথাও আটকাবে না। একবার লণ্ডনে গেলেই হয়।"

রণজিত ক্ষোভের হাসি হাসিল, "তুমি পাগল বেণু, আমি যাব লণ্ডনে? আমার টাকা কোথায়? আমি এখানেই চেষ্টা করব, যা হয় হবে।"

বেণু বিরক্তির সহিত উত্তর করিল, "তোমার বড় দোষ, নিতে জান না? তোমার বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন, তুমি আমার মা'র বাপের বাড়ীর দেশের লোক, তোমার আবার টাকার অভাব? বাবাকে বলো তিনিই টাকা দেবেন।"

রণজিত ঘাড় নাড়িল, "তা হয় না বেণু, যেখানে অধিকার নেই, সেখানে ভিক্ষাবৃত্তির প্রবৃত্তিকে আমি ঘৃণা করি। তোমার বাবার টাকা আমি নিতে পারব না।"

বেণু কহিল, "না নিলে বাবার টাকা, আমার টাকা ত নেবে? আমার নিজের হাজার কয়েক টাকা জমেছে। আমার সমস্ত খরচ বাবা দেবেন, তোমায় আমার ক্যাবিনে সাথী করে নিয়ে গেলে ভাড়া ঢের কম লাগবে।"

রণজিত চমকিয়া উঠিল, "তুমি কি বলচ বেণু? এক ক্যাবিনে বন্ধু পরিচয়ে দুইজন যেতে পারে না। নিয়ম নেই। কারা যায়, যেতে পারে, তা কি তুমি জান না?"

বেণু মিষ্টহাসি হাসিয়া কহিল, "কে বললে জানি নে? জানি বলেই না তোমায় যাত্রা-সঙ্গী করছি। তোমার নেবার ক্ষমতা নেই, আমার দেবার শক্তি আছে। সেই শক্তিতেই আমি তোমায় নিয়ে যাব। তোমার সাধ্য নেই, আমায় বাধা দাও।"

হাঁ, আর একটা কথা, এতক্ষণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বেণু ছেলে নয়, মেয়ে।

ফাল্গুন ১৩৪৫

বনান্তরাল

হাসিরাশি দেবী

ছোট কয়েকখানা ঘর...যাকে বস্তিও বলা চলে এবং এইটারই তদারক ক'রে যে মানুষটা ভাড়া খাটিয়ে খায় তার নাম পশুপতি—পশুপতি কর্মকার।

পশুপতির বয়সের অঙ্ক কষা মূর্খতা, তবে দেহটা সবল, সুস্থ ও সম্পূর্ণ। মুখখানা কঠিন, আর ওরই মধ্যে থেকে কোঠরাগত চোখ দুটো এমন উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে মাঝে মাঝে যে, মনে হয় এক নজরেই যেন মানুষের সমস্ত অন্তরটাকে আবিষ্কার ক'রে ফেলবে। অন্তত সে ক্ষমতা ওর আছে।

এই পশুপতির বেশ-বাসের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিছু ছিল না। সদা সর্বদা গায়ে থাকে একটা হাতকাটা বেনিয়ান, কাঁধে একটা গামছা, পকেটে পান বিড়ির কৌটা—সে আগে লুঙ্গিই প'রতো, উপস্থিত প'রছে হাপপ্যান্ট।

মোটামুটি ভাবে সাজ-পোষাকের বহর ওর এই-ই, কিন্তু বিচার ক'রতে গেলে, প্রকৃতির দিক দিয়ে মানুষটাকে নেহাৎ মন্দ বলা চলে না। কারণ, আশ্রয় সে যাদেরই দিক— কোনওদিন যে তাদের ওপর কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি একথা হলফ ক'রে ব'লবে সবাই।

এ হেন পশুপতি কর্মকারের সঙ্গে দেখা ক'রবার জন্যে সেদিন যে লোকটি এসে দাঁড়ালো সে তারুণ্যের সীমা অতিক্রম না ক'রলেও, অসুস্থতায় যেন জর্জরিত। চোখে মুখেও যেন একটা অসহায় কাতরতার ভাব। বাইরে থেকেই ও দরোজার কড়া নেড়ে ডাক দিলে ঃ

—"কে আছেন বাড়ীতে?...শুনছেন?...ও—"

খোলা জানালাপথে পশুপতির তামাটে বিশ্রী মুখখানা ভেসে ওঠে একবার—তারপর বেরিয়ে আসে। জিজ্ঞাসা করে ঃ

—"কাকে—চাই?"

পশুপতির সবল স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহটার দিকে তাকায় াবাগত ; তারপর একটু কেশে গলাটাকে পরিষ্কার ক'রে বলে ঃ

—"চাই, এ বাড়ীর বাড়ী-ওয়ালাকে। খবর পেলাম নাকি ঘর খালি আছে—মানে তাই..."

পশুপতির চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ ক'রে ওঠে একবার। বলে—

—"ঘর খালি আছে কিনা, এই তো শুধোচ্ছ?—"

—"আজ্ঞে।"

—"তা আছে। কিন্তু তুমি তো দেখ্‌ছি ভদ্দরলোকের ছেলে ! লেখাপড়া কিছু শিখেছো ব'লে মনে হয়—আর কথা হ'চ্ছে কি—এখ'ন খোলার বস্তি। যত সব ছোটলোকের বাস এখানে।"...

—"ছোট লোক?—"

লোকটা তাকায় যেন একটা ক্ষীণ আপত্তি উত্থাপনের ভঙ্গিতে!

কিন্তু, সে ভঙ্গি গায়ে না মেখেই একটু উপেক্ষার হাসি হাসে পশুপতি। বলে ঃ

—"হ্যাঁ, তা ছোটলোক বৈকি! লেখাপড়া না শিখ্‌লেই লোকে তাকে ছোটলোক ব'লে

থাকে। তারপরে, কেউ মিস্তিরী, কেউ কামার, কেউবা ছুতোর।...অনেক জায়গায় অনেক খিটকেল ক'রে তবে পেটের ভাত যোগাতে হয়! কাজেই এসব লোককে ছোটলোক ছাড়া কি বলা যায়, তুমিই বলো!...কিন্তু সে কথা থাক্—ঘরগুলোও বাসের উপযুক্ত নয়—মাইরি! এঘরে কি তুমি—মানে তোমার মত নিরীহ মানুষ কি বেঁচে থাকতে পারবে দাদা?—"

কেমন একটা মমতার স্পর্শ পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে পশুপতির কণ্ঠে।...

মানুষটিও সচকিত হ'য়ে ওঠে। কাতর কণ্ঠে বলে ঃ

—"পারবো, খু—উব—পারবো। আর না পারলেও তো আমার আর কোনও উপায় নেই। কাজেই—"

নিরুপায়ের যে সমস্যাটা ওর সে কণ্ঠস্বরে মুখর হ'য়ে উঠতে চায়, পশুপতি তাকে ফিরাতে পারলে না। ব'ললে ঃ

—"বেশ, পার তো এসো। আপত্তির কোনও কারণ নেই, তবে—"

হঠাৎ মুখ তুলে সে প্রশ্ন ক'রলে ঃ—

—"তা হ'লে ভাই তোমার নামটা?—"

—"নাম!—"

একটুখানি থেমে ও জবাব দিলে ঃ

—"আমার নাম অশ্বিনী, অশ্বিনীকুমার চৌধুরী।"

হাত বাড়িয়ে পশুপতি বাইরের দিক্‌কার একখানা ঘর দেখালে। ঘরখানার ওপোরে খোলার চাল, আর নিচে ছাঁচের বেড়ার ওপোর চূণবালি ধরিয়ে, যার ওপোর চূণকাম করা হ'য়েছে হালফিল—সেই ঘর।

আলো, আর হাওয়া-হীন ঘরখানা ইঙ্গিতে দেখিয়ে পশুপতি ব'ললে ঃ

—"কিন্তু, ঘর ব'লতে তো মাত্তর খালি আছে ঐটেই—ওতে হবে তোমার?..."

অশ্বিনীর মুখে নিশ্চিন্ততার আভাষ প্রকাশ পায়। জবাব দেয় ঃ

—"খু-উ-ব। আপনি কিছু ভাববেন না পশুপতিবাবু। ভাড়া আমি ঠিক রেগুলার দিয়ে যাব, ওর জন্যে কিছু গণ্ডগোল হবে না কোনওদিন। তবে কিনা..মেয়েছেলে থাকবে!....."

চিন্তার স্রোতটা যে ওর কোনখানে আঘাত পাচ্ছে তা বুঝতে বিলম্ব হ'লো না—পশুপতির। হাঃ হাঃ ক'রে হেসে উঠে সে ব'ললে...

—"ওঃ—তার কিছু ভাব্‌না নেই দাদা! মেয়েছেলে, মানে ইজ্জত নিয়ে সব ব্যাটাছেলেকেই ঘর ক'রতে হয়! আর বাইরের ঘর? তাতে হ'য়েছে কি?—এই পশুপতির বাড়ী এ তল্লাটের কোনও লোক মাথা গলাতে আসবে না এখানে, এ তুমি জেনে রেখ!—"

বুকের ওপোর পেশীবহুল হাত দু'খানা আড়াআড়ি ভাবে রেখে ও হাসে—রহস্যজনক হাসি।

অশ্বিনী ওর সে হাসির অর্থ বুঝলো কিনা, বোঝা গেল না কিছু, কেবল চোখ দুটো একবার মিট্ মিট্ ক'রে ব'ললে ঃ

—"আচ্ছা, আমি তা'হলে ওদের নিয়ে আসি এখনি। আপনি যদি দাদা কাইগুলি—মানে ঘরটা খুলে একটু ধুয়ে-টুয়ে..মানে..."

পশুপতি আবার হাসে। বলে ঃ

—"এতে আর দয়ামায়ার সম্বন্ধ কোতায় দাদা? বাড়ী ভাড়া দিয়েই খাচ্ছি—'যকন্...মানে তকন' আর ওসব ক্যানো?...আরে হ্যাঁ.."

সংসার আর সভ্যতার সঙ্গে যেন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাল ঠুক্‌তে চায় ও!..

অশ্বিনী বার হ'য়ে যায় চিন্তাক্লিষ্ট মুখে।...

বেশীক্ষণ নয়, বোধহয় আধঘণ্টার মধ্যেই একটা ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ীর দরোজা খুলে নামে অশ্বিনী। সঙ্গে একটা ঘোমটা টানা মেয়েছেলে, আর একটা টিনের ফুলদার স্যুট্‌কেশ।..

স্যুট্‌কেশটা নিজেই হাতে উঠিয়ে নিয়ে এগিয়ে এলো অশ্বিনী।...পেছনে এলো বৌটা।...

বারান্দায় উবু হ'য়ে ব'সে বিড়ি টানছিল পশুপতি, আর পাশে দাঁড়িয়েছিল যোগমায়া।...

দিব্যি মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, রংটা শ্যাম। ভ্রূ দুটি ললাটের মাঝখানে প্রায় নিশ্চিহ্ন, কেবল সুগোল মুখখানির মধ্যে সুপুষ্টু অধরোষ্ঠ দুখানিই আকর্ষণীয়। নাকের একপাশে একখানা ওপেল বাঁধানো নাকচাবী, নিচের হাতে সোনার রুলী, গলায় মোটা বিছে, পরণে বিচিত্র পাড়ের ছাপানো শাড়ী।

কর্মকারের বিবাহিতা স্ত্রী সুখদার স্বর্গারোহণ হ'য়েছে প্রায় বারো বৎসর আগে, আর যোগমায়া এসে পশুপতির ঘর সংসার আলো ক'রেছে মাত্র সাত মাস।"...

সম্বন্ধটা এই রকমই।..তা হ'লেও পশুপতির ওপোর যোগমায়ার মমতার অন্ত নাই।

নিজের কাঁচাপাকা চুলের ওপোর মাথাটার কাপড়টা আর একটু টেনে দিয়ে শুধোলে...

—"বাইরের ঘরখানা পর্যন্ত ভাড়া দিলে, তো বন্ধুবান্ধব এলে বসাবে কোতায়?..."

পশুপতি মিট্‌মিটিয়ে হেসে জবাব দিলে ঃ

—"কেন,—শোবার ঘরে!..."

ঠোঁট ও'ল্টালে যোগমায়া...

—"এ॰—আমি কি যত তোমার ইয়ার বক্‌সিদের সামনে বেরুব নাকি?—ও আমি পারবো না।..."

যোগমায়া আরো যেন কি একটা ব'লতে যাচ্ছিল কিন্তু পারলে না, দেখলে বিদ্রূপের হাসিতে বঙ্কিম হ'য়ে উঠেছে পশুপতির ভ্রূ।...

কলতলায়—মানে জল আনতে এসে আলাপ জ'মে উঠলো।

কমল শুধোলে ঃ

—"তা তোমার বাপের বাড়ী কোতায় ভাই?..."

—"বাপের বাড়ী?..."

একটু অন্যমনস্ক হ'য়েই মেয়েটি জবাব দেয়...

—"সে—অনেক দূর-গাঁয়ে।...বাঁকুড়া জেলায়—কিন্তু সেখানে আমরা থাকিনি কোনওদিন।"

—"কতদিন বে' হ'য়েচে?..."

—"বছরখানেক হবে।..."

—"আহা! তা বাপ মাকে ছেড়ে আসতে খুব কষ্ট হ'য়েছিল নিশ্চয়!"

—"হুঁ!..."

—"বর কি কাজ করে?"...

এবার এসে দেখা দেয় গুইরামের পরিবার। বলে ঃ

—"সর্‌ সর্‌ তোরা, আমায় জল নিতে দে! একুনি খেয়ে আপিসে যাবে। সর্‌..."

কলসীতে জল ভরা হ'য়েছিল নবাগতার, কাঁখে উঠিয়ে নিয়েই সে যাকে দেখে মুখের ওপোর ঘোমটা টেনে দিলে, সে আর কেউ নয়, অশ্বিনী। অশ্বিনী বাজার ক'রে ফিরছে ;—

একহাতে ওর একটা মস্ত ইলিশ, অন্যহাতে বাজারের ব্যাগ থেকে উঁকি মারছে পুঁইশাকের একপ্রান্ত, আর কুমড়োর ফালির একটুকু।...

ওপাশের বারান্দা থেকে কুড়ুনে হাঁক দেয়—

—"কি দাদা, মাছটা কত হ'লো?..."

চ'লতে চ'লতে মুখ ফিরিয়ে অশ্বিনী যে কি উত্তর দিলে, তা ভালো বোঝা গেল না। তার বদলে কোণের ঘর থেকে গর্জন শোনা গেল যোগমায়ার ঃ

—"কি আমার সংসার রে!...এটা আনতে ওটা নেই! আবার আনতে ব'ললেই চোখ রাঙানো! কেন গা বাপু? ...আমিইবা এত সইতে যাই কেন? কার জন্যে? পারবো না, এ সংসারে সংসার ক'রতে পারবো না আমি, এই ব'লে দিচ্ছি!..."

কিন্তু যাকেই উদ্দেশ্য ক'রে সে কথা বলুক, তার তরফ থেকে কোনও জবাব শোনা গেল না।

তাস পেটাতে পেটাতে রাখোহরি শুধোয় ঃ

—"বলি, ঘর তো ভাড়া দিলে, কিন্তু মানুষটা তোমার চেনা তো?"

হুস্ হুস্ ক'রে হাতের মধ্যেকার জ্বলন্ত বিড়িটায় টান দিতে দিতে জবাব দেয় পশুপতি ঃ

—"কেন, কি আবার হ'লো তোর?..."

—"ঐ তোমার এক কথা।"

রাখোহরি টেনে টেনে বলে ঃ

—"রাগ ধরে মাইরি। ভালো কথা ব'লতে গেলেও মন্দ ভেবে নাও তুমি। নেহাৎ তোমায়, মানে একটু ভালোবাসি ব'লেই ভাবনা হয়! নইলে দুনিয়ায় কে কার তারই ঠিক নেই, তা আবার ভাড়াটের সঙ্গে বাড়ীওয়ালার ভাব!..."

—"তা যা ব'লেচিস্ দাদা, ...একখানা কথা!"

টেনে টেনে হাসতে থাকে কমলের স্বামী ষষ্ঠী! তারপরে জোরে তাস পিটিয়ে চেঁচায়।

—"লেঃ লেঃ,—খেলবি তো খ্যাল্! আর না খেলিস্ তো উটে যা!..."

নেশাখোর নিতাই তার একথায় চ'টে ওঠে। বলে ঃ

—"উটে যাব, মাইরি আর কি? ভাড়া দিয়ে তবে একানে থাকি ; উট্‌বো ব'ললেই উট্‌বো? আমি উটে গেলেই ঘরখানা বুঝি এসে দকল করবে, কারবারটা মন্দ নয়! এঃ..."

শুয়ে প'ড়ে সে গান ধরে ঃ

—ও সই, ভামরা তোমার ফুলের বনে—
এ ভোমরা...

তাস্ খেলা চ'লতে থাকে ওকে বাদ দিয়েই। অবকাশে অবকাশে কথাও চলে নবাগত অশ্বিনীর সম্বন্ধে।

—"কোথায় যেন দেখেছি ওকে।"

—"ঠিক্! আমিও মনে ক'রতে পারছিনে, তবু মুখটা যেন চেনা!..."

—"আর, বৌ ব'লছিল..."

জীবন বলে—"নতুন বিয়ে ক'রেছে সে, তাই বৌয়ের কথায় তার অনন্ত আস্থা।"

উদ্‌গ্রীব বন্ধু মহলকে আর একটু উৎসুক ক'রে তুলে জীবন বলে ঃ

—"বৌ ব'লছিল, অশ্বিনীবাবু লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোক হ'লে কি হয়—বৌটা'র সম্বন্ধে কেমন কেমন ঠেকে যেন। মনে হয় বিয়ে করা বৌ নয় ওর।"

জীবন আর ওর বৌয়ের এই আবিষ্কারে সকলে একটু উৎসাহিত—একটু চকিতও হয় বোধকরি। কেবল পশুপতি হাতের বিড়িটাকে আছড়ে ফেলে বলে ঃ

—"দূর শালা!..."

বেলা হ'য়েছে!...

উনুনে ভাতের হাঁড়িটাকে চাপিয়ে দিয়ে যোগমায়া সবেমাত্র গোটাকুড়ি পানের খিলি

সেজে বাটায় তুল্‌ছে, এমনি সময়ে দরোজার বাইরে থেকে অস্পষ্ট একটা আহ্বান কানে এলো,—

—"ও মা, মাগো!..."

চম্‌কে উঠে তাকালো যোগমায়া ; দেখলে, দরোজার পাশে দাঁড়িয়ে অশ্বিনীর সঙ্গে আসা সেই মেয়েটা। কপালের কাপড় ওর চোখের ওপোর পর্যন্ত ঢাকা, গায়ে একটা ছেঁড়া সেমিজ, নিচের হাতে শাঁখা। হাত দুখানা মেলে ধ'রেছে ও—সে হাতের মুঠোয় কয়েক আনা পয়সা। ব'ললে ঃ—

—"ওনার জ্বর এসেছে ; তাই ব'ললেন, যদি তুমি একটু সাবু কি বার্লি আনিয়ে দাও..."

ঘোমটা স'রে দেখা যায় অশ্বিনীর বৌয়ের উজ্জ্বল শ্যাম মুখখানা।...যোগমায়া দেখে—পশুপতি সেইদিকেই তাকিয়ে আছে..সে তাকানোটা কেমন যেন অসহ্য—বোধহয় যোগমায়ার কাছে। বিকৃত মুখে জবাব দেয় ঃ

—"তা আমার কাছে ক্যানো, আরো তো লোক র'য়েচে বাসায়।"

উঠে এসে পশুপতি বলে—

—"তোর এক কতা যোগা, জ্বর এয়েচে, অসুক মানুষটার একটু উবগারে লাগবো না?.. ওগো, তুমি পয়সা রেখে যাও—রেখে যাও...ও অশ্বিনীর বৌ—"

অশ্বিনীর বৌ একটু আশ্চর্য হ'য়েই ঘোমটার ভেতর থেকে যুগলমূর্তির দিকে তাকায় যেন, কিন্তু পয়সা রেখে যেতে ভোলে না।...

রুদ্ধ আক্রোশে আহত অজগর একটা যেমন ফোঁস ফোঁস শব্দ করে—তেমনি একটা ফোঁশফোঁশানীর আওয়াজ আসছিল অশ্বিনীর ঘর থেকে।...

রাত্রি অনেক।...দূরে, কোথায় যেন কোন একটা কুকুর চীৎকার ক'রেই চুপ ক'রে গেল। পুলিশের বাঁশীর ধ্বনিও কানে এলো একবার—কিন্তু পশুপতি সেদিকে মন দিলে না ; দরোজা খুলে বাইরে এসেই সে থমকে দাঁড়িয়েছিল ঐ শব্দটা শুনে। কিন্তু আগিয়ে যেতে পারলে না আর। সামনের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে, সেখানে সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে নক্ষত্রগুলো যেন সংখ্যাতীত হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই তাকিয়ে থাকার সঙ্গে জিজ্ঞাসার চিহ্নে আত্মপ্রকাশ ক'রছে সপ্তর্ষির দল। ওরা যেন একযোগে ওর কাছে জানতে চায়—ঐ ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দের ইতিবৃত্ত! যা আজ কানে আসতেই পশুপতিও কেমন যেন থ'ম্‌কে গেছে! মনে প'ড়ছে ওমনি ক'রে—হাঁ, ওমনি ক'রে একদিন আর একজনও তার পায়ের কাছে আছড়ে প'ড়ে কেঁদেছিল।

...সে তার স্ত্রী, যে স্ত্রী হঠাৎ একরাত্রে মারা গিয়েছিল ;...লোকে ব'লেছিল—মরেছে হার্টফেল ক'রে। কিন্তু সে কথা যাক্।...

আজ, আজ অশ্বিনীর বৌ কাঁদছে কেন?...তবে, তবে কি! অসম্পূর্ণ একটা প্রশ্ন মনে নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে পশুপতি। কিন্তু বাধা পায় তখুনি। পেছন থেকে যোগমায়ার মাংসল বাহু দুখানা ওকে বেঁধে ফেলে কঠিন বন্ধনে। বলে ঃ

—"তবে রে মিন্সে! লুকিয়ে পরের ঘরের পরিবার দ্যাকা! আমি বলি গ্যালো কোতায় আর উনি কিনা..হেঃ হেঃ..." নিষ্ঠুর একটা হাসি অর্ধ পথেই থেমে গেল যোগমায়ার মুখে। ফিরে দাঁড়িয়ে শক্ত হাতের মুঠিতে যোগার মুখখানা চেপে ধরলে পশুপতি—তারপর তাকে হিড় হিড় ক'রে ঘরে টেনে এনে দরোজা বন্ধ করে দিলে।...

দিন দুই কেটে গেল।...পশুপতির ঘর থেকে যোগমায়ার আর কোনও উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি বটে, কিন্তু বাইরে, অশ্বিনীর ঘরের ফোঁসফোঁসানীটা যেন ক্রমশই বেড়ে চলেছে।...

বৌটার অসুখ। বিছানায় প'ড়ে সে কাৎরায়। বোধহয় কাঁদেও—তবু কাউকে ডাকে না। পশুপতিও আর এ পথে হাঁটে না—প্রতিবাদীরাও নয়।—

সবাই যেন ওদের এড়িয়ে চলতেই চায়।...

কাজ সেরে দুপুরে ফিরছিল গুইরাম। অশ্বিনীকে তাড়াতাড়ি বার হয়ে যেতে দেখে—শুধোলে :

—"কোতায় চলেছো অশ্বিনীবাবু?...

অশ্বিনী জবাব দিলে :

—"আর বল কেন ভাই, পরিবারের অসুখ, তাই ডাক্তার ডাকতে।—জেরবার হ'য়ে মলাম একেবারে। একমাস হ'লো না ঘর ভাড়া নিয়েছি। এরই মধ্যে একেবারে...মানে যাকে বলে..."

হঠাৎ সে ডান হাতখানা মেলে ধরে গুইরামের সামনে ; প্রার্থনার সুরে বলে :

—"কিছু আছে ভাই? ধার দিতে পারো উপস্থিতের মত? মাইনেটা পেলেই শোধ দিয়ে দেব!"...

—"ধার?"—

গুইরাম ছেঁড়া পকেট হাতড়িয়ে পাঁচসিকে পয়সা বার ক'রে দেয়। বলে :

—"আর তো নেই।—"

—"না থাক্।"—

চ'লতে চ'লতে অশ্বিনী বলে :

—"এখন এতেই হবে।..."

দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় সে, ক্রমে মিলিয়ে যায় পথের বাঁকে। কেবল ওর যাবার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে গুইরাম। মনে পড়ে ওর—কাল—গত কাল কে যেন ঐ লোকটার কাছে পাওনা টাকা চাইতে এসেছিল ! তা ছাড়া পথের মোড়ের ঐ মুদির দোকানে ওর মাসকাবারের জিনিস এসেছে ধারে—মুদি টাকার কথাটা সেদিন তুলেছিল—গুইরামেরই সামনে।...সমস্ত কথাটা ভাবে গুইরাম।...কিন্তু এর শেষ পায় না। নেকাপড়া জানা নোক, ভদ্দর নোক...কিন্তু, কিন্তু...সমস্ত অন্তরে যেন একটা বিক্ষোভ জাগে।...

ভোর হ'য়ে এসেছে, শীতের ভোর।...

দরোজার বাইরে থেকে করাঘাতের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে বিছানার ওপোরে উঠে ব'সলো পশুপতি। তারপরে দরোজা খুলে বার হ'য়ে এলো।...

কিন্তু একি?...চারিদিকে লাল পাগড়ী দেখা যায় কেন? পশুপতি চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু স'রে যাবার সুযোগ পায় না। সামনে এসে দাঁড়ায় ওদের বড়কর্তা। শুধোয় :

—"তোমার নাম পশুপতি কর্মকার—"

—"আজ্ঞে!—"

—"হরিহর সাহু ব'লে কাউকে ভাড়া রেখেছিলে? তার সঙ্গে আর একটি মেয়ে—নাম—মীরা গুহ!—"

বিস্মিত পশুপতি জবাব দেয় :

—"কই স্যার? না..."

—"মিথ্যে কথা ব'লছো, আমি জানি..."

কর্তা হুম্‌কী দেন। অপ্রস্তুত হ'য়ে পশুপতি বলে :

—"হুজুরের দিব্যি—মাইরি নয়। তবে অশ্বিনী চৌধুরী ব'লে একজন ভদ্দর নোক তার পরিবারকে নিয়ে ভাড়া আচেন বটে—ঐ ঘরে..."

ঘরখানা আর দেখিয়ে দিতে হ'লো না, বড়কর্তা নিজেই এগিয়ে গিয়ে দেখলেন ঘরের

দরোজা খোলা—কেউ কোথাও নাই—কেবল কয়েকখানা ছেঁড়া জামা, জুতো আর কাগজের টুক্‌রো এধারে ওধারে ছড়িয়ে সকালের আলোয় পরিস্ফুট হ'য়ে উঠছে ক্রমশ।...

গুইরাম বলে ঃ

—"ল্যাও ঠালা! গরীবের কথা বাসি হ'লেই মিষ্টি লাগে।...তখন ব'লেছিলুম কিনা..."

ষষ্ঠী বলে ঃ...

—"হ'লো তো!"...

কেবল চুপ ক'রে ব'সে থাকে পশুপতি—আর দূর থেকে হাসতে থাকে যোগমায়ার চোখ-দুটো।...

জীবনের টিপ্পনী কানে আসে। সে বলে ঃ

—"বৌ ব'লেছিল ঠিকই, ও ওর বিয়ে করা বৌ নয়। নেকাপড়া জানা মেয়েমানুষ, বৌ হয় কখনো?—"

পশুপতির চোখ দুটো জ্বালা ক'রে ওঠে হঠাৎ!...একটা কথা ওর ঠোঁটের কাছে এগিয়ে আসে যেন কিন্তু বলে না। উঠে যায় ;—যেতে যেতে শোনে ওরা একযোগে ব'লছে ঃ

—"দেখতে একদিন পাবই, তখন টাকা আদায় ক'রবো কেমন ক'রে তা..."

পশুপতি তা জানে। কিন্তু ভাবে...অশ্বিনী যেই হোক, আর যে অপরাধেই সংসারের শান্তিভঙ্গ ক'রে বেড়াক, সঙ্গিনী সে পেয়েছে তারই যোগ্য। তাই তার নালিশ নেই—কৈফিয়ৎ দেবার নেই কারো কাছে।

শ্রাবণ ১৩৫৫

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা—

আশাপূর্ণা দেবী

ঘুম ভাঙিতেই প্রথম মনে হইল সকালের আলোটায় "আলো"র পরিমাণ যেন অন্যদিন অপেক্ষা অনেক বেশী। কাহার সহিত দেখা না হইতেই ছুটিয়া গেল রাধা ছাদে। কেন গেল সেই জানে, অথবা সেও জানে না।

কলিকাতার বাড়ীর ছাদে উঠিয়াই যে রাধা সহসা মনোরম একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য বা সূর্যোদয়ের অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটা দেখিয়া মুগ্ধ হইল এমন মনে করিবার হেতু নাই। তবু সে অহেতুক আনন্দে উচ্ছ্বসিত মুগ্ধ হৃদয়ে মনে মনে উচ্চারণ করিল—বাঃ। শ্যাওলা পড়া ছাদের আলিসা ধরিয়া কিছুক্ষণ আনমনে দাঁড়াইয়া থাকিল। আবার চঞ্চলচিত্তে—গুন গুন করিয়া একটা বহু পুরাতন গানের এককলি গাহিতে গাাহতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল ; "নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরাণ হবে খুসী, যে পথ দিয়া চলিয়া যাবো—সবারে যাবো তুষি'। বাতাস জল, আকাশ আলো—সবারে কবে বাসিব ভালো—হৃদয় সভা জুড়িয়া তা'রা—

অকস্মাৎ খোঁপায় 'হ্যাঁচ্‌কা' এক টান্ খাইয়া মাথাটা পিছনের দিকে ঝুলিয়া পড়িল এবং রবিবাবুর মর্যাদা ভুলিয়া রাধা গানের মাঝখানে চীৎকার করিয়া উঠিল—উঃ।

আক্রমণকারী ততক্ষণে নিরীহভাবে বইখাতা লইয়া গুছাইয়া বসিবার বাসনায় ছাদে একখানি মাদুর বিছাইতেছে ; রাধা বিরক্তকণ্ঠে কহিল, এটা কি হল শিশির?

ষোল বছরের ছেলেকে যুবক বলিলে যদি শ্রুতিকটু না হয় তো উক্ত যুবক, অথবা বালক বলিলে যদি মর্যাদাহানি না হয় তো উক্ত বালক—নিজের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ আশা করিয়াছিল একটি অগ্নিবর্ষণকারী তীব্র দৃষ্টি এবং একটি উত্তপ্ত কণ্ঠের মর্মভেদী ডাক—"শিশির"।

সেস্থানে রাধার বিরক্তিপূর্ণ প্রশ্নটা অনেক কোমল বলিয়া বোধ হইল। কাজেই আরো ক্ষেপাইবার উদ্দেশ্যে কহিল—কোনটা? ওঃ চুলটানা? শ্রীরাধা ধ্যানে মগ্ন, অথচ চায়ের জল প্রতীক্ষা করে করে শীতল হয়ে উঠছে—তাই।

রাধা ঝাঁঝিয়া উঠিয়া কহিল—শিশির, ফের তুমি ওই রকম ইয়ার্কি দিয়ে কথা বলছো? কলেজে ঢুকে তোমার বড় বাড় বেড়েছে না? মাসীর সঙ্গে আবার ঠাট্টা কি?

শিশির সবিনয়ে দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া কহিল—ও 'সরি' ছোটমাসীমাতা ঠাকুরাণী, চায়ের জলটা আপনার আশায় থেকে থেকে হতাশ হয়ে উঠছে—দয়া করে যদি বেচারাকে কেটলীর পেট থেকে মুক্তি দেন।

রাধা কিঞ্চিৎ নরম হইয়া কহিল—দাদু উঠেছেন না কি? কতই বা বেলা হয়েছে?

আপনার কি আজ সময়ের জ্ঞান আছে? ধ্যানমগ্ন হয়ে কতক্ষণ ছিলেন সেটা যদি ঘড়ি ধরে দেখতেন?

শিশির ভারী অসভ্য হয়েছ তুমি, চল বড়দির কাছে তোমার মজা দেখাচ্ছি।

'বড়দির' নামে শিশির সবিনয়ে শিথিলতা ত্যাগ করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল—কি মজা দেখাবে শুনি? অসভ্যতাটা কি করা হয়েছে? 'ধ্যানমগ্ন' কথাটা বুঝি খুব অসভ্য? সাধু সন্ন্যাসীরা ভোর বেলা নির্জনে বসে ঈশ্বর চিন্তা করেন না? তুমি যদি নিজের মনের মতন মানে বের করো কি করবো? সেই যে বলে না 'চোরের মন বোঁচকার দিকে' তোমার তাই

হয়েছে দেখছি। চল—তুমিই চল, সবাইকে জিগ্যেস করি গিয়ে—

'সবাইকে জিগ্যেস' করিবার নামেই রাধার বীরত্ব কমিয়া আসিয়াছিল? কিন্তু মুখে স্বীকার না করিয়া মাসীগিরি বজায় রাখিয়া কহিল—আচ্ছা খুব হয়েছে—সকাল বেলা বুঝি লেখা পড়া নেই? ফার্স্ট ইয়ারে ফেল্ করলে খুব মুখ উজ্জ্বল হবে—কলেজের ছেলেরা চাঁটি মেরে বের করে দেবে যখন, তখন দেখবে মজা। বলিয়াই বোধকরি নিজেই চাঁটি খাইবার ভয়ে দুড়দুড় করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

শিশির হাসিয়া পাঠে মনঃসংযোগ করিল ; অন্যদিন হইলে চুল টানার অজুহাতে একটা খণ্ড প্রলয় ঘটিয়া যাইত সন্দেহ নাই, কিন্তু আজকের কথা স্বতন্ত্র।

রাধার কপালে আজ অনেক দুঃখ, বড়দি যে বড়দি এত গম্ভীর মানুষ, তিনি আজ পর্যন্ত রাধাকে দেখিয়াই মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—রাধারাণীর যে রাত না পোয়াতেই ঘুম ভেঙেছে দেখছি! কে জাগালে গো?

এ কি অন্যায় বল তো—রাধার না হয় 'ঘুম-কাতুরে' বলিয়া একটু বদনাম আছে, তাই বলিয়া কি না ডাকিলে কোনদিনই ওঠে না? এই তো সেদিন—কবে যেন ভাল—রাধা ভোরবেলা উঠিয়া বড়দিরই খোকাকে পাউডার মাখাইল, টিপ কাজল পরাইল, কোলে করিয়া সাত রাজ্য ঘুরিয়া বেড়াইল—বড়দির তখন অর্ধেক রাত! ইতিমধ্যেই সেসব ভুল, অকৃতজ্ঞ হইলেই এইরকম হয় বটে।

আজ একটু সকাল সকাল ঘুম ভাঙিয়াছে বলিয়া পরিহাস কিসের বাপু? ছেলে তো এদিকে ধ্যানমগ্নটগ্ন কত কি যা তা' বলিয়া বসিল। বাঃ রে, রোজই বুঝি ডেকে দিতে হয়? বলিয়া রাধা সরিয়া পড়িল। কিন্তু পড়িল একেবারে বাঘের মুখে—বড় জামাইবাবু যে ট্রেনের 'ধকলে' সারাদিন কাটাইয়া রাত্রি বারোটায় শয্যাগ্রহণ করিয়া সকালবেলাই সেই শয্যার মায়া ত্যাগ করিবেন এটা রাধার কল্পনারও অতীত। জামাইবাবুর পক্ষে রাধাকে গ্রেপ্তার করা এমন কিছু কঠিন নয়, যার জন্য রাধা ভদ্রলোককে "লোহার থাবা" নামে অভিহিত করে। হাত ছাড়িবার কিছুমাত্র লক্ষণ না দেখাইয়া ভদ্রলোক এমন সব অশিষ্ট কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন যাহা দাঁড়াইয়া শোনা অসম্ভব বলিলেও হয়, ছাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে রাধা বিরক্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল—আপনি যে বড় আমার সঙ্গে ঠাট্টা করেন? আপনার ছেলেই বলে আমার চেয়ে বড়, হ্যাঁ। ভারী একেবারে—

তাতে কি? শ্যালী ইজ্ শ্যালী, ছেলের চেয়ে ছোট বলে শ্যালীকে নাত বৌ বলতে হবে না কি? লজিক পড়া বরের সঙ্গে মিশে এই বুদ্ধি হচ্ছে বুঝি? এঃ হে হেঃ।

লাগছে, ছাড়ুন বলছি, আঃ—অনেক কষ্টে শৃঙ্খল ভাঙিয়া দে ছুট। রাধার পিছনে সকলে মিলিয়া এমন করিয়া লাগিবার হেতুটা কি? বেচারাকে কি কাঁদাইয়া ছাড়িবে?

জামাইবাবুর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া রাধা প্রায় কাঁদো কাঁদো হইয়াই স্নানের ঘরে ঢুকিল, সন্দেহ হইতে পারে হয়তো বা কাঁদিতেই গেল। কিন্তু স্নানের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আর্শীটা যদি আর্শী না হইয়া ক্যামেরা হইত তাহা হইলে হয়তো বিপরীত সাক্ষ্য দিয়া লোকসমাজে তাহাকে অপদস্থ করিয়া ছাড়িত।

বহুক্ষণ ধরিয়া জল মাখাইয়া ছিটাইয়া র. ' যখন বর্ষা ধোয়া শ্যামল লতার মত একটা স্নিগ্ধশ্রী লইয়া স্নান সারিয়া বাহির হইল, তখন আপনার তনুর কমনীয়তায় আপনা আপনি মনটা তাহার অপূর্ব পুলকে মুগ্ধ বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সুন্দর স্নানের পর, বাদামী সিল্কের ব্লাউসের সহিত, রূপালী জরিপাড় মিহি নীলাম্বরী শাড়ীখানি পরিলেই অবশ্য মানায় ভালো ; কিন্তু পরিলে বাড়ীর সকলে তাহাকে 'আস্ত' রাখিবে কি না সে বিষয়ে রাধার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অগত্যাই ঈষৎ ক্ষুণ্ণ মনে নিত্য ব্যবহৃত শাড়ী ব্লাউস পরিয়া সারিতে হইল।

চুল আঁচড়ানো অথবা টিপ্ পরা অবশ্য প্রাত্যহিক কর্মের মধ্যে পড়ে—করিলে নিন্দা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু রাধার ভাগ্যে আজকে হয়তো লোকচক্ষে তাহারও একটা বিশেষ অর্থ বাহির হইবে, কাজ নাই বাপু।

বরং ইচ্ছা করিয়াই চুলগুলা একটু এলোমেলো করিয়া রাখিল; মায়ের চক্ষে পড়িলে যদি কিছু সুরাহা হয়। হায় এত ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করা সত্ত্বেও ঘর হইতে বাহির হইতে মেজদা অনায়াসে বলিয়া বসিল—রাধি যে খুব ফরসা হয়েছিস দেখছি? সকাল থেকেই পাউডার মাখতে আরম্ভ করেছিস বুঝি?

দেখিলে একবার আক্কেলখানা? কবে আবার 'রাধি' সকালবেলা পাউডার মাখিয়া বেড়ায়, তাই আজই অমনি মাখিয়া বসিবে। যা নয় তাই। ইহারা দেখছি রাধাকে বাড়ী ছাড়া করিয়া ছাড়িবে। মেজদাকে উপযুক্ত উত্তর দিবার আগেই সে অবশ্য চলিয়া গিয়াছে; ড্রয়ার হইতে কাঁচিখানা বাহির করিয়া লইয়া।

রাধা হাঁকিয়া বলিল, বড় কাঁচি নিচ্ছ যে মেজদা? মা বকবে কিন্তু, কি করবে কাঁচি?

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে মেজদা বলিয়া গেল, এক ভদ্রলোকের নাক আর কান কাটা হবে। শুনিলে কথা? সাধে বলিয়াছি রাধাকে ইহারা বাড়ী ছাড়া না করিয়া ছাড়িবে না। এমন করিয়া যদি—দূর ছাই, তা'র চেয়ে ভাঁড়ার ঘরে মা ঠাকুমার কাছে গিয়া বসা যাক, নিরাপদ দুর্গ।

রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল, সেখানে বিরাট ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে। তিনটা উনুন জ্বালিয়া বামুন ঠাকুর যেন কল্কি অবতারের দ্বিতীয় সংস্করণের ন্যায় 'ম্লেচ্ছ-নিধন' ছাড়িয়া মৎস্য-নিধন্ কার্যে লাগিয়াছে। মসলার গন্ধে রন্ধনশালা ভরপুর। একদিকে আবার তোলা উনুন জ্বালিয়া মা পায়েস চড়াইয়াছেন। বাবা বাবা! বিয়ে নাকি বাড়ীতে? প্রসন্নমুখে কোন রকমে অপ্রসন্ন ভাব টানিয়া আনিয়া রাধা ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল—বাবারে বাবা, ঠামা যে একেবারে খাবারের বৃন্দাবন করে বসেছ, আমাদের বুঝি খিদে পায় না? বারে! ঠামা ঝুড়ি দুয়েক ফল মিষ্টি লইয়া রেকাবীতে "বাটা" সাজাইতেছিলেন, রাধাকে দেখিয়া মুখ তুলিয়া হাসিয়া হাত নাড়িয়া গাহিয়া উঠিলেন—"রাধার কুঞ্জবনে, আজ গোপনে, আসবে শ্যামরায়।" বলি রাধালতার আজ 'বার' নেই কেন গো? অন্যদিন যে এতক্ষণে সাতবার দেখা মেলে!

ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া রাধা মার কান বাঁচাইয়া কহিল—ঠামা তো বেশ কেত্তন গাইতে পারো। ভালো লোককে শোনাতে পারলে বক্‌শিষ পেতে।

ওলো, ভালো কি আর আছে? ভালো কালো হয়ে গেছে, সব গোপিনী ভাসিয়ে দিয়ে রাধার পায়ে পড়ে আছে।

আমাদের কপালে ভাল আর নেই গো রাধালতা। পাথর বাটিটা দে তো ভাই ওদিক থেকে। পাথর বাটি সরাইয়া দিয়া রাধা কৌতুককণ্ঠে কহিল—কেন তোমারটি তো আর কেউ কেড়ে নেয়নি বাবু?

আর দিদি, সেকাল কি আছে? যে একটি কথা কইবার জন্যে, মুখখানি একটু দেখবার জন্যে—চাতক পক্ষীর মতন ঘুর ঘুর করে বেড়াবে? এখনি না হ'ক কত মুখনাড়া দিয়ে গেল, বুড়ি বলেই না?

রাধা হাসিমুখে আর কিছু বলিতে যাইতেছিল, মা রান্নাঘরে হইতে ছুটিয়া আসিলেন—ন'খুড়ি পায়েসের কিসমিস ক'টা বাছা হয়েছে না কি। হয়ে থাকে তো দাও। ঠামা নিবিষ্ট মনে শশার চাকায় ফুল কাটিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন—কিসমিস পেস্তা বাদাম এলাচ কর্পূর সব তো বৌমা রেখে এসেছি? জলচৌকীর নীচে রেকাবে আছে।

রাধার মা কন্যার দিকে চাহিয়া কহিলেন, রাধা কোথায় ছিলিরে? সকলের "ঘাটের

জল" নেওয়া হয়েছে শুধু তোরই বাকী আছে, ছুটে যেন পালাসনে? 'ঘাটের জল' দেব—মিষ্টি হাতে দেব। আসছি পায়েসটা নামিয়ে।

রাধা বড় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল ; সত্যই কি তাহার স্নানের ঘরে এত দেরী হইয়া গিয়াছে। 'ঠামা' রাধার লজ্জিতভাব লক্ষ্য না করিয়া আপনার মনেই কহিতে লাগিলেন—

এদের সব এখনকার ধরণধারণ বুঝিনে, রান্না বান্না করে ব্যস্ত ; এদিকে মেয়েটা একখানা ময়লা কাপড় পরে বেড়াচ্ছে তা' ভ্রূক্ষেপ নেই। আমাদের কালে যদি জামাই নেমন্তন্ন হয়েছে তো সাত পাড়ার বৌ ঝি জড় হয়েছে মেয়ে সাজাতে। তা' এখনকার মেয়েদের করেই বা দেবে কি, নিজেরাই কত সাজতে জানে! যা লো রাধা, যা মনের মত করে একটু সাজসজ্জা কর্‌গে, পায়ে একটু আলতা ছোঁয়াস। টিপ্ কাজল কতই তো পরিস লো, আজ এমন যোগিনী বেশ কেন? কি যে সেই গাস তোরা—"যোগিনী হইয়ে যাবো সেই দেশে"—তাই বুঝি। রাধা মুচকি হাসিয়া কহিল, ঠামার যেমন সব অদ্ভুত কথা, যোগিনী বেশ কোথা দেখলে? 'এই তো ডুরে শাড়ী পরেছি। তা হো'ক দিদি, বচ্ছরকার দিন নতুন বর আসবে, একখানি ভাল কাপড় পরতে হয়—ওলো অ' শান্তি! এই যে শিশির, তোর মাকে ডেকে দে তো? দিক্ এসে মেয়েটাকে সাজিয়ে গুজিয়ে—রাধারাণী তো আমার এখনকার মেয়েদের মতন নয়। একটা দুর্ভাবনা ঘুচিল, বড়দি'র কাছে কৌশল করিয়া রাধার তবু নীলাম্বরী শাড়াখানির কথা উল্লেখ করিতে হইবে। নীলাম্বরীর একটা মধুর ইতিহাস আছে বলিয়াই না রাধার এত চিন্তা। মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, নাঃ রাধা মোটেই একেলে নয়—ভারী সেকেলে।

বড়দি না ডাকিলে তো যাওয়া যায় না ; তা' ছাড়া মা নিষেধ করিয়া গেছেন ছুটিয়া পলাইতে ; রাধা অন্যমনস্কভাবে কহিল—আচ্ছা ঠামা তোমার বিয়ে হয়েছে কতদিন হলো?

কেন রে—হঠাৎ এ খোঁজ কেন? সে কি আজকের কথা? ন বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে, আর এই উনষাট হ'ল ; পঞ্চাশ বছরের কথা, চার যুগ বেরিয়ে গেছে। বলিতে বলিতে বৃদ্ধা ঠাকুরমাও কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন, অতীতের কোন দৃশ্য কল্পনা করিয়া না জানি শিরাবহুল শীর্ণ মুখে একটু মধুর স্নিগ্ধতা ফুটিয়া উঠিল।

আচ্ছা ঠা'মা, দাদু তোমায় খুব আদর করতেন?

আ মোলো! কি পাপ!! সকাল বেলা ছুঁড়ির মাথা বিগড়ে গেল না কি? সর সর কাজ আছে।

ও ঠাকুমা বল না, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি—

ওলো করতো লো করতো, এখনকার ছোঁড়ারা সোহাগের জানে কি? 'বিশবছুরে' কনে সব—তারাই থাকে হাঁ করে, বর পেয়ে বর্তে যায়। তখনকার এতটুকুন মেয়ে—পাখী পোষার মতন করে বশ করতে' হ'ত ; তবে না মনের মতনটি হ'ত? সে সব সোহাগের মর্ম তোরা বুঝবি কি?

রাধার অবশ্য বিশ বছর বয়স নয়, তাই শ্লেষটা গায়ে মাখিল না ; বলিয়া উঠিল—তবে এখন যে দাদুর সঙ্গে দিনরাত ঝগড়া করো বড়ো? দাদুও তো তোমায় কেবলি বকেন?

রাধা, তোর কথায় বাছা মরা মানুষেরও হাসি পায়। বকবে না তো কি এখনো কোলে বসিয়ে সোহাগ করবে? সকাল বেলা রাজ্যের ছিষ্টিছাড়া কথা নিয়ে কাজ ভণ্ডুল। নে সর, কত কাজ বাকী এখনো। ওই আসছেন তাড়া দিতে। বসে বসে তামাক খাবার যম। খালি ফোঁফোর দালালী।

আসিতেছেনই বটে, চটি জুতার শব্দে পাড়া মুখরিত করিয়া দাদু আসিয়া দর্শন দিলেন—কি এখনো তোমাদের হয়নি তো? আঃ, আজ আর দেখছি তোমরা ভদ্রলোকের ছেলেদের বেলা দুটোর আগে খেতে দিচ্ছ না। পিত্তি পড়িয়ে অসুখ করাবে আর কি—

ষাট্ অসুখ করবে কি দুঃখে? কথার কি ছিরি, মরে যাই। বেলা দশটা না বাজতেই নিজের যদি পিত্তি পড়ে যায় তো গিলে নাওগে যাও। ভদ্দর লোকের ছেলেরা এসেছে সবাই?—আসা আসি আর কি সুধাংশু তো রয়েইছে—বিজয়ও এসে পড়বে এখুনি রবিবার আছে, খালি মনোজ—'তা'কে আনতে যাবে তবে তো? কথা কয়টা কহিয়াই 'দাদু' বারকতক তামাকে টান দিয়া লইলেন, বোধ হয় শ্রম লাঘব করিতে।

যেতে হবে তো—যাও না? বসে বসে তো তামাকের ছেরাদ্দ করছো ; গেরস্থর একটা কাজে লাগলেও তো হয়? দিবা রাত্তির "ভুড়ুক ভুড়ুক" দেখলে যেন হাড়পিত্তি জ্বলে যায়।

শীর্ণ মুখ বিকৃত করিয়া "ঠা'মা এমনভাবে নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন যে দেখিলে "পিত্ত জ্বলিয়া" যাওয়া সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ থাকে না।

রাধা অবশ্য জন্মাবধি এই দৃশ্য দেখিয়া আসিতেছে এবং দাদু যে কোন কালে ঠামার 'বর' বলিয়া পরিচিত ছিলেন, ঘণ্টাখানেক আগে পর্যন্ত একথা তাহার কখনো মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ যেন আজকেই বিশেষ করিয়া কথাটা স্মরণ হইয়া তাহার বড় আশ্চর্য বোধ হইল। এই দন্তহীন কেশহীন বিকৃত-দর্শন বৃদ্ধ একদা যুবকরূপে তরুণী পত্নীকে ভালবাসিয়াছে আদর করিয়াছে, যেমন করিয়া মনোজ তাহাকে—? কি ভাষণ! এই রকম হইয়া যাইবে মনোজ? তাহাকে আর ভালবাসিবে না, আদরে ডুবাইয়া দিবে না। এতটুকু মন খারাপ করিলে শত প্রকার সাধ্য সাধনার মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিবে না। কথায় কথায় গঞ্জনা দিবে, কলহ করিবে?

আর রাধা? রাধাও এমনি শিরাবহুল শীর্ণ হাত নাড়িয়া সারাদিন সংসারের কাজ করিবে? আর রাত্রে নাতি নাতনীর পাশতলায়, যেখানে সেখানে একটু স্থান করিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইবে? অসম্ভব! রাধা কখনো বুড়ি হইয়া বাঁচিবে না। কিন্তু মনোজ? তাহার সম্বন্ধে ও কথা ভাবিতে নাই, সে বাঁচিয়া থাকুক, কিন্তু বুড়া হইবে? ছিঃ।

ঠামা রান্না ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছেন, দাদুর চটির শব্দ কখন মিলাইয়া গেছে রাধা অন্যমনা ; শিশিরের সশব্দ হাস্যে চৈতন্য ফিরিল বেচারার।

বাবা!. মেয়েকে সকালে কি একটু বলেছিলাম বলে তো তেড়ে মারতে এলেন, ধ্যান ছাড়া এটা কি হচ্ছে ছোট মাসী? রাধা মুখ তুলিয়া চাহিল মাত্র, কিছু বলিল না।

শিশির রাধার প্রকৃতি-ছাড়া ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইল। ছোটমাসী আবার গম্ভীর হইবে! বিবাহ ব্যাপারটা যে মেয়েদের পরকাল ঝরঝরে করিয়া দিবার প্রধান 'কল', তাহাতে আর শিশিরের সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

মেয়েদের যে কতই ঢং। নাও, মা তোমার জন্যে রাজ্যের বেনারসী শাড়ী ছড়িয়ে বসে ডাকাডাকি করছেন। কি যে সব বুঝি না বাবা। বলিয়া দুইখানা হাত যতটা সম্ভব উল্টাইয়া মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেল। মূল কথা ছোট মাসীর সঙ্গে ভাল মতন একটা ঝগড়া না বাধান পর্যন্ত তাহার মনে একবিন্দু শান্তি নাই। ভোজের ব্যাপারটি বেশ লোভনীয় হইয়াছে দেখা যাইতেছে, হজম হইবে কিরূপে? লাগিবে নাকি মেজ-মামার সঙ্গে একবার? নাঃ, বড় লায়েক হইয়া গিয়াছে আজকাল সে—শিশিরের সঙ্গে কথা কয় যেন পিঠ চাপড়াইয়া, তেমন জমিবে না। ছোট মেসোমশাইটী আসিলে হয়। লোকটী তবু ভদ্র আছে ; সে দিন খাসা হারিয়াছিল 'ক্যারমে'।

বড়দির কাছে আবার 'ডাক খাইয়া' রাধা উপরে গেল।

বড়দি ট্রাঙ্ক খুলিয়া খানকতক রঙিন শাড়ী বাহির করিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন, দেখিয়া বলিলেন—রাধা শোন্, দেখতো কোন কাপড়টা দেব।

রাধার মন ভাল্ থাকিলে বড়দির সামনে একটু লজ্জার অভিনয় করিয়া জানাইত—বেশ সাজ আছে তাহার। মনটা তাহার সহসা এমন ভারগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে যে নিরুৎসাহভাবে

শুধু বলিল, দাও না যা হয়। নীলাম্বরীর কথা মনেই পড়িল না।

বড়দি বাছিয়া বাছিয়া একখানা বেগুনী ছাপা ছিটের শাড়ী ও ব্লাউস পরাইয়া চুল আঁচড়াইয়া টিপ্ পরাইয়া আলতা পরাইয়া বলিলেন—বসে থাক সভ্য ভব্য হয়ে। এখুনি যেন শিশিরটার সঙ্গে মারামারি করে রণচণ্ডী বেশ করিসনে বাপু।

শিশিরের সঙ্গে? তাহার সম্মুখে বাহির হইতে হইলে তো রাধা মরিয়াই যাইবে। কাহার সামনেই বা নয়? বাবা, দাদু, মেজদা, জামাইবাবু—উঃ সর্বনাশ আর কি?

তিনতলায় দাদার ঘরটা খালি পড়িয়া আছে। দাদা বৌ লইয়া শ্বশুর বাড়ী গিয়াছে, অথবা বৌদি বর লইয়া বাপের বাড়ী। রাধা আসিয়া জানলার ধারে ইজি-চেয়ারটা টানিয়া শুইয়া পড়িল।

কালই তো মনোজের চিঠি আসিয়াছে ; হাতের কাছে না থাকিলেও রাধার প্রায় মুখস্থ। ওই যে লিখিয়াছে রাণি আমাদের ভালবাসা চিরনবীন, চিরসুন্দর, অক্ষয়, যুগযুগান্তর আমরা পরস্পরকে ইত্যাদি ইত্যাদি সে সমস্তই—তাহা হইলে অসার কবিত্ব? "যুবক 'দাদু' ও তরুণী "ঠাকুমা" এমন একটা হাস্যকর চিত্র কল্পনা করিয়া হাসিয়া লুটোপুটি খাওয়ার পরিবর্তে এত দুশ্চিন্তা কেন? হইল কি রাধার।

শিশির মিথ্যা বলে না, "মেয়েদের সব ঢংই" বটে।

রাধার চিন্তাজাল ভেদ করিয়া সুধার কলকণ্ঠ ধ্বনিয়া উঠিল নীচের তলায়—ছোড়দি আসিয়াছে? আসিবার কথা ছিল না কি? রাধার কি কিছু হুঁস পর্ব ছিল না? না—ওই যে সুধার খনখনে সাধা গলার প্রত্যেকটি কথা শোনা যাইতেছে, রাধা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল ; ছোড়দি আসিলে রাধার ঝড়ে উড়িয়া নীচে পড়িবার কথা, কিন্তু বলিতেছে কি?—হ্যাঁ গো তাইতো এলাম। আমি না থাকলে নতুন জামাইয়ের কান মলবে কে? তোমাদের বাপু আচ্ছা আক্কেল, ঘরের মেয়েকে বাদ দিয়ে পরের ছেলেকে নেমন্তন্ন! রাধি' এসেছে—বড়দি রয়েছে—আমি না এসে থাকতে পারি? রাত থেকে ঘুম হচ্ছিল না, নিয়ে আসবে প্রতিজ্ঞা করিয়ে তবে ঘুমোই। কই গো দাদু, তোমাদের 'চাঁদের হাট-বাজার' দেখলে? তিনটি রত্ন তোমার ঘরের তিন কোণ উজ্জ্বল করে বসেছেন, এইবার তুমি গিয়ে এদিকে বসলেই সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

শেষের কথা কয়টা কানে ঢুকিবার পথ না পাইয়া ভাসিয়া গেল ; রাধার কানে শুধু বাজিতে লাগিল—"তিনটি রত্ন"—মনোজও আসিয়াছে তাহা হইলে? অত করিয়া লিখিয়াছিল মনোজ, ঠিক দশটা দশ মিনিটের সময় ছাতের পশ্চিম কোণে দাঁড়িয়ে থেকো লক্ষ্মীটি, আমি দূর থেকে আসতে আসতে দেখবো—অভিসারিকা শ্রীরাধার মত তোমার সেই নীল শাড়ীর আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে থাকবে তো? আমি ঠিক মোড়ের মাথায় গাড়ীটা ইচ্ছে করে বিগড়ে ফেলবো, আর অনে—কক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে হবে ওপর দিকে তাকিয়ে, কেমন? লোকের কিছু মনে করবার হেতু নেই, গাড়ীই যখন চলছে না? সত্যি রাণি, তোমাদের বাড়ীর সেই জনারণ্য ভেদ করে কখন যে দেখা হবে—" মনোজ ছাদের দিকে চাহিতে চাহিতে আসিয়া হতাশ হইয়া গিয়াছে? কোন তুচ্ছ কথায় ভুলিয়া এমন প্রয়োজনীয় কথা ভুলিল রাধা? হইয়াছিল কি তাহার? এতক্ষণের পুঞ্জীভূত বেদনা যেন একটা পথ পাইয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

মাঘ ১৩৪৪

বিচিত্র

প্রতিভা বসু

দরজা খুলেই সুমিতা চমকে উঠলো। বেলা বোধহয় তিনটা। একটা ভূত দেখলেও মানুষ অমন আঁতকে ওঠে না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারপর হঠাৎ ত্রস্ত হাতে মাথার কাপড়টা প্রায় গলা অবধি টেনে নিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

বিস্ময় বিমূঢ় শঙ্করনাথ প্রথমে একটু লজ্জিত হলো—তারপরেই সেটা কাটিয়ে উঠে গলা খাঁকারি দিয়ে বল্ল, কই, সব গেল কোথায়?

কথাটা সে যার উদ্দেশ্যে বল্ল—তাকে আর দেখা গেল না। একটি বৃদ্ধ ভৃত্য গামছা কাঁধে ঘরে এসে দু হাত জোড় করে বিনীতভঙ্গীতে দাঁড়াল।

শঙ্করনাথের চোখে রাগের ঝিলিক দেখা গেল কিন্তু সেটা সে সাম্‌লে বল্ল, 'দেখ, বাইরে ট্যাক্সিতে আমার একটা বাক্স আর একটা বিছানা আছে, নিয়ে এসো—আর ড্রাইভারকে এই ভাড়াটা দিয়ে দাও।'

ভৃত্য চলে যেতেই বাড়ির ভেতরে যাবার জন্য একবার পা বাড়িয়ে তখনি থম্‌কে গেল। ভৃত্যটি ফিরে আসতেই বল্ল—'সুমিতাকে বল গিয়ে আমার শরীর অসুস্থ, কোন ঘরে থাকবো তাড়াতাড়ি তার একটা ব্যবস্থা করে দিতে।'

'আজ্ঞে আচ্ছা।'

একটু পরেই ভৃত্যটি ফিরে এসে শঙ্করনাথকে দোতলার ঘরে নিয়ে গেল। এর মধ্যেই খাটের উপর পরিপাটি কোরে বিছানা পাতা হয়েছে, ছোট একটি আলনাও খালি করা আছে পায়ের কাছে। যদিও শঙ্করের জীবনের শুভ অংশটিই এ বাড়ির এই ঘরে কেটেছে তবুও ঘরে ঢুকে সে খুব উৎফুল্ল হতে পারলো না। তার পূব দক্ষিণ খোলা মারবেলের মেঝেযুক্ত বৃহৎ ঘরের আরামটির জন্য মনটা একটু ব্যাকুল হল এবং সঙ্গে সঙ্গে সুমিতার এই অপরিসর পুরোনো ভাঙা সিমেন্টের ঘরটির জন্য মনের কোথায় যেন একটা ব্যথাও খচ্‌ খচ্‌ করে উঠলো বুকের মধ্যে। পকেট থেকে দামী সিল্‌কের রুমালটি বার কোরে ঘাড় মুছতে মুছতে পাখাশূন্য সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে চোখ নামাল।

ওদিকে সুমিতা ভেবে পেলো না এই মানুষটি কি চায়—কেনই বা এসেছে। সাত পাঁচ চিন্তা কোরে সে ময়দা মাখতে বসলো—যখন এসেইছে—আর সে তো জানে যে মানুষটি ভারী আহার-বিলাসী—তখন তার ইচ্ছা না থাকলেও যাতে খাবারটাবারগুলো ভালো হয় তা দেখা উচিত। ভৃত্যকে ডেকে বল্ল, রামু, তুমি বাবুর কাছে কাছেই একটু থাক গিয়ে, এখানে সব আমিই করে নেব। ডাকলে—এসে চা নিয়ে যেয়ো। বহুদিনের বিশ্বস্ত ভৃত্য রামশরণ নিতান্ত অনিচ্ছায় মার আদেশ পালন করতে দোতলায় চলে গেল।

সুমিতা বোসে বোসে লুচি বেললো—নানা আকৃতির নিম্‌কি তৈরী করলো, তারপর চায়ের জল চাপিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো। একসময়ে রামশরণ নেমে এসে বল্ল, 'মা বাবু এই ব্যাগটা রেখে দিতে বল্লেন—' মোটাপুরু চামড়ার ব্যাগটি প্রায় ফেটে যাবার মত হয়েছে টাকাপয়সার ভারে। সুমিতা একটু নেড়ে চেড়ে বল্ল, 'বাবুকেই দিয়ে এসো এটা, আমি কোথায় রাখবো?'

'এই যে চাবিও দিলেন--'

'বাক্স খুলে বাবু জামা-কাপড় বার করে দিতে বল্লেন। চান করতে চাইছেন।'

সুমিতা একটু অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলো। আবদারও তো মন্দ না। একবার ভাবলো--চাবিসুদ্ধ স্যুটকেসটা উপরে পাঠিয়ে দেয় ; কিন্তু কি মনে করে চাবিটা হাত পেতে নিয়ে বল্ল, 'চায়ের জলটা বোধহয় ফুটলো, দেখোতো--' নিচু হয়ে সে স্যুটকেসটা খুলে ফেল্ল। খুলতেই একটা মধুর গন্ধে ভরে উঠলো বাতাস--হঠাৎ এই চেনাগন্ধে একটুখানির জন্য সুমিতার মনটা যেন কেমন করে উঠ্‌লো। দুম্‌ড়ানো ভাঁজশূন্য সব দামী দামী শান্তিপুরী ধুতি--পাঞ্জাবীগুলোর ইস্তিরি নেই--কোণের দিকে কয়েকটা ভাঁজ করা সিল্‌কের গেঞ্জি আর পাজামা। তার উপরে বাথ-পাউডার, সল্‌ট, একবাক্স সাবান, সেন্টের শিশি, ল্যাভেণ্ডার। বাবুগিরিটি ঠিক আছে এখনো। কাপড়ের ভাঁজ না থাকলে আর পাঞ্জাবীর ইস্তিরি না থাকলে শঙ্করনাথ কোনদিনও সে জামা-কাপড় ছোঁয় না। সুমিতা ধুতি আর গেঞ্জি বার করে ইস্তিরি করা জামা খুঁজতে লাগলো।

চা ভিজিয়ে রামশরণ বল্ল, 'মা, আপনার হল?'

'এই যে'--ব্যস্তভাবে সুমিতা হাতের কাছে যা পেল তাই উঠিয়ে বাক্সটা বন্ধ করতে গিয়েই আবার খুলে তেলের শিশি খুঁজতে লাগলো। বাক্সের ডালা তুলতেই যে গন্ধটি সুমিতার নাকে ঢুকলো সে গন্ধের নেশা ওকে পাগল কোরে তুল্ল। অনেকদিন পর্যন্ত সুমিতার বাক্স খুল্লেও এই গন্ধ বেরুতো। সুমিতার দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ চুলে এখন তেল পড়ে না--কিন্তু সন্ট! সেন্ট! সে কবেকার স্বপ্ন।

নিঃশ্বাস ফেলে বল্ল, 'রামু, তুমি জিজ্ঞেস কোরে এসো বাবুকে--চা খেয়ে চান করলে চলবে কিনা।'

শঙ্করনাথ বাঁ হাত কপালে রেখে আধশোয়া অবস্থায় সিগারেট টানছিল। সবল দীর্ঘ দেহ, পরিষ্কার গায়ের রং, ঘনচুল ব্যাকব্রাশ করা--মুখচোখ ঈষৎ বিবর্ণ--দেখলে মনে হয় অত্যন্ত ক্লান্ত। রামশরণকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বল্ল, 'কী হে, তোমার মা চা'টা খানতো--আমি তো এই মুহূর্তে এক কাপ চা না পেলে বাঁচবো না।'

'আজ্ঞে না--মা চা খান না। তবে আপনার জন্য তিনি তৈরী করেছেন--বল্লেন, এখনি চান করবেন, না চা খেয়ে নিয়ে--'

'নিশ্চয়! তুমি আগে চা নিয়ে এসো। আর শোন, তোমার মা সকালে বিকেলে কোন সময়েই চা খান না?'

'আজ্ঞে না।'

'কী খান?'

'আজ্ঞে সকালে বিকেলে তেনার খাবার অভ্যেস নেই, দুপুরে ভাত খান্‌।'

'আর রাত্তিরে--?'

'রাত্তিরে তো পেরায়ই খান না, বলেন ক্ষিদে নেই।'

'হুঁ, তুমি কদ্দিন আছ?'

রামশরণ হেসে বল্ল, 'আমি, আজ্ঞে কদ্দিনের লোক--মাকে আমি ছোটবেলায় কোলে কাঁখে নিয়ে বড় করেছি। মাঝে অনেক দিন ছিলাম না। পেরায় দশবছর রেঙ্গুনে এক বাবুর কাছে ছিলাম। আবার এই বছর চারেক যাবত কোলকাতা এসেছি। হঠাৎ মার সঙ্গে দেখা হল, আর সেই থেকে এখানেই আছি।'

'ও, তাহ'লে তো তুমিই মার অভিভাবক।'

'আজ্ঞে ছ'মাস হলো বুড়োবাবু মারা গেছেন, সেই থেকে আমি আর বামির মা-ইতো মার কাছে আছি।'

'বুড়ো বাবুটি কে? তোমার মার বাবা বুঝি?'

'আজ্ঞে!'

'আর, বামির মা?'

'ঐতো—' আঙ্গুল দিয়ে দিক নির্ণয় কোরে রামশরণ বল্ল, 'সূর্য সেনের ভাগ্নে বৌ! তারও তো মার মতনই দশা বাবু,—এই তিনচারটা কাচ্চা ছেলে—' হঠাৎ পেছন ফিরে তাকিয়ে রামশরণ শঙ্কিতভাবে থেমে গেল।

রামশরণ থামতেই শঙ্করনাথ দরজার বাইরে তাকিয়ে দেখলো—একহাতে চায়ের কাপ আর এক হাতে এক প্লেট খাবার নিয়ে সুমিতা রামশরণকে চোখ রাঙাচ্ছে।

ব্যাপারটা শঙ্করনাথ দেখতে পেল কিন্তু সুমিতা সেকথা জানতে পারলো না; কেননা তার মুখ পাশের দিকে ফেরানো। শঙ্করনাথ অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ ফিরিয়ে নিল।

সুমিতা রোগা হয়ে গেছে। হবে না? দিনে একবার খেয়ে মানুষ বাঁচে কেমন কোরে?

রামশরণ চা আর খাবারের প্লেট টিপয়ের উপর রাখলো। বিষণ্ণ মুখে শঙ্করনাথ বল্ল, 'আমাকে কেবল চা'টাই দাও রামশরণ, ওসব আমি খাব না।'

রামশরণ নিজের বুদ্ধিতেই ভদ্রতা করলো, 'না বাবু সে কি হয়, মা নিজে বানালেন এত কষ্ট করে।'

'রামশরণ, কষ্ট যে করে তারই খাওয়া উচিত। আমাকে অত না বোলে ওরকম কোরে মাকে খাওয়াতে পার না?'

তবু রামনারাণ বল্ল, 'মা দুঃখিত হবেন।'

'নিয়ে যাও তুমি'—কথাটা এমন ভাবে বলা হলো যার পরে রামশরণ আর কিছু বলতে সাহস করলো না। চায়ের কাপটা রেখে ব্যস্তভাবে খাবারটা নিয়ে নীচে নেমে গেল।

চা খেয়ে শঙ্কর উঠলো বিছানা থেকে। শরীরটা ভারি ক্লান্ত বোধ হল। অমন অসুরের মত স্বাস্থ্যেও তার ঘুণ ধরেছে। স্নান করবার জন্য মন অস্থির হয়ে উঠলো। বুড়োটাকে কখন বলেছি কাপড়-জামা আনতে—সুমিতা কি এতদিনের সব অভ্যেস ভুলে গেল?

বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেল বারান্দার শেষপ্রান্তে বাথরুমের দরজাটি খোলা। তার কাছেই বাইরের দেয়ালে তার সদ্যভাঁজভাঙা কুঁচানো ধুতি, একটি সিল্কের গেঞ্জি ও একটি আদ্দির পাঞ্জাবী শোভিত একটি ছোট্ট ব্র্যাকেট। মনটা মুহূর্তে খুসী হয়ে উঠলো। এগিয়ে গিয়ে দেখলো বাথরুমের ভেতরকার ছোট সিমেন্টের তাকটিতে তার ম্যাকেসার অয়েলের শিশি থেকে টুথব্রাশটি পর্যন্ত পরিপাটি কোরে রাখা হয়েছে। শঙ্করনাথ চুপ কোরে তাকিয়ে রইলো সেদিকে।

সেদিন রাত্তিরে একতলার ঘরে শুয়ে সুমিতার আর ঘুম এলো না। কত কথা যে ভিড় কোরে এলো তার মনের মধ্যে। এতদিন পরে ও কেন এলো? কেন এলো ও? কী চায়? বাড়ির অধিকার? হয়তো তাই। একদিন তাকে সে এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল আজ তারই প্রতিশোধ নিতে ও এসেছে।

সুমিতার কত দুঃখ পুঞ্জিত হয়ে আছে এই অন্তরে তা কি শঙ্করনাথ জানে? তার কেমন কোরে চলে তা কি ভাবে শঙ্করনাথ? কিন্তু এ বাড়ি যদি তার ছাড়তেই হয় তবে সে যাবে কোথায়? শেষে কি ওর কাছেই হাত পাততে হবে সুমিতার? না, না, কখনো না। যার কাছে ও ছিল রাণী, তার কাছে ও যাবে ভিখারিণী হয়ে। না, না, না, অস্ফুটে সুমিতা উচ্চারণ করলো না, না, না। সব সইবে কিন্তু এ তো আমি সইতে পারবো না। গভীর উত্তেজনায় সুমিতা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। উঃ কী অসহ্য গুমোট আজ। একতলার এই বন্ধ ঘরে এখনি যেন দম আটকে যাবে। সুমিতা ছট্‌ফট্‌ করে দরজা খুলে বাইরে

বেরিয়ে এলো।

উপরের ঘরে শুয়ে শঙ্করনাথের চোখেও ঘুম এলো না। এই ঘর—কত আশার আনন্দকুঞ্জ। কত স্বপ্ন দেখেছে সে এই ঘরে। আর এই ঘরে এই খাটে এমন নিঃসঙ্গ শয্যায় আজ কাটছে তার বিনিদ্র রাত্রি? এও তার ভবিতব্য ছিল? শাস্তি কি তার এখনো ফুরোলো না? কোথায় সেই সুদূর বোম্বাই, আর কোথায় এই কলকাতা। অতবড় চাকরী, অত প্রতিপত্তি কোন্ আকর্ষণে সেসমস্ত ছেড়ে পাগলের মত সে এখানে চলে এলো? ভুল করেছিল শঙ্কর, কিন্তু শঙ্করের অন্যায়েরও যদি শেষ না থাকে সুমিতার অভিমানেরও তবে শেষ নেই। আজও সুমিতা তাকে দেখলে মুখ ঢাকে। সুমিতা—মিতা শঙ্করনাথ অস্ফুটে বল্ল, 'আমি কি তোমার ক্ষমারও অযোগ্য?'

বিছানা ছেড়ে সে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেই তার চোখে পড়লো—নীচের বারান্দায় ও থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি মনুষ্য মূর্তি। আকাশের মৃদু আলোতে অনায়াসেই সেই মানুষটির সুঠাম শরীরের দাঁড়াবার বিশেষ ভঙ্গীটি চিনতে পেরে শঙ্করনাথের বুকের মধ্যে ঢেউ খেলে গেল। নিজের অজান্তেই তার পা একবার একতলার সিঁড়ির মুখে এলো তারপর একটা নিঃশ্বাস নিয়ে আবার ঘরে ফিরে এলো।

প্রচলিত অর্থে সুমিতা হয়তো সুন্দরী নয়, কিন্তু তার ছিপছিপে শ্যাম-শরীরে কী যে মাধুর্য ছিল যা একবার দেখলেই মন থেকে মুছে যায় না। তার চোখে মুখে এমন একটা সজল আভা ব্যাপ্ত হয়ে থাকতো যে শঙ্করনাথ তাকে দেখে আর মন ফেরাতে পারেনি। কত হাঙ্গামা কত মান-অভিমান চল্ল মা-বাবার সঙ্গে তারপর এলো সুমিতা তার ঘরে। সুমিতা, সুমিতা। একটা নামের মধ্যেও এত মোহ? একটা মানুষের মধ্যে আরেকজন মানুষের এত আনন্দ? শঙ্করনাথ বিভোর হয়ে রইল। আর তার ঐ বেসুরো মোটা গলাও গুণগুণিয়ে গেয়ে উঠলো, 'তুমি মধু, তুমি মধু, মধুর নিঝর মধুর সায়র আমার পরাণ বঁধু।'

সুমিতা বলে, 'বাবারে বাবা, এমন মিষ্টি গান তো আর আমি কখনো শুনিনি।' মুখ বন্ধ করে দিয়ে শঙ্করনাথ মনে মনে বলে ভগবানের অবিচারটা দেখো একবার—কবি হইনি ও মুখেব বর্ণনা করতেও পারি না—ভাষা দেন নি, দেবীর স্তুতি করতে পারি না—গান গেয়ে যে মনের আনন্দটা একটু ব্যক্ত করবো তাও আবার গলাটা নিতান্তই সুরহীন। ভেতরের চাপ কেবল বেড়েই চলে অথচ প্রকাশের দ্বারগুলো সবই রুদ্ধ। মিতা, আমি একদিন মরে যাব।'

সুমিতা রাগ করে।

শঙ্করনাথ তখন সবে এম-বি পাশ কোরে বেরিয়েছে, সুমিতা আই-এ পরীক্ষার্থী। বাবা বল্লেন, 'এবার তুই বিলেত গিয়ে ডিগ্রিটা নিয়ে আয়—বৌমাও তদ্দিনে আই-এ-টা পাশ করুন।'

শঙ্করনাথ মার কাছে জানাল—অসম্ভব!

'কেন, অসম্ভব কেন? আগাগোড়াই তো তাই ঠিক।'

নির্লজ্জের মত শঙ্করনাথ বল্ল—আগাগোড়া বুঝি সুমিতা ছিল।'

গম্ভীর মুখে মা বল্লেন, 'তাই বলে তুই ভবিষ্যত নষ্ট করবি। বৌ তো রইলোই আমার কাছে। কদ্দিনের ব্যাপার—দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে যাবে।'

'না, মা, না।'

রাত্রে সুমিতা বল্ল, 'মা যা বল্লেন ভালই তো—'

'ভাল?' অভিমানে শঙ্করনাথ মুখ ফিরিয়ে শুয়ে বল্ল, 'আপদ বিদেয় হলেই ভাল না। এ কিনা হাওড়া-লিলুয়া! জান, সে দেশ সাত সমুদ্র তেরনদী পারে?'

'পাগল' গভীর অনুরাগে সুমিতার বুক ভরে যায়। মনে মনে ভাবে সত্যিই তো শঙ্কর যাবে অতদূরে, আর সে এখানে টিকবে কেমন করে?

অবশেষে নিরাশ হয়ে অগত্যা অমরনাথ ছেলেকে একটা ডিস্‌পেনসারি খুলে দিলেন।

ডাক্তারীতে শঙ্করনাথের হাতযশ ছিল। শক্ত শক্ত অসুখ যা অনেক সময় তার বোধগম্যও হত না, এমন রোগীও দু'চারজন তার হাতে এসে ভাল হয়ে গেল। হয়তো ভাল হল তারা নিজে থেকেই, নাম হ'ল শঙ্করনাথের। আস্তে আস্তে পাড়ার মধ্যে, পাড়ার বাইরে অবশেষে অনেক দূরেও তার সুনাম ছড়িয়ে পড়লো।

সুমিতাকে বল্ল, 'কি হ'ত বিলেত গেলে? আমি সব সময়ে ডাকলেই যাই না তাই, নইলে যা উপার্জন করতুম তাতে টাকার বিছানায় শুইয়ে রাখা যেতো তোমাকে। আমি হতভাগা তো ঐ শ্রীচরণেই,—'

'আচ্ছা, আচ্ছা'—মুখের এক অপরূপ ভঙ্গী কোরে সুমিতা হেসে ওর মুখে হাত চাপা দিত এবং সে হাত ছাড়িয়ে নিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হত।

সুগভীর আনন্দে, আশায়, আর অনুরাগে চরম আসক্তিতে সুদীর্ঘ তিন বছর তাদের চোখের পলকে কেটে গেল। কিন্তু মানুষের চরিত্র বড়ই বিচিত্র। যে সুমিতার আকর্ষণে বিশ্বসংসারই তুচ্ছ ছিল শঙ্করনাথের কাছে, একদিন তাতে ভাঙন ধরলো। হঠাৎ সুমিতা বুঝতে পারলো—ধীরে ধীরে যেন একটা ব্যবধান গড়ে উঠছে তাদের মাঝখানে। শঙ্করের ডাক্তারীর উৎসাহ যেন অকস্মাৎ বড় বেশী রকম বেড়ে গেল এবং সেটা হল হাসপাতালে চাকরী নেবার পর থেকেই। নেবার ইচ্ছে তার নিজের একটুও ছিল না, কিন্তু তার বাবা আর সুমিতারই ইচ্ছা ছিল বেশী। আড়াইশ টাকা মাইনে নির্দিষ্ট সময়ের কাজ,—সুমিতা বল্ল, 'নাও না, এতে যখন প্রাইভেট প্র্যাকটিস বারণ নেই—'

'সারাটা দিন তো তাহ'লে হাসপাতালেই কাটবে, আর যেই ফিরে আসবো অমনি পড়বে রোগীর ডাক—'

শঙ্করের অভিমানভরা মুখের দিকে তাকিয়ে সুমিতা হেসে বল্ল, 'আচ্ছা, আমি কি পালিয়ে যাব যে তুমি ওরকম কর?' লতার মত দুই হাতে সে চেয়ারের পেছন থেকে শঙ্করনাথের গলা জড়িয়ে ধরলো। বলিষ্ঠ হাতের মুঠোর মধ্যে সুমিতার হাত চেপে রেখে শঙ্করনাথ বল্ল, 'পালিয়ে নাইবা গেলে—কিন্তু জীবনটা কি এতই দীর্ঘ যে সময়গুলো ওরকম অপব্যয় করতে পারি? তুমি যে কি, তুমি যে কতখানি—এত ভাল লাগা—মিতা, এত ভালবাসা—এর ভার যে কী অসহ্য কেমন কোরে আমি তোমাকে বোঝাবো? আর তার তুলনায় কত ছোট এই হৃদয়ের পাত্র। মনে হয় কি জান? এক সমুদ্রেও যা ধরে না তার ভার আমি সইবো কেমন কোরে?'

'সেই জন্যেই তো ভয়'—দুষ্টুমিতে ভরে উঠেছে সুমিতার মুখ—পাত্র যদি ছোট হয় তা হ'লে নিশ্চয় উপচে পড়বে ; আর কোন বুদ্ধিমান মানুষ যদি টের পায়—একথা তাহ'লে নিশ্চয়ই একটি বড় পাত্রের সন্ধান দিয়ে সমস্ত সুধা কেড়ে নিয়ে যাবে আর আমি বোকার মত শূন্য পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো হাঁ করে।'

'চালাকি!'—সুমিতার দুই ঠোঁট—শঙ্করনাথ সবেগে বন্ধ করে দিয়েছে।

সেই শঙ্করনাথ ক্রমে এমন হয়ে উঠলো যে সুমিতা কিছুই ভেবে পেলো না সে কি করতে পারে।

রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে সুমিতা টের পেল শঙ্করনাথ ফিরে এসেছে হাসপাতাল থেকে। বিছানার উপর উঠে বোসলো সে। গম্ভীর গলায় বল্ল, 'হাসপাতালে কি রাত দু'টো পর্যন্ত

কাজ করতে হয় তোমাকে?'

সুমিতার কণ্ঠস্বরে চম্‌কে উঠে শঙ্করনাথ পেছন ফিরে তাকালো। একটু চুপ কোরে থেকে বল্ল, 'নিশ্চয়ই হয়, রাস্তায় তো আর ঘুরে বেড়াই না।' 'যদি তাই হয়, কাল থেকে তুমি কাজে যাবে না।'

'তোমার কথাই যে চরম কথা, এতখানি আত্মবিশ্বাস না থাকাই উচিত ছিল।'

'আমি যা বল্‌বো তা তুমি শুনবে না?' সুমিতার ঘুম ভাঙ্গা গলা কেমন অদ্ভুত শোনালো।

'স্ত্রীলোকের সব আব্দার শুন্‌লে তো সংসারে চলে না। তুমি বললে আর দৌড়ে গিয়ে অত ভাল চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে এলুম এটা সম্ভব নয়।' বিদ্রূপের হাসিতে শঙ্করনাথের মুখ ভরে উঠলো।

'নিশ্চয়ই সম্ভব।' সুমিতার গলা চিরে কথা বেরুলো, সঙ্গে সঙ্গে তার ছিপ্‌ছিপে পাতলা শরীর যেন হাওয়ায় উড়ে এলো শঙ্করনাথের কাছে—'আমি তোমাকে সন্দেহ করি, তোমার অধঃপতন হয়েছে, আমি কি বুঝি না তোমার চালাকি? কার চোখে তুমি ধুলো দিচ্ছ? কাল থেকে তুমি হাসপাতালে যাবে না, যাবে না, যাবে না'—শঙ্করনাথের হাত ধরে প্রচণ্ড এক ঝাঁকানি দিয়ে কেঁদে ফেল্ল সুমিতা।

'কি মুস্কিল!' সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে শঙ্করের মনটা হঠাৎ কেমন হয়ে গেল—সুমিতাকে সে দুঃখ দিচ্ছে, সে কাঁদছে এ চেতনা তার অবচেতনাকে মুহূর্তের জন্য একটা নাড়া দিল। হাত বাড়িয়ে বল্ল, 'মিতা তুমি কি পাগল?'

কিন্তু চাকরী সে ছাড়লো না। কয়েকদিন পরে এমন হল যে রাত্রিতে বাড়ি আসাই প্রায় ত্যাগ করলো। অমরনাথ নিভৃতে স্ত্রীকে বল্লেন, 'খোঁজ নিয়েছিলাম, সে একটা ফিরিঙ্গী নার্স।'

কথাটা সুমিতার কানেও গেল। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে চুপ কোরে বোসে রইল।

এ দিকে শঙ্করনাথের সঙ্গে দেখা হওয়া দুর্লভ ব্যাপার। সকালবেলা বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত একটায়। যে দিন দুপুরে ফেরে সেদিন রাত্তিরে আসে না। সুযোগ বুঝে একদিন সুমিতা বল্ল, 'আমি বর্ধমান যাব।'

'বেশ তো।'

'তুমি সঙ্গে যাবে।'

'বটে!' ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে শঙ্করনাথ বল্ল, 'আমার মরবার সময় নেই তা শ্বশুরবাড়ি। আর সেখানে বলতে তো ঐ একমাত্র বুড়ো ভদ্রলোক'—

ব্যথিত হয়ে সুমিতা বল্ল, 'ঐ বুড়ো ভদ্রলোকটি তো একদিন তোমার কম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন না। তা ছাড়া আমার বাবা আমার মার অভাবও পূরণ করেছেন।'

বিরক্ত মুখে শঙ্করনাথ বল্ল, 'বেশ তো যাও না—আমি তো বারণ করছি না।'

'বারণ করবার মনুষ্যত্ব তোমার আছে নাকি? তা হ'লে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক হয়ে ও সব ইতরমি তুমি করতে পারতে না। একটা দুশ্চরিত্র নার্স'—

'কী বল্‌লে?'

'যা বলবার তাই বল্লাম। গলার স্বর তুমি আর এক পর্দা চড়াবে না। হল্লা করবার জায়গা তো তোমার আছেই—সেখানে যেয়ো।'

'শাট্‌আপ্! এ বাড়ি আমার। স্পর্ধা করবার জন্য তোমারও বর্ধমান আছে, এখানে—আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙাবার সাহস আর তুমি দ্বিতীয়বার দেখিয়ো না।'

আগুনের শিখা দপ্ কোরে জ্বলে উঠলো সুমিতার দুই চোখে। কঠিন গলায় বল্ল, 'না এটা আমার শ্বশুর বাড়ি। তিনি যদ্দিন জীবিত আছেন, তদ্দিন এ বাড়ির কোন অধিকারও

তোমার নেই জেনো। উচ্ছন্নে গেছ—ভাল কোরেই যাও। তোমার ও মুখ আর আমি দেখতে চাই না।'

পাশের ঘর থেকে শাশুড়ী বেরিয়ে এলেন, 'কি করছিস্ তোরা ছেলেমানুষের মত'—

মাথার কাপড় ঈষৎ টেনে দিয়ে সুমিতা বল্ল, 'মা ওঁকে বলুন এ বাড়ি আমার শ্বশুরের, ওঁর না।'

লাফ দিয়ে শঙ্করনাথ বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

শাশুড়ি রাগ করে বল্লেন, 'কী করলে তুমি? বার করে দিলে বাড়ি থেকে? এত তেজ ভাল নয়।'

থর থর করে কেঁপে উঠ্‌লো সুমিতা। দুই হাতে খাটের বাজুটা ধরে কোন মতে শরীরের টাল সামলালো।

পরের দিনই সে চলে গেল তার বাবার কাছে। সুদীর্ঘ ছ'মাস কাটিয়ে সে যখন ফিরে এলো শুনলো—বড় চাকুরী পেয়ে শঙ্করনাথ কালিম্পং গেছে। এমন কথাও শোনা গেল সেই নার্সটিকে সে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। সুমিতা কোনরকমে দুই চোখ বুজে চোখের জল ফেললে। শঙ্করের মা বল্‌লেন, 'তুমি তাকে ঠেকাতে পারতে, কিন্তু তোমার দর্পই তোমার সর্বনাশ করলো।'

অমরবাবু বল্লেন, 'অমন কথা বোলো না তুমি। বৌমা যা করেছেন বেশ করেছেন। ওর মুখ দেখবার আমারও সাধ নেই। যে একবার উচ্ছন্নে যায় তাকে কি কেউ ঠেকাতে পারে?'

এর এক বছর পরেই হঠাৎ অমরনাথ মারা গেলেন হার্টফেল কোরে। শঙ্করনাথ খবর পেয়েই চলে এলো, মা তাকে দেখে ডুক্‌রে উঠলেন। আর সুমিতা একগলা ঘোম্‌টা দিয়ে সেই যে গিয়ে ঘরের কোণে লুকোলো—যে কয়দিন শঙ্করনাথ থাকলো সে কয়দিন চন্দ্র সূর্যের মুখও সে আর দেখলো না। শাশুড়ি বল্লেন—'বৌমা, এ সুযোগ অবহেলায় হারিয়ো না। ওর মুখের দিকে দেখেছ? ওর কথার ভাবেও আমি বুঝেছি যে ও শান্তিতে নেই। ওকে তুমি ঘরে বাঁধ।'

সুমিতা নির্বিকার মুখে বসে রইল। শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেলে মা-ই বল্লেন ছেলেকে, 'শঙ্কু, সুখ তো তুই অনেকই দিলি, এবার আমাকে কাশী পাঠীয়ে দে, সেখানেই বাকী জীবন কাটুক।'

'বেশ তো! কত টাকা লাগবে তোমার?'

'আর ঐ অভাগী? সে কোথায় যাবে তা ভেবেছিস্?'

বেদনায় শঙ্করনাথের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠ্‌লো—ভাঙা গলায় বল্ল, 'তাঁর যা লাগে দেব।'

আহত কণ্ঠে মা বল্লেন, 'হতভাগা, টাকাটাই কি সব? শুধু টাকা দিয়েই ওর উপর সব কর্তব্য তোর শেষ হয়ে যাবে? একথা তুই বল্‌তে পারলি?'

'মা, আমি নিরুপায়।'

'তা হ'লে লোকে যা বলে সব সত্যি?'

অনেকক্ষণ চুপ কোরে থেকে শঙ্করনাথ বল্ল, 'লোকে কি বলে আমি জানি না ; তবে আমি যে ফাঁদে সাধ করে পা দিয়েছি তার থেকে আমার অব্যাহতি নেই'—একটু ইতস্তত করে বল্লে, 'মা ওকে আমার কয়েকটা কথা বল্‌বার ছিল।'

মা মনে মনে পুত্রবধূর নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিতে দিতে বল্লেন—'সেই ভাল, যা বলবার যা বোঝাবার ওকেই তুই বুঝিয়ে যা।' ঘরে গিয়ে বল্লেন, 'বৌমা শঙ্কর তোমাকে ডাক্‌ছে।'

সুমিতার বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে উঠ্‌লো, জবাব দিল না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে তাকিয়ে রইল শাশুড়ির দিকে। শাশুড়ি রূঢ় স্বরে বল্লেন, 'যা বলছি তাই কর—ওর ঘরে যাও তুমি।'

যাও'—শেষের 'যাও' টা তিনি এমন স্বরে বল্লেন যে সুমিতা সে আদেশ অমান্য করতে সাহস পেলে না। ঘোমটা টেনে নিঃশব্দে সে গিয়ে দাঁড়ালো শঙ্করের ঘরে।

'এই যে'—শঙ্করনাথ ব্যস্ত হয়ে নড়ে চড়ে বোসল ; তারপর অনেকক্ষণ কাটলো। গলা পরিষ্কার করে এবার সে বল্ল, 'আমি যেখানে থাকি মা তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে বলছেন, তোমার কাছে অকপটেই স্বীকার করছি যে সেখানে আমি একা থাকি না। যা দরকার, যত টাকা লাগে সব আমি পাঠাবো—আর দয়া কোরে যদি অনুমতি দাও মাঝে মাঝে—' কথার মাঝখানেই সুমিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। থম্‌কে গিয়ে শঙ্করনাথ যতক্ষণ দেখা গেল তাকিয়ে রইল সেদিকে, তারপরেই দুই হাতে মুখ লুকালো।

এর পরে আর তিন দিন ছিল শঙ্করনাথ। শাশুড়ি গেলেন কাশী, সুমিতা এলো বর্ধমান। কিন্তু বর্ধমানে সে টিকতে পারলো না। শতস্মৃতিবিজড়িত সেই তালাবদ্ধ বাড়িটি তাকে আবার টেনে আনলো কলকাতা। বুড়ো বাপকেও ধরে নিয়ে এলো সে। এই বাড়ির প্রত্যেকটি আসবাবের মধ্যে পর্যন্ত তার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ জড়ানো, এ ছেড়ে সে যাবে কোথায়? এখানে আসবার কয়েকদিনের মধ্যেই শঙ্করনাথের কাছ থেকে দু'শো টাকার একটা মণিঅর্ডার এলো। সুমিতা সেটা ফিরিয়ে দিতেই তার বাপ বল্লেন, 'সুমি, এটা কি ভাল করলি? অভিমান তো পেট মানবে না মা—আমি মাত্র চল্লিশটা টাকা পেন্‌সন্‌ পাই—'

সুমিতা বল্ল, 'বাবা, এর চেয়ে যে ভিক্ষে করাও ভাল।' তার বাবা চুপ কোরে রইলেন।

পরের মাসে আবার এলো। এবার খামে ভরা চেক্‌। ছোট্ট দু লাইন লেখা ছিল তার মধ্যে 'গ্রহণ কোরো'—লেখাটা সুমিতা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো—চোখ সজল হয়ে উঠ্‌লো ; তারপর আস্তে আস্তে চেক্‌টি কুটি কুটি কোরে ছিঁড়ে রাস্তা গলিয়ে ফেলে দিল।

সন্ধ্যাবেলা সে তার বাবাকে বল্ল, 'বাবা, এতগুলো ঘর দিয়ে কি হবে—ছোট একটা দিক রেখে বাকীটা ভাড়া দিয়ে দি।'

বাবা কথাটা শুনে নিজের মধ্যেই মগ্ন হয়ে রইলেন। সহাস্যে সুমিতা বল্ল, 'তুমি বুঝি ভাবছ আমার কষ্ট হবে? কিছু কষ্ট হবে না—তাই ভাল বাবা—বাড়িটা একটু প্রাণ পাবে। কি রকম খাঁ খাঁ করে দেখছো না?' বড় অংশটা ভাড়া দেওয়া হলো। কিন্তু ত্রিশ টাকার বেশী পেলো না। সুমিতা তাইতেই খুসী—। দুঃখের দিন গড়িয়ে গড়িয়ে কাটলো পাঁচ বছর। এবার সুমিতার বাবা একদিন বেরিয়ে বাড়ি ফিরে বল্লেন, 'সুমি, আমার একটা কথা তোকে রাখতেই হবে—বল্‌ রাখবি?'—বৃদ্ধ সুমিতার হাত চেপে ধরতেই সে চম্‌কে উঠলো। 'বাবা, তোমার হাত এত গরম কেন? দেখি তো।'—তাড়াতাড়ি সে বাবার কপালে বুকে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করে বিমর্ষ হয়ে বল্ল, 'বাবা তোমার জ্বর হয়েছে, কেন তুমি বেরিয়েছিলে এই বৃষ্টির মধ্যে—কদিন থেকেই দেখছি কোথায় যেন তুমি যাও, কি যেন তুমি ভাব'—

চোখ বুজে বৃদ্ধ বল্লেন, 'সুমি আমি সব খবর জেনে এসেছি আজ—তুই আমার কথা রাখ সুমি, তুই চলে যা ওর কাছে—বম্বেতে ও মস্ত লোক—তার কত মান কত প্রতিপত্তি—তাছাড়া তাছাড়া'—ইতস্তত করে তিনি বল্লেন—'তাছাড়া ও সেখানে একাও আছে।—'

'বাবা তুমি শোও'—গম্ভীর মুখে সুমিতা বাপকে শুইয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

ভাল আছেন, ভাল থাকুন—এ ছাড়া আর তো কোন প্রার্থনা নেই সুমিতার। বাবার স্নেহোদ্বিগ্ন মুখখানা দেখে ভারি আঘাত লাগলো তার। মনটা কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো। দ্রুত পায়ে নেমে এসে বল্ল, 'রামশরণ, তুমি একজন ডাক্তার নিয়ে এসো এখনি—বাবার বড্ড জ্বর হয়েছে।'

কিন্তু সুমিতার সকল প্রার্থনা সকল আশা ব্যর্থ করে বৃদ্ধ পনেরো দিনের দিন শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন। আর তারি ছ' মাস পরে শঙ্করনাথ ফিরে এলো এখানে। কিন্তু ও কেন এলো? সে কথাই সুমিতা ভেবে পায় না।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে শঙ্করনাথের যথেষ্ট বেলা হয়ে গেল। চোখ চেয়েই সে দেখতে পেল মাথার কাছে টিপয়ের উপর ঢাকা চা পড়ে আছে, সামনে রামশরণ দাঁড়িয়ে। রামশরণ বল্ল, 'আজ্ঞে, এবার ডিমটা নিয়ে আসি—ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল দেখে'—

'না, না কিছু দরকার নেই ডিমে'—খাটের বাজু থেকে পাঞ্জাবীটা টেনে গায়ে দিয়ে এক কাপ চা ছেঁকে নিলেন।

রামশরণ বল্ল, 'আজ্ঞে আপনার চাবিটা কাল থেকে মার কাছে ছিল'—হাত বাড়িয়ে চাবিটা রাখলো খাটের কোণে। শঙ্করনাথ সেদিকে না তাকিয়েই বল্ল, 'চাবিটা আমি কোথায় রাখবো, মার কাছেই রাখতে বল গিয়ে। আর বল সকাল বেলার খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি—কিছু যেন না করেন।' বিস্মিত রামশরণকে হতভম্ব করে দিয়ে শঙ্করনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ; বারান্দায় এসেই দু'পা ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লেন, 'আমার কাপড়চোপড় বার করে দিতে বোলো তো মা'কে।' 'আজ্ঞে, আপনার স্যুটকেস্ তো মা উপরে পাঠিয়ে দিয়েছেন—সেই জন্যেই তো চাবিটা পাঠিয়ে দিলেন—আর ওর মধ্যে আপনার ব্যাগটাও আছে।' শঙ্করনাথ থমকে দাঁড়ালেন—কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে বল্লেন ; 'ও, আচ্ছা যাও তুমি।'

সকালবেলা উঠেই শঙ্করনাথের স্নান করা অভ্যাস—বাথরুম পর্যন্ত গিয়েও আর স্নান করা হো'লো না।

ভেতরে এসে বিরাট স্যুটকেসটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অভিমানে তার দুই চোখে জল ভরে উঠলো।

নীচে রান্নাঘরে বোসে সুমিতা সমস্ত কথা শোনা সত্ত্বেও ময়দায় ঘি ঢাললো। খাবে না? —খাবে না কেন? কবে থেকে বাবুর সকালবেলার আহার গেল? চা! চা না খেয়ে যেন সে থাকতে পারে। নিবিষ্ট হয়ে সে খাবার তৈরী করতে লাগলো। রামশরণ এসে বল্ল, 'মা, এসব করছেন কেন? বাবু বারণ করলেন।' সুমিতা একবার রামশরণের মুখের দিকে তাকিয়ে সিঙাড়ায় পুর দিল। একটু পরে বল্ল, 'আচ্ছা সে দেখা যাবে। তুমি একটু অপেক্ষা করে খাবারটা দিয়েই—তার পর বাজার যেয়ো। শোন, আজকাল বাজারে মাছটাছ তো মোটেই পাওয়া যাচ্ছে না; চাঁদা মাছ পাওয়া যায়? বাবু খুব চাঁদা মাছ খেতে—' হঠাৎ থেমে গিয়ে— 'চাঁদা মাছটা খেতে তো ভালই, দেখতেও বেশ। আর আধ সের ভাল মাংস দুটো ডিম এনো—দই আনতে ভুলো না কিন্তু, বলতে বলতে রামশরণের মুখের দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ অত্যন্ত লজ্জা পেল সুমিতা ; তাড়াতাড়ি বল্ল, 'এই সব আর কি—একটু দেখে শুনে বাজার কোরো—পুরুষ মানুষের খাওয়া তো বুঝলে না?'

রামশরণ নিঃশব্দে মাথা নাড়লো। সন্ধ্যাবেলা শঙ্করনাথ বল্ল, 'আমার বিছানা আজকে নীচে পেতো—আমি উপরে শোব না।'

রামশরণ মাথা চুলকে বল্ল, 'এজ্ঞে?'

'যা বলি তাই কর রামশরণ! আমি একটু বেরুচ্ছি, ফির্‌তে দেরী হতে পারে।'

সুমিতা কিছুতেই বিছানা নীচে আনতে দিল না। বেচারা রামশরণ এদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে মনে নানা কথা ভেবে চুপ কোরে রইল। রাত্তিরে ফিরে শঙ্করনাথ যখন দেখলো তার বিছানা উপরেই আছে তখন সে বিনাবাক্যব্যয়ে সুমিতার বিছানার উপরেই হাত পা ছড়ালো।

এই নাকি সুমিতার বিছানা? চাদর তুলে শঙ্করনাথ দেখলো—তলায় একটি কম্বল, আর তার তলায় সতরঞ্চি। শিয়রে বালিস কই? একটা নিঃশ্বাস পড়লো শঙ্করনাথের! রাত্তিরে খেয়ে উঠেও সে উপরে গেল না।

সেই শক্ত কম্বলের বিছানায়—হাতের উপর মাথা রেখে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। একে মেঝের বিছানা তার উপর তোষক নেই, বালিস নেই—অত্যন্ত কষ্ট হল তার—ক্রমে

রাত বাড়লো, বাড়িঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেল, এক সময়ে তার চোখও জড়িয়ে এলো ঘুমে।

হঠাৎ বেশী রাত্তিরে তার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল কে যেন এইমাত্র তার শিয়রে দাঁড়িয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে সে তার মাথার তলায় দু'টি নরম বালিশের আরাম অনুভব করে লাফ দিয়ে উঠে বসলো। তারপর আর একমুহূর্তও দেরী না করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো উপরে। নিঃশব্দে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আবছা আলোয় সে দেখলো সুমিতা মাটিতে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে—আর উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগে ফুলে ফুলে উঠছে তার দেহ। সমস্ত পিঠময় পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের মত চুল ছড়ানো। শঙ্করনাথ চৌকাঠ পার হয়ে আস্তে আস্তে তার কাছে এলো। গভীর স্নেহে পিঠের উপর হাত রেখে নিজের দিকে ঈষৎ আকর্ষণ করে ডাকলো, 'সুমিতা।' চমকে উঠে সুমিতা মুখ তুলে পর মুহূর্তেই কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেল্ল সে মুখ।

জোর করে শঙ্করনাথ তার মুখের কাপড় সরিয়ে দিল। সুমিতার দুই চোখ বেয়ে বড় বড় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। শঙ্করনাথ মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকে তারপর—পাখীর মত ভীরু নরম মানুষটিকে অনায়াসে বহন করে এনে খাটের উপর শুইয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

আষাঢ় ১৩৫০

কন্যাপক্ষ

বাণী রায়

আমার ছোটমামা একটু অসাধারণ লোক। বাইরের পরিচয় তার বাঙালী 'আই-সি-এস'দের মধ্যে তরুণতম, সুন্দরতম যুবক মাত্র, কিন্তু অন্তরের পরিচয় বিশেষ কেউ আজও ভাল ক'রে জানে না। নিতান্ত আমি তার খুব কাছে গিয়ে পড়েছিলুম, আমার সঙ্গে কতকটা বন্ধুভাব ছিল, তাই বুঝ্‌তাম যে এই বাইরে কাটখোট্টা সাহেবীধরণের লোকটির মন একান্ত ভাবপ্রবণ এবং শিশুর মত অভিমানী।

ছোটমামার সঙ্গে আমার শিশুকাল থেকে বড় বেশী আলাপ ছিল। মামার বাড়ী যাবার আকর্ষণ আমার ছিল কেবল ছোটমামার সঙ্গে খেলা করবার জন্য। বয়সে আমার থেকে পাঁচ-ছয় বছরের বড় হ'লেও ছোটমামা এক মুহূর্তের জন্যও যেন বুঝ্‌তে দেয়নি যে তার ও আমার মধ্যে বয়েসের কোনও ব্যবধান আছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ছোটমামা ছুটিতে ছিল, আমার বয়স তখন দশবছর। সেই সময় আমার ছোটবোন খুকু হওয়ায় আমি মাতৃক্রোড় বঞ্চিত হয়ে মামার বাড়ীতে দিদিমার কাছে কিছু দিন ছিলাম। দিন আমার হয়তো তত ভাল কাট্‌ত না, যদি না ছোটমামা আমাকে সাগ্রহে তার কাছে টেনে নিয়ে আমার ব্যথা ভুলিয়ে দিত।

সন্ধ্যাবেলা বাইরের লনে বসে আছি, হঠাৎ আকাশের একটি মাত্র তারার দিকে চেয়ে মনে হ'ল মা এতক্ষণ একটা বিচ্ছিরি কাঁদুনে খুকুকে নিয়ে কত বা আদর করছেন! সঙ্গে সঙ্গে অভিমানে চোখে জল এসে পড়ত, আপনি অধর কেঁপে উঠ্‌ত। আর তখনই যেন অন্তর্যামীর মত ছোটমামা এসে আমার পাশে দাঁড়াত। চুলের ওপর হাত রেখে সস্নেহকণ্ঠে বল্‌ত 'রুবি, চল্‌, খরগোশটাকে কর্ণওয়ালিস্‌ স্কোয়ার থেকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।'

সকালবেলা দিদিমার কাছে দুধ খেতে খেতে খামকা মনে হ'ত—মা আমাকে ভুলে গেছেন একেবারে। হাত থেকে দুধের রূপোর গেলাস হয়তো বা গড়িয়ে পড়ে টোল খেয়ে যেত, চোখের জল গোপন করবার জন্য অন্য দিকে মুখ ফেরাতে হ'ত। তখনই কোথা থেকে ছোটমামা দৌড়ে আস্‌ত, 'রুবি, চল্‌, আমরা বাগান তৈরি করি-গে।'

আশ্চর্য! কোন দিন কিন্তু ছোটমামা আমার চোখের জলের কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌ত না, একবার উল্লেখ পর্যন্ত করত না। তখন ভাবতাম্‌, 'ছোটমামা কিছু দেখ্‌তে পায়নি, কিন্তু এখন বুঝি তার চোখে সব পড়েছিল। সেইজন্য সে তার সমবয়স্ক বন্ধুদের সাহচর্যের মোহ ত্যাগ ক'রে আমার মত একটা নিতান্ত অপদার্থ কাঁদুনে মেয়ের মনোরঞ্জনের জন্য এত ব্যস্ত ছিল।

একমাস পরে বাড়ী ফিরে এলাম। আমার মায়ের স্নেহ ত্যাগ হয়ে গেলেও তখন আমার দুঃখের কিছু রইল না। এই একমাসে যে আমি আমার ছোটমামার স্নেহ ভালবাসা সমস্ত একান্ত আমারই ব'লে জেনেছিলাম।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় সমস্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে ছোটমামা কলেজে ভর্তি হ'ল। বাবাও আমাকে স্কুলে দিলেন।

তখন আবার আমার ও ছোটমামার বন্ধুত্ব নূতন জগৎ নিয়ে গড়ে উঠ্‌ল, কলেজের প্রতিটি গল্প ছোটমামা আমাকে বল্‌ত—যা আমি বুঝ্‌তে না পারি—তাও। ছোটমামার কোন কথাই আমার অজানা ছিল না। আবার আমার জগতের প্রতিটি তুচ্ছ ঘটনাও ছোটমামার

কানে আমার তোলা চাই। সহপাঠিনীর বেশবিন্যাস, শিক্ষয়িত্রীর শাসন—সমস্ত মনে মনে জমা ক'রে রেখে দিতাম, কখন ছোটমামা আস্‌বে, কখন তাকে বল্‌ব। মাঝে মাঝে নিজের মনে জমানো কথার হিসাব মিলিয়ে বল্‌তাম, ভুল না হয়ে যায়।

এইরকম করে দিনে দিনে আমরা এই অসম বয়সের দুই বন্ধু দুই অসম জগৎ নিয়ে পরস্পরের কাছে ক্রমেই আরও সরে আস্‌ছিলাম। আমার বড় দুই ভাইবোন ও ছোট বোন খুকুর চেয়ে আমি আবার দেখ্‌তে অনেক খারাপ ছিলাম। মা'র উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বা বাবার অনিন্দ্য মুখচোখ কিছুই আমি পাইনি। পাশাপাশি দাঁড়ালে আমাদের ভাইবোন বলে চেনা দুষ্কর। তার ওপর আমি চিরকাল বড় লাজুক, অভিমানী-প্রকৃতির ছিলাম। রূপের অভাবে গুণের বিকাশ দেখাবার উপায়ও আমার যেন ছিল না। লোকের কাছে বের হ'বার সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ত, এরা আমাকে আমার ভাইবোনদের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখে দেখে হয়তো উপহাস কর্‌ছে। তাই যেন কুণ্ঠিত চরণ আপনি থেমে যেত, ভীরু চোখ আপনি নীচু হ'ত। এ-হেন একটা নির্জীব, জড়প্রকৃতির কুশ্রী মেয়েকে ছোটমামার মত রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ পুরুষ কেন যে আদরে স্নেহে মাথার মণি ক'রে তুল্‌ল সেইটাই আশ্চর্য লাগ্‌ত সবার। আমার অন্যান্য ভাইবোন তার কাছে আমলও পেত না, দূর থেকে কেবল ঈর্ষার দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাক্‌ত। সবাই বল্‌ত, 'সোমেশ আদর দিয়ে দিয়ে রুবিটাকে মাথায় তুলেছে।'

আমার ছোটমামার নাম সোমেশ।

ছোটমামা আবার দেখ্‌তে তার ভাইবোন সকলের চেয়ে সুন্দর। সতোরো-আঠারো বছর বয়েসেই তার চেহারা রাস্তার লোক ফিরে চেয়ে দেখে যেত। শুভ্র মর্মরের মত উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ। বাঙালীর মধ্যে অতটা ফর্সা বিরল, আমার চোখে তো আর একটিও পড়েনি। নিকষ কালো চুল তরঙ্গায়িত হয়ে প্রশস্ত ললাট থেকে ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। যুগ্ম ভুরু। আকর্ণ কিন্তু অনতিপ্রশস্ত চোখে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, যেন শিকারী ঈগলের মত প্রতিটি বস্তুর ওপর নির্ভুল লক্ষ্য। উন্নত রোমান্‌ নাক, প্রসন্ন অধরোষ্ঠ রক্তকোকনদের পরাগের মত। পাথর কেটে তৈরী করার মত সুগঠিত চিবুক। প্রশস্ত বক্ষ, উন্নত সবল দেহ! বিদ্যার খ্যাতিতে, রূপের খ্যাতিতে ছোটমামার স্তাবক ও বন্ধুর অভাব ছিল না। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারলে সাধারণ ছেলেরা নিজেদের ধন্য মনে কর্‌ত। কিন্তু সে তাদের গণ্ডি কাটিয়ে ছুটে চলে আস্‌ত বালিগঞ্জে আমাদের বাড়ী, যেখানে আমি তার পথের দিকে চেয়ে থাক্‌তাম।

ছোটমামার ভাবপ্রবণ চিত্তের এও একটা লক্ষণ। যাকে সে ভালবাস্‌ত বাইরের কোন টানই তাকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারত না। লোকের উপহাস বা ভুলিয়ে দেবার প্রচেষ্টা যেন তার বন্ধনকে আরও দৃঢ় কর্‌ত। সে জান্‌ত আমাকে কেউ চায় না ; আমি আমার হাস্যমুখর সুন্দর ভাইবোনদের মধ্যে নিতান্ত খাপ্‌ছাড়া। তার কোমল মনে আমার অবস্থাটা বিশেষ ক'রে নাড়া দিত। তাই সে বাইরের আঘাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্য নিজের অসীম স্নেহ দিয়ে আরও নিবিড় ক'রে ঘিরে রাখ্‌ত।

এ এক সর্বনাশা মন! এরা ভালবাসে খুব কম, কিন্তু যাকে ভালবাসে তাকে কিছুতেই ভুলে যেতে পারে না। অনেক সময় নিজের ইচ্ছা সত্ত্বেও পারে না।

ছোটমামা যখন বি-এ পড়ে তখন তার দু-একটি বান্ধবী হ'ল। সে খবর অবশ্য প্রত্যহ ছোটমামা আমাকে এসে নিয়মিত ব'লে যেত। কোন মিস্‌ খান্‌ তার ছবি চেয়েছে, কোন্‌ রেবা বোস তাকে অহেতুক চিঠি লেখে—এ সবই আমার জানা ছিল। ছোটমামার রূপের তীব্র আকর্ষণে অনেকে প্রত্যঙ্গই আকৃষ্ট হয়েছিল, যদিও বেচারী তাদের পক্ষ প্রসারণের বাইরে যাবার যথেষ্ট প্রচেষ্টা কর্‌ত। আমি মাঝে মাঝে বলতাম, 'ছোটমামা, কেন তুমি

ওদের পষ্টাপষ্টি বলে দাও না যে তুমি এসব পছন্দ কর না?'

কিন্তু এখানেও ছোটমামার আশ্চর্য দুর্বলতা দেখ্‌তাম। মেয়েদের যেন সে মধ্যযুগের নাইট্‌দের চক্ষে দেখ্‌ত! তার শুভ্র কুমার মনে কোন মেয়ে রেখাপাত কর্‌তে পারেনি জানি, তবু সে তাদের মনে আঘাত দিতে পারত না। নারীর স্থান তার কাছে অনেক ঊর্ধ্বে ছিল। আমার দাদার বিয়েতে মা তাকে মেয়ে দেখ্‌তে যাবার অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠ্‌ল, 'দিদি, ওই কাজটা আমি পার্‌ব না। একটি মেয়েকে দেখে অপছন্দ হয়েছে বলার কথা আমার মনেও আসে না। এ কি বাজারের জিনিস যে অন্তঃকরণ বলে কিছুর বালাই নেই? বরপক্ষের পছন্দ হ'লে ভাল, না হ'লে অনর্থক সে মেয়েটির মনে কতটা কষ্ট দেওয়া হয় কেউ ভেবে দেখে না। চিরকাল কন্যাপক্ষের এই অপমান!'

মনে আছে, সেদিন একথা নিয়ে আমাদের বাড়ীতে কত আন্দোলন হয়েছিল। মা ঠোঁট উল্‌টে বলেছিলেন, 'কি পাকা পাকা কথা বলে যে সোমেশ! চিরকাল ধরে তো মেয়ে দেখে তারপরেই বিয়ে হচ্ছে। আজ সে নিয়ম একপলকে উল্‌টে যাবে নাকি?' দিদি টিট্‌কারি দিয়ে বলে উঠ্‌ল 'আচ্ছা, নিজের বেলা দেখা যাবে।'

কিন্তু ছোটমামার কথা আর কেউ না বুঝ্‌লেও আমি বুঝ্‌তে পারলাম।

আমি যখন আই-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি তখন ছোটমামা ইংলণ্ড থেকে সিভিল্ সার্ভিস পরীক্ষা পাশ ক'রে ফিরে এল। দেখ্‌তে সে আরও অনেক সুন্দর হয়েছে। তার দিকে যেন বেশীক্ষণ চেয়ে থাকাও যায় না। কালো পোশাক-পরা, সুদীর্ঘ দেহ, সুপুরুষ যুবকটির কাছে এগিয়ে যেতে আমার সঙ্কোচবোধ হচ্ছিল। কিন্তু সেই সস্নেহকণ্ঠে 'রুবি' ব'লে ডেকে ছোটমামা যখন আমাকে আদরে বুকে জড়িয়ে ধরল, তখন জাহাজঘাটায় দাঁড়িয়ে ক্ষণকালের জন্য আমার সন্দেহ হ'ল—আমার বাবা-মা কি আমাকে বেশী ভালবাসেন, না ছোটমামা বেশী ভালবাসে!

—ছোটমামা বিষ্ণুপুরে চাকরি পেল। প্রতি সপ্তাহেই প্রায় সে কল্‌কাতায় আস্‌ত। সে সময়টা বড় আনন্দে কাট্‌ত, সারা বাড়ী হাসি-গল্পে মাতিয়ে আমাদের নিয়ে বেড়িয়ে হৈ চৈ ক'রে যেত। আমার ওপর তার ভালবাসা আরও যেন বেশী হয়েছিল। নিজেদের বাড়ী বা আমাদের বাড়ী যেখানেই সে থাক্‌ত, একদণ্ডও তার আমাকে ছেড়ে চল্‌ত না।

বিদেশে থেকে ছোটমামার কোন পরিবর্তন হয় নি বা মতামত কিছুই বদ্‌লায় নি। মেয়েদের ওপর ছোটমামার সেই শ্রদ্ধামিশ্রিত উচ্চ ধারণা তুহিনপ্রদেশের তুহিনহৃদয়া লিসি-সিসির সংস্পর্শে এসেও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। মেয়ে দেখে বিয়ের কথায় সে আবার আগের মত 'কন্যাপক্ষের অপমান' ইত্যাদি বড় বড় কথা বলে। বিয়েতে ছোটমামাকে আমরা কিছুতেই রাজী কর্‌তে পারি না। আবার ব্যবসাদারী ভাবে মেয়ে দেখে বিয়ে ঠিক করার পরিবর্তে প্রেমমূলক বিবাহের কথা বললেও বলে, 'এত ব্যস্ত কেন? আমি কি তোমাদের অরক্ষণীয়া মেয়ে নাকি?' ছোটমামার বিবাহে অনিচ্ছা যেন আমাদের একটা অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল।

এদিকে দিদির বিয়ে হয়ে গেল। দিদির বিয়ের পর সেই বছরের শেষ থেকেই ছোটমামার একটা পরিবর্তন দেখ্‌তে পেলাম। তার হাসিখুসী ভাবটা চলে গিয়ে একটা অকালগাম্ভীর্য সে স্থানে দেখা দিল। আমার সঙ্গে গল্পেও যেন তার সে আগেকার প্রাণ ছিল না। কথা বল্‌তে বল্‌তে চুপ ক'রে অন্যমনস্ক হ'ত। আমি তাকে বেশী ক'রে অন্তরঙ্গভাবে দেখ্‌তাম বলে তার এই ভাবটা প্রথম অবশ্য আমার কাছেই ধরা পড়ল। কিন্তু ক্রমে সে এতটা বিষণ্ণ ও মলিন হয়ে গেল যে, সেটা সকলের চোখেই পড়্‌লো। এ নিয়ে সকলে তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ কর্‌ত, কিন্তু ছোটমামা সে সবের কোনও উত্তর দিত না।

আমাকে সকলে প্রশ্ন করত 'কি রে, তুই তো তোর মামার খাস্-মুন্সী, কি হয়েছে ওর জানিস্?' আমি মাথা নেড়ে 'না' বলে চলে যেতাম। মনে হ'ত কি একটা কারণে ছোটমামার সারা পৃথিবীর ওপর বিজাতীয় অভিমান হয়েছে এবং সেই অভিমান তার মুখ চেপে বন্ধ করে রেখেছে—এমন কি আমার কাছেও খুল্তে দিচ্ছে না। কিন্তু আমিও তো সেই অভিমানী মামার ভাগ্নী! আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, জীবনে প্রথম যখন সে আমার কাছে কথা লুকোচ্ছে, আমিও সে নিজে না বললে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করব না। সুদূর বিদেশ থেকেও প্রতি ডাকের সহাস্য সুন্দর চিঠিগুলি 'এল্সি', 'ডোরা' 'লরা'দের তুচ্ছ কথাও বিন্দুমাত্র গোপন ক'রে আন্ত না, সে আজ যখন স্বদেশে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে তার মনের ভেতর দেখ্তে দিচ্ছে না তখন আমি কেন তাকে জিজ্ঞাসা করব? তাই যখন দেখ্তাম আড়াল থেকে—যে ছোটমামা অর্ধভুক্ত থালা ঠেলে রেখে খাবার 'টেবল্' থেকে উঠে যাচ্ছে, বিনিদ্র রাত্রি বারান্দায় একলা ঘুরে ঘুরে কাটাচ্ছে, তখন আমার চোখে জল আস্লেও মুখে কথা ছিল না। আমার অভিমানও যে ছোটমামার সমান!

কার্তিকের শেষে বিষ্ণুপুর থেকে ছোটমামা চিঠি দিল সে এখানে আস্ছে মেয়ে দেখ্তে। কয়েকটি মেয়ের বাবা তাকে বিব্রত ক'রে তুলেছে। সে নিজে দেখে বিয়ে ঠিক কর্তে চায়।

সূর্য পশ্চিমে উঠ্লেও কেউ বোধ হয় এতটা আশ্চর্য হ'ত না। রূপে গুণে ছোটমামার তুলনা বিরল, চাকরিও ভাল পেয়েছে। তার ওপর আমার মামার বাড়ীর বংশ ও ধনমর্যাদা-বিখ্যাত। সুতরাং কন্যাদায়গ্রস্ত মেয়ের বাবারা ছোটমামাকে বিব্রত ক'রে তুলবে এতে আশ্চর্য হবার নেই ; কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি যে, সেই ছোটমামা—যে মেয়েদের এত ওপরে ভাব্ত, বাজারের পণ্যের মত ক'রে মেয়ে দেখার বিরোধী ছিল, সে এত সহজে বিয়েতে রাজী হয়ে নিজে মেয়ে দেখ্তে আস্ছে। সকলে হাসি-তামাসা করতে লাগল, ছোটমামার নাকি ও সমস্ত ভণ্ডামী ছিল। আমার আশ্চর্য ও দুঃখিত লাগ্লেও মনে আনন্দ হ'ল ; তা হ'লে এবার ছোটমামা বিয়ে কর্বে, তাহ'লে তার জীবনে আকর্ষণ আস্বে। শেষের কয়েকটি দিনের মত তার ছন্নছাড়া রূপ আমার চোখ মেলে দেখ্তে হবে না!

ছোটমামা কল্‌কাতায় এল। পাণ্ডু হয়েছে তার মূর্তি, চোখে মুখে নববর-সুলভ কোন ভাবই খুঁজে পাওয়া যায় না। দশটি দেখে একটিকেও পছন্দ না ক'রে সে ফিরে চলে গেল। সকলে দ্বিতীয়বার আশ্চর্য হ'ল।

তারপর থেকে আরম্ভ হ'ল ছোটমামার মেয়ে দেখার অভিযান। বারে বারে সে আস্ত, বারে বারে মেয়ে অপছন্দ ক'রে ফিরে যেত। লোকের বিদ্রূপে আমার কানপাতা দায় হ'ল। কলেজের মেয়েরা পর্যন্ত আমাকে ঠাট্টা কর্ত, 'কি রে রুবি, তোর মামার আর ক'টি মেয়ে দেখ্লে হাজার পূর্ণ হয় রে?' বাইরের ছেলেরা 'সোমেশ রায়ের দিগ্বিজয় মাত্র!' ব'লে এক ছড়াই তো লিখে বস্ল!

এই সব লোকের নিন্দায় আমার চোখে জল আস্ত। মনে মনে বল্তাম, 'ছোটমামা, তোমাকে এরা সব ভুল বুঝেছে। কেন তুমি এমন করছ বলে দাও এদের। কোন্ মেয়ের ছবি তোমার সারা মন জুড়ে রয়েছে যে সমস্ত মেয়ের মাঝ থেকে তুমি তাকে খুঁজে বের কর্তে চাও? কার ওপর অভিমানে তুমি সমস্ত নারী-জাতির ওপর এমন শোধ তুলছ?'

আমার মনের কথা কিন্তু মনেতেই থাকৃত। অভিমান আমারও কণ্ঠরোধ ক'রে ধরেছিল।

ইদানীং ছোটমামা বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছিল, যা আমার চক্ষেও বড় বিসদৃশ লাগ্ত। বাবার এক দূর-সম্পর্কীয়া ভাগ্নীকে ছোটমামা আমাদের বাড়ী দেখ্বে বলে কথা দিয়েছিল। মেয়েটি বড় সুন্দরী, ভীরু হরিণীর মত টানা টানা যুগল চোখে ভুবন ভোলানো কোমল দৃষ্টি। প্রথম যৌবনের উন্মেষে তনুদেহটি লাবণ্যে টলমল্ কর্ছে। একটু লাজুক সে,

নম্র পুষ্পভারনতা লতার মত। আমার বড় আনন্দ হ'ল, এবারে ছোটমামার নিশ্চয় পছন্দ হবে। মেয়ে দেখার সভায় আমি ছোটমামার কানে কানে বললাম, 'এবার কেমন পছন্দ না হয় দেখি?'

ছোটমামার অধরে বিদ্রূপের শাণিত হাসি খেলে গেল। তারপর সেই লজ্জিতার নির্যাতন সুরু হ'ল। ছোটমামা যে এত চোখালো ধারালো প্রশ্ন মনে জমা ক'রে রেখেছে কে জান্ত? কথার বাণে নিরপরাধা মেয়েটিকে বিদ্ধ ক'রে না-পছন্দের রায় দিয়ে তবে সে ক্ষান্ত হ'ল।

সেদিন আর থাক্‌তে পারলাম না। ফুলের মত কোমল মেয়েটির অপমানে আমার মুখ থেকে যেন জোর ক'রে কথা বার হ'ল, 'ছোটমামা, তুমি কি মানুষ? কোথায় গেল তোমার নারী-জাতির ওপর শিভাল্‌রি-এর কথা, কতকাল ধরে তো বলে এসেছ 'কন্যাপক্ষের চিরদিন অপমান'। কই, আজ তো তোমার কন্যাপক্ষের ওপর কোন দয়াদাক্ষিণ্য মনে এল না? আজ যে দুর্বল কন্যাপক্ষের বরপক্ষের অপমানে এত লজ্জা—তা তো তুমি একবার ভাব্‌লেও না?

মনে আছে, সেদিন আমার এত কথার, এত রাগের উত্তরে ছোটমামা একটি কথাই বলেছিল। অধরে ক্লান্ত করুণ একটু হাস্য, চোখে মলিন শ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে ছোটমামা বলেছিল, 'রুবি, তুই এখনও ছেলেমানুষ, এসব বুঝ্‌তে পাব্‌বি না। কন্যাপক্ষই চিরকাল প্রবল।'

গরমের ছুটিতে আমি ও মা দাদার সঙ্গে বিষ্ণুপুরে ছোটমামার কাছে গেলাম। মা দাদার সঙ্গে এখানে ওখানে বেড়িয়ে ফিরতেন। আমি ছোটমামার কাছে বাড়ীতেই থাক্‌তাম।

সেদিনটা আজও আমার পরিষ্কার মনে আছে। মা দাদা বাড়ী নেই। বাইরে বস্‌বার ঘরে গ্রীষ্মের রমণীয় বৈকালে আমি আর ছোটমামা বসে গল্প কর্‌ছি। ছোটমামার মুখে পাইপ্‌, আমার হাতে একখানা ইংরেজী কবিতার বই।

বাইরে মোটর দাঁড়াবার শব্দ পাওয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভারী রেশমের পরদা সরিয়ে যে মেয়েটি ঘরে ঢুকল, তাকে দেখে সে দেখ্‌তে ভাল কি মন্দ, সে সব কিছু মনে হবার আগেই মনে হয় এর সঙ্গে মেশ্‌বার পর, একে দেখ্‌বার পর কোন পুরুষের একে ছাড়া দিন কাটে কেমন ক'রে?

ছোটমামার দিকে তাকিয়ে দেখি, এক মুহূর্তে তার মুখের চেহারা বদলে গেছে। আনন্দ, আশ্চর্য ভাব, অভিমান, প্রেম সমস্ত মিলে তার সুন্দর মুখকে আরও অপরূপ ক'রে তুলেছে। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছোটমামা বলে উঠ্‌ল, 'ললিতা, তুমি এ সময়ে?'

ললিতা উত্তর দিল, 'মা এসেছেন সঙ্গে।'

ললিতার মা স্থূল দেহভার বহন ক'রে ঘরে ঢুকলেন, হাতে তাঁর একতাড়া নিমন্ত্রণের লাল চিঠি। তারই একখানা ছোটমামার দিকে অগ্রসর ক'রে দিয়ে ভদ্রমহিলা অনর্গল বকে চললেন, 'বড় তাড়াতাড়ি দিন ঠিক হয়ে গেল সোমেশ। তোমাকে আর কি বলব? সেই তোমার প্রথম চাকরির দিন থেকে এখানে আমাদের সঙ্গে আলাপ। তুমি তো ঘরের ছেলে, যেও ললিতার বিয়েতে। আমরা আর কি করব বল? আমাদের মন তো তোমার ওপরেই ছিল, কিন্তু যে জেদী মেয়ে! ব'লে বস্‌ল দ্বিজেনকে ছাড়া কাউকেই বিয়ে কর্‌বে না। কি আর করি বল? এতদিন চেষ্টাও তো কম করলাম না! ছেলেবেলা থেকে দ্বিজেনের সঙ্গে আলাপ। এত বড় মেয়ের মতামতটাই এক্ষেত্রে আমাদের সব চেয়ে বেশী। তা, তোমার কি আর পাত্রীর অভাব? ললিতার বিয়ের পর দেখে আমিই পছন্দ ক'রে দেব। বড় তাড়াতাড়ি, আর দাঁড়াবার সময় নেই। যা হোক, সোমেশ, তোমার কিন্তু যাওয়া চাই।'

তাঁরা বেরিয়ে চলে গেলেন—আর কোন দিকে দৃষ্টিক্ষেপ না ক'রে—ঝড়ের গতিতে।

কি একটা বল্‌তে যেয়ে সহসা ছোটমামার ওপর চোখ পড়ে আমি থেমে গেলাম। ছোটমামার হাত থেকে জ্বলন্ত পাইপটা পড়ে গিয়ে দামী কার্পেটখানা পুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আর ছোটমামার মুখ!—মানুষ কি কখনও জীবিত অবস্থায় এত শাদা দেখাতে পারে!

আমার প্রতিজ্ঞা ছিল, ছোটমামা নিজের থেকে কিছু না বললে আমি কখনও তাকে জিজ্ঞাসা করব না। আমার তাকে প্রশ্ন কর্‌তে হল না কিছু, তারও কিছু আমাকে বল্‌তে হ'ল না। আমাদের দৃষ্টি সম্মিলিত হ'ল মাত্র। আমার জীবনের পরম সুহৃৎ, আমার প্রিয়তম আত্মীয়ের মুখের দিকে একবার চেয়ে আমি বুঝ্‌তে পারলাম তার সব কথা।

আমার ব্যথিত স্তম্ভিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে ছোটমামা গিয়ে তার শোবার ঘরে ঢুকল। দ্বার আমারই চোখের সাম্‌নে বন্ধ হয়ে গেল।

সেই রুদ্ধদ্বারের দিকে চেয়ে চেয়ে আজ আমি ছোটমামার সেদিনের কথা এতদিন পরে বুঝ্‌তে পারলাম—

'রুবি, চিরকাল কন্যাপক্ষই প্রবল।'

চৈত্র ১৩৪৬

ঢেউ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

সত্যভামা যে কোন দিন সহরে আসিয়া আর গ্রামে ফিরিবে না সে-কথাটা হয়ত বিধাতারও অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু বিধাতার অজ্ঞাত থাকিলে কি হইবে, বিবাহের পর সত্যভামা আর গ্রামে যায় নাই। পঁচিশটা বছর আর তা'র শ্বাস ফেলিবার অবসর ছিল না ; স্বামী উকীল হইতে সব্ জজ হইয়া গেলেন, ছেলেপুলেতে ছোট মেয়ে টুনীরও ঘর ভরিয়া উঠিল,—ঘর ভাঙিয়া দালান হইল—উৎসব-নিমন্ত্রণ হাঁক-ডাক হৈ-চৈ বাড়ীতে লাগিয়াই আছে—তার কি শ্বাস ফেলিলে চলে? তার বাবা মাধব শিরোমণি মরিলেন পঞ্চাশ গাঁয়ে সাড়া তুলিয়া—এত বড় নৈয়ায়িক এ অঞ্চলে ক'টাই বা আর ছিল ;—কিন্তু তখনো সত্যভামার উপায় ছিল না সংসার ফেলিয়া নড়িবার। বড় মেয়ে আসন্ন-প্রসবা, তার ছেলের কালাজ্বর—এখন-তখন অবস্থা। শিরোমণি মশাই দূর হইতেই মেয়েকে আশীর্বাদ করিয়া গেলেন। ছেলে-মেয়ে স্বামী-সংসার লইয়া এমন ব্যস্ত ক'জন সৌভাগ্যবতী থাকিতে পারে? গাঁয়ের লোকেরা মানিল না। বৃন্দাবন চক্রবর্তী ত' সশব্দেই বলিয়া ফেলিলেন, "সহুরে ভূতে ধরেছে আর কি! যাঁর নাভি-গঙ্গা দেখতে দশ গাঁয়ের লোক পড়ল ভেঙে, তাঁরই মেয়ে না কি আসে না তাঁর শেষ-সময়!" কিন্তু বৃন্দাবন চক্রবর্তী যত বড় সত্যবাদীই হোন, সত্যভামাকে সহরের ভূতে পায় নাই। সত্যভামা মাধব শিরোমণিরই মেয়ে, কোন দিন তা'কে দেখিবার সুযোগ হইলে, চক্রবর্তী মহাশয় বুঝিয়া আসিবেন।

পঁচিশ বছর অনবচ্ছিন্ন গিন্নিপনা করিয়া যখন সত্যভামা অবসর গ্রহণ করিয়াছে, তখন বাপের বাড়ী তা'র পরিষ্কার। মা-বাবার ভিটায় বাতি দিবার জন্য যা-ও একটা ভাই ছিল, গ্রামে সে-বছর কলেরার মড়ক আসিল তা'কেই উপলক্ষ্য করিয়া। সত্যভামা অনেকবারের মত এই শেষবার, বুঝিল ছেলেবেলাকার সেই গ্রাম আর তা'র জন্য ভাত মাপে নাই।

অবসর গ্রহণের নির্জনতা সত্যভামাকে বড় বেশি করিয়া বাজিল। মনটা যেন তা'র বাপের পোড়ো ভিটার মতই শূন্য, ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। সেখানকার রূঢ়, স্তিমিত বিষণ্ণতাই তা'র মনে ছোঁয়াচ ধরাইল না কি? সত্যভামা বসিয়া ভাবিত। এত দিন ধরিয়া কর্মের যে বিরাট স্তূপ সে জড় করিয়াছে—তা'তে যেন তা'র আত্মাকে মিশাইয়া দিতে পারে নাই ; কোন্ উগ্র অনিবার্য অস্বস্তিকর উন্মাদনা তা'কে চালিত করিয়া লইয়াছে! প্রবাল-কীটের মত জীবন-শেষে আপন কার্যের বিরাটত্বে অবাক হইয়া সত্যভামাও ভাবিল, এত বড় সংসার কোন্ অসম্ভব উপায়ে সে অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিয়াছে! দিনের পর দিন আপন সত্তাকে লঙ্ঘন করিয়া, উৎপীড়িত করিয়া আজ সে যেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখান হইতে আর নিজেকে চেনা যায় না। কোথায় গিয়াছে তার সেই বাল্য-পরিচিতেরা, যাদের সান্নিধ্য ছাড়া আপন অস্তিত্ব সে কোন দিন কল্পনা করিতে পারিত না—তাদের সেই তক্‌তকে উঠান, রান্নাঘরের পেছনে বড় বড় নারকেল গাছ দুইটা, উঠানের সঙ্গেই একফালি আবাদের জমি, তার পাশেই খাল—যাদের স্পর্শ পাইয়া জীবনের চৌদ্দটা বছর তাহার কাটিয়াছে—কোথায় গেল সেই সব! এই কোলাহলহীন স্বচ্ছমুহূর্তে ভীড় করিয়া তারা আসিয়া দাঁড়ায় ;—সত্যভামা চিনিতে চায় সমস্ত চেতনা দিয়া—হয়ত চিনিতে পারেও, কিন্তু অস্পষ্ট,—কালের অপরিচ্ছন্ন যবনিকায় দৃষ্টি তার বাধিয়া যায়।

ভোর-বেলা ঘুম হইতে জাগিয়াই সে-দিন সত্যভামা শুনিল নীচে তার ঝি-চাকর নাতি-নাত্‌নিরা মহা সোরগোল তুলিয়াছে। কান ঝালাপালা হইবার যোগাড়। ব্যাপারটা দেখিতে হয়। সত্যভামা নীচে নামিয়া আসিল। সিঁড়িতেই নীচেকার কথার কয়েকটা টুকরা তার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। "চোর না হলে অমন করে চায় কেউ?" "ওকে পুলিশে দেবার আগে কয়েক ঘা লাগিয়ে দে না অতুল!" "কি ছাই চ্যাঁচাচ্ছিস্, দে না শুন্‌তে, শুনেই দেখি মহাপ্রভুর আগমন কেন!" সত্যভামা নামিয়া দেখিল, মহাপ্রভুটি হয়ত একটি ভিখারীরই ছেলে—বয়স চৌদ্দর বেশি হইবে না। শতছিন্ন ময়লা কাপড়ের আবরণে সে অতি কষ্টে আপনার সম্ভ্রম রক্ষা করিতেছে। বড় বড় নির্বোধ চোখ দুইটা মেলিয়া এই একদল অপরিচিতের রূঢ় কথাবার্তা শুনিয়া যাইতেছে।

মাকে আসিতে দেখিয়া টুনী যেন জটলা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সরিয়া আসিতে আসিতে বলিল, "চোর।"

একসঙ্গে অনেকগুলি কণ্ঠ প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল, "দিদিমা, চুরি কর্‌তে এসেছিল ও।"

মণ্টু বলিল, "আমি দেখেছি প্রথম..."

মাণিক তার প্রথম জন্মগ্রহণ করিবার দাবী অবমানিত হইতে দিতে পারে না ; সে দিদিমার কাছে আগাইয়া আসিয়া হাত পা নাড়িয়া বলিল, "সুট্ করে কলতলায় ঢুকে পড়েই চারদিকে চাইছিল—ভাগ্যিস রবার কিন্‌তে আমি বাইরে যাচ্ছিলাম তখন ; আমাকে দেখেই পালাই-পালাই কর্‌ছে, অতুল এসে ধরে ফেল্ল।"

মন্টু বাধা দিতে চাহিল, "না দিদিমা—" মাণিকের রোষ-কষায়িত চোখের দিকে চোখ পড়িতেই বাকি কথাটা তার গলায় আট্‌কাইয়া গেল।

মৃণাল—সত্যভামার বড় মেয়ের ছেলে : ফার্স্টক্লাশে পড়িবার দাবীতে সে এই দুই অপোগণ্ডকে ধমক দিয়া উপরে পাঠাইয়া বলিল, "একে যা কর্‌তে হয় কর দিদিমা ; অতুল ত তক্ষুণি থানায় নিয়ে যায় ; আমি বলি, দিদিমা এসে নিক।"

সত্যভামা অনেকক্ষণ 'চোর' ছেলেটির চোখের দিকে চাহিয়া ছিল। মনে পড়িল, মাধব শিরোমণি স্থান দিয়া রাখিয়াছিলেন দুই ঘর প্রজা। সদানন্দ—সদানন্দই হয়ত তাদের ছেলেটির নাম ছিল। তা'র যম-পুকুরের ব্রতের ত্রিশটা দিন পরম উ[illegible]াহে সদানন্দ রায়দের দীঘি হইতে পানা আনিয়া দিত, 'চোখ-পানি' মাছ ধরিয়া দিত। বিবাহের সময় সত্যভামা দেখিয়া আসিয়াছিল—সদানন্দ প্লীহাজ্বরে ভুগিতেছে ; দিনকতক পরেই হয়ত সে মরিয়াছে ;—বাঁচিয়া থাকিলেও, সে আজ কোথায়, সত্যভামা সে খবর পায় নাই। নিজের কণ্ঠে নিজেই চম্‌কাইয়া সত্যভামা জিজ্ঞাসা করিল, "তোর নাম কি রে?"

ছেলেটির সমস্ত চেতনা যেন এতক্ষণে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "আজ্ঞে উমেশ। আমি চোর নই মা-ঠাকুরণ। বাবুদের বল আমি চোর নই!" ঝি-চাকরের ব্যবধান ঠেলিয়া সে সত্যভামার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।

"এখানে কেন এসেছিলি?" কণ্ঠে সত্যভামার অভয় গলিয়া পড়িতেছিল। উমেশ শীর্ণ হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিল, "মা-[illegible]া, জায়গা-জমি কিছু নেই, মা, আমার। হেঁটে রতনপুর থেকে এসেছি—পথে কিছুই খাইনি—খেয়ার মাঝিও পয়সা নেয়নি। শুনেছি সহরে খাওয়া মেলে!"

আস্ফালনে আর কাজ হইবে না বুঝিয়া মৃণাল সরিয়া পড়িল। টুনীর কাছে ব্যাপারটা কেমন নূতন ঠেকিতেছে। অনুরূপ ঘটনা ছেলেবেলায় সে অনেক দেখিয়াছে। মা আসিয়া কোন দিন আগন্তুকদের থানার পথে বাধা হন নাই। আজ অকস্মাৎ মায়ের মধ্যস্থতা টুনীর ভাল লাগিল না।

"ওকে তুমি ভালমানুষ ভেবেছ না কি মা? থানায় নিয়ে গেলেই জেনে আস্‌বে. অতুল, ও দাগি-চোর না হয়েই যায় না।"

কলতলায় কুঁজোতে জল ধরিতে ধরিতে অতুল উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিল। কথাটাতে তার সম্পূর্ণ সমর্থন আছে।

সত্যভামা উপরে উঠিয়া গেল ; বলিয়া গেল, "ও এখানেই খাবে আজ।"

মৃণাল সত্যভামাকে পাইয়া বসিয়াছে। "দিদিমা, উমেশ তাহলে আমাদের কী হ'ল,—তোমার ছেলে—আমাদের মামা নয়?" টুনী এসব পরিহাসকেও আমল দিতে চায় না ; "কি সব নোংরামি করিস্‌ মৃণাল, যা পড়্‌তে যা। মা, আজ ডলির জন্মদিন, তোমাকে বলে পাঠিয়েছে—দুপুর বেলায়ই যেতে হবে কিন্তু।"

সত্যভামা ছোট করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "তা যাস্‌ তোরা।"

"বাঃ! তুমি যাবে না? বাবাও যাবেন বল্লেন। আমি মোটর সাফ কর্‌তে বলে দিয়েছি রামসদয়কে।"

সত্যভামা বলিল, "যা, যাব'খন।"

মাসীর ধমকে মৃণাল একটুও স্থানচ্যুত হয় নাই। দিদিমার কাছে সরিয়া আসিয়া সে চুপি চুপি বলিতে চাহিল, "উমেশও যাবে ত?"

সত্যভামা এইবার রাগিয়া উঠিয়াছে। "তোরা আমায় পেয়েছিস কি—বল্‌ তো? দেবো আমি এক্ষুণি দূর করে ওকে। সব সময় ঠাট্টা-ইয়ারকি আমার ভাল লাগে না বাপু।"

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সত্যভামা নীচে নামিয়া আসিয়াছে। উমেশ পরিতৃপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া, অতুলের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া, একথাল ভাত লইয়া বসিয়াছে। সত্যভামাকে দেখিয়া উমেশ এতটুকু হইয়া বলিল, "চার দিন পরে ভাত পেলাম, মা, যা খেয়ে পেট ভর্‌বে।" সত্যভামা একটু হাসিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল। বলিল, "ওকে মুড়িঘণ্টটা দেওয়াস্‌ কিন্তু অতুল ; খা'ক্‌, খুব ভাল হয়েছে।"

"না, মুড়িঘণ্ট আমার লাগ্‌বে না, এম্‌নিতেই পেট ভরে যাবে।" ভাতের প্রথম গ্রাসটাতেই উমেশের কেমন যেন আমেজ আসিয়াছে।

"লাগ্‌বে না কেন? ভালবাসিস্‌ নে? নিশ্চয় নিমন্ত্রণে খাস্‌নি কোন দিন? তোদের গাঁ ত নদীর কাছেই, খুব মাছ পাওয়া যাবার কথা।"

নদী ত আছেই, তা ছাড়া হালদারের দীঘিতে রুই কাত্‌লা কিল্‌বিল্‌ করিতেছে। দশ-পাঁচটা গাঁয়ের নিমন্ত্রণের মাছ ওখান হইতেই হইতে পারে। সে কথাটা উমেশ অনেক কষ্টে, অনেক বকিয়া, অস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিল।

"তোদের গাঁয়ে বাঁশ-ঝাড় নেইরে, উমেশ, নিচ দিয়ে সরু পথ। ভাঁটাফুল ফুটে থাকে না পথের পাশে? ষষ্ঠীপূজোয় ছেলেমেয়েরা আসে না দল বেঁধে বাঁশের ডগার পাতা ছিঁড়ে নিতে?"

"হ্যাঁ আসে। গেলো বছর বোসদের বুড়িকে ত ওখানেই সাপে কাট্‌ল। সনাতন ওঝা এসে কত ঝাড়্‌-ফুঁক্‌! কিছুতেই বুড়ি আর চোখ মেলে চাইল না। সনাতন বলে গেল, কাল-সাপ ; ও-বিষ কিছুতেই নাম্‌বে না।"

"তোদের ওখানে মনসাপূজো হয় না বুঝি? সাপে কাটে যে লোকদের? সারা শ্রাবণ মাসটা আমার বাবা পদ্মপুরাণ পড়্‌তেন। গাঁয়ের সব লোক এসে জড় হ'ত ধূয়া গাইবার জন্য।" সত্যভামা দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া অতীতের দিনগুলিকে চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চাহিল। তার পর ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল : "পদ্মপুরাণ পড়্‌লে বংশ

থাকে না। বাবার বংশও থাকবে না জান্‌তাম।" উমেশের দিকে ফিরিয়া তার চোখে পড়িল ছেলেটা ভাত অর্ধেকটাকও খাইতে পারে নাই। একটু ব্যস্ত হইয়াই সত্যভামা বলিল, "এ কি, ও ভাতকয়টাও খেতে পার্‌লিনে। শুধু জলই খাচ্ছিস্‌! আর যা গরম পড়েছে এ ক'দিন! পুড়ে গেলুম। মেঘের ফোঁটাও দেখা যায় না আকাশে। নে, দই দিয়ে খেয়ে ফেল ও-কটা ভাত। হাঁ চল্‌বে, মাত্র ত দুটো ভাত।"

উমেশ উঁকি দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "বিষ্টি হ'বে। দেখে এসেছি কেদারঠাকুর নারায়ণশিলা জলে ডুবিয়ে রেখেছেন। সাত দিনের দিন এক ফোঁটা হলেও পড়্‌বে।"

সত্যভামার মনে পড়িয়া গেল এমনি অনাবৃষ্টিতে 'মেঘ-মাগন'-এর কথা। "আচ্ছা উমেশ, তোদের গাঁয়ে মেঘ-মাগ্‌তে যায় না বামুনের ছোট ছোট মেয়েরা—স্নান করে, এলোচুলে ; এখনো আমার মনে আছে ছড়াগানের দু'একটা পদ : 'মেঘ রাজারে মেঘ রাজা, তুই না সোদর ভাই—' কেমন, বেরুবে না এখন মেয়েরা মেঘ-মাগ্‌তে?"

এমন কোন ঘটনা উমেশের মনে পড়িল না। ভাতের থালায় সে নিবিষ্ট হইয়া রহিল।

"ও, আজকাল কেউ করে না বুঝি? ছোট ছোট মেয়েরা জাল দিয়ে চুলও বাঁধে না, কেমন? ছোট বেলায় আমরা বেঁধেছি। সার করে চুলের কাঁটা গুঁজে দিতাম, মাথায় চিনেমাটির পক্ষী দেওয়া চুলের কাঁটা,—দূর থেকে বেলফুলের কুঁড়ির মালার মত দেখ্‌তে হ'ত। আজকাল ও-সব আর নেই, না রে?"

উমেশের ত স্পষ্টই মনে আছে তার ছোট বোনটা যেবার মরিয়া গেল সে বছর তার বাবা ওর জন্য চুলের জাল, চুলের কাঁটা কিনিয়া আনিয়াছিল। কাজেই এইবার উৎসাহিত হইয়াই সে বলিল, "হাঁ, আজকালও পরে।"

সত্যভামা দেখিতেছে নন্দীবাড়ীর ছোট মেয়ে ষোড়শীর সঙ্গে সে বাহির হইয়া পড়িয়াছে খালের বাঁধে মাছধরা দেখিবার জন্য। বাগ্‌দীদের জোয়ান-জোয়ান ছেলেগুলির পোলো লইয়া সে কি হুল্লোড়! ওদিকে কার পুকুরের বুঝি পাড় ভাঙিয়াছে—উঠিতেছে শোল আর মৃগেল মাছই বেশি। সত্যভামা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া মাছ ধরা দেখিত, যতক্ষণ না শিরোমণি আসিয়া আড়-কোল করিয়া তাকে বাড়ীতে লইয়া যাইতেন। হয়ত এখনো খালে তেমনি মাছ ধরা হয়, তেমনি বামুন-কায়েতের ছোট ছোট মেয়েরা খুসীর দৃষ্টিতে চাহিয়া তা' দেখে! হয়ত সেই মেয়েদেরই অনেকের বিবাহ হইয়া যাইবে এত দূরে, যেখানে গাঁয়ের কাক-চিলও যাইতে পারে না ; সত্যভামার মত হয়ত তারাও ভাবিবে গ্রাম্য-পরিবেশে স্নিগ্ধ শৈশবের কথা।

পেছনে টুনী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে : "এ কি—তুমি যাবে না কি মা?"

উমেশ লজ্জায় ছোট হইয়া গিয়া খালি থালের উপর আঙুল ঘষিতে লাগিল। তার জন্যই না ঠাকরুণ এত কাজ ফেলিয়া এতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

সত্যভামা সশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উপরে উঠিয়া গেল। ডলির জন্মদিন, তাকে যাইতে হইবে বই কি। গিয়া অনর্থক কথায় হাসিতে হইবে, আগন্তুকদের শাড়ীর ঝলমলানি, মার্জিত অনুচ্চ কণ্ঠস্বর, ডলির দু'একটা সে[illegible]রের গদ, একটা গানও হয়ত, উপভোগ না করিলে চলিবে কেন?

উমেশ কিন্তু এ বাড়ীতেই থাকিয়া গেল। অতুলের শুইবার ঘরের পাশেই কোঠার মত একটু জায়গা ছিল, এত দিন সেখানে কয়লা রাখা হইত, উমেশই বন্দোবস্ত করিয়া ওটাকে চমৎকার শুইবার ঘর করিয়া লইয়াছে। একটা ভাঙা তক্তপোষে গোটা দুই পেরেক ঠুকিয়া সত্যভামাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, "দিব্যি হয়ে গেছে, মা, শোবার বন্দোবস্ত!"

সত্যভামা বলিল, "খালি কাঠে কি করে শুবি বল্, গায়ে লাগ্‌বে না? একটা কাঁথাও আনিস্ নি বাড়ী থেকে!"

"খুকুমণিদের ছেঁড়া কাঁথা নাই দু'একটা? আমি শেলাই করে নিতুম।"

"নাঃ ওদের কাঁথা নেই। আমারি আছে একটা। বিয়ের আগে আমায় শেলাই করে দিয়েছিলেন মা ;—পাড়ের কাঁথা, কাপড়ের পাড় জোড়া দিয়ে দিয়ে তৈরী! মায়ের চিহ্ন, ওটা দিতে পারি নে। তুই বরং এক কাজ কর। টুনীর কাছ থেকে কয়েকখান ছেঁড়া কাপড় চেয়ে নিয়ে শেলাই করে নিস কাঁথা।"

"হ্যাঁ, দুটো কাপড় জোড়া দিয়ে নিলেই আমার ঢের হবে।"

সত্যভামা চলিয়া গেল। মেলা কাজ পড়িয়া আছে। টেলি আসিয়াছে সবজজ নিকুঞ্জ চ্যাটার্জি এবার রায় সাহেব উপাধি পাইলেন। উৎসবের ভূমিকা স্বরূপ তাই একটা টি-পার্টি হইবে। সত্যভামা পুরাতন উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া রান্না-বান্নার যোগাড়-যন্ত্র করিতে চাহিতেছে। অথচ কাজ যে বেশি আগাইয়াছে তা নয়। ঘুরিতেছে বাড়ীময় ; অলস মন্থর পদক্ষেপে কোথাও একটু কর্ম-ব্যস্ততা জাগে নাই। নিকুঞ্জ চ্যাটার্জিই যখন উকিল হইতে মুন্সেফ হইয়া গেলেন, তখন ত আর এমন ছোটখাট টি-পার্টি নয়, দেড়শ' লোকের পাত পড়িয়াছিল—খাইয়া তারা তৃপ্তি পাইয়াছিল তারই কর্মকুশলতায়। বয়স? এখনও ত এমন অথর্ব হইয়া সে পড়ে নাই যে এই হ্রস্ব উৎসবের আয়োজন একা করিতে পারে না। আর একাও ত সে নয়, টুনী আছে--তাছাড়া হাতের পাঁচ আছে একটা ঠাকুর। তবু, তবু যেন সত্যভামার সম্মুখে কি একটা ফাঁক পড়িয়া গিয়াছে, তা উত্তীর্ণ হইবার সামর্থ্য তার নাই। হলঘরে ঢুকিয়া চেয়ারগুলিতে দুই একটা টানও সে দিল ; আলমারীর কাচগুলি ধূলায় ময়লা হইয়া আছে, কাপড়ের আঁচলটা সেগুলির উপর একবার বুলাইয়া আনিল, কিন্তু তার বেশি দূর নয় ; যেমন ঘরে ঢুকিয়াছিল, সন্তর্পণে তেমনি বাহির হইয়া আসিল। ওধারেই উমেশের ঘুমাইবার খুপরীটা। নিজের অজ্ঞাতেই সত্যভামা সেখানে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

উপরের তলা হইতে একটা সোরগোল উঠিল। সত্যভামার বুকে সে কি ধড়্‌ফড়ানি। মাণিক মন্টু যা হইয়াছে, কি জানি, স্টোভেই পুড়িয়া গেল না কি! একটা চীৎকার উন্মুখ করিয়া সত্যভামা উপরে আসিয়া উপস্থিত। ছোটখাট একটা জটলা। জটলার ভিতর হইতে ভীতু উৎসুক একজোড়া চোখ কা'কে যেন খুঁজিতেছে। উমেশ! উমেশ সত্যভামাকে দেখিতে পাইয়া একরকম আছাড় খাইয়াই তার পায়ের উপর আসিয়া পড়িল। একটা কান্নাই যেন ছিট্‌কাইয়া আসিল ; "তুমি বল, মা, ওদের, আমি চোর নই। আমি না কি চুরি কর্‌তে উপরে এসেছি মা।"

মৃণাল ভ্যাঙ্‌চাইয়া উঠিল : "না চুরি কর্‌তে আস্‌বেন কেন, হাওয়া খেতে উপরে এসেছেন! বুঝেছ দিদিমা, আমাদের পড়ার ঘরে ঢুকে দেখি, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে-- ভাগ্যিস আমি এসে পড়েছিলাম—"

টুনী শুষ্ক গলায় বলিল : "চুরি করবার মতলব ছিল আর কি! ওদিন মাকে বল্লাম—"

সত্যভামার পায়ের তলা হইতে একটা ভিজা শব্দ আসিল, "মাকে জিজ্ঞাসা কর দিদিমণি, তোমাকে খুঁজতে এসেছিলাম আমি, একটা ছেঁড়া কাপড়ের জন্যে—"

মাণিক নাক-মুখ সিঁটকাইয়া উঠিল : "হিঃ, তবে তুই আমাকে দেখে পালাচ্ছিলি কেন?"

টুনী সিঁড়ির মুখে অতুলকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। নিতান্ত উদাস এবং নিস্পৃহ কণ্ঠ হইতে কথাটা আসিল। "ওকে কি কর্‌তে হবে করে আয় অতুল।"

সত্যভামা তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ সিদ্ধান্তশীল কথাবার্তায় তপ্ত হইবার কথাই ত। উমেশ চোর, কেন না একদিন সে কদর্য পোশাকে তাদের বাড়ীতে ঢুকিয়াছে ; কেন না আজ তার উপরে উঠিবার সাহস পর্যন্ত হইয়াছে। যে-হেতু সে চোর হইতে পারিত, সে-

হেতু সে চোর। সত্যভামা উত্তেজনায় ফাটিয়া পড়িল : 'দিচ্ছি আমি আজই ওকে তাড়িয়ে। তোমাদের কাউকে আর চোর পাহারা দিতে হবে না। এই উমেশ, আজই তুই চলে যা— জেলখানায় পচ্‌তে ত আর সহরে আসিস্‌নি। না—না, আমার পা জড়িয়ে থাক্‌লে কি হবে— ওঠ্‌ শীগ্‌গির।"

উমেশ পা ছাড়িয়া উঠিল। ধারে কাছে কেউ নাই। যারা ছিল চলিয়া গিয়াছে যার যার কাজে।

সত্যভামা মুখ ফিরাইয়া বলিল : "হাঁ চলে যা—"

উমেশ আসিয়া সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়াছে, সত্যভামা ডাকিল, "দাঁড়া—" হাতে লাল-নীল রঙের একটা পুটুলির মত : "শীত আসছে সামনে ; নিয়ে যা কাঁথাটা! কীই বা কর্‌ব ওটা দিয়ে আর। গাঁয়ে ফিরে গেলে গায়ে দিস।"

সিঁড়িতে উমেশের পায়ের শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গেল। সত্যভামা তার সমস্ত ইন্দ্রিয় শ্রুতিমান করিয়া সেই শব্দ শুনিতে লাগিল—সেই শব্দ বাজিয়া চলিয়াছে আঁকা-বাঁকা খালের ধারে ধারে সাদামাটির সরু একটি পথ দিয়া—দেখিতে সব গাঁয়েরই মত একটি অখ্যাত গাঁয়ের ভিতর।

তপ্ত ঘিয়ের একটা উগ্র গন্ধের সহিত টুনীর কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল : "সব চপ পুড়ে গেল ছাই—মা তুমি আস্‌বে, না কি?"

সত্যভামা চপ না ভাজিলে পার্টিতে আজ একটা কেলেঙ্কারীই হইবে।

আশ্বিন ১৩৪০

নিশাস্বপ্ন

দেবেশচন্দ্র দাশ

প্রেমের মধ্যে আমি আর নেই।

অবশ্য আমি যে প্রেমে পড়েছিলাম তা নয়। অথবা আমার প্রেমে যে কেউ পড়েছিল তা-ও নয়।

যে নিশীথের কাহিনী এটা, সেটা প্রেমের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। একটি দুর্লভ দুর্বার রাত্রি। পূর্ণিমার আলো মনে হচ্ছিল যেন অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করবার জন্য আকাশ থেকে নেমে এসেছে। চিত্রাঙ্গদা বর চেয়েছিলেন যে তার এক বৎসর ছলনার শেষ রাত্রিটি যেন সব চেয়ে বেশী মাধুরী ও মাদকতা নিয়ে বসন্তের পুষ্পাভরণ দিয়ে তাকে সাজিয়ে দেয়। অর্জুনের হৃদয় যেন সম্পূর্ণরূপে শেষবারের জন্য তিনি হরণ করতে পারেন। আজ রাত্রিতে মনে হচ্ছে যে বহু আধুনিক অর্জুনের হৃদয় ভেনিসের চিত্রাঙ্গদারা—আহা, রুজ-লিপস্টিক পাউডারে চিত্রিত অঙ্গ তাদের—হেলায় হরণ করবে।

আমার হোটেলের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সারি সারি সাইপ্রেস গাছের আড়ালে আলোছায়ার মত মায়াজাল রচিত হয়েছে। ব্রুনোর ভাষায় শাদা ও কালোতে যে ছবি তৈরী হয় সে ছবিই সব চেয়ে সুন্দর, তার প্রমাণ দক্ষিণ ইটালীর সুন্দরীদের কালো আঁখি। শ্বেত মর্মর প্রস্তরে গঠিত মূর্তির মধ্যে ঘন কৃষ্ণ আঁখিই সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয়। সে বলে যে আমাদের দেশের কৃষ্ণকলিদের কালো কাজল চোখের সৌন্দর্য তেমন খেলে না তারা ইটালিয়ান মেয়েদের রং পায় নি বলে। ব্রুনো পৃথিবীর কোথায় যে না ঘুরেছে তার ঠিক নেই।

মোটকথা এই মায়াজাল আমার মনকে সামনের আলোয় উদ্ভাসিত পথে টেনে আনছিল ; ঘরে থাকতে দিচ্ছিল না। এমন চাঁদনী রাত্রি শুধু কবি, প্রেমিক ও পাগলদেরই পথে টেনে আনে। তা ছাড়া আর যাদের টেনে আনে তাদেরও এই তিন শ্রেণীর কোন না কোন শ্রেণীতে পরিণত করে দেয়।

এমন রাত্রিতে হোটেলের রেস্তোরাঁ ঘরে বসে সুসভ্য টুরিস্টের মত আদব কায়দা মাফিক গুণে গুণে ঠিক মত ছুরি কাঁটা চামচ চালিয়ে "অদ্য রজনীর ফরাসী স্পেশিয়ালিটী" নামক খাবারগুলির সদ্‌গতি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পথ আমায় ডেকেছে। উদ্যানপথে ঝাউকুঞ্জের পাশে পাশে মর্মরের প্রস্তরমূর্তিগুলিও আমায় ডেকেছে।

ওই পথ অবশ্য কাউকে রোমে নিয়ে যেতে পারবে না—যদিও ওদেশে একটা কথা আছে যে সব রাস্তাই রোমে নিয়ে যায়। দুধারে বাগান ও পুরানো ইতিহাসের গন্ধমাখানো বাড়ী ; তার মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে যেতে যেতে হাজির হলাম ভেনিসের জল পথে। এই "গ্রাণ্ড ক্যানালেই" এই পথের পরিসমাপ্তি এবং আমার গল্পেরও এখানে প্রারম্ভ।

সারাটা দিন আমার খুব সম্ভ্রান্তভাবে কেটেছে অর্থাৎ আমি যদিও সম্ভ্রান্ত নই, অতীতের সম্ভ্রান্ত নগরশ্রেষ্ঠ 'ডোজের' প্রাসাদের অতুলনীয় চিত্রগুলির সামনে আমার সারা দিন কেটে গেছে। আমার চারপাশে ত্বরিত গতিতে ঘোরা ফেরা করে গেছে কোটিপতি আমেরিকান টুরিস্টরা। তাদের যে একদিনের মাত্র মেয়াদ ভেনিসে। একমাসে ভূ-প্রদক্ষিণ করে যেতে হবে তাদেরকে। আবার বইয়ে লিখেছে যে "টু সি ভেনিস অ্যাণ্ড দেন ডাই"—অর্থাৎ

ভেনিস না দেখে মরলে সেটা আমেরিকান টুরিস্ট শাস্ত্র অনুসারে মরাই হবে না।

আমি কিন্তু মজে গেলাম ইটালীয়ান ছবিগুলির বর্ণসুষমাতে। এমন বর্ণমিশ্রণের সুষমা শুধু ছবিতেই নয়, ইটালীর অপরূপ আকাশে—ভেনিসের সাগরস্নানের সৈকতে—'লিডো'র স্বচ্ছ জলরাশিতে ও লীলাঞ্চল ইটালীয়ান আঁখিতে ছড়িয়ে পড়েছে ছবিগুলি ছাপিয়ে। তার রঙের পরশ প্রলেপ দিয়েছে আমার মনে। সেই রঙই আমায় হাতছানি দিয়ে পথে টেনে এনেছে আজ রাত্রিতে।

ভেনিসের সুসজ্জিত নৌকাগুলিকে গণ্ডোলা বলে। গাঙে দোলা খেতে খেতে ভেসে যায় বলেই বোধ হয় নাম হয়েছে গণ্ডোলা। ইঞ্জিনে-চালান গণ্ডোলায় আমি কোন দিন চড়তে পারলাম না, কারণ সোনার পাথর বাটীতে খেলে আমার তৃপ্তি হয় না। হাতে-বাওয়া ছোট আমার পানসী (ফ্যানসী-ও বলতে পারা যায়) তরীখানি বেয়ে 'রিয়াল্‌টো' সাঁকোর তলায় এসে নামলাম।

আমি টুরিস্ট হ'লেও ওই দলটাকে পছন্দ করি না। তাই ছোট্ট একটি পথপ্রান্তের রেস্তোরাঁয় খেতে ঢুকলাম। আমি যে বিদেশী, আমার বিদেশী মনকে স্বদেশী আবহাওয়ায় প্রকৃতরূপে ঢেলে দিতে চাই, তার সঠিক পরিচয় চাই। এ সব জায়গায় এলে খাঁটি ইটালীয়ানকে পাওয়া যাবে। সে আমার আমেরিকান টুরিস্টের উদ্ধত ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিয়ে নীরবে প্রশ্ন করবে না—"তুমি কে বট হে"?

ধীরে ধীরে খেতে খেতে চোখ প্রায় বুজে এসেছিল। কারণ মন খুলে গিয়েছিল একটি ভিক্ষুক-শিল্পীর 'ম্যাণ্ডোলিন' বাজনাতে। সে খুব পুরানো একটি দক্ষিণী সুর বাজাচ্ছিল। সে সুর যেন আমার সারা দিন ও সারা সন্ধ্যার ঘটনাগুলিকে চিত্ররূপ দিয়ে যাচ্ছিল, আমার মনে ওলট পালট লেগে গেল। সে সার্থকতা এই সব সাধারণ ইটালীয়ানের জীবনে নেই ; যে অস্তিত্বের কথা এরা ভাবে না, স্বপ্নেও সেই গৌরবে এদের মহিমান্বিত মনে হতে লাগল। চোখ বুজে বেঁচে থাকার আরাম উপভোগ করছি এমন সময়ে খুব মৃদু একটা শব্দে চোখ মেলে দেখলাম—সামনে এসে বসেছে একটি প্রৌঢ় ইটালীয়ান। চোখে সহানুভূতি, মুখে প্রসন্নতা ও সর্বাঙ্গে গতযৌবন এক সুপুরুষের কমনীয়তার অস্তমান আভাস!

"সিনর, ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমায় বন্ধুভাবে নিয়ে আমার দোষ মার্জনা করবেন। আমার মনে হচ্ছে আপনি বোধ হয় কিছু ভাবছেন। কারো কথা বোধ হয় ভাবছেন।"

এ লোকটি বলে কি? বড় অপ্রস্তুত বোধ করলাম। সত্যিই ত সাধারণ সস্তা একটা রেস্তোরাঁয় বসে খেতে খেতে চোখ বুজে এলে লোকে কি ভাবতে পারে? মুখে একটু অপ্রস্তুত হাসি ফুটে উঠল।

ভদ্রলোক বললেন—"ঠিকই বুঝেছি, সিনর, আপনি কারো কথা ভাবছেন। এমন রাতে সেটা খুবই স্বাভাবিক।" সহানুভূতিতে তার স্বর একটু আর্দ্র, চোখ একটু কোমল হয়ে এল। তিনি বললেন—"আপনি যার কথা ভাবছেন তিনিও নিশ্চয়ই আপনার কথা এখন এই মুহূর্তেই ভাবছেন।" কি সর্বনাশ! অর্থাৎ এ বলতে চায় যে আমি প্রেমে পড়েছি! অবশ্য আমার মাথার চুল একটু অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে তরুণ কবিদের মত সারা দিন ঘোরাঘুরির পরে ; ভেনিসের আকাশের ও 'লিডো'র সুনীল রঙের আঁকাবাঁকা খেলার সঙ্গে 'ম্যাচ' করে অর্থাৎ সামঞ্জস্যরেখে একটা টাই আমার গলায় পরা রয়েছে। কিন্তু তাতেই কি প্রেমে পড়ার কোন নিশানা পাওয়া যায়? বিব্রত হয়ে আবার একটু হাসলাম। সামনের প্লেটটাতে পরম সুখাদ্য 'এস্কালপ' (অনেকটা কাটলেট গোছের) ও ম্যাকারোনি য়্যাল পোমাদোরো (টোমাটো রসে মাখান ম্যাকারোনি) এখনো বাকী রয়েছে। আনমনে প্লেটটা একটু সরিয়ে রাখলাম।

ভদ্রলোক বোধহয় এতে একটু সমর্থন বোধ করলেন। চেয়ারটা একটু কাছে টেনে নীচু

স্বরে বললেন—"আমি দুঃখিত যে আপনার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলাম ; কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি ভেবেছিলাম যে আমি একজন সমব্যথীর সন্ধান পেয়েছি। কেন এমন মনে হল জানি না, কিন্তু জানেন তো একই কথা যারা ভাবে তারা পরস্পরকে চিনতে পারে। অবশ্য আপনার স্বপ্ন গড়ে উঠছে, আর আমার স্বপ্ন ভেঙে গেছে। আজই, এইখানে, এই রেস্তোরাঁতে।

আমি অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম। আমি ত কোন স্বপ্ন এখনো দেখতে সুরু করি নি। অবশ্য যদি করতাম, আমার বাইশ বছর বয়সকে দোষ দেওয়া যেত না। কিন্তু এঁর অনুমানকে ভেঙ্গে লাভ নেই। এঁর জীবনে যা ভেঙ্গেছে আমার সম্বন্ধে একটা কল্পিত অনুমান তার তুলনায় অতি সামান্য। তাই আমার মন কোমল হয়ে এল ; গাঢ় কণ্ঠে বললাম—ভেঙ্গে গেল? আপনার আশা-স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল? আহা—

ভাবাবেগে আর কিছুই বলতে পারলাম না। শুধু আমার নীরবতাকে অতিক্রম করে চোখ সপ্রশ্ন হয়ে উঠল।

ভ—সত্যি। কেন যে, দেশে ফিরে এলাম এত বছর পরে আমি জানি না। আর দেশের চেনা লোকদের মধ্যে আমার আর ফিরে আসা যেন জানাজানি না হয়ে যায়, তাই আমি শীঘ্রই আবার চলে যাব।

আ—বিদেশে চলে যাবেন? বিদেশে? আবার প্রবাসী হবেন? কথাটা জিজ্ঞাসা করেই মনে পড়ে গেল যে তিন বছর ধরে আমিও প্রবাসী।

ভ—কেন হব না? দেশে আমার রইল কি? যাকে নিয়ে আমার দেশ, আমার দেশের স্বপ্ন, সে ত আর সে নেই। শুধু আমিই একা সে-ই আছি।

এই রেস্তোরাঁতে তার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে বলেছিলেন তাই একবার ঘরটার চারদিকে চকিতে চোখ বুলিয়ে নিলাম। শুধু একটি নারী আছে সেখানে ; এই রেস্তোরাঁরই মালিক, সদ্য অতিক্রান্তযৌবনা, কিন্তু সুন্দরী যে ছিল এককালে তা সহজেই বোঝা যায়। অবশ্য ইটালীতে কেই বা সুন্দর নয়, এ প্রশ্ন একবার মনে যে না উঠল তা নয়।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রৌঢ়ও চারদিকে তাকিয়ে যাচ্ছিলেন ; তাঁরও দৃষ্টির গতি ওই নারীতে এসে সমাপ্ত হল ; আঁখির ভুরু দুটি প্রচ্ছন্ন একটু হাসির আভাস দিয়ে রামধনুর মত বেঁকে খেলে গেল। তিনিও মৃদু ভ্রূভঙ্গী করলেন। দুজনে যে পরিচিত তা বুঝতে পারা গেল সহজেই। ভাবলাম হায়, কত নিকটে এরা, অথচ কত দূরে।

ভ—জান বন্ধু—ওই হচ্ছে আমার অতীত প্রিয়া, যে অতীত আমার কাছে এই আজ পর্যন্ত বর্তমান ছিল সত্য হ'য়ে। আমার আর এখানে মন টিকছে না, চল আমরা বাইরে কোথাও চলে যাই।

আবার সেই নারীর দিকে তাকালাম। তার অধরে—যে অধর এই ভদ্রলোকের জন্য ধরাতে স্বর্গ রচনা করেছিল সে অধরের প্রান্তে একটু হাসি লেগে আছে। আমরা দুজনে বাইরে চলে এলাম। গণ্ডোলা ঘাটেই বাঁধা ছিল।

ততক্ষণে 'সান মার্কো' গির্জার সুন্দর চত্বর খালি হয়ে গেছে। কিন্তু ভরে আছে সে জায়গাটা জ্যোৎস্নায়, প্রায় সমুদ্রের মত বিপুল জলরাশিতে সে জ্যোৎস্না পুলকে কুটি কুটি হয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। জলের ধারে এসে দুজনে বসলাম।

ব্রুনো বলে যেতে লাগল তার কাহিনী। আমরা ততক্ষণে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে এসে পৌঁছেছি। সে বলে যেতে লাগল—এক দরিদ্র প্রেমিকের অবস্থাপন্ন রাজপুরুষের কন্যার সঙ্গে ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনী।

ব্রু—ক্লারেট্টা ফরাসী 'ক্লারেট' সুরার মতই আমার সমস্ত অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। যে দ্রাক্ষাগুচ্ছ থেকে ক্লারেট নিষ্কাষণ করা হয় সে গুচ্ছ গুচ্ছ দ্রাক্ষার মত কোঁকড়ানো অলকগুচ্ছ ঘিরে থাকত তার মুখখানাকে। সে মুখ সুধা আঙুরের মত নিঙড়িয়ে

নিঙড়িয়ে পান করতে ইচ্ছা হত, কিন্তু আমরা হচ্ছি রোম্যান ক্যাথলিক।

আ—তাতে লোকসান কি? সে দ্রাক্ষারসে পরাণ ত তোমার ছিল "অরুণ বরণী" ; পানই যে করতে হবে তার কি কোন মানে আছে?

ব্রু—নেই? তুমি বলছ নেই? তোমার বয়স কত?

আমি তার বাহুতে মৃদু একটু টোকা দিয়ে হেসে বললাম—সে কথা থাক ; তার পর বল?

ব্রু—তার পর? আমি ক্লারেট্টাকে নাম দিয়েছিলাম 'তাজ'। তোমাদের দেশে যে শ্বেত পাথরের তাজমহল আছে তার মত শুভ্র সুন্দর ছিল সে।

আ—আমার ত মনে হয় যে জীবন্ত তাজ প্রস্তরীভূত তাজের চেয়ে বেশীই সুন্দর ছিল তোমার কাছে।

ব্রু। ঠিক বলেছ। এই দেখ না আজো ক্লারেট্টার সেই শুভ্র বর্ণ আছে কিন্তু সৌন্দর্য নেই। আজ সে প্রস্তরীভূতা ; শুধু প্রস্তর। কিন্তু প্রাণ পেলাম না তাতে।

আ। কেন? সে কি তোমায় আর ভালবাসে না?

ব্রু। সে কথা আজ গৌণ। যদি সে আজো ভালবাসতে চায় তাতেই বা কি হবে?

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। 'জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার' অক্ষয় প্রেমের কথা শুনে এসেছি কাব্যে ; অনন্ত অতীন্দ্রিয় প্রেমের কথা লেখে উপন্যাসে। আর বাস্তব জীবনে যে লোকটী একটী চম্পকাঙ্গুলীর ধাক্কা খেয়ে যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত প্রবাসী হয়ে ফিরে এল সে এ কি কথা বলছে? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম।

ব্রু। জান, আমার যখন তোমার মত বয়স ছিল তখন তাজের জন্য কি কাজই না করতে পারতাম? আমার অর্থের অভাবকে পূর্ণ করবার চেষ্টা করেছি অর্থহীন প্রেমগুঞ্জন দিয়ে, সঙ্গ দিয়ে, সেবা দিয়ে। উপহারের অভাবকে লঘু করে দিতে চেষ্টা করেছি পুষ্প হারে সাজিয়ে। গণ্ডোলায় চড়িয়ে তাকে নৌকা বিহারে নিয়ে গিয়েছি। সে আমার হ'তে রাজী ছিল কিন্তু তাকে আমি পাই নি।

আ। কেন? তুমি ইংরেজীতে যাকে বলে 'সিনিক' তাই হয়ে গিয়েছিলে?

ব্রু। না, ভেনেসি 'সিনিক' হওয়া সহজ বা স্বাভাবিক নয়। আঙুর ফল টক হলে লোকে সিনিক সাজে, কিন্তু প্রেম বৃক্ষের ওই ফলটি নাটকীয় ভঙ্গিতে কবে এসে মুখে ঝুপ করে পড়বে তার প্রতীক্ষায় নৃত্যকলা নটীর মত মন তাদের ঘুঙুর পরে ঘুর ঘুর করে নেচে বেড়ায় সেই বৃক্ষতলে।

আ। সে কথা আমি অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের সহপাঠীরা কলেজে অনেকেই প্রেমের কবিতা পড়ে সিনিক হয়ে উঠেছে এবং সে ভাবটা তাদের কারো যাবে না প্রেমে সত্যি না পড়া পর্যন্ত।

ব্রু। সাবাস, বন্ধু। তোমার বিশ্লেষণ খুব ঠিক হয়েছে। কাজেই দেখ আমি সিনিক হ'তে যাব কেন? আর তা-ই যদি হব, তবে আমার এ ফ্যাঁসাদ কেনই বা হবে?

আ। কিন্তু কার দোষে এমন হল?

ব্রু। দোষ কারো ছিল না। দোষ যদি কারো থাকে তবে আমাদের দেশের সুনীল নির্মল আকাশের—যার ওই রকম সুন্দর রঙ হয়েছে আমাদের তরুণীদের চোখের রঙের প্রলেপ পেয়ে। দোষ এই ভেনিসের জলরাশির যারা আঁকা বাঁকা খালগুলির মধ্যে সারাদিন সারারাত্রি প্রত্যেক রূপসীর বাতায়ন তলে গান করে খেলে বেড়ায়। জান, ভেনিসের জলের এই লীলা চঞ্চলতা হচ্ছে ইটালীয়ান মেয়েদের হৃদয়মাধুরীর সজল সংস্করণ।

ব্রুনোর বর্ণনার ব্যঞ্জনা আমায় প্রায় দিশেহারা করে ফেলেছিল। বুঝতে পারছিলাম যে প্রেমে পড়লে মানুষ এমনভাবেই প্রলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে নিজেকে। আর পৃথিবীর

সব শ্রেষ্ঠ প্রেমের গীতিকাই ত প্রলাপ ও বিলাপের সংগীতের সংলাপ। অবশ্য ব্রুনোর অনেক কথা ও অনেক উপমা ব্যাকরণ-বিলাসী বা সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষকদের মতে সুবোধ বা সুশ্লীল হবে না ; কিন্তু সে এ সম্বন্ধে উদাসীন। জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয় বলে উঠবে যে তার জন্য দোষ দাও ওই ভেনিসের বারি রাশিতে ভাসমান বসন্ত মত্ততাকে, আমাকে নয়।

আ। তার পর?

ব্রু। তার পরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত—যদিও দীর্ঘ জীবন যে কি ভাবেই কাটিয়েছি। ক্লারেট্টার বাবা একদিন এইখানে এই রকম চাঁদের আলোর মধ্যে আমাদের আবিষ্কার করলেন। আমি তখন দাঁড়ের ছপছপ শব্দের সঙ্গে তাল রাখতে রাখতে গেয়ে ওকে নিয়ে গণ্ডোলায় চলেছি ; ওর বাবা ফিরছিলেন আর একটা গণ্ডোলায় ; আমার দাঁড়ের ধাক্কায় তাঁর নৌকা ওল্টাবার যোগাড় হয়ে গিয়েছিল। সামলিয়ে নিয়ে তিনি দেখতে পেলেন আমাদের দুজনকে। তার পরের কথা বুঝে নিতে তোমার কষ্ট হবে না।

আ। তুমি কেন তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থনা করলে না যৌবনের দাবীতে, প্রেমের দাবীতে, ক্লারেট্টার দাবীতে?

ব্রু। তার পথ কি ছিল, বন্ধু? তার সামনেই ত বড়লোক বাবা আমার অক্ষমতাকে ব্যঙ্গ করে বললেন—আগে স্বর্ণখানি আবিষ্কার করে এস, তারপর আমার সোণামণির কথা ভেবো। আমিও সেই শপথ করে হাতের দাঁড় জলে ভাসিয়ে দিয়ে, ভাসমান পানসীতেই ক্লারেট্টাকে রেখে সাঁতরিয়ে ক্যানাল পার হয়ে প্রবাসী হয়ে গেলাম।

তার পরের কাহিনী ব্রুনো নিজে থেকেই বলে যেতে লাগল। কত দেশে সে ভাগ্যান্বেষণ করে বেড়িয়েছে তার হিসাব নেই। ভারতবর্ষেও সে এসেছিল তাজ দেখবার জন্য ; তাজের সমাধি পার্শ্বে অশ্রুময় যে ইয়োরোপীয় মূর্তি নিত্য দেখা যেত বলে গাইডরা বলে—সে মূর্তি হচ্ছে ব্রুনোর। তার পর মালয়ের জঙ্গলের রবারের ব্যবসায় ফাটকায় বড়লোক হয়ে সে মাত্র দেশে ফিরে এসেছে। আজ সকালেই সে তার তাজকে খুঁজে বের করেছে এই সামান্য 'রিস্তোরান্তির' মালিকের মধ্যে। ক্লারেট্টার বাবা মারা যাবার পর দেখা গেল যে টাকাকড়ি কিছুই বিশেষ রেখে যান নি। তার ধনী পাণিপ্রার্থীরা সরে গেল শূন্য মধুভাণ্ড দেখে। অভিমানে সে নিজে উপার্জনের চেষ্টায় লেগে গেল ; বিয়ে করা তার আর হল না।

প্রায় অশোভন একটা উল্লাসে বলে উঠলাম—বেশ ত, এখন ত তুমি তোমার তাজে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করতে পার।

মলিন একটু হাসি হেসে সে বলল—সেইখানেই ত হ'ল আমার পরাজয়।

বুঝতে পারলাম না। দূরে গণ্ডোলায় মাঝিটা নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত কম্পমান ছোট তরীটির উপর ত্রিভঙ্গিম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রুনোর কাহিনী সন্ধ্যা-তারার মত আমার মনের আকাশে জ্বল জ্বল করে বিরাজ করছে ; কি যে তার শেষ বক্তব্য তা আমি বুঝে উঠতে পারলাম না।

আ। সে যখন অবিবাহিতা পিতা যখন নেই পথে বাধা দিতে, তুমি যখন ধনী হয়ে ফিরে এসেছ, তখন তোমার জয়ের মুহূর্ত ত সামনেই অপেক্ষা করছে।

ব্রু। তুমি তা বুঝবে না বন্ধু, তোমার বয়স অল্প ; তুমি এখনো রচনা করতে পার। আমি আর পারি না।

আ। অর্থাৎ?

ব্রু। অর্থাৎ আমি সেই আমিই আছি, সেই মন, সেই অন্বেষণ, সেই আশা আকাঙ্ক্ষা। এই পঁচিশ বছর আমি যাকে মনে মনে বসন্তপুষ্পাভরণা তরুণী রূপেই শুধু কল্পনা করে এসেছি সে যে আমার মনের সীমা ছাড়িয়ে কৈশোর ও যৌবন পার হয়ে প্রৌঢ়া হয়ে গেছে

তা আমি কখনো ভাবি নি। আজ সকালে যে প্রতিমা দেখব বলে ছুটে এসেছিলাম শুধু তার প্রেতাত্মাকে পেলাম। হায়! এর জন্য ত আমি সোনার খনি সন্ধান করে বেড়াই নি।

আ। কিন্তু তুমি নিজেও ত আর বিশের কোঠায় নেই ; তুমি ও ক্লারেট্রা দুজনেই কবে যৌবন পার হয়ে এসেছ। তা ছাড়া সেও ত ভাবতে পারে যে ব্রুনো ত আর তরুণ নেই।

ব্রু। সে ঠিক তা ভাববে না। সে ত আমার জন্য সব কিছু ছেড়ে মনের দ্বার রুদ্ধ করে পরিবর্তনের স্রোতের গতি প্রতিরোধ করে বসে ছিল না। তার স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে সে গড়ে উঠেছে। আমার ত সে অবস্থা ছিল না।

আ। তুমি কি আয়নাতেও কখনো নিজের বয়স বেড়ে যাওয়া লক্ষ্য কর নি? অনুভব কর নি তুমি আপনার অজ্ঞাতসারে বদলিয়ে যাচ্ছ ক্রমে ক্রমে?

ব্রু। তা কখনো করি নি ; যদি করতাম তাহলে হয়ত এমন করে ছুটে আসতাম না। যদি বা আসতাম নির্বিচারে অকুণ্ঠিতচিত্তে যাকে পাচ্ছি তাকেই গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়ে উঠতাম।

আ। আশ্চর্য! তুমি কি সত্যিই তাকে ভালবাসতে?

ব্রু। ভাল—বাসতাম না? ভালবাসতাম না? তাহলে এতদিন কাকে নিয়ে দিন কাটিয়েছি, দুঃখ দৈন্য হতচ্ছাড়া জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি? কার স্বপ্ন মনে আলো জ্বেলে ছিল তাহলে? কার মূর্তি চোখের মণিতে আসন নিয়েছিল?

আ। ঠিক সে-ই ত আছে। তুমি আর সে দুজনেই যেটুকু বদলিয়েছ তা শুধু প্রকৃতির জৈব পরিবর্তন। তাকে তুমি স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে পারছ না কেন?

ব্রু। যে জিনিষ তর্কের বাইরে তাকে দিয়ে হারাতে পার, কিন্তু গড়তে পার না। সেদিন যে দ্রাক্ষাগুচ্ছ রসে শোভায় আমার রসনা সিক্ত করে তুলত, সেই গুচ্ছ এতদিন পরে শুধু গুচ্ছ বলেই কি আকর্ষণ করতে পারবে? কোথায় তার স্বাদ, তার সুরাসার? তুমি বইপড়া বালক, তাই বুঝছ না যে আমি পঁচিশ বছর বয়সে এসে ঠেকে রয়েছি এবং সে জন্যই আজ ঠকে গিয়েছি। বিদেশে ছিলাম যতদিন ঠিক ছিলাম ; বেহিসাবী হয়ে দেশে এসে বেঠিক কাজ করে ফেলেছি।

এর পর আর কথা চলে না। চুপ করে বসে রইলাম। কতক্ষণ তার হিসেব নেই। শুধু চাঁদ মাথার উপর দিয়ে উঠে অন্যদিকে হেলে যেতে লাগল। জ্যোৎস্নার বান আশেপাশে জলরাশিতে নূতন নূতন আলপনা কাটতে লাগল, আর যে চত্বরে বসে অতীতে বিখ্যাত প্রেমিক ক্যাসানোভা তার অসংখ্য প্রণয়িনীদের প্রেমপত্র লিখত এবং তার চারদিকে ধান্যলোভী পায়রার দল অশ্রান্ত কলগুঞ্জনে অলস দ্বিপ্রহরগুলিকে চঞ্চল করে তুলত—সেই চত্বরে এক পাশে জলের ধারে আমি বেদনায় বিবশ হয়ে বসে রইলাম।

ধীরে ধীরে ব্রুনোর মতটার জন্য একটা ব্যথাভরা করুণতা অনুভব করতে লাগলাম। সত্যই ত। জীবনের ঊষায় যে অধরোষ্ঠ রক্তগোলাপের পাপড়ীর মত সরস লোভন ছিল, মধ্যাহ্নতাপের পর অপরাহ্নের রৌদ্রপীড়িত সে পাপড়ীতে যে ঊষারই স্বপ্ন দেখে চলেছে সে এখনো সার্থকতা খুঁজে পাবে কি করে? হায়! প্রেমিকপ্রেমিকারা সময়সাগরতীরে বসে বালুসৌধ গড়তে ভালবাসে, কিন্তু সে সাগর ত সেদিনের জলরাশিকে সেইখানেই রেখে যায় না। ইহলোকে কারো প্রেমের অপেক্ষা করবার অবসর নেই। আজ হচ্ছে সত্য, বর্তমান সত্য ; আগামী কালই সে হয়ে যাবে অতীত ও মিথ্যা। কবি গেয়ে গেছেন অনন্ত প্রেমের মহিমা, কিন্তু মানুষ চেয়ে যায় আজকের সান্ত প্রেমের সুষমা। দ্বিতীয়টি প্রথমটির চেয়ে বিন্দুমাত্র কম সত্য নয়।

হঠাৎ পাশে তাকিয়ে দেখি ব্রুনো নেই। অধীর হৃদয়ভার লাঘব করে কখন বোধ হয় সে অলক্ষিতে উঠে গেছে। অন্তরকে খুলে দেখানর সংকোচে সে বোধ হয় আর আমার চিন্তাধারাকে ব্যাহত করতে চায় নি। এ কথা ভেবে একটু সান্ত্বনা পেলাম যে সহানুভূতির

মায়াকাঠিতে এক জনের মনের দুয়ার খুলতে পেরেছিলাম। এই প্রৌঢ়েরই মত কতজন নীড় বাঁধবার সাধ ত্যাগ করে প্রিয় গৃহ ও প্রিয়া সান্নিধ্য ত্যাগ করে চলে গেছে দক্ষিণ আমেরিকার প্রান্তরে বা আফ্রিকার দগ্ধ ঊষর অরণ্যানীর মধ্যে। তারপর কতজনেরই যৌবন-স্বপ্ন হয়ত এরই মত করুণভাবে সমাপ্ত হয়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস আপনার অজ্ঞাতসারেই বের হয়ে এল। ভেনিসের জলরাশি সে নিঃশ্বাসে দুলে উঠল। সমগ্র মধুরজনী সে দীর্ঘশ্বাসে সাড়া দিবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

পরদিন সকালে উঠেই সেই কথাগুলি আবার হৃদয় মথিত করে উঠতে লাগল। ব্রুনোর মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি ভুল। এ ভুলের জন্য তার অবশিষ্ট জীবন সার্থকতা থেকে বঞ্চিত হবে ; ক্লারেট্টাও কম কষ্ট পাবে না। বৃথাই আমি শেলী রবীন্দ্রনাথ পড়েছি, যদি তার এই ভুলটা তাকে না বুঝিয়ে দিতে পারি। তাকে এখনই খুঁজে বের করতে হবে। জ্যোৎস্নার আলোকে লোকে অবাস্তব ও সেন্টিমেণ্টাল হয়ে ওঠে একটু বেশী করেই, দিনের আলোয় বাস্তব দৃষ্টিপথ বের করে নিতে পারে। তাই তাকে আজ সকালেই বোঝাতে হবে তার ভুলের কথা।

ভুল, নিশ্চয়ই ভুল। আমায় সে বাইশবছরের বই-পড়া বালক বলে মনে করে, কিন্তু সে জানে না বইয়ে কত সময় সত্যের আলো দেখতে পাওয়া যায়। কোনরকমে প্রাতরাশ শেষ করে ছুটলাম খালের পারে? এবারে আর সোনার পাথরবাটী ইঞ্জিনে চালান নৌকায় কোন আপত্তি বোধ করলাম না। রিয়াল্টো সেতুর পাশে সেই রেস্তোরাঁয় গিয়ে ব্রুণোর ঠিকানাটা তাড়াতাড়ি বের করতে হবে। কি জানি যদি সে এতক্ষণে আবার দূরদেশে পাড়ি দিয়ে থাকে। বলা যায় না।

রিয়াল্টোর ঘাটে নেমে ক্লারেট্টার রেস্তোরাঁয় যেতে একটু ইতস্তত বোধ করলাম। ওকে কি করে জিজ্ঞেস করব ব্রুনোর কথা? কি না জানি ভাববে। অথবা হয়ত লজ্জা পাবে। বুঝতে কি আর পারবে না সে আমিও তাদের কাহিনী একটা মোহিনী রাতের মায়ার সুযোগ নিয়ে জেনে ফেলেছি?

সন্তর্পণে ঘাটের পাশে একটা ছোট কেক বিস্কুটের দোকানে জিজ্ঞেস করলাম—জান কি ওই রেস্তোরাঁয় যে প্রৌঢ় ভদ্রলোক ব্রুনো কাল এসেছিল সে কোথায় থাকে? যে ব্রুনো মাত্র কাল বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে এখানে, সেই ব্রুনো?

দোকানী অবাক্ হয়ে গেল। বলল—ব্রুনো ত মশায়, এখানে একজনই আসে, ওই রেস্তোরাঁয় বুড়ীর সঙ্গে খুব ভাব ; রোজই আসে আর যা জুয়ো খেলতে পারে মশায়। যেমন জুয়ো খেলে, তেমনই 'কিয়াস্তি' খায়। ওস্তাদ, পাঁড় ওস্তাদ। এ কথা বলেই খাস ইটালীয় নটবর ভঙ্গিতে দুই ঠোঁটের মাঝখানে জিভ রেখে রসিকতাসূচক একটা শব্দ করল।

আমি একটু অধীর হয়ে বললাম—না, না সে নয়। যে কালই মাত্র বিদেশ থেকে ফিরেছে তার কথা বলছি।

দোকানী বলল—ও তো একই লোক, সিনর। যদিও পড়ুয়া লোক, পেটে ভাল ভাবে 'কিয়াস্তি' পড়লে সে অনেক দেশই ঘুরে আসে। কাল বুঝি সে আপনার খরচায় খেয়েছিল?

সত্যিই ত। কাল ত তার কাহিনী শুনবার প্রলোভনে তাড়াতাড়িতে তার বিলটা আমিই মিটিয়ে দিয়েছিলাম। আর কিছু শুনতে ভাল লাগল না। ধীরে ধীরে সরে গেলাম।

আস্তে আস্তে সূর্যের তাপ প্রখর হয়ে উঠতে লাগল। কিছুই ভাল লাগছে না। এলোমেলো মন নিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। শেষে ক্লান্ত হয়ে লিডোর সমুদ্র স্নানের সৈকত ছাড়িয়ে একটা উদ্যানকুঞ্জে এসে ঝাউ গাছের ছায়ায় বসলাম। নীল আকাশ, নীল জল, মনে বেদনার নীল আভাস। সিক্ত সমীরণ ধীরে ধীরে আমার মানসিক ও দৈহিক অবসাদ মুছে দিতে লাগল। ক্রমে নিজেকে আবার গড়ে নিলাম।

সেই গড়ে নেবার ক্ষমতাটাই সত্য বলে মনে হল। ব্রুনো আমায় ঠকিয়েছে ; ভেনিসের পূর্ণিমা রজনীর বিহ্বলতা আমায় ঠকিয়েছে। কিন্তু, কিন্তু হোক্ সে প্রবঞ্চনা। না হয় লোকে মনে করুক যে অনভিজ্ঞের উপর বারুণীর প্রভাবেই এমন একটা বোকামী সম্ভব হয়েছিল। বিজ্ঞ ও কাজের লোকরা অনুকম্পা করে একটু মৃদু হেসে আমার কালকের রাত্রিটিকে সম্মান দেবেন। বিদেশে বেড়াতে গিয়ে যে ব্যিডেকারের ভ্রমণ গ্রন্থে লেখা 'প্রাসাদের রাজপুত্রী' বা 'দুর্গম দুর্গের অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ' প্রভৃতি ছাড়া অন্য কোন কাহিনী বিশ্বাস করে লোকে তাকে বোকাই বলবে। ও সব কাজ ভদ্রোচিত অর্থাৎ "রেস্‌পেক্‌টেবল" নয়।

না হোক্। তবু আমি সেই গল্পে এখনো বিশ্বাস করি। না করে উপায় কি? ব্রুনো ও তার তাজের প্রেম কাহিনী শুনে রাত্রিতে ঘুম আসছিল না মোটেই। অধীরভাবে পাইচারী করতে করতে আমি একটা কবিতাও লিখে ফেলেছিলাম ব্রুনোর তাজকে উপহার দিব বলে।

ধরণীর ধূলি প্রেম
মরণের দিল অমরতা
নিরুপায় নিরজনে
রাখি গেল তোমার বারতা ;
মর্মরের মর্ম মাঝে
দিয়ে গেনু জোছ্না আখরে
অনন্ত কালের পাতে
সান্ত মোর জীবন স্বাক্ষরে।

সে কবিতার পিছনে যে অনুভব ছিল তা ত মিথ্যা নয়।

সে গল্পে বিশ্বাস না করে উপায় কি? ভেনিসে যে মদির চাঁদিনী রাতে সুনীল জলরাশি এখনো গণ্ডোলার আশে পাশে মায়া জাল বুনতে বুনতে চলে। সে সব স্মৃতি সব সময় মনে আসবে না। যদি বা আসে, দিবাস্বপ্নের মত অলীক বলে তাদের মনে হবে। প্রেমকে যে সর্বথা পরিহার করে চলা উচিত সে কথা বহুবার নিজেকে বুঝিয়ে দিয়েছি। হয়ত আর কখনো কোন বিমুগ্ধ নিশীথে চোখে স্বপ্নের অঞ্জন ও হৃদয়ে সহানুভূতির করুণতা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে ভাবতে বসব না। কাজের ভিড় ঠেলে কোন প্রেমকাহিনী অস্ফুট আবেদন মনের গহন ভরে উঠবে না। সম্ভবত ভেনিসের [illegible]গুলি শুধু স্বপ্নই। কিন্তু সে রাত্রিটি ত স্বপ্ন নয়।

অগ্রহায়ণ ১৩৫৪

রেশ

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

হাসছে সকলে।

খুশিতে ডগমগ হ'য়ে হাসছে বন্ধুবান্ধব-আত্মীয় স্বজন। ওদের হাসির বৈঠকে যোগদান করতে পারছে না দীননাথ। হাসি দেখলে চাপাকান্না বুকের ভেতর উঠছে।...

একসময় হাসির খোঁজে অস্থির হয়ে পড়েছিল দীননাথ। নিজের মনের কোণে খুঁজতো। পথযাত্রী খদ্দের পরিবারবর্গের চোখেমুখে অনুসন্ধানীদৃষ্টি ফেরাতো কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

এতো তল্লাসেও, হাসিপাগল দীননাথ, তার আকাঙ্ক্ষিত হাসি দেখতে পায়নি কারো চোখেমুখে।

দোকানে খদ্দের এসেছে। প্রতিমা কিনতে। ছেলে অমরনাথ আর্টস্কুলে পড়া শিল্পী—দেখাচ্ছে বোঝাচ্ছে জ্যামিতির ছকমাপা নিয়ম-কানুনে তৈরী প্রতিমা।—পিরামিডিক্যাল—ত্রিকোণের মধ্যে, চারকোণার কিউবিক্যাল, স্তম্ভপ্যাটার্নের সিলিন্ড্রিক্যাল, গোলের ভেতর স্ফিঅ্যারিক্যাল।

খদ্দেরদের ঠোঁটের কোণে প্রশংসার হাসি ফুটে উঠছে। পুত্রের গালে খাঁজ পড়ছে গৌরবের হাসিতে। দেখলে খানিকক্ষণ সেকেলে বৃদ্ধ দীননাথ চেয়ে চেয়ে। মন ভরল না। মনে হল, ধনীর ধন্যবাদ আর গৌরব-গরবের মিতালী ঘটছে জ্যামিতির মাপেরই মতো—এ যেন যান্ত্রিক হাসি।

হাসির কলরোল শুনতে পেল রাস্তায় সেদিন। দোকান থেকে বেরিয়ে এলো ত্বরিৎগতিতে দীননাথ। যতো সবার মুখ দেখছে, ততো বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাচ্ছে।—শবযাত্রীদের হাসির লহর। বোধহয় বৃদ্ধ মরায় বিষয় পেল এরা সব, তাই উত্তরাধিকারীর উল্লাস এদের হাসির রবে। বৃদ্ধশবের খাটশুদ্ধ নিয়ে নাচানাচি করে চলার বহর এতো!

দোকানের লাগোয়া চালাঘরের ভেতর যখুনি গেছে, তখুনি দেখেছে, স্ত্রী-পুত্রবধূ-নাতিনাতনী যেন এক একটি বিষাদখিন্ন প্রতিমা। অভাব-অনটনের নিষ্পেষণে নিস্তেজ। হাসির ফোয়ারা শুকিয়ে গেছে একেবারে। বিফল হয়ে ফিরে এসে, ভারায় উঠেছে আবার দীননাথ। আবার রঙেভরা মাটির সরায় তুলি ডুবিয়েছে। দুর্গাপ্রতিমার মুখে বুলিয়েছে। চোখ-ঠোঁটে রঙের যাদুতে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করেছে। পারে নি। হাসির জায়গায় কান্নাই এনে ফেলেছে যেন প্রতিবারে। বার বার প্রতিমার মুখ-চোখ-ঠোঁটের রঙ তুলে ফেলতে হয়েছে তাকে এই একই কারণে। তার হাতের মূর্তি জীবন্ত হয়ে ওঠে তুলির ছোঁয়ায়। স্বর্গীয় হাসি হেসে ওঠে। বনেদি-ঘরের বৃদ্ধেরা এখনো বলে সে কথা। তাই এই বয়সে ষাটের কোঠা পেরিয়েও—অসমর্থ দেহ নিয়ে ঠাকুর গড়তে হয়। ছেলের গড়ামূর্তি পছন্দ হয় না বাবুদের। তার গড়া চাই! ভেতর ভেতর রাগে ফেটে পড়ে দীননাথ বাবুদের ওপর।—সে পারছে না। অভাবের তাড়নায় যে তারও ভাবের থলি শূন্য হয়ে গেছে—এটা কেউ বোঝে না। শুধু জুলুম আর জুলুম!

মূর্তিগড়া—দোকানের ভার অমরনাথের ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চেয়েছিল, হওয়া গেল না। ঠাকুর্দার খদ্দেরদের ছেলেরা বাবার জীবদ্দশায় রেহাই দেয়নি। বাবার খদ্দেরদের ছেলেরাও তাকে দিচ্ছে না। দেবেও না।

পুজোর দিন যতোই এগিয়ে আসছে, ততোই যেন দীননাথ উগ্রমেজাজী হয়ে উঠছে।

সদাহাসিখুশি মাটির মানুষ দীননাথের ব্যতিক্রম ঘটছে। সকলে বিস্মিত—তটস্থ।

কাউকে কিছু বলতে পারছে না দীননাথ—নিজের মনোবেদনার কথা। বলতে গেলে, আত্মসম্মানের কপাট পড়ে যায় মুখে তক্ষুণি। এদিকে দারুণ দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে—তাড়াতাড়ি মূর্তি শেষ করতে না পারলে, পূজোর সময় বিপদে পড়বে লোকে তার জন্যে। পূর্ব সুনাম ক্ষুণ্ণ করে যা' তা মূর্তি গড়েও দেওয়া যায় না কিছুতেই। লোকের চোখে ধুলো দেওয়া বাপ ঠাকুর্দার কোষ্ঠিতেও লেখা নেই।

দীননাথ, আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও মনোমতো করে তুলতে পারছে না মায়ের মুখখানাকে।—অসুরনাশিনী করুণাময়ী সহাস্যবদনে অসুরকে বধ ক'রে মুক্তি দিচ্ছেন। ধ্যানের এই ভাবরূপ সারাজীবন ধরে প্রতিমায় ফুটিয়েও এখন অপারক হচ্ছে! আশ্চর্য! সহাস্যবদনাকে নিজের মনের ধ্যানে আনতে পারছে না এক মুহূর্তও। মায়ের হাসি ফুটছে না তাই।

নিজের ওপর ধিক্কার এলো দীননাথের। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। এই রকম যখন মানসিক অবস্থা—সেই সময় একদিন ঈপ্সিত হাসি দেখতে পেল হঠাৎ। দেখতে পেল বড় করুণ অবস্থার ভেতর দিয়ে।

ভারায় উঠে, দিক্‌হারা পথিকের মতো, মায়ের মুখে তখন রঙ চড়াচ্ছে দীননাথ। দোকানের লাগোয়া চালাঘরের দরজা ঠেলে, এসে উপস্থিত হ'ল দু'বছরের নাতনী—রতন-মণি। চোখে জল। জলের সঙ্গে আব্দারের সুরের বায়না। একে মন মেজাজ সপ্তমে চড়েই আছে তার ওপর সোনায় সোহাগা যোগাল নাতনীর ছিচকাঁদুনেপনা। বিরক্ত হ'য়ে উঠল দীননাথ। নাতনীকে ভেতরে যেতে বললে, ধমকালে। হিতে বিপরীত হ'ল। রতনমণির গোঁয়ের কান্না উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। অগত্যা ভারা থেকে নামতে হ'ল দীননাথকে।

নাতনী আলমারীতে সাজানো সারবন্দী মাটির ফলের দিকে আঙুল দেখাচ্ছে কেবল। রঙের-কারিগরির মহিমায় নকল ফল আসল দেখাচ্ছে—তাজা—একেবারে যেন গাছ থেকে পাড়া হয়েছে সবে। খেয়াল ধরলে, ফলগুলো পাবার জন্যে হুলুস্থুল বাধায় রতনমণি। এ কাণ্ড ঘটে মাঝে মাঝে। অন্য সময় আদর করে, দোকান ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় রতনমণিকে দীননাথ। ফলের নেশা ভোলাবার চেষ্টা করে। ভোলায়ও। এবারে কিন্তু কোনো চেষ্টাই করল না সে সব। বরং আলমারী থেকে একটা মাটির আম বার করে ওর হাতে দিলে তাড়াতাড়ি বিদায় করবার জন্যে।

নিমেষে চোখের জলে হাসির ঝলক উছলে পড়ল রতনমণির। বাঞ্ছিত ফল পেয়ে মুখভরা হাসি।

বিমুগ্ধ চোখে দেখছে এই হাস দীননাথ। এই হাসিই যেন খুঁজছিল সে এতদিন ধরে। মনের জড়তা অবসাদ কেটে গেল মুহূর্তে। দ্বিগুণ শক্তি এসে পড়ল দেহমনে। ভারায় উঠল। তুলি হাতে নিলে।...

ফুটল স্বর্গীয় হাসি মৃন্ময়ীমূর্তির মুখের ভাঁজে ভাঁজে।—আগের সুনাম অক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবে দীননাথের। লোকে বলবে, জীবন্ত প্রতিমা। দীননাথ মরেনি এখনো। বেঁচে আছে। তুলি তার মৃতসঞ্জীবনী!

দীননাথের চোখে-মুখে খুশি উপচে পড়ছে। প্রতিমার মুখ দেখছে বার বার। দেখেও সাধ মিটছে না। অন্যবারে নিজের অন্তরের হাসি প্রতিমার মুখে প্রলেপ দেয় সে। এবারে সে উৎসে তার অকাল লেগেছে। নাতনীর হাসির রঙে তুলি ডুবিয়েছে। আগেকার সমস্ত শিল্পকৌশলের মাধুর্য ম্লান করে দিয়েছে তার এই নতুন সৃষ্টি!

তারস্বরে কেঁদে উঠল রতনমণি। বুঝল বোধহয় ঠকেছে দাদুর কাছে। মাটির আমে দাঁত বসিয়ে আঘাত পেয়েছে।

পিছন ফিরে তাকিয়ে এ দৃশ্য দেখলে দীননাথ। বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল।

নীচে নেমে এসে, কোলে তুলে নিলে নাতনীকে। প্রতিমার দিকে তাকালে একবার। প্রতিমা হাসছে আর ব্যঙ্গ করছে যেন তাকে। এই তুমি স্রষ্টা! সৃষ্টির অহংকার! ঠকিয়ে হাসি চুরি!

চোখে জল এল দীননাথের অনিচ্ছাকৃত দোষের জন্য। অন্যমনস্ক হ'য়ে—রতনমণিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দোকান থেকে।

রতনমণির শিশুমন যন্ত্রণা ভুলল। কান্না ভুলল। দেখা-দৃশ্য ভুলল না কিন্তু দীননাথ। দুষ্টক্ষতের মতো মনের গভীরে দাগ কেটে বসেছে। অন্যবারের মতো প্রতিমাকে জীবন্ত করে তোলার কৃতিত্ব তার এবারে এতোটুকু নেই। চুরিকরা হাসির প্রলেপ দেবীর মুখে।

প্রতিমা দেখে সবাই হেসেছে। পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছে। বলেছে, মা আমাদের সদানন্দময়ী হাসিমুখী!

সরে গেছে তক্ষুণি দীননাথ। খদ্দেরদের কথাগুলো যেন কানে গরম সীসেগলা ঢেলেছে। এ সুখ্যাতি পাবার অধিকারী সে নয়।

মূর্তিটি নিয়ে ছেলের সঙ্গে, স্ত্রীর সঙ্গে, বন্ধুবান্ধব—সকলের সঙ্গেই ভীষণ মন কষাকষি সুরু হ'ল দীননাথের। কিছুতেই মূর্তিটি বেচবে না সে। ওরাও নাছোড়বান্দা—বেচতেই হবে।

সমবয়সীরা বললে, ভীমরথী ধরেছে। তা না হ'লে এতোবড় একটা যোগ কি কেউ ছেড়ে দেয়! আশ্চর্য! লক্ষ্মী-সরস্বতী একসঙ্গে—যশ-অর্থ!

স্ত্রী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল—পূজো চলে গেলে তো মূর্তি পড়ে পড়ে কাঁদবে, তখন হাসি থাকবে কোথায়! মূর্তি ঘরে রাখলে, হাসি দেখলে কি পেট ভরবে? সারা বছরের পেটের যোগাড় তো এই সময়! কথা শুনলেও গা জ্বলে ওঠে। বলে কিনা ও মূর্তিতে আমার দেওয়া নেই কিছু, বেচার অধিকারও নেই তাই। মাথা খারাপের আর বাকি কোথায়? বলি তবে কার?

কার? বলতে গিয়েও পারল না দীননাথ। কথা জড়িয়ে গেল। সরম এলো। নিজের দুর্বলতা চাপতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মৌনধর্মের আড়ালে।

অমরনাথও বোঝালে বাবাকে। দ্বিগুণ থেকে চতুর্গুণে দর উঠেছে। এই বেলা, আর দেরী নয়। পুরোনোরা পায়ের সূতো ছিঁড়িয়ে, ঘটপূজো করবে বলে চলে গেছে। এবারে ছেলের দলও সরবে কিন্তু। এখনো ঝোঁকটা রয়েছে—জ্যামিতির মাপের প্রতিমা ভালো লাগছে না। এই মূর্তিই প্রাণবন্ত ঠেকছে ওদের চোখে। মওকা ছাড়া ঠিক হবে না।

না, না, না। তিনটে অব্যক্ত স্বর যেন কষাঘাতে আহত হয়ে বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো দীননাথের।

হতভম্ব স্তব্ধ সকলে।

দীননাথের এই ধনুক-ভাঙা পণকে ভাঙতে নিভৃতে পরামর্শ চলল। বন্ধুবান্ধব স্ত্রী-পুত্র এক জোট হল।

খদ্দের এসেছে।

দীননাথ চোখের সামনে অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখছে। বাক্য সরছে না মুখে। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার অনুমতির প্রত্যাশা না করেই সকলে মিলে লরীতে তুলে দিলে প্রতিমা। বিক্রি হয়ে গেছে! অপরিসীম আনন্দে মশগুল সবাই। একটি প্রতিমায় এতোগুলো টাকা আর এতো সুখ্যাতি কেউ পায়নি এই কুমারপাড়ায় এর আগে কখনো।

মূর্তি চলে যাচ্ছে। লরীর গতি বাড়ছে। মন্থর থেকে দ্রুত হচ্ছে। বড় রাস্তায় আরো বাড়ল। অদৃশ্য হয়ে গেল লরীসমেত প্রতিমা।

সমবেত সকলের হো-হো-হা-হা শব্দের হাসি যেন দীননাথের কানে করুণকান্নার সুরে বাজছে—রতনমণির কান্না!

কার্তিক ১৩৫১

একা

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ইস্কুলে নতুন মাস্টার মশাই এসেছেন—নাম দেবেনবাবু।

ভদ্রলোক ডবল এম-এ ; পূর্বে কোথাও হেড মাস্টার ছিলেন, এখানে য়্যাসিস্টাণ্ট মাস্টার হ'য়ে এসেছেন বলে আমরা সকলেই বিস্মিত হ'য়েছি। শিক্ষক-হিসাবে কয়েক দিনেই বেশ নাম কিনে ফেল্‌লেন, কিন্তু তাঁর স্বভাব চরিত্র দেখলে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

ভদ্রলোক কখনও অকারণ কথা বলেন না। একাকী ঘুরে বেড়ান, অবসর সময় সাহিত্য পাঠ করেন। কোন সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই তাঁর মতামত পাওয়া যায় না, জিজ্ঞাসা করলে হেসে বলেন—আমি? আমার আবার একটা মত! শুনেছি ভদ্রলোক বিবাহিত, কিন্তু আজ দু'মাসের মধ্যে খামে কোন পত্র আসে নি। পোস্টকার্ডে মায়ের পত্র কদাচিৎ আসে। মাহিনার অর্ধেক নিয়মিত মায়ের নিকটে যায়। ভদ্রলোক নিরামিষাশী, বয়স মাত্র তিরিশ।

ওঁর দিকে চেয়ে চেয়ে কেবলই মনে হয়, ওঁর জীবনের ইতিহাস হয়ত বিচিত্র, তা না হ'লে জীবন এমন অস্বাভাবিক কেন? আলাপ করবার অবসর খুঁজি, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে প্রেতের সতর্কতা নিয়ে নিজেকে পাহারা দেন—অবসর কদাচিৎ মেলে।

সেদিন স্কুলের সেক্রেটারী মহোদয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল।

সকলেই আমরা খেতে বসেছি। হোস্টেলের টিচার্‌রা বেশ আনন্দের সঙ্গেই জিহ্বাকে তৃপ্তিদান করছেন। মাছের কালিয়া পরিবেশককে দেবেনবাবু ব'ললেন—আমি মাছ খাই না, দেবেন না।

সেক্রেটারী বললেন—সে কি দেবেনবাবু! এত অল্প বয়ে মাছ ছেড়েছেন কেন? একটু খেয়ে দেখুন না।

দেবেনবাবু এমন রুক্ষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইলেন যে, তিনি পুনরায় অনুরোধ করতে সাহসী হলেন না। ভোজের বারান্দা নানা পরিহাসে যখন প্রায় নির্দোষ আনন্দের সীমা অতিক্রম করতে চ'লেছে তখন চেয়ে দেখি দেবেনবাবু রুমালে চোখ মুছে সেটাকে পরিষ্কার করতে চেষ্টা করছেন।

অকস্মাৎ তিনি বললেন, আপনারা মাপ্ করবেন, আমি উঠ্‌লাম।

কাহারও উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই তিনি উঠে সদর দরজার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সকলে নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন, কিন্তু কথা বলার মত অবসর কেউ পেলেন না।

ব্যাপারটা অভদ্রোচিত ও অতি আকস্মিক এবং তাঁর মত লোক এমনি ব্যবহার ক'রতে পারেন এ যেন বিশ্বাস হয় না। ওই ধীর সৌম্য শান্ত ব্যক্তির মধ্যে কোন চঞ্চলতা আছে, তা জানবার কৌতূহল আমার মধ্যে অদম্য হ'য়ে উঠ্‌ল। বিচিত্র জগতে কত বিচিত্র মানবমনই না আছে! তার মধ্যে দুঃখ আনন্দও কত বিচিত্র!

বোর্ডিং-এ মাস্টারদের ঘরে সন্ধ্যার পর চা-এর আসরে কত উজীর-নাজির বধ, কত

হিটলার-মুসোলিনীর দম্ভাদেশ, কত মহাদেশ বন্টন নিত্যই চলে কিন্তু দেবেনবাবু একা একটি কোণে বিছানার সবখানি দখল ক'রে নির্বিকার চিত্তে বই পড়েন। সেদিন সদ্য-পরিণীত যতীশবাবু তাঁর নবোঢ়া বধূর নবমেঘদূত-রূপ বিরাট পত্রখানা সগর্বে পাঠ করছিলেন। শুনেছি তাঁর স্ত্রী একটা পাশ দিয়েছেন, তার বিরহ, জোছনা-রাতের যন্ত্রণা প্রভৃতির আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনা সকলকে মুগ্ধ করেছিল সন্দেহ নেই। যতীশবাবু নিরক্ষর স্ত্রীর স্বামীগণের প্রতি ব্যঙ্গদৃষ্টি দিয়ে প্রগল্‌ভের মত হাসছিলেন।

হঠাৎ চেয়ে দেখি দেবেনবাবু কান পেতে সেই পত্রখানাই শুন্‌ছেন—এটা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক, তাই জিজ্ঞাসা করলুম, পত্রখানা শুনছেন দেবেনবাবু?

—হ্যাঁ, শুন্‌ছি।

যতীশবাবু আরও উৎসাহিত হ'য়ে পত্র পড়তে লাগলেন। দেবেনবাবু শুনলেন।

পত্র পাঠান্তে আমি প্রশ্ন ক'রলুম, দেবেনবাবু, নারী এমনি ক'রেই পুরুষের মনকে পরিপূর্ণ করে দেয় না? এই পরিতৃপ্তির উপর নির্ভর ক'রেই কত সাহিত্য কাব্য গড়ে উঠেছে!

দেবেনবাবু কোন মতামত প্রকাশ করবেন আশায় সকলেই চুপ করলেন। দেবেনবাবু একটু হেসে বললেন, না, সাহিত্য গড়ে উঠেছে অতৃপ্তি থেকে। বড় বড় শিল্পীদের জীবনী পাঠ করলে দেখ্‌তে পাবেন, তারা নারীকে নিয়ে তৃপ্তি পায়নি, তাই তারা চরিত্রহীন, না হয় সংসারত্যাগী। তার কারণ, পুরুষে চায় তার কল্পনাকে এই বাস্তব নারীর মধ্যে, আর নারী চায় এই বাস্তবকে। তাই অতৃপ্তিই গড়ে ওঠে।

যতীশবাবুর দাম্পত্যজীবন আকণ্ঠ কাব্যরসাশ্রিত, তিনি প্রতিবাদ করলেন—না, কখনই না, এই যে জীবনে নতুন উৎসাহ এসেছে, কেন?

দেবেনবাবু প্রশ্ন করলেন, আপনি কি বলতে পারেন, দাম্পত্য জীবনে আপনি সম্পূর্ণ সুখী, কোথায়ও অতৃপ্তি নেই, না-পাওয়ার বেদনা নেই?

—না।

—তবে আমি বলতে চাই, হয় আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসেন না, না হয় আপনি সুখদুঃখ জিনিষটাই সম্পূর্ণ বুঝতে পারেন না।

যতীশবাবু উত্তেজিত হ'য়ে আবার প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু দেবেনবাবু শত ব্যঙ্গোক্তির উত্তরেও কোন উত্তর দিলেন না। সান্ধ্যসভা সেদিনের মত শেষ হ'ল।

বিস্তীর্ণ আড়িয়ালখা নদীর তীরে, শহরের উত্তরে প্রকাণ্ড চর। স্বাস্থ্যান্বেষী বৃদ্ধ-তরুণ-তরুণী সকলেই সেখানে বেড়াতে যান। সঙ্গীহীন দেবেনবাবুও যান, একাই পদচারণা ক'রে ফিরে আসেন। কথা বললে হয়ত ভদ্রতা-সুলভ দু-একটা উত্তর দেন, কাজেই তার সঙ্গীও থাকা চলে না।

সন্ধ্যার পূর্বেই ত্রয়োদশীর চাঁদ আকাশে উঠেছে। হঠাৎ সাম্‌নে দেখি আকাশের পানে চেয়ে দেবেনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। পাশে দাঁড়িয়ে বললুম, দেবেনবাবু, কি ভাবছেন!

দেবেনবাবু চম্‌কে বললেন—কে? ও শীতলবাবু! ভাবছিলুম কি?

—হ্যাঁ—আপনার সঙ্গে বেড়াতে অনুমতি করেন ত, চলুন একটু ঘুরি—

—আসুন, এই ধানের আ'লে বসি। পাগলের সংজ্ঞা কি জানেন! যে যা ভাবে তাই যদি বলে দেয় তবে তাকেই লোকে পাগল বলে। তাই সব কথা বলা ত' সম্ভব নয়, তবে শুন্‌তে চাইলে বলতে পারি—

—বলুন।

—একটি তরুণীকে দেখেছেন একটু আগে, একটা চাকরের সঙ্গে একা ঘুরছে? আমিও

একাই ঘুরি। চরের এই নরনারীর মধ্যে এমনি একাই আমরা ঘুরে বেড়াই—সকলেই। জগতের এই কোটি লোক-এর মধ্যে সকলেই একা—জীবনের মনের সাথী কেউ নেই। ওই চাঁদ উঠেছে—আমি যেমন করে ওই চাঁদকে দেখছি, আমার ইচ্ছা অমনি ক'রে আর একজনও দেখুক্, আমার মত ভাবুক, কিন্তু তা কি এই জগতে হয়!

কথাটার সঙ্গে সেদিনকার নারী-সংক্রান্ত মন্তব্যের একটা সূত্র আছে নিশ্চয়ই, তাই বললুম—সেদিন প্রভাতবাবুকে যে কথাটা বলেছিলেন, তা কি সত্যি বলে আপনার বিশ্বাস?

—হ্যাঁ। আজ আমার মনটা ঠিক প্রকৃতিস্থ নেই, আজ এ অবস্থায় অনেক কিছুই বলে ফেল্‌তে পারি, যদি সেটা ঠিক তেমনি ভাবেই নিতে পারেন তবে বলতে পারি।

—না, আপনাকে ভুল বুঝব না বলেই আমার বিশ্বাস।

—দেখুন আমার দাদা, মা, ভাই, বৌ—সবই আছে, কিন্তু তার মধ্যেও আমি নিরবচ্ছিন্নভাবে একা। আমার স্ত্রীর প্রশংসা গ্রামবাসী করে. মা করেন, দাদারা করেন। এমন কি, আমার চেয়েও তাকে হয়ত বেশী ভালবাসেন। সেও যে আমাকে ভালবাসে সে বিষয়েও আমার সংশয় নেই, তবু ত তৃপ্তি পাই না। একটা দুরধিগম্য প্রাচীর কোথায় যেন রয়ে যায়!

—আপনি ত তাঁর কাছে পত্রও দেন না।

—না, দিই না ; তার কারণ, তার পত্র পেয়ে আমি আরও বেশী দুঃখ পাই। আমার দুঃখটা কোথায় তা আমি বুঝোতে পারি নে, সেও বোঝে না। কেউই বোঝে না—

—আমিও ত ঠিক আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

—জানি, একটা উদাহরণ দিলে হয়ত বুঝবেন। জানেন, এ জগতে যে যাকে সবচেয়ে ভালবাসে তার কাছে সবচেয়ে বেশী আশা করে—রাস্তার লোকের কাছে আমি কোন ভদ্রতা প্রত্যাশা করি না, কিন্তু আপনার কাছে করি—কারণ অবস্থাভেদে নৈকট্য জমায়। বহুদিন পরে হয়ত বাড়ী যাই, মনে মনে ভাবি সে হয়ত কত অভিযোগ করবে, পথের সম্বন্ধে আমার জীবন সম্বন্ধে শত প্রশ্ন করবে, কিন্তু সে নির্বাকভাবে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ে। সীতার সহিষ্ণুতা আত্মসমর্পণ নিয়ে হয়ত সে গড়ে উঠেছে, কিন্তু আমার মনে হয়, এই অনাগ্রহ এই শিথিলতা তার উপেক্ষার পরিচয় মাত্র। মন বেদনায় বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে, মন আর যুক্তিতর্ক মানে না—জানি না, শিক্ষিতা হ'লেও ঠিক এমনি নীরব সে হ'ত কি-না! তবে যতদূর মনে হয়, নারী—সে নারীই, শিক্ষায় তার প্রকৃতি বদলায় না।

—আপনার দিক দিয়েও ত যথেষ্টই উপেক্ষা আছে।

—এ উপেক্ষা আমার ছিল না, গড়ে উঠেছে। অতৃপ্তের মাঝে মনটা এমন হওয়া ত স্বাভাবিক। যারা হয়ত আমার মত ক'রে পেতে চায় না, তারা এদের নিয়ে সুখী হ'তে পারে জানি, কিন্তু আমার সুখী হওয়ার কোন উপায়ই নেই।

আলোচনার ফাঁকে জীবনের অনেক কথাই জানলুম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার মনে হ'ল —যে বুকে এত ভালবাসা, সে বুকে শান্তি তৃপ্তি মেলা একান্তই অসম্ভব। এই ভালবাসার দুর্দম স্রোতের সামনে সাহসে ভর ক'রে দাঁড়াবার সাহস ক'জনের আছে?

এমনি ক'রে নির্বান্ধব দেবেনবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠ্‌ল।

ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি সমস্ত মন শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠ্‌ল—জীবনকে এমন গভীরভাবে এমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আমরা ত কখনও দেখি নি, তাই বোধ হয় এই অতৃপ্তির হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। মাঝে মাঝে দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়, দেবেনবাবুর স্ত্রীকে—যাঁকে সকলেই ভাল গৃহস্থবধূ বলে ; তার মধ্যে কোন্ দীনতা আছে যার জন্যে এই উদারপ্রাণ দেবেনবাবু এমন ক'রে উদাসজীবনের মাঝে আত্মহত্যা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

সেদিন কথায় কথায় তাঁর হেড-মাস্টারী ছেড়ে আসবার প্রসঙ্গে বললেন—হেড মাস্টারী ক'রতে পারিনি বলে আমি ছেড়ে আসিনি। স্কুলকে যেমন ক'রে গড়ে তুলব ভাবি, তেমন ক'রে সেটা গড়ে ওঠে না। ছেলেরা মনের মত হয় না, মাস্টার মশায়রা হন্ না, মনে বড় দুঃখ পাই—নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। কোথায় যেন আমার ত্রুটি থেকে যায়। সেই দায়িত্ব আর অতৃপ্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই চলে এসেছি। এখানে দায়িত্ব অল্প, কাজেই পরিতৃপ্তি আছে।

বৈশাখের মাঝামাঝি দেবেনবাবু অত্যন্ত অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। কলেরার আক্রমণ বলে ডাক্তার যখন সনাক্ত করলেন তখন হাসপাতালেই তাঁকে স্থানান্তরিত করতে হ'ল। তৃতীয় দিনে অবস্থা খুব ভাল বলে মনে হ'ল না।

আমি বললুম, দেবেনবাবু, আপনার মা, দাদা, স্ত্রী, এদের কাছে পত্র লিখি, খবর দেওয়া দরকার। ঠিকানা—

তিনি একটু চিন্তা ক'রেই হোক্, আর দুর্বলতাবশত দেরী ক'রেই হোক্, ধীরে ধীরে জবাব দিলেন—না, দরকার নেই, লাভও কিছু নেই। তাঁরা মানসিক অশান্তি আর কষ্ট পাবেন মাত্র। আমার সান্ত্বনা উপকার কিছুই হবে না।

—তবুও—

—না, এর মধ্যে 'তবুও' নেই। আমার যখন লাভ নেই তখন আমার জন্যে আর কয়েকজন কষ্ট পাবে, এ আমার ইচ্ছে নয়। আর যদি এখানেই আমার জীবনের শেষ হয়, আমার স্যুটকেসের মধ্যে সমস্ত ঠিকানাটা পাবেন, প্রয়োজন হ'লে পত্র দিতে পারবেন—এ রোগ-যন্ত্রণার উপশম ত হবার নয়।

চুপ ক'রেই রইলাম। এমন জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে এমনি ক'রে নির্বিকারচিত্তে সমস্ত প্রিয়জনের স্নেহ সেবা প্রীতিকে উপেক্ষা করা—এ যেন একান্তই অসম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু যা চোখের সামনে দেখ্‌ছি, যে-কথা স্বকর্ণে শুনলাম তাকেই বা অস্বীকার করি কেমন করে! মানুষের মনে কি এমনি অনুভূতি থাকাও সম্ভব!

কয়েকদিন ক্রমাগত ভাল এবং মন্দের সীমানায় গতায়াত ক'রে যেদিন দেবেনবাবুর অবস্থা আর আশঙ্কাজনক রইল না, সেদিন তাঁর দাদা এসে পৌঁছলেন। তাঁর পত্রোত্তর আমিই পত্র দিয়েছিলাম, কাজেই সংবাদ পেতে তাঁর বাধা হয়নি।

গ্রীষ্মের ছুটি হওয়ার সময় সময় দেবেনবাবুর ধীরে ধীরে উঠে বেড়াবার মত সামর্থ্য হ'ল। তাঁর দাদা বন্ধে বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করতে আরম্ভ করলেন—কিন্তু দেবেনবাবু কেবল একটু সুস্পষ্ট 'না' ছাড়া দ্বিতীয় কিছুই বললেন না।

চরে বেড়াতে গিয়ে সেদিন তাঁর দাদার সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল—

তাঁর দাদা খগেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম, দেবেনবাবুর স্বভাব কি চিরদিনই এমনি?

খগেনবাবু বললেন—না, বিয়ের কিছু পর থেকেই ওর স্বভাবের আমুল পরিবর্তন হ'য়েছে। আগে ও ছিল সব চেয়ে আমুদে, সব চেয়ে মিশুক, থিয়েটারের কমিক প্লেয়ার, ফুটবলের ভাল খেলোয়াড়। আর আজ ও একেবারে নির্বিকার—

একটুক্ষণ থেমে বললেন, বৌমা আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে। তার কোথাও আমরা এতটুকু ত্রুটি পাইনি। ধীর স্থির, সর্বকার্যে সুনিপুণা, অথচ কেন যে এমন হয়! সে সতী লক্ষ্মীর চোখের জল ফেলে কি ওরই মঙ্গল হবে? ও তার উপরে কেবল অত্যাচারই করে, সে মুখ বুজে সহ্য করে। এর প্রতিবাদ করবার সাহসও তার নেই।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পার্থক্য বা ব্যবধানটা কোথায় রয়েছে তা ত আমিও জানি না, কাজেই নির্বাক হয়ে কেবল শুনলাম। খগেনবাবু বললেন, আপনারা যদি অন্তত ওর স্ত্রীকে

এখানে বাসায় আনবার মত করাতে পারেন তবে আমরা এই অশান্তির হাত থেকে মুক্তি পাই। তার ভাগ্যে যা থাকে তাই হবে।

—দেবেনবাবুর মতামত সৃষ্টি বা পরিবর্তিত করবার সাহস আমার নেই, তবে বলে দেখ্‌তে পারি।

সেদিন হোস্টেলে ফিরে গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা ক'রে ঠিক হ'ল, দেবেনবাবু বাড়ীতেই যাবেন এবং ফিরবার সময় সস্ত্রীক ফিরে আসবেন। আমি ও তিনি দুজনে মিলে একটি বাসা নিয়ে বসবাস আরম্ভ করব।

যে মহিলাটিকে দেখবার কৌতূহল মনের মধ্যে অদম্য হ'য়ে উঠেছিল, তিনি এলেন।

নাম তাঁর বীণা, সুন্দরী না হ'লেও চেহারায় একটা লাবণ্য আছে। মুখখানা দেখলেই মনে হয়, যেমন শান্ত তেমনি সরল, পবিত্রতার একটা সুস্পষ্ট দাগ সমগ্র মুখে অস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। দেখলে শ্রদ্ধা হয়। বয়স বেশী নয়, কুড়ির কমই বলে মনে হয়—যৌবনের চাঞ্চল্য নেই, কিন্তু তার মাধুর্য আছে।

একই বাসার মধ্যে দুটি ঘর ; কিন্তু ভিতর-বাড়ীর উঠান একটাই। দুই গৃহস্থের মাঝে পর্দার কোন বালাই নেই।

স্টীমার থেকে নেমে সমস্ত ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে ঘর-গুছিয়ে গৃহস্থালীর অবশ্য কর্তব্য কাজ শেষ ক'রতেই সেদিনের মত সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। আমার সমস্ত গুছানো পূর্বেই হয়েছিল, সুনীতিকে সাহায্য করতে পাঠিয়েছিলাম ; সে সাহায্য বিশেষ কিছু করেনি, তবে আলাপ ক'রে এসেছে।

পরদিন স্কুলের ছুটির পর বল্‌লুম, দেবেনবাবু, চলুন বাসায় ফিরি।

যাই, যাই করে অনেকক্ষণ ধ'রে খবরের কাগজের আপাদমস্তক পড়ে উঠে বললেন, চলুন।

বাসায় ফিরে জল খেয়ে এক সঙ্গে চরে বেড়াতে যাব স্থির ক'রে ডাক দিলুম, দেবেনবাবু, চলুন, চরে যাবেন না?

দেবেনবাবু ডাক্‌লেন, আসুন।

ঘরের ভিতর ঢুকে দেখলুম—লুচি তরকারী তৈরী হয়েছে, স্টোভে চা'র জল গরম হ'চ্ছে। তিনি বললেন, চা হবে ত?

—না। এক্ষুণি খেয়েছি।

দেবেনবাবু খেয়ে নিলেন। এক সঙ্গেই চরে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। দেবেনবাবু বললেন, আপনার সঙ্গে টাকা আছে?

—কেন?

—কয়েকটা জিনিষ কিন্‌তে হবে, ওর চিরুণীটার কয়েকটা দাঁত ভেঙে গেছে, দুটো ক্লিপ্‌ একটা তোয়ালে।

দেবেনবাবু উদাস প্রকৃতির লোক, তবুও তাঁর স্ত্রীর অসুবিধার প্রতি এই খরদৃষ্টি আমি আশা করি নি। বললুম,—এও লক্ষ্য করেছেন?

—হ্যাঁ, আপনি এ লক্ষ্য করেন না!

—লক্ষ্য করার অবসর হয় না, তার পুর্বেই ফর্দ এসে জোটে।

দেবেনবাবু একটু হেসে বললেন, চাইবার দাবী আছে তাঁর, তাই। এই দাবীই তাঁর ভালবাসার নিদর্শন—কাজেই সে ফর্দ-মাফিক জিনিষ কেনার মধ্যে আনন্দই আছে, না?

ভাবছিলুম, এই দাবী নেই বলেই অথবা তার চাইবার প্রয়োজন হয় না বলেই হয় ত দেবেনবাবুর অন্তরে অতৃপ্তি অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হ'য়ে ওঠে! তাঁর মন বেদনার্ত হ'য়ে নিরন্তর গুম্‌রে মরে।

চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে তিনি বললেন, মানুষ চায় কি জানেন, এই দাম্পত্য জীবনের মাঝে? নারী তার স্নেহ যত্ন প্রেম দিয়ে ঘিরে রাখবে পুরুষের অন্তরটিকে। দিনান্তে শ্রান্ত মন সেই অঞ্চলের আড়ালে নিশ্চিন্ত আবেশে আপনাকে ভুলে যাবে--

--এ জগতে এতখানি কি পাওয়া সম্ভব?

--যারা চায়নি, তারাই খুশী, যারা চেয়েছে তাদের জীবনের একাকীত্ব ঘোচেনি।

পরদিন দেবেনবাবু স্কুল থেকে সরাসরি চরে বেড়াতে গেলেন, জল খেতেও বাসায় ফিরলেন না। আমি কোন দুর্যোগ আশঙ্কা ক'রে সুনীতিকে দিয়ে খবর নিলুম, বীণা দেবী লুচি তৈরী ক'রে অপেক্ষা করছেন। দেবেনবাবুর দেখা না পেয়ে গুছিয়ে সেগুলিকে তুলে রাখলেন।

চরে গিয়ে দেবেনবাবুকে বললুম, আপনি গেলেন না, তিনি খাবার তৈরী করে বসে আছেন।

দেবেনবাবু দ্বিরুক্তি না করেই বললেন--জানি, সে আজ খাবার তৈরী করবে, যেহেতু আমি কাল বলেছিলাম, কিন্তু এ পাওয়ার মধ্যে আমি দুঃখই পাই। চাইলে আমি হয়ত সব কিছুই পাই. আদায় করবার অধিকার আজিও আমার আছে, কিন্তু না চাইতে যে পাওয়া তাই প্রকৃত পাওয়া, সে-ই আনন্দ। কাল যদি সে খাবার তৈরী ক'রে রাখত তা হ'লেই মনটার মধ্যে তৃপ্তি পেতুম।

--আপনি কখন আসবেন, কি খাবেন, তাই তিনি জান্‌তেন না, কাজেই খাবার তৈরী করা তাঁর সম্ভব হয়নি।

--মানুষ বিকেলে খায় এ জানবার বয়স তার না হয়েছে এমন নয়, আর ঘরে যা আছে তাই নিশ্চয়ই খাবো। এর মধ্যে বুদ্ধির কিছু নেই, অভাব আছে অনুভূতির।

--না, এ সম্পূর্ণ ভয়, আজকালকার মত শিক্ষিতা মেয়ে হ'লে হয়ত--

--ভয়েই হোক, লজ্জায়ই হোক, উপেক্ষায়ই আর শিক্ষাভাবের জন্যেই হোক, এ দুঃখটা আমি যে পেয়েছি, এ কথাটা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। কাজেই আমার মন যদি ব্যথিত হয়, নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করি, তবে আমাকে দোষ দেবেন কি! দুঃখটা পাওয়ার উপর নির্ভর করে না, চাওয়ার উপর নির্ভর করে!

দেবেনবাবুর যুক্তি-তর্কের সামনে সহসা নির্বাক হ'য়ে গেলাম--প্রতিবাদ করবার সাহস হ'ল না।

শ্রাবণের মাঝামাঝি।

সেদিন সন্ধ্যা থেকে অঝোর-ধারায় বৃষ্টি হয়েছে। আকাশের নিবিড় ঘন কালো মেঘের বুক চিরে যেন শত ধারে অশ্রুর বন্যা ঝাঁপিয়ে পড়ে পৃথিবীকে প্লাবিত ক'রে দিয়েছে। সন্ধ্যার পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। গভীর রাত্রে সহসা কেন যেন জেগে গেলাম।

চারিপাশে ঘন অন্ধকার। কদাচিৎ ক্লান্ত ভেকের মৃদু কণ্ঠস্বর ও ঝি ঝি পোকার ডাক, নিঝুম রাত্রির স্তব্ধতা যেন বাড়িয়ে তুলেছে। বর্ষণক্লান্ত আকাশে তখনও মেঘ জমা হ'য়ে আছে, মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ ক'রে দুই-এক ফোঁটা বৃষ্টি হ'চ্ছে--কোন্ ছিদ্রপথে ঘরের মধ্যে যেন এক রেখা আলো প্রবেশ করেছে--

চেয়ে দেখি, দেবেনবাবুর ঘরে তখনও আলো জ্বল্‌ছে। আমার ঘরের একটা জানালার পাশে দাঁড়ালে তার ঘরের প্রায়-সবটাই দেখা যেত। জানালাটা নিঃশব্দে খুলে দাঁড়িয়ে রইলুম।

টেবিলের উপর আলো জ্বলছে, একখানা বই খোলা পড়ে আছে। পাশেই খাটের উপর

তাঁর স্ত্রী সম্ভবত ঘুমিয়েই আছেন। দেবেনবাবু অপলক দৃষ্টিতে নিদ্রিত সেই মুখখানির পানে চেয়ে তন্ময় হ'য়ে বসে আছেন। নিস্পন্দ স্তব্ধ মুখে তার কোনই অভিব্যক্তি নাই।

বীণা দেবী বোধ হয় আলো দেখেই সহসা জেগে উঠে বস্‌লেন।

দেবেনবাবু ধীরে ধীরে বললেন, আচ্ছা বীণা, তুমি ঘুমিয়েছিলে? না?

উত্তরটাও স্পষ্ট শুনলুম। বীণা দেবী বললেন, হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছি—

—চারপাশে এই অঝোর ধারে বৃষ্টি পড়ছে, আজ আমার মনটা উন্মাদের মত কত চিন্তা ক'রে চলেছে। ওই আকাশের মত আমার অন্তর চিরে সমস্ত ভাবধারা তোমার সমস্ত অঙ্গে বর্ষিত হয়েছে। আচ্ছা, তোমার কি ইচ্ছে করে না, এমনি করে একবার সমস্ত অন্তর দিয়ে আমার দুঃখী অন্তরকে ঘিরে ধরতে?

বীণা দেবী বল্‌লেন, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি ব'লে রাগ করেছ?

দেবেনবাবু হাসলেন, কিন্তু সে হাসি কান্নারই রূপান্তর মাত্র। তাঁর সমস্ত অন্তর সহসা যেন কঠিন বাস্তবের প্রাচীরে প্রহৃত হ'য়ে ভেঙ্গে পড়ল। বললেন, না, তুমি ঘুমোও।

—তুমি শোবে না?

—হ্যাঁ, শোব বই কি!

বীণা দেবী স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন দেখলেন। দেবেনবাবু খানিক বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। আমি ধীরে ধীরে শয্যায় ফিরে এলাম। ভাব্‌লুম—এ অতৃপ্তি ত জগতের কাছে তার পাওয়ার নয়, তিনি নিজের ভালবাসার মূল্য পান নি তাই এই অতৃপ্তি, ভালবেসে তিনি তৃপ্তি পান না তাই অতৃপ্তিই কেবল বেড়ে চলে। এত ভালবাসা নিয়ে কি জগতে সুখী হওয়া চলে?

সেদিন সিনেমা দেখে ফিরে এলাম প্রায় রাত্রি দশটায়।

সুনীতি এসে খবর দিল, বীণাদিকে ত আজ খুবই গম্ভীর দেখলাম, কিছু ঘটেছে বলে মনে হয়।

আমি জান্‌তুম, ঘটবেই এবং এক সঙ্গে ওদের থাকা চলবে না। গগনবিহারী ওই দেবেনবাবুর অন্তরের পিছু পিছু কোন নারীহৃদয়ই ছুট্‌বার সাহস করবে না। ব'ললুম, কিছু শুন্‌লে?

—না, ও তেমন মেয়েই না, বুক ফেটে গেলেও ও কথা বলতে পারবে না।

পরদিন স্কুলে গিয়ে শুনি, দেবেনবাবু ছ দিন ক্যাজুয়্যাল লিভের দরখাস্ত দিয়েছেন। বিকেলে কারণ জিজ্ঞাসা করলে দেবেনবাবু বললেন, এক সঙ্গে থেকে ব্যবধানের দুঃখকে ভোগ করার চেয়ে দূরে থেকে তাকে ভুলে যাওয়াই লাভের। আমাদের এক সঙ্গে থাকা আর সম্ভব নয়।

—ব্যবধানটা আপনার অনুমান, না—

দেবেনবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, না, অনুমান নয়, অনুভূত সত্য। আপনারা সিনেমায় গেলেন, আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি সিনেমা দেখবে? ও জবাব দিলে—'জানি না।' আমার কাছে দাবী জানাবার শক্তি যার নেই, আমার কাছে চাইবার যার কিছু নেই, তার অন্তরের সঙ্গে আমার অন্তরের ব্যবধান ত অল্প নয়। সে ব্যবধানকে নিরন্তর ভোগ ক'রে দুঃখ আমি কেন পাই!

আজ এই ব্যাখ্যাকে আমি গ্রহণ করতে পারলুম না, একটু রুষ্ট স্বরেই বললুম, আপনি একে বলেন ব্যবধান, কিন্তু এ ব্যবধান নয়। এই একান্ত আত্মসমর্পণ, এই মৌন মূক আত্মনিবেদন, এই সহনশীলতা—এর কি কোন মূল্য নেই? এই সেবা, এই নিষ্ঠা, এই হাসিমুখে সুখ-দুঃখকে গ্রহণ করা, এর কি কোন মূল্য নেই?

—আছে, সমাজের কাছে এর মূল্য যথেষ্ট, কিন্তু অন্তরের কাছে নয়। এই আত্মসমর্পণকে উপন্যাসের আদর্শ করা চলে, কিন্তু এ মানব জীবনকে সুখী করতে পারে না। আপনি মনে করেন, এই ব্যবধান কেবল আমার আর ওই বীণার মধ্যে—তা নয়—এই ব্যবধানের শাশ্বত চিরন্তন কাহিনী নরনারী হৃদয়কে পৃথক ক'রে মধুরতর ক'রে রেখেছে। বীণাও হয়ত আমারই মত শত দুঃখে বেদনায় ম্রিয়মান হয়ে রয়েছে। বলবেন—ও শিক্ষিতা হ'লে হয়ত এমন হ'ত না, তা নয়। শিক্ষিতা হ'লেও এই ব্যবধান অন্য রূপ নিয়ে দেখা দিত। দূরত্বের মধ্যে নৈকট্য, আর নৈকট্যের মধ্যে রয়েছে দূরত্ব।

যাবার দিন স্থির হ'ল।

শহরটার বুকের উপর দিয়ে যে অতি সরু রাস্তাটা স্টেশনে গেছে, সেইটা ধরে দেবেনবাবু ও বীণা দেবীর পিছনে পিছনে আমি আর সুনীতি চলেছি। এমনি কত লোককে কতদিন স্টেশনে তুলে দিয়েছি, কিন্তু এমন ক'রে বিদায় মুহূর্তটি কোন দিন সমবেদনার ব্যথায় করুণ হ'য়ে ওঠেনি।

স্টীমারে বিছানা ক'রে সমস্ত গুছিয়ে একবার চারিপাশে চাইলাম। আজিকার এ বিদায়ের মধ্যে যেন একটা চির-বিদায়ের করুণ সুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্ছে। দেবেনবাবুকে বল্লুম—সত্যি চললেন দেবেনবাবু?

—হ্যাঁ, যাব।

—আপনার এ মন নিয়ে এ জগতে সুখী হওয়া চলবে না।

—জানি, তাই সে ব্যর্থ প্রয়াস আমি করতে চাইনি—আমার মন নিয়ে নয়, মানুষের মন নিয়েই এ জগতে সুখী হওয়া চলে না।

বীণা দেবীর দিকে একবার চেয়ে দেখলাম, নদীর ওপারে দূর দিগন্তরেখার পানে উদাস সজল চোখের দৃষ্টি ন্যস্ত ক'রে স্তূপাকার জড়পদার্থের মত তিনি বসে রয়েছেন, সামনে নদীর স্রোত তর তর ক'রে বয়ে চলেছে—

স্টীমার ছেড়ে দিল।

ভারাক্রান্ত মনে শ্লথ মন্থর পদক্ষেপে ফিরে এল। চোখের অন্তরালে ধীরে ধীরে স্টীমারখানি ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর হ'য়ে অদূরে বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।...

তারপর বহুদিন চলে গেছে। দেবেনবাবুও আর এখানে নেই, বীণা দেবীও আর আসেন নি, তবুও মাঝে মাঝে মনে হয়, অনিন্দ্য সেই চোখ দুটি দিগন্তরেখার পানে আজও যেন সজল উদাসদৃষ্টিতে চেয়ে আছে, আর তারই অতি সন্নিকটে, তারই শয্যায় ব'সে আর একটি অন্তর ক্রমাগত অভিযোগ করছে—মানুষের মন নিয়ে এ জগতে সুখী হওয়া চলে না।

বৈশাখ ১৩৪৭

চাকুরে ভাই

দীনেন্দ্রকুমার রায়

(পল্লীচরিত্র)

১

কার্তিক ও গণেশ দুই ভাই পুঁটিমারীর হারাধন দের পুত্র। হারাধন পুঁটিমারী গ্রামে 'কয়ালে'র কাজ করিত। কৃষকদের ধান্যাদি শস্য মাপ করিয়া দিয়া, কখনও বা মহাজনের গদীতে পাট ওজন করিয়া দিয়া, যে কিঞ্চিৎ 'কয়ালি' পাইত, তাহাতেই তাহার দিনপাত হইত। আবার ধান কাটা-মাড়ার সময়—সে এক ধামা মুড়ি-মুড়কী লইয়া কৃষকদের খোলায়-খোলায় ঘুরিয়া বেড়াইত ; এবং কৃষকদের যে পরিমাণ মুড়ী-মুড়কী জল খাইতে দিত, তাহার তিনগুণ ধান আদায় করিয়া সহর্ষে বাড়ী ফিরিত। তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, ছেলেটিকে কোনও প্রকারে মানুষ করিয়া তুলিবে। মাতৃহীন শিশুদ্বয়কে সে পিতার স্নেহ ও মাতার আদরযত্ন ঢালিয়া দিয়া মানুষ করিয়া তুলিতেছিল।

পরিণত বয়সে স্ত্রীর মৃত্যুর পর হারাধন চারিদিক অন্ধকার দেখিলেও একটি বিষয়ে সে কৃতনিশ্চয় ছিল ; বৃদ্ধবয়সে একটি 'দ্বিতীয় পক্ষ' ঘরে আনিয়া অরণ্যে গমন করিতে তাহার আগ্রহ ছিল না। যেদিন তাহার বিধবা ভগিনী ক্ষেত্রমণি তাহাকে বলিয়াছিল, "কতদিন আর খালিঘরে বাস কর্‌বে?--ও-পাড়ার নিতাই হালদারের মেয়ে, খাসা চোখ-মুখের গড়ন ; আর ন-বছরের মেয়ে--দেখ্‌তে যেন বার বছরের!--তাকে বিয়ে কর না কেন দাদা!"—সেদিন হারাধন তাহার ভগিনীর সহিত 'বিপরীত' ঝগড়া করিয়াছিল। হারাধন বলিয়াছিল, "তুইও ক্ষেপ্‌লি নাকি ক্ষেতু! এই তিন-কুড়ি-সাত বছর বয়সে নিতাই হালদারের দুধের মেয়ে বিয়ে করব?--বৃষকাঠের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। জাত-বেহারার কাঁধে চড়ে মড়ুইখালির (শ্মশানের নাম) ঘাটে বিয়ে করতে যাব। তিন-কুড়ি-সাত বছরের বুড়োকে বিয়ের কথা বল্‌তে তোর লজ্জা করলো না?—থাক্‌লো তোর ভাতের থালা, চল্‌লাম আমি —যে দিকে দুই চোখ্ যায়, সেই দিকে।"

হারাধন তখন ভাত খাইতে বসিয়াছিল ; সক্রোধে উঠিয়া কোন রকমে হাত-মুখ ধুইয়া হুঙ্কার দিল, "একটা পান্‌টান্ দিবি, না, শুধুমুখেই চলে যাব?"

ক্ষেত্রমণি বলিল, "পান তৈয়ারি করবার লোকই ত আন্‌তে বল্‌ছিলাম, আমার যেমন 'অদেষ্ট!' বল্‌লাম এক, বুঝ্‌লে আর এক!—কে তোমার সংসারের বোঝা টানে বল দিকিন্?"

হারাধন বলিল, "তুই টান্‌বি, আবার কে টান্‌বে? বিয়ে-টিয়ের কথা মুখে আনিস্‌নে। ছেলে দু'টোকে মানুষ কর, যেন বাপের ভিটেয় 'পিদ্দিম' জ্বলে।"

তাম্বুল চর্বণ করিতে করিতেই ভগিনীর সহিত হারাধনের সন্ধি হইয়া গেল!—সেইদিন হইতে ক্ষেত্রমণি আর ভ্রাতার বিবাহের কথা মুখে আনে নাই। নিতাই হালদার বুড়োকে কন্যাটি 'গছাইয়া' কিছু টাকা আদায় করিবার ফন্দিতে ছিল, তাহার আশা হঠাৎ এইভাবে নির্মূল হওয়ায়, সে শিবু সা'র আব্‌গারি দোকানে গিয়া গঞ্জিকা-ধূমপানে মনঃক্ষোভ নিবারণ করিতে লাগিল।

২

কার্তিক বড় ; তাহার বয়স যখন পনের, আর গণেশের বয়স দশ, সেই সময় বুড়া হারাধন দে তিনদিনের জ্বরে মড়ুইখালির শ্মশানে বাসরযাপন করিতে গেল। তাহার দীর্ঘকালের কামনা পূর্ণ হইল। ক্ষেত্রমণি ভ্রাতৃশোকে আকুল হইয়া জমীদার বৃন্দাবন বাবুর জননীর সঙ্গে কাশীবাস করিতে চলিল। অগত্যা সংসারের সকল ভার কার্তিকের স্কন্ধে পড়িল। সে অনেক শোকতাপ সহ্য করিয়া এই বয়সেই বেশ বিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল। যাহাদের মধ্যে কিছু 'বস্তু' থাকে, তাহারা বিপদে পড়িয়া স্বাবলম্বন শিক্ষা করে ; আর যাহাদের ভিতরটা একেবারেই অসার, তাহারা বানের জলে ভাসমান 'টোপাপানা'র মত ধ্বংসের পথে ভাসিয়া যায়। কার্তিকের ভিতর 'বস্তু' ছিল, সে তাই ছোট ভাইটিকে লইয়া ভাসিয়া গেল না। লেখাপড়া শিখিলে সে মানুষ হইতে পারে,—এই আশায় কার্তিক পুঁটিমারীর ছাত্রবৃত্তি স্কুলে গণেশকে ভর্তি করিয়া দিল। ছোট ভাইটিকে মানুষ করিয়া তোলাই তাহার জীবনের ব্রত হইল।

গণেশ বেশ বুদ্ধিমান ; তাহার স্মরণশক্তিও ভারি তীক্ষ্ণ ছিল। বছর তিনেকের মধ্যে সে ছাত্রবৃত্তি 'পাশ' করিয়া তিন টাকার বৃত্তি পাইল।

পুঁটিমারীর দুইক্রোশ দূরে হাজিনগর মহকুমায় একটি এন্ট্রেন্স স্কুল আছে। হাজিনগরের স্কুলের সম্পাদককে ধরিয়া কার্তিক গণেশকে স্কুলে বিনাবেতনে ভর্তি করিয়া দিল। গণেশ প্রত্যহ বাড়ী হইতে স্কুলে পড়িতে আসিত ; আবার ছুটি হইলে বাড়ী ছুটিত। চতুর্দশবৎসরবয়স্ক বালক এইরূপে প্রত্যহ চারিক্রোশ হাঁটিয়া পাড়ি দিত! এমন ছেলে প্রায়ই মূর্খ হয় না। সে চারিবৎসরে এন্ট্রেস ক্লাশে উঠিল। আর একবৎসর পরে ভাই পাশ হইবে, এবং পাশ হইলেই মুন্সেফী আদালতে একটা আমলাগিরি পাইবে--এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া কার্তিক প্রাণপণ পরিশ্রমে ভ্রাতার অন্নবস্ত্র ও পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করিতে লাগিল। কতদিন দেখা গিয়াছে, গণেশ 'মেঠো' পথ অতিক্রম করিয়া বেলা দশটার সময় স্কুলে আসিতেছে। তাহার পায়ে জুতা নাই ; ধূলা হাঁটু পর্যন্ত মোজা বুনিয়া দিয়াছে ; কাঁধে একখানি ময়লা চাদর—কত জায়গায় ছেঁড়া, তা গণিয়া ঠিক করা কঠিন। পথশ্রমে মুখখানি ম্লান ; সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে। কার্তিক বহু চেষ্টাতেও তাহার জন্য একজোড়া জুতা সংগ্রহ করিতে পারে নাই! যদি কেহ কার্তিককে পরামর্শ দিত, "বিয়ে-থাওয়া কর, কতদিন একা হাতপুড়িয়ে রেঁধে মর্‌বি?"—কার্তিক বলিত, "হুঁঃ, বিয়ে করচি!—এতদিনেও ভাইয়ের পায়ে একজোড়া জুতো জুটোতে পারলাম না। পরের মেয়ে ঘরে এনে 'উপোষ পাড়িয়ে' রাখ্‌বো?"—কার্তিক তখন পর্যন্ত অকৃতদার।

৩

কিন্তু প্রজাপতি কার্তিককে কৃপা না করিয়া ছাড়িলেন না!—পুরন্দরপুরের সাতকড়ি বিশ্বাস পাটের দালালী করিয়া কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল ; তাহার কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ না দিলে নয়। হঠাৎ কার্তিকের ভাই গণেশের উপর তাহার নজর পড়িল। গণেশ ছেলেটি বেশ, লেখাপড়া শিখিলে মানুষ হইতে পারিবে ; আর বিবাহে তাহার কোনও দাবি-দাওয়াও থাকিবে না। সাতকড়ি কার্তিকের নিকট এই বিবাহের প্রস্তাব করিতেই সে মহা আহ্লাদে রাজী হইল ; তখনও কিন্তু কার্তিকের বিবাহ হয় নাই!

পুরোহিত ঠাকুর সাতকড়িকে বলিলেন, "গণেশের সঙ্গে তুমি যে 'প্রেভা'র বিয়ে দিতে যাচ্ছ ; তা যদিস্যাৎ অগ্রে কার্তিকের বিয়েটা হয়ে যেতো, তা হ'লে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু বড়ভাইয়ের বিয়ে না হ'লে ছোটভাইয়ের বিয়ে কেমন করে হ'তে পারে?"

সাতকড়ি বিলক্ষণ সপ্রতিভ। সে বলিল, "কার্তিক ত চির-কুমার।"

যাহা হউক কার্তিকের জন্য নানাদিকে 'কনে' খোঁজ করা হইল ; কিন্তু কেহই তাহাকে মেয়ে দিতে চাহিল না। এমন মূর্খকে কে মেয়ে দিবে?

পাড়ার ছোঁড়ারা ছড়া আওড়াইতে লাগিল ;—

"বড় থাক্‌তে ছোটর বিয়ে,
'মাইতোর' (মধ্যম) বেড়ায় গালে হাত দিয়ে!"

কিন্তু এক্ষেত্রে 'মাইতোর' কেহ ছিল না ; সুতরাং 'মাইতোরে'র কোনও দুশ্চিন্তা না থাকিলেও পল্লী-বধূরা স্নান করিতে গিয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া তুমুল আন্দোলনের তরঙ্গ তুলিতে লাগিল।

শেষে ধর্মরক্ষা হইল। সাতকড়ির এক খাতক ছিল, তাহার নাম রাধু প্রামাণিক। রাধু মুদিখানার দোকান করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিত ; কিন্তু সাতকড়ির কাছে অনেক টাকা কর্জ করিয়া সে 'দেন্‌দার' হইয়া পড়িয়াছিল। সাতকড়ি সুযোগ বুঝিয়া তাহার বাড়ীসমেত তিনকাঠা লাখ্‌রাজ জমি বন্ধকস্বরূপ রেজেস্টারি করিয়া লইল। রাধুকে ভিঁটাছাড়া করিবে—সাতকড়ির এরূপ দুরভিসন্ধি ছিল না। তবে সে রাধুকে ভয় দেখাইয়া যখন-তখন কাহিল করিয়া তুলিত।

রাধুর একটি 'আইবুড়ো' মেয়ে ছিল ; বার বৎসরের মেয়ে—অমাবস্যার অন্ধকারের মত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ; তাহার উপর ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া উদরটি ঢক্কাকার, এবং মস্তকের কেশগুলি প্রায় নিঃশেষিত। সাতকড়ি রাধুর প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বলিল, "তোমাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার ক'রে দিচ্ছি।--তোমার মেয়ের জন্য একটা ভাল 'পাত্তর' ঠিক করেছি।"

রাধু তাহার উত্তমর্ণের সহৃদয়তার কোনও পরিচয় এ পর্যন্ত পায় নাই ; সে কিছু সংশয়াপন্ন হইয়া বলিল, "এ খুব ভাল কথা। ছেলেটি কে?" সাতকড়ি মাথা চুলকাইয়া ঢোঁক্ গিলিয়া বলিল, "ঐ যে কি বলে পুঁটিমারীর--ভাল ছাই নামটাও মনে আস্‌ছে না,—ঐ যে হারাধন দে ছিল,--তারই ছেলে কার্তিকচন্দ্র। ছেলেটি ভাল ; বেশ দু' পয়সা ক'রে খাচ্চে। আর ঘরেও স্ত্রীলোক নেই ; তোমার মেয়ে গিয়ে একেবারে গিন্নি হয়ে বস্‌বে।"

রাধু বলিল, "কার্তিকে! দিব্বি ছেলে ঠিক করেছেন!—আমার মেয়ের বিয়ের কথা হচ্ছে --স্বরূপপুরের জমীদার বিশ্বনাথবাবুর ছেলের সঙ্গে। আপনি বলেন কি? কার্তিকের সঙ্গে আমার সৌদামিনীর বিয়ে দেব! হারু দের ছেলে কার্তিক হবে আমার জামাই?"

সাতকড়ি বলিল, "হাঁ, স্বরূপপুরের বিশ্বনাথ চৌধুরী এ তল্লাটে আর মেয়ে খুঁজে পেলে না! ভাল বল্‌লে মন্দ বোঝো! আচ্ছা তা দেওগে, যেখানে পার তোমার মেয়ের বিয়ে। আমি কিন্তু আস্‌ছে সোমবার মামলা রুজু করবো। এতগুলো টাকা আর ফেলে রাখ্‌তে পারচি নে।"

রাধু ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল।--অবশেষে কার্তিকের সহিত সৌদামিনীর বিবাহেই সে সম্মত হইল। বিবাহের ব্যয়নির্বাহের জন্য সাতকড়ি শতকরা মাসিক তিনটাকা দুই-আনা সুদে রাধুকে একশত টাকা কর্জ দিয়া পরোপকার-ব্রতের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল।

কার্তিকের বিবাহের তিনদিন পরে সাতকড়ি তাহার কন্যা প্রভাবতীর সহিত গণেশের বিবাহ দিল ; এবং এক বৎসর পরেই গণেশ 'এন্ট্রেস' পাশ করিয়া হাজিনগর মুন্সেফী আদালতের নকলনবিশী লাভ করিল।

এতদিনে তাহাদের সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল হইল।--কার্তিক ভাইকে চাকুরে দেখিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সে ভাবিল, সংসার-পালনের জন্য তাহাকে আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইবে না। এতদিনে তাহার চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম সফল হইল ; সে এখন চাকুরে ভাইয়ের দাদা!

এবার কার্তিক সংসারের কর্তা হইয়া বসিল।

মুন্সেফী আদালতের চাকরীতে বেশ উপরি-পাওনা আছে। এমন কি, সাত-আট টাকা বেতনের পেয়াদাগুলি পর্যন্ত মাসে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা উপার্জন করে! অনেক পেয়াদার পায়ে বিলাতী জুতা, এবং গায়ে শাল পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষত মুন্সেফের ডিক্রিজারীর সেরেস্তাটি কমলার মৌচাক। নানা উপায়ে মুন্সেফবাবুর মনোরঞ্জন করিয়া গণেশ বছর দুই মধ্যে ডিক্রি জারীর মুহুরীগিরি লাভ করিল। কমলা সদয়া হইয়াছেন বুঝিয়া গণেশ খড়োঘর ভাঙ্গিয়া পাকা ইমারত নির্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা বাধা উপস্থিত হইল। পুঁটীমারীর জমীদার রাজারাম লাহিড়ী দুর্দ্ধর্ষ লোক। হারাধন দের বাড়ীখানি উঠ্‌বন্দী জমিতে ছিল ; জমীদার গণেশকে জানাইলেন, জমী মৌরুসী না করিয়া সে ইমারত গাঁথিতে পারিবে না ; গণেশও জানিত, উঠ্‌বন্দী জমীতে ইমারত প্রস্তুত করা নিরাপদ নহে। কিন্তু জমীদার তাহার বাস্তুজমি মৌরুসী করিয়া দিতে একদম পঞ্চাশ টাকা 'সেলামী' হাঁকিয়া বসিলেন! জমীদার লাহিড়ী মহাশয় জানিতেন, মুন্সেফী আদালতের ডিক্রীজারী মোহরের পঞ্চাশ টাকা সেলামী দিতে কষ্ট বোধ করিবে না। পঞ্চাশ টাকা ত তাহার দশদিনের উপার্জন!

জামাতার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে সাতকড়ি জামাতার প্রতি অধিকতর স্নেহবান্ হইয়া উঠিল। সে এখন মধ্যেমধ্যে জামাই-বাবাজীউর গৃহে পদধূলি প্রদান করে, এবং নানাবিষয়ে হিতোপদেশ দেয়। গণেশের দাদা সপরিবারে তাহার গলগ্রহ হইয়াছে, এবং তাহার বহুকষ্টে উপার্জিত টাকাগুলি পরের পেট ভরাইতেই ফুরাইয়া যাইতেছে,—এ কথা সাতকড়ি গণেশের হৃদয়ঙ্গম করাইতে কোনদিন চেষ্টার ত্রুটী করিল না। গণেশ প্রথম-প্রথম এই প্রকার হিতোপদেশে কিছু বিরক্ত হইত। যে দাদা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তাহাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছে, নিজে উপবাসী থাকিয়া তাহাকে দুইবেলা আহার দিয়াছে, যে দাদা না থাকিলে সে 'মানুষ' হইতে পারিত না, সেই দাদাকে সে এখন উপার্জনক্ষম হইয়া প্রতিপালন করিতেছে,—ইহা ত তাহার কর্তব্যকর্ম। সুতরাং কার্তিক সংসারের কর্তৃত্ব করিতেছে ইহা গণেশের তেমন অস্বাভাবিক মনে হইত না। কিন্তু সাতকড়ি তাহাকে বুঝাইয়া দিল,—সে যাহা কর্তব্য মনে করিতেছে—সেই কর্তব্যপালন করিতে করিতেই তাহাকে সর্বস্বান্ত হইতে হইবে। বিশেষত, কার্তিকের যখন দুই-চারটি 'কাচ্চা-বাচ্চা' হইবে, তখন তাহার সংসারের ভার বহন করা গণেশের দুঃসাধ্য হইবে। সুতরাং সময় থাকিতে সাবধান হওয়াই কর্তব্য।

কিন্তু কিরূপে সাবধান হওয়া যায়—গণেশ তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে গণেশ শ্বশুরের পরামর্শে একদিন কার্তিককে বলিল, "দাদা, বাড়ীর জমীটা মৌরুসী না করিলে ত পাকা ইমারত তৈয়েরী করা যায় না, আর তা উচিতও নয়। কিন্তু জমীটা মৌরুসী করিয়া দিতে জমীদার ৫০ টাকা নজর চান ; খাজনাও বার্ষিক ছয় আনার জায়গায় তিনটাকা হইবে। জমীদার মশায় বলেন, তিনি যার কাছে নজরের টাকা পাইবেন, লেখাপড়াটা তাহারই নামে হইবে। আপনি যদি টাকাটা যোগাড় করিতে পারেন, তাহা হইলে লেখাপড়াটা আপনার নামেই হয়।"

কার্তিক মূর্খ মানুষ, বিশেষত সে একান্ত ভ্রাতৃবৎসল। গণেশ যে কোনও গুপ্ত অভিসন্ধির বশবর্তী হইয়া এ কথা বলিল, তাহা সে ধারণা করিতেই পারিল না। সে গণেশকে বলিল, "আমি পঞ্চাশ টাকা কোথায় পাব, ভাই? আমার বাপ্‌দাদারা কোনও পুরুষে পাকাঘরে শোন্ নি। তুমিই ইমারত তৈয়েরী করবার মতলব করেছ, জমীদারের সেলামীটাও তুমিই কোনও রকমে জোগাড় করে দাও ; লেখাপড়া তোমার নামেই হোক। আমি ভাই, ও সকল কিছু বুঝি না।"

পঞ্চাশ টাকা নজর পাইয়া জমীদার গণেশের নামেই মৌরুসীপাট্টা লিখিয়া দিলেন।

তখন পাকা ইমারতের গঠনোপযোগী মালমসলা সংগৃহীত হইতে লাগিল।

গণেশ বলিল, "দাদা কিছু ইট খরিদ করা যাক্।"

কার্তিক বলিল, "রামঃ, ইট কিনে ইমারত দেওয়া কি আমাদের পোষায়?--তুমি দশটাকা-হাজার-ইট কিনে বাড়ী তৈয়েরী করতে গেলে ফেরার হবে। আমি বলি কি, তুমি কিছু কয়লার যোগাড় কর, আমি ইট তৈয়েরী করিয়ে দিচ্ছি। তাতে হাজার-করা পাঁচটাকার বেশী খরচ হবে না। একলাখ্ ইট তৈয়েরী কর্তে তোমার বড়জোর পাঁচশো টাকা লাগবে। একটা পাঁজাপোড়ানোতে চারিদিকেই সুবিধা। সুরকীর জন্যে আলাদা ইট্ কিন্তে হবে না ; খোয়া, রাবিস্ সকলই পাঁজাতে পাওয়া যাবে। এমন্ সুবিধা কি ছাড়্তে আছে?"

গণেশ বলিল, "কিন্তু দাদা, তাতে বড় ঝঞ্ঝাট। কে দেখে, কে শোনে? আমি ত নথির তাড়া নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকি ; বাড়ীতে বস্তাবন্দী নথির বোঝা টেনে এনে কাজ শেষ করতে পারি নে।--ইট তৈয়েরীর হাঙ্গামা সব করে কে? দেখা-শোনার লোক কোথায়?"

কার্তিক সোৎসাহে বলিল, "সে জন্য তোমাকে কিছু ভাব্তে হবে না, ভাই! তুমি টাকার জোগাড় দেখ, আমি সব ঠিক্ করে দেব। মেহন্নৎ করতে আমি কোনও দিন কাতর নই। গতর খাটিয়ে যতটুকু যা হয়, আমি তা করতে পারবো।"

কার্তিক ইট প্রস্তুতের ভার লইল। কয়মাস তাহার পরিশ্রমের সীমা রহিল না। সে প্রাণপণ পরিশ্রমে এক লাখ ইটের একটি পাঁজা প্রস্তুত করাইল। ফাল্গুনমাসের শেষে যেদিন সে পাঁজায় আগুন দিল, সেদিন কার্তিকের স্ফূর্তি দেখে কে?

ইট পোড়ান হইলে গণেশ একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাহার শ্বশুরকে বলিল, "দাদা খুব পরিশ্রম করে ইটগুলো পুড়িয়েছেন ; নগদ টাকায় ইঁট কিনতে হলে মব্লগ টাকা লেগে যেতো।"

গণেশের শ্বশুর বলিল, "হ্যাঁ, তোমার দাদাকে পরিশ্রম করতে হয়েছে বই কি? পরিশ্রম ভিন্ন পৃথিবীতে কোন কাজটা হয়? তা তোমার দাদা যে ব্যাগার দিয়েছে ; তা মনে করো না। তোমার এই পাঁজার দৌলতে তোমার দাদার নিতান্ত কম করে ধরলেও, শতখানেক টাকা লাভ হয়েছে। স্বার্থ না থাক্লে কি আর কেউ পরিশ্রম করে?"

গণেশ শ্বশুরের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। ইট কিনিলে তাহার বেশী টাকা খরচ হইবে বলিয়াই কি দাদা পাঁজা পুড়াইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে নাই? সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, এ কোন কাজের কথা নয়!--দাদা মিথ্যা হিসাব দিয়ে আমার পয়সা চুরি করবে? মহাভারত!"

গণেশের শ্বশুর বলিল, "ঐ ত বাবু তোমার দোষ! তুমি মাথা খাটিয়ে, কায়দা করে দু'টাকা উপার্জন করতে পার বটে, কিন্তু আজও মানুষ চিন্তে শেখ নি। তোমার দাদা একটি 'চিজ্'। তুমি গরুর মত খাট্চো, আর তিনি সপরিবারে ব'সে ব'সে 'পাতড়া' মারচেন! আমি না জেনেশুনেই কি আর এতবড় কথাটা বলেছি?--তোমার দাদার শ্বশুর রাধু প্রামাণিক আমার একজন খাতক, তা জানো? আজ কয়েকদিন হ'লো তার কাছে পাওনা টাকা না পাওয়ায় দুই কিস্তী খেলাপের জন্য আমি ডিক্রীজারী করতে উদ্যত হই, তখন সে আমাকে একশত টাকা এনে দিলে ; শুন্লাম, টাকাটা সে তার মেয়ের কাছে পেয়েছে। তা তার মেয়ে--তোমার দাদার স্ত্রী--এতটাকা কোথায় পেলে? তুমি বাবু তোমার দাদাকে যতখানি সরল মনে কর, সে তত সরল নয়।"

এরূপ অকাট্য প্রমাণ পাইয়া আর শ্বশুরের কথায় অবিশ্বাস করিতে গণেশের প্রবৃত্তি হইল না। ক্রমে দাদার উপর তাহার সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠিল ; দাদার হাতে সে খরচের টাকা দেওয়া বন্ধ করিল। ইমারত প্রস্তুত হইতেছে, মিস্ত্রী ও মজুর সঙ্গে সমস্তদিন খাটিয়াই কার্তিক খুসী।--গণেশ সন্ধ্যাকালে নথির বস্তা লইয়া বাড়ী আসিয়া মিস্ত্রীদের দৈনিক মজুরা

স্বয়ং মিটাইয়া দিত ; কার্তিকের তাহাতে অসন্তোষের কোনও কারণ ছিল না।—পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যেই ঘর প্রস্তুত হইয়া গেল।

৫

গণেশ যে ইমারত প্রস্তুত করাইল,--তাহা তেমন বড় নহে ; দুইটি কুঠুরী এবং একটি দালান। দুইটি কুঠুরীর একটি গণেশের ও অন্যটি কার্তিকের বাসের জন্য নির্দিষ্ট হইল।

মাসদুই পরে একদিন গণেশের স্ত্রী প্রভাবতী কার্তিকের স্ত্রী সৌদামিনীকে বলিল, "দিদি, বাড়ীতে মোটে ত ছোট দুটো কুঠুরী ; তার একটা কুঠুরীতে আমার কুলোয় না। তোমার দেওর বল্‌ছিলেন, তিনি তোমাদের জন্যে ঐ গোয়ালখানার পাশে একখান খড়োঘর তুলে দেবেন। আর ধরতে গেলে—এ ঘর বাড়ী ত তোমার দেওরের টাকাতেই হয়েছে ; জমিজিরেতও তাঁর নামেই লেখাপড়া হয়েছিল। এত টাকা খরচ করে যে চিরকাল অসুবিধে সইব, তা কি করে হবে?"

সৌদামিনী এ কথার কোন জবাব দিল না ; সে রাত্রিতে কার্তিককে সকল কথা বলিল। কার্তিক কথাগুলি শুনিয়া খানিকটা দম্‌ ধরিয়া থাকিল। হঠাৎ তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল ; সে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অগত্যা বসিয়া বসিয়া দুই ছিলিম তামাক টানিল। তাহার পর ভগ্নস্বরে স্ত্রীকে বলিল, "কথায় বলে, 'ভাই ভাই—ঠাঁই ঠাঁই'।—দেহের রক্ত জল করে, শরীরপাত করে আমি এ বাড়ী তৈয়েরী করিয়েছি ; পয়সা গণেশের বটে, কিন্তু কেবল পয়সাতেই কাজ হয় না। তা গণেশই এ বাড়ীতে থাক, আমার ঘরে দরকার নেই। আমি পথ দেখ্‌চি।"

প্রভাবতী 'গাঁটা' দিয়া ভাসুরের কথাগুলি শুনিল। কার্তিককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা 'চক্কোর'! বসে বসে দু'জনে 'পাত্‌ড়া' মারবেন, আর সরিকি কর্‌বেন! গতর খাটালেই যদি অট্টালিকা তৈয়েরী হতো, তা হলে এতকাল বাপ্‌দাদার আমোল থেকে কুঁড়েঘরে বাস করতেন না।"

গণেশ একটা হারিকেনের সম্মুখে বসিয়া নথি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বলিল, "তা, কি করি বল? দাদাকে ত আর বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি নে।"

কথাটা সে নিতান্ত ছোট করিয়া বলে নাই। কার্তিক তখন বারান্দা দিয়া সুবল দাস বাবাজীর আখ্‌ড়ায় কীর্তনের দলে খোল বাজাইতে যাইতেছিল। হঠাৎ গণেশের কথাকয়টি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া বলিল, "তাড়াতে হবে না, গণেশ! আমরাই পথ দেখ্‌চি। তোমার বাড়ীতে আমার কোনও দখল নেই, তা কি আর আমি জানিনে?"

কার্তিক প্রস্থান করিলে প্রভাবতী সৌদামিনীর শ্রুতিগম্যস্বরে বলিল, "ওঃ, ভয়ে ত মরে গেলাম! কে এতকাল পথ দেখ্‌তে বারণ করেছিল? দু'পয়সা রোজগার করার ক্ষ্যামতা নেই, ষোল আনা সরিকি, আর আঠারো আনা রাগ! চিরদিন কে দুটো মানুষকে পুষতে পারে?"

সৌদামিনী সংসারের সকল কাজ করিত, রাঁধিবার ভারও তাহার উপরেই ছিল। প্রভাবতীর শরীর খারাপ, আগুনের তাত তাহার সহ্য হইত না ; এবং সখ করিয়া কোনদিন হেঁসেলে যাইলে উনানের ধোঁয়ায় তাহার মাথা ধরিত। আজ মনঃপীড়া পাইয়া সৌদামিনী রাত্রিতে আর রান্নাঘরে গেল না। স্বামীর উপর অভিমান করিয়া শুইয়া রহিল ; কিন্তু সেই পাকাঘরের মেঝের প্রতি ইঞ্চি স্থান যেন কেউটে সাপের মত ফণা তুলিয়া তাহাকে দংশন করিতে লাগিল।

প্রভাবতী গণেশকে বলিল, "দেখ্‌লে আক্কেলখানা? আমাদের জব্দ করবার জন্যে আজ

হেঁসেলে যাওয়া হলো না। এমন হিংসুটে মেয়েমানুষ ভূ-ভারতে কি আর দু'টি আছে?—সেই বেলা ন'টার সময় আধসিদ্ধ ডাল-ভাত নাকে-মুখে গুঁজে গিয়েছ ; রাতে কি খাবে—সে কথাটা একবার ভাবলে না। আমাদের হয়েছে দুধকলা দিয়ে কাল-সাপ পোষা।"

গণেশ বলিল, "চিড়ে-মুড়ী কিছু থাকে তাই ভিজিয়ে দাও, দু'থাবা খেয়ে রাতটা ত কাটিয়ে দিই ; কাল একটা উপায় করা যাবে।"

প্রভাবতী সানুনাসিকস্বরে বলিল, "উপায়ের অভাব কি?—কথায় বলে 'ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব!'—কতদিন থেকে মনে করছি, আমার মাসীমাকে কাছে আনিয়ে রাখি। সময়-অসময়ে ভাত-জল দেবে ; তা রাজ্যের অপুষ্যি পুষ্‌তে তোমার কষ্ট হয় না, আমার মাসী যে দু'দিন এখানে এসে দাঁড়াবেন, তা তোমার সহ্য হয় না।"

"আচ্ছা, সেই ব্যবস্থাই কোরো, আজ রাত্রিটা ত পোহাক্‌।" বলিয়া গণেশ নথির বাণ্ডিল বাঁধিয়া তামাক সাজিতে বসিল। তাহার পর চিড়ার ফলার করিয়া শয্যায় দেহ প্রসারিত করিল।

সংকীর্তন শেষ করিয়া গভীর রাত্রে কার্তিক বাড়ী আসিয়া দেখিল, ঘরে ভাত নাই ; সৌদামিনী মেঝেয় পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

স্বামীকে দেখিয়া সৌদামিনী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া এবং সবেগে নাক ঝাড়িয়া বলিল, "একমুঠো ভাত দেওয়ারই যদি ক্ষ্যামতা নেই, তবে বিয়ে কর্‌তে গিয়েছিলে কেন?"

কার্তিক দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সে কেবল গণেশকে সংসারী করবার জন্যে। ভারি ভুল করে ফেলিচি। তা এখন ত শুধরাইবার উপায় নেই, এখন ঘরে কিছু খাবার-টাবার আছে?"

সৌদামিনী বলিল, "এ ঘরে কিছু নেই, ছোটবৌর ঘরে সাঙ্গার উপর হাঁড়িতে চিড়ে আছে,—আমি তা চাইতে পারব না।"

কার্তিক বলিল, "তার আর দরকার নেই। আজ হরিমটর!"—স্বামী-স্ত্রী সে রাত্রি অনাহারে কাটাইল।

৬

পরদিন প্রভাতে কার্তিক হুঁকাহাতে খড়ম পায়ে দিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল, "দেখ গণেশ, আমি চিরকাল যে বসে-বসে তোমার অন্ন-ধ্বংস করি,—এটা ভাল দেখায় না। আমার শ্বশুর লিখেছিলেন, তাঁদের গ্রামে দত্তদের আড়তে খরিদ-বিক্রীর জন্যে একজন লোকের দরকার আছে, চেষ্টা করলে আমি সে কাজটা পেতে পারি। তা আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। আজই আমি তোমাদের বৌকে সঙ্গে নিয়ে পুরন্দরপুরে যাচ্ছি।"

পুরন্দরপুর পুঁটিমারী হইতে তিনক্রোশ দূর, নদীপথে যাওয়া যায়। হাজীনগর হইতে পুঁটিমারী দুই ক্রোশ।—গণেশ 'বাইসিকলে' এই পথ অতিক্রম করিয়া বাড়ী হইতেই প্রতিদিন আফিসে যাতায়াত করিত।

কার্তিক একখানি ময়লা চাদর কাঁধে ফেলিয়া জেলেপাড়ার দিকে চলিল, এবং বারো আনায় উমেশ হালদারের জেলেডিঙ্গীখানি ভাড়া করিয়া স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য বাড়ী ফিরিল।

সৌদামিনী পিতৃগৃহে যাইবার জন্য তাহার ক্ষুদ্র হলদে পোর্টম্যান্টটি সাজাইয়া, গাঁটরী বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল। আজ সে 'হেঁসেলের' দিকে যায় নাই। এই একদিনেই সংসারের প্রতি সে বীতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছিল। সে কি চিরকাল রাঁধুনীগিরি করিবার জন্য তাহার দেবরের সংসারে আসিয়াছে? স্বামীর উপার্জনে অক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়া সে সর্বদাই মর্মপীড়া ভোগ করিত। এক একবার তাহার মনে হইত, পরিবার প্রতিপালনে যাহার শক্তি নাই সে কেন বিবাহ করে? ভাগ্যে তাহার সন্তানাদি হয় নাই! যদি তাহার গর্ভে দুই-

একটি ছেলে-মেয়ে জন্মিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে কিরূপে প্রতিপালন করিবে, —এই চিন্তায় সেই সন্তানহীনা যুবতীর সন্তানলাভের আগ্রহ তিরোহিত হইত। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিত, "না হয়েছে, বেশ হয়েছে।"—কিন্তু তথাপি সে যখন দেখিত, তাহার দেবরের ছয় বৎসরের মেয়ে হৈমবতী তাহার মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া সোহাগ করিয়া চুমো খাইতেছে, বা মায়ের নিকট কত আবদার করিতেছে,—তখন মুহূর্তের জন্য অপরিতৃপ্ত বাৎসল্যরস তাহার হৃদয়ে কি অতৃপ্তি, কি অভাব জাগাইয়া তুলিত, আমরা পুরুষ-লেখক তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা কোথায় পাইব? সৌদামিনী কখন কখন হৈমবতীকে কোলে তুলিয়া লইত, তাহাকে সোহাগ করিয়া, নানাপ্রকারে তাহার মনোরঞ্জন করিয়া, তাহার শূন্যহৃদয়ের অপূর্ণতা দূর করিবার চেষ্টা করিত। হৈমবতী জেঠাইমার বড়ই বশীভূতা ছিল।

নিষ্কর্মা কার্তিকও হৈমবতীকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছিল। 'জেঠামশায়' তাহাকে তেল মাখাইয়া কোলে লইয়া নদী হইতে স্নান করাইয়া আনিত ; গাছে উঠিয়া পাকাপাকা পেয়ারা পাড়িয়া দিত ; তাহাকে সঙ্গে লইয়া বসিয়া খাইত। জেঠামশায়ের সঙ্গে না খাইলে তাহার পেট ভরিত না। জেঠামশায় তাহাকে কাপড় পরাইয়া না দিলে কাপড়পরা মঞ্জুর হইত না। সুতরাং জেঠামশায় ও জেঠাইমা যখন মাঝির মাথায় মোট দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিল,—তখন হৈমবতী জেঠামশায়কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কোতায় যাচ্ছ, জেঠামশায়, আমি যাবো।" কার্তিক হৈমবতীকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "না, মা! সে অনেক দূর, সেখানে যায় না।" কার্তিকের আপত্তি দেখিয়া সে আরও বাঁকিয়া বসিল। সে তাহার কোল হইতে নামিতে চাহিল না।

গণেশের কাছারীর বেলা হইয়াছিল, সে তখন আহারে বসিয়াছিল। দাদার ব্যবহারে তাহার প্রতি সে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু ঘাড় হইতে এতবড় একটা বোঝা অতি সহজে নামিয়া গেল দেখিয়া, সে যে যথেষ্ট আরাম অনুভব করে নাই, এ কথাও বলা যায় না। সে খাইতে খাইতে মেয়েকে ডাকিয়া বলিল, "খুকি, কেন গোলমাল কচ্ছিস্? আয়, আমার সঙ্গে ভাত খেতে।"—অন্যদিন হইলে হয় ত সে যাইত, কিন্তু সে আজ সে কথা গ্রাহ্যও করিল না।

আজ প্রভাবতীর আগুনের আঁচে তেমন কষ্ট হয় নাই ; সে সকালে উঠিয়াই স্বামীর কাছারীর ভাত রাঁধিতে রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। সে ঘোমটা টানিয়া, নথ ঘুরাইয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ডাকিল, "হেমা, এদিকে আয় বল্‌ছি। কোন্ চুলোয় যাবেন, তার ঠিক নেই।"

এবার কার্তিক জোর করিয়া ভাইঝিকে মাটিতে নামাইয়া দিল। সে মাটিতে পড়িয়া দুই পা দাপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "জেঠামশায়, আমাকে নিয়ে যাও, জেঠামশায়! তোমার পায়ে পড়ি, জেঠামশায়!"

কার্তিক সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পত্নীসহ দ্রুত বাড়ীর বাহির হইয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিল। সৌদামিনীর চক্ষু দু'টিও ছলছল করিতেছিল। সে একবার সতৃষ্ণনয়নে তাহার বাসগৃহের দিকে চাহিয়া বনচ্ছায়াশ্যামল নদীর পথে অগ্রসর হইল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিঃশব্দে চলিতে লাগিল। বহু দূর হইতে প্রভাতবায়ুতে যেন সেই ভূমিলুণ্ঠিতা, রুদ্যমানা, ব্যথিতা বালিকার মর্মভেদী আর্তনাদ ভাসিয়া আসিয়া তাহাদের কর্ণমূলে প্রবেশ করিতে লাগিল, "আমাকে নিয়ে যাও, জেঠামশাঁয়! তোমার পায়ে পড়ি!"

৭

কার্তিকের শ্বশুরের স্ত্রী ভিন্ন আপনার বলিতে সংসারে আর কেহ ছিল না। তাহার পর্ণকুটীরে আসিয়া কার্তিক ও সৌদামিনীর দিন সুখেদুঃখে একরকম কাটিতে লাগিল।

পুরন্দরপুরে দত্তদের আড়তে কার্তিক আট টাকা বেতনের একটি চাকরী পাইয়াছিল; পাইকেরদের মালপত্র ওজন করিয়া দিতে হইত, এবং বিভিন্ন গ্রামে পাইকেরদের বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া প্রাপ্য টাকার তাগাদা করিতে হইত।

পুঁটিমারী গ্রামেও দত্তদের পাইকের ছিল। পুঁটিমারীর প্রামাণিক ও বসাক মহাশয়েরা বনিয়াদী তন্তুবায়। যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা বলেন, "গৌরদাস বসাক আমাদের 'আজা মশায়' হইতেন"। যাঁহারা শিক্ষিত হন নাই, তাঁহারা মামাতো ভাই বা খুড়্‌তুতো দাদা কালাচাঁদ বসাক উকীল মহাশয়ের ফরাসে বসিতে পান না,—'কল্‌কে পাওয়া' ত দূরের কথা!—অগত্যা তাঁহারা ঘরে বসিয়া তাঁত বোনেন, কেহ বা 'অটোনিটার' কল আনাইয়া মোজা বোনেন, এবং 'স্বদেশী মোজা ফ্যাক্টরী বলিয়া রাস্তায় 'প্ল্যাকার্ড' মারেন। ইহাদের অনেকেই পুরন্দরপুরের দত্তদের পাইকের।

কার্তিক মধ্যেমধ্যে পুঁটিমারীতে তাগাদায় যাইত, বোধ করি একটু ঘনঘনই যাইত। সে যখনই যাইত,—একবার 'গণেশের বাড়ী'তে প্রবেশ করিত ;—তাগাদার জন্য নহে—তাহার ভাই-ঝি হৈমবতীকে দেখিবার জন্য। হৈমবতীর জন্য তাহার হৃদয় সর্বক্ষণ হাহাকার করিত। সে কখন দু'টি রসগোল্লা, কখন দু'খানা বড় জিলিপি লইয়া, চোরের মত তাহার আজন্মের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে ডাকিত, "হেমা!" হৈমবতী উত্তর না দিলে তাহার বুকের মধ্যে দুরুদুরু করিয়া উঠিত! হেমা ভাল আছে ত?—যদি হঠাৎ সে ছুটিয়া গিয়া "জেঠামশায় এসেছে রে!" বলিয়া তাহার ধূলিধূসরিত, মলিনবস্ত্রাচ্ছাদিত জানু ধরিয়া, বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার কোলে উঠিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত, তাহা হইলে কার্তিকের মুখে হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। কার্তিক তাহাকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিত। বহু কষ্টে সে তাহাকে কোল হইতে নামাইয়া, সন্দেশ দু'টি হাতে দিয়া, যখন গৃহত্যাগ করিত, তখন তাহার বুকের ভিতর হইতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠিয়া শূন্যে মিলাইত, তাহা সে বুঝিতে পারিত না।

একদিন প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া সে ভ্রাতৃবধূর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল, "মিন্‌সে নিত্যি আসেন মায়া দেখাতে! ভেবেছেন, এমনই করে ভুলিয়ে আবার এ বাড়ীতে ঢুক্‌বেন। তা হচ্ছে না! একদিন মুখের মত জবাব পাবেন। এসে আবার হুঁকো-কল্‌কের খোঁজ করা হয়! বেহায়া মিন্‌সে!—ও সন্দেশ ফেলে দে, হেমা! তোকে [illegible]-টোসুদ করবে ব'লে সন্দেশ দিয়েচে! বিশ্বাস কি? ফাল্ বল্‌চি!"

হেমা সন্দেশ দু'টি দুইহাতে বুকের মধ্যে আঁকড়িয়া ধরিয়া কাঁদো-কাঁদো মুখে বলিল, "জ্যাঠামশায় দিয়েছে, আমি খাবো। আমি ফেল্‌বো না।"

মুহূর্তপরে হেমার পৃষ্ঠে সবেগে চপেটাঘাত ও তাহার হাত হইতে সন্দেশের ভূপতন! ভোলা কুকুরটা এক লম্ফে আসিয়া তাহা গ্রাস করিল। তাহার পর লাঙ্গুল আন্দোলিত করিতে করিতে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে হেমার মুখের দিকে চাহিয়া ডাকিল,—"ভাউ!"

প্রাচীরের বাহিরে কার্তিক ক্ষণকাল বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহার পর মাতালের মত টলিতে-টলিতে চলিয়া গেল। পাঁচ বৎসরের মধ্যে কার্তিক আর পুঁটিমারীর বাড়ীতে প্রবেশ করে নাই! এই পাঁচ বৎসরে তাহার চুল অনেক পাকিয়া গেল। যৌবনেই তাহাকে বুড়া বোধ হইতে লাগিল। এক-একদিন সে স্বপ্নঘোরে কাতর কণ্ঠে ডাকিত, "হেমা! হেমা!"

৮

পাঁচ বৎসর পরে হৈমবতীর বিবাহ। গণেশ তখন মুন্সেফী আদালতের পেস্কারী লাভ করিয়া, দুইহাতে উপরি লুটিয়া লাল হইয়া গিয়াছিল! পূর্বাবস্থার কথা আর তাহার মনে ছিল

না। কার্তিক নামে তাহার একটি বর্ণজ্ঞানহীন, ভদ্রসমাজে বসিবার অযোগ্য, অসভ্য দাদা আছে,—এ কথা মনে হইলে লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিত। হৈমবতীর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, সে তাহার মূর্খ দাদার সহিত পরামর্শ করা অতি অপমানজনক মনে করিল। তাহাকে সংবাদ পর্যন্ত দিল না!

তিনক্রোশ দূরে চিংড়িপোতা গ্রামে, নরহরি বিশ্বাসের জ্যেষ্ঠপুত্র ভজহরির সহিত হৈমবতীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। নরহরি বিশ্বাস গ্রামের একজন মাতব্বর গৃহস্থ। বাড়ীটি পাকা, এবং ছেলেটি চিংড়িপোতার মাইনর ইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ক্রমাগত তিনবৎসরকাল অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যার বনিয়াদ পাকা করিতেছিল। বিশেষত, নরহরি সঙ্গতিপন্ন মহাজন ও প্রচণ্ড সুদখোর বলিয়া সন্নিহিত পল্লীসমূহে অসামান্য প্রতিপত্তি সঞ্চয় করিয়াছিল। সুতরাং গণেশচন্দ্র কিছুদিন যাবৎ মহা উৎসাহে কলা-মূলার মত তাহার পুত্রের দরদস্তুর করিয়া অবশেষে অনেক বেশী দাম দিয়া ভজহরিকে কিনিয়া লইল ;—বিবাহের কথা পাকা হইয়া গেল।

আষাঢ় মাসে বিবাহ। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে গণেশচন্দ্র চিংড়িপোতায় ঘরবর দেখিতে গেল। পাঁচ টাকা দিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা হইল ; সঙ্গে চলিলেন, গণেশচন্দ্রের জ্যেঠ্শ্বশুরের ভায়রাভাইয়ের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত পঙ্কজলোচন মজুমদার L. A. F (অস্যার্থ, এল, এ, ফেল,—ইনি তাঁহার পিতাঠাকুর চাঁদপুরস্থ দাঁয়ের দোকানের গোমস্তা রামচন্দ্র মজুমদারকে পত্র লিখিবার সময় নিজের নামের শেষে এই লেজুড় জুড়িয়া দিতেন)। পঙ্কজলোচন বাবু বহুদিন হইতে হাজীনগর এন্ট্রেন্স স্কুলে চতুর্থ-শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন ; শিক্ষকতা করিতেন বলিলে, সত্যের অপলাপ করা হইবে ; কারণ, তিনি হাজীনগর স্কুলের সম্পাদক উকীল খুদিরাম বাবুর সর্বশ্রেষ্ঠ মোসাহেব ছিলেন। রাত্রে উকীল বাবুর সহিত পাশা খেলিতেন, প্রভাতে গৃহস্থালির কাজ দেখিতেন, মধ্যাহ্নে ক্লাশে বসিয়া ঝিমাইতেন। কখন-কখন নিদ্রা অপরিহার্য হইয়া উঠিলে—সম্মুখস্থ টেবিলে পা তুলিয়া দিয়া, চেয়ারে ঠেস্ দিয়া 'হা' করিয়া ঘুমাইতেন ; এবং হঠাৎ চৈতন্যোদয় হইলে ছাত্রবৃন্দকে 'লেখ্‌রে লেখ্' বলিয়া হুঙ্কার দিয়া পুনর্বার নাসাগর্জন আরম্ভ করিতেন! একদিন হেড্‌মাস্টার তাঁহাকে এবম্বিধ অবস্থায় দেখিয়া, তাঁহাকে ডাকিয়া ঘুম ভাঙ্গাইলেন ; সমগ্র ছাত্রমণ্ডলীর সম্মুখে তাঁহাকে তিরস্কার না করিয়া বলিলেন, "চেয়ার ঠেস্ দিয়াও ত মাস্টার মশায় বেশ ঘুমাইতে পারেন!"—পঙ্কজলোচন মুখব্যাদানপূর্বক আকণ্ঠ-প্রসারিত হাই তুলিয়া দক্ষিণ হস্তে সবেগে তুড়ি দিয়া বলিলেন, "তবু ত মাথায় বালিস ছিল না!" হেড্‌মাস্টার স্কুলের সেক্রেটারী খুদিরাম বাবুর নিকটে গিয়া পঙ্কজলোচনের নিদ্রালুতার কাহিনী বর্ণনা করিয়া, বালিসের রহস্য ভেদ করিলে—খুদিরাম বাবু মুখবিবর হইতে ধূমপুঞ্জ নিঃসারিত করিয়া বলিলেন, "লোকটা ভারি রসিক, ঐ গুণেই আমি ওকে ভালবাসি। কথাটার দাম লাখ্ টাকা! বাদ্‌সার মজলিসে এমন কথা বল্‌লে একখান জায়গির বক্‌শিশ হয়ে যেতো।"

এ হেন রসিক পঙ্কজলোচন,—গণেশচন্দ্রের সঙ্গী হইলেন। ভবজলধি বাবু হাজীনগরের ফৌজদারী আদালতে মোক্তারী করিতেন,—তিনিও সঙ্গী হইলেন। ভবজলধি খ্যাতনামা মোক্তার ; তাঁহার তেজস্বিনী বক্তৃতায় ভীত হইয়া হাকিম তাঁহাকে মামলা জিতাইয়া দেন, হাজীনগরের জনসাধারণের মনে এইরূপ ধারণা ছিল। তিনি একটু নাকিসুরে কথা কহিতেন। শওয়াল-জবাবে সুদক্ষ ছিলেন বলিয়া গণেশ তাঁহাকেও সঙ্গে লইল। গণেশচন্দ্রের মুরুব্বী গ্রাম্যবিগ্রহ গোপালদেবের পুরোহিত হরচন্দ্র 'দাদাঠাকুর' মহাশয়ও পাত্র আশীর্বাদ করিতে গণেশচন্দ্রের সঙ্গে চলিলেন।

হরচন্দ্র দাদাঠাকুর কিন্তু সরলপ্রকৃতির লোক ; এই জন্য বৈষয়িকেরা তাহাকে 'বোকা' বলিত। কেহ কেহ মজা দেখিবার জন্য একদিন বলিল, "হরচন্দ্র দা, তুমি না কি নানারকম

মন্ত্রতন্ত্র জান ; আচ্ছা, ঐ বোল্‌তার চাক্‌খানাতে তোমার লাঠির খোঁচা দেও দেখি!"

হরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ টিকিতে ভাল করিয়া গেরো দিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তোমরা সব সরে যাও! বোল্‌তায় তাড়া করবে কিন্তু—" সঙ্গে সঙ্গে হরচন্দ্র বোলতার চাকে এক খোঁচা দিলেন। দর্শকগণ উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। সুতরাং ক্রুদ্ধ বোল্‌তাগুলা বোঁ বোঁ শব্দে ছুটিয়া আসিয়া হরচন্দ্রের সর্বশরীরে 'হুল্‌'-চালনা করিল। হরচন্দ্র লাঠি ফেলিয়া দিয়া, কাঁধের চাদর ঝাড়িতে-ঝাড়িতে নৃত্য করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ওঃ,—খেয়ে ফেল্লে রে বাবা!" কিছুকাল পরে মজা-উপভোগলিপ্সু ভদ্রসন্তানেরা সেই স্থানে আসিয়া সমবেদনাভরে বলিলেন, "আহা, হরচন্দ্রদাকে আধমরা করেছে ; বোলতার হুলের চোটে দাদাঠাকুরের গাল, কপাল ফুলে উঠেছে।"—হরচন্দ্র দাদা হাসিয়া বলিলেন, "ফোলে, কিন্তু জ্বলে না!"—এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমতাশালী দাদাঠাকুরও ঘোড়ার গাড়ীর 'সোয়ারী' হইলেন।

গাড়ীতে উঠিবার সময় দাদাঠাকুর গণেশকে বলিলেন, "আহা মস্ত একটা ভুল হয়ে গেল!—কার্তিককে খবরটা দেওয়া হলো না?—সে হ'লো মেয়ের জ্যাঠা।"

গণেশ কার্তিকের প্রসঙ্গে চটিয়া আগুন হইয়া বলিল, "তোমার যেমন কাণ্ডজ্ঞান নেই, দা-ঠাকুর! ভদ্দোরলোকের বাড়ী তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাচ্ছ? তার ফাটা-পা নিয়ে যখন বেয়াই-মশায়ের ফরাসে বসবে ; তখন আমার কি বল্‌তে ইচ্ছা হবে না,—'মা বসুন্ধরে, তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি।"

দাদাঠাকুর বলিলেন, "তা না নেও, চল ; কিন্তু মা বসুন্ধরা তোমার আবদার শুনবেন না ; অনেক পাপিষ্ঠকে বুকে বয়ে বয়ে তাঁর বুক পাষাণ হয়ে গিয়েছে।"

পাকাদেখা শেষ হইলে, আষাঢ় মাসের যে দিন হৈমবতীর বিবাহ, তাহার পূর্বদিন সকালে গণেশের নাপিত ঈশ্বর পরামাণিক একখানি পত্র লইয়া পুরন্দরপুরে উপস্থিত হইল, এবং পত্রখানি কার্তিকের হস্তে প্রদান করিল। ইহা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র ; পত্রের নিচে লেখাছিল--"লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষম বিধায় ত্রুটী মার্জনা করিবেন।"

কার্তিক পত্রখানি পাঠ করিয়া দোকানের একটা বস্তার উপর বসিয়া পড়িল! তাহার প্রাণাধিকা ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ, অথচ এ পর্যন্ত তাহাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।! আজ সে কুটুম্বের মত নিমন্ত্রিত হইতেছে। এই ভাইক সে নিজে না খাইয়া মানুষ করিয়াছে ; স্বয়ং মোট-বহিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছে। তাহার দুই চক্ষুতে দুইবিন্দু অভিমানের অশ্রু দেখা দিল।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া গণেশ মনিবের নিকট হইতে ছুটি লইয়া বাড়ী গেল ; নিমন্ত্রণপত্রের কথা স্ত্রীকে বলিয়া, কি দেওয়া যায় এবং বিবাহে যাওয়া উচিত কি না, তৎসম্বন্ধে স্ত্রীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল।

সৌদামিনী বলিল, 'মেয়ের বিয়ে, ঠাকুর পো একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে না ; আমাদের নিয়ে যাবার নামটি নেই। এক নেমন্তন্নপত্র পাঠিয়েই দায় সেরেছে! সেখানে কখন যাওয়া উচিত নয়। যদি তুমি তার রোজগেরে ভাই হতে, তা হ'লে কি এমন 'হেনেস্তা' করতে পারতো? তবে কিছু নকুতা পাঠাতে হবে।—একখান বগিথাল কিনে একথাল সন্দেশ গোবিন্দর মাকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও।"

হাতে টাকা ছিল না, কার্তিক তাহার সোনার অঙ্গুরীটি বাঁধা দিয়া আটটি টাকা আনিল ; এবং রামহরি নন্দনের দোকান হইতে একখানি খাগড়াই বগিথাল ছয় টাকা দিয়া কিনিয়া আনিয়া দু'টাকার রসগোল্লাসহ 'আইবুড়ো ভাত' পাঠাইল।--সেইদিনই হৈমবতীর বিবাহ।

গোবিন্দর মা প্রত্যূষে বাহির হইয়া বেলা দশটার সময় ঘর্মাক্ত-কলেবরে গণেশচন্দ্রের উৎসবভবনে উপস্থিত হইল।

ভাসুরের নিকট হইতে বিবাহের তত্ত্ব আসিয়াছে শুনিয়া গণেশপত্নী প্রভাবতী বাহিরে আসিয়া একবার অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে রসগোল্লাপূর্ণ থালখানির দিকে চাহিল ; তাহার পর নথ সরাইয়া বলিল, "ভাইঝির বিয়ে, নিজে এলেন না, তত্ত্ব পাঠিয়েছেন! লোক-দেখানো বড়-মান্‌সি!—তা, ও তত্ত্ব নিয়ে আমি খোঁটা সইতে পারবো না। যার ইচ্ছে হয় সে রাখুক ওগুলো ; আমি ঘরে তুল্‌চি নে।"

'যার ইচ্ছা হয় সে'—অর্থ গণেশ।—গণেশ আসিয়া বলিল, "ওঃ—দাদার কি দরদ!—না গো বাছা, ও তত্ত্ব তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও, দু টাকার জিনিস্ রেখে পরে কে দশকথা শুন্‌বে? তোমাদের কর্তাকে বোলো, আমি আমার মেয়ের বিয়েতে জ্ঞাতি-কুটুম্বদের কাছে নকুতা চাই নে।"

গোবিন্দর মা যে-মুখে আসিয়াছিল, সেই-মুখে চলিয়া গেল। একমুঠো চিঁড়ে-মুড়কীও তাহার ভাগ্যে জুটিল না।

দেবর তত্ত্ব ফেরত দিয়াছে দেখিয়া সৌদামিনী অভিমানে, অপমানে অভিভূত হইয়া পড়িল ; স্বামীকে বলিল, "তোমার চাকুরে ভাই গরীবের তত্ত্ব ফেরত দিয়েছে! এত অহঙ্কার! ভগবান কি এর বিচার করবেন না?"

কার্তিক বলিল, "তার যা ভাল মনে হয়েছে, তা করেছে। আমি হেমাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি ; আজ তার বিয়ে, আজ বড় আনন্দের দিন, গিন্নি ; ভগবান গণেশের মঙ্গল করুন, সে আমাদের যতই অপমান করুক, অশ্রদ্ধা করুক, আমরা যেন কখন তার মন্দ চিন্তা না করি।"

কিন্তু মুখে এ কথা বলিলেও, সহোদরের ব্যবহারে কার্তিকের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইতে লাগিল ; কোনরকমে আত্মসংবরণ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইল। সে তাহার দারিদ্র্যযন্ত্রণা মর্মে মর্মে অনুভব করিতে লাগিল। আজ হৈমবতীর বিবাহ, এমন দিনে সে একবার তাহাকে চোখেও দেখিতে পাইল না। কার্তিক অন্তর্যাতনায় ছটফট্ করিতে লাগিল। তাহার মনের কষ্ট কাহাকেও বুঝাইবার নহে ; মনের বেদনা সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না।

কার্তিক সমস্ত দিন অস্থিরভাবে এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া, অপরাহ্ণকালে তাহার ময়লা চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া, মোটা লাঠিগাছটা হাতে লইয়া পুঁটিমারী গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিল। রাত্রি চারিদণ্ড উত্তীর্ণ হইলে সে আলোক-সমুজ্জ্বল উৎসব-ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

তখন গণেশের গৃহে মহাসমারোহ। বিবাহ আরম্ভ হইয়াছিল। বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী বিবাহ-সভায় বসিয়া নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিয়াছেন ; ডাবাহুকায় ঘনঘন তামাক চলিতেছে। বাহিরে চাটাই ও মাদুরের উপর ঢুলি-বাদ্যকরেরা বসিয়া গাঁজায় দম্ দিতেছে। রসুন-চৌকীরদল আটচালা-ঘরের দাওয়ায় বসিয়া একটি মিষ্টি গৎ বাজাইতেছে ;—এবং অন্তঃপুর হইতে বহু রমণীর কণ্ঠে ঘনঘন হুলুধ্বনি উত্থিত হইতেছে।

কার্তিক সকলের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া বিবাহসভার একপাশে গিয়া দাঁড়াইল। এবং নির্নিমেষ নেত্রে হৈমবতীর দিকে চাহিয়া রহিল। হৈমবতীর মুখ তখন লাল চেলির অবগুণ্ঠনে আবৃত ; সে জেঠামহাশয়কে দেখিতে পাইল না।

বিবাহ শেষ হইলে, পুরোহিত বলিলেন, "গণেশ, এখন মেয়েজামাইকে আশীর্বাদ করিয়া ঘরে তোল। গুরুজন যে যে উপস্থিত আছেন, সকলেই বর-কনেকে আশীর্বাদ করুন।"

তখন কার্তিক আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে সমাগত বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীর ভীড় ঠেলিয়া ছান্‌লাতলায় গিয়া দাঁড়াইল, এবং বরণডালা হইতে ধানদূর্বা তুলিয়া লইয়া হৈমবতীর মাথায় দিয়া আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "মা, আশীর্বাদ করি, জন্ম-'এয়োস্ত্রী'

হও, পাকা চুলে সিঁদুর পর, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক ; আমি তোর গরীব জেঠা, আমার আর কি সম্বল আছে, যে তাই দিয়ে মা তোকে আশীর্বাদ করবো?"

এমনস্থানে এমনভাবে জেঠাকে দেখিতে পাইবে হৈমবতী তাহা একবারও ভাবিতে পারে নাই। সে মুখ তুলিয়া চকিতনেত্রে জেঠার মুখের দিকে চাহিল। স্থান কাল সে বিস্মৃত হইল, লাল চেলির অবগুণ্ঠন মাথা হইতে খসিয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা হইল, সে ছেলেবেলার মত তাহার জেঠার কোলে লাফাইয়া উঠিয়া, তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লয়! কিন্তু সে তাহা পারিল না, লজ্জা আসিয়া বাধা দিল ; তাহার কজ্জলরঞ্জিত চক্ষু হইতে অশ্রুধারা ঝরিয়া গণ্ডস্থিত চন্দনচর্চা ধৌত করিল। চোখের জলে তাহার অবগুণ্ঠন ভিজিয়া গেল ; সে চারিদিক ঝাপ্‌সা দেখিতে লাগিল।

কিন্তু এমন স্থানে, এমন সময়ে, মলিন-বস্ত্রপরিহিত সেই অসভ্য চাষাটাকে উপস্থিত দেখিয়া বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী উভয়পক্ষই বিস্ময় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল! লজ্জায়, ঘৃণায় গণেশের মাথা যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল!—গণেশের বৈবাহিক নরহরি বিশ্বাস কার্তিককে চিনিত না। সে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ লোকটা কে হে, ব্যাই!"

গণেশ উত্তর দিবার পূর্বেই কার্তিক বলিল, "কেমন করে চিন্‌বে মশাই! মাথায় মোট ব'য়ে যাকে মানুষ করেছি, সেই যে চেনে না!"

তাহার পর সে নৈশ অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হইল—কেহ দেখিতে পাইল না ; এবং কেহ তাহার সন্ধান লওয়াও আবশ্যক মনে করিল না।

ফাল্গুন ১৩২২

মৃত্যু

অজিতকৃষ্ণ বসু

"কিন্তু মৃত্যু যখন আসে তখন তাকে কি ঠেকিয়ে রাখা যায় ডাক্তারবাবু?" বলিয়া শশাঙ্কবাবু ডাক্তার গুরুপ্রসাদ মিত্রের সদাহাস্যোজ্জ্বল মুখের পানে তাকাইলেন। হাসিয়া গুরুপ্রসাদবাবু কহিলেন, "এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার একটা মুস্কিল আছে শশাঙ্কবাবু। জবাব যা দেবো, তার হয় তো প্রমাণ দিতে পারবো না। কারণ মৃত্যু হয়ে গেলে লোকে বল্‌বে মৃত্যুকে ঠেকানো গেল না ; আর যদি বা ঠেকানো গেল, তা হলে লোকে বলবে মৃত্যু আসে নি। কারণ মৃত্যু যতক্ষণ না প্রাণটা ছিনিয়ে নিয়ে যায় ততক্ষণ তো তাকে মৃত্যু বলে চিন্‌তে পারি না!...কিন্তু আমি বিশ্বাস করি শশাঙ্কবাবু, যে মৃত্যুকে সত্যিই ঠেকানো যায়—অবশ্য ঠেকাতে জানা চাই।"

ডাক্তার গুরুপ্রসাদের কণ্ঠস্বরে এবং বলার ভঙ্গিতে দৃঢ় বিশ্বাসের অভিব্যক্তি শশাঙ্কবাবুকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাঁহার যেন বিশ্বাস হইতে লাগিল ডাক্তারবাবুর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য ; মৃত্যুকে ঠেকানো যায়, ইহার চাইতে বড় সত্য যেন আর জগতে নাই। কিন্তু এ বিশ্বাস কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই আবার হতাশায় তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল। তাহার কানের কাছে কে যেন বার বার বলিতে লাগিল যে মৃত্যু এবার গোপালকে গ্রাস করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এবার আর তাহাকে ঠেকানো যাইবে না।

"মৃত্যুকে মানুষ যদি সত্যিই ঠেকাতে পারতো ডাক্তারবাবু" শশাঙ্কবাবু কহিলেন, "তাহলে মানুষ কি অমর হয়ে যেতো না? ভগবান মানুষের কাছে এত বড় পরাজয় স্বীকার করবেন . এ কি ভাবা যায়?"

ডাক্তারবাবুর চোখ দুটি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "কেন ভাবা যাবে না শশাঙ্কবাবু? চিকিৎসাবিজ্ঞান যেরকম দ্রুত উন্নতি করে চলেছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে হোক্ বা সুদূর ভবিষ্যতেই হোক্ মানুষ যে অমর হবার উপায় আবিষ্কার করতে পারবে না এ কথা জোর করে বলা যায় না। আর কেউ বিশ্বাস করুক বা নাই করুক শশাঙ্কবাবু, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি—দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি, অমর হবার উপায় মানুষ একদিন আবিষ্কার করবেই করবে। এই আবিষ্কারের পথে আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র এখনই অনেকটা এগিয়ে গেছে।..."

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুগভীর আশ্বাসের সুরে কহিলেন, "আপনি একেবারে নিঃসংশয় থাক্‌তে পারেন শশাঙ্কবাবু। মৃত্যু এ যাত্রা আপনার বাড়ীর ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারবে না। আপনার ছেলের সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন। অবশ্য কেস্ যে অত্যন্ত সিরিয়াস্ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই এবং সেজন্যই আমায় ডেকেছেন। কেস্ সিরিয়াস্ না হলে ডাক্তার গুরুপ্রসাদকে কেউ ডাকে না, আর বাস্তবিক সিরিয়াস্ না হলে সে কেস্ গুরুপ্রসাদ ডাক্তার হাতেও নেয় না। হাঃ হাঃ হাঃ।"

বিজ্‌লী বাতির সুইচ টিপিয়া দিলে চকিতে যেমন অন্ধকার দূর হইয়া যায়, গুরুপ্রসাদ ডাক্তারের হাসিতে তেমনি শশাঙ্কবাবুর মনের চিন্তাঘোর যেন এক নিমেষে কাটিয়া গেল। এই অদ্ভুত ডাক্তারটির অদ্ভুত চিকিৎসানৈপুণ্য সর্বজনবিদিত। অনেকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী বলিয়া থাকেন। ইহাতে কিছুটা অতিরঞ্জন হয় তো হয়, কিন্তু তাহাতে এ পর্যন্ত

কাহাকেও আপত্তি করিতে শুনা যায় নাই।

শশাঙ্কবাবু প্লুতকণ্ঠে কহিলেন, "আপনার হাতেই আমার গোপালকে সঁপে দিয়ে তাই অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আছি ডাক্তারবাবু। সবাই তো জবাব দিয়ে গেছে..."

"কিন্তু আমি শুধু প্রশ্নই করবো, জবাব দেবো না। হাঃ হাঃ হাঃ।" ডাক্তার গুরুপ্রসাদ বলিলেন—'সত্যি শশাঙ্কবাবু, জবাব দেওয়া যেন আমার কোষ্ঠীতে লেখে নি। অন্য ডাক্তাররা যাই বলে থাকুন, মৃত্যু কথাটাই আপনার মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন। মৃত্যুকে নিশ্চয়ই ঠেকানো যায়, আর কেমন ক'রে যায় সেটা ডাক্তার গুরুপ্রসাদ মিত্র কিছু কিছু জানে। তার প্রমাণ অনেক পেয়েছেন।...

আপনার ছেলের মাত্র পঁচিশ বছর বয়েস, জীবনী শক্তি ওর ভেতর প্রচুর রয়ে গেছে। শুধু রোগের চাপে একটু ঝিমিয়ে পড়েছে, তাকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। সেটাই হচ্ছে আমার কাজ। যমে মানুষে লড়াই বলে একটা কথা শুনেছেন তো শশাঙ্কবাবু? সে ব্যাপারটা ঘটাবার এবং যমকে হটাবার একজন মাত্র লোক যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে থাকে তো সে এই ডাক্তার গুরুপ্রসাদ মিত্র বলিয়া ডাক্তারবাবু যে হাসি হাসিলেন তাহাতে আত্মগরিমা হইতে আত্মবিশ্বাসের গভীরতাও অনেক বেশী। সে হাসি শূন্যগর্ভ কলসীর বৃহৎ শব্দ নহে ; অমিতশক্তিমান সমুদ্রের গম্ভীর নিনাদ।

উকীল শশাঙ্কবাবু বত্রিশটি টাকা পকেটে লইয়া ডাক্তার গুরুপ্রসাদবাবু তাঁহার গাড়ীতে উঠিলেন এবং শোফারকে চালাইতে হুকুম দিবার পূর্বে শশাঙ্কবাবুকে আরেকবার আশ্বাস দিলেন যে তিনি যখন কেস্ হাতে লইয়াছেন তখন গোপালের সাধ্য নাই যে মারা যায়, অথবা মৃত্যুর সাধ্য নাই গোপালকে ছিনাইয়া নেয়--গোপালকে তিনি বাঁচাইবেনই।

একমাত্র সন্তান গোপাল। ইহার প্রাণের বাতি নিভিয়া গেলে বংশে বাতি দিতে কেহ থাকিবে না। পরপর তিনটী সন্তান হারাইয়া পত্নী প্রিয়বালা ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন ; এবার সবেধন নীলমণি গোপালকেও হারাইলে তিনিও আর প্রাণে বাঁচিবেন না। ভাবিয়া শশাঙ্কবাবু শিহরিয়া উঠিলেন। এত যত্নে যে বাগান সাজাইয়াছিলেন সে বাগান এমন করিয়াই কি শুকাইয়া যাইবে?

গোপালের রোগম্লান মুখের পানে তাকাইয়া শশাঙ্কবাবু নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য! রোগ কি অসাধ্য সাধনই না করিতে পারে! যাহার বিশাল ব্যায়ামপুষ্ট দেহ বাঙালীর গৌরব ছিল সে আজ কঙ্কালের মত শীর্ণ হইয়া বিছানার সঙ্গে যেন মিশাইয়া গিয়াছে!

অসম্ভব। মৃত্যু যাহার শিয়রে বসিয়া ক্রূর হাসি হাসিতেছে তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিবেন গুরুপ্রসাদ ডাক্তার? বাতুল, উন্মাদ না হইলে এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? কিন্তু না করিবারই বা কি আছে? গুরুপ্রসাদবাবু তো সাধারণ ডাক্তার নন! বিশ্বাস হইতে অবিশ্বাসে, অবিশ্বাস হইতে বিশ্বাসে শশাঙ্কবাবু ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলিতে লাগিলেন।

গুরুপ্রসাদবাবুর অদ্ভুত অদ্ভুত চিকিৎসার কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। কবে কোন্ মৃত্যুপথযাত্রীকে এক ফোঁটা ওষুধ দিয়া জীবনের পথে ফিরাইয়া আনিযাছিলেন, কবে কাহার বিরাট টিউমার শুধু ওষুধ খাওয়াইয়া বেমালুম মিলাইয়া দিয়া তাহাকে কঠিন অস্ত্রোপচারের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন—এই সব কথা মনে করিয়া তিনি নিজেকে ভরসা দিতে লাগিলেন। পত্নীকেও বুঝাইয়া দিলেন যে গোপালের রোগটা কিছু কঠিন নয়, শুধু আগেকার চিকিৎসকগণ ঠিকমত রোগটাকে নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কথাটা প্রিয়বালা যে ঠিক বিশ্বাস করিলেন তাহা নহে, কিন্তু পাছে তাঁহার অবিশ্বাসের ফলে গোপালের অমঙ্গল হয় এই ভয়ে প্রাণপণে বিশ্বাস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যায় ডাক্তারবাবু আবার আসিলেন। শশাঙ্কবাবুর এবং প্রিয়বালার মনে বিষাদের যে

মেঘ সারাদিন ধরিয়া ঘনাইয়াছিল, ডাক্তারবাবুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা যেন কোন যাদুমন্ত্রে নিঃশেষ হইয়া গেল। গোপালের রোগপাণ্ডুর মুখেও যেন মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

রোগীকে পরীক্ষা করিয়া সহাস্যমুখে ডাক্তার গুরুপ্রসাদ কহিলেন, "বাঃ! ওষুধে চমৎকার কাজ হয়েছে। একেবারে আশাতীত, শশাঙ্কবাবু। আর দিন পনেরোর ভেতরে একে যদি বিছানায় বসাতে না পারি তবে আমার নামের প্রথম অক্ষরটার 'উ'কারটা স্রেফ্ বাদ দিয়ে দেবেন, আমি কোনো আপত্তি করবো না।" বলিয়া রোগীর অসুবিধা বা ক্ষতি না করিয়া যতটা জোরে হাসা যায় ততটা জোরে হাসিয়া উঠিলেন। এই হাসিতে শশাঙ্কবাবু এবং প্রিয়বালার মন আরো অনেকটা হালকা হইয়া গেল।

আশান্বিত হৃদয়ে প্রিয়বালা কহিলেন, "তাহলে এখন ভালোর দিকেই ডাক্তারবাবু?" বলিয়া এমনভাবে ডাক্তারবাবু মুখের দিকে তাকাইলেন যেন তিনি স্বয়ং ভাগ্যবিধাতা, তাঁহারি মুখের কথাটুকুর উপর যেন গোপালের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে।

"নিশ্চিত ভালোর দিকে।" ডাক্তারবাবু কহিলেন, "সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই। আমার সম্বন্ধে কোনো বদনাম আছে কিনা আমার জানা নেই ; কিন্তু আমি মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে ভুলাই এ বদনাম আমার নেই এ আমি নিশ্চয় জানি মিসেস্ বোস্।..."

নিজহাতে একডোজ ওষুধ তিনি রোগীকে খাওয়াইয়া দিলেন। সেটা বাস্তবিক ওষুধ না শুধু সুগার অব্ মিল্ক্ তাহা অবশ্য ঠিক করিয়া বলা যায় না। কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া সস্ত্রীক শশাঙ্কবাবুর অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না যে মৃত্যুকে এ যাত্রা তিনি হটাইয়া দিতে পারিবেন।

পরক্ষণেই আবার শশাঙ্কবাবুর মনে সন্দেহ জাগিল। হয় তো রোগী খারাপের দিকেই চলিয়াছে, ডাক্তারবাবু রোগীর মাকে ভুলাইবার জন্য ছলনা করিয়াছেন মাত্র। অথবা ইহাও হইতে পারে যে গোপালের গতি এখন একটু ভালোর দিকে, কিন্তু তাহা সাময়িক মাত্র ; নিভিবার পূর্বে প্রদীপ যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

এ সন্দেহ বড় মর্মান্তিক। ডাক্তারবাবুর কাছে পরিষ্কার জবাব পাওয়া দরকার। চিন্তান্বিত মনে শশাঙ্কবাবু ডাক্তার বাবুকে মোটরে তুলিয়া দিতে গেলেন।

গেটের সাম্নে দাঁড়াইয়া শশাঙ্কবাবু কহিলেন, "ডাক্তারবাবু, একটা প্রশ্ন করবো। ঠিক জবাব দেবেন?"

"নিশ্চয় দেবো।" ডাক্তারবাবু কহিলেন "কি আপনার প্রশ্ন? অবশ্য সেটা আমার বুদ্ধির আওতার ভেতরে হওয়া চাই।"

ক্ষীণস্বরে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে শশাঙ্কবাবু প্রশ্ন করিলেন, "সত্যিই কি আপনি মনে করেন গোপালকে আপনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন?"

হাসিয়া ডাক্তার গুরুপ্রসাদ কহিলেন, "সত্যি মনে করি বলে তাই তো আশ্বাস দিয়েছি শশাঙ্কবাবু। মৃত্যু যখন দেখতে পেয়েছে আমি এ কেস্ হাতে নিয়েছি তখনি সে ভয় পেয়ে গেছে। Death knows full well that Dr. Guruprasad is more dangerous than He, জানলেন শশাঙ্কবাবু? হাঃ হাঃ হাঃ।"

খানিকক্ষণ হাসিয়া তিনি শশাঙ্কবাবুর মন অনেকখানি হালকা করিয়া দিলেন। আরো হালকা করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, "মৃত্যু যখন তার সময় মত আসে তখন তার ওপর তো কোনো আক্রোশ থাকা উচিত নয়—তখন সে আসে পরম প্রয়োজনরূপে। কিন্তু অসময়ে যদি সে আসতে চায় তো ঘুঁসির জোরে তাড়াতে হবে তাকে—আর আমরা আছি তো সেই জন্যেই।" বলিয়া বলিষ্ঠ হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ঝাঁকাইয়া দিলেন যেন মৃত্যুর সঙ্গে এখনি মুষ্টিযুদ্ধ সুরু করিবেন। ডাক্তারের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের দিকে তাকাইয়া কল্পনায় তাঁহার ঘুঁসিতে মৃত্যু বেচারার দুর্দশা দেখিয়া শশাঙ্কবাবু মনে মনে শিশুর মত আনন্দ লাভ

করিলেন।

কাল ভোরেও আবার আসিবেন, এ আশ্বাস দিয়া বত্রিশটি টাকা পকেটস্থ করিয়া নমস্কার জানাইয়া ডাক্তার গুরুপ্রসাদ শোফারকে চালাইতে আদেশ দিলেন।...

রাত্রিটা সকলেরি বড় উদ্বেগে কাটিল। ঘুম কাহারো ভাল করিয়া হইল না। শেষরাত্রির দিকে রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে যাইতে লাগিল। ভোরবেলা সকলেরি মনে হইল গোপালকে লক্ষ্য করিয়া মৃত্যু যেন দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিতেছে।

প্রিয়বালা কাঁদিয়া কহিলেন, "ওগো, তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে খবর দাও। উনি কখন আসেন তার তো ঠিক নেই। এখ্‌খুনি আন্‌তে পাঠিয়ে দাও তিনকড়িকে।"

তিনকড়ি সরকার তাড়াতাড়ি গাড়ী লইয়া রওনা হইয়া গেল। কিন্তু ফিরিয়া আসিল সে গাড়ী লইয়া ম্লানমুখে। তাহার মুখে খবর পাইয়া শশাঙ্কবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ভোরবেলা চা খাইতে বসিয়া হঠাৎ ডাক্তার গুরুপ্রসাদ মিত্র হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন।

হয় তো ঘুঁসি তিনি চালাইয়াছিলেন, কিন্তু সেটা ঠিক মত লক্ষ্যে পৌঁছায় নাই ; ফলে মৃত্যুর এক ঘুঁসিতে তিনি চিরশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

প্রথম ও শেষ

বুদ্ধদেব বসু

সোনারঙ্ পোঃ
(ঢাকা)
১৬ই বৈশাখ, বিকেল

এইমাত্র বেড়াতে বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ এসে গেলো বৃষ্টি। আমার জান্‌লার পাশের পুরোনো পেঁপে গাছটার চিক্‌রি-কাটা চিকণ পাতাগুলি হাওয়ায় দুলে'-দুলে' উল্টে' যেতে লাগলো। প্রথমে হীরের কুচির মত বড় ও স্বচ্ছ বৃষ্টির ফোঁটা—যেন কতদূর থেকে ছুটে' আস্‌তে-আস্‌তে পেঁপে-গাছটার ওপর মুখ থুব্‌ড়ে পড়্‌লো ; পরে এলো জাঁক-জমক হাঁকডাকে পৃথিবীকে অস্থির করে' বৃষ্টির মিছিল, সবুজ পাতাগুলো জলের ঝাপটে কালো হ'য়ে এলো, বিকেলের প্রচুর আলো কোথায় গেলো মিলিয়ে,—আকাশ থেকে নদী পর্যন্ত মেঘের ধূসর ছায়া শীত-সন্ধ্যার কুয়াশার মত ভারি ও ম্লান হ'য়ে নেমে এসেছে।

সুতরাং আমাদের বেড়াতে যাওয়া হ'ল না। সেই বেশেই আমার ঘরে ফিরে' এসেছি। জান্‌লার শার্সির কাঁচে বার বার বৃষ্টির ঝাপট্ এসে আছড়ে পড়ছে, তা'র পেছনে আমাদের বিস্তৃত আম-বাগানের শ্যামল ঘনতা রঙ্গমঞ্চের কালো যবনিকার মত চোখে এসে লাগ্‌ছে। ঘরের ভেতরে আলো কম ; জান্‌লার কাছে একখানা চেয়ার নিয়ে এসে বস্‌লাম। খানিকক্ষণ বই নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌লাম, মন বস্‌লো না। তার পর হঠাৎ মনে হ'ল, আমার প্রিয়তমা নীলার কাছে যে চিঠিটা রাত্তিরে লিখ্‌বো ভেবেছিলাম, সেটা এখনি লিখে' ফেলি না কেন?

সেই চিন্তার ফল যে কি হ'ল, তা তো তুই প্রত্যক্ষই কর্‌ছিস্। যদি এই বৃষ্টিটা না আস্‌তো, তবে এতক্ষণ পদ্মার ধার দিয়ে সরু পথ ধরে' হেঁটে বেড়াতাম—শুধু পায়ে। এখানকার লোকেরা জুতো-পরা মেয়ে দেখ্‌লে আঁৎকে উঠ্‌বে বলে' নয়,—নরম মাটির ওপর নরম পায়ের (আমার পা যে নরম, তা, তোর মুখেই শুনেছি) চাপ দিয়ে-দিয়ে চল্‌তে ভারি আরাম লাগে—তাই। এই চিঠি লিখ্‌তে অন্তত আরো ছ'টি ঘণ্টা দেরি হ'ত, এবং ইতিমধ্যে তোর কথা একটি-বারো মনে পড়্‌তো না। এই নতুন আব্‌হাওয়ার সঙ্গে ভাব কর্‌তেই সমস্ত সময় কেটে যেতো।

তুই শুনে' হাস্‌বি, কিন্তু এখানে আস্‌তে না-আস্‌তেই আমি পাড়াগাঁয়ের প্রেমে পড়ে' গেছি। সত্যি। এ-প্রেম যা'তে ব্যর্থ না হয়, সে-জন্য আমি উঠে'-পড়ে' লেগে গেছি। একটি মুহূর্ত আমি অপব্যয় হ'তে দেবো না, এখানকার মাটিতে প্রথম পা দিয়ে আমি এই করেছি পণ।

পূর্বরাগ হয় তা'রো আগে। গোয়ালন্দ থেকে আমাদের স্টীমার তখন ছাড়্‌লো, যখন সূর্য উঠেছে, অথচ ভালো করে' রোদ ফোটে নি। গাড়ি থেকে নাম্‌বার সময় অসম্পূর্ণ ঘুমের অতৃপ্তিতে আমার মেজাজ খারাপ হ'য়ে ছিলো, কিন্তু স্টীমার খানিকক্ষণ চল্‌তেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমার চোখের ঘুম ও মনের ক্লান্তি ধুয়ে' গেলো। ডেক্-এর রেলিঙে ভর্ দিয়ে দাঁড়িয়ে আমি ম্লান জলের ওপর লাল আলোর ঝিকিমিকি দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। তখনকার মত

যদি আমি ইন্দ্রের মত সহস্রাক্ষ হ'তাম, তবু বোধ হয় আমার দেখে আশ মিটতো না।

এক সময় বাবা এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। তাঁর স্বাভাবিক মাধুর্যের সঙ্গে বল্‌লেন, 'কিগো, আমাদের চা খাওয়া-টাওয়া হ'বে না?'

আমি তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, "আচ্ছা বাবা, এই পদ্মা নদী? রবি বাবুর পদ্মা?'

'না, রবি বাবুর পদ্মা ঠিক এ নয়। সে গেছে পাব্‌না জেলার ভেতর দিয়ে ; নদী সেখানে সঙ্কীর্ণ, স্রোত প্রখর নয়। আমরা যে পথে যাচ্ছি, তাঁর বোট্‌ কখনো সে-পথে যাওয়া-আসা করেনি। এ পদ্মা অলসগমনা, ভীরু স্রোতস্বিনী নয়, এ গভীর গম্ভীর ও উদার--করুণা-বিতরণেও যেমন মুক্তহস্ত, অকল্যাণ-সাধনেও তেম্‌নি অকুণ্ঠ। তোরি মত। নদীর মধ্যে এ অভিজাত।'

'বাবা, নিজকে এমন করে' প্রশংসা কর্‌তে তোমার লজ্জা করে না? আমি যে তোমারই মেয়ে।'

বাবা হাসলেন। 'এ-কথা বলাতেই তা'র পরিচয় পেলাম।'

চা খেতে বসে' হঠাৎ আমার মনে এক উৎকট প্রশ্নের আবির্ভাব হ'ল। জিজ্ঞেস করলুম, 'বাবা, যেখানে যাচ্ছি, সেখানে চা কিন্‌তে পাওয়া যায় তো?'

রুটিতে জ্যাম্‌ মাখাতে-মাখাতে বাবা বল্‌তে লাগলেন, 'এক ইংরেজ মহিলার একবার ভারতবর্ষে আস্‌বার কথা হয়। তিনি এখান্‌কার এক বন্ধুকে চিঠিতে জিজ্ঞেস্‌ করেন, "ক্যাল্‌কাটার পথে-ঘাটে কি দিনের বেলাতেও বাঘ ঘুরে' বেড়ায়?"

মা আমার পক্ষ নিয়ে বল্‌লেন, 'ওর আর দোষ কি, বলো? জন্মেও তো পাড়া-গাঁ চোখে দেখে নি!'

বাবা বললেন, 'যেন তুমিই দেখেছ! মা-মেয়ে দু'জনেরই গ্রাম-সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা, তা তো শরৎবাবুর উপন্যাস থেকে নেয়া। তা ভালোই হ'ল। তোমাকে বিয়ে করেছি পর আর তো দেশে-যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি--এবার তোমাকে সুদ্ধ দেখিয়ে আনা যাবে। তুমি তো মুসৌরীর নামে ক্ষেপেছিলে, কিন্তু মুসৌরীতে পরেও যাওয়া যা'বে--আর, আস্‌ছে বছর বোধ হয়, যেখানে আমাদের বাড়ি ছিলো, সেখানে থাক্‌বে নদী, এবং তা'র ওপর দিয়ে চল্‌বে স্টীমার। বাড়িটে আমাদের বহুকালের--তিরিশ বছর ওটা দেওয়ান-গোমস্তার হাতে পড়ে' আছে, শেষ সময়ে আমাদের দেখে খুসিই হ'বে।'

মা জিজ্ঞেস কর্‌লেন, 'কেমন বাড়ি?'

'কেমন? দেখ্‌তে সাবেকী, কিন্তু কাজে আশ্চর্যরকম আধুনিক। ঘরগুলো অত্যন্ত প্রশস্ত এবং উঁচু, অনেক জান্‌লা আছে ও সেগুলো বেশ চওড়া। ওপরে ওঠ্‌বার সিঁড়ি কাঠের। এমন কি, মেয়েদের ও পুরুষদের আলাদা স্নানের ঘর পর্যন্ত আছে। অর্থাৎ, বাড়িটাকে চৌরঙ্গীতে তুলে' নিয়ে আস্‌তে পার্‌লে বস-বাস করা যায়। কাজেই, শ্রীমতী লীনা, তোমার সমস্ত আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক বলে' জেনো। হ্যাঁ--বল্‌তে ভুলেছি, সিঁড়ির পেছনে ছোট্ট একটা কুঠুরি আছে--চোরা কুঠুরি। বাইরে থেকে যেটা জাপানী পর্দার মত দেখায়, সেটাই হচ্ছে দরজা--কৌশল না জান্‌লে কিছুতেই খোলার উপায় নেই। শুনেছি আমার প্রপিতামহের আমলে সেখানে মোহর রাখা হ'ত। তিনিই ঐ বাড়িটে করেন কিনা। তিনি কল্‌কাতায় এসে এক পাদ্রীর কাছে ইংরেজি শেখেন। ফলে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে তাঁর একটা বড় রকম চাক্‌রি জুটে' যায়--মাসে সত্তর টাকা বুঝি মাইনে। দশ বছরে তিনি যা উপার্জন করেন, তা দিয়ে শুধু ঐ বাড়ি নয়, একটা প্রকাণ্ড এস্‌টেট্‌ গড়ে' তোলেন। চৌধুরীরা তখন ছিলো এ-মুল্লুকের সেরা জমিদার, কিন্তু সেই সময় থেকেই তা'দের পতন সুরু হয়। ঠাকুর্দার আমলে আমাদের প্রতিপত্তি আরো বাড়ে, চৌধুরীদের নবাবী জাঁক-জমকের অবশিষ্ট থাকে শুধু প্রকাণ্ড চক্‌মিলান বাড়িখানা। তখন পর্যন্ত দু' বাড়িতে যথেষ্ট

রেষারেষি ছিলো—থাকারই কথা।'

যেন একটা গল্প শুন্‌ছিলাম, এইভাবে আমি বলে' উঠ্‌লাম, 'তার পর?'

'তার পর বাবার আমলে সবি গেলো বদ্‌লে। বাবা ছিলেন ঠাকুর্দার ছোট ছেলে, তাই পৈতৃক সম্পত্তির ওপর বিশেষ ভরসা না করে' তিনি চলে' গেলেন বিলেত—পাশ কর্‌লেন সিভিল্‌ সার্ভিস। ফিরে' এসে দেখ্‌লেন, তাঁর অগ্রজ সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে' নিরুদ্দেশ হয়েছেন। পরে জানা গেলো, তিনি হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব জান্‌বার জন্য জার্মানিতে অবস্থান কর্‌ছেন। তিনি বাডেন্‌-বাডেন্‌ এ মারা যান্‌।

'অথচ বাবা বিদেশেই থাক্‌তেন বলে' গ্রামের বিষয়-আশয়ের অবস্থা ক্রমশই কাহিল হ'তে লাগ্‌লো। তার পর তো পদ্মাই সব নিতে সুরু কর্‌লে। ফলে চৌধুরীদের সঙ্গে মনোমালিন্যটাও মুছে' গেলো। সীতাপতি চৌধুরীর সঙ্গে বাবার যথেষ্ট বন্ধুতা ছিলো। তাঁকে আমি ছেলেবেলায় বারকয়েক দেখেছি। তিনি সমস্ত জীবন দেশেই কাটান্‌, কিন্তু অমন প্রতিভাদীপ্ত কপাল ও চোখ আমি কোনো মানুষের দেখিনি। মিকায়েলেঞ্জেলোর মুখের অবর্ণনীয় কারুণ্য ও তেজস্বিতা ছিলো তাঁর চোখে। তিনি বাজাতেন বীণ—পুঁচকে সেতার বা এস্রাজ নয়—ও-সব তখনকার দিনে ছিলো না। অসংখ্য তারের ওপর তাঁর আঙুলগুলো যখন ঢেউয়ের মত অনায়াসে ভেসে বেড়াতো, তখন বাবার কোল ঘেঁষে বসে' মুগ্ধ হ'য়ে আমি তাকিয়ে থাক্‌তাম। মনে হ'ত, উনি যদি একবার ঐ আঙুলগুলো দিয়ে আমাকে স্পর্শ করেন, তা হ'লে আমি আগুনের মত দাউ-দাউ করে' জ্বলে' উঠ্‌বো।'

'উনি এখন খুব বুড়ো হয়েছেন—না?'

'তখনো যুবক ছিলেন না, কিন্তু বার্ধক্যের আগেই তাঁকে ধর্‌লে মৃত্যু। আমি তাঁর স্ত্রীকে দেখিনি, তাঁর একমাত্র সন্তান—তাঁর মেয়েই তাঁর দেখাশোনা কর্‌তেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই মেয়ের কি হ্য়েছে জানিনে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বাবা বল্‌লেন, সে যেন আর-এক জন্মের কথা ; তবু সীতাপতি চৌধুরীর কপাল আর চোখ আর আঙুল আজো মনে পড়ে।'

জানিস্‌ নীলা, এই সীতাপতি চৌধুরীকে দেখ্‌তে পাবো না ভেবে মনে-মনে আমার ভারি অভিমান হ'ল—বাবা যেন আমাকে ফাঁকি দিয়ে মস্ত একটা লাভ করে' ফেলেছেন, সে-লাভের যোগ্যতা আমারো কম ছিল না। অপুত্রক সীতাপতি চৌধুরীর রক্তের বংশ তো শেষ হয়েই গেছে, কিন্তু বর্তমান পৃথিবী থেকে তাঁর মনের বংশও যে লোপ পেয়ে গেলো, এই আমার দুঃখ। বাবার কথা শুন্‌তে-শুন্‌তে মনে হচ্ছিলো, বল্‌জাক্‌-এর পৃষ্ঠা থেকে কোনো চরিত্র নেমে এসে যেন আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়েছেন—সাত শো বছর ধরে' তাঁর পূর্বপুরুষেরা রাজত্ব করেছেন, প্রজাদের সঙ্গে নিছক প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধ বজায় রেখে চলেছেন, বিয়ে করেছেন ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ রাজ-কন্যাদের—রূপে তাঁরা নিরুপমা। তার পর এলো মানুষের সভ্যতার প্রথম শত্রু—ফরাসী বিদ্রোহ্‌। উন্মত্ত, বর্বর জনসংঘ গিলোটিনের নীচে—শুধু ষোড়শ লুইকে নয়, মানুষের শত-শতাব্দীর দুরূহ সাধনা-লব্ধ সৌন্দর্যচর্চাকে জবাই কর্‌লে। ওরা মাটির রাজত্ব কেড়ে নিলো, কিন্তু সাত-শো বছর ধরে' আলোকে সঙ্গীতে সৌন্দর্যে আনন্দে বিলাসিতায় যে-মন বেড়ে উঠেছে, তা'র প্রসার খর্ব কর্‌বে কে? তাই সেই নায়ক গ্রহণ কর্‌লেন নির্বাসন ; রাজধানী থেকে বহুদূরে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে এক ধ্বংসোন্মুখ প্রাসাদ, সেইখেনে আবদ্ধ হ'য়ে উৎসবের একটি রাত্রির মত দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে দিলেন—মদের আর গানের নেশায়। সীতাপতি চৌধুরীর মনও সেই ধাতের—বহুমূল্য বিদেশী ফুলের মত কাঁচের ঘেরা টোপ্‌-দেয়া বাগানের ভেতর সেই মনকে অতি যত্নে লালন কর্‌তে হয়, তা'র স্পর্শ-অসহিষ্ণু সুকোমলতা তা'কে পরমদুর্লভ করেছে। আজকালকার দিনে আর এমন মেয়ে নেই, ভাই, যে সত্যিসত্যি ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায়, এমন পুরুষ নেই যে দুই

পদক্ষেপে স্বর্গ-মর্ত্য অধিকার করে' তৃতীয় পা ফেল্‌বার যায়গা পায় না। রাশ্যা থেকে শিলাবৃষ্টির হাওয়া দিচ্ছে ;--মহার্ঘ ক্রিসেন্‌থিমাম্‌-এর দরকাব নেই আর ; আমরা সব গাঁদা-ফুল বনে' গেছি ;--ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্মের যত উৎপাতই হোক্‌, অনাবশ্যক প্রাচুর্যে আমরা ফুটে' উঠ্‌বোই।

এতক্ষণে একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গেছে, ভাই ;--বেহারা কখন্‌ এসে যে লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, টের পাই নি। ঘরের পক্ষে আলো যথেষ্ট নয় . দরজার কোণে, ভেল্‌ভেট এর ভারি পর্দার আনাচে-কানাচে, হাল্কা নীল রঙে ছোপানো দেয়ালের গায়ে-গায়ে ভূতের মত অস্পষ্ট, অদ্ভুত সব ছায়ামূর্তি এই ঝাপ্‌সা হল্‌দে আলোয় লুকোচুরি কর্‌ছে। ঘরের 'সীলিং' অনেক উঁচুতে--এই দুর্বল আলো সেখানে যেতে-যেতে হাঁপিয়ে পড়ে, সেখানে তাকালে মেঘ-মলিন আকাশেরই এক টুকরো দেখ্‌ছি বলে' ভুল হয়। ঘরের মধ্যে একমাত্র উজ্জ্বল জিনিস হচ্ছে মেঝের গালিচাখানা--সূর্যাস্তের মত খোলা লাল। রঙচঙে খেলো বিলিতি কার্পেট নয়, পারস্যের বিখ্যাত গালিচা--পাথরের মত ভারি, অথচ মাখনের মত নরম। দিল্লীর নবাবের বেগমরা তাঁদের পদ্ম-কলির মত পায়ের পাতা এই-সব জিনিষের ওপর ফেল্‌তেন। না--তা'র চেয়েও উজ্জ্বল জিনিষ এ-ঘরে আছে ; সে আমি। আমি যেখানে বসে' আছি, তা'র উল্টো দিকের দেয়ালে এক জোড়া দীর্ঘ আয়না ;--লেখ্‌বার ফাঁকে-ফুঁকে নিজকে তা'দের মধ্যে দেখে নিচ্ছি। এই ঘরের নিষ্প্রভ ম্লানতার মধ্যে আমাকে রোদের মুখে জ্বলে' ওঠা তরবারির মত স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ দেখাচ্ছে ;--খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাক্‌লে মনে হয়, আয়না যেন ফেটে পড়্‌বে। এই মৃদু আবছায়ায় আবৃত হ'য়ে ঝাড়-লণ্ঠনের নীচে বসে' এ-কথাই ভাবা সহজ যে আমি রাজকন্যা।

বাড়িটার বিশেষত্বই এই। তা'তে ঢুকলেই মনে হ'বে চির-গোধূলির রাজ্যে প্রবেশ করলাম। দিনের বেলাতেও ঘরগুলো ছায়া-ঢাকা, রঙের ও রেখার কোমলতায় শান্ত ও শীতল। সেখানে রোদের আস্‌তে বারণ ; রাশি রাশি পর্দাকে ফাঁকি দেয়ার জো নেই, সূর্যদেব কোনো ফাঁক দিয়ে যদি চুপি-চুপি দু'একটি ক্ষীণ রেখা পাঠিয়ে দিতে পারেন তো ঢের! ফলে, কোনো মন্দির বা গির্জার অভ্যন্তরের মত এই ঘরগুলোরও আবহাওয়ায় এমন একটি অপূর্ব্ব শুচিতা, ও মেজাজে এমন চির প্রসন্নতা আছে যে কিছুকাল এখানে বসবাস কর্‌লে যে-কোনো লোকের ইন্দ্রিয়বৃত্তি কবি-তুল্য মার্জিত সূক্ষ্মতা লাভ কর্‌তে পারে।

বিরাট বনস্পতির মত অটুট, অক্ষয় ও মহান্‌ এই বাড়ি ; দূর থেকে প্রথম দেখেই এর গাঢ় ধূসর রঙ আর বলশালী দৃঢ়তার সুন্দর রুক্ষতা আমার ভালো লেগেছিলো। এর চারদিকে যদি খাল থাক্‌তো, আর তা'র ওপর টানা-সেতু, আর সেই সেতুর ওপর যদি সারাদিন অশ্বখুরধ্বনি শুন্‌তে পেতাম, তবেই যেন স্বাভাবিক হ'ত। এই অভাবটুকু আমাকে নিজের কল্পনা দিয়ে পূরণ করে' নিতে হচ্ছে, এবং সেই সঙ্গে আরো-একটা অভাব, সেই মানুষের অভাব, যা'কে দেখে আমার সমস্ত মন-প্রাণ একসঙ্গে কথা কয়ে' উঠ্‌বে ; "সে যে আমি, সেই আমি।"

রবীন্দ্রনাথ একেবারে আমাদের মাথা খেয়েছেন--না রে? ইতি--

তোর লীনা।

সোনারঙ্‌

২২শে বৈশাখ

ছি-ছি--তুই নীলা, তুই? তোর মনে এ-পাপই ছিলো তো আমায় আগে বলিস্‌নি কেন?

আমার কাছে লুকোবার মত দুর্মতিও তোর হ'ল!

কেন যে তুই আমার কাছ থেকে ব্যাপারটা আগাগোড়া গোপন করে' গেছিস্, তা-ও আমি জানি। আমি যদি এর একটু আভাসও পেতাম, তবে এই দুর্গতির পাঁক থেকে তোকে ছিনিয়ে তুলে' আন্‌তামই, কোনো লজ্জা বা ভয় আমাকে আড়ষ্ট কর্‌তো না। তোর চিঠি পাবার আগের মুহূর্তেই কেউ যদি আমাকে এসে বল্‌তো 'নীলা বিয়ে কর্‌ছে', আমি তা'র মুখের ওপর হো-হো করে' হেসে উঠ্‌তাম। এত দেরি করে' জানালি! তা'র ওপর, কল্‌কাতার বাইরে আছি, আমার অনুপস্থিতি তুই এমন হীন প্রয়োজনে ব্যবহার কর্‌বি জান্‌লে—তা হ'লে সোনারঙের সকল সৌন্দর্য আমি না-হয় উপভোগ না ক'রেই মর্‌তাম, কিন্তু তোকে তো অকালমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পার্‌তাম!

সব চেয়ে আশ্চর্য এই যে আমাকে তুই কেমন করে' ফাঁকি দিলি! তোর মধ্যে কখনো এমন-কিছু তো লক্ষ্য করি নি, যাতে তোর সম্বন্ধে কোনো গুরুতর সন্দেহের উদয় হ'তে পারে! কিন্তু এতে আশ্চর্যই বা কী আছে? তুই কর্‌ছিস্ ব্যবসাদারি বিয়ে ; বেণেরা যেমন সাত-পাঁচ, আগু-পিছু, ডান-বাঁ ভেবে-চিন্তে, সাড়ে-উনিশ জনের পরামর্শ নিয়ে চা-বাগানের শেয়ার না কিনে, রেঙ্গুন্ থেকে সেগুন কাঠের চালান আনিয়ে তিনগুণ লাভের আশায় বসে' থাকে, তুইও তেম্‌নি দীর্ঘকাল চিন্তার পর কিনা বিয়ে-করাই ঠিক কর্‌লি! কারণ বিয়ে-করা নিরাপদ—জোলা বলেন, যুবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে নানা দিক থেকেই নিরাপদ। জীবনের উচ্ছলিত গঙ্গায় যৌবনের প্রবল বাতাসের মুখে কল্পনার রঙীন পাল তুলে' দিয়ে আমরা দু'জন একসঙ্গে নাও ভাসিয়েছিলাম, তুই যে এত শীগ্‌গিরই ক্লান্ত হ'য়ে বন্দরের আশ্রয় খুঁজবি, তা ভাবি নি। এত তাড়ার কারণ কি? পাছে আইবুড়ো মর্‌তে হয়, এই ভয় নয় তো? না, জোলা-উল্লিখিত অন্য কোনো কারণে তোর সবুর সইলো না?

তোকে এই কথা লিখ্‌তে ঘৃণায় আমার নিজেরি গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে। তোর সম্বন্ধে আমার এ-কথা ভাব্‌তে হচ্ছে! তা'র আগে সারা পৃথিবী কেন রসাতলে তলিয়ে গেলো না?

মুরারি বাবুর আমি অসম্মান কর্‌ছি নে। তিনি সুদর্শন ও অমায়িক ;—তাঁর স্ত্রীত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে তোর দৈহিক কোনো বিলাসিতারই হানি হবে না। কিন্তু তোর মন? তুই কি আমায় সত্যি করে' বল্‌তে পার্‌বি যে সেই ভদ্রলোকের সংস্পর্শে আসা মাত্র বিদ্যুৎ-বিদারণের মত অসহ্য আনন্দে তোর মনের আকাশ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছিলো? তা-ই যদি হ'বে, তবে তোর মুখের দিকে তাকাতে আমার চোখ কি ঝল্‌সে যেতো না? তা হ'লে সেই মুহূর্তে পৃথিবী তোর কাছে নতুন করে' জন্ম নিতো ;—প্রথম সূর্যোদয়ের অপূর্ব জ্যোতির্লেখা হ'ত তোর গাত্রবাস। নিজের চেয়ে যে-প্রেম বড়, তা'কেও কি গোপন করা সম্ভব? তন্দ্রার জড়িমায় আচ্ছন্ন হ'য়ে মন্থর গতিতে দিনের পর দিন কেটে যায়—সুখ-দুঃখের নির্দিষ্ট গণ্ডী এঁকে-এঁকে, লাভ-ক্ষতির হিসেব করে'-করে'। তারপর একদিন হয় প্রেমের আকস্মিক আবির্ভাব ; টুকরো-টুকরো শান্তি নিয়ে মনের জন্যে যে-নীড় গড়েছিলাম, চক্ষের পলকে তা ছিঁড়ে' উড়ে' উনপঞ্চাশ বায়ুতে মিলিয়ে যায়, সমগ্র সত্তা সমুদ্র-মন্থনের মত দুঃসহ বেদনার আলোড়নে জেগে ওঠে, আত্মায় আগুন ধরে' যায়, তা'র দীপ্তি সর্বাঙ্গে উচ্ছলিত হ'য়ে ঝরে' পড়ে ;—দান্তের মত সকলকেই বলে' উঠ্‌তে হয় ঃ 'সেই দেবতার দেখা পেলাম, যিনি আমার চেয়ে বলশালী ; যিনি এসে আমার ওপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার কর্‌বেন।'

সেই দেবতার দেখা তুই পাস্ নি ; সেই তীব্র দীপ্তিতে জ্বলে' উঠতে তোকে দেখি নি। আমাকে ক্ষমা করিস্ নীলা, কিন্তু তোদের এ-বিয়েতে আমি আশীর্বাদ কর্‌তে পার্‌লাম না।

আর যা-ই করিস্, দয়া করে' প্রত্যুত্তরে সংসার ধর্ম-সম্বন্ধে আমাকে সারগর্ভ উপদেশ দিতে বসিস্ না। সে-গুলো আমি জানি। এবং এ-ও মানি যে পাত্রবিশেষে তা'র সার্থকতা

আছে। কিন্তু জানিস্ তো, সকলের জন্য সব কর্তব্য নয়। কিন্তু আমরা যেন আমাদের সাধ্যানুযায়ী মহত্তম কর্তব্যকেই অবলম্বন করি, বিধাতা আমাদের দিয়ে এ-ই চান্। ধর্, রবীন্দ্রনাথ যদি অধ্যাপক হ'তেন, তা হ'লে খুব উচ্চ শ্রেণীর অধ্যাপকই হ'তেন—হয়-তো বাঙ্‌লা দেশের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক বলে' তাঁর নাম থেকে যেতো, কিন্তু পৃথিবীর পক্ষে সেটা কি খুব শুভ ঘটনা হ'ত? সংসারধর্ম যেমন, অধ্যাপনাও তো তেম্‌নি একটা গুরুতর কর্তব্য। কিন্তু বিধাতা যাঁকে বড় কবি হ'বার মাল-মশ্‌লা দিয়ে পাঠালেন, তিনি যত ভালো অধ্যাপকই হোন্ না কেন, কর্তব্য তাঁর সম্পন্ন হ'ল না ; যতদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর কবিত্বশক্তির পরিপূর্ণতম ব্যবহার না কর্‌ছেন, ততদিন তাঁর জীবন ব্যর্থই রয়ে' গেলো।

তুই কি স্বপ্নেও ভেবেছিস্, নীলা, যে বিধাতা তোর এ আচরণ ক্ষমা কর্‌বেন? আমার সাম্‌নে এই কাগজের টুক্‌রোর মত স্পষ্ট করে' দেখ্‌তে পাচ্ছি যে নিজহাতে তুই তোর জীবনের সব চেয়ে বড় সর্বনাশ কর্‌লি! 'মাটি কাটি' যে-কোহিনূর লাভ করা যায়, তা দিয়ে কাগজ-ছাপার কাজ দিব্যি চলে ; কিন্তু কাগজ চাপার ব্রতে কোহিনূর যদি তা'র জীবন উৎসর্গ করে তো তুই কি তা'কে প্রশংসা কর্‌বি? তোকে দিয়ে বিবাহিত জীবনের সকল দায়িত্ব উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন হ'তে পারে—তা আমি অস্বীকার কর্‌ছিনে ; কিন্তু সাধারণ স্ত্রীত্ব ও মাতৃত্বের চেয়ে অনেক বড় ও সুন্দরতরো কর্তব্যের উপযুক্ত তুই ;—তুই মহামূল্য বিরলজ্যোতি হীরকখণ্ড ; কাগজ-চাপাদের দলে ফার্স্ট ক্লাস্ ফার্স্ট হ'লেও নিজকে তুই অপমান বই কিছু কর্‌লি নে।

[illegible], কাঁশার গেলাশে অমৃত-পান করা চলে না, তা'র জন্য চাই লক্ষদ্যুতি স্বচ্ছগাত্র স্ফটিক-ভাণ্ড। তেম্‌নি বড় প্রেম অনুভব কর্‌বার যোগ্যতা সকলের থাকে না ; সে সৌভাগ্য যা'দের হ'বে, বিধাতা তা'দের প্রকৃতিকে দুর্লভ ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে' দেন ; নিথর বায়ুমণ্ডলে অগ্নিময় পক্ষ-সঞ্চালন করে' তিনি যেখানে অবতরণ কর্‌বেন, সেই হৃদয়ের তাঁকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা কর্‌বার মত সৌন্দর্য ও প্রসার চাই ;—তা কি সকলের থাকে, ভাই? যা'দের তা নেই, তা'দের জীবনে কোনো সংঘাতেরও স্থান নেই ; তা'রা বিয়ে করুক্, ঘর-সংসার দেখুক, মোটর-চাপা পড়ার জন্য জীবসৃষ্টি করুক্, তা'দের জন্য কেউ যেন কোনো দুর্ভাবনা না করে। কিন্তু তুই যে আলাদা জাতের লোক ; সেই মহান্ অতিথি হয় তো একদিন তোর দুয়ারে আস্‌তেন, 'যিনি তোর চেয়ে বলশালী'। কেন [illegible] তাঁর জন্যে অপেক্ষা কর্‌লি না?

তুই তো জানিস্, সে-অতিথির পদক্ষেপে আমার হৃদয়াঙ্গন এখনো মুখরিত হ'য়ে ওঠে নি ; কিন্তু যেদিন থেকে বুঝতে শিখেছি, সেইদিন থেকে তাঁর আগমনের জন্য নিজকে প্রস্তুত করা ভিন্ন আমি অন্য-কোনো কর্তব্য জানি নি। তিনি যখন আমাতে অবতীর্ণ হ'বেন, কোনো দিক দিয়েই যেন হতাশ না হন্, সেই জন্য আমাকে দেহে ও মনে, বাক্যে, বুদ্ধিতে ও আচরণে অপরূপ সুন্দর হওয়া দর্‌কার। আমার সেই তপস্যায় তোকে পেয়েছিলাম সঙ্গী। তুই আমাকে মুগ্ধ করেছিলি ; তার পর যেদিন তুই আমার হাতের ওপর পায়রার বুকের মত নরম তোর হাতখানা এনে রাখ্‌লি, ভাব্‌লাম, দেবতা প্রসন্ন হ'লেন—আমার সাধনার প্রথম সিদ্ধি-রূপে লাভ কর্‌লাম তোকে।

দু'টি বটগাছের চারা পাশাপাশি রোপণ কর্‌লে, তা'রা বেড়ে ওঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ডালে ডালে, পাতায়-পাতায় যেমন অবিচ্ছেদ্য কোলাকুলি হ'তে থাকে—তেমনি এই ছ'বছর ধরে' তুই আর আমি পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতায় জড়িত হ'য়ে বড় হ'য়ে উঠেছি। আকাশেতে বাষ্পকণা আর সূর্যালোক দুই-ই তো থাকে, কিন্তু দুয়ের যখন মিলন হয় তখনই দেখা দেয় ইন্দ্রধনু। তুই আর আমি মিলে' সেই মনোহরণ ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করেছিলাম ;—তা'রি অন্তরালে ছিলো আমাদের মনের সীমাহীন রাজত্ব—এক মুঠো নীল

কাপড়ের মত কুলহীন, ক্ষয়হীন, মৃত্যুহীন আকাশ।

আমাদের এই বন্ধুতাই কি এবারের এ-জন্মের পক্ষে যথেষ্ট ছিলো না, নীলা? আমরা দু'জন না হয় চিরন্তন নেপথ্যে জীবন কাটিয়ে দিতাম—না হয় চল্‌তো শুধু আয়োজন, শুধু সজ্জা—রঙ্গমঞ্চে নায়িকাদের আবির্ভাব না হয় না-ই হ'ত! যাকে আমরা বাস্তব বলি, সেখানে যদি শাদা খাতায় ধূলো জমে ওঠে তো উঠুক ; আমাদের মনের যিনি কবি, তিনি তো নদীর জলে ভাঙা চাঁদের টুক্‌রোর মত শত-শত গীতি-কবিতার জাল বুনে যাচ্ছিলেন! সেই জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আস্‌বার কি প্রয়োজন ছিলো তোর? হৃদয়ের রক্তে যাঁকে অনুভব করেছিস্, একদিন তাঁকে প্রত্যক্ষ কর্‌বিই, এইটুকু আশা কর্‌বার সাহস তোর হ'ল না? আশা পরিপূর্ণ না হ'লেই যে তা ব্যর্থ হ'য়ে যায়, এমন তো নয়। কেরোসিন্ লণ্ঠনের অতি সত্য বাস্তবের চাইতে সূর্যোদয়ের অন্তহীন প্রতীক্ষাই কি বরেণ্য নয়? সূর্য যদি কখনো দেখা না-ও দেন্, তবু সেই ব্যর্থতা নেপোলিয়ন্-এর জীবনের ব্যর্থতার মতই মহান্। এই ব্যর্থতার মূল্য তুই দিতে পার্‌বি নে, এ আমি আশা করি নি।

কল্‌কাতায় আমি যত ছেলের সঙ্গে মিশেছি, তা'দের অনেকের চোখের দৃষ্টিই আমার কাছে অনেক অনুক্ত কাহিনী উদ্‌ঘাটন করেছে। রূপে ও বিদ্যায়, বংশ-গৌরবে ও পদমর্যাদায় তা'রা নিকৃষ্ট নয়। কিন্তু আমার সব সময় মনে হয়েছে কোথায় যেন কি অভাব রয়ে গেছে, আমাকে দেখাবার জন্যে এরা একটি বিশেষ ভঙ্গী অর্জন করেছে ; সেই ভঙ্গীটিই মনোরম, আদৎ লোকটি নয়। এরা যা'কেই বিয়ে করুক্, বিয়ের পর সেই ভঙ্গীটি যা'বে খসে', এবং তখন হরিমতির স্বামী আর তা'দের মধ্যে বিশেষ-কোনো পার্থক্য থাক্‌বে না।

তোর মত আমি কোনো ভুল কর্‌বো না। স্বর্গে যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়ে গেছে, পৃথিবীতে তা'র দেখা পাওয়া মাত্র আমি চিনে নিতে পার্‌বো। এক এক সময় ইচ্ছে করে, মাদ্‌মোয়াজেল্ মোপ্যাঁর মত ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়ি--তাঁর অন্বেষণে। কিন্তু মন করে বারণ। ফুলের বুকে গন্ধের মত যাঁর অনুভূতি সমস্ত অন্তরাত্মা জুড়ে আছে, বাইরে তাঁকে কোথায় খুঁজবো? শুভলগ্ন যেদিন আস্‌বে, দুয়ারে করাঘাত পড়্‌বেই—বিজয়ী রাজার মত এসে তিনি আমাকে অধিকার ক'র্‌বেন। আর, যদি তিনি না-ই আসেন—না-ই বা এলেন! তবু তাঁর প্রতীক্ষায় মুহূর্ত-জপ করে' আমরণ আমি জেগে বসে' রইবো—তুই দেখিস্।

তোর পূর্বজন্মের বন্ধু,
লীনা

—নং বীডন্ স্ট্রীট্,
কলিকাতা
১৮ই জ্যৈষ্ঠ

চির-প্রিয়তমা লীনা,

ওপরের ঠিকানা দেখেই বুঝ্‌বি যে ইতিমধ্যে গোত্রের সঙ্গে-সঙ্গে আমার গৃহও বদল হ'য়ে গেছে। এবং সেই জন্যই তোকে চিঠি লিখ্‌তে এত দেরি হ'ল। তামাসা মন্দ হ'ল না, কিন্তু তোকে নেমন্তন্ন কর্‌লেও তো তুই আস্‌তিস না!

প্রথমেই তোকে জানানো দরকার যে বিয়ে করে' আমি মোটেও অসুখী হই নি। আমি জানি, সুখের নামে তুই নাসিকা কুঞ্চিত কর্‌বি। তোর মতে ও জিনিষটা পশুদের উপভোগ্য। কিন্তু সত্যি কি তাই, ভাই? কল্পনার আগুনের মেঘ তোকে ঘিরে' আছে বলে' শান্তদীপালোকিত গৃহকোণের স্নিগ্ধ মাধুর্য তোর চোখেই পড়্‌লো না। সেখানে উন্মাদনা না থাক্, শান্তি তো আছে ; উচ্ছলতা না থাক্, অস্বাস্থ্যও নেই। প্রতিদিনকার সুখদুঃখের অজস্র রেখা-সম্পাত এই গৃহকে বিচিত্র করেছে ; স্বর্গের অনিন্দ্য জ্যোতি সেখানে পড়ে না, কিন্তু

এই পৃথিবীরই ফসলের ক্ষেত থেকে, গোধূলির আকাশ থেকে সোনার আলো সেখানে ঝরে' পড়ে ;--অতসীর হাসির মত তা চির-পরিচিত হ'লেও চির-সুন্দর।

বিয়ে-করার জন্য কারো কাছে কোনো অপরাধ করেছি বলে' যদি আমার মনে হ'য়ে থাকে, সে তোরই কাছে। কিন্তু আমি তো যেমন ছিলাম, তেম্‌নিই আছি, তেম্‌নিই থাক্‌বো। পরিবর্তন যা-কিছু হয়েছে বা হ'বে, তা এত বাহ্যিক ও এত সামান্য যে সেই উপলক্ষ্যেই যদি তোর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হ'তে হয়, তবে স্বামী একদিন গোঁফ কামিয়ে বাড়ি এলে স্ত্রীর উচিত তা'কে চিন্‌তে না পারা। তুই যেটাকে প্রকাণ্ড-তম সর্বনাশ বলে' ভাবছিস্, তা'র চেয়েও বড় সর্বনাশ আমার হ'তে পার্‌তো—বসন্ত হ'য়ে আমার মুখ কুৎসিত হ'য়ে যেতে পার্‌তো। কিন্তু সেই আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে কি আমি তোর কাছ থেকে একটুও দূরে সরে' যেতাম? এই ঘটনাটাকেই বা অত বেশি প্রাধান্য দিচ্ছিস্ কেন? তোর বন্ধু এখনো তোর--সর্বান্তঃকরণে তোর, চিরকাল তোর।

তুই যদি আমার অবস্থাটা একটু পরিষ্কার করে' ভেবে দেখতিস্ তবে তোর চিঠির উগ্রতা নিশ্চয়ই অনেক কমে' আস্‌তো। এ-কথা তুই ভুলে' গিয়েছিলি যে তোর মত মা-বাবার আশ্রয় আমার নেই ; পরিজন বল্‌তে আমার এক মামা, তা তিনিই বা কতকাল আমার ভার বইবেন? বি-এ পাশ করার পর আমার পক্ষে দু'টি পথ খোলা ছিলো--ইস্কুলটিচারি আর বিয়ে। দুই-ই সমান। জলের কুমীরকে এড়িয়ে ডাঙার বাঘের মুখেই যদি আত্ম-সমর্পণ করে' থাকি তো এমন কি অপরাধ করেছি, বল্?

[illegible] বিয়েটা তেমন-কিছু ভয়ঙ্কর ব্যাপারও নয়। সত্যি ভাই, হাওয়ায় উড়তে-উড়তে আমার ডানা বুজে' এসেছিলো ; একদিন সুদূরস্পর্শী ভবিষ্যতের বন্ধ্যা অনিশ্চয়তার দিকে তাকিয়ে ক্লান্তিতে আমার দুই চোখ আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো, ব্যাকুলভাবে হাত বাড়াতে প্রথম যাঁর হাতের সঙ্গে হাত ঠেক্‌লো, তিনিই মুরারিবাবু। ভাবলাম, মুরারিবাবু হ'লেই বা দোষ কি?

এখন ভেবে দেখ্‌ছি, মোটের ওপর ভালোই করেছি। মুরারিবাবুকে ভালোবাস্‌তে না পারি, তাঁর প্রতি মধুর মমতা জন্মেছে--এবং এই মমতাই হয়তো কোনোকালে আমাকে প্রেমের অমরাবতীতে পৌঁছিয়ে দেবে। তিনি আমাকে ভালোবাস্‌তে না পেরে থাকেন, অপরিসীম স্নেহ করেন--এবং মা-কে হারিয়েছি পর থেকে এই স্নেহ জিনিষটির ওপর আমার লোভ সব চেয়ে বেশি। তা-ই পেয়ে আমি তৃপ্ত। সে-প্রেম আমাদের মধ্যে নেই, যা'তে প্রিয়র পায়ের শব্দ শুন্‌লে বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করে' ওঠে, তার একটুখানি হাতের লেখা দেখলে শরীরের সমস্ত রক্ত উঠে আসে মুখে। এখানে প্রবল আবেগ-ঝঞ্ঝার, দুরন্ত মাতামাতি নেই ; এখানকার কুঞ্জ-কুটীরে মৃদু মমতার কোমল-মলয়-সমীরের নিত্য-সঞ্চালন। মুরারিবাবু লোক ভালো ; শিষ্টতায় মিষ্ট-আচরণে বিনয়-বচনে তিনি বাস্তবিক ভদ্রলোক-আখ্যার উপযুক্ত। তাঁর প্রকৃতি কুয়োর জলের মত ; কালভেদে উষ্ণতা ও শৈত্য দুই-ই তা'র গুণ। চাকর-বাকরদের আদেশ কর্‌বার সময় তাঁর কণ্ঠস্বরে রুক্ষতা আসে না, এবং নাটুকেপনা না করে'ও তিনি স্নেহশীল হ'তে জানেন। এই ধরণের লোকের সঙ্গে তাল রেখে চলা খুব সহজ! স্বীয় ব্যক্তিত্বের লেশমাত্র হানি না করে'ও তাঁর সঙ্গে নিজকে খাপ খাইয়ে নেয়া যায়। এইভাবে জীবন তো বয়ে' চলুক ;--স্বপ্ন যদি কিছু থেকে থাকে, সে তো আমার আছেই।

শুনে' খুসি হ'বি, এ-বাড়িতে একটা পিয়ানো আছে। মুরারিবাবু শুধু যে বাজাতে জানেন তা নয়, ইয়োরোপীয় সঙ্গীত-সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানও প্রখর। তা ছাড়া, লাইব্রেরিঘরে ঢের বই আছে, এবং তা'র বেশির ভাগই কবিতা। এবং সেই বই-গুলির পৃষ্ঠা ময়লা।

আমার সম্বন্ধে যা-কিছু জান্‌বার মত, তা তোকে জানালাম তোর এই এক মাসের সব খবর জান্‌তে উৎসুক

নীলা

সোনারঙ
২০শে জ্যৈষ্ঠ

নীলবাণী,

সর্বগুণসম্পন্না বন্ধু আমার—দোষের মধ্যে শুধু এই যে তোর চিঠিগুলো বড্ড ছোট হয়। এ-হিসেবে তুই একেবারে বৌদ্ধ : হিন্দুধর্মের চমৎকার আড়ম্বর, বর্ণ ও ধ্বনির অপূর্ব প্রাচুর্য তোর মধ্যে নেই ; কথার ভেতর দিয়ে নিজকে তুই যতটা প্রকাশ করিস্, নীরবতার মধ্যে নিজকে আড়াল করিস্ তা'র চেয়ে বেশি। মনে করিস্ নি যে তোর বিবাহিত জীবনের আরো বৃত্তান্ত জান্‌তে আমার কৌতূহল হচ্ছে, কারণ সে-বিষয়ে এমন-কিছু তুই বল্‌তে পার্‌বি নে নিশ্চয়ই, যা আমি জানি নে বা ভাব্‌তে পারি নে। আর, যদি বা কিছু থাকে, তা তোর মুখেই শোনা যা'বে ; চিঠির মস্ত একটা অসুবিধে এই যে পত্র লেখক প্রতিটি কথার সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী মুখভঙ্গী খামে পুরে' পাঠাতে পারে না ; কণ্ঠস্বরেই ওঠা-নামা কম্পন-বিকৃতি ইত্যাদি আছে, হাতের লেখার ও-সব বালাই নেই। মুখের চেহারা, গলার স্বর ও বক্তব্য বিষয়—এই তিনে মিলে' হয় গল্প-বলা ; চিঠিতে গল্পটি আসে সেজে-গুজে ভদ্রলোক হ'য়ে, কিন্তু হারাই বলা-কে। প্রেমের কবিতা-পড়া ও প্রেমে-পড়ায় যেমন পার্থক্য, চিঠি ও মুখের কথাতেও তেম্‌নি। তোর মুখামৃত পান কর্‌বার জন্য না-হয় একদিন তোর বীডন্ স্ট্রীটের বাড়িতেই যাওয়া যাবে—কি বলিস্?

কারণ আমাদের শীগ্‌গিরই কল্‌কাতায় ফিরে' যাবার কথা হচ্ছে। পূজো অবধি এখানে থাক্‌বার কথা ছিলো—বাবা বল্‌ছিলেন, এই যখন শেষ, তখন দেখা শোনা আলাপ-পরিচয় শুধু চোখ-কানের নয়, মনেরও হোক্। কিন্তু ইতিমধ্যে খবর এলো যে এক মাম্‌লার তদ্বির কর্‌তে বাবার যেতে হ'বে বিলেত। মধ্য প্রদেশের এক রাজার সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে ; তাঁর ছেলে নেই ; কাজেই সিংহাসনপ্রাপ্তি নিয়ে তাঁর অনুজ আর খুল্লতাতে ঘটেছে বিরোধ। ব্যাপার জটিল ;—পার্লিমেণ্ট-এও এ-নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, এবং ইণ্ডিয়া অফিসের পরামর্শ নিতে অনুজের পক্ষ হ'য়ে বাবা জুলাইর মাঝামাঝি পাড়ি দিচ্ছেন। তাই বড় জোর আর মাসখানেক আমরা এখানে আছি।

ঐ যাঃ—আসল খবর দিতেই ভুলে' গেছি। বাবার সঙ্গে আমিও বিলেত যাচ্ছি। বাবা নিজে থেকেই বলেছেন। দিন তিন-চার আগে এক সকালবেলায় তিনি এসে আমার ঘরে উপস্থিত। বিশেষ-কোনো কাজের কথা না থাক্‌লে সকালবেলাতে তিনি বাড়ির কারু সঙ্গে দেখা করেন না ; তাই জিজ্ঞেস কর্‌লাম, 'কি খবর, বাবা?'

প্রত্যুত্তরে বাবা তাঁর আসন্ন বিলেত-যাত্রার কথা বল্‌লেন। অথচ এই সংবাদের সঙ্গে আমার কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আবিষ্কার কর্‌তে না পেরে আমি বল্‌বার জন্য কথা খুঁজছিলাম, এমন সময় তিনি আবার বল্‌লেন, 'তুইও আমার সঙ্গে চল্ না!'

তখন এ-ই ভেবেই আমার আশ্চর্য লাগ্‌লো যে এ কথা আমার মনে কেন আগে উদয় হয় নি? বললাম, 'বেশ তো। বোসো না।'

বাবা একটা নীচু কাউচ্-এর মাঝখানে বসে' পড়্‌লেন। আমি তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি যাবো? কেন?'

'প্রধানত বেড়াতে। গৌণত আমার সঙ্গী হ'য়ে। যে উপলক্ষ্যে যাচ্ছি, তা'তে কাজ স্বল্প, অবসরই প্রচুর। তা ছাড়া, যাওয়া-আসার দেড় মাস একেবারে ফাঁকা। এবং সে-বয়েস এখন আর আমার নেই, যা'তে নতুন লোকের সঙ্গে চট্ করে' আলাপ করে' নে'য়া যায়। সে প্রবৃত্তিও নেই। কাজেই তোকে নিতে চাচ্ছি। মাস তিনেকের ব্যাপার ;—এ ক'টা দিন তোর মা হায়দ্রাবাদে তাঁর ভায়ের কাছে বা কল্‌কাতায় আমাদের বাড়ীতে থাক্‌তে পারেন—যেমন তাঁর খুসি। আমার অভিপ্রায় এইটুকুই ; তোর যদি আরো কোনো থাকে, আমায় জানাতে

পারিস্।'

'আমার যাওয়াই যদি ঠিক হ'ল, তবে মাস-তিনেকের মধ্যেই ফিরে' আস্‌তে হবে, এমন-কোনো প্রয়োজন বা আকর্ষণ তো আমার দেশে নেই।'

বাবা হেসে বল্‌লেন 'আচ্ছা বেশ, অক্‌স্‌ফোর্ড-এ তা হ'লে তোর ভর্তির ব্যবস্থা করি। সময়টাও ঠিক পড়েছে। না প্যারিস্?'

'বাবা, তুমি আমার মনের কথা কি করে' হুবহু বুঝ্‌তে পারো, বলো তো? আমি যে অক্‌স্‌ফোর্ড-এর কথাই ভাবছিলাম!'

এমন সময় গোলাপী এলো আমার কোকো-র পেয়ালা নিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, 'এক পেয়ালা খা'বে, বাবা?'

'আন্‌তে বল্।'

কোকো খেতে খেতে বাবার সঙ্গে অনেক বিষয়েই আলাপ হ'ল। বহুকাল কথা বলে' ও শুনে' অমন সুখ পাই নি। অমন প্রাণ-খোলা সরল, অথচ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার কথা বাবার মুখেও কম শুনেছি। তিনি আমাকে যা বল্‌লেন, তা'র সারসঙ্কলন কর্‌লে মোটামুটি এইরকম দাঁড়ায়।

'দেখতে তো পাচ্ছিস্, মনুষ্যজাতি ক্রমেই অবনতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। তা'র কারণ শুধু এই যে মানুষে মানুষে প্রভেদ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। রাজা ও প্রজায় আস্‌মান-জমীন্ ফারাক্ আর নেই, সমাজপতিদের দিন গেছে, সমাজচালনায় আজকাল সবারি সমান দাবী। গৃহেও তেম্‌নি পিতা তা'র অবিসম্বাদিত কর্তৃত্ব হারিয়েছে। একজন বাদ্‌শাহকে ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্যের অধিকারী কর্‌বার জন্য জন-গণ আর পশুতুল্য জীবন যাপন কর্‌তে রাজি নয় ;— সবাই মোটামুটি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ কর্‌বে, বর্তমান যুগের এই হয়েছে লক্ষ্য। ফলে হয়েছে কি, উৎকৃষ্ট বলে কোনো জিনিষ আর থাক্‌ছে না—সবই মাঝারি। আশী টাকা তোলার আতর আজকালকার বাজারে বিকোয় না, কারণ তা কেন্‌বার মত সঙ্গতি কারুরই নেই ; ন' আনা দামের অগুরুর খুব চল্—যা রাণী থেকে কেরাণী পর্যন্ত সবাই কিন্‌তে পারে।

'এই উৎকর্ষের অভাব দেখ্‌বি সবখানেই। পাঁচ টাকা দিয়ে বই কিনে' দু' দিন বসে, বিরাট উপন্যাস পড়্‌বার সময় ও সামর্থ্য নেই কারো ; আট আনা পয়সা খরচ করে' দু'ঘণ্টায় সেই বইখানা ফিল্‌ম্-এ দেখে আস্‌বে। এমন দিন হয়-তো আস্‌বে, যখন কেউ আর বই লিখ্‌বে না ; জনমণ্ডলীর শিক্ষা ও আমাদের ভার ন্যস্ত হ'বে ফিল্‌ম্‌ওয়ালাদের ওপর ; তাঁরা অবিশ্রান্ত খেলো রসিকতা আর শস্তা ন্যাকামির পসরা বহন করে' জনগণের সঘন করতালি লাভ কর্‌বেন। কবিতা পৃথিবী থেকে উঠে যা'বে, কারণ সবাই তা বোঝে না, গান আর ছবি একেবারে লুপ্ত হ'বে, কারণ ও-সব বোঝবার মত কান বা চোখ যাঁদের আছে, তাঁদের সংখ্যা হাজারকরা একও নয়। সেই বৈচিত্র্যহীন জগতে মানুষের স্থূলতম প্রবৃত্তিগুলি ছাড়া সব যাবে মরে' ; ফলে সব মানুষই এক রকম হ'য়ে যাবে—অর্থাৎ, মানুষে আর কলে খুব বেশি তফাৎ থাক্‌বে না।

'সুলভতার এই নব্য-তন্ত্রে আমাদের কোনো স্থান নেই—তোর আর আমার। আশা করি নিজের সম্বন্ধে তুই সম্পূর্ণ সচেতন। তোর রক্তের মধ্যে যে-শ্রেষ্ঠতার বীজ আছে, এবং এতদিনকার শিক্ষা ও অনুশীলন যা'র বিকাশের সহায়তা করেছে, আশা করি তুই তার অমর্যাদা কর্‌বি নে। আত্ম-সমর্পণের একটা প্রবল মোহ আছে—সেটাও সুলভ। তোর পক্ষে তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারা উচিত। বিশেষত আমাদের দেশে এ ভয় খুব বেশি। আমরা পরাধীন ও সেন্টিমেন্টাল জাত ; একটু কিছু হ'লেই 'জয় মা' বলে' বন্যায় গা ঢেলে দিতে পার্‌লেই আমরা খুসি। তুই আর আমি সব ক্ষণিকের উত্তেজনার ওপরে ; জীবনে ও আচরণে, বুদ্ধিতে ও চিন্তায় আমরা মহার্ঘ সৌন্দর্যের উপাসক ; বাঙলা দেশ আমাদের

মনের মাতৃভূমি নয়, এবং দৈবাৎ আমরা দু' শতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ করে ফেলেছি!'

বাবার কথা শেষ পর্যন্ত শুনে' আমি বললাম, 'বৃথাই আমাকে এত কথা বল্লে বাবা। বিয়ের চিন্তা এখনো আমার মন থেকে ঢের দূরে। এবং যদি কখনো সে-চিন্তার উদয় হয় তো যথাসময়ে তোমাকে তা জ্ঞাপন কর্তে ভুল্বো না।'

'সে আমি জানতাম। কিন্তু তুই যখন বিলেতে পড়তে যাওয়া ঠিক কর্লি, তখন তোকে এ-কথা না বলেও পার্লাম না।—বুঝলি তো?'

'বুঝেছি বই কি। কিন্তু আজকাল যে বাঙালী ছেলেরাও মেম বিয়ে করে' আসে না, বাবা!'

বাবা শুধু বল্লেন, 'বুদ্ধিমতী মেয়ে আমার!'

কাজেই দেখতে পাচ্ছিস, জুলাইর মাঝামাঝি আমরা দেশ ছাড়ছি, তাই মাসখানেকের মধ্যেই কল্কাতায় ফেরা দরকার। জাহাজে ওঠবার আগে তোর সঙ্গে অল্প কয়েক দিনের জন্যে দেখা হবে, এবং সেই ক'টি দিনের প্রতি আমি উৎসুক হৃদয়ে তাকিয়ে আছি। তিন চার বছরের মত তোর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হ'বে এবার—ফিরে এসে তোর একেবারে গৃহলক্ষ্মীরূপে না দেখি, তা হ'লেই বাঁচি। এ ক'টা বছর আমি আর যা ই করি, হৃদয়বৃত্তি চর্চা করবার অবকাশ পাবো না—যদি অবিশ্যি কোনো ইংরেজ ছোক্রার প্রেমে না পড়ে' যাই।

ঠিক ঐ কাজটিই যেন আমি না করি, বাবা সেদিন স্পষ্ট করে' তো এ-কথাই বলে গেলেন। আমার মনের কথা যদি জিজ্ঞেস্ করিস্ তো বল্তে পারি, সে-ভয় আদৌ নেই। জানি, তিনি সর্বক্ষণ আমার কাছে-কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তবু তাঁকে দেখতে পাই নে কেন? আমরা, দু'জন অন্ধকার রাত্রিতে মশাল হাতে নিয়ে অসংখ্য নর-নারীর মধ্যে পরস্পরকে খুঁজে বেড়াচ্ছি ;—কতবার হয় তো পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছি, অন্ধকারে চিনতে পারি নি। কিন্তু যে-মুহূর্তে মশালের আলোকে তাঁর মুখ তারার মত জ্বলে উঠবে, অম্নি সব সংশয় দূর হবে ; সকল অন্বেষণের হ'বে পরিসমাপ্তি।

বাবা আমার ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর সেদিন অনেকক্ষণ চুপ করে' শুয়ে' ছিলাম, হঠাৎ কি মনে হ'ল, জানিস্? মনে হল, আর দেরি নেই—সে শুভ-মুহূর্ত সমাগতপ্রায়, আমার এই বিলেত-যাত্রার প্রস্তাবনা যেন তা'রি দূত রূপে এসেছে। এই যে আমি তিন-চার বছরের মত তাঁকে পাবার সম্ভাবনা অতিক্রম কর্তে উদ্যত হয়েছি—এত বিলম্ব কি তিনি সইবেন? কলম্বাস্-এর সেই অকস্মাৎ আবির্ভূত বিহঙ্গশ্রেণীর মত আমার এই প্রবাস-যাত্রার সঙ্কল্প যেন পরম-আকাঙ্ক্ষিত উপকূলের নিকটবর্তিতা নির্দেশ কর্ছে ; নিজের তপোবলে তাঁকে আবিষ্কার কর্বার আনন্দ আমাকে দান কর্বেন বলে'ই সেই স্বয়ম্প্রকাশ আত্ম-গোপন করে' আছেন।

এখানকার এই নির্জনতায় নিজকে বড় বেশি প্রাধান্য না দিয়ে উপায় নেই। এখানে আমিই আমার একমাত্র সঙ্গী। নিজের মনের এই-সব চঞ্চলতা নিয়ে বিলাস কর্তে-কর্তে সন্দেহ হয় যে আমি এদের প্রতি যতটা মূল্য আরোপ কর্ছি, সে মূল্য অন্য লোকেও দিতে প্রস্তুত কিনা। কল্কাতায় ফিরে যেতে ইচ্ছে কর্ছে ; আমার মনের এই অস্পষ্টতম গতি-বিধিগুলো তুই একাই বুঝতে পার্তিস্। নিজের ওপর বিশ্বাস যখন টল্মল্ করে' উঠ্ছে, তখন তোর চোখের প্রশান্ত নির্মলতার দিকে তাকিয়ে হয়-তো আশ্বাস পেতাম। আকাশ আর পদ্মানদীকে নিয়ে দিন কাটাতে কাটাতে মন আমার হাঁপিয়ে উঠেছে।

এই কথা লিখ্তেই মনে পড়্লো যে কাল্কে বেশ মজার একটা ব্যাপার হ'য়ে গেছে। সকাল থেকেই হাওয়ার তাড়া খেয়ে আকাশে মেঘগুলো ছুটোছুটি করে' বেড়াচ্ছিলো। দুপুরটি ছিলো ছায়া-ঢাকা স্নিগ্ধ। বৃষ্টি নেই, অথচ বাতাস বেশ জোরে বইছে। ধূসর আকাশ

আর সজল বায়ুতে মিলে মনের ওপর যে একটি কোমল আবেশের সঞ্চার করে, তা কাটিয়ে ওঠ্‌বার জন্য আমি টমাস্‌ ব্রাউন-এর 'রিলিগিয়ো মেডিচি' পড়্‌তে বস্‌লাম। কিন্তু প্রথম কয়েক লাইন পড়ার পর মন ও চোখ দুই-ই ক্লান্ত হ'য়ে এলো। দূর ছাই—বরঞ্চ বাইরে থেকে খানিকক্ষণ ঘুরে আসি। আমাদের বড় দীঘিটার জল মেঘের ছায়ায় কালো হ'য়ে নিশ্চয়ই কূলে-কূলে টল্‌মল্‌ করে' উঠ্‌ছে!—বইখানা হাতে করে'ই বেরিয়ে পড়্‌লাম।

দীঘিটা আমাদের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। তিনটে বড়-বড় আঙিনা পেরিয়ে সুবৃহৎ দুর্গা-মণ্ডপ—বহু কালের অব্যবহারে ম্লান। তার পর কয়েক ঘর মালী-বাড়ি—আমাদেরই রায়ৎ। সেই বাড়িগুলো পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা ;—বিকেলে মালীর ছেলেরা ওখানে হা-ডু-ডু খেলে। তার পর দীঘি- মস্ত দীঘি, ওপারে পানের বরজ্‌ একটা,—একধারে বাঁধানো ঘাট। সারা গ্রামের পানীয় জল এই দীঘি থেকে সরবরাহ হয়। ঐ ঘাটে দাঁড়িয়ে পদ্মার রূপালি ঝিকিমিকি চোখে পড়ে। লোকে বলে, মাটির তলা দিয়ে পদ্মার সঙ্গে এই দীঘির গোপন যোগাযোগ আছে ; তাই এর জল অত মিষ্টি।

সকাল-সন্ধ্যায় এই দীঘিতে লোক-চলাচলের অভাব হয় না ; কিন্তু এই ভর্‌-দুপুরবেলা চার্‌দিক শূন্যতায় ঝাঁ-ঝাঁ কর্‌ছে ; এত নীরব যে চড়ুই পাখীদের ডানার ঝাপটানিও শুন্‌তে পাওয়া যায়। বাঁধানো ঘাটের নীচের দিকটার একটা সিঁড়িতে বসে' আমি হাতের বইখানা খুল্‌লাম।

হাওয়ার দাপটে দীঘির জল ছোট-ছোট ঢেউ তুলে আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ছিলো। তাদের ছল্‌ছলানি শুন্‌তে-শুন্‌তে কি আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, না আমার মন বইয়ের মধ্যেই ডুবে গিয়েছিলো, তা এখন বল্‌তে পারবো না। কিন্তু হঠাৎ জলের মধ্যে ভয়ানক একটা তোলপাড়ের শব্দ শুনে' আমি চম্‌কে উঠলাম। তাকিয়ে যা দেখ্‌লাম, তা এই ঃ

আমি যেখানে বসেছিলাম, তা'র একটু দূরে একটা জামরুল-গাছ, তা'র কয়েকটা পত্র-ঘন শাখা সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে পড়ে দীঘির জল-স্পর্শ কর্‌তে উদ্যত হয়েছে ;—মাঝে-মাঝে দু'একটা শুকনো পাতা টুপ্‌টাপ্‌ করে' খসে' পড়্‌ছে। সেই গাছের আড়ালে লুকিয়ে একটা লোক বসে' ছিপ্‌ দিয়ে মাছ ধরছে—এতক্ষণে আমার চোখে পড়্‌লো। এইমাত্র বোধ হয় বেশ বড় রকমের একটা মাছ টোপ্‌ গিলেছে; এদিকে লোকটা প্রায় মাটিতে শুয়ে পড়ে' মাছটাকে ডাঙায় তুলে' আন্‌বার চেষ্টা করছে ; ওদিকে আবার মাছটাও এই মর্মান্তিক বন্ধন থেকে ছাড়া পাবার জন্য নিদারুণ ছট্‌ফটানি সুরু করে' দিয়েছে। তারি ফলে ঐ তোলপাড়।

আমি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, ততক্ষণে আমাদের মৎস্য-শিকারীর হয়েছে জয় ; মস্ত একটা রুই মাছ ডাঙায় পড়ে হাঁপাচ্ছে এবং লোকটা উবু হ'য়ে তা'র মুখ থেকে বঁড়শির টোপটা খসাচ্ছে। মুহূর্তে আমার অধিকার-বৃত্তি সজাগ হ'য়ে উঠ্‌লো ; লোকটার কাছে এগিয়ে এসে আমি রুক্ষ-স্বরে বল্‌লাম, 'এই, তুমি এ দীঘি থেকে মাছ ধর্‌ছো যে বড়? জানো—'

কিন্তু সেই মুহূর্তে লোকটা আমার দিকে মুখ ফেরালো, এবং সঙ্গে-সঙ্গে আমি চুপ করে' যেতে বাধ্য হলাম। আশ্চর্য রকম কালো ও পরিষ্কার দুই চোখ মেলে সে একবার আমার দিকে তাকালো ;—সে-দৃষ্টিতে তিরস্কারের তীব্রতা ও করুণা-ভিক্ষার নম্রতা দুই-ই দেখ্‌তে পেয়েছিলাম। তার পর চোখ নত করে' মৃদু মেঘ গর্জনের মত গম্ভীর-কোমল স্বরে সে বললে, 'আমার মতন দুর্ভাগ্যকে অপমান করা আপনার সাজে না।' 'আপনার' কথাটির ওপর জোর দিয়ে বল্‌লে।

আমি একটু অপ্রস্তুতই হ'য়ে গেলাম। লোকটা ততক্ষণে ছিপটা সম্পূর্ণ খসিয়ে নিয়ে আবার বল্‌লে, 'এ-দীঘি আপনাদের, এ-মাছের ওপরও আপনারই অধিকার। আপনার যদি

দরকার থাকে তো বলুন্, নইলে মাছটাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দি।'

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'তা'র মানে?'

'আমি মাছ খাই নে।'

না জিজ্ঞেস করে' পার্‌লাম না, 'তবে--তবে ধরেন কেন?'

'এম্‌নি। সময় কাটাতে।--আপনি তা হ'লে চান্ না মাছটা?' বলে' তিনি সেটাকে পা দিয়ে আস্তে একটু ঠেলে দিলেন। অর্ধ-মৃত রুই গড়াতে-গড়াতে জলে গিয়ে পড়লো। মাছটা পারের কাছে অগভীর জলে খানিকক্ষণ ছট্‌ফট্ করে' তলাকার সমস্ত কাদা ওপরে পাঠিয়ে দিলে ; তার পর যেই একবার গভীর জলের আশ্রয় পেলে, অমনি সব গেলো শান্ত হ'য়ে।

ভদ্রলোকের আচরণে ও কথাবার্তায় আমি ক্রমাগতই আশ্চর্য হচ্ছিলাম, কিন্তু সব চেয়ে বড় বিস্ময় পেলাম তখন, যখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পুরুষ জাতকে যদি সুন্দর ও কুৎসিত এই দুই দলে বিভক্ত কর্‌তে হয়, তবে তাঁকে কুৎসিত না বলে' উপায় নেই। কিন্তু তিনি খর্বাকৃতি হ'লেও ক্ষুদ্রদেহ নন্। প্রশস্ত, বলিষ্ঠ কাঁধের ওপর সিংহের মত প্রকাণ্ড, তেজ-ব্যঞ্জক মাথা ; দীর্ঘ বাহুর কঠিন সরলতায় পৌরুষের রুক্ষতা, কিন্তু হাত দু'খানা নারী-সুলভ, মুখের চেয়ে তা'দের রঙ্ ফর্সা। পরিচ্ছন্ন নখগুলিতে রক্ত যেন ফেটে পড়্‌ছে।

সিংহের মত সেই মাথায় শিশুর মত স্বচ্ছ ও করুণ চোখ ; আমার দিকে একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে নত-মস্তকে যেন আমার কথা-বলার অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন। বল্‌লাম, 'এক মাসের ওপরে আমি এখানে আছি, কিন্তু আপনাকে কখনো দেখেছি বলে' তো মনে পড়্‌ছে না।'

'আমার এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জনা কর্‌বেন, কারণ আমি কাল মাত্র এখানে এসেছি।'

কথাটা আমার কানে ব্যঙ্গের মত শোনালে। হেসে বল্‌লাম, 'আপনার স্পর্ধা আছে। আমার কথাটা অভিযোগ নয়।'

ভেবেছিলাম, আমার এ-কথা শুনে' ভদ্রলোক যা'বেন চটে,' কিন্তু চটা দূরে থাক্, তিনি তাঁর স্বভাবত মৃদু কণ্ঠস্বর আরো নামিয়ে বল্‌তে লাগলেন, 'কাল এখানে এসেই শুন্‌লাম, আপনারা এসেছেন। আপনারা সমাজের শীর্ষতুল্য ; আমার উচিত ছিলো কাল্‌কেই এসে আমার অভিবাদন জানিয়ে-যাওয়া, কিন্তু তিন দিন রেলে-জাহাজে কাটিয়ে আমি পথশ্রমে ক্লান্ত ছিলাম। আমার এই আপাত-অবহেলার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।' বলে' ঈষন্নত মস্তক তিনি আরো অবনত কর্‌লেন।

মুখের এই অতিরিক্ত বিনয়ের অন্তরালে মনের যে অসম্ভব অহঙ্কার প্রচ্ছন্ন ছিলো, তা আমার আত্ম-সম্মানে ঘা দিলে। অসহিষ্ণুভাবে বলে' উঠলাম, 'তা'র কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিলো না।'

বলে'ই দ্রুত পদক্ষেপে সেখান থেকে চলে' আস্‌ছিলাম, কিন্তু অল্প একটু যেতেই সেই ভদ্রলোক এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। না থেমে বল্‌লাম, 'বলুন।'

চল্‌তে-চল্‌তে তিনি বল্‌লেন, 'অপরাধ গ্রহণ কর্‌বেন না, কিন্তু আপনার হাতের বইখানা যদি একদিনের জন্য আমাকে ধার দেন্, তবে কাল্‌কে আর আমাকে আপনাদের দীঘিতে অনধিকার-চর্চা কর্‌তে আস্‌তে হয় না।'

তাচ্ছিল্যভরে বললাম, 'কিন্তু ও তো গল্পের বই নয়!'

ভদ্রলোক উৎফুল্লস্বরে বললেন, 'না, নয়। কিন্তু গল্পের মত সুখপাঠ্য ও কবিতার মত ছন্দশীল। আপনার হাতে যে-বইখানা দেখ্‌ছি, তা'র চেয়ে তাঁর 'Urn Burial' আরো চমৎকার। পড়েছেন নিশ্চয়ই?'

হঠাৎ থেমে গেলাম। তার পর ফিরে তাঁর মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়াতেই তাঁর মুখের এক আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য কর্‌লাম। এইমাত্র যা উৎসাহে ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় উজ্জ্বল ছিলো, আমার দৃষ্টি তা'র ওপর পড়তেই লজ্জায় ও আশঙ্কায় তা মলিন হ'য়ে এলো। বল্‌লাম, 'এই নিন্।'

বইখানা নেবার জন্য তিনি যে-হাতখানা বাড়ালেন, তা'র আঙুলের ডগাগুলো একটু-একটু কাঁপছিলো। বইখানা তাঁর হাতে দিয়ে আমি আমার মধুরতম হাসি হেসে বললাম, 'আচ্ছা, নমস্কার।' বলে' দু'হাত একত্র করে' কপালে ঠেকালাম।

প্রতি নমস্কার করে' তিনি বললেন, 'আমার সৌভাগ্য!' কিন্তু ও দু'টি কথা তিনি যে-গাম্ভীর্যের সহিত উচ্চারণ কর্‌লেন, তা'তে আমার মনে হ'ল, তিনি ধ্বনিবহুল সংস্কৃত ভাষায় বল্‌লেন, 'কৃতার্থেহহং দেবি!'

বাড়ি ফিরে' এসে মনে হ'ল যে ভদ্রলোকের সম্বন্ধে অনেক জরুরি কথাই জানা হয় নি। নাম জিজ্ঞেস করাটা অবিশ্যি আধুনিক আদব-কায়দার অনুযায়ী নয় ;—কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই এ-গ্রামেরই লোক, নইলে আমাদের সম্বন্ধে অমন সম্ভ্রম-সহকারে কথা বল্‌বেন কেন? আর অত জানবেনই বা কি করে'? ওদিকে আবার তিন দিন রেলে-জাহাজে কাটিয়ে এলেন ;—অত দূরে কোন্ দেশ? বোম্বে? পণ্ডিচেরী? রেঙ্গুন? অত দূর দেশে কি করেন তিনি? অরবিন্দর শিষ্য বা সব্যসাচীর পকেট্-সংস্করণ নন্ তো? অথচ টমাস্ ব্রাউন-ও পড়া আছে! আধুনিক যুগের কোনো সাহিত্য-সম্রাট হ'লে একটুও আশ্চর্য হ'তাম না ; কিন্তু এই সেকেলে লেখকের অদ্ভুত ভাষা ও তা'র চেয়েও অদ্ভুত চিন্তার রসোপভোগ কর্‌তে পারে, এমন লোকও আজকালকার দিনে আছে?

আসল কথা এই যে এই মৎস্য-শিকারীর সম্বন্ধে আমি বিষম কৌতূহল অনুভব কর্‌ছি। তাঁর বাড়ি কোন্ দিকে, জিজ্ঞেস কর্‌তে ভুল হ'য়ে গেছে ; আশা কর্‌ছি, শীগ্‌গিরই একদিন এসে তিনি বইখানা ফেরৎ দিয়ে যা'বেন।

তুই তো মানব-চরিত্রের একজন মস্ত বড় সমঝদার ;—আমার চিঠি পড়ে' এই ভদ্রলোকের একটা চরিত্র চিত্রণ লিখে' পাঠাতে পার্‌বি? যদি সুযোগ হয়, আসলটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌বো। ইতি—

তোর লীনা।

সোনারঙ
২২শে জ্যৈষ্ঠ

নীলা,

বইখানা দিতে তিনি নিজে আসেন নি ; আজ সকালে একটা চাকরকে দিয়ে সেখানা ফেরৎ পাঠিয়েছেন। কিন্তু অন্যমনস্কভাবে বইখানা একবার খুল্‌তেই তা'র মধ্যে আবিষ্কার করলাম ডাকঘরের ছাপ-আঁকা খালি একটা খাম—ওপরে নাম লেখা 'শ্রীবিদ্যাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়'—এবং ঠিকানা কলম্বোর। খামখানা বোধ হয় পেইজ্-মার্ক্ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিলো, তার পর আর স্থানান্তরিত কর্‌তে মনে ছিলো না।

কোনো অপরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে তা'র নাম-ধাম-বিবরণ জান্‌বার প্রথা আমাদের দেশে আছে। প্রথম দুটি দৈবাৎ জান্‌তে পেরে তৃতীয়টি জানবার জন্য আমার কৌতূহল আরো বেড়েই গেলো। কলম্বোটা অবিশ্যি দুর্বোধ্য নয়—অন্ন-অন্বেষণে আজকাল মানুষ কোথায় না যেতে পারে? কিন্তু তাঁর ঐ নাম—মধুসূদনের কোনো পদের অংশ-বিশেষের মত গুরুগম্ভীর তাঁর ঐ নাম আমাকে চঞ্চল করে' তুল্‌লো।

মনে হ'ল, ও-নাম যেন আমার অচেনা নয় ; এক কালে যে ঐ নামের সঙ্গে আমার

খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিলো, এখন তা ভুলে গেছি। অথচ, ও-নামের কাউকে কখনো চিনতাম কিনা, না কারো মুখে শুনেছি বা কোনো বইতে পড়েছি—হাজার চেষ্টা করেও তা মনে কর্‌তে পারলাম না। জানিস্ তো, আমাদের স্মরণ-শক্তি কি অদ্ভুতরকম খামখেয়ালী ; সাধারণ অবস্থায় তা'র মধ্যে সামান্য একটু শ্লথতা খুঁজে পাবি নে ; দশ বছর আগেকার কোনো ঘটনাও অনায়াসে বিবৃত করে যাওয়া যায় ; কিন্তু যদি কেউ হঠাৎ 'নির্নিমেষ' বানান জিজ্ঞেস করে' বসে, বা 'Sorrows of Satan'-এর লেখিকার নাম জান্‌তে চায়—তা হ'লেই হয় মুস্কিল। এবং যে-হেতু 'বিদ্যাপতি'-নামের ইতিহাস জান্‌তে আমার মন উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে, সেই জন্যই সুযোগ বুঝে' আমার স্মৃতি-শক্তি দিতে সুরু কর্‌লেন ফাঁকি, এবং দুপুর পর্যন্ত আমি অসহ্য যন্ত্রণায় কাটালাম। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঐ নামের বৈষ্ণব কবির কথাও আমার একটিবার মনে পড়লো না। কিন্তু তা'র পরেই আমার প্রশ্নের উত্তর মিললো। আমার তখনকার বিস্ময়টা তুই সহজেই অনুমান করতে পার্‌বি, দুপুরে খেতে বসে বাবা যখন বল্‌লেন :

'লীনা, পরশু বড় দীঘির ধারে তোর যার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, তিনি সীতাপতি চৌধুরীর দৌহিত্র।'

এতক্ষণ যে-নামরহস্য আমাকে পীড়া দিচ্ছিলো, বাবার কথা শোনামাত্র তা জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। মনের দরজায় কোথায় যেন একটা খিল পড়ে গিয়েছিলো, তা চট করে খুলে গেলো—এবং সঙ্গে সঙ্গে এখানে আসবার দিন স্টীমারে বাবার মুখে যে-সব কথা শুনেছিলাম, তা'রা হৈ-চৈ করে' ফিরে আস্‌তে লাগলো। 'সীতাপতি'-নামের সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্যই যে ঐ ভদ্রলোকের নাম আমার চেনা চেনা ঠেকছিলো, তা এতক্ষণে বুঝলাম।

'কি করে' জানলে, বাবা? মানে, আমার সঙ্গে যে দেখা হয়েছিলো, সে খবর?'

'তাঁরই মুখে শুনলাম। আজ সকালবেলা ডাকঘরে দেখা। আমি চিন্‌তে পারি নি। উনিই প্রথমে নমস্কার করে' বল্‌লেন, "ভালো আছেন তো?"

"তা আছি। কিন্তু আপনাকে তো—"

"আমাকে চিন্‌তে পারছেন না? পার্‌বার কথাও নয়। কিন্তু আপনার সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার দু'বার দেখা হয়েছে।"

'আপাদমস্তক তাঁকে নিরীক্ষণ করলাম। আশা করেছিলাম, মুখের কোনো রেখায় বা দেহের কোনো ভঙ্গীতে বহুদিনের বিস্মৃত কোনো ক্ষণিক পরিচয়ের আলো জ্বলে উঠবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশ হ'তে হ'ল। ভদ্রলোক আমার অকৃতকার্যতা লক্ষ্য করে' বললেন :

"আপনার লজ্জিত হ'বার দরকার নেই, কেননা, প্রথম বার দেখা হয় মাদুরা রেলোয়ে স্টেশনে—নিশাকালে। আপনি যে গাড়ি থেকে নাবছিলেন, আমি সেই গাড়িতে উঠছিলাম। দ্বিতীয়বার আপনাকে দেখি কল্‌কাতায় রামমোহন লাইব্রেরিতে—স্টেলা ক্রাম্‌রিশ-এর বক্তৃতা হচ্ছিলো।"

'আমি হেসে উঠ্‌তে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি বল্‌তে লাগলেন, "আর পরশু দিন আপনার মেয়ের সঙ্গে—হ্যাঁ, এক রকম পরিচয়ই হয়েছে।"

'আমি কিছুই বুঝতে না পেরে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তখন তিনি তাঁর মাছ-ধরা থেকে বই ধার নেয়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন।

'আদ্যোপান্ত শুনে' আমি বললাম, "সত্যি? কিন্তু লীনার দোষ কি, বলুন? ও তো আপনাকে চেনে না। ঐ দেখুন—আপনার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে আমিও ভুলে' গেছি।"

'পোস্টমাস্টার বাবু এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন ; এইবার তিনি আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁর মুখ থেকেই আমি বিদ্যাপতি বাবুর পরিচয় শুন্‌লাম।

'বিস্মিত হ'তে হ'ল। কিন্তু পরমুহূর্তে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল যে তাঁর মুখের ওপর সীতাপতি চৌধুরীর সেই আশ্চর্য চোখ দুটি আমি প্রথম দেখেই কেন চিন্‌তে পারি নি? বাল্যকালে আমার কল্পনায় যিনি শুধু ঈশ্বরের চেয়ে ছোট ছিলেন, সেই সীতাপতি চৌধুরীর একমাত্র রক্ত সম্পর্কিত ও উত্তরাধিকারীকে দেখলাম,—মনে হ'ল, এ যেন আমার কত বড় সৌভাগ্য।'

এইখানে বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তখন আমার হ'য়ে তুমি খুব ক্ষমা চাইলে তো?'

বাবা হেসে বল্‌লেন, 'ও সব লৌকিকতার কোনো প্রয়োজন তাঁর কাছে ছিলো না। তাঁকে বললাম, "আপনাকে দেখে আমার মন আজ আনন্দিত হ'য়ে উঠ্‌ছে, কারণ আপনার সঙ্গে এমন-একজনের স্মৃতি বিজড়িত, যিনি আমার সমগ্র জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন।"

'ঐ কেতাবী ভাষায় তুমি কথা কইলে বাবা?'

'বক্তব্য বিষয়টা যখন বইয়ে লেখবার মত হয়, তখন ভাষাটাও সেই অনুসারে তৈরি হয়ে ওঠে বই কি!'

'তাই নাকি? যাক্—তার পর?'

'তার পর আমরা দু'জন ডাকঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম। অনেক আলাপ হ'ল। সাংসারিক ব্যাপারে সীতাপতি চৌধুরীর ঔদাসীন্য সব চেয়ে মারাত্মক হয় তাঁর মেয়ের পক্ষে। একমাত্র মেয়ের প্রতি অত্যধিক স্নেহবশত তিনি তাঁর বিয়ে দিতেই ভুলে যান। পিতার মৃত্যুর পর এই চতুর্বিংশতিবর্ষীয়া কন্যা আবিষ্কার কর্‌লেন যে পৃথিবীতে এখন তিনি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়।'

এইখানে মা বলে' উঠ্‌লেন, 'কী সর্বনাশ!'

'কিন্তু সৌভাগ্যবশত সীতাপতি চৌধুরী তাঁর সঙ্গীত-দক্ষতা মেয়েকে দিয়ে গিয়েছিলেন; ফলে তিনি কল্‌কাতায় এক গানের ইস্কুলে'—

মা বল্‌লেন, 'কিন্তু দেশের বিষয় সম্পত্তি?'

'জানোই তো, তোমার শ্বশুরের পূর্বপুরুষদের কল্যাণে তা'র নামে মাত্র অস্তিত্ব ছিলো। তাছাড়া, শুধু অর্থ হ'লেই মেয়েদের চলে না। তদ্ব্যতীত যা প্রয়োজন, তা তাঁর ভাগ্যাকাশে অনতিবিলম্বেই উদিত হ'ল।

'জিজ্ঞেস করলাম, 'কে সেই ভাগ্যবান?'

'এক দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট সাহিত্যিক। বিয়ে করে' তাঁর অর্থকষ্ট ঘুচলো। কিন্তু সে-সুখ তাঁর কপালে বেশিদিন সইলো না। বছর তিনেক পর তিনি গেলেন মারা। বিদ্যাপতি বাঁড়ুয্যে তখন এক বছরের শিশু।'

মা রুদ্ধস্বরে বলে' উঠলেন, 'তার পর কি হ'ল?'

'হ'বে আবার কি? সেই সাহিত্যিকজায়া কত কষ্ট করে' যে ছেলেটিকে মানুষ করে' তুল্‌তে লাগলেন, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বিদ্যাপতিবাবু ও-প্রসঙ্গ যেন এড়িয়ে গেলেন মনে হ'ল—সম্প্রতি তাঁর মাতৃ-বিয়োগও হয়েছে কিনা! মা-র অবিশ্যি যথেষ্ট বয়স হয়েছিলো, কিন্তু বিদ্যাপতিবাবু বোধ হয় এই অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনাকে এখন পর্যন্ত ক্ষমা করে' উঠতে পার্‌ছেন না।'

মা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বল্‌লেন, 'কী যে বলো! আর-কেউ নেই যা'র—'

'হ্যাঁ, সত্যি। একান্ত স্বজনহীনতা যে কত বড় দুর্ভাগ্য, তা আমাদের বুঝতে পারার কথা নয়।'

'তা এই বিদ্যাপতিবাবু কি কর্‌ছেন এখন?' মা শুধোলেন।

'কলম্বোর এক বৌদ্ধ মিশনারী কলেজে ইংরেজি সাহিত্য পড়ান্ ও মাঝে মাঝে ছুটি পেলে এইখেনে আসেন। জানো তো, আমাদের জন্যই আজ তাঁর এই দুরবস্থা। তাঁর কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমি লজ্জিত হ'য়ে উঠ্‌ছিলাম ; আমার পূর্বপুরুষেরা আমার ঘাড়ে যত অন্যায়ের ঋণ চাপিয়ে গেছেন—মনে হচ্ছিলো, তা যেন আমার শোধ করা উচিত।'

মা হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্‌লেন, 'সে-উদ্দেশ্যে কি কর্‌লে তুমি?'

'চল্‌তে চল্‌তে যখন আমাদের দুজনের দুদিকে যাবার সময় হ'ল, আমি একটু থেমে বললাম, "যদ্দিন এখানে আছি, আপনার সঙ্গলাভের জন্য নিশ্চয়ই আশা করতে পারি?"

'তিনি অল্প একটু হেসে বল্‌লেন, "আপনাদের যদি তাই অভিরুচি হয়, আমার কোনো মতান্তর নেই, জান্‌বেন।"

'ফলে আমি তাঁকে নিমন্ত্রণ করে' এসেছি। আজকে রাত্তিরে।'

আমি বলে উঠলাম, 'আজকেই?'

'হ্যাঁ, আজকেই। তোর মত জিজ্ঞেস্ করবার সময় ছিলো না, কিন্তু তোর কোনো আপত্তি নেই নিশ্চয়ই?'

'না, না—আপত্তি কিসের?' সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, বিদ্যাপতিবাবু ঐ কথাটা অমন করে বল্‌লেন কেন? 'আপনাদের যদি তাই অভিরুচি হয়, আমার কোনো মতান্তর নেই, জানবেন' 'আপনাদের' কেন? আর, 'আমার কোনো মতান্তর নেই জানবেন,' এ-কথার মানে তো শুধু সম্মতি নয়, বরং সাধারণ ভাষায় তর্জমা কর্‌লে তা অনেকটা এইরকম দাঁড়ায় ঃ 'যা অনিবার্য, তা'র সঙ্গে সংগ্রাম করা চলে না ; বিনা দ্বিধায় তা'র হাতে আত্ম-সমর্পণ করা ভিন্ন উপায় নেই।'

সে যাই হোক্, আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বিদ্যাপতিবাবু স্বয়ং আবির্ভূত হ'বেন, আপাতত এই আশা করা যাচ্ছে। এবং এইমাত্র খেয়াল হ'ল যে এখনো আমার সাজসজ্জা বাকি। সুতরাং—যদিও তোকে আরো অনেক কথা বল্‌বার ছিলো। আজকের মত এইখানেই ইতি।

তোর লীনা।

—নং বীডন স্ট্রীট

২৩শে জ্যৈষ্ঠ

লীনা,

আজকেই তোকে চিঠি লিখতাম না, কিন্তু পর পর তোর দুখানা দীর্ঘ চিঠি পেয়ে তোর সম্বন্ধে আমি এতদূর উৎকণ্ঠিত হয়েছি যে বিস্তর কাজের মধ্যেও তোকে দু'চার কথা লেখবার সময় করে নিতে হচ্ছে।

আমি তোকে সাবধান করে' দিতে চাই, লীনা—তোর ঐ নব পরিচিত বিদ্যাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে। তোর চিঠি দু'খানা পড়ে' তাঁকে আমি যেমন চিনেছি, আমি তাঁর আজন্ম-পরিচিত হ'লেও তার চেয়ে ভালো চিন্‌তাম না। যে-দুর্ভাগ্য তাঁর মাকে ক্ষমায়, নম্রতায়, সহনশীলতায় মধুর করে তুলেছিলো, সেই দুর্ভাগ্যই তাঁকে হিংস্র, স্বার্থপর ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ করে' তুলেছে। এটা অবিশ্যি তাঁর অপরাধ নয় ; নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্যই এখানে। দৈব-দোষে বিদ্যাপতি বাবু যে-সব দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন বা পাচ্ছেন, সেগুলো মেনে নেবার মত উদারতা বা কাটিয়ে ওঠার মত শক্তি তাঁর নেই ; খাঁচায় অবরুদ্ধ চিতাবাঘের মত তিনি ছট্‌ফট্ করে বেড়াচ্ছেন ;—এবং ভাবছেন, অন্য কাউকে অসুখী কর্‌তে পার্‌লে বুঝি তাঁরো শান্তি হ'বে। তাঁর যে-প্রচণ্ড অহঙ্কারের ফলে তাঁর মুখের প্রায় প্রত্যেকটি কথা বিদ্রূপের মত শোনায়, সে-ই তাঁর চরিত্রের কলঙ্ক, কারণ অতখানি অহঙ্কারের যোগ্যতা তাঁর নেই। এবং তিনি তা জানেন। জানেন বলে'ই প্রকাণ্ড

অভিমানের ভান করে' লোক চক্ষে তিনি সেই অভাব পূরণ কর্‌তে চান্। যেটা অহঙ্কার বলে মনে হয়, আসলে সেটা তাঁর ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স।

এ-কথা অবিশ্যি ঠিক যে প্রথম-দর্শনে এই ধরণের লোকের মস্ত একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, এবং বিপদ সেই কারণেই সমূহ। শোনা যায়, বায়রনকে প্রথম দেখে ইংল্যাণ্ডএর সুন্দরীবৃন্দ সবাই মনে-মনে বলে' উঠ্‌তেন, 'That pale face is my fate.' তুই কি অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বি যে এ-ক'দিন ধরে তেম্‌নি একটা চিন্তা তোর মনে আনাগোনা করছে? কিন্তু ঐ কথাটা বাঙ্‌লায় বল্‌তে গেলে কি হয়, জানিস্? ঐ মুখই আমার কাল হ'বে।' কারণ সেই মহিলাদের পক্ষে বায়রন যে কালই হ'তেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ কি? বায়রন-এর জাতের লোকেরা উগ্র, দয়াহীন, বে-পরোয়া—এঁরা না কর্‌তে পারেন, এমন কাজ নেই। তাই তাঁদের সংস্রব বর্জনীয়। সাপের মত এঁরা আকর্ষণ করেন—তা'র ফল হয় মর্মান্তিক। বিদ্যাপতিবাবু ঐ শ্রেণীর মানুষ ; প্রতিকূল অদৃষ্ট ও নির্বান্ধবতা তাঁকে রুক্ষতরো করেছে। আমার মনে হয়—মনে হয় কী? নিশ্চয়ই—তিনি এরি মধ্যে তোর ওপর অনেকখানি মোহ বিস্তার করেছেন ; কিন্তু তোর মনের স্বাভাবিক মোহ-বিমুখতা ও বুদ্ধির অত্যুজ্জ্বল তীক্ষ্ণতা শেষ পর্যন্ত তোকে রক্ষা কর্‌বেই, এই বিশ্বাসে নির্ভরশীল, তবু তোর জন্য উদ্বিগ্ন ও তোর চির-কল্যাণকামী বন্ধু,

নীলা।

সোনারঙ্

২৫শে জ্যৈষ্ঠ

প্রাণাধিক নীলা,

তোর সংক্ষিপ্ত—অর্থাৎ সম্যকরূপে ক্ষিপ্ত—চিঠিখানা পেয়ে আমি কিন্তু মোটেও বিচলিত হই নি। তোর কল্যাণ-কামনার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আমার দিক থেকে এটুকু বল্‌তে পারি যে বিপদ এখনো ততটা ঘনিয়ে আসে নি। সুতরাং তোর মহামূল্য উৎকণ্ঠার বাজে খরচ কর্‌তে নিষেধ কর্‌ছি। জমিয়ে রেখে দে—কোনোকালে কাজে লাগ্‌তে পারে।

অথচ ইচ্ছে কর্‌লে তোর কথারও যে উত্তর না দিতে পারি, এমন নয়। প্রথমেই একটা পুরোনো নীতিবাক্য উচ্চারণ কর্‌তে হচ্ছে। সে হচ্ছে এই যে শয়তানকে (এবং বায়রনকে) যত কালো করে' আঁকা হয়, তত কালো সে নয়। তুই যদি বলিস্ যে ও-কথা বলার কোনো মানে হয় না, তা হলে আমি বল্‌তে বাধ্য হ'ব যে বিদ্যাপতিবাবুর সঙ্গে ঐ দুই মহাপুরুষের চরিত্রগত কোনো সাদৃশ্যই নেই। ডন্ জুয়ান্ বা মেফিস্‌টোফিলিস্-এর অংশ নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি। উপন্যাসের নায়কের যে-কয়েকটি বড় বড় ছাঁচ আমাদের চোখের সাম্‌নে আছে, তা'র কোনোটির মধ্যেই তিনি পড়েন না। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের চোখ-ঝল্‌সানো প্রখরদীপ্তিত্ব বা কবি-রামচন্দ্রের মর্মস্পর্শী কারুণ্যের মন ভোলানো মধুরতা—কোনোটিই তাঁর নেই। তাঁর মধ্যে সে মদিরতার অভাব, যাতে তাঁকে দেখামাত্র মনের নেশা ধ'রে যেতে পারে।

তার পর অহঙ্কার। বিদ্যাপতিবাবু অহঙ্কারী বটে, কিন্তু কে বল্‌বে সে-অহঙ্কারের যোগ্যতা তাঁব নেই? মানুষের মর্যাদা-নির্ধারণের সত্য উপায় যা-হয়েছে নয়, যা-হ'তে-পারতো। তিনি দরিদ্র, এ হচ্ছে সাংসারিক সত্য, কিন্তু তা'র চেয়ে বড় সত্য হচ্ছে এই যে দারিদ্র্য তাঁকে মানায় না। সেই জন্যেই তাঁর মন বাস্তব অবস্থাকে অতিক্রম করে' যায়। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে নিষ্ফল অভিযোগ কর্‌তে তিনি অভ্যস্ত নন, কিন্তু তা'র প্রতিকূলতাকে স্বীকার করে' নিয়ে মনের জন্মগত উদারতাকে খর্ব কর্‌তে তিনি নারাজ। ভাই, স্বভাব যাঁকে বড় করেছে, তাঁর জাত মার্‌বে কে?

এই আত্ম-শ্লাঘা যদি তাঁর সর্বস্ব হ'ত, তা হ'লেও তোর ব্যাখ্যা মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি ছিলো না। উগ্র লাল রঙয়ের গোলাপ দৃষ্টিকে পীড়া দিত, যদি না তা'র আশে-পাশে শ্যাম-পত্রগুচ্ছের ম্লানিমা দেখ্‌তাম। তেম্‌নি একটি স্বভাবজাত বিনয়ের কোমলতা তাঁর গর্বকে সুদৃশ্য করেছে। এবং ঐ দুটি জিনিষ তাঁর মধ্যে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে, তা'দেরকে বিচ্ছিন্ন করে' দেখবার উপায় নেই। ইলেক্‌ট্রিক-এর কোন্ তারে নেগেটিভ, আর কোন্ তারে পজিটিভ শক্তি যাতায়াত কর্‌ছে জানি নে, কিন্তু এটুকু নিঃসন্দেহে বল্‌তে পারি যে দু'য়ের সম্মিলনেই পরমবাঞ্ছিত আলোর উৎপত্তি।

বলাই বাহুল্য, ইতিমধ্যে বিদ্যাপতিবাবুর সঙ্গে আরো দেখা হয়েছে, এবং আমার কাছে তিনি যেমন মনে হয়েছেন, তা'র সঙ্গে মিলিয়ে তোর বর্ণনা পড়েছি। যে-সব অসমাঞ্জস্য চোখে পড়্‌লো, তা তোকে জানালাম।

সে-রাত্রে নিমন্ত্রণ-রক্ষা কর্‌তে তিনি এসেছিলেন—আস্‌বেনই বা না কেন? আহারান্তে নীচের হল্‌-ঘরটিতে আমরা সমবেত হ'লাম। বাবা আমার বেহালাটার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্‌লেন, 'আপনাকে এর চেয়ে উচ্চশ্রেণীর কোনো যন্ত্র দিতে পার্‌ছি না বলে' ক্ষমা কর্‌বেন।'

বিদ্যাপতিবাবু তাঁর অভ্যাস মত একবার বাবার মুখে তাকিয়ে, তার পর নিজের প্রসারিত করতলে দৃষ্টি সংবদ্ধ করে' বল্‌লেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, আমি বাজাতে জানি নে।'

বাবা বললেন, 'একেবারেই নয়? আশ্চর্য!'

'হ্যাঁ, আশ্চর্যই। আমার মাতামহ তাঁর কন্যাকে যে-অদ্ভুত শক্তির অধিকারিণী করে যান, তা তাঁর—অর্থাৎ সেই কন্যার—সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হ'ল। সেই প্রতিভার উত্তরাধিকারী হ'বার মত সৌভাগ্য নিয়ে তাঁর পুত্রের জন্ম হয় নি।'

বাবা বললেন, 'বাস্তবিক। আপনার মা-র কথা আমার স্মরণ হয় না, কিন্তু চৌধুরী মশায়ের আত্ম-বিস্মৃত মুখের লাবণ্যচ্ছটা আর কারো মুখে দেখ্‌বো না ভাব্‌লে দুঃখ হয়।'

মা জিজ্ঞেস কর্‌লেন, 'কিন্তু আপনি গান গাইতে পারেন নিশ্চয়? গায়কদের মতই তো মার্জিত ও মসৃণ আপনার কণ্ঠস্বর।'

বিদ্যাপতিবাবু আবার দৃষ্টি আনত করে' বল্‌লেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, আমার সম্বন্ধে আপনার এই অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

তার পর তাঁর সেই আশ্চর্য, উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি বাবাকে, মা-কে পরিভ্রমণ করে' অবশেষে আমার ওপর এসে নিবদ্ধ হ'ল। আমার দিকে তাকিয়েই বল্‌তে লাগলেন ঃ

'দেখুন, প্রতিভাসম্পন্ন হ'বার প্রচুর সম্ভাবনা আমার ছিলো ; কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যের ফলে সব গেলো ব্যর্থ হ'য়ে। পিতৃগণের পুণ্যফলের কিছুই আমাতে এসে বর্তালো না। আমার বাবা ছিলেন লেখক ;—কেমন লিখ্‌তেন, সে বিষয়ে আলোচনা করা আমার মানায় না, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের অনেক ওপরে তিনি তাঁর সাহিত্যকে স্থান দিয়াছিলেন, এ-কথা সগর্বে বল্‌তে পারি। আমার এক কাকা ছিলেন—তাঁকে আমি কখনো দেখি নি। সতেরো বছর বয়সে তিনি পালি'য় প্যারিসে চ'লে যান্—ছবি আঁকা শিখ্‌তে। কালে চিত্রকর ও ভাস্কর-হিসেবে ও-দেশেও সুনাম অর্জন করতে তিনি সক্ষম হন্। বছর দুই পূর্বে তাঁর মৃত্যু হ'লে প্যারিসে যে শোকসভা আহূত হয়, তা'র সভাপতি ছিলেন রোদ্যাঁ।

'আমারো গীতি-কুশল, কবি বা চিত্রকর হওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু হ'তে পারিনি বলে'ই আমার হয়েছে মুস্কিল। তাঁদের কাছ থেকে আমি তদুপযোগী প্রাণ ও কল্পনাশক্তি পেয়েছি, কিন্তু পাই নি প্রকাশের ক্ষমতা। প্রতিভাশালী স্রষ্টাদের জ্যোতির্মণ্ডল বেষ্টন করে' যে-সব অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ ও নিকৃষ্ট লোক বিরাজ করে, আমি তা'দের একজন। এরা নিজেরা স্রষ্টা না হ'লেও স্রষ্টার ঠিক নীচেই এদের আসন, কারণ সৃষ্টির সৌন্দর্য পরিপূর্ণতম-রূপে

উপভোগ করার ক্ষমতা এদেরই আছে। যেমন আমি। আমার নিজের অযোগ্যতা দেখ্‌লেন তো, কিন্তু ছবি, কবিতা বা গান আমার চাইতে বেশি ভালোবাসে, এমন লোক নেই।'

এই দীর্ঘ বক্তৃতার আসল উদ্দেশ্য যে কি তা এতক্ষণে বোঝা গেলো। এবং তা'র ফল যে কি হ'ল, তা বুঝতেই পার্‌ছিস ;—বেহালাটা আমাকেই হ'ল বাজাতে।

যতক্ষণ বাজাচ্ছিলাম, বিদ্যাপতিবাবুর সেই আশ্চর্য, উজ্জ্বল চোখ ধারালো তীরের ফলকের মত আমার মুখের ওপর বিদ্ধ হ'য়ে ছিলো। সে-দিকে না তাকিয়েও আমি তা বুঝতে পার্‌ছিলাম। মানুষের অমন চোখ হয় ভাই?—যে-চোখে কখনো পলক পড়ে না, প্রশান্ত গভীরতায় যা পাষাণের মত স্থির হ'য়ে গেছে! আমার সমস্ত মুখ যেন জ্বালা করে উঠ্‌লো : স্পষ্ট অনুভব করলাম, আমার হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দ্রুত স্পন্দিত হ'য়ে বুক থেকে সমস্ত রক্ত মুখে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ বাজ্‌না থামিয়ে আমি উঠে' দাঁড়ালাম। কিন্তু বিদ্যাপতিবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ামাত্র তাঁর কঠিন দৃষ্টিতে অমন তরল চঞ্চলতা এলো কি করে'? দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনিও উঠে দাঁড়ালেন।

নীলা, আমার এই বিবরণ পড়ে' তুই যা ইচ্ছে তা ভাব্‌তে পারিস্‌, কিন্তু আমার সম্বন্ধে কোনো দুশ্চিন্তা করিস্‌নে, এইমাত্র অনুরোধ। শ্যালট্‌-বাসিনীর মত বাস্তবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মায়া-মুকুরের ভেতর দিয়ে, আমি পৃথিবীটাকে দেখি নি, একদিন বিষণ্ণ-সুরে বলে'ও উঠবো না, 'I'm half-sick of shadows' আমার ল্যান্‌স্‌লট্‌কে যদি আমি দেখে থাকি, দিনের আলোয় শাদা চোখেই দেখেছি। প্রত্যূষের অস্পষ্ট আলোয় জ্বরের ঘোরে-দেখা-স্বপ্নের কুহেলি-আবরণে ক্ষণবিহারী ছায়ার মত দেখা দিয়েই তিনি অপসৃত হ'বেন না ; তাঁর আবির্ভাব হ'বে সূর্যোদয়ের মত মহিমান্বিত, মৃত্যুর মত সংশয়াতীত ও সুনিশ্চিত। সেই মোহ তিনি বিস্তার করবেন না, বুদ্ধি যা'তে ঘোরালো হ'য়ে আসে। অন্ধকার নিরবয়ব ও অস্পষ্ট বলে'ই কুৎসিত, কালো বলে' তো নয়। সূর্য উঠ্‌লে তা'র আলোয় যেমন পৃথিবীর সুগঠিত ও সুসমঞ্জস সৌন্দর্য্য আত্ম-প্রকাশ করে, তেম্‌নি তাঁর স্পর্শে আমার দেহ মন ও আত্মা থেকে ঘুমের যবনিকা উঠে' যা'বে ; শুধু ইন্দ্রিয়ের চেতনায় বা হৃদয়ের অনুভূতিতেই নয়, বুদ্ধির মমতাহীন প্রখর উজ্জ্বলতাতেও তাঁকে লাভ করবো—কোথাও কোনো ফাঁকি থাক্‌বে না। এর নাম তো মোহ নয় ভাই ; বরঞ্চ তাঁর প্রে যখন মর্মান্তিক যন্ত্রণার মত বুকে এসে বাজবে, তখনই সকল মোহ থেকে মুক্তি লাভ কর্‌বো। লাভ কর্‌বো নব-জন্ম।

লীনা।

সোনারঙ্‌
৩২শে জ্যৈষ্ঠ

নীলা,

কাল রাত্তিরে পৃথিবীর সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হ'য়ে গেছে . তাই মনের মধ্যে তা একটুও ঝাপ্‌সা হ'য়ে যাবার আগেই তোকে লিখ্‌তে বসেছি। নিছক ঘটনা-হিসেবে দেখ্‌তে গেলে তা তেমন বিস্ময়কর মনে হ'বার কথা নয়, কিন্তু তা'র ফলে আমার মধ্যে যে-পরিবর্তন এসেছে, আশ্চর্য সেইটি। এতদিন যে-যবনিকা মৃদু হাওয়ায় থেকে-থেকে কাঁপছিলো মাত্র, কাল আমার চোখের সাম্‌না থেকে তা উঠে' গেছে, এবং রঙ্গমঞ্চের ওপর আমারই জীবননাট্য অভিনীত হচ্ছে, দেখ্‌লাম। সেই দিকে তাকিয়ে নিজকে আবিষ্কার করলাম, ও অভিনন্দন জানালাম। কারণ সেই আমি সব চেয়ে আশ্চর্য।

এখানে যখন আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'য়ে যায়, কল্‌কাতায় লোকে তখন

বেড়াতে বেরোয়। আহার ও নিদ্রার মাঝখানে সময়ের সুবৃহৎ ফাঁকাটা আমরা তিনটি প্রাণীতে মিলে' গল্প-গুজব করে' ভরে' তুলি। কিন্তু কাল মা-র শরীর অসুস্থ ছিলো, তাই আমাদের সভাটি বসে নি। বাধ্য হ'য়ে ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হ'ল। ঝাড়-লণ্ঠনের যতই চাক্‌চিক্য থাক্‌, সে-আলো বৈঠকখানারই উপযোগী, শোবার বা পড়্‌বার ঘরের নয়। জানালার ধারের টেবিলে বসে' মোমের আলোয় আমি বই পড়্‌তে লাগলাম। সমস্ত পল্লী ঘুমিয়েছে।

কতক্ষণ পড়েছিলাম, ঠিক বল্‌তে পারবো না ; কিন্তু মনে আছে, একটা মোমের আধ-খানার বেশি পুড়ে' গিয়েছিলো। কাজেই অনুমান কর্‌ছি, তখন রাত বারোটার কম হ'বে না। বুঝ্‌তে পার্‌লাম, এখন শয্যাগ্রহণ করলে সঙ্গে-সঙ্গেই নিদ্রাকর্ষণ হ'বে ; তাই গল্পের বহু-পরিচিত নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গত্যাগ কর্‌তে কষ্ট হ'লেও বইখানা মুড়ে' আমি চেয়ার ছেড়ে উঠলাম।

খোঁপার কাঁটাগুলো খুল্‌তে-খুল্‌তে আমি জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। খানিকক্ষণ আগে এক পশ্‌লা বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছিলো, এখন আকাশের মেঘ কেটে চাঁদের মুখ দেখা দিয়েছে। দশমী বা একাদশীর চাঁদ রয়েছে আমার মাথার ওপরে—জানালা থেকে তা'কে দেখ্‌তে পাচ্ছি না, কিন্তু তার নীল আলোয় আমাদেব আম্র-কানন চুপচাপ দাঁড়িয়ে স্নান কর্‌ছে, কাছের গাছগুলোর ভিজে পাতারা ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় সঞ্চালিত হ'য়ে ঝিকিরমিকির করে' উঠ্‌ছে। আমার জানালার নীচে আলো-ছায়ায় মিশে' অদ্ভুত আব্‌ছায়ার জাল বুনে' চলেছে. পেঁপে-গাছটার পাশে এক টুকরো ছায়া এইমাত্র নড়ে' উঠ্‌লো।

কিন্তু ঐ ছায়াটাই কি সোজা হ'য়ে উঠে' দাঁড়িয়েছে? তা'র ফাঁকে-ফাঁকে শাদা কাপড়ের মত ও কী দেখা যাচ্ছে? যাক্‌—এতদিনে বোধ হয় একটা আসল ভূতের দেখা পাওয়া গেলো? হাওয়ায় দু'একটা এলোচুল উড়ে' এসে আমার চোখে-মুখে পড়্‌ছিলো ; হাত দিয়ে তা'দেরকে সরিয়ে আমি মুখ বাড়িয়ে নীচের দিকে তাকালাম।

বিদ্যাপতিবাবু ফির্‌ছিলেন বোধ হয় ;—আমার দিকে দৃষ্টি পড়্‌তেই থম্‌কে দাঁড়ালেন।

বিস্ময়ের প্রথম আঘাত কাটিয়ে উঠ্‌তে-না-উঠ্‌তেই অসংখ্য প্রশ্ন একসঙ্গে আমার মনকে আক্রমণ কর্‌লে ঃ এর মানে কি? গোলাপীকে তুল্‌বো? উনি কি এ-পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন? বাবাকে ডাক্‌বো? এত' রাত্তিরে কোথায়ই বা যাবেন? আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে' পড়বো? কিন্তু—

এতক্ষণে এই অতি সরল সত্যটা আমার মনে উদয় হ'ল যে বিদ্যাপতিবাবু আমাকে দেখ্‌বার জন্যই ঐখেনে এসে দাঁড়িয়েছেন, এবং সম্ভবত বহুক্ষণ যাবৎই দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই আমাকে এমন কোনো কথা তাঁর বলার ছিলো, জ্যোছনার নেশায় সারা পৃথিবী ঝিমিয়ে না এলে যা বলা যায় না—আমার প্রতিটি হৃৎ-স্পন্দন চীৎকার করে' এই কথা বলে' উঠলো। সেই কথা আমার শোনা চাই। ভাব্‌বার সময় নেই ; যে-কোনো মুহূর্তে তিনি ঐ পথের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন। মনে হ'ল, সেই কথাটি না শুন্‌তে পারলে আমার পৃথিবী চিরকালের মত বন্ধ্যা হয়ে যাবে। সেই শুভ-লগ্ন বুঝি এলো, যা'র জন্য এতকাল অপেক্ষা করেছি ; এ যদি বৃথা হয়ে' যায়, তবে এ জন্মের মত আমার বৈধব্য ঘুচবে না।

এখন বুঝতে পারছি, নীলা, যে বাইরে উপস্থিত হ'তে পারার আগে আমি অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে নেবে, মাঝের হলটা পেরিয়ে নিজ হাতে পেছন দিককার প্রকাণ্ড ভারি দরজাটা খুলেছিলাম। কিন্তু তখন মনে হয়েছিলো যেন ইচ্ছে করা মাত্র আমি হাওয়ায় উড়ে' এসে সেখানে পড়লাম।

দরজার ঠিক বাইরে সিঁড়ির ওপর আমি দাঁড়ালাম। বিদ্যাপতিবাবু যন্ত্র-চালিতের মত আমার দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগলেন। সিঁড়ির গোড়ায় এসে কি ভেবে যেন একটু

অপেক্ষা করলেন—তার পর আমার ঠিক নীচের সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন।

অস্ফুটস্বরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি? এ-সময়ে? কেন?'

মৃদু অথচ স্পষ্ট কণ্ঠের উত্তর শুন্‌লাম, 'কাল চলে' যাচ্ছি। তাই আপনাকে দেখ্‌তে এসেছিলাম।'

কি বল্‌ছি নিজে তা বুঝ্‌তে পারার আগেই আমি বলে' উঠলাম, 'কাল যাচ্ছেন? অসম্ভব।' কথাটা নিজের কানেই বিসদৃশ শোনালো। একটু অপ্রতিভ হ'য়ে হাস্‌বার চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি বলে' ফেললাম, 'কিন্তু সময়টা কি খুব সুনির্বাচিত হয়েছে, বিদ্যাপতিবাবু? আপনার বিবেচনাকে ধন্যবাদ!'

'আমি তো আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসি নি, আপনাকে দেখ্‌তে এসেছিলাম শুধু। দূর থেকে দেখে চলে গেলেই আমার তৃপ্তির সীমা থাক্‌তো না ; আপনার সঙ্গে যে কথা বল্‌তে পার্‌ছি, এ আমার আশাতীত সৌভাগ্য।'

'দুঃখের বিষয়, এ-সৌভাগ্য আমার পক্ষেও সমান উপভোগ্য হচ্ছে না। পাশের ঘরে চাকর-বাকরেরা শুয়ে' আছে ;—তা'রা যদি কেউ—'

'নিরর্থক আপনি আশঙ্কা কর্‌ছেন। আমি তো চলেই যাচ্ছিলাম—কেন আপনি এলেন?'

বলে' তিনি যাবার জন্য পা বাড়ালেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে হাওয়ার মত স্বরহীন অথচ তীব্রস্বরে আমি ডাকলাম, 'শুনুন।'

বিদ্যাপতিবাবু আমার দিকে যে মুখ ফেরালেন, তা ভূতের চেয়েও ম্লান। নীচের সিঁড়িতে না নেবে যতটা সম্ভব তাঁর কাছে সরে' এসে আমি বললাম,—না, বলি নি, কারণ আমার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোয় নি ;—আমার নিশ্বাস-পাতের সঙ্গে এই কথা উচ্চারিত হ'ল : 'কাল্‌কেই যাচ্ছেন? সত্যি?'

বিদ্যাপতিবাবুর বিবর্ণ মুখ মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, দেখলাম। ভীরু একটি হাসি লাজুক আলোকরেখার মত তাঁর ঠোঁটের কিনারে একটু খেলা কর্‌লে, তার পর তাঁর দুই চোখের শ্যামল গভীরতায় ঝাঁপ দিয়ে খানিকক্ষণ ঝল্‌মল্‌ করে' নিজকে হারিয়ে ফেল্‌লে। অত্যন্ত সহজভাবে, প্রায় লঘুকণ্ঠেই তিনি বল্‌লেন, 'এ-কথা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন? জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যাঁর নির্দেশ মেনে-চলায় আমার জীবনের একমাত্র চরিতার্থতা, একটু আগেই তিনি নিজমুখে বলেছেন যে কাল আমার যাওয়া অসম্ভব।'

'তাঁর ওপর আপনার বিশ্বাস যদি এমনি অন্ধ, তবে যাবার সংকল্প করার আগে তাঁর পরামর্শ নেন্‌ নি কেন?'

'বিশ্বাস অন্ধ বলে'ই কোনো প্রশ্ন করবার প্রয়োজন হয় নি। জানতাম, তাঁর যা অভিপ্রেত, তা হ'বেই ; আমার কোনো চেষ্টার অপেক্ষা তিনি রাখবেন না। হ'লও তা-ই।'

'তবে জান্‌বেন, তিনি এই মুহূর্ত থেকে আপনার সমস্ত জীবন দাবী কর্‌ছেন।'

হঠাৎ বিদ্যাপতিবাবু নতজানু হ'য়ে আমার সাম্‌নে বসে' পড়্‌লেন। তাঁর উত্তোলিত, উদ্‌গ্রীব বাহু এড়াবার জন্য আমি বিদ্যুৎ-গতিতে সরে' যেতেই আমার শাড়ির আঁচলটা পড়্‌লো লুটিয়ে। বিদ্যাপতিবাবু দুই হাতে সেই আঁচল কুড়িয়ে নিয়ে তা'তে মুখ ঢাক্‌লেন।

ঈষৎ অবনত হ'য়ে আমি তাঁর চুলের ওপর হাত রাখলাম। ধীরে-ধীরে তিনি মুখ তুল্‌লেন—সিংহের মত প্রকাণ্ড মাথায় হরিণের চোখ—আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখ—জ্যোছ্না আর অশ্রুজল একত্র হ'য়েও সেই দু'টি চোখকে উজ্জ্বলতর কর্‌তে পারে নি। দু'খানা আয়না মুখোমুখী রাখ্‌লে যেমন তা'রা পরস্পরের সংখ্যাহীন ছায়া সৃষ্টি করে, তেম্‌নি আমাদের দৃষ্টি পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হ'তেই তা'র ভেতর দিয়ে আমরা নিজেদের অনাদিবিস্তৃত অগণন মূর্তি প্রত্যক্ষ কর্‌লাম ;—সময় যখন শিশু, তখন থেকে আরম্ভ করে' আজ পর্যন্ত আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের কাহিনী। এক মুহূর্ত কেটে গেলো—শত সহস্র শতাব্দী।

বিদ্যাপতিবাবু আবার আমার আঁচলে মুখ ঢাক্‌লেন। সেইন্ট্‌ ভেরনিকার রুমালে যীশুর মুখের ছাপের মত আমার ঐ বস্ত্রাঞ্চলে যদি আজ তাঁর মুখচ্ছবি দেখ্‌তে পেতাম, তা হ'লে আমি একটুও বিস্মিত হ'তাম না।

পনেরো মিনিট আগে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে যে নেমে এসেছিলো, সে আর ফিরে এলো না ; তা'র শূন্য স্থান যে অধিকার করেছে, শেলির মত সে সুন্দর ভাই, দেবতার মত সে অনির্ব্বচনীয়। বিশ্বের সকল কবিদের অপরূপ আনন্দ ও বেদনা, কল্পনা ও অনুভূতি আমার মনে নেবুর রসে লেখা ছিলো ; এতদিন তা পড়্‌তে পারি নি, কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে প্রেমের আলো জ্বলেছে, তা'র উত্তাপে সেই লেখা উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে ফুটে উঠেছে। নিজেকে আবিষ্কার করলাম, ভাই ;—এর চেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে লেখে নি।

আমাদের এই বিবাহকে আশীর্বাদ করবার জন্যই বিধাতা সেই অল্প একটু সময়ের জন্য আকাশ থেকে করেছিলেন জ্যোছনার পুষ্পবর্ষণ ;—নইলে ওপরে এসে আমি বিছানায় শোবামাত্র আকাশ ভেঙে কেন নাব্‌বে বৃষ্টি? জলের ধারা যে গান কর্‌তে-কর্‌তে পৃথিবীতে নামে, আমার আগে কেউ কি তা জেনেছে? দুপুর রাতে অন্ধকার ঘরে একা শুয়ে'-শুয়ে' কিছুতেই ঘুমুতে-না-পারাটি যে কত মিষ্টি, কাল 'তা প্রথম উপলব্ধি করলাম।

আজ সকালবেলা চোখ মেল্‌তেই পৃথিবীর সঙ্গে আমার প্রথম শুভ-দৃষ্টি হ'ল। পুকুরের নীচের পাঁক থেকে আরম্ভ করে' আকাশের স্ফটিকাভ নীলিমা পর্যন্ত এমন-কিছু নেই, যা আমার ভালো না লাগ্‌ছে। এমন কি, গোলাপীর উঁচু দাঁতও আজ ক্ষমা কর্‌তে পার্‌ছি।

এই পর্যন্ত লিখেছি, এমন সময় লেখায় বাধা পড়লো। বাবা পাশের বারান্দা দিয়ে তাঁর নিজের ঘরে যাচ্ছিলেন ; আমার দরজার কাছে এসে কি মনে করে' থেমে দাঁড়ালেন। উৎফুল্লকণ্ঠে ডাক্‌লাম, 'এসো, বাবা।'

বাবা এলেন। তার পর তাঁর মুখে যা শুনলাম, তা এই ঃ

এইমাত্র তিনি বিদ্যাপতিবাবুর বাড়ি থেকে ফির্‌ছেন। দেওয়ানজীর সঙ্গে মহালের দেখা-শোনা কর্‌তে বেরিয়েছিলেন, ফের্‌বার পথে পড়লো সেই বাড়ি। ভাবলেন, বিদ্যাপতিবাবু অনেকদিন আসেন না, একবার খোঁজ নিয়ে যাওয়া যাক। গিয়ে দেখলেন, বিদ্যাপতিবাবু জ্বরে অচেতন হ'য়ে পড়ে আছেন, তাঁকে দেখে চোখ মেল্‌লেন, কিন্তু চিন্‌তে পার্‌লেন বলে মনে হ'ল না। চাকরের মুখে শুন্‌লেন যে তিনি কাল সন্ধ্যের একটু পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান্‌। যখন ফিরেছেন, রাত তখন আর বেশি নেই, এবং জামা-কাপড় সব বৃষ্টিতে এমন ভিজেছে যে মনে হয়, এইমাত্র তিনি নদীতে ডুব দিয়ে এসেছেন। কাপড় বদ্‌লাতে-বদ্‌লাতে চাকরকে বল্‌লেন, 'আমার বোধ হয় জ্বর হ'ল রে।' তার পর সেই যে বিছানায় পড়লেন, এ পর্যন্ত আর একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি। বাবা কপালে হাত রেখে বুঝলেন, জ্বর খুব বেশি, এবং সম্ভবত চেতনাও ঘোলাটে হ'য়ে গেছে। বাবা তৎক্ষণাৎ নিজের হাতে-লেখা চিঠি দিয়ে একটা লোককে পাঠিয়ে দিয়েছেন তারপাশায়—সরকারী ডাক্তারকে ধ'রে আনতে। অবিশ্যি নৌকোই যখন এ অঞ্চলের একমাত্র যান, তখন ডাক্তারবাবুর আস্‌তে-আস্‌তে বিকেল। বাবা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় চাকরটাকে যথাসাধ্য সাহস ও ভরসা দিয়ে মনুষ্যত্বে পুনর্প্রতিষ্ঠিত ক'রে এসেছেন, কিন্তু দুপুরবেলায় তাঁকে আর-একবার যেতে হবে, কারণ তিনি—হ্যাঁ, তিনি একটু শঙ্কিত হ'য়ে পড়েছেন বই কি।

পরে বাবা বল্‌লেন, 'বিদ্যাপতিবাবু কাল সারা-রাত কোথায় যে ছিলেন, এবং কি ক'রেই বা বৃষ্টিতে ভিজলেন, সে এক রহস্য। বোধ হয় কাছের কোনো গ্রামে গিয়েছিলেন নেমন্তন্নে—বা কোনো কাজে—ফেরবার পথে মাঠের ওপর পান্‌ বৃষ্টি—সেখান থেকে নিকটতম আশ্রয়ও হয় তো মাইল-খানেক দূরে। আর ঐ শেষ-রাত্তিরে কাছাকাছি বাড়ি-ঘর থাক্‌লেই বা কি? স্বগৃহে উপস্থিত হ'তে-না-পারা পর্যন্ত কোনো আশ্রয়ের আশা নেই।—

অথচ, আজ নাকি তাঁর এখান থেকে চলে যাবার কথা ছিলো।'

বাবার কথা শুন্‌তে-শুন্‌তে আমি মনে মনে কি ভাবছিলাম, জানিস্? আমাদের এখান থেকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছতে কোনো মতেই আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগবার কথা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় আধ ঘণ্টা ধরে' 'নব-ধারা-জলে' স্নান কর্‌তে বারণ ক'র্‌বেন। তা'র ফলেই এই জ্বর। প্রভুর অনুপস্থিতিতে ভৃত্য সন্ধ্যা থেকেই সুখ-নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, তাই রাত-একটাকে নিশান্ত বলে' তিনি স্বচ্ছন্দে ভুল করেছিলেন।

বললাম, 'আমাকেও নিয়ে চলো না, বাবা—তাঁকে দেখে আসি।'

'তুই যাবি?' এই দু'টি কথায় বাবা অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞেস করলেন। অসঙ্কোচে উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, যাবো। কারণ আজকে যে তাঁর এখান থেকে যাওয়া হ'ল না, সে-জন্য আমিই দায়ী।'

বাবার চোখ সংশয়ের মেঘে মলিন হ'য়ে এলো—কিন্তু মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই দেখলাম, সেই দৃষ্টি সত্যবোধের পরিচ্ছন্ন দীপ্তিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

'তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে, বাবা।'

'কি, লীনা?'

'তোমার বিলেত-যাত্রার সঙ্গী-রূপে আর-একজনকেও নাও না।'

বাবা হাসিমুখে বল্‌লেন, 'বনবাসে যাওয়া তত দুঃখের নয়, লীনা, সমাজের মাঝখানে একঘরে হ'য়ে-থাকা যত। দু'টি লোক যখন পরস্পরের কাছে সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বড় হ'য়ে ওঠে, তখন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি যে কতখানি বাহুল্য, তা আমি জানি। সেই তৃতীয় ব্যক্তির স্থান অধিকার করে, নিজকে লজ্জা দিতে আমি রাজি নই। তোরা পরের জাহাজে আসিস্, আমি বরঞ্চ এই সুযোগে তোদের রবিঠাকুরের বইগুলো পড়ে' ফেল্‌বো। হ্যাঁরে, রবিবাবুর বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ পড়া যায় তো?'

'কিন্তু বাবা, আমার প্রতি তুমি বড্ড অবিচার করছ।'

'কেননা, নিজের প্রতি সুবিচার কর্‌তে হচ্ছে। "তৃতীয় ব্যক্তি"'র দুর্ভাগ্য জানি ব'লেই আমার এত ভয়। আমার কথায় বিশ্বেস না হয়, তোর মা-কে জিজ্ঞেস্ করে দেখিস্।'

আমিও হেসে ফেল্‌লাম।—'তোমার সঙ্গে তর্কে কে কবে জিতেছে, বাবা?'

'কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তর্কটা যে আদৌ আমার সঙ্গে হচ্ছিলো না। তুই তর্ক কর্‌ছিলি নিজের সঙ্গে, এবং এই আত্মবিরোধে মানুষ সর্বদা হার্‌তেই চায়।'

বলে, বাবা আমার ললাট চুম্বন করলেন।

জানিস্ লীলা, বিদ্যাপতিবাবুর এই অসুখের খবর শুনে' আমার একটুও দুশ্চিন্তা বা উৎকণ্ঠা হচ্ছে না। এখানেও আমি বিধাতার অঙ্গুলি-নির্দেশ দেখতে পাচ্ছি। এই রোগ মুহূর্তমধ্যে তাঁকে আমার একান্ত নিকটে এনে দিয়েছে ; সাধারণভাবে দিন কাট্‌লে এই প্রকাশ্য অন্তরঙ্গতায় উপনীত হ'তে বহুদিন কাট্‌তো। সেই দীর্ঘকালের ব্যবধান বিধাতা নিজ হাতে দিলেন সরিয়ে ; কাল রাত্রে যিনি ঐটুকু সময়ের জন্য আকাশ ভরে' পাঠিয়েছিলেন জোছনা, এই রোগও তাঁরি দান, মিলনতীর্থের দীর্ঘপথকে সংক্ষিপ্ত করার জন্যে তাঁরি একটা কৌশল। যা-কিছু হচ্ছে, তা'র মধ্যে সেই চির-মঙ্গলের পরম শুভেচ্ছা দেখতে পাচ্ছি।

আজ আর আমার মনে কোনো বিরোধ, কোনো সংশয় নেই ; সুদৃঢ় বিশ্বাস ও আত্ম-নির্ভরতার পরিপূর্ণ শান্তিতে তা শরতের আকাশের মত স্তব্ধ ও সমাহিত। এমন কি, বিদ্যাপতিবাবুকে দেখতে যাবার জন্য কোনো অধীর উৎসুকতা নেই পর্যন্ত। কেননা, যা অবশ্যম্ভাবী, তা তো ঘটেছে, আমার আজন্ম-তপস্যার ফল-লাভ আমি করেছি ;—দেবতা দিয়েছেন বর। এই বর আমি যখনি ব্যবহার করি নে কেন, একবার যা পেয়েছি, চিরকালের মত তা পেয়েছি ; তা ফিরিয়ে-নেয়া—যিনি বর দিয়েছেন, তাঁরো অসাধ্য।

লীনা।

সোনারঙ্
১লা আষাঢ়

নীলা,

তারপাশা থেকে যে ডাক্তার এসেছিলেন, তিনি বল্‌লেন যে বিদ্যাপতিবাবুর চিকিৎসার ভার-নেয়া তাঁর সাহসে কুলোয় না, বিদ্যাতেও নয় বোধ হয়। বল্‌লেন—বুকে সর্দি বসে' গেছে, নিউমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে, তাই কল্‌কাতা নিয়ে-যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সুতরাং কাল আমরা সবাই কল্‌কাতা রওনা হচ্ছি—এবং এই খবর দিতেই তোকে এ-কার্ড্‌খানা লিখ্‌লাম। বুঝ্‌তে তো পার্‌ছিস, আমার পক্ষে বাড়ি থেকে বেরোনো সম্ভবপর হ'বে না—তুই-ই আসিস্‌, পরশু সকালেই আসিস্‌। সোনারঙ্‌ বছর-খানেকের মধ্যে নাকি পদ্মার জলে তলিয়ে যা'বে, ইহজীবনে তা'কে আর দেখবো না, কিন্তু আমার স্মৃতির পৃথিবীতে তা আনন্দ-উজ্জ্বল ক্ষয়-হীন আয়ু-লাভ কর্‌লো।

লীনা।

লীনার জীবনের যে-অংশের অভিব্যক্তি আনন্দে সৌন্দর্যে করুণতায় উজ্জ্বলতম, তা'র পরিচয় এই চিঠিগুলোতে আপনারা, আশা করি, যথেষ্ট নিবিড় করে'ই পেয়েছেন। কিন্তু তা'র জীবনের চরম পরিপূর্ণতার কাহিনী আপনারা এখনো শোনেন নি। সে-কথা বল্‌বার ভার আমার নিজেরই নিতে হচ্ছে বলে' আপনারা অপরাধ গ্রহণ কর্‌বেন না।

দশুই আষাঢ় ভোরবেলা টেলিফোন্‌-এর আওয়াজে নীলার ঘুম ভেঙে গেলো। বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে সে সেটা তুলে' নিলে। তার পর নিম্নলিখিত-রূপ কথাবার্তা হ'ল ঃ

'কে? কে আপনি?'

'আমি।'

'ও, লীনা? কি খবর সব? ডাক্তার নীলরতন কাল বিকেলেও এসেছিলেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'নার্স্‌-দু'জন কাল্‌কেও সারা-রাত ছিলো?'

'দু'জন নয়, চারজন।'

'নতুন আরো আনানো হয়েছিলো? কেন? তোর মা-র শরীর ভালো আছে তো?'

'মা ভালোই আছেন।'

'কাল সারাদিনেও আমি একবার যাবার ফুর্‌সৎ করে' উঠতে পারলাম না ;—হঠাৎ আমার এক দেওর সস্ত্রীক এসে উপস্থিত হয়েছেন—তাঁদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। আজ যাবো। দশটা-নাগাদ তোর গাড়িটা একবার পাঠাতে পার্‌বি?'

'তোর আস্‌বার দরকার নেই।'

'কেন?'

'বিদ্যাপতিবাবু এইমাত্র মারা গেলেন। না, তোর আস্‌বার দরকার নেই।'

আমার চারদিকে সহস্র কৌতূহলী কণ্ঠের প্রশ্ন শুনতে পাচ্ছি ; 'তার পর কি হ'ল? তার পর?'

কিন্তু তার পর আবার কি? লীনাকে আপনারা যতটুকু দেখেছেন, তা'তে তা'র ঐ মর্ত্যাতীত জ্যোতির্ময়ী মূর্তিকেই দেখেছেন, এবং সেই অতি-দুর্লভ আভাই যেন আপনাদের মনের চোখে নেশার মত লেগে থাকে। লীনা আপনাদের চোখে দীর্ঘজীবী নয়, উজ্জ্বলজীবী হোক, এই আমার আন্তরিক কামনা। অনুরাগবতী উষসীর লাজরক্ত মহিমার অন্তে গোধূলির বিষণ্ণ, ধূসর ম্লানতা তো আছেই ; কিন্তু আমরা—আমি ও আপনারা—আমাদের সমস্ত মন-

প্রাণ ভরে' উষসীকে পান কর্‌লাম, আমাদের কাছে তার পর আর-কিছু নেই।

তবু কোনো পাঠিকা জিজ্ঞেস কর্‌তে পারেন—লীনা কি তা'র বাবার সঙ্গে বিলেত গিয়েছিলো? না, বিলেতে সে যায় নি, অক্‌স্‌ফোর্ড-এ ভর্তি হওয়াও তা'র কপালে আর হ'ল না। তবে? তবে আবার কি? জলপাইগুড়ির একটা মেয়ে-ইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ খালি ছিলো, সে সেটা নিয়ে নিলে। শিক্ষয়িত্রী? কেন? টাকার অভাব তো তা'র—! না, টাকার জন্যে নয়, বাঁচবার আশায়। তা টাকার জন্যেও খানিকটা বটে ;—কারণ সে মনে কর্‌তো যে তা'র বিয়ে হ'য়ে গেছে, এবং বিয়ের পর পিতৃগৃহের ওপর মেয়েদের যখন আর অধিকার নেই, তখন নিজের সংস্থান সে নিজেই কর্‌তে চায়। কিন্তু সত্যি-সত্যি সে কি আর বিয়ে করে নি? তা করেছিলো বই কি—বিয়ে না করে' কোনো মেয়ে সারা জীবন কাটাতে পারে? কিন্তু অনেকদিন পর—পুরো একটি বছর। পরের বছর দশুই আষাঢ় তারিখে তা'র বিয়ে হয়। কা'র সঙ্গে? কা'র সঙ্গে আবার? ঐ ওখানকারই—অর্থাৎ জলপাইগুড়ির—এক উকিল, নাম রসময় ঘোষাল। লীনার বাবা প্রতিজ্ঞা করেছেন বটে যে জীবনে আর তিনি মেয়ের মুখ দেখবেন না, কিন্তু তা'র মা বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। নীলারও নেমন্তন্ন হয়েছিলো, কিন্তু সে আস্‌তে পারে নি ; কারণ তখন তা'র প্রথম সন্তান অত্যাসন্ন।

বৈশাখ ১৩৩৬

পট্ পরিবর্তন

বিমল মিত্র

সিদ্ধেশ্বরীর মনে হইল : বাহির হইতে আশা যেন 'মা' 'মা' বলিয়া চীৎকার কবিয়া উঠিল। কতকটা আর্তনাদের মতন। হঠাৎ কী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া সিদ্ধেশ্বরী ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন।

রান্নাঘরের পিছন দিকটায় ঝোপ জঙ্গল ; সিদ্ধেশ্বরী আসিয়া দেখেন : আশা সেইখানেই পড়িয়া আছে ; পড়িয়া গোঙাইতেছে। বুকটা দুরদুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

লেম্পটা মুখের কাছে লইয়া যাইতেই সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিয়া উঠিলেন :

—ও আশা, ও মা আশা, কি হয়েছে মা?

আশা শুধু ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিল—উঁ—

আশা যেমন শুইয়া ছিল তেমনি শুইয়া রহিল। উঠিবার শক্তি তাহার নাই। সিদ্ধেশ্বরী আশাকে কোলে তুলিয়া ঘরে আনিলেন। চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে দিতে—পাখার বাতাস করিতে তবে একটু জ্ঞান সঞ্চার হইল বোধ হয়।

মুখের উপর নীচু হইয়া' সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—কি হয়েছে মা, ও আশা, আশা চোখ্ খোল, চেয়ে দেখ্—এই আমি তোর মা—

আশা চোখ খুলিল। সামনে মাকে দেখিয়াই দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ওমা, দিদি এসেছিল—দিদি—

—দিদি কে রে?—শৈল?—

চারিদিকে চাহিয়া সিদ্ধেশ্বরী তখন সমস্ত অবস্থাটা বেশ বুঝিতে পাবিয়াছেন। আশা তুলসীতলায় প্রদীপ দেখাইতে আসিয়াছিল, প্রদীপটা মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। টগর গাছটার তলায় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। আশাকে কোলের ভিতর আরো দৃঢ় করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—ভয় কি মা—ও কিছু নয়—মনের ভুল, সে কেন আসতে যাবে—সে রাক্কুসী কী আর—বলিতে বলিতে সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সে কেন আসিতে যাইবে! সেই এক বর্ষা রাত্রের দুর্যোগে শৈল কোথায় চলিয়া গিয়াছে।—চুলকাটিতলার শ্মশানে তাহার মৃতদেহ পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে—তিনি হাজার কাঁদিয়া কাটিয়াও তাহাকে রাখিতে পারেন নাই!—সত্যই তো, সে কেন আসিতে যাইবে!

ক্রমে রাত্রি আরো গভীর হইল। কৃষ্ণা-একাদশীর চাঁদ ঘোষালদের চিলেকোটার আড়ালে ডুবিয়া গেল। একটা অদ্ভুত শব্দে আশার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী তখন ঘুমাইতেছেন। আশা কান পাতিয়া আবার শুনিল।

ঠিক্!—দিদি আসিয়াছে ঠিক। নিশ্চয় কোনও সন্দেহ নাই!

ও ঘরে ঠুক্ ঠুক্ করিয়া শব্দ হইতেছে।—তাহার পুতুলের বাক্স নড়িবার শব্দ! আশা বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। আস্তে আস্তে টিপি টিপি পায়ে বড় ঘরের দরজা খুলিল। সব অন্ধকার! কিন্তু তবু আশার মনে হইল : ঘরের ওই কোণে যেখানে তাহার পুতুলের বাক্স থাকে, শব্দটা যেন ঠিক সেইখান হইতেই আসিতেছে।

আশা অন্ধকারের ভিতর চুপি চুপি সেই শব্দটা লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। দিদি তো জানিতে পারিলেই পলাইয়া যাইবে। এতটুকু শব্দও নয়—একেবারে কাছে গিয়া আচম্‌কা

দিদিকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিবে। তারপর আর ছাড়িবে না। বলিবে--কেমন হয়েছে--আর পালাবি?--পুতুল নিয়েছি বলে' আমার ওপর রাগ করে' চলে গেছিস্, না দিদি?--

দিদি হয়ত বলিবে--ওরে আশা, ছাড় ছাড়,--এই দেখ আর আমি পালাব না,--মা'কে বলিস্‌নে--

কিন্তু কোথায় শব্দ--কোথায় কী!--কাছে যাইতেই শব্দটা চুপ হইয়া গেল। হঠাৎ আশার মনে হইল : তাহার পিছন দিকের খোলা দরজা দিয়া কে যেন গুটি গুটি সরিয়া গেল। সেই দিদির মতন চেহারা--সাদা শাড়ী পরা--খোঁপায় টগর ফুল। আশাও তাহার পিছন পিছন চলিল। বাহিরের দরজা খুলিয়া দেখে : দিদি কিছু দূরেই তাহার আগে আগে চলিয়া যাইতেছে। চারিদিকে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার! টগর গাছটার উত্তর দিকে ভাঙা সজিনা গাছটার তলা দিয়া দিদি চলিতেছে। তার পরেই বাঁশঝাড়--বাঁশঝাড়ের মধ্যে গিয়া পড়িলে দিদিকে আর পাওয়া যাইবে না।

আশা ডাকিল--ও দিদি--পালাস্‌নে--কথা শোন্--

দিদি ফিরিয়া চাহিল--কিন্তু দাঁড়াইল না। বড় সড়কের পাশে গাব গাছটার কাছে একবার থামিয়া আবার সোজা চলিতে লাগিল। গ্রাম তখন নিশুতি। আশার চীৎকার করিবার ক্ষমতাও নাই দিদি চলিতেছে, আশাও চলিল। পথের দু'ধারে ঘন অশ্‌শ্যাওড়ার জঙ্গল।--বুক পর্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এক একবার দিদিকে দেখা যায়--আবার দেখা যায় না। আশা ছুটিয়া চলিল--কিন্তু দিদিও ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

নন্দগাড়ীর মাঠের কাছে আসিয়া আশা দেখিল--কই দিদি নাই তো! কোন্ দিক দিয়া দিদি পলাইল কে জানে। চারিদিকে বিপুল অন্ধকার--কোথাও এতটুকু সাদার চিহ্ন নাই!

গাঢ় অন্ধকারের ভিতর আশা পথ হারাইয়া ফেলিল। পিছন পানে ফিরিয়া আশা দেখে : সেদিকেও পথ নাই। আশা মাঠের উপর দিয়া ছুটিতে লাগিল। মাঠে লাঙল দেওয়া হইয়াছে--শুক্‌নো মাটির ঢেলায় আঘাত লাগিয়া আশার পা কাটিয়া গেল। বড় বাব্‌লা-গাছটির আশে পাশে যেন কতকগুলি অদ্ভুত মূর্তি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আশা সারা মাঠময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছুটিতে লাগিল।

আশা ছুটিতেছে--মাঠের পর বিল।--বিলের উপর কচুরীপানার দামে ছপ্ ছপ্ শব্দ--বিলের পাশে মস্ত একটা তাল গাছ--তারপর বন--বৈঁচী ক[illegible]র বন--বনের পথ পার হইয়া উঁচু জমি--একটা বাজপড়া খেজুর গাছ--কচার বেড়া--আমব[illegible]ন--তারপর কেবল অন্ধকার--নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার--আকাশ--পৃথিবী কিছু নাই।

হঠাৎ সিদ্ধেশ্বরীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। বলিলেন--ও আশা, আশা--কাঁদছিস্ কেন মা, আশা--এই যে আমি তোর পাশে শুয়ে আছি--ভয় কি মা--ভয় কি--

গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন : আশার জ্বর হইয়াছে।

টগর গাছটা উঠানের ঠিক উপরেই। গাছটা ফুলে ফুলে আজ ভরিয়া গিয়াছে। সকাল বেলা পূজার ফুল তুলিতে তুলিতে সিদ্ধেশ্বরীর অনেক আগের দিন একটা ঘটনা মনে পড়িয়া গেল।

শৈল তখন ছোট, এ-পাড়া ও-পাড়ায় খেলিয়া বেড়ায়। একদিন কোথা হইতে এই গাছটা এইখানে আনিয়া পুঁতিয়া দিল।

পুঁতিয়া তো দিল--কিন্তু পরক্ষণেই ঘোষালবাড়ীর ছেলেরা আসিল ছুটিতে ছুটিতে।

তাহারা আসিয়া জানাইয়াছিল : শৈল না কি টগর গাছটি ঘোষালদের বাগান হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছে। হয় ত চুরি সত্য সত্যই করিয়াছিল--কিন্তু তাহা স্বীকার করিবার মত মেয়ে শৈল নয়।

ঘোষালবাড়ীর মেজ-গিন্নীও খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলেন।

গালে হাত দিয়া বলিলেন—ওমা, এই বয়েসেই এই—শ্বশুর বাড়ী গিয়ে কী দশা হবে মা,—একরত্তি মেয়ের কীর্তি দেখে আমার তো--নিজের মেয়ে হ'লে কেটে ফেল্‌তুম না—

মেজ-গিন্নী কলিকাতার মেয়ে। শেষে সেই গাছ তুলিয়া লইয়া গিয়া, বাগানে পুঁতিয়া দিয়া তবে ছাড়িলেন। বলিলেন—অমন মেয়েতে কাজ নেই মা—সাতজন্ম বাঁজা থাকবো—

ঘোষালবাড়ীর ছেলের দল লইয়া মেজ-গিন্নী বিজয়িনীর মত বাড়ী ঢুকিলেন।

তারপর, সকলে চলিয়া গেলে শৈলর উপর সে কী শাস্তি। অন্য মেয়ে হইলে পিঠ বোধ হয় ভাঙিয়া যাইত। কিন্তু শৈল এতটুকু কাঁদিল না—এতটুকু নড়িল না। মস্ত একটা চ্যালাকাটের সাহায্যে সিদ্ধেশ্বরী সেদিন তাহাকে এমন শাস্তি দিলেন—শেষ পর্যন্ত তাহার পিঠের সে দাগ মিলায় নাই। সে শাস্তির কথা স্মরণ করিয়া কত দিন সিদ্ধেশ্বরী আড়ালে কাঁদিয়াছেন। সামান্য একটা ফুলগাছ—তাহার জন্য এত?

পরে কালীনাথই কৃষ্ণনগরের কাছারী-বাড়ী হইতে একটা টগর গাছ আনিয়া দিয়াছিলেন। সেই গাছই এখন এত বড় হইয়াছে—সেই গাছেই এখন এত ফুল ফুটিতেছে—কিন্তু যাহার জন্য এত, সে-ই আজ নাই। এক বর্ষারাত্রের দুর্যোগে কালীনাথ তাহাকে চুলকাটিতলার শ্মশানে রাখিয়া আসিয়াছেন।—সে আর আসিবে না।

পিছন ফিরিয়া চাহিতেই সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন—ওমা তুমি কখন এলে? বলিয়াই মাথায় ঘোম্‌টা টানিয়া দিলেন।

কালীনাথ বলিলেন—আশা কোথায়—বাগানে গেছে বুঝি?

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন—ওসব আবার আন্‌লে কেন—যা'র জন্যে আনা—সিদ্ধেশ্বরীর মুখে কথা বাধিয়া গেল।

কালীনাথের হাতে মাটির পুতুল। বলিলেন—আশার জন্যে আন্‌লাম—তা কই সে? বড় মেয়ে চলিয়া যাইবার পর আশার উপর তাঁহার যেন মায়া বাড়িয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণনগর হইতে বাড়ী আসিলেই গোয়াড়ীর মাটির পুতুল তাঁহার আনা চাই। বড় মেয়ে যতদিন বাঁচিয়া ছিল তাহার জন্যও আনিতেন। বলিলেন—এই রদ্দুরে তা'কে আবার বাগানে পাঠানো কেন?

সিদ্ধেশ্বরী আর পারিলেন না। বলিলেন—ওগো তা'র যে জ্বর—

—জ্বর? তাই না কি? কই—কালীনাথ ঘরে ঢুকিলেন। কিন্তু কেহ ত নাই। সিদ্ধেশ্বরীও ঘরে ঢুকিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। আশা কই! এই তো একটু আগে বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছিল। আর এখনি কোথায় গেল? কালীনাথ ততক্ষণে ও-ঘর এ-ঘর সব দেখিয়া আবার বাহিরে দেখিতে আসিলেন। সিদ্ধেশ্বরী ডাকিলেন—ও আশা—আশা—

কোনও সাড়া নাই। কালীনাথ পাগলের মত হইয়া গেলেন। গেল কোথায়! সারা বাড়ী কোথাও যে নাই। ঘোষালদের বাড়ী যায় নাই তো!—কালীনাথের একবার মনে হইয়াছিল। কিন্তু না, শৈল চলিয়া যাইবার পর হইতে আশা বড়-একটা কাহারো বাড়ীতে যায় না তো! কোথাও ঘুমাইয়া পড়ে নাই তো!

কালীনাথের আনা পুতুলগুলা তখন উঠানের উপর গড়াগড়ি যাইতেছে। সেগুলি পা দিয়া লাথি মারিয়া কালীনাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ওই পুতুলগুলিই যত অনিষ্টের মূল!

অনেক দিন আগের এমনি একটা ঘটনা তাঁহার মনে পড়িল। বর্ষাকাল—দু' দু'টা মকর্দমা শেষ করিয়া কালীনাথ তখন একটু স্থির হইয়াছেন। গোয়াড়ী হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটা পুতুল কিনিয়া বাড়ী আসিলেন; পথে বৃষ্টির জলে তাঁহার পা কাদায় ভরিয়া উঠিয়াছিল।

বাড়ীর বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন—শৈলী, ও শৈলী? ওরে আশা—শব্দ শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরী বাহির হইয়াছিলেন—ওগো তুমি এসেছ—আমাদের শৈল বুঝি আর—

শেষ পর্যন্ত বলিতে হয় নাই। কালীনাথ ঘরে ঢুকিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তখন আর দাঁড়াইয়া ভাবিবার সময় ছিল না।

যাহা হউক, পায়ের কাদা আর সে রাত্রে ধোয়া হইল না। ধুইলেন পরদিন একেবারে শ্মশান হইতে ফিরিয়া। সেদিন পুতুল হাতে করিয়া আসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন, আজো যে তাহাই দেখিবেন, ইহা তিনি আশা করেন নাই।

কালীনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল : দীঘির ঘাটে যায় নাই তো!

কথাটা মনে পড়িতেই কালীনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।—তাই তো। এতক্ষণ সেখানে তো একবার দেখা হয় নাই। চারিদিকে বড় বড় গাছের ছায়ায় অত বড় দীঘি দিনের বেলায়ও অন্ধকার। কালীনাথ পৈঁঠার উপর গিয়া দাঁড়াইলেন। গভীর কালো জলের উপর ততোধিক কালো কালো ছায়া ফেলিয়া গাছগুলি নিঃশব্দ শাস্ত্রীর মত দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও কাহারো সাড়া শব্দ নাই। নিথর নীরব জলরাশি যেন থম্ থম্ করিতেছে। উত্তর দিকের কোণে ঢোল-কলমির বনের ভিতর কি যেন একটা ভাসিতেছে না? চলিতে গিয়া কালীনাথের পা কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু বেশী দূর যাইতে হইল না। যাহাকে তিনি সন্দেহ করিয়াছিলেন—সেটি আর কিছু নয়—কচুরীপানা শুকাইয়া গাদা হইয়া ভাসিতেছে। বাড়ী আসিতেই কিন্তু সব গোলমাল চুকিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন—কী মেয়ে জানো রান্না ঘরের ভেতর শৈলর পুতুলগুলো নিয়ে খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়েছে—এদিকে আমরা এত ডাকাডাকি এত চেঁচামেচি—

সে রাত্রেও আশার জ্বর ছাড়িল না।

দিনের বেলা আশা বেশ থাকে—যত গোল বাধে রাত্রে। আশার মনে হয় : দিদি যেন ওই টগর গাছটায় হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, দাঁড়াইয়া তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে। দূরে বাঁশ ঝাড়ের ভিতর দিয়া একটা তারা রোজ মিটি-মিটি করিয়া জ্বলে—ভোর হইলে আর থাকে না ; কোথায় ঘোষালদের চিলে-কোটার আড়ালে সব লুকাইয়া পড়ে।—আবার রাত্রি হইলেই জানালাটার ভিতর দিয়া নিঃশব্দে উঁকি মারিয়া দেখে।

আশার মনে হয়—যত রোগের মূল যেন ওই পুতুলের বাক্সটা!

শৈল যখন বাঁচিয়া ছিল তখন দু' মেয়ের ছিল পৃথক ব্যবস্থা। কালীনাথ যখন কৃষ্ণনগর হইতে পুতুল আনিতেন, তখন দু'জনের জন্য একই পুতুল দুইটা আনিতে হইত। একটা এতটুকু ফারাক হইলেই ঝগড়া।

কিন্তু শৈল চলিয়া যাইবার পর হইতে সমস্তই আশার অধিকারে আসিয়াছে। আশা ভাবে—ওইগুলা সে নিয়াছে বলিয়াই দিদি অমন করিয়া রোজ রোজ আসে। তাই সে অমন স্বপ্ন দেখে। ঘুমাইলেই মনে হয় : দিদি যেন টিপি টিপি পায় আসিয়া তাহার পুতুলের বাক্স নাড়িতেছে। ঘুমাইতে ঘুমাইতে আশা কত দিন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছে—তারপর আস্তে আস্তে ও-ঘরে যেখানে পুতুলের বাক্স থাকে—সেখানে হাত বুলাইয়া দেখে : সব যেমনকার তেমনই আছে। শুধু দুঃস্বপ্ন!

দুই মেয়েরই আজন্ম পুতুল খেলায় সখ্!

অনেক দিন আগের একটা ছোট ঘটনা আজও আশার মনে আছে।

নোনাগঞ্জে রথের মেলা বসে। রথ তো মাত্র দু'দিন, কিন্তু মেলা চলে পনেরো দিন ধরিয়া। নোনাগঞ্জের পথে নৌকা করিয়া একবার ইছামতী পার হইতে হয়।

তখন রাত হইয়াছে। কালীনাথের সঙ্গে দুই মেয়ে রথের মেলা দেখিয়া ফিরিতেছিল। দুই জনেরই হাত বোঝাই খেল্‌না আর পুতুল ; ভীড়ও কম নয়। সেই নৌকার উপরেই দুই মেয়েতে ঝগড়া বাধিয়া গেল।

ঝগড়ার কারণ সামান্য ; কিন্তু তাহা যে পুতুল লইয়া তাহা আজো আশার মনে আছে।

আরম্ভ করিয়াছিল আশা। বলিয়াছিল—এই দেখ্ দিদি, আমার বেনে বউ বড়—তোরটা ছোট—এই দেখ্—দেখ ইদিকে—

একটু উনিশ-বিশ ছিল হয় ত।—হয় ত ছিল না। পটুয়ার হাতের কাজ—দুইটা ঠিক এক মাপের হয় নাই হয় ত। কিন্তু তা' কে শোনে! ঝগড়া বাধিতে দেরি লাগিল না।

কালীনাথ প্রথমে কান দেন নাই। গ্রামের আরো অনেক লোক নৌকায় পারাপারের জন্য উঠিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গেই কথায় মাতিয়া ছিলেন। যখন ওদিকে নজর গেল--তখন কথা ছাড়িয়া তাহা হাতাহাতিতে নাবিয়াছে।

বলিলেন—করিস্ কি—ও আশা—ও যে তোর দিদি—বলিয়া আগাইয়া গেলেন।

কিন্তু বিপদ তখন উপায়ের বাহিরে—

আশা তাহার দিদিকে এক ঠেলা দিয়াছে! ঠেলা দেওয়াতে নৌকাও কাঁপিয়া উঠিয়াছে। শৈল ছিল নৌকার ধারে! নৌকা কাঁপিতে সে-ও কাঁপিয়া উঠিল।

হাত কাঁপিল, পা কাঁপিল, দেহ কাঁপিল ; তারপরেই ঝপাং করিয়া এক শব্দ।—

যে-হোক একজন পড়িয়াছে সন্দেহ নাই।

নৌকা শুদ্ধ লোক তো ভয়ে বিস্ময়ে কাট হইয়া গেল। অন্ধকারে ভাল দেখিতেও পাওয়া যায় না! কিন্তু শৈল পড়ে নাই—পড়িয়াছে তাহার পুতুল ; একটিও নাই—সব।

মেয়েদের বকিবেন তিনি পরে, আপাতত ব্যাপার দেখিয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিলেন!

কপালের গ্রহ ছিল ;—সেই রাত্রেই কালীনাথ আবার নোনাগঞ্জের মেলায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। এবং সেই রকম দেখিয়া আবার প্রত্যেকটি পুতুল মিলাইয়া মিলাইয়া কিনিয়া তবে শান্তি!

মেয়েদের জন্য কালীনাথকে কি কম ভুগিতে হইয়াছে! তবু ইহাতেই কালীনাথের আনন্দ ; ভাবিতেন : ছেলে তাঁহার নাই—মেয়েদের যখন বিবাহ হইয়া যাইবে—তখন কী লইয়া তিনি বাঁচিবেন? কিন্তু বিবাহ হইবার আগেই কালীনাথের চোখের সমুখ দিয়া একটি তো চলিয়া গেল।

চোখের সমুখ দিয়াই বটে।

সে বর্ষা রাত্রের দুর্যোগের কথা আজো কালীনাথের চোখের সমুখে জাগিয়া আছে।

বাহিরে বিপুল অন্ধকার—বৃষ্টি যেন থামিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছে। পাশাপাশি বাড়ীর কয়েকটা লোক জড়ো হইয়াছিল ; তাহারাই শ্মশানে যাইবে। কিন্তু মুস্কিল বাধিল সিদ্ধেশ্বরীকে লইয়া। পাগলের মত সেই মৃত্যুশয্যায় মৃত কন্যাকে তিনি জড়াইয়া রহিলেন। বাহকদের মধ্যে একজন আগাইয়া গেল। বলিল--ও কাকিমা উঠুন--অমন অবুঝ হ'লে--

কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী কোনও কথা শুনিতে চান্ না। কেহ কাছে যাইলেই চীৎকার করিয়া বলেন—ওগো না না—আমি ছাড়বো না—

তখন কে-ই বা বোঝে আর কে-ই বা বোঝায়। কালীনাথ তখন এক পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু সত্যই কয়েকজনের সাহস ছিল বলিতে হইবে! তাহারা অমন বিশ-পঞ্চাশ বার শ্মশানে গিয়াছে।—শব বহিয়া তাহাদের কাঁধে কড়া পড়িয়া গিয়াছে।—শেষে তাহারাই আগাইয়া গেল। বলিল—নাঃ—এ তোমাদের কম্ম নয়—এইটুকুতেই—দেখি—

আশা ও সিদ্ধেশ্বরীর নিকট হইতে তাহারা একরকম জোর করিয়াই শবদেহ ছিনাইয়া

লইয়া গেল। কালীনাথের আজো মনে আছে আশা বড় সড়কের গাব গাছ পর্যন্ত কেমন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছিল।—সে কী কান্না!

—ও দিদি, তোর পুতুল নিবিনে?—আমি আর নেব না—কখ্খনো নেব না—ও দিদি—শুন্‌লি--

মুস্কিল বাধিয়াছিল চিতা জ্বালাইবার সময়। ভিজা কাট জ্বালিতে গিয়া দশ আঁটি পাট্‌কাটি খরচ হইয়া গেল। যাহা হউক—সে-রাত্রে জ্বলে নাই—জ্বলিয়াছিল পরদিন। মৃতদেহ ততক্ষণে সারা রাত্রি জলে ভিজিয়া ঢোল হইয়া গেছে। সেই মৃতদেহ তিল তিল করিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল—কালীনাথ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিয়াছে।

পরের বার কৃষ্ণনগর হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় আবার পুতুল কিনিবার দরকার হইল।

কালীনাথ পুরানো খরিদ্দার। দোকানী বলে—এবার আজ্ঞে এই মাটির খরগোস দুটো নিয়ে যান দিকি কত্তা--

--দেখো শ্রীবিলাস দুটো যেন এক রকম হয়—নইলে জান তো মেয়েদের--

দোকানী সে কথা জানিত। নিঃসন্দেহে পুতুলটা কালীনাথের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু তখনও কালীনাথের কিছুই মনে হয় নাই। ভুল ভাঙিয়াছে রাস্তায় আসিয়া। এমনি কতবার।

বাড়ীতে সিদ্ধেশ্বরীরও অমন হইত।

সিদ্ধেশ্বরীর দুই পাশে দুইজন শুইত। আশা শুইত বাঁদিকে—শৈল ডানদিকে। দুই দিকে দুইজনের সমান ভাগ। কিন্তু তবু দুই মেয়েতে ঝগড়া। সিদ্ধেশ্বরী কাহার দিকে পাশ ফিরিবেন তাহাই লইয়া ঝগড়া। শেষে অনন্যোপায় হইয়া সিদ্ধেশ্বরী সোজা উপর দিকে মুখ করিয়া শুইতেন। কিন্তু ঘুম আসিলেই আবার কখন পাশ ফিরিয়া শুইতেন। আবার ঝগড়া সুরু হইত।

সিদ্ধেশ্বরী ঘুমের ঘোরে রাগিয়া উঠিতেন : না মা, তোদের জ্বালায় আর—শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কি করবি শুনি--তখন তো আমি যাচ্ছিনে সঙ্গে—

একদিন ঘুমের ঘোরে সিদ্ধেশ্বরী একেবারে দেয়ালের দিকে ঘেঁষিয়া গিয়াছেন। হঠাৎ আচম্‌কা ঘুম ভাঙিতেই ভয়ে এদিকে সরিয়া আসিয়াছেন।—তাই তো! অজান্তে একেবারে শৈলর ঘাড়ের ওপর গিয়া শুইয়াছিলেন না কি? ছি-ছি—

--শৈলী ও শৈলী--দেখেছ, মেয়ের সাড় নেই একেবারে—

কিন্তু বলিয়াই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন। শৈল তো নাই! যাহাকে ঠেলা, সে শৈল নয়—আশা।

শৈলর জায়গায় আশা তখন অঘোরে ঘুমাইতেছে।

শৈল যাইবার পর হইতেই আশা যেন কেমন-কেমন হইয়া গিয়াছে। সব বিষয়েই নির্লিপ্ত। ওই মেয়েই যে আগে অমন করিয়া ঝগড়া কোন্দল করিত, এখন আর তাহা বিশ্বাস করিবার যোটি নাই। কোনও জিনিষে স্পৃহা নাই। দাও ভাল—না-দাও চাহিবে না। পিঠোপিঠি মেয়ে—দু'টিতে একসঙ্গে বড় হইয়াছে—একসঙ্গে খেলিযাছে—এক বাড়ীতে মানুষ —ছোটবেলা হইতে দুটিতে ছাড়াছাড়ি হয় নাই।—

সিদ্ধেশ্বরী ভাবিলেন : শৈল তো গিয়াছে উপায় নাই—কিন্তু আশাও যাইবে না কি? না, না। সিদ্ধেশ্বরী কাছে গিয়া বসিলেন।—ও আশা—ওমা—এখন কেমন আছিস্ মা—?

বিছানার উপর পুতুলগুলা ছিল। সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন—ওমা—অত পুতুল—সব কি হোল?

আশা বলে—দিদির পুতুলগুলো আর নেব না মা—ও থাক্।

এই পুতুলগুলা লইয়াই আশা কত দিন দিদির সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছে! সে অনেক

দিনের কথা : আগের দিন শৈলর জ্বর আসিয়াছে।—অনাদি কবিরাজ আসিয়া সেদিন বড়ি দিয়া গিয়াছেন। জ্বর-দেহে শৈল বিছানার উপর শুইয়া আছে–কিন্তু তবু প্রশ্নের বিরাম নাই। —এলোপাতাড়ি অসম্বদ্ধ প্রশ্ন।

—হ্যাঁ মা, আশা কই, বাগানে গেছে বুঝি?

—ও মা, ওই দেখ, ঘোষালদের বুধি আসছে–ওই আমার টগরগাছটা সব খেলে—খেলে—ওই খেলে—

—হ্যাঁ মা—তোমার খাওয়া হয়েছে? আশার? কি দিয়ে খেলে—আমি সেরে উঠলে কিন্তু পুঁইশাকের ডাঁটা দিয়ে ভাত খাবো—আর অম্বল—

—মা, একটা কথা শোন কানে কানে—নীচু হও আরো—কাউকে বোল না—এই—কাউকে বল্‌বে না বল—ঠিক?—ঘোষালদের কেষ্ট না—তামাক খায়—হ্যাঁ খায়—আমি দেখেছি—

তার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলে—হ্যাঁ মা, আমাদের পাৎকো'তে না কি সাপ পড়েছে—আশা বলছিল—সব মিছে কথা—

হঠাৎ শৈলর মুখটা দৃঢ় হইয়া উঠিল। চোখে উদ্বেগ—দেহ কাঁপিতেছে। দরজার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া হঠাৎ শৈল যেন উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। সিদ্ধেশ্বরী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—ও কি—উঠিস্‌নে—উঠিস্‌নে—করিস কি—?

কিন্তু কে কা'র কথা শোনে? শৈল উঠিবেই! সিদ্ধেশ্বরী শৈলর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখেন : বাহিরে আশা যাইতেছে। আশার হাতে শৈলর পুতুলের বাক্স।

শৈল চীৎকার করিয়া উঠিল—ওমা, ওই আমার সব পুতুল নিয়ে নিলে—নিলে—নিলে-এ—

সিদ্ধেশ্বরী ছুটিয়া বাহিরে গেলেন।—ওরে ও আশা দে—দিয়ে যা—শুন্‌লি—?—

আশা পলাইয়া গেল—কিন্তু সেই রাত্রেই শৈলর জ্বর বাড়িয়া গেল। সেই যে বাড়িয়াছিল, আর থামে নাই। বেঘোর বেহুস অবস্থায় পাঁচ দিন কাটিল।

আশা কাছে গেল।—ও দিদি—চোখ্ তোল—চেয়ে দেখ্—এই তোর পুতুল নে—এই নে দিদি—

দিদি শুনিতে পাইল কি না কে জানে—কিন্তু কথা বলিল না। তাহার নিষ্পলক দৃষ্টি ঘোলা হইয়া আসিল—কণ্ঠনালী একটু নড়িল,—ঠোঁট দু'টি কাঁপিয়া স্থির হইল। তেমনি করিয়াই কাটিল রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। সিদ্ধেশ্বরী গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন—জ্বর ছাড়িয়াছে—কিন্তু বুকের স্পন্দনও যেন আর নাই।

কালীনাথ তখন আসিয়া পড়িয়াছেন। সিদ্ধেশ্বরীর মর্মভেদী ক্রন্দনের শব্দে সেই বর্ষার দুর্যোগ রাত্রি কেমন করিয়া থমকিয়া উঠিয়াছিল—সে কথা ভুলিয়া যাইবার নয়।

বিকালবেলা বিছানায় শুইয়া আশা জানালাটা খুলিয়া দিল। টগর গাছটা এখান হইতে স্পষ্ট দেখা যায়।

ওইখানে এই খানিক পরেই রাত্রি যখন গভীর হইবে—দিদি আসিবে। দিদি ওইখানে রোজ আসিয়া দাঁড়ায়। রাত্রি দ্বিপ্রহরে কতদিন আচ্‌মকা আশার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে; শিয়রের জানালাটা খুলিয়া দিতেই আশা দেখিয়াছে : ওই টগরগাছটিতে হেলান্ দিয়া দিদি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! সাদা কাপড় পরা—ছোট একটি কাঁচপোকার টিপ্ কপালের মাঝখানে চক্ চক্ করে—খোঁপার উপর একটি টগর ফুল গাঁথিয়া দেওয়া।

আশা শুইয়া শুইয়া একটা ফন্দি ঠিক করিল।—

একদিন রাত্রে যখন কেউ কোথাও থাকিবে না— চারিদিকে নিবিড় নিশুতি—চাঁদটা যখন ঘোষালদের চিলে-কোটার আড়ালে ডুবিয়া যাইবে—সেই সময় দিদির পুতুলের বাক্সটা ওইখানে ওই গাছতলায় রাখিয়া চলিয়া যাইবে।

সেই ভাল ; যাহার পুতুল সেই আসিয়া লইয়া যাক্। সেই ভাল—সেই ভাল!

পরদিন সকালবেলা কালীনাথের চলিয়া যাইবার কথা! এবার কৃষ্ণনগর হইতে ডাক্তার লইয়া আসিবেন! ভোর থাকিতে থাকিতে রওনা হইতে হইবে। পাঁচ মাইল দূরে ষ্টেশন— হাঁটিয়া যাইলেও কম সময় লাগে না।

খুব রাত থাকিতে থাকিতে কালীনাথ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াছেন। উঠিয়া একবার বাগানের দিকে গেলেন। প্রকাণ্ড আম বাগান। দু' একটা পাকিতে সুরু হইয়াছে—এখন হইতেই আম চুরি সুরু হয়। রাত থাকিতে থাকিতে সাত পাড়ার লোক অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া গাছে উঠিয়া আম পাড়িয়া লইয়া যায়। কালীনাথ বাগানে গিয়া কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না ; রাত্রি বোধ হয় এখনও অনেক—কালীনাথ আন্দাজ বুঝিতে পারেন নাই।

মস্ত বড় জামগাছটা পথের উপরেই পড়ে। জাম এখন পাকিবার সময় নয়—পাকিবে সেই জৈষ্ঠ্যের শেষাশেষি ; এখন কচি কচি জামে গাছটা ভরিয়া গিয়াছে। ছোটবেলায় কালীনাথ এই গাছটা হইতে একবার পড়িয়া গিয়াছিলেন। পড়িয়া ডান পা'টা কাটিয়া গিয়াছিল। আজও বোধ হয় কাটার দাগ আছে।

সে এক বড় মজার ব্যাপার।

হঠাৎ গুজব উঠিয়াছে : গ্রামে বাঘ আসিয়াছে। সন্ধ্যা হইতেই যে যাহার ঘরে ঢুকিয়া পড়ে ; রাত্রে গ্রাম যখন নিশুতি—অন্ধকারের তন্দ্রা ভেদ করিয়া কত বিকট শব্দ সকলের কানে আসে। সকলেই শুনিতে পায় যেন কাছাকাছি পোয়াটেক্ পথ দূরেই সারা পল্লী চকিত সন্ত্রস্ত করিয়া দিয়া শব্দ হইতেছে—ফেউ ফেউ—

ওই শব্দের ইঙ্গিত যে কিসের—তাহা আর কাহারো জানিতে বাকি নাই।

কালীনাথ তখন ছোট! ভাজনঘাটার ইস্কুল হইতে ফুটবল খেলিয়া ফিরিতেছেন। পথেই কিন্তু রাত্রি হইয়া গেল। কালীনাথ সোজা আসিতেছিলেন। জোলের মাঠ পার হইয়া— নলগাড়ীর খাল—তারপর আমবাগান ; আমবাগানের ভিতর দিয়াই পথ। আসিতে আসিতে হঠাৎ কাছাকাছি যেন কোথায় ছপ্ ছপ্ শব্দ হইল। তারপরেই কোথায় যেন হঠাৎ শুক্‌নো পাতার উপর চলিলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি শব্দ হইল। হাতের কাছে এই জাম গাছটা ছিল, কালীনাথ ইহারই উপর উঠিলেন। উপরে উঠিয়া দেখেন : নীচে মস্ত বড় এক—

ভাবনায় হঠাৎ বাধা পড়িল। রাত এখন অনেক নিশ্চয়ই। পথ দিয়া গরুর গাড়ী আসিতেছিল। রাত্রি দশটার ট্রেন ধরাইয়া এখন ফিরিতেছে। গাড়ী কাছে আসিতেই নন্দ বলিল—কে? খুড়োমশাই নাকি? এত রাত্রে এখেনে?

কালীনাথ বলিলেন—কত আর রাত, ভোর তো হোল ব'লে'—

নন্দ বলিল—ভোর কোথায়? গরমের দিনে কি রাত বোঝবার যো আছে আজ্ঞে—রাত এখন তিন পো—

কালীনাথ ফিরিতেছিলেন। নন্দ বলিতেছিল—গাঁয়ে লোকজন যাচ্ছে মরে' ঝরে—বন জঙ্গ-লও বাড়ছে তেমনি—আপনি তো আর দেশে থাকেন না, আমাদের চলাফেরা বন্ধ করতে হবে, খুড়োমশাই—

—কেন, কি হোল তোমাদের?

নন্দ যেন আশ্চর্য হইয়া গেল। চুপি চুপি বলিল—কেন, আপনি শোনেন নি কিছু? কিছু শোনেন নি—

কালীনাথ বলিলেন—শুনেছি বৈ কি,—জমিদারের খাজনার কথা বোলছ তো?

নন্দ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—ও, আপনি শোনেন নি তা' হ'লে,—শুনুন্ তবে—আমি নিজের চোখে দেখিছি, খুড়োমশাই—দিদি আমার এইখেনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—একটা সাদা শাড়ী পরা—কপালে কাঁচপোকার টিপ্, খোঁপায় ফুল গোঁজা—আমায় দেখে দিদি আবার সরে' গেলেন আড়ালে—বোধ করি চিন্‌তে পারলেন—আহা চিনবেন না,

কোলে পিঠে করে' এই সেদিনও বেড়িয়েছি—

কালীনাথ তবু কথাটা বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন—কা'র কথা বলছ, নন্দ?

নন্দ তেমনি ভাবেই বলিতে লাগিল—তা' যেমন ভাল মানুষটি ছিলেন দিদিটি আমার—বুঝলেন খুড়োমশাই—এখনও তেমনি—সেদিন ওই সিঁদুরে আমগাছটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন—ঝম্ ঝম্ করে' বিষ্টি হচ্ছে—আমি গাড়ী নিয়ে আসছিলাম, থমকে গেলাম—তা একটু ভয় হয় বৈকি—কি বলেন—ভয় হয় না? ভাবলাম একবার ডাকি—ও দিদি—শৈল দিদি—

—আমাদের শৈলর কথা বলছ?—বিস্ময়বিমূঢ় কণ্ঠে কালীনাথ প্রশ্ন করিলেন।

—তারই কথা তো বল্ছি—তা' বলা তো যায় না, ওঁদের একটু ভয়-ভক্তি করে' চলতে হয়, নইলে—বদনগঞ্জের একাদশী বিশ্বেসের কি হয়েছিল জানেন তো—পা থেকে মাথা পর্যন্ত একেবারে—

কোন এক একাদশী বিশ্বাসের কি হইয়াছিল কালীনাথ সে কথা শুনিলেন না ; তিনি ফিরিলেন সিঁদুরে আমগাছতলায় আজ এখনি একবার দেখিতে হইবে!—আজো যদি শৈল সেখানে আসিয়া থাকে? এখনও রাত্রি আছে—কালীনাথ চলিলেন।

নন্দ গাড়ী থামাইয়া বলিল—যাবেন না খুড়োমশাই, কাজ নেই—না দেখেছেন—সেই ভালো—নইলে বদনগাছের একাদশী বিশ্বে—

কিন্তু কালীনাথ শুনিলেন না। পায়ের তলায় শুক্‌নো পাতা জমিয়াছে ; চলিতে গেলেই খস্ খস্ শব্দ হয়—

প্রকাণ্ড বাগান। নিস্তব্ধ বনস্থলী যেন কাহার আশায় প্রতীক্ষমান। বনপুরীর অভ্যন্তরে অন্ধকারের রাজত্ব। ও অন্ধকার যেন স্পর্শ করা যায়। বন-রাজ্যের ভিতর নিঃশব্দ সান্ত্রীর দল মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কালীনাথ যে আগন্তুক—কালীনাথ যে উহাদের রাজত্বে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছেন—ইহাতে যেন এতটুকু চাঞ্চল্য নাই। কালীনাথ যেন উহাদেরই আত্মীয়—ওই অন্ধকারেই কালীনাথ মানুষ হইয়াছেন।

তাঁহার মনে হয় ; এ পৃথিবী হইতে যত কিছু হারাইয়া গিয়াছে—ওই আকাশ হইতে যত তারকা খসিয়া গিয়াছে—যত কিছু অনাগত—যত কিছু বিগত, সব যেন ওই অন্ধকারকে কেন্দ্র করিয়া আছে। আমরা সারা পৃথিবী ব্যাপিয়া দীপমালা জ্বালিয়াছি—কোথাও অন্ধকার রাখিব না পণ করিয়াছি, তাই আমাদের চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছে—সারা জগৎ অন্ধকার না করিলে বুঝি আর আমাদের চোখ ফুটিবে না ;...ফুলের মতন অন্ধকারের রাজত্বে বসিয়াই আলোর সাধনা করিতে হইবে—

কিন্তু কালীনাথের মনে হইল ঃ দূরে ওই যে সাদা কাপড় পরা মূর্তিটি—ওই শৈল নয় তো? বাবাকে দেখিয়া হয় ত সরিয়া যাইতেছে—ভয় কি মা—আমি তোমার কোনও অনিষ্ট করিব না!

পায়ের তলায় মর্মর শব্দ হইতেছে—তবু কালীনাথ তাহারই উপর দিয়া চলিলেন। আকাশে চাঁদ নাই—অন্ধকারের ভীড়ে কালীনাথ যেন দিক-ভুল করিলেন। তাঁহার মনে হইল এই নিশীথ রাত্রে হয় ত এমন করিয়া এখানে আসা উচিত হয় নাই। সারাদিন সূর্যের আলোয় যাহারা দিকচক্রবালের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া থাকে—এই তমসাচ্ছন্ন রাত্রেই আবার তাহারা এই পৃথিবীতে আসিয়া বিচরণ করে ; বোধ করি এই অন্ধকারেই তাহাদের সুযোগ। পৃথিবীর যত আত্মা চলিয়া গিয়াছে, যত হাসি কান্না—যত আলো ছায়া একদিন বিদায় লইয়াছে, তাহারা যেন সবাই এই অন্ধকারে বাসা বাঁধিয়া আছে। যেদিন একাগ্রমনে আমরা এই অন্ধকারের রাজ্যে তাহাদের খুঁজিয়া বেড়াইব—মনে-প্রাণে তাহাদের কামনা করিব, সেদিন আবার তাহারা আসিবে। এ পৃথিবী হইতে কেহ হারায় নাই—কিছু চলিয়া যায় নাই। সবাই কোন-না কোন স্থানে আত্মগোপন করিয়া আছে,—আমরা আলো

জ্বালাইয়াছি বলিয়াই তাহারা লুকাইয়া থাকে।

ভাবিতে ভাবিতে কালীনাথ কোন্ অতীতের রাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছিল।

ও বাবা, বাবা, দেখেছ—দেখ, সিঁদুরে গাছতলায় তিনটে আম পড়ে ছিল—বাগানে গেলাম তাই তো!

—ওমা আমার কি হবে—দেখ দেখ—খাজা গাছের কাঁটালগুলো সব চুরি করে' নিয়েছে—এ ওই উজীর মণ্ডলের কাণ্ড।

—তুমি কিছু জান না বাবা, ওটা যে কাঁচামিঠে,—টিপ্ ঢালতে তো ও বাগানে—

—ও বাবা, ওই একটা আম পড়লো—ওই—শুন্‌লে?

ছোট ছোট কথা—দৈনন্দিন তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটি তবু প্রত্যেকটি আজো কালীনাথের মনে রেখাপাত করিয়া আছে। যেদিন রাত্রে ঝড় হইত সেদিন শৈলর সে কি মাতামাতি! উপর্ঝরণ বৃষ্টি পড়িতেছে—কাপড় ভিজিয়াছে—মাথা ভিজিয়াছে—কিন্তু তবু কাহারো কথা শুনিবে না। বাগান হইতে আম কুড়াইয়া আনিয়া ঘর বোঝাই করিয়া ফেলিবে। আম খাইত তো ভারী—কুড়াইতেই তাহার যত আনন্দ!

কিন্তু একবার কালীনাথের মনে হইল : কেনই বা সে আসিবে! চুলকাটিতলার শ্মশানে কালীনাথ তাহাকে নিজে গিয়া পুড়াইয়া আসিয়াছে।—কালীনাথ নিজের চোখে দেখিয়াছেন : তাহার দেহ তিল তিল করিয়া ভস্ম হইয়া গেল!—খুঁজিলে আজ সেখানে এতটুকু কণাও আর যে তাহার পাওয়া যাইবে না। যে চলিয়া যায়—সে আবার আসে না কি! যত সব মিথ্যা কথা -কুসংস্কার। সে মরিয়া গিয়াছে—সে কেমন করিয়া আসিবে? ভুল, ভুল, নিশ্চয়ই ভুল! উহাদের চোখের ভুল—মতিভ্রম! কালীনাথ নিজের মনেই হাসিয়া উঠিলেন—নিশ্চয় ভুল! এমন কথা না কি বিশ্বাস করিতে হইবে! ভূত বিশ্বাস করিবে ছোট ছেলেরা! কালীনাথ নিজের মনেই আর একবার হাসিয়া উঠিলেন—ভুল বৈ কি! নিশ্চয় ভুল!

কালীনাথ ফিরিলেন।

দীঘির পাশ দিয়া রাস্তা। এখানটায় অন্ধকার যেন আরো গাঢ় ; কালো জলের উপর ততোধিক কালো গাছের ছায়া পড়িয়া দীঘির গাম্ভীর্য যেন শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। হঠাৎ তাহার বাড়ীর দিকে নজর পড়িল :

উঠানের উপর যেখানটায় টগর গাছ ঠিক সেইখানে—গাছের তলায় কে যেন দাঁড়াইয়া আছে না? কালীনাথ ভাল করিয়া দেখিলেন : তবে তো মিথ্যা নয়—যাহা শুনিয়াছেন, সব সত্য! ধ্রুব সত্য! শৈলই তো বটে! আগে ঠিক যেমন ছিল, এখনো ঠিক তেমনি আছে।—কই, চেহারায় তো তাহার এতটুক পরিবর্তন হয় নাই!

কালীনাথ পা টিপিয়া টিপিয়া আগাইয়া গেলেন। শৈল এখনও দাঁড়াইয়া আছে। একবার কালীনাথের মনে হইল : স্বপ্ন নয় তো! যদি স্বপ্নই হয়! নিজের দেহ স্পর্শ করিলেন—চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন : না স্বপ্ন নয়—এতটুকু মিথ্যা নয়। তিনি ঠিক দেখিতেছেন। শৈল আসিয়াছে। শৈল—তাঁহার মেয়ে—যে মেয়েকে তিনি চুলকাটিতলার শ্মশানে নিজে পোড়াইয়া আসিয়াছেন! শৈল আসিয়াছে তবে! বিস্ময়ে আনন্দে ভয়ে সন্দেহে কালীনাথের মুখে কথা বন্ধ হইয়া গেছে—দেহে স্পন্দন থামিয়া গেল যেন।

শৈল আসিয়াছে—আসিয়াছে ঠিক! মিথ্যা সন্দেহ! যে চোখ দিয়া এতকাল কৃষ্ণনগরের কাছারীর কাজ করিয়াছেন সেই চোখ দিয়া কালীনাথ দেখিতেছেন। কতক্ষণ কাটিয়া গেল—এবার কালীনাথের সাহস আসিয়াছে!

আস্তে আস্তে কালীনাথ পিছনে গিয়া ডাকিলেন—শৈল—ওমা—

শৈল পিছন ফিরিল। কিন্তু মুখখানা দেখিয়াই অধিকতর বিস্ময়ে কালীনাথের পা হইতে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গের রক্ত-চলাচল যেন ক্ষণিকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল।

—আশা? তুই?—এখানে?—এত রাতে?—

আশার মুখে কথা নাই। কালীনাথ বুঝিলেন জ্বরের ঘোরে এমনি করিয়া এখানে আসিয়াছে। বলিলেন—চল্—ঘরে চল্—উঃ—গা যে পুড়ে যাচ্ছে একেবারে—

আশাকে ধরিয়া লইয়া কালীনাথ ঘরে যাইতেছিলেন ; কিন্তু গাছতলায় পুতুলের বাক্স দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

—এগুলো এখেনে কেন রে—এ বুঝি তোর দিদির—?

শেষে আশা সমস্ত ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া কালীনাথ হাসিয়া উঠিলেন।—দূর পাগলী—তাই কখনো হয়—সে কেন নিতে যাবে—? চল্ ঘরে শুবি চল্—ও থাক্—ওখেনেই পড়ে' থাক্—

ভোর হইতে তখনও বহু দেরী! আশার মনে হইল, এখনও সময় আছে! দিদি আসিবার এখনো ঢের সময় আছে!

দিদি সত্যসত্যই আসিয়াছিল বলিতে হইবে। আশা ভোরবেলা জানালা খুলিয়া দেখিল : গাছতলায় পুতুলের বাক্স নাই। আনন্দে আশার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হইয়াছে! দিদি তবে রাগ করে নাই!—অভিমান করে নাই!

আশা যেন নূতন মানুষ! একদিনেই তাহার যেন নূতন শক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। দিদির কাছে সে ঋণ-মুক্ত!—দিদি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে! সন্ধ্যার দিকে আশার জ্বর একেবারে ছাড়িয়া গেল।

আশা বলে—হ্যাঁ বাবা, রাতের বেলা আমরা যখন চলে এলাম না, দিদি তখনই এসেছিল—

কালীনাথ বলিলেন—তা' হ'বে—ভালই হয়েছে—যার জিনিষ সেই নিয়েছে—

সকাল বেলাই কালীনাথের যাবার কথা ছিল—কিন্তু গাড়ী পাওয়া গেল না। ভাবিয়াছিলেন রাত্রের গাড়ীতে যাইলেই হইবে!...সন্ধ্যাবেলা আশার জ্বর ছাড়িয়া যাওয়াতে ডাক্তার ডাকিবার দরকার হইল না। কালীনাথ নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের কাজে ফিরিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি দশটায় গাড়ী—সেইটাতেই যাওয়া। আশা তখন ঘুমাইতেছে।

সিদ্ধেশ্বরী গোছগাছ করিতেছিলেন—

—এই কাপড়টাতে আমসত্ত্ব বেঁধে দিলাম—বুঝেছ—ভাতের সঙ্গে রোজ খেও—আর এইটেতে সরের ঘি, আর দেখ, দুধ এ মাস থেকে এক সের করে' নিও—না খেলে—যে খাটুনি—

—আর গোপালের মা'কে এই থান্‌টা আর সিঁদুরে গাছের আমক'টা দেবে—তোমাকে কত যত্ন-আত্তি করে—আর এবার আসার সময় একখানা আট হাতি ধুতি এনো তো—ঠাকুর মশাইকে দেব—

—ওই দেখ—আসল জিনিষই ভুলে গেছি—তোমার মাথা ধরে বলো—এই মাদুলিটী আনিয়ে রেখেছি, আমাবস্যের দিন বাসিমুখে জল দেবার আগে এটা ধারণ কোর দিকি—মনে থাকবে তো—যে ভুলো মন তোমার—

সিদ্ধেশ্বরী প্রত্যেকটি পুঁটুলি বাঁধিতেছেন, আর প্রত্যেকবার তাহার বিশদ বিবরণ দিতেছেন—

—এই দেখ, যেটি না দেখব সেটিই—পাঁচকড়ির দরুণ যে মুগ্ এক কাঠা দেবার কথা ছিল না,—তা' কি দিয়েছে দেখ—বেগার-ঠেলার কাজ—

তার পর খানিক থামিয়া বলিলেন—ওটা কি—ওই যে পুঁটুলিটা—ওটাতে আবার কি?

কালীনাথ তাড়াতাড়ি পুঁটুলিটা নিজের কাছে সরাইয়া লইলেন।--না--না ওতে কিছু নেই, ও আমার দলিল-পত্তর,--ও কিছু না--

--দেখি--দেখি না--ওটা যদি খালি থাকে--গোটাকতক কাগ্‌জি-লেবু পুরে দি--দাও--

--না গো না--ওতে আমার দরকারী কাগজপত্তর আছে--কালীনাথ পুঁটুলিটা নিজের হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া রাখিলেন।

চারিদিকে বেশ অন্ধকার করিয়া আসিয়াছে ; বাহিরে নন্দ গাড়ী লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কালীনাথ গিয়া উঠিলেন--

--দুগ্যা, দুগ্যা--আশা কেমন থাকে লিখো, বুঝলে। গণেশ মাস্টারকে না পাও তো--ঘোষালদের কেষ্টকে একটা পয়সা দিলেই লিখে দেবেখন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল!

নন্দ বলিল--হুঁকো নিয়েছেন তো খুড়োমশাই, পথে যদি খান্--আমি তামাক্ এনেছি--জয়চণ্ডীপুরের গুড়-তামাক খেয়ে দেখ্‌বেনখন--অম্বুরিকে হার মানিয়ে দেয়--

গাড়ী টগর গাছ ছাড়িয়া--গাবগাছ-তলা দিয়া বড় সড়কে পড়িল। বাঁশঝাড় বাঁয়ে রাখিয়া দীঘির পাশ দিয়া রাস্তা। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার!

ছইএর ভিতর বসিয়া কালীনাথ সেই কাগজ-পত্রের পুঁটুলিটা খুলিলেন। কাগজপত্রের কথাটা মিথ্যা ; কালীনাথ প্রত্যেকটি পুতুল হাত দিয়া স্পর্শ করিলেন। পুতুলগুলি শৈলর। এই পুতুলগুলিই একদিন তিনি কত যত্নে মেয়ের জন্য কিনিয়া আনিয়াছেন--আজ এই গুলিই আবার নিজের হাতে ফেলিয়া দিতে হইবে। এই পুতুলগুলির জন্যই তো আশার যত অসুখ। আশার কথাগুলি কালীনাথের মনে পড়িল--হ্যাঁ বাবা, কাল রাতের বেলা আমরা যখন চলে' এলাম না, দিদি তখনই এসেছিল।--

কালীনাথের হাসি আসিল। কালীনাথ যে উহাকে কতখানি ঠকাইলেন তা' তো সে জানিল না। ছোট মেয়ে, এখনও বয়স কম--সব বুঝিতে শেখে না। ভূত তো উহারাই বিশ্বাস করিবে। যে মরিয়া যায় সে আবার আসে না কি। উহাদের মনের ভুল। কালীনাথ তাহাকে নিজে চুলকাটিতলার শ্মশানে গিয়া পোড়াইয়া আসিয়াছেন। তাহার দেহ তিল তিল করিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেছে--এ কালীনাথের স্বচক্ষে দেখা! ভুল বৈ কি!--নিশ্চয় ভুল!

--নন্দ, দীঘির পাড়ে গাড়ীটা একবার থামিও দিকি--একটু নাব্‌বো--

নন্দ গাড়ী থামাইল। বলিল--হুঁকোয় জল ফিরিয়ে নেবেন বুঝি--নিন্--ও-কথা আমার মনেই ছিল না আজ্ঞে--

কালীনাথ পুঁটুলিটা লুকাইয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। দীঘির পৈঁঠা দিয়া নীচে নামিতে নামিতে কালীনাথের মনে হইল কেহ কোথাও নাই তো চারিদিকে। নন্দরও দেখিতে পাইবার কথা নয়।

কিন্তু ফেলিতে গিয়া কালীনাথের হাত যেন কাঁপিয়া উঠিল। আহা, একজনের কত আদরের, কত সাধের জিনিষগুলি।--ফেলিতে তাঁহার যেন কেমন মায়া হইল। আবার মনে হইল : না, যে বাঁচিয়া নাই, তা'র জিনিষ রাখিলেই বা কী--আর না-রাখিলেই বা কি! ওই পুতুলগুলার জন্যই যে আশার যা অসুখ। কালীনাথ হাত উঁচু করিলেন--কেবল ছাড়িয়া দিলেই হয় ; ছাড়িয়া দিলেই ছলাৎ করিয়া একবার শব্দ হইবে--তার পর জলের উপর কয়েকটা ঢেউ উঠিবে, তারপর? তারপর কোন্ অতল তলায় তলাইয়া যাইবে, তা'র কি ঠিক আছে? কিন্তু কালীনাথের উঁচু করা হাত উঁচুই রহিল ; পুঁটুলিটা যেন তাঁহার হাতের সঙ্গে আঁটিয়া গিয়াছে। না, এ তিনি ফেলিতে পারিবেন না কখনও। কোন্ প্রাণে ফেলিবেন? এইগুলির সাথে একজনের কত স্মৃতিই জড়িত রহিয়াছে। যে। কিন্তু এইগুলি দেখিলেই আবার আশার জ্বর হইবে--শৈলর মতন সে-ও তাহাকে কাঁদাইয়া চলিয়া যাইবে।

আকাশ বাতাস পৃথিবী সব কিসের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। এই বুঝি গেল। কিন্তু কালীনাথ বজ্রমুষ্টিতে পুঁটুলিটা ধরিয়া রহিলেন। কে তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইবে—কাহারো সাধ্য নাই।

—কাহারো সাধ্য নাই। আকাশ বাতাসে তাহারই প্রতিধ্বনি উঠিল—না—নাই! কাছেই কোথায় একটা ঝিঁ ঝিঁ পোকা অনবরত ডাকিয়া চলিয়াছে ; বাঁশঝাড়ের ভিতর ছোট একটি ফাঁক দিয়া কতদূরে আকাশের একটি তারা যেন অপলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে! উহার মুখে উৎকণ্ঠা—চোখে আশঙ্কা—থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। মাথা নাড়িয়া বলিতেছে, না—না—ফেলিও না। কালীনাথের মুখ চোখ দৃঢ় গম্ভীর হইয়া উঠিল।—এ তিনি ফেলিবেন কেমন করিয়া? একজনের কত আদরের, কত সাধের জিনিষগুলি!

নন্দ উপর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল—খুড়োমশাই, একটু বেশী করে' জল নেবেন হুঁকোয়—তামাকের হাতটা অম্‌নি ধুয়ে নেব—

হঠাৎ কি হইয়া গেল! কালীনাথ দেখিলেন—তাঁহার হাত হইতে পুঁটুলিটা পড়িয়া গিয়াছে। পড়িবামাত্র ছলাৎ করিয়া একটা শব্দ হইল।

কালীনাথের মনে হইল : মর্ম্মস্থলে বড় আঘাত পাইয়া কে যেন সহসা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিল। কালীনাথের মাথা হইতে পা পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। যে ঝিঁ ঝিঁ পোকাটা এতক্ষণ ডাকিতেছিল সে হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। বাঁশঝাড়ের ভিতর ছোট তারাটি যেন তাহার দিকে চাহিয়া বড় করুণ স্বরে বলিল—'করিলে কি?' আবার জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সেই কথারই প্রতিধ্বনি উঠিল—'করিলে কি?' দীঘির পাড়ে নলখাগড়ার বনে চঞ্চল মর্মরধ্বনি উঠিল ; কালীনাথের মনে হইল : তাহার পায়ের কাছে দীঘির জল যেন পৈঁঠার উপর মাথা কুটিয়া তাঁহাকে কত কি নিবেদন করিতেছে!

উপায় নাই—এতক্ষণ সেগুলি কোন্ অতল জলে তলাইয়া গিয়াছে তা'র কি ঠিক আছে?

কালীনাথ যে কখন গাড়ীতে উঠিয়াছেন, এবং কখন যে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে—সে জ্ঞান তাঁহার তখন ছিল না। তাঁহার মনে হইতেছিল : এত বড় অপরাধের ক্ষমা নাই—ক্ষমা নাই তাঁহার। তাঁহার চোখের সমুখ হইতে যেন চির-পরিচিত পর্দা সরিয়া গেছে!

নন্দর কথায় তাঁহার যেন চৈতন্য হইল।

নন্দ বলিতেছে—বুঝলেন খুড়োমশাই—এই সিঁদুরের আমগাছটা পেরোলেই—ছিলিম ধরাবো—এখানে নয়—বলা তো যায় না—ওঁদের একটু ভয়-ভক্তি করে চলতে হয়—নইলে, বদনগঞ্জের একাদশী বিশ্বেসের কি হয়েছিল, জানেন তো?—পা থেকে মাথা পর্যন্ত একেবারে—

বদনগঞ্জের একাদশী বিশ্বাসের যাহাই হউক, কালীনাথের আজ সত্যই পা হইতে মাথা পর্যন্ত কাঁপিতেছিল!

অগ্রহায়ণ ১৩৪০

আত্মহত্যা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

শকুন্তলা প্রদীপটি জ্বালিয়া লইয়া ঘরে সন্ধ্যা দিয়া বেড়াইতেছিল, সহসা সন্ধ্যা আসিয়া সংবাদ দিল, দিদি অমলদা আসছে!

মুহূর্তের জন্য শকুন্তলার মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াই একেবারে ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। চৌকাঠের উপরই দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে কহিল, সে কি রে?...ধ্যেৎ!

হ্যাঁ গো দিদি, সত্যি। ঐ গলির মোড় পেরোচ্ছে দেখে এলুম, তুমি জান্‌লা দিয়ে দেখো না, এতক্ষণে বোধহয় এসে পড়েছে—

কিন্তু জানলা দিয়া আর দেখিতে হইল না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি অত্যন্ত সুপরিচিত কণ্ঠের ডাক শকুন্তলার কানে আসিয়া পৌঁছিল, আরে, এরা সব গেল কোথায়—ও সন্ধ্যা, বাড়ী ছেড়ে ভাগ্‌ল নাকি?

শকুন্তলা অকস্মাৎ যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল একবার নিজের পরনের কাপড়টার দিকে আর একবার আসবাবগুলার দিকে চোখ বুলাইয়া লইয়া চাপা-আকুল কণ্ঠে কহিল, সন্ধ্যা লক্ষ্মী দিদি আমার, ওকে একটু ছাদে বসা, হঠাৎ যেন ঘরে আনিস নি—যা ভাই! এবং পরক্ষণেই প্রায় ছুটিয়া আর একটা ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সন্ধ্যা কিন্তু তখনই নীচে নামিতে পারিল না, দিদির এই আকস্মিক ভাবান্তরের কোন কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া কতকটা মূঢ়ের মতই দাঁড়াইয়া রহিল। অমল তাহার বড়দিদির দেওর এবং এ বাড়ীর সকলেরই প্রিয় অতিথি। বিশেষ করিয়া. সন্ধ্যা তাহার জ্ঞান হইবার পর হইতেই দেখিয়া আসিতেছে যে, এই প্রিয়দর্শন এবং প্রিয়ভাষী তরুণটিকে দেখিলে তাহার মেজদি একটু বেশীই খুশী হয়। তাহার জ্ঞান অবশ্য বেশী দিন হয়ও নাই—বছর দুই-তিন হইবে—কিন্তু তখন ছিল অমল কিশোর মাত্র, এখন সে যৌবনে পা দিয়াছে, যদিও তাহার মুখের মধ্য হইতে কৈশোরের কমনীয়তা এখনও বিদায় লয় নাই, দেখিলেই কেমন একটা স্নেহের সঞ্চার হয় মনে মনে। সন্ধ্যাও 'অমলদা'কে ভালবাসিত, সুতরাং সে অনেক দিন পরে তাহাকে দেখিতে পাইয়া খুশী মনেই দিদিকে সংবাদটা দিতে আসিয়াছিল—হঠাৎ দিদির এই অদ্ভুত আচরণে অত্যন্ত দমিয়া গেল—কেমন যেন একটা অপ্রস্তুতভাবে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। ততক্ষণে অমলই উপরে উঠিয়া আসিয়াছে। আন্দাজে আন্দাজে ছাদটা পার হইয়া একেবারে দুয়ারের কাছে আসিয়া কহিল, এ কী রে, এখানে এমন চুপটী ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ভূত দেখেছিস নাকি? মাউই-মা কৈ? আর তোর মেজদি—?

সন্ধ্যা ঢোঁক গিলিয়া কহিল, মা গা ধুতে গেছেন আর মেজদি সন্ধ্যে দিচ্ছে—আ—আপনি বসুন না অমলদা। চলুন, আমি মাদুর পেতে দিচ্ছি ছাদে—

ইস! ভারী যে খাতির করতে শিখেছিস্ দেখছি। যা যা, আর মাদুর পাততে হবে না, আমি এখানেই বসছি।

সন্ধ্যা কোন প্রকার বাধা দিবার পূর্বেই সে সেই প্রকাণ্ড ভাঙ্গা তক্তাপোষটায় অতিশয় মলিন শয্যার উপরেই বসিয়া পড়িল। কহিল, আমার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না, এখন তোমার মেজদিকে সংবাদ দাও, তিনি দয়া ক'রে আমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে

যান্। তাঁকে বলো যে এ ঘরটাও তাঁর সন্ধ্যে দেওয়ার এলাকার মধ্যে পড়ে—

কিন্তু ইহার পূর্বের একটা ইতিহাস আছে ; প্রায় সব গল্পেরই থাকে।

শকুন্তলার বাবা হরিপ্রসাদবাবুরা চার ভাই, তাহার মধ্যে হরিপ্রসাদ এবং তাঁহার মেজো ভাই জ্যোতিপ্রসাদ উপার্জন করিতেন, আর দু-ভাই দেশের বাড়ীতেই বসিয়া খাইতেন। জমিজমা যাহা কিছু ছিল তাহাতে ভাতটা হইত, বাকী হরিপ্রসাদ জ্যোতিপ্রসাদের অনুগ্রহে চলিত। হরিপ্রসাদ কাজ করিতেন ভালই, প্রায় শ'খানেক টাকা মাহিনা পাইতেন। কিন্তু মানুষটি খুব সৌখীন ছিলেন বলিয়া সঞ্চয় প্রায় কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই। কলিকাতায় বাসা ভাড়া দিয়া, এখানে মাসিক দশ টাকা হিসাবে পাঠাইয়া, ভাল মাছ এবং ল্যাংড়া আম খাইয়া, ছেলেমেয়েদের ভাল কাপড়-জামা পরাইয়া ও স্কুলের খরচ জোগাইয়া বরং প্রতি মাসে তাঁহার কিছু ঋণই হইত। বলা বাহুল্য যে জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহে যে ঋণ তিনি করিয়াছিলেন তাহার কিছুই শোধ দিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে উন্নতির আশা ছিল, হয়ত বা সেই উন্নতির পথ চাহিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন, ইহারই মধ্যে যে জীবনের অধ্যায়ে পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে তাহা তিনি ভাবেন নাই।

কিন্তু কার্যত তাহাই ঘটিল। হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে যখন তিনি মারা গেলেন তখন শ্মশান খরচার জন্যই অলঙ্কার বাঁধা দিতে হইল। অফিসে যে ঋণ ছিল তাহাতেই প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা শেষ হইয়া গেল। গৃহিণীর সামান্য অলঙ্কার জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহেই গিয়াছিল, কন্যাদের কাহারও ও বস্তু ছিলই না--সুতরাং ঘটি-বাটী বেচিয়াই, বলিতে গেলে, স্বামীর শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া ভদ্রমহিলা দুই কন্যা ও এক শিশু পুত্রের হাত ধরিয়া দেশের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

হরিপ্রসাদের ভাইয়েরা অকৃতজ্ঞ নন্, তাঁহারা যথাসাধ্য যত্নের সহিতই ইঁহাদের গ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের সাধ্য আর কতটুকু? জ্যোতিপ্রসাদ ভাইদের যা সাহায্য করিতেন তাহার উপর আর পাঁচটি টাকা বাড়াইয়া দিলেন, তাহার বেশী আর তাঁহার সাধ্য ছিল না। কিন্তু তাহাতে চারিটি প্রাণীর ভরণ-পোষণ চলে না। শকুন্তলা সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িতেছিল তাহার আর সন্ধ্যার পড়াশুনা বন্ধ হইলই, তাহাদের ছোট ভাই অভয়েরও লেখাপড়া শিখিবার কোন সম্ভাবনা রহিল না। শুধু উদরান্নের জন্যই শকুন্তলা ও তাহার মায়ের অনেকগুলি ভাল ভাল সাড়ী আবার দোকানে চলিয়া গেল। শকুন্তলার ভগ্নিপতির অবস্থাও এমন কিছু সচ্ছল নয়, আর সেখানে হাত পাতাও তাহাদের আত্মসম্মানে বাধে।

এ আজ প্রায় মাস দুয়েকের কথা। ইহার মধ্যে জামাতা বিমল বার দুই ইহাদের খবর লইতে আসিলেও অমল আসিতে পারে নাই। তাহার পরীক্ষা ছিল সামনে, সেইজন্যে সে কলিকাতাতেই থাকিত, দেশে আসিবার তাহার প্রয়োজনও ছিল না। কলিকাতায় থাকিতে সে প্রায় নিয়মিতভাবেই ইহাদের বাড়ীতে আসিত, শকুন্তলার সহিত তাহার একটা বেশ সখ্যের সম্বন্ধই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। শকুন্তলার পড়াশুনায় আগ্রহ ছিল খুব বেশী, অমলের দ্বারা সেদিকে অনেকটা সাহায্য হইত, অমলেরও এই প্রিয়ভাষিণী বুদ্ধিমতী মেয়েটির সাহচর্য ভালই লাগিত--যদিচ রূপগৌরব শকুন্তলার বিশেষ ছিল না।

এ-হেন অমলকে আজ এতদিন পরে আসিতে দেখিয়া শকুন্তলা বিব্রত হইয়া পড়িল তাহার কারণও ঐ দারিদ্র্য। অমল ছেলেটিও সৌখীন, যেমন আর পাঁচজন কলেজের ছেলে হইয়া থাকে—সিল্কের পাঞ্জাবী—স্নো--পাউডার—হাতঘড়ির একটা পুতুল। বিশেষ করিয়া ইদানিং যখন সে শকুন্তলাদের বাড়ীতে আসিত তখন তাহার প্রসাধনের পারিপাট্য আর একটু বৃদ্ধি পাইত। সেই অমলকে এই অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে কল্পনা করিয়া শকুন্তলা লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। শুধু কি তাই, তাহার নিজের পরণে যে কাপড়টা আছে সেটাও

বোধ হয় পনেরো দিন সাবানের মুখ দেখে নাই--পয়সার অভাবে সোডা-সাজীমাটীও আনানো যায় নাই।

সে এপাশের ঘরে আসিয়া ব্যাকুলভাবে আল্‌নার দিকে চাহিল। না, ভদ্র কাপড় একখানাও নাই। হয়ত এখনও বাক্সটা খুঁজিলে একখানা ফরসা কাপড় বাহির হইতে পারে কিন্তু তাহার চাবীও মায়ের কাছে, তাছাড়া মাকে কৈফিয়ৎই বা কি দিবে? মা যদি হঠাৎ বলিয়া বসেন যে, 'অমল ঘরের ছেলে, ওকে দেখে ফরসা কাপড় পরবার কি দরকার হ'লো?' তখন কি বলবে সে?...

অকস্মাৎ শকুন্তলার আপাদমস্তক ঘামিয়া উঠিল। এপাশে একটা ঈষৎ জীর্ণ নীলাম্বরী সাড়ী আল্‌নার উপর কোঁচানো আছে বটে কিন্তু সেটাও কয়েক দিন ব্যবহারের পর তুলিয়া রাখার ফলে তেলে-ময়লায় দুর্গন্ধ ছাড়িয়াছে--অথচ যেটা সে পরিয়া আছে সেটা এতই ময়লা যে কোনমতে ঘরের লোকের কাছেও পরিয়া থাকা যায় না। নীলাম্বরীতে দুর্গন্ধ হইলেও ময়লা বোঝা যায় না, এই একটা সুবিধা--

পাশের ঘর হইতে অমলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল ব্যাপার কি? তোমার মেজদি আর নরলোকের মুখদর্শন করবেন না নাকি? হলা, সখি শউন্তলে, দীনজনকে দয়া করো--এঘরেও একটা আলো দাও!

কানের কাছটা অকারণেই শকুন্তলার গরম হইয়া উঠিল। শকুন্তলা নামটা লইয়া অমল যতদিন, যতবারই ঠাট্টা করিয়াছে, ততবারই শকুন্তলা এম্‌নি একটা উষ্ণতা অনুভব করিয়াছে--এবং কে জানে কেন ততবারই তাহার মনে হইয়াছে যে অমল নিজেকে দুষ্মন্ত বলিয়া পরিহাসটা সম্পূর্ণ করিতে চায় কিন্তু পারে না, লজ্জায় বাধে--

সে প্রায় মরিয়া হইয়াই নীলাম্বরীটা টানিয়া লইল। কিন্তু না, এ বড়ই দুর্গন্ধ. বহু দূর হইতেও পাওয়া যাইবে!...অগত্যা সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আরক্তমুখে লণ্ঠনটা লইয়া সেই অবস্থাতেই এ ঘরে পা দিল।

আরে আসুন, আসুন, দেবী শকুন্তলে! তবু ভাল যে অভাজনদের মনে পড়ল--

কিন্তু এই চাপল্য এবং অমলের পারিপাট্যযুক্ত প্রসাধন এই আবহাওয়ার মধ্যে এতই বেমানান্ ঠেকিল, অন্তত শকুন্তলার কাছে যে, সমস্ত ব্যাপারটা যেন চাবুকের মত আহাকে আঘাত করিল। জরাজীর্ণ প্রকাণ্ড ঘর, বোধহয় ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাহাতে চূণের কাজ পর্যন্ত হয় নাই--জানলা দরজার অর্ধেক নাই--আর তাহারই মধ্যে পায়াভাঙ্গা বিরাট এক তক্তাপোষ কোন মতে সাজানো ইঁটের উপর দেহরক্ষা করিয়া ঘরের অর্ধেকটা জুড়িয়া আছে। তাহার উপর কয়েকটী কাঁথা ও তোষকের অতিশয় মলিন একটা শয্যা এবং তাহারও উপরে অসংখ্য ছারপোকার দাগে কলঙ্কিত একটা শত-ছিন্ন মশারী খানিকটা খোয়াতে বিচিত্রিত। এ পাশে একটা ভাঙ্গা র‍্যাকে শকুন্তলার পিতামহের আমলের খানকতক পুঁথি ও বই কীটদষ্ট ও ধূলিমলিন অবস্থায় স্তূপাকার করা. ওধারে বিভিন্ন তাকে কতকগুলা ডেয়ো-ঢাক্‌না, ভাঙ্গা ফুটা জিনিষের বিচিত্র সমাবেশ। সমস্তটা জড়াইয়া এমনই শ্রীহীন এবং লজ্জাকর যে নিমেষমাত্র সেদিকে চাহিয়া লজ্জায় অপমানে শকুন্তলার মুখটা প্রথমে আরক্ত পরে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কিছুতেই মুখ তুলিয়া অমলের দিকে চাহিতে পারিল না ; ঘরে ঢুকিবার সময়েই একবার শুধু সিল্কের পাঞ্জাবী সোনার বোতাম এবং রূপালী ঘড়ির একটা মিলিত দীপ্তি বিদ্যুৎ-ঝলকের মত চোখের সম্মুখ দিয়া খেলিয়া গিয়াছিল কিন্তু মানুষটার দিকে সে চাহিতে পারে নাই। সে লণ্ঠনটা ঘরের মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়া কোনমতে ঢোক গিলিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, অমলদা, ভাল আছেন? বসুন, মাকে ডেকে দিচ্ছি--

তাহার পরক্ষণেই, অমল কোন কথা বলিবার পূর্বেই সে দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অমল অত্যন্ত বিস্মিত হইল, এই মেয়েটি বিশেষ করিয়া তাহার আগমনে খুশী হয়,

খুশী কেন উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, ইহাই সে জানিত, কিন্তু আজ এ কী হইল? সে যতটা সম্ভব পুরাতন দিনের কথা ভাবিয়া দেখিল, কৈ শকুন্তলার রাগ করিবার মত ত কোন ঘটনা ঘটে নাই।...সে তাহার দাদার মুখে ইহাদের অবস্থার কথা সবই শুনিয়াছিল, সুতরাং দারিদ্র্যের এই শোচনীয় রূপ তাহাকে আঘাত করিলেও বিস্মিত করিতে পারে নাই, কাজেই এইটাই যে শকুন্তলার ভাবান্তরের কারণ হইতে পারে, তাহা তাহার একবারও মনে হইল না।

শকুন্তলা নীচে নামিয়া আসিয়া কুয়াতলাতে গিয়াই মাকে সংবাদ দিল, মা, অমলদা এসেছেন!

কে এসেছেন? অমল? ও—আমাদের অমল! একজামিন দিয়ে দেশে এসেছে বুঝি!...বসাগে যা তুই, আমার হয়ে গেছে আমি যাচ্ছি—। কতদিন দেখিনি ছেলেটাকে!

শকুন্তলা তবুও দাঁড়াইয়া রহিল। মায়ের আর একটা দরকারী কথা মনে পড়িল, কহিলেন, ঘরে ত বিশেষ কিছু নেই। দ্যাখ্ দিকি, কৌটোটায় চারটি সুজি পড়ে আছে কিনা, তাহ'লে উনুনটা ধরিয়ে একটু সুজি ক'রে দে, আর এক পেয়ালা চা—। ভাগ্যিস্ খোকার দুধটা সাবুর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলি নি—

অকস্মাৎ শকুন্তলার কণ্ঠস্বর তীব্র হইয়া উঠিল, তুমি কি পাগল হ'লে মা? ঐ ঘি-হীন সুজি, আর ঐ জঘন্য চা--ও আর খাওয়াবার চেষ্টা ক'রো না। ওসব হ্যাঙ্গাম ক'রে কাজ নেই।

মা অবাক হইয়া কিছুক্ষণ মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, পাগল আমি হয়েছি, না তুই হয়েছিস? অমল আমার পেটের ছেলের মত, ওর কাছে আবার লজ্জা কি? আর ও না জানেই বা কি?...ওর কাছে আমার ঢাকবার ত দরকার নেই কিছু।...মেয়ের যত বয়স বাড়ছে তত যেন ন্যাকা হচ্ছেন। যাও, যা বলছি তাই করো গে—

মায়ের মেজাজ শকুন্তলা জানিত, প্রতিবাদ তিনি একদম সহিতে পারেন না। অগত্যা রান্নাঘরে গিয়া উনানে আঁচ দিবার চেষ্টা করিতে হইল ; কিন্তু তাহার যেন ইচ্ছা হইতেছিল ছুটিয়া কোথাও চলিয়া যায় কিংবা কুয়াতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাহার মন, তাহার দেহ সব যেন কেমন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। আর কিছুরই বোধ ছিল না, শুধু অনুভূতি ছিল একটা দুর্নিবার লজ্জার—

সে উনানে আগুন দিয়া বাহিরে আসিল না, ধোঁয়ার মধ্যেই বসিয়া রহিল। অমল বি, এ পড়িতেছে, খুব সম্ভব পাশও করিবে, সে সুশ্রী, সচ্চরিত্র—সুতরাং তাহার বাবা যে বিবাহে রীতিমত অর্থ দাবী করিবেন তাহা সুনিশ্চিত। শকুন্তলার সহিত তাহার বিবাহের যে কোন সম্ভাবনা নাই তাহা শকুন্তলা নিজেই জানিত ; শুধু রূপা নয়, অমলের বাবা ছোট ছেলের বিবাহে রূপও চান। সে কথা কখনও বোধ হয় শকুন্তলা ভাবেও নাই, আশা করা ত দূরের কথা। তবু, তবু, আজ কে জানে কেন তাহার মনে হইতে লাগিল যে তাহার বুকের অনেকখানি যেন কে দলিয়া পিষিয়া নির্মমভাবে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তীব্র একটা আশাভঙ্গের বেদনাতে তাহার চিত্ত যেন মূর্ছাহত!

তবে কি, তবে কি মনের অজ্ঞাতসারে মনেরই কোন সঙ্গোপনে তাহাদের বাড়ী আসিত, সেই সব দিনের কথা মনে পড়িল। অমলের কাছে সে পড়া বলিয়া লইত, অমল সেই পাঠচর্চার সঙ্গে সঙ্গে চালাইত সাহিত্যচর্চা! প্রকাশ্যে সকলকার সামনেই চলিত তাহাদের গল্প, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কৈ, কখনও ত প্রণয়ের আভাসমাত্র তাহাদের কথাবার্তায় প্রকাশ পায় নাই। দুই-একবার সে অমলের সঙ্গে একা বেড়াইতেও গিয়াছে, একবার বোটানিক্যাল গার্ডেনে, আর একবার দক্ষিণেশ্বরে—কিন্তু তখনও ত কেহ রঙ্গীন হইয়া উঠিবার চেষ্টা করে নাই। অমল তাহাকে বলিত—বন্ধু, সেই বন্ধুত্বেতেই তাহারা সুখী ছিল। তবে? কোথাও কি, কোন কল্পনাতে তাহার রঙ্ ধরে নাই?...

অকস্মাৎ তাহার গণ্ডকপোল উত্তপ্ত করিয়া বাবার অসুখের পূর্বে শেষ নিভৃত দিনটির কথা তাহার মনে পড়িল। অনেক রাত্রে অমল বাড়ী ফিরিতেছিল, সে এক হাতে পান আর এক হাতে আলো লইয়া সদর দরজা পর্যন্ত তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। বিদায়ের আগে পান দিতে গেলে অমল হাত পাতিয়া লয় নাই, তাহার হাতটা ধরিয়া নিজের মুখের কাছে পানসুদ্ধ হাতটা তুলিয়া ধরিয়াছিল ; অগত্যা শকুন্তলা পানটা তাহার মুখে পুরিয়া দিতে যায়, আর সেই সময় দিয়াছিল অমল তাহার আঙ্গুলে ছোট্ট একটি কামড়। সামান্য ঘটনা, ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়, ছেলেমানুষি অমল অহরহই করিত—তবু শকুন্তলা সেদিন ঘামিয়া উঠিয়াছিল, বহুরাত্রি পর্যন্ত ঘুমাইতে পারে নাই।

ভাবিতে ভাবিতে আরও একটা কথা তাহার মনে পড়িল, ঐ শেষের দিকেই, আকস্মিক বজ্রপাতে তাহাদের সুখের বাসা পুড়িয়া যাইবার ঠিক আগেই, রসিকতার ছলে অমল দিয়াছিল তাহার বাহুমূলে সজোরে এক চিম্‌টি। তখন সে আর্তনাদ্ করিয়া উঠিয়াছিল বটে, মায়ের কাছে নালিশ করিতেও ছাড়ে নাই—কিন্তু তবু, তাহার বেশ মনে আছে, সেই বেদনাটা তাহার যেন ভালই লাগিয়াছিল এবং সেই কালশিরার দাগটা মিলাইয়া যাইতে সে যেন একটু ক্ষুণ্ণই হইয়াছিল—

সহসা তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইল অমলেরই কণ্ঠস্বরে, কিন্তু এর আজ হ'লো কি?

পরক্ষণেই রান্নাঘরের দোরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ও মা গো, এই একঘর ধোঁয়ার মধ্যে চুপটি ক'রে বসে আছে! পাগল নাকি? এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া একটা হাত ধরিয়া তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিল। শকুন্তলা ইহার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, সে এই আকর্ষণের বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া একেবারে গিয়া পড়িল অমলের ঘাড়ে। মুহূর্ত মাত্র, তাহার পরই সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল কিন্তু তাহার দেহ-মনের এই আঘাতের আকস্মিকতা তাহাকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কঠিন স্বরে বলিল, আমরা গরীব ব'লে কি আমাদের মান-ইজ্জৎও থাকতে নেই মনে করেন?

এ কী হইল? অমল নিজেই ব্যাপারটার জন্য অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল সত্য কথা, কিন্তু এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বিশেষত এমন ঘটনা আগেও বহু ঘটিয়াছে, শকুন্তলা রূঢ় কখনই হয় নাই। মৃদু অনুযোগ করিয়াছে, হয়ত বা একটা চড় চাপড়ও দিয়াছে, অধিকাংশ সময়েই উহাকে ছেলেমানুষী বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। কি-

অমল আহত কণ্ঠে কহিল, ছি!...তোমার আজ হয়েছে কি বলো ত! এমন করছ কেন?

বহুক্ষণের অপমান, লজ্জা, বেদনায় তাহার কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল তবু সে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া কহিল, কিছু হয়নি আমার, আপনি যান, ঘরে গিয়ে বসুন গে, আমি যাচ্ছি—

সে আবার রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল। উনান তখন প্রায় ধরিয়া আসিয়াছে, জোর করিয়া সে কাজে মন দিল—

একটু পরেই মা আসিয়া বলিলেন, ওরে সন্ধ্যা, তোর অমলদাকে এই ছাদেই একটা মাদুর দেনা, এখানে বসুক—ঘরে যা গরম!...চা হ'লো শকুন্তলা?

অমল মৃদুকণ্ঠে জানাইল, চা থাক্ না মাউই-মা, ওসব আবার হাঙ্গামা কেন?

মায়ের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল, হাঙ্গামার আর সামর্থ্য কোথায় বাবা, এখন শুধু একটু চা দেওয়া, তাই কষ্টকর! কিন্তু তাও যদি তোমাদের সামনে একটু না দিতে পারি ত বাঁচব কি ক'রে?

অমল আর কথা কহিল না। মা রান্নাঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, আর কত দেরী রে?

শকুন্তলা ক্লান্তসুরে কহিল, তুমি একটু ক'রে দাও না মা, আমার শরীরটা বড্ড খারাপ

লাগ্‌ছে—

মা উদ্বিগ্নভাবে তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, কি হ'লো আবার তোমার? পারি না বাবা ভাবতে—

শকুন্তলা কথার জবাব না দিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া বিনাবাক্যে অমলকে পাশ কাটাইয়া নীচে নামিয়া গেল। মা হালুয়া ও চা প্রস্তুত করিতে করিতে অনেক কথাই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, অমল কিন্তু একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে কী ইহারই জন্য এই দীর্ঘ ছয়মাস দিন গণিয়াছে! শকুন্তলা যে তাহার মনের কতখানি জুড়িয়া বসিয়াছিল তাহা এই দীর্ঘদিন বিচ্ছেদের আগে বুঝিতে পারে নাই ; তাহারা দেশে চলিয়া আসিবার পর কলিকাতার আকাশ-বাতাস যখন বিবর্ণ-বিস্বাদ ঠেকিল তখনই প্রথম বুঝিতে পারিল। কিন্তু তখন আর দেশে ফিরিবার কোন অজুহাতই ছিল না বলিয়া কোনমতে তাহাকে এই দিনগুলি কাটাইতে হইয়াছে। সবার গোপনে নির্জনে বসিয়া সে দিনের পর দিন স্বপ্ন দেখিয়াছে, আবার কবে প্রথম এই মধুরভাষিণী মেয়েটির দেখা পাইবে! অথচ—

সে অনেক ভাবিয়াও নিজের কোন অপরাধ খুঁজিয়া পাইল না। মনে পড়ে কলিকাতা ছাড়িয়া আসিবার দিনটিতে সে স্টেশন পর্য্যন্ত উহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াও শকুন্তলা কত গল্প করিয়াছে, মায় সাহিত্যচর্চা পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। শরৎবাবুর কী একখানা উপন্যাস দেশে ফিরিবার সময় অমলকে সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিয়াছিল অমল সেকথা ভোলে নাই, বই কিনিয়াই আনিয়াছে। বিদায়ের পূর্বে অমলই যেন একটু মুষড়াইয়া পড়িয়াছিল, শকুন্তলা তাহা লক্ষ্য করিয়া নানা হাস্য-পরিহাসে শেষমুহূর্তগুলিকে উজ্জ্বল ও সহজ করিয়া তুলিয়াছিল। কোথাও ত কোন অসঙ্গতি, কোন ছন্দপতন হয় নাই! তবে?

শকুন্তলার কাকীমা কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন ; তিনি ফিরিয়া আসিয়া অমলের পাশে বসিলেন, তাঁহার ছেলেমেয়েরাও ঘিরিয়া ধরিল। এই ছেলেটি এ বাড়ীর সকলেরই প্রিয়—অনেকদিন পরে তাহাকে পাইয়া তাঁহারা কলরব করিয়া উঠিলেন। কিন্তু অমলের তখন এসব অসহ্যবোধ হইতেছে, সে যেন পলাইতে পারিলে বাঁচে। কোথাও নির্জনে বসিয়া তাহার একটু দম ফেলা দরকার—

চা ও খাবার শীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিল, তাহার তখন খাইবার মত অবস্থা নয়, তবু পাছে সন্ধ্যার মা ক্ষুণ্ন হন, তাই কোনমতে খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

এরই মধ্যে চললে বাবা?

হ্যাঁ মাউই-মা, আবার কাল আসব। আজই এসেছি, গরমে ট্রেনে বড় কষ্ট হয়েছে। সকাল করে শুয়ে পড়ব।

তাহ'লে এস বাবা, আর দেরী ক'রো না।

অমল একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, শকুন্তলাকে ত দেখতে পাচ্ছি না, তার জন্যে এই বইটা এনেছিলুম—

কী জানি বাবা, তার আবার কি হ'লো আজ!...ওরে সন্ধ্যা, এই বইটা তুলে রাখ্ ত—মেজদির বই।—আর বই, এখানে এসে ও পাট ত নে-ই একেবারে। এখন কি ক'রে যে জাতধর্ম বাঁচবে তাই শুধু ভাবছি বাবা, একটা দোজ-বরে তেজ-বরে পেলেও বেঁচে যাই—

কথাটা সজোরে অমলকে আঘাত করিল। এ ব্যাপারটা সে ভাবেই নাই। সত্যই ত, শকুন্তলার বিবাহের বয়স ত অনেকদিনই আসিয়াছে—

সে 'তাহ'লে আসি' বলিয়া নীচের দিকে পা বাড়াইল। আশা ছিল বিদায়ের পূর্বেও অন্তত শকুন্তলার দেখা মিলিবে, কিন্তু কোথাও তাহার কোন সম্ভাবনা রহিল না।

ওরে তোর অমলদাকে আলোটা দেখালি না? মা কহিলেন।

না, আলোর দরকার নেই, আলো রয়েছে—

অমল তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিল। নীচের তলাটা যেমন অন্ধকার তেম্‌নি ভাঙ্গা ও স্যাঁৎসেতে। এখানে প্রায় কেহই থাকে না, শুধু কাঠ-কুটা আবর্জনা রাখা হয়। সেখানে সে কাহাকেও দেখিবার আশা করে নাই, কিন্তু একেবারে সদরের কাছে গলিপথটায় গিয়া দেখিল একটি কেরোসিনের ডিবা পাশে রাখিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে শকুন্তলা, দৃষ্টি তাহার কম্পমান দীপ-শিখার উপর নিবদ্ধ।

অমল কাছে যাইতেই সে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অমল আরও কাছে আসিয়া তাহার স্বেদসিক্ত হাত দুইটি জোর করিয়া নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া কহিল, কী হয়েছে কিছুতেই বলবে না কুন্তলা? কেন তুমি এমন বিরূপ হয়ে রইলে আমার ওপরে?

কুন্তলা! অমলের আদরের ডাক। অকস্মাৎ একটা প্রবল কান্না যেন শকুন্তলার কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। ক্ষীণ আলোক, তবু তাহাতেই অমলের চক্ষু দুইটি বড় করুণ, বড় অসহায় ঠেকিল। শকুন্তলার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল কিন্তু সেই করুণ দৃষ্টির পিছনে যে সিল্কের পাঞ্জাবী ও সোনার বোতাম ঝল্‌মল্‌ করিতেছিল সেটাও চোখে পড়িতেই সে আবার নিজেকে কঠিন করিয়া লইল। ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া শান্ত উদাসীনস্বরে কহিল, কিছুই হয়নি অমলদা। আমরা বড় গরীব, দিনরাত অভাবের সংসারে খাটতে হয়, তাই হয়ত সব সময়ে হাসিমুখ রাখতে পারি না। তাতে যদি ত্রুটী হয়ে থাকে ত মাপ করবেন।

অমলের ওষ্ঠ দুইটি কিছুক্ষণ নীরবে কাঁপিবার পর স্বর বাহির হইল—বিনা অপরাধে কেন যে বারবার আঘাত করছ শকুন্তলা, বুঝতে পারছি না। থাক্‌—তুমি শান্ত হও, তারপর একদিন আমার দুষ্কৃতির কথা শুনব—

কিন্তু তবু সে চলিয়া যাইতে পারিল না। শুধু শকুন্তলা অহেতুক একটা ক্রোধে যেন জ্ঞান হারাইল, কঠিনকণ্ঠে কহিল, আর, আপনি যখন তখন আমার গায়ে অমন ক'রে হাত দেবেন না। আমরা বড় গরীব, মায়ের এক পয়সা পণ দেবার সামর্থ্য নেই তা ত জানেনেই। কেউ যদি ভিক্ষা দেবার মত ক'রে গ্রহণ করে তবেই তিনি কন্যাদায়ে মুক্ত হবেন। তার ওপর যদি কোন বদনাম ওঠে, তাহ'লে ভিক্ষাও কেউ দিতে চাইবে না, এটা আপনার বোঝা উচিত।

সেই শকুন্তলা! সংসারের কোন ক্লেদ যাহাকে কোনদিন স্পর্শ করে নাই। অমল আর দাঁড়াইতে পারিল না। শুধু কপাটটা খুলিবার পূর্বে একবার স্খলিতকণ্ঠে সে কহিল--কিন্তু আমার দ্বারা যে কোন সাহায্যের সম্ভাবনা নেই তাই বা ' ক'রে জানলে কুন্তলা? শুধু অনিষ্টই করতে পারি, উপকার কিছু করতে পারি না?

না, না, না—চাপা গলায় শকুন্তলা যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল--আপনি যান্‌--বাড়ী যান্‌। আমার উপকার করা আপনার দ্বারা সম্ভব নয়। আপনি যান্‌।

অমল বাহির হইয়া গেল। তাহার পদশব্দ কপাটের ওপারে মিলাইয়া যাইতে হঠাৎ যেন শকুন্তলার তন্দ্রা ভাঙ্গিল। সে চমকিত ব্যাকুলভাবে একবার বাহিরের দিকে চাহিল, সেখানে শুধুই অন্ধকার।...অমল সত্যই চলিয়া গিয়াছে।...

কপাটটা বন্ধ করিয়া দিয়া শকুন্তলা অনেকক্ষণ বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মাটির উপর লুটাইয়া পড়িয়া, অমল শেষ যেখানে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত কথা কহিয়াছিল, সেইখানে মুখ রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে হইল আজ সারারাতের মধ্যে এ কান্না যেন থামিবে না। উপরে তখন শকুন্তলার মায়ের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল।

কার্তিক ১৩৪৯

কথা

সুবোধ ঘোষ

থার্ড মাস্টার যতীশবাবু অঙ্ক কষাইতেছিলেন। ছেলেদের দিকে পেছন করিয়া এক মনে খস্ খস্ করিয়া লিখিয়া যাইতেছিলেন। সব চুপ-চাপ। হঠাৎ একটি ছেলে দাঁড়াইয়া উঠিল। দেখিতে সুশ্রী। রং কালো হইলেও মুখখানা লাবণ্যময়। মোটা-সোটা—আঁট-সাট গড়ন। বলিল—'স্যার'।

যতীশবাবু মুখ ফিরাইলেন না। এক মনে অঙ্ক করিয়া যাইতে লাগিলেন। আবার ছেলেটি ডাকিল, "কালকের সে প্রবলেম্‌টা বুঝিয়ে দেবেন স্যার?"

'পরে হবে'—বলিয়া শিক্ষক মহাশয় দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁহার কার্যে মন দিলেন।

'বুঝেছি স্যার সেটা আপনি পারবেন না'! বলিয়া ছেলেটি ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই যতীশবাবু হাতের চক্‌খানা ছেলেটির দিকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। বেঞ্চের ধারে লাগিয়া চকখানা গুঁড়া হইয়া গেল। তিনি কতক্ষণ ছেলেটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন ;—তারপর বলিলেন—'এমন কথা কেউ বলতে সাহস করে নি যতীশ ঘোষালকে এই দশ বছরের মধ্যে—শুধু আজ—' বলিয়া দ্রুতবেগে তিনি ক্লাস হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

থার্ড মাস্টারের এই রূপ কেহ দেখে নাই—বিশেষ করিয়া সদাহাস্যময় পুরুষের ঐ রকম চক ছুঁড়িয়া মারা যেমন আকস্মিক তেমনি অভিনব! ছেলেরা সকলে মিলিয়া ঐ ছেলেটিকে ঘিরিয়া ধরিল—'তুই যে অমন কথা বল্‌বি কালী তা আমরা ভাবতেই পারি না। যতীশবাবুর মত লোককে এমন কথা—তোর হ'ল কি—বলত!'

কালিদাস কোন কথা বলিতে পারিল না। সে যে অপরাধ করিয়াছে তাহা তাহার চোখ-মুখ দেখিয়াই বোঝা যায়।

তাহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল।

তাহার মুখের অবস্থা দেখিয়া কেহই অনুমান করিতে পারিবে না, সে অমন কথা বলিতে পারে। নিতান্ত গো-বেচারী মানুষ—ক্লাসে ও কথা বলে খুব কম। ছেলেরা চাপ দিল যে তাহাকে ক্ষমা চাহিতে হইবে। সে স্বীকার করিল। কিন্তু শিক্ষকদের বসিবার ঘরের নিকট যাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। কি বলিবে সে? 'ক্ষমা করুন স্যার'—না, এমন কথা সকলের সামনে সে বলিবে কি করিয়া। তবে কেমন যেন লজ্জা করিল। ছুটীর পরই বলা যাইবে। কারণ তখন একেলা থাকিবেন। কিন্তু ছুটীর পরও সে যাইতে সাহসী হইল না। ভাবিল যদি দেরী হইয়াছে বলিয়া তিনি রাগ করেন? তখন! অবশেষে ছেলেরা তাহাকে এক রকম টানিয়া লইয়া গেল যতীশবাবুর কাছে। নীরবে মাথা হেঁট করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। কোন কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না!

ছাত্র শিক্ষকের মনোমালিন্য ঘুচিয়াও ঘুচিল না!

এমনি অনেক ছোট-বড় ঘটনা তাহার আঠারো বছরের জীবনকে ভরিয়া রাখিয়াছে। কথা বলিবার পূর্বে সে বুঝিতে পারে না যে সে কত বড় কথা বলিতে যাইতেছে। মুখ হইতে কথাটা বাহির হইয়া গেলে সে তাহার গুরুত্ব বুঝিতে পারে। পরকে আঘাত দিবার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও সে আঘাত দিয়া বেদনা পায়। নিজের এই স্বভাব সে ফিরাইতে চায়। লোকের সঙ্গে কথা বলিতে চায় কারণে অকারণে। সে অসুবিধায় পড়ে, বক্তব্য বিষয় দুই

কথায় শেষ করে, অথবা বেশী কথা বলিতে গেলে লোকে অনেক সময় মনোযোগ দেয় না, শ্রোতা শুনিতে চায় না অথচ সে বলিতে চায়—এমন অবস্থা হইলে অস্বস্তি অনুভব করে। সে মিশুক হইতে চায়—পারে না। তার জড়তা কাটে না। অনেক করিয়াও সে তাহার স্বভাব পরিবর্তন করিতে পারিল না। তাই যখন কর্ম-কোলাহল মুখর কলিকাতাতে সে আসিল তখন সে খেই হারাইয়া ফেলিল। গ্রামে সে চুপচাপই থাকিত ; তাহাতে বাধা ছিল না—কিন্তু এখানে তা চলিবে না কারণ এখানে ত' কথা বেচিয়া খাইতে হয়। তাই কালিদাসের বাবা যখন লিখিলেন, 'তোমার পড়ার খরচ আমি দিতে পারি কিন্তু থাকিবার ও খাইবার ব্যবস্থা তোমাকে করিতেই হইবে' ;—তখন কালিদাস পড়িল মহাবিপদে। কি করা যায়! ভাগ্য তাহার সুপ্রসন্ন তাই দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইল না ; কর্মখালির বিজ্ঞাপনেই তাহার গৃহশিক্ষকের কাজ জুটিয়া গেল।

ভদ্রলোক অতি ভালমানুষ ; বেশী কথা বলেন না। ব্যবসায়ী লোক হইলে কি হইবে, শিক্ষিতের সবগুলি চরিত্রগুণই গজেনবাবুর আছে। বিনা বাক্যব্যয়ে হয়তো বা কালিদাসের মুখচোরা ভাব দেখিয়া তাঁহাকে নিয়োগ করিয়াছেন। কালিদাস হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। রূপকথার রাজপুত্রের মত কে যেন তাঁহাকে মেসের কেরোসিন কাঠের তক্তপোষের উপর হইতে সোনার পালঙ্কে বসাইয়া দিল!

গজেনবাবুর স্ত্রী বড় ঘরের মেয়ে। বিবাহও হইয়াছে বড় লোকের সহিত। সংসারে স্বামী আর দুইটি ছেলেমেয়ে। দিনগুলি তাহাদের বেশ কাটে। কলিকাতায় প্রকাণ্ড বাড়ী—দেউড়িতে দরোয়ান, গাড়ী, কিছুরই অভাব নাই তাঁহার। সদা হাস্যময়ী আনন্দের প্রতিমা।

কালিদাসকে আনিয়া গজেনবাবু স্ত্রীকে বলিলেন, 'এই নেও তোমার মঘো ও সবির গুরু—যাও তুমি, উনি সব ব্যবস্থা ঠিক করে দেবেন।' বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

এমন অবস্থায় যে তাহাকে পড়িতে হইবে তাহা কালিদাস ভাবে নাই। অন্তঃপুরে এক অপরিচিত মহিলার সম্মুখে সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল! এই রকম বিপদে বোধকরি সে জীবনে পড়ে নাই!

গজেনবাবুর স্ত্রী প্রতিমা দেবী ছেলেটির দিকে চাহিলেন ; বোধহয় তাঁহার বয়সটা অনুমান করিলেন, তারপর হাসি মুখে বলিলেন, 'এস ভাই এখানে—ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন—এসো আমার সঙ্গে,'—বলিয়া তিনি হাঁক দিলেন—'ওরে মঘো—ওরে সবি—দেখে যা কে এসেছে'।

উপরের দোতলা হইতে তর্-তর্ করিয়া দুইটি ছেলে-মেয়ে নামিয়া আসিল। ছেলেটি বড়, মেয়েটি ছোট। ছেলেটির বয়স সাত আট বছরের বেশী হইবে না। মেয়েটি দু'এক বছরের ছোট হইবে।

কালিদাসকে লইয়া প্রতিমা দেবী একটি সুসজ্জিত কক্ষে আসিলেন। 'এই ঘরে তুমি থাকবে আর ওরা পড়বে। এই দেখ তোমাদের মাষ্টার মশাই।'

মঘোবন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাহার নূতন শিক্ষককে ধরিল ও কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে বলিল—'জানো আমার বাক্সটা দাদা ভেঙ্গে দিয়েছে, আমাকে একটা পুতুলের বাক্স কিনে দিও, দেবে ত'?'

কালিদাস কি বলিবে! সে ভাবিতেও পারে নাই যে এমন করিয়া মেয়েটা তাহার কাছে আসিতে সাহস করিবে। তাহার মুখ হইতে অস্ফুট একটা স্বর বাহির হইল, 'আচ্ছা দেব'।

প্রতিমা দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এর আগে কোথায় ছিলে তুমি?'

'কলুটোলায় একটা মেসে।'

'তোমার দেশ কোথায়?'

'বাইনান—২৪ পরগণায়।'

'ওঃ' বলিয়া প্রতিমা দেবী একটু চুপ করিলেন।

'ওখানে আমারও আত্মীয় আছে'।

'আপনার বাপের বাড়ী বুঝি?' কালিদাস ফস করিয়া বলিয়া বসিল। বলিয়াই সে লজ্জায় মরিয়া গেল। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলিবার রীতি তাহার জানা নাই। নীরবে সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল। প্রতিমাদেবী বুঝিলেন।—স্মিত হাস্যে বলিলেন, 'ও গ্রামে নয়—তবে ঐ জেলায়ই আমার বোনের বিয়ে হয়েছে।' তারপর কথার মোড় ফিরাইয়া দিলেন—'তা হলে তোমার বিছানা এখানে করতে বলে দেব। পাশেই বাথরুম আছে—কোন অসুবিধা হবে না তোমার, হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও। তার পর বইটইগুলো গুছিয়ে নিও!'

ঘাড় নোওয়াইয়া সে শুধু বলিল—'আচ্ছা'।

প্রতিমাদেবী লাজুক ছেলেটিকে আর ঘাঁটাইলেন না। নিজের ঘরে যাইয়া চাকরকে দিয়া সব বন্দোবস্ত ঠিক করাইয়া দিলেন।

এই গেল প্রথম পরিচয়ের পালা। কয়েকদিন বাদেই নূতন পরিস্থিতিটা তাহার গা সওয়া হইয়া আসিল। ছেলেমেয়েদের রীতিমত পড়াইতে লাগিল কালিদাস। শিক্ষকতার দিক দিয়া তাহাকে কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। খাওয়া-দাওয়ার দিক দিয়া ত' সে রাজার হালে আছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্য দিক দিয়া।

বাড়ীর সবাই তাহাকে আপন লোক বলিয়াই মনে করিত। তাই তাহাব সঙ্গে মৌখিক একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। মনে মনে হয়তো সে তোড় জোড় করিয়াছে, কিন্তু তাহার আর সাহসে কুলায় নাই। অন্যের বেলায় যাহা হউক প্রতিমা দেবীর বেলায় সেটা কেমন যেন বেমানান বোধ হইত। প্রতিমাদেবী স্নেহশীলা। ওকে যত্ন করেন ছেলের মত। মনে মনে কালিদাস তাহাকে মাতৃপদ দিতে কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু কিছু বলিতে পারে না, তাহার প্রকৃতি বাধা দেয়।

একদিন সে তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ কাজ করিয়া বসিল মঘোবন ও সবিতাকে পড়াইবার সময় সে সমস্ত জড়তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল, 'একটা কথা তোমাদের এতদিন বলি নি।' সে থামিল।

'কি মাস্টার মশাই?' মঘোবন জিজ্ঞাসা করে।

'তোমার মাকে দেখতে ঠিক আমার দিদির মত! আমি যখন প্রথম দেখলুম তখন চম্‌কে উঠেছিলুম, দিদিমণির চেহারার সঙ্গে তাঁর মিল দেখে!'

কালিদাসের বুকের ভিতর টিপ্‌ টিপ্‌ করিতে লাগিল—যেন কি ভীষণ কথা সে বলিয়া ফেলিয়াছে। সে সবিতার দিকে চাহিল। মেয়েটা মিটি মিটি হাসিতেছিল! হঠাৎ বলিয়া উঠিল—'তাহলে আপনি ত' মাস্টার মশাই নন, আপনি ত' কালিমামা।' বলিয়া সে খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিতে লাগিল।

কালিদাস লজ্জায় মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। বেহায়া মেয়েটা বলে কি? তাহার শরীর রী রী করিয়া উঠিল।

তারপর হইতেই মঘোবন ও সবিতা তাহাকে মামা বলিয়া ডাকে। কিন্তু লজ্জার মাথা খাইয়াও সে প্রতিমা দেবীকে দিদি বলিয়া ডাকিতে পারে নাই। গজেনবাবু খুব সন্তুষ্ট তাহার ব্যবহারে। কালিদাসের সঙ্গে নূতন সম্পর্ক পাতানোর জন্য তিনি সুখী হইয়াছিলেন এই ভাবিয়া যে তাঁহার ছেলেমেয়েদের ও কালিদাসের মধ্যে ছাত্র শিক্ষক সম্বন্ধ ছাড়া আর একটা সৌন্দর্যের সম্বন্ধ রচিত হইয়াছে।

প্রতিমা দেবীও অখুশী নহেন, কিন্তু ভাইফোঁটার দিন স্বামী-স্ত্রীতে এক ব্যাপারে মতের অনৈক্য হইল!

ভাইফোঁটার দিন সকালে সবিতা ছুটিয়া আসিয়া কালিদাসকে বলিল, 'কালিমামা, মা

আপনাকে ডাকছেন উপরে। আজকে যে ভাইফোঁটা! জানেন আপনি?'

'না জানিনে ত'। কি হয় তাতে। ভাইকে ফোঁটা তিলক কেটে বৈরেগী সাজতে হয় বুঝি?' মুখরা মেয়েটার পাল্লায় পড়িয়া এখন সে কথা বলিতে শিখিয়াছে।

'ওমা ভাইফোঁটা কি তা বুঝি জানেন না—রে—রে বলে দেব সবাইকে।' বলিয়া চঞ্চলা বালিকা হাততালি দিতে লাগিল। তারপর মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল—'আচ্ছা কালিমামা, আপনার বোন নাই?'

'না। ছিল মরে গেছে।'

মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কালিদাসের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—'এবার—আমি দেব আপনাকে ফোঁটা কেমন? ফোঁটা দেবার সময় কি বলতে হয় জানেন ত'—

'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা—'

কি জানি আর মনে নেই। আচ্ছা দাঁড়ান কাগজটা দেখে আসছি। এখনি মুখস্ত করে ফেলব। বলিয়া ছুটীতে ছুটীতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দোতলা হইতে প্রতিমা দেবী ডাকিলেন, 'কালিদাস তুমি যাও ত একবার শ্যামবাজারে আমার দিদিকে নিমন্ত্রণ করতে। সেখান থেকে এসে আবার তোমাকে যেতে হবে বাজারে ফুল ও দূর্বা আনতে। অনন্তকে পাঠিয়েছি মিষ্টি কিন্‌তে—তার কতক্ষণ লাগে কে জানে।'

কালিদাস বর্তাইয়া গেল। তাহাকে আপনার জনের মত কাজের ভার প্রতিমা দেবী কোন দিন দেন নাই। স্নেহের পরশ পাইয়া সে নিজেকে ধন্য মনে করিল।

শ্যামবাজার হইতে প্রতিমাদেবীর ভগিনী আসিলেন। দূর্বা, চন্দন, ফুল আনা হইল। বাড়ীতে লুচি ভাজা হইতে লাগিল। রেকাবীতে মিষ্টি সাজাইতে লাগিলেন সবিতার মাসি। কালিদাস কাছে বসিয়া সব দেখিতেছিল। ঘৃতের প্রদীপ জ্বালা হইল। লাল ও শ্বেত চন্দন, ধান দূর্বা শোভিত পুষ্পপাত্র আনা হইল। প্রতিমা দেবী নিজের হাতে ফুল-তোলা আসন আনিলেন। সবিতা পাতিল তার দাদা বসিল। তার পর আরম্ভ হইল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। সবিতা অপূর্ব সুর করিয়া ছড়াগুলি আবৃত্তি করিল। একটুও ভুল করিল না। শ্বেত ও রক্ত চন্দনে মঘোবনের কপাল ভূষিত হইলে মেয়েরা হুলুধ্বনি করিয়া উঠিল।

কালিদাস দেখিতেছিল। মনে পড়িতেছিল বহুদিন আগে—সেও তাহার দিদিকে নমস্কার করিয়াছিল। দিদির সঙ্গে সে সব সময় ঝগড়া করিত কি ঐ দিন কেন যেন মনে হইয়াছিল দিদির চাইতে আপনার জন বুঝি আর কেহ নাই। দিদির মুখের ছড়াগুলির অর্থ সে তখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। তবে 'যম দুয়ারে কাঁটা—' কথাটা তাহার মনে আছে। তখন সে মনে করিত যে, তাহার দিদিব মুখের মন্ত্রের জোরেই যমদূত বিপর্যস্ত হইবে। দিদি আর নাই!

অনুষ্ঠান শেষ হইল। কালিদাসের বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। এখনি তাহাকে ডাক দিবে প্রতিমা দেবী। তাহার নূতন দিদি। প্রদীপের কম্পমান শিখাটির দিকে চাহিয়া রহিল কালিদাস। হঠাৎ প্রদীপটা ফুঁ দিয়া নিভাইয়া দিলেন প্রতিমা দেবী! কালিদাসের বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল! তবে কি?

প্রতিমা দেবী তাহার দিকে একখানা খাবারের থালা আগাইয়া দিলেন। থালাখানা লইয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার ঘরে আসিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে গজেনবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। পাশের ঘরে তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে কথা বলিতেছেন। 'কেন তুমি ওকে ফোঁটা দিলে না। আহা বেচারা!—বোন নেই!' 'কেন দেব, এক দিনও ডেকেছে আমাকে দিদি বলে! মুখের কথাটা বলতে ওর এত অপমান—থাকুক ও, ওর মান নিয়ে—'

'মুখের কথাই বেশী হ'ল।'

'হ্যাঁ তাই। আমরা তাই চাই—অত ভেতর কে দেখে যতই হোক'—আর শোনা গেল না।

কালিদাস শুনিল।

'যতই হোক'—সে যে মাস্টার। মুখের কথা বেচিয়াই তাহাকে খাইতে হইবে! সব স্বচ্ছ বলিয়া মনে হইল। সে আর কাঁদিল না। টেবিলের উপর হইতে মূল্যবান খাবারগুলি শেষ করিয়া ফেলিল!

আষাঢ় ১৩৫০

বিলাতী ডাক

সন্তোষকুমার ঘোষ

চিঠি বাছাই হইতেছিল।

ডাক-ঘরের বারান্দায় প্রতীক্ষাকুল জনসমাবেশ। কেহ বা সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে, কেহ বা নিজেদের মধ্যে বিবিধ প্রসঙ্গ তুলিয়াছে, তাও শুধু সময় কাটাইবার জন্য। সুতরাং কোনোটাই ভাল জমিতেছিল না ; প্রত্যেকেরই আছে স্ব স্ব কাহিনী শুনাইবার অপরিসীম ব্যগ্রতা এবং অপরের কাহিনীর প্রতি ঠিক ততটাই উগ্র ঔদাসীন্য।

পৃথিবীটা বিভিন্ন ঋতুতে কক্ষপথের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিলেও তাহার সুমেরুটা নির্ভুলভাবে হেলিয়া থাকে ধ্রুবতারার দিকে ; ইঁহারাও লক্ষ্য-বিহীনভাবে নানা আলোচনার মধ্য দিয়া সময় কাটানোর কৌশল করিতে থাকিলেও মনটা হেলিয়াছিল 'সর্টারের' প্রতিই।

—বুঝলেন মুখুয্যে মশাই, আমি কি আর রোজ আসি? তবে কি জানেন, বৌমা ছেলেমানুষ, তার ওপর এই প্রথম...বুঝ্লেন কি-না?—বলিয়া হাজরা মহাশয় সলজ্জ হাসি হাসিলেন, যেন সবটুকু লজ্জা তাঁহারই।

মুখুয্যে মহাশয় আসিতেন অন্য উদ্দেশ্যে ; তাঁহার কলিকাতাবাসী শ্যালক এবার দশ টাকা কাড়িয়া লইয়া একটি লটারীর টিকিট গছাইয়া দিয়াছিল, প্রাপ্য কুড়ি হাজার টাকা! টাকা যে আসিবে সে বিষয় তাঁহার কোনো সন্দেহ ছিল না ; তাঁহার শ্যালকও আশ্বাস দিয়াছিল, টাকাটা ঠিক পাবেন, এটা হ'চ্ছে সায়েব কোম্পানী—ফাঁকি চুরি 'ডিসনেস্টি' কোথাও নেই ; আপনার নাম উঠেছে কি তখনি পেয়ে গেলেন--হেঁ, একেবারে 'পাংচুয়েল'। কথাটা তিনি গ্রামের আর কাহারও নিকট বলেন নাই, একেবারে টাকাটা পাইয়া সকলকে তাক লাগাইয়া দিবেন, এই ছিল তাঁর অভিপ্রায় ; কিন্তু কি করিয়া কথাটা ফাঁস হইয়া গিয়াছে...

প্রকাশ্যে কহিলেন, আমার শালার চিঠির জন্যে অপে করছি। শালা বো'য়ের অসুখ, রেমিট্যান্ট, শক্ত টাইপ...

হাজরার পার্শ্বচর বিনোদ বলিয়া উঠিল, আপনার সেই লটারীর কি হলো মুখুয্যে মশাই?

-কোন্‌টা? মুখুয্যে ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছেন না।

—সেই, আপনার শালার 'থুরু'তে সেবার যেটা কিন্‌লেন।

তাঁহার লটারীর ফল জানিবার প্রতি আসক্তিটা বিনোদের নিকট ধরা পড়িয়া গেছে ভাবিয়া মুখুয্যে মহাশয় আরক্ত হইয়া উঠিলেন--আমি বুঝি তাই আসি? শালা বো'য়ের নাকী বড্ড অসুখ—

হাজরা বলিয়া উঠিলেন, কিচ্ছু ভাব্‌বেন না, টাকাটা ঠিক পাবেন, 'মা ফলেষু' জানেনই তো।

অপর একদিকে গ্রামের একদল ছেলে বসিয়াছিল। তাহারা সাধারণত আসে না, এবার কলিকাতার এক যাত্রা-কোম্পানীকে তাহারা পূজার সময় বায়না দিয়াছে ; আজ তাহার উত্তর আসিতে পারে। পূজার এখনো তিন চার মাস দেরী, এত আগে হইতে ঠিক করিলে কোনো ভাব্‌নাই থাকে না।

প্রহ্লাদ বলিতেছিল, বুঝলি শ্রীমন্ত, এ দলটা একেবারে 'আন্ প্যারেলাল' ; সেবার আমার মামার বাড়ীতে গেছলো, ডিসেন্ট! একটা ছোট্ট ছেলে, সেই কেষ্ট সাজে...আঃ মাইরি, কি গলা! যেন ভিজিয়ে দেয়!

—রাণীর পার্ট-টার্টগুলো? একজন উৎসুক প্রশ্ন করিল।

—চমৎকার! বল্লুম তো অমনটী আর ভূ-ভারতে নেই!

বিরাট এবার কথা কহিল, শালা ধাপ্পা দেবার আর জায়গা পাওনি? কার্তিকপুরে সেবার যে 'আচার্য অপেরা' এসেছিল, সেটা কোন্ হিসেবে খারাপ শুনি? মেয়েছেলের 'পার্ট' এমন 'ন্যাচারাল' আর দেখিনি। নয় বিনুদা?

বিনোদ এতক্ষণ একটা খুঁটীতে পিঠ দিয়া নিবিষ্টভাবে সিগারেট টানিতেছিল এবং ছেলেদের প্রতি পর্যাপ্ত ধোঁয়া ছাড়িয়া তার অবহেলাটাকে প্রকট করিতেছিল। সে কলিকাতা হইতে বি-এ পাশ করিয়া দেশে বসিয়াছিল ; বিবাহ করিয়াছে, স্ত্রী বাপের বাড়ী। বিরাটের প্রশ্নের উত্তরে একটা সংক্ষিপ্ত 'হুঁ' ঠুকিয়া সে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সিগারেট টানিতে মন দিল।

উৎসাহিত হইয়া বিরাট বলিয়া গেল, আর নাচ, সে মাথা ঘুরিয়ে দেবে!

নাট্যসমিতির সম্পাদক কহিলেন, ওদের 'রেট' কত?

—হুঁ, হুঁ, সেদিকে আছে ; সেবার কার্তিকপুরে তিনরাত গাইলে, একেবারে তিনশোটী টাকা গুণে নিলে!

সম্পাদক হতাশা-মলিন হইলেন, অতো টাকা নেই।

—নেই কেন শুনি ; শ্রীমন্ত রুষ্ট হইয়া উঠিল, গেল বার যা' বেঁচেছে তাই তো প্রায় দেড়শো! তারপর 'রিলিফ পারফরম্যান্স' থেকে খরচা বাবদ কেটে রেখেছো পঞ্চাশ টাকা।

—তোমার মুণ্ডু! রিলিফ পার্‌ফরম্যান্স থেকে এক আধলা আদায় হোলো না, পঞ্চাশ টা—কা! সম্পাদক মুখভঙ্গী করিলেন!

--অলরাইট, আমি এ্যাকাউন্ট চেক্ কোরবো।

—তুই 'শা—' এ্যাকাউন্ট চেক করবার কে? আমি কি টাকা ভেঙেচি, যে তোকে এ্যাকাউন্ট দ্যাখাতে যাবো?

প্রায় হাতাহাত্তির উপক্রম হইল।

অনুতোষ নিস্পৃহভাবে বসিয়াছিল ; তার চাকরী নাই, একটা স্কুল-মাস্টারীর জন্য আবেদন করিয়াছে আজ একমাস ; কোনো উত্তর আসে নাই, আসিবে সে আশাও শীর্ণ হইতে হইতে প্রায় মিলাইয়া গেছে ; তবু সে আসে, বোধ হয় অভ্যাস বজায় রাখিবার জন্য। সে স্বভাবতই মৃদু স্বভাবের, ইদানীং কোন রন্ধ্রপথ দিয়া তার স্বভাবের রুক্ষতা ঢুকিয়াছে! সে একটা ভঙ্গুর কাচের পাত্রের মত আজকাল একটু টোকা পাইলেই আক্রোশে ও রোষে ভাঙিয়া পড়ে।

সে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, হয়ত এম্‌নিই ; হয়ত চিঠি 'সর্ট' করিতে দেরী হইতেছিল বলিয়া।

—কই হে অনুতোষ, এবারকার খাজনাটা দিচ্ছো কবে? লাটের কিস্তি দাখিলের 'টাইম' যে উৎরে গেল। নলহাটির গোমস্তা তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন—এবার আমার ওপরেই সব 'ডিপেণ্ড' করছে কি-না? হেঁ—

অনুতোষ ফিরিয়া তাকাইল।

গোমস্তা—লম্বা, রোগা লোক। বয়েস পঞ্চাশকে ডিঙাইয়াছে বহুদিনই। বাদামী রংএর মানুষ তাঁহার মুখের পানে তাকাইলে মনে হয় কাল যেন দুই গালে দুই চড় মারিয়া একেবারে বসাইয়া দিয়াছে। শীর্ণ প্রবিষ্ট কোটরে দুইটী অতিরিক্ত উজ্জ্বল চোখ যেন হিংস্রতায় ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছে। ঈষৎ কুব্জ দেহটী যেন কোনো আরণ্য পশুর

উদ্যত থাবা!

—আপনার 'বিলাতী ডাকের' খোঁজে এলেন বুঝি? অনুতোষ তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করিল।

—হ্যাঁ ভাই, আজ বোধ হয় আসবে। গোমস্তা নন্দী মহাশয়ের মুখখানি অকস্মাৎ ম্লান-পাণ্ডুর হইয়া উঠিল।

একপাশে স্থানীয় আদালতের পিয়ন, স্কুলের দপ্তরীদের জটলা। সকলেই ডাক প্রত্যাশী।

প্রতীক্ষা-বন্ধুর মহূর্তগুলির মন্থর চলায় তাহারা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিয়াছিল।

ডাকঘরে আসা কাহারও দৈনন্দিন কর্তব্য, কাহারও বা খেয়ালমাফিক।

ডাক-পিয়ন জানালার ভিতর হইতে হাঁকিল, ফৌজদারী আদালত!

বনমালী হাত বাড়াইয়া দিল, ক'খানা?

—পাঁচখানা, ধরো ঠিক ক'রে।

—দেওয়ানী?

নিত্যানন্দ অগ্রসর হইল, ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে যাওয়াটাই একটা সমস্যা!

উদ্ধব কহিল, গার্ল স্কুলের ডাক্ নেই?

—বই আছে, দাঁড়াও, এনে দিচ্ছি—বলিয়া হাঁকিয়া গেল, ইউনিয়ন বোর্ড, মাইনর স্কুল, ব্যাঙ্ক—

যে যারটা লইয়া গেল। ইহার মধ্যে উদ্ধবের ভারটা কিঞ্চিৎ বেশী হইয়াছিল ; বই-এর প্যাকেটটা হাতে করিয়া কহিল, বাপ্‌রে, কত! গার্ল স্কুলের কাণ্ডকারখানা! তার মুখে একটু সগর্ব হাস।

গ্রামের ছেলেরা হাঁকিল—গণনাথ, নাট্যসমিতির 'লেটার' এসেছে?

গণনাথ হাসিল—'না।' ছেলেদের উৎসাহের প্রাখর্য নিবিয়া গেল, ভাবিল 'অপেরা পার্টি ভাবিতেছে কি? তাহাদের 'অফার এ্যাক্সেপ্ট' করিবে না নাকি? শ্রীমন্ত ভ্রূকুটি করিল—কি বিনুদা, ইংরিজীটা ঠিক ক'রে লিখেছিলে তো! বিনোদের আত্ম-সম্মানে বোধ করি একটু আঘাত লাগিল, মুখ ভ্যাংচাইয়া কহিল, না, হয়নি। যা' না, শুদ্ধ ইংরিজী লেখ্ গিয়ে—হুঁ, এককলম ইংরিজী লিখতে 'ইয়ে' বেরিয়ে যাবে!'

হাজরা মহাশয়ের বেহাই লিখিয়াছেন, 'শ্রীমতী ভালই আছে, চিন্তা করিবেন না,...' হাজরা মহাশয় চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় মুখুয্যে মহাশয়কে বলিয়া গেলেন—কই আপনার শালা বো'য়ের কোন খবর এলো? বিনোদ মোসাহেবী করিয়া কহিল—আজ্ঞে ওঁর লটারীর কথাটাও একবার জিজ্ঞেস করুন না!—বিনোদের প্রকৃতি হিংসুক।

মুখুয্যে মহাশয় একটা শুষ্ক 'না' উচ্চারণ করিলেন।

—গণনাথ, আমার কোনো—গলাটা কাশিয়া অনুতোষ ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

অনুতোষ চলার পথে পা দিল। তাহার চিঠি আসে নাই, তাহাতে কিছু আসে যায় না ; সে কালও আসিবে, বাড়ীতে বসিযা মানান্ ভাবনা দুশ্চিন্তায় উপদ্রুত হওয়ার চেয়ে এ ঢের ভাল!

গোমস্তা মহাশয় একপাশে সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, পোষ্টমাস্টার মহাশয় তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন, কই হে গণনাথ, নন্দী মশায়ের ডাক্‌টা দেখে দাও না!

গণনাথ মুখ না তুলিয়াই হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে, ওঁর 'বিলাতী ডাকের' তো আজ্‌কে আস্‌বার কথা নয়।

পোস্টমাস্টার মহাশয়ও অস্পষ্ট হাসিয়া বলিলেন, তবে আর কি নন্দী মশাই, নেই যখন...

গোমস্তা নন্দী মহাশয়ও হাসিলেন।

শীতের সাতটা, তবু এরই মধ্যে পোস্ট অফিসের প্রাঙ্গণে রৌদ্র গড়াগড়ি দিতেছে।

গোমস্তা মহাশয়ও চলিতে লাগিলেন।

আজ ত্রিশ বৎসর তিনি কামারপুকুর স্টেটে ঢুকিয়াছেন—তখন স্টেট কত ক্ষুদ্র ছিল! বর্তমান জমিদার নবনীকান্তির পিতা অবনীবাবুই ছিলেন তখন কর্তা। নন্দী মহাশয়ের মনে ছাপা হইয়া আছে, সে সব দিনের স্মৃতি ; যখন তিনি এক একটা মোকর্দমা জিতিয়া মহাল হাত করিতে লাগিলেন। অবনীবাবু তো তাঁহাকে খুসী হইয়া নায়েবই বানাইয়া দিলেন। দিনে দিনে 'স্টেট' ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, তাঁহারই যত্নে ও কায়িক পরিশ্রমে।

তারপর অবনীনাথ একদিন ওপারে গেলেন এবং তদীয় পুত্র নবনীকান্তি কলিকাতা হইতে আসিলেন ফিরিয়া। নবনীর সহিত তার এক বন্ধুও উদিত হইলেন।

নবনীকান্তি বলিলেন, ইনিই এখন থেকে ম্যানেজার—

ম্যানেজার? নন্দী মহাশয় বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইলেন।

নবনীকান্তি একটু লজ্জিতভাবে কহিল, মানে ইনিই এখন থেকে 'হেড্' হবেন, অবিশ্যি 'নমিন্যালী' ; আসলে আপ্নিই সব...আদায়-পত্তর ক'রবেন...

নবাগত ম্যানেজার উদ্ধত গলায় কহিলেন, ওসব হবে-টবে না, আমাকে সমস্ত চার্জ বুঝিয়ে দিতে হবে ; ওসব সাবেকী নিয়ম চ'ল্বে না, 'থরো অল্টারেশান' চাই ; এ্যাকাউন্ট ক্লীয়ার ক'রে দিন, তারপর না হয় আপনাকে একটা 'সাবর্ডিনেট' পোস্ট দেওয়া যাবে।

—হুঁ—রুদ্ধস্বরে নন্দী মহাশয় উচ্চারণ করিলেন।

তারপর সাগর-পার নবনীকে হাতছানি দিল, সে গেল বিলাতে। এখানে থাকিয়া বিদ্যা উপার্জনের কৌশলটা সে আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না। বলিয়া গেল, খাজনা-পত্তর প্রজাদের কাছ থেকে ঠিকমত আদায় ক'রবেন, আর ম্যানেজার মশাই রইলেন, আপ্নি না পার্লে উনিই চালিয়ে নিতে পারবেন!

অর্থাৎ বলিয়া দেওয়া, তোমাকে দিয়া কোন প্রয়োজন নাই, তুমি তো' একপা চিতায় তুলিয়াছ—

ম্যানেজারবাবু কর্তৃত্বের রাশ হাতে পাইয়া 'স্টেটের' ঘোড়াকে সবেগে চালাইতে লাগিলেন সাহেবী কায়দায় ইংরাজীতে হিসাব-পত্তর রাখা, খাজনা আদায় করিয়া নিয়মিতভাবে রসিদ্ দেওয়া—

নন্দী মহাশয় প্রতিবাদ করিলেন, আজ্ঞে, রসিদ্-টসিদ্ আবার দিতে যাওয়া কেন? খাজ্না নিয়ে মাঝে মাঝে জমা দিতে ভুল ক'রবেন, না হ'লে এসব চাষারা বাগে থাক্বে কেন?

ম্যানেজার মহাশয় হাসিলেন অর্থাৎ মহাল শাসনে রাখিবার ওই পুরাতন পদ্ধতিটা একালে অচল।

আগে সাহেবসুবোদের ডালি পাঠানো হইত। ম্যানেজারবাবু বন্ধ করিলেন।

ম্যানেজারবাবু স্বদেশী।

অন্তত নন্দী মহাশয় তাই ভাবিয়াছিলেন। তিনি জনান্তিকে সকলকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেন—এই ক'রে উনি 'স্টেট' চালাবেন। ফুঃ, আমরা এই করে চুল পাকালুম, তাই 'সা' —ছোটলোকদের বাগে মানাতে পারি না...আর...

ম্যানেজারবাবু তাঁহাকে ডাকিলেন, আপনি আমার 'এগেন্স্টে' প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুল্ছেন?

নন্দী মহাশয় জিভ্ কাটিলেন, তাও কি হয়?

ম্যানেজারবাবু শুনিলেন না, কামারপুকুর সদর হইতে এই নলহাটিতে তাঁহাকে পাঠাইলেন গোমস্তা করিয়া।

কাছারি-বাড়ীর পিছনের দিকটাতে তাঁহাকে থাকিতে হয়, এই আবাসই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। মাহিনা, নায়েব যখন ছিলেন তখন ছিল দশ টাকা অবশ্য...। ম্যানেজারবাবুর আমলে

গোমস্তা হইয়াও বাড়িয়াছে পঁচিশ টাকায়। কিন্তু অর্থাগমের আর সব কয়টা পথ এমন সুস্পষ্টভাবে রুদ্ধ হইয়া গেছে...

রাস্তায় একটা আমের গাছে সবে মুকুল ধরিয়াছে ; একটা ডালে এক ঝাঁক মৌমাছির অশ্রান্ত গুঞ্জন, আর পাড়ার কতগুলি ছেলে ঢিল ছুঁড়িতেছে—মুকুলগুলি অজস্র ধারে পড়িতেছে। নন্দী মহাশয়ের মনে পড়িল, প্রথম যেবার এখানে মহাল দেখিতে আসিয়া তিনি এই গাছেরই কয়েকটা আম নিয়া নবনীকান্তিকে দিয়াছিলেন, তখন সে কত ছোট।

নন্দী মহাশয় চেঁচাইলেন, ওসব কি হ'চ্চে শুনি? সবকটা আম ঝ'রে যাক্, কেমন? জানিস্ নবনী আমাকে চিঠিতে লিখেছে এই গাছটার যত্ন নিতে, এর আম নাকি সে বড্ড ভালবাসে...

রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল ; আকাশে কে যেন তপক্লিষ্টতার তাপে জ্বলন্ত অক্ষরে দুর্বোধ্য লিপি লিখিয়া চলিয়াছে...আগুন ক্ষরিয়া পড়িতেছে যেন!

তিনি ম্যানেজারের কার্যের প্রতিবাদ করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন ; অনুনয় করিয়া—নূতন ম্যানেজারের অযথা অতিরিক্ত নিন্দা করিয়া। এরকমভাবে চলিলে যে স্টেট টিকিবে না, সে আভাসও দিয়াছিলেন ; তথাপি নবনীকান্তির তরফ হইতে স্টেটের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোনো দুশ্চিন্তা উদ্বেগ উদ্রিক্ত হয় নাই।

নবনীকান্তি উত্তর দিবে না?

নিশ্চয়ই দিবে, এই অন্যায়ের প্রতীকার সে করিবেই। নন্দী মহাশয় সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতেছেন, নবনী কিচ্ছু জানে না তাই ; নইলে সে যা শ্রদ্ধা করে আমাকে, বুঝলে, ঠিক পিতৃতুল্য ; ওই ম্যানেজার বেটাকেই যদি আমি না তাড়াই—

তাঁহার নামে বিলাতের ডাক আসে নাই? না পিওনটা চাপিয়া রাখিয়াছে, কিছু আদায় করিবার মতলব!

বিলাতের ডাক রোজ আসে না। সপ্তাহে একদিন উড়ো জাহাজে আসে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া—একি সোজা কথা?

সকলের নামে চিঠি আসে, সে তো স্থানীয়। নন্দী মহাশয় বলিয়া বেড়ান, আমার নামে বিলিতী ডাক আস্‌বে—দেখো!

'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখিতেছেন—'প্রতি বৃহস্পতিবার বিলাতের ডাক জেনারেল পোস্ট অফিস হইতে—"

বৃহস্পতিবার? নন্দী মহাশয় হিসাব করিলেন, পশুই তো বৃহস্পতিবার!—ও গিন্নি, বুঝ্‌লে, পশুই নবনীর চিঠি আস্‌চে –

–সত্যি? গৃহিণী আশা-দীপ্ত মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

—ও, তুমি ভেবো না ; পশু ডাকের তারিখ, নবনী আমায় যা ভক্তি শ্রদ্ধা করে...তার কোনো অসুখ—বুঝলে, নইলে সে আমার তেমন ছেলেই নয়! দেখো, এবার ওই ম্যানেজার বাছাধনের জারিজুরি সব ভেঙে দিচ্ছি!

* * * *

ভিতরে চিঠি বাছাই হইতেছিল ;

মুখুয্যের শালা বৌ'এর অসুখ সারিবার নয়, তিনি আজো আসিয়াছেন, রেমিটেণ্ট, শক্ত টাইপ...

হাজরা উদ্বেগাকুলভাবে আসিয়াছেন, তাঁর ছেলেমানুষ পুত্রবধূর কোনো সংবাদ এক সপ্তাহ তিনি পান না।

ড্রামেটিক ক্লাবের ছেলেরাও আসিয়াছে, 'অপেরা পার্টি' ভাবিয়াছে কি? একটা হ্যাঁ কি না কিছু জবাব দিলে ছেলেরা অন্য চেষ্টা দেখিত, নাঃ—এ কেবল আশা দিয়া পোড়াইয়া মারা!

অনুতোষ নিশ্চিন্তভাবেই বসিয়া আছে। ইতিমধ্যে সে আরো সাতখানা আবেদন করিয়াছে, উত্তর একটারো আসে নাই ; কিছু আসে যায় না, সে নিয়মিতই আসিবে, অন্তত অভ্যাস বজায় রাখিবার জন্য। এ ঢের ভালো চাক্‌রী।

নন্দী মহাশয় এক পাশে দাঁড়াইয়া আছেন।

একে একে সকলেই বিদায় হইল।

—মুখুয্যে মশাই কোনো খপর পেলেন?

—নাঃ, শুষ্ক গলায় মুখুয্যে মহাশয় উত্তর দিলেন। তাঁর শালা বো'য়ের অসুখটা সারিবার নয়। রেমিট্যাণ্ট, শক্ত টাইপ...

হাজরার পুত্রবধূটিরও খবর নাই।

নাট্যসংঘ রাগ করিয়া চলিয়া গেল ; না আসুক কলিকাতার বিখ্যাত যাত্রার দল, তাহারা নিজেরাই 'প্লে' করিবে।

অনুতোষ নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগে চলিয়া গেল ; আবেদনের উত্তর আসে নাই, কি আসে যায় অনুতোষের?

গণনাথ হাসিয়া কহিল, আপনার একখানা চিঠি আছে গোমস্তা মশাই, তবে বিলেতের নয়...

নন্দী হাত বাড়াইলেন, কৈ, দাও!

ম্যানেজার বাবু লিখিয়াছেন,

'.....শুনিলাম আপনি আমার বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাইতেছেন ; ইহাতে আপনার উন্নতির পথ কতদূর প্রশস্ত হইল আপনিই জানেন ; আর প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করিবার প্রাগৈতিহাসিক মনোবৃত্তি--আপনি তাহাও কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। আমি সমুদয় ব্যাপার নবনীবাবুর গোচরে নিবেদন করিলাম। তিনি যাহা নির্দেশ করিবেন, তাহাই করিব...'

নন্দী মহাশয়ের মুখে কঠিন হাসি ফুটিল। বিলাতের ডাকটা আসিতেছে না ; রওনা হইয়া পথে ঝিমাইতেছে নাকি? এদিকে ম্যানেজারের ঔদ্ধত্যও হজম করিতে হইতেছে—

নন্দী মহাশয়ের বুক ঠেলিয়া একটা ব্যথিত শ্বাসের বাষ্প বাহির হইল। একটু রাগও যেন হইল—আশা ও নিরাশার দুইটী ছিন্নবল্গা অশ্ব উদ্দামবেগে ছুটিতেছে, আর তাহাদের ক্ষুরের ঘায়ে নিষ্পিষ্ট হইতেছে তাঁহার প্রতীক্ষার দিনগুলি।

ডাকঘর।

গণনাথ গোমস্তা মহাশয়কে ডাকিয়া বলিল, আপনার বিলেতের ডাক সত্যিই এলো নন্দী মশাই।

—সত্যি? নন্দী মহাশয়ের শীর্ণ উজ্জ্বল চোখ দুইটী জ্বলিয়া উঠিল।

--হ্যাঁ। এই নিন্, গণনাথ হাসিয়া চিঠিখানা দিল,—বখশিস্ চাই কিন্তু!

—নিশ্চয়ই, বুঝ্‌লে ; এবার ওই ম্যানেজারটার থোঁতা মুখ যদি ভোঁতা না কর্‌তে পারি আমি, তবে...নবনী কি আর আমার তেমন ছেলে?

* * * *

চিঠি বিতরণ পর্ব সমাপ্ত।

উদ্ধবের ঘাড়ে আজও একটা বিরাট প্যাকেট জুটিয়াছে, 'গার্ল স্কুলের কাণ্ড-কারখানা!'

মুখুয্যে মহাশয় পড়িয়া গেলেন—শালা লিখিয়াছে, টাকাটা মুখুয্যে পান নাই ; যে পাইয়াছে তার নম্বর চার হাজার পাঁচশো পাঁচ, আর মুখুয্যের টিকিটটার নম্বর চার হাজার পাঁচশো তিন, সুতরাং অল্পের জন্য বৈ তো নয়...

শালা আশ্বাস দিয়াছেন—যদি মুখুয্যে মহাশয় আর একখানি টিকিট কেনেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই টাকা পাওয়া যাইবে। সাহেব কোম্পানী, ফাঁকি চুরি 'ডিসনেস্টি' নাই, 'যেই নাম

উঠ্‌লো ওম্‌নি টাকাটা হাতে পাবেন—পাংচুয়েল!’

হাজরা মুখুয্যেকে শুনাইতেছিলেন, খবর পেলাম। বৌমার মেয়ে হ’য়েচে, তা’ মেয়েও ফ্যাল্‌না নয়, কি বলেন? একটা ছেলেকে মানুষ করতেও যা, মেয়ের বে’ দিতেও...

অনুতোষ একটা দৈনিকের এজেন্সী পাইয়াছে ; যাক্ এই ভাল ; আর কিছু যখন জুটিতেছে না...

নন্দী মহাশয় পড়িয়া গেলেন—নবনীকান্তি লিখিয়াছে—

‘...ম্যানেজাব বাবুর পত্রে জানিলাম আপনার ব্যবহারের বিসদৃশতা ক্রমশই সীমা অতিক্রম করিতেছে ; আপনি কিছুতেই বর্তমান সুশাসনের ব্যবস্থা বরদাস্ত করিতে পারিতেছেন না এবং আমার বিরুদ্ধে প্রজাদের উত্তেজিত করিতেন। এমতাবস্থায় স্থির করিলাম আপনাকে কর্ম হইতে অবসর দানই যুক্তিযুক্ত। আপনাকে মাসিক বৃত্তি কিছু নির্দিষ্ট করিয়া দিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু ম্যানেজারবাবু জানাইয়াছেন দীর্ঘকাল আপনি একচ্ছত্র আধিপত্য করিয়াছেন, সুতরাং বেশ দু’পয়সাও করিয়াছেন। অতএব অনতিবিলম্বে কাছারী ছাড়িয়া দিবেন এবং উক্ত গৃহের যে সকল ক্ষতি সাধন করিয়াছেন তাহা সারিয়া দিবেন। পত্রের রূঢ়তা মার্জনীয় ইতি।—

ড্রামেটিক সমিতি হল্লা করিতে করিতে চলিয়া গেল ; শ্রীমন্ত বলিতেছিল, শালাদের কি খাঁই দেখেছিস্? বলেছে তিন ‘নাইটে’ আড়াইশো টাকা চাই!—বিনোদ বলিতেছিল, আমার ইংরিজী লেখার গুণেই ওরা স্বীকার পেয়েচে জানিস্? নইলে...

পোস্টমাস্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর এলো বিলেত থেকে?

শীর্ণ চোখ্ দুইটী হাসিতে উজ্জ্বল করিয়া নন্দীবাবু বলিয়া গেলেন, ব’লেইছি তো, সোনার টুক্‌রো ছেলে নবনী, লিখেচে এই বুড়ো বয়েসে খাটুনি আমার পোষাবে না, অবসর নেয়াই সঙ্গত ; কাশী গিয়ে বাস করুন মোটা টাকা ধ’রে দেবো। আপনিই তো আমার বাবার ডান হাত ছিলেন, একছত্র আধিপত্য ক’রে আসচেন ; কাছারী বাড়ীটা সারাতে হবে, সে ভারটাও আমাকেই নিতে হবে হাজার হোক্ বিদ্বান্, গুণীর সমাদর তো ক’রবেই। আমাকে চাক্‌রী ছেড়ে দিতে ব’লেছে, এতে আমি যেন কিছু মনে না করি। এ এক রকম ভালই হোলো—কি বলেন, বুড়ো বয়েসে কি আর পোষায়? তার চেয়ে কাশীতে থাক্‌বো—

কার্তিক ১৩৪৪

বিবাহবার্ষিকী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে জল্পনাকল্পনা অনেকদিন ধরেই চলছিল। বিকাশ আর নন্দা তাদের বিয়ের দশম বার্ষিক উৎসব এবার ঘটা করে যাপন করবে। গরজটা বিকাশের চেয়ে নন্দারই বেশি। নন্দার দাদা বউদি, দিদি জামাইবাবু সহপাঠিনী বান্ধবীরা সবাই কত নতুন নতুন ভাবে তাদের বিয়ের দিনটিকে স্মরণ করে। কেউ কেউ স্ত্রীর জন্যে শাড়ি গয়না কিনে নিয়ে আসে, কেউ স্ত্রীকে নিয়ে শহরের বাইরে গিয়ে দিনটি কাটিয়ে আসে, গাড়ি থাকলে গাড়িতে যায়, না হলে ট্রেনে যায়, কেউ বাগানবাড়ি টাগানবাড়িতে গিয়ে পিকনিক করে, কেউ বা নিজের বাড়িতেই আত্মীয় স্বজনকে ডেকে খাওয়ায়। কতভাবে আমোদ-আহ্লাদ করে। ওসব দূরে থাকুক, নন্দা এমন কপাল করে এসেছে যে এ্যানিভারসারির দিনে ভাল একখানা শাড়িও তার জোটে না। প্রথম দু'চার বছর বিকাশ কবিতার বই আর ফুল নিয়ে আসত। ক বছর ধরে তাও গেছে। গতবার ছিল বিচ্চুর অসুখ, তার আগের বার নন্দা নিজেই টাইফয়েডে পড়েছিল। বিবাহ বার্ষিকীর দিনে বন্ধু-বান্ধব ফুল কি ধূপকাঠি কিচ্ছু আসেনি, ডাক্তার আর ওষুধ পথ্যই এসেছে। তার আগের বার নন্দা ওই সময়টাই বাবার কাছে কৃষ্ণনগরে ছিল। তার ফলে বিকাশের আর কোন খরচ হয়নি। খামে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েই স্মরণোৎসব শেষ করেছে।

বিকাশ হেসে বলে, 'দেখ ওসব বড়লোকের উৎসব বড়লোককেই মানায়। গরিবের কি ঘোড়া-রোগ সাজে। সবসাকুল্যে পাই তো আড়াই শো। তার মধ্যে বাড়িভাড়া দোকানপাঠ মাসকাবারি দুটি ছেলেমেয়ের খোরাক-পোশাক স্কুলের মাইনে, ডিসপেনসারির ওষুধের বিল মিটিয়ে এ্যানিভারসারি ট্যানিভারসারির কথা কি আর মনে থাকে? যদি বেঁচে-বর্তে থাকি, আর অবস্থাটা ততদিনে ভাল হয়ে যায় আমরা এক সেনটিনারি করব। বিবাহ শতবার্ষিকী। নামটা যেমন গালভরা হবে, উৎসবটাও তেমনি বেশ জমকালো করে করব।'

নন্দা রাগ করে জবাব দেয়, 'কষ্ট করে তোমাকে এতদিন অপেক্ষা করতে হবে না। আমার যা স্বাস্থ্য তাতে দু'চার বছরের মধ্যেই আমি তোমাকে রেহাই দিয়ে যেতে পারব। তখন ঘটা করে দ্বিতীয় পক্ষ কোরো।'

বিকাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গম্ভীরভাবে জবাব দেয়, 'অত তাড়াতাড়িই কি আর সে ব্যবস্থা করতে পারব? তার আগে একটা তাজমহল তৈরির ব্যয় আছে না?'

নন্দা রাগ করতে করতেও স্বামীর কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেলে বলে, 'ঈস আমার কী একজন শাজাহান রে।'

তারপর যথারীতি স্বামী স্ত্রীতে সন্ধি হয়ে গেল। বিকাশ বলল, 'আচ্ছা, তোমাকে এবার একখানা দামি শাড়ি কিনে দেব।'

নন্দা বলল, 'কী শাড়ি দেবে, বেনারসী?'

বিকাশকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে নন্দা ফের হেসে ফেলল। 'ভয় নেই গো, ভয় নেই। তোমার কাছে সত্যি সত্যি বেনারসীও চাইব না, সিল্ক জর্জেটও চাইব না। তাঁত দাও মিল দাও—যা তুমি হাত তুলে দেবে তাই আমার ঢের। তবে হাসিমুখে দিতে হবে কিন্তু। সব টাকা একখানা শাড়িতে ব্যয় করে বসব এমন বে-আক্কেল আমি নই।'

তারপর মাস ভরে নন্দার জল্পনা-কল্পনা চলে বিবাহবার্ষিকীর জন্যে বরাদ্দ করা টাকাটা তারা আর কত সার্থক ভাবে ব্যয় করতে পারে। নন্দার একবার ইচ্ছা হয় শাড়ি ফুল বই টই কেনা ছাড়াও দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে খাওয়ায়। গতবার ফাল্গুন মাসে বীথিকা ভবানীপুর থেকে তাদের ম্যারেজ এ্যানিভারসারিতে নিমন্ত্রণ করেছিল। বিকাশ যায়নি, কিন্তু নন্দা না গিয়ে পারেনি। কবিতার বই আর রজনীগন্ধায় টাকা আড়াই খরচ করেছিল। বীথিকা খাইয়েছিল খুব। পোলাও মুরগির মাংস দই মিষ্টি। অত না খাওয়াতে পারলেও বীথি আর পরেশবাবুকে একবার না বললে কি ভাল দেখায়? আর কিছু না হোক বন্ধুকে ডেকে যদি ডাল ভাত মাছের ঝোল খাওয়ানো যায় তাতেও শান্তি।

কিন্তু এমন স্বামীর হাতেই পড়েছে নন্দা—যার মনে কবিত্ব কল্পনা বলে কোন পদার্থ নেই। তার কেবল হিসাব আর হিসাব। মার্চেন্ট অফিসের একাউন্টস ডিপার্টমেন্টে আর যেন কেউ দুনিয়ায় কাজ করে না। তারা কি সবাই হিসাবের খাতাটা মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে আসে?

প্রীতিভোজের প্রস্তাবে বিকাশ বলে, 'খেতে বললে শুধু তো আর পরেশবাবু আর তাঁর স্ত্রীকে বললেই চলে না? আরও দু'চার জনকে বলতে হয়। সে এক বিয়ের খরচ। তোমার বাবা কি দ্বিতীয়বার সে খরচ বইতে রাজি হবেন?'

নন্দা রাগ করে বলে, 'দায় পড়েছে আমার বাবার। দরকার নেই তোমার কিচ্ছু করে, ফের যদি আমি এসব নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলি তাহলে আমার ফিরিয়ে নাম রেখ।'

কিন্তু নতুন নামে ডাকবার সুযোগ স্বামীকে নিজেই করে দেয় নন্দা। পরদিনই আবার নতুন প্ল্যান করে। ছেলে মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে স্বামীর মশারির মধ্যে এসে বসে, 'আচ্ছা যাক, দরকার নেই এবার আর কাউকে বলে। আসছে বছর বলব। এবার আমরা দুজনে ফটো তুলব. সিনেমা দেখব। সকাল বেলাটা বিচ্ছু আর বিবলুকে কোন জায়গা থেকে বেড়িয়ে আনব। তারপর দোতলার মাসিমার কাছে ওদের রেখে আমরা কোথাও বেরিয়ে পড়ব। দু'জনে এক সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ফুল কিনব, ধূপকাঠি কিনব, কী বল?'

বিকাশ বলে, 'আচ্ছা।'

নন্দা বলে, 'তারপর রাত্রে ফিরে এসে কী করব বল দেখি।' বিকাশ বলে, 'খাওয়া দাওয়াটা সেদিন বেশ ভালই হবে আশা করি। ভুরি ভোজের পর সহজেই ঘুম পাবে। দশটা বাজতে না বাজতেই দুজনেরই নাক ডাকতে থাকবে। বিয়ের দিন একটা সানাই বেজেছিল. এ্যানিভারসারির দিন দুটো সানাই বাজবে।'

নন্দা বলে, 'দেখ, ফের যদি ওসব কথা বল, আমি তোমার মুখ দেখব না। সেদিন রাত জেগে জেগে আমরা আমাদের সেই পুরনো চিঠিগুলি পড়ব। তখন কী সুন্দর সুন্দর চিঠিই না তুমি লিখতে। বারবার পড়লেও তা যেন আর ফুরোতে চাইত না। মাঝে মাঝে আবার কবিতা থাকত। কিছু রবীন্দ্রনাথের কিছু নিজের। তখনকার দিনের তোমার অনেক চিঠিই আমি যত্ন করে তুলে রেখেছি। আমার লেখা জবাবগুলির একটাও তোমার বাক্স সুটকেশে কোথাও খুঁজে পাইনি। আমার চিঠি তুমি রাখবে কেন। আমি তো আর ভাল লিখতে পারিনে। যারা পারত—তোমার সেই বান্ধবীদের চিঠি কিন্তু দু'চারখানা এখনও আছে।'

বিকাশ বলে, 'কী যে বল, আমার বান্ধবী টান্ধবী কেউ নেই। গৃহিণী বলতেও তুমি, সচিব বলতেও তুমি, সখি বলতেও তুমি।'

কথাটা একেবারে অসত্য নয়, ছেলেমেয়ে হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীজাতিরা অন্য কারও মুখ দেখা একেবারে বন্ধ না করলেও মন দেয়ানেয়ার পালা পুরোপুরিই শেষ করে ফেলেছে বিকাশ। বিশ্বাসহন্তার খড়্গ নন্দার ওপর যে পড়েনি সেজন্যে কৃতজ্ঞ। তার পরিচিত

অনেককে এ দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে।

বাদ প্রতিবাদের মধ্যে না গিয়ে নন্দা বলে, 'আমরা তাহলে রাত জেগে চিঠিগুলি পড়ব কী বল।'

বিকাশ আর আপত্তি করে না। বিয়ের দশ বছর পরে দুটি ছেলে মেয়ের মা হওয়া সত্ত্বেও নন্দা যে এতখানি রোমান্টিক থেকে গেছে সে কথা জেনে বিকাশের বরং আনন্দই হয়, বিস্ময়ও নিতান্ত কম হয় না। মনের এতখানি সজীবতা ও রাখতে পারল কী করে? নিশ্চয়ই সচ্ছল অবস্থার বান্ধবীদের কাছে সব গল্প শুনেছে, কি সৌখিন সমাজ নিয়ে লেখা নবেল টবেল পড়ে হাতের কাছে অন্য কোন পুরুষকে না পেয়ে বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে স্বামীর সঙ্গেই আর একবার প্রেমে পড়বার, কি পড়িপড়ি ভাব করবার সাধ হয়েছে নন্দার। যাই হোক এ সাধ এবার আর বিকাশ অপূর্ণ রাখবে না। পরিকল্পনা যে মঞ্জুর তা নন্দাকে সে জানিয়ে দিল।

ভোরবেলার চায়ের আসরেও এসব আলাপ আলোচনা হয়। ষোলই জ্যৈষ্ঠের আর বেশি দেরি নেই। আগে থেকেই তৈরি হতে হবে। নন্দা স্বামীকে অনুরোধ করে লাইফ-ইনসিওরান্সের কোয়ার্টার্লি প্রিমিয়ামটা যেন এমাসে না দেয় বিকাশ। সামনের মাসে না হয় কিছু ফাইন দিয়েই তা দেওয়া যাবে।

বিকাশ বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। ষোলই জ্যৈষ্ঠের অনুষ্ঠান ঠিক মতোই হবে।'

বিচ্ছু আর বিবলু গম্ভীর হয়ে বাপমার আলোচনা শোনে।

আট বছরের ছেলে বিচ্ছু বলে, 'মা, ষোলই জ্যৈষ্ঠ কার জন্মদিন? তোমার?'

নন্দা বলে, 'দূর বোকা।'

'বাবার?'

নন্দা হেসে বলে, 'দূর তা নয়।'

বিচ্ছুর ছোট বোন ছ'বছরের বিবলু বলে, 'দাদাটা বোকা। কিচ্ছু জানে না।'

বিকাশ হেসে বলে, 'তুই জানিস?'

বিবলু বলে, 'জানি। বিয়ের জন্মদিন। তোমাদের বিয়ের।'

বিকাশ হেসে উঠে স্ত্রীকে বলে, 'দেখেছ নন্দা—তোমার মেয়ে এখনই কি রকম সেয়ানা হয়েছে দেখেছ? ওকে যদি আট বছরে গৌরী দান না করতে পারি নবম বছর থেকে পাড়ার ছোকরাদের ও মাথা খেতে শুরু করবে তোমাকে বলে রাখলাম।'

কলের কাছে কাজ করে নন্দার ঠিকে ঝি সুখলতা। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর। কপালের সীমান্ত পর্যন্ত ঘোমটা টানা থাকলেও সে কর্তা গিন্নি দুজনের সঙ্গেই কথা বলে। হাসিতামাসায় যোগ দেয়। বিকাশ আর নন্দা দুজনেই ওকে প্রশ্রয় দিয়েছে। কাজ করতে এসে সুখলতা চা খায়, দু চারটে সুখদুঃখের কথার বিনিময়ও যে না হয় তা নয়। সুখলতা বাসন মাজে, বাটনা বাটে, কয়লা ভাঙে, উনুনে আঁচ দিয়ে দেয়। মাসে আট টাকা করে নেয়। বাইরের কাজ করলেও বিকাশ আর নন্দার ঘরের খবর সে রাখে। কত টাকা মাইনের চাকরি করে বিকাশ, ক'টাকার কাঁচা বাজার করে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন দিন কোন ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্য হয় তা পর্যন্ত সে আন্দাজ করে।

বিকাশের কথা শুনে সেদিন বাসন মাজতে মাজতে সুখলতা বলল, 'ষোলই জ্যৈষ্ঠ খুব ভাল দিন না দাদাবাবু?'

বিকাশ বলল, 'কেন বল তো? ভাল দিন নিশ্চয়ই। ক্যালেণ্ডারের লাল তারিখ না হলে কি হবে, আমাদের পক্ষে রাঙা শুক্কুরবার।'

সুখলতা বিকাশের কথার ব্যঞ্জনা সবখানি না বুঝতে পারলেও হাসল, 'আমাদের বস্তির

চক্কোত্তি মশাইও তাই বললেন। তিনটে লগ্ন আছে ওইদিন। তারার বিয়ে ওইদিনই ঠিক করে ফেললাম বউদি।'

তারা সুখলতার বড় মেয়ে। পনের ষোল বছর বয়স হয়েছে। মাথায় এক গোছ কোঁকড়ানো চুল। রঙটা ফর্সা। মুখখানা একটি পানের মতো। কথাবার্তা তত বলে না। কিন্তু ভাবভঙ্গি দেখলে বোঝা যায় মার মতোই বুদ্ধিসুদ্ধি রাখে।

এর আগে তারাকে মাঝে মাঝে সঙ্গে নিয়ে এসেছে সুখলতা। মেয়েকে দিয়ে নন্দার পান সাজিয়েছে, কি ময়দা মাখতে বসিয়েছে। তার বদলে চেয়েছে পুরনো শাড়ি ব্লাউজ। সময় সময় না চাইতেও দিয়েছে নন্দা। আহা বেচারা। না দিলে পাবে কোথায়?

নন্দা সুখলতার কথার জবাবে বলল, 'একেবারে ষোলই জ্যৈষ্ঠই ঠিক করে ফেললে? আমাদের কাছে একবার জিজ্ঞাসাও করলে না?'

বিকাশ পরিহাসের সুরে বলল, 'কেন ভালই তো হয়েছে নন্দা। আমাদের ফাংশনটা না হয় সুখলতার বাড়ি গিয়েই করা যাবে। তোমার মেয়ের বিয়েতে আমাদের নিমন্ত্রণ করবে তো সুখলতা?'

সুখলতা বলল, 'কী যে বলেন দাদাবাবু। আপনারাই তো মেয়ের বিয়ে দেবেন। আপনারা না দিলে আমার কি সাধ্য আছে ওই মেয়েকে নামানো? আমারও সাধ্য নেই, তারার বাপেরও সাধ্য নেই। বুড়ো নিত্যরোগা ঘর-ধরা হাঁপানির রোগী। আজ পাঁচ বছরের মধ্যে একটি পয়সা উপায় করেনি। সব আমাকে দেখতে হচ্ছে। আপনারা না দিলে আমি কোথায় পাব দাদাবাবু।'

বিকাশ কিছু বলবার আগে নন্দা বলে উঠল, 'তাইতো তোমাকে বলছিলাম সুখলতা। আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই মেয়ের বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেললে, এদিকে ওইদিন যে আমাদের একটা বাড়তি খরচ আছে।'

সুখলতা বলল, 'তা জানি বউদি। সেই বাড়তি খরচের মধ্যে দয়া করে একটু হাত ঝাড়বেন তাহলেই আমার হয়ে যাবে। পুরুত ঠাকুর বললেন দিনটা খুব ভাল। এদিকে পাত্রপক্ষেরও বেশ গরজ। মেয়ে খুব পছন্দ হয়ে গেছে। তাই আর দেরি করলাম না বউদি।'

সুখলতার মেয়ের বিয়ে আর নন্দার বিবাহবার্ষিকীর দিন একই সঙ্গে এগিয়ে আসতে লাগল। তোড়জোড় কোন পক্ষেরই কম নয়। নন্দা মনে মনে ঠিক করল, এদিনের সব খরচটা স্বামীর ঘাড়ে ফেলবে না। কাগজ বিক্রী করা টাকা যা সঞ্চয় করেছে তা তো নন্দার নিজেরই সম্পত্তি। তা এই উপলক্ষে ব্যয় করবে। গোপনে গোপনে আরও পাঁচ সাত টাকা যা জমিয়েছে তাও এই দিনের কল্যাণে ভাঙলে দোষ নেই।

কিন্তু সুখলতা ভারি অবুঝ মেয়েমানুষ। তার দাবিদাওয়ার যেন আর শেষ নেই! সে বাটনা বাটতে বাটতে এক মুখ হেসে বলল, 'বউদি', তারাকে কী দেবেন বলুন।'

নন্দা চুপ করে রইল।

সুখলতা বলল, 'তারাকে কিন্তু একখানা জিনিস দিতে হবে। হাতের হোক কানের হোক একখানা জিনিস আপনারা দেবেন। সারাজীবন আপনাদের দয়া মনে করে রাখব বউদি।'

নন্দা বলল, 'অসম্ভব। এমাসে আমি কিছুই খরচ করতে পারব না তা তোমাকে আগেই বলে দিয়েছি। এ মাসে আমার নিজেরই খরচের সীমা নেই।'

সুখলতা তখন বলতে আরম্ভ করল, 'ঘোষালরা কিন্তু কানের দুল দিয়েছে বউদি।'

নন্দা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তা দিক গিয়ে। যার যা সাধ্য সে তাই তো দেবে। আমার নেই কোত্থেকে দেব।'

শুধু ঘোষালরা নয়, দত্তরা মুখুয্যেরা চৌধুরীরা সবাই দামি দামি জিনিস দিয়েছে কি দিতে চেয়েছে সুখলতাকে। কেউ চুড়ি, কেউ দুল, কেউ সিল্কের শাড়ি, কেউ বা বাসন-কোসন। এদের কোন কোন বাড়িতে নতুন কাজ নিয়েছে সুখলতা। কোন বাড়িতে কাজ খুবই সামান্য। শুধু স্বামী স্ত্রীর দুখানা বাসন মেজে দেওয়া, তা সত্ত্বেও সুখলতার কন্যাদায়ে তাঁরা যথেষ্ট সাহায্য করছেন। নন্দারা পুরনো মনিব হয়ে যদি এমন বিমুখ হয় তাহলে সুখলতার মতো গরিবরা দাঁড়ায় কোথায়।

কিন্তু নন্দা কিছুতেই বেশি প্রতিশ্রুতি দিল না। সে বলল, 'পুরনো শাড়ি ব্লাউজ তুমি কম নাওনি আমার কাছ থেকে। তারপর ধার বলেই হোক, আর বকশিশ বলেই হোক—ফি বছরে বিশ পঁচিশ টাকা করে বেশি নিচ্ছ। তোমার মেয়ের বিয়েতে আলতা আর তেল সাবানের খরচ বাবদ পাঁচটা টাকা আমি ধরে দিতে পারি, তার বেশি এ মাসে কিছুতেই দিতে পারব না।'

সুখলতা বলল, 'তাহলে আপনি ধানদূর্বা দিয়েই তারাকে আশীর্বাদ করবেন বউদি। আর কিছু আপনার কাছে চাইব না।'

স্পর্ধা দেখ ঝি চাকরের! নন্দা ভাবল তখনই ওকে বিদায় করে দেয়। কিন্তু ঠিকে ঝি সুলভ নয়। তাই মনের রাগ মনেই চেপে রাখতে হল।

বিকাশ স্ত্রীকে আড়ালে ডেকে বলল, 'এক কাজ করো না। ভাঙাচোরা সোনা যদি কোথাও থাকে ওকে বের করে দাও, যা হোক কিছু একটা তৈরি করিয়ে নেবে।'

নন্দা বলল, 'থাকলে তো দেব। বিয়ের পর কত গয়না-গাঁটি তুমি আমাকে গড়িয়ে দিয়েছ। জানা আছে মুরোদ। বলে একখানা শাড়ি কিনে দিতে বললে প্রাণ ফেটে যায়।'

বিকাশ আর কথা না বাড়িয়ে অফিসে চলে গেল।

সুখলতা অবশ্য ধানদূর্বার ভরসায় রইল না। নন্দার কাছ থেকে পাঁচ টাকাই হাত পেতে নিল। বিকাশ নিজের পকেট খরচ থেকে গুনে আরও পাঁচ টাকা দিল সুখলতাকে। কিন্তু তাতেও কি ওর মন ওঠে? মুখে কিন্তু খুবই ভদ্রতা করল সুখলতা। মিষ্টি হেসে বলল, 'যাবেন কিন্তু দাদাবাবু। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একবার গিয়ে পায়ের ধুলো দিয়ে আসবেন বউদি। আশীর্বাদ করে আসবেন তারাকে। দেশে থাকলে আরও কত আমোদ-আহ্লাদ ব্যয়ভূষণ করে বিয়ে দিতাম বউদি। কিন্তু সে কপাল তো ওর নয়।'

নন্দা বলল, 'যাক গিয়ে জামাইটি তো ভালই পেয়েছ।'

সুখলতা বলল, 'হ্যাঁ বউদি, আপনাদের আশীর্বাদে ছেলেটি ভাল. বেলেঘাটায় নিজেরই সেলুন আছে। দু-তিনজন লোক তাতে খাটে। ভাল অবস্থা। মেয়েটাকে দেখে শুনে পছন্দ করেছে তাই। নইলে ও সম্বন্ধ কি আমরা করতে পারি?'

নন্দা ভাবল বিয়ের দিন একবার গিয়ে আশীর্বাদ করে আসবে। অত করে বলছে যখন। পাড়ার মধ্যেই ওদের বস্তি। তাদের সিমলাইপাড়া লেন থেকে মাত্র মিনিট কয়েকের পথ।

তবু যাই যাই করে যাওয়া হল না। সময়ই করে উঠতে পারল না নন্দা। সকাল থেকেই কাজ। কাল রাত্রে গিয়ে দোতলার মাসিমা মেসোমশাইকে খেতে বলে এসেছে। এই প্রৌঢ় দম্পতি তাদের দেখা শোনা করেন, খোঁজখবর নেন, ছেলেমেয়ে দু'টিকে ওদের কাছে রেখে নন্দা কোনদিন মার্কেটিং-এ যায়, কোনদিন বা সিনেমায়। পুরনো বান্ধবীদের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাতের ইচ্ছা হয় কোন কোন সময়। কোন একটা উপলক্ষে ওদের না বললে কি চলে?'

আর দুজন বাইরের লোককে খেতে বললেই তার জন্যে আলাদা বাজার করতে হয়, রান্না-বান্নার একটু বিশেষ ব্যবস্থা না করলে ভাল দেখায় না। ওদের আবার বেলায় খাওয়ার অভ্যাস। সব কাজ সারতে সারতে দুটো আড়াইটে বেজে গেল।

এদিকে বিচ্ছু আর বিবলু ভারি দুষ্টু হয়েছে। তারা বলে বেড়াচ্ছে, 'জানিস, আজ আমাদের বাবা মার বিয়ে।'

মাসিমা বলছেন, 'তাই নাকি বিচ্ছু? সম্প্রদান করবে তুমি বুঝি? তুমি তোমার মায়ের বাবা—না বাবার বাবা?'

বিচ্ছুও কম চালাক নয়, সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিচ্ছে, 'আমি মারও বাবা, বাবারও বাবা। আমাকে মাও বাবা বলে, বাবাও বাবা বলে।'

কী দুষ্টুই হয়েছে ছেলে!

বেলা গেলেও এইটুকু ভেবে নন্দার তৃপ্তি যে এমন দিনে অন্তত একটি সুখী দম্পতিকে এই উপলক্ষে আপ্যায়ন করে আজ তাঁদের আশীর্বাদ নিতে পেরেছে। বাপ-মা দূরে থাকেন। তাঁদের তো বলতে পারল না। কিন্তু তাঁদের বয়সী দুজনকে বলল।

অনেক বলা-কওয়ার পর বিকাশ সত্যিই সেদিন অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে। বাজার করেছে, ছেলে-মেয়ে দুটিকে নিয়ে প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসেছে। ওদের টফি আর চকোলেট কিনে দিয়েছে। সবই নন্দার বুদ্ধি, তারই পরামর্শ। বিকেলে বাপ-মাকে এক সঙ্গে বেরোতে দেখে ওদের যাতে হিংসা না হয় সেই জন্যেই এই সব ব্যবস্থা।

তবু গোলমাল যেটুকু হবার তা হলই। নন্দাকে সেজে-গুজে বিকাশের সঙ্গে বেরোতে দেখে বিচ্ছু আর বিবলু দুজনেই বায়না ধরল তারাও যাবে।

বিকাশ পরিহাস করে বলল, 'ক্ষতি কি, ওরা বরযাত্রী হিসেবে আসুক না সঙ্গে।'

নন্দা বলল, 'তোমার কেবল ঠাট্টা। ব্যাপারটাকে তুমি মোটেই সিরিয়াসলি নিচ্ছ না!'

ভুলিয়ে টুলিয়ে বিচ্ছু ও বিবলুকে মাসিমার কাছেই গছিয়ে রেখে গেল নন্দা। আজ তার ওদের নিয়ে বেরোবার মোটেই ইচ্ছা নেই। আজ কয়েক ঘণ্টার জন্যে সে শুধু প্রিয়া। জননীও নয়, গৃহিণীও নয়। কিন্তু বেশি দূর বেড়ানো হল না। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, বিকাশের দৌড় শ্যামবাজার। নড়তে চড়তে তার ভাল লাগে না। ছুটির দিনে আয়েস করে শুয়ে বলে ঘুমিয়েই সে তৃপ্তি পায়। আলস্যের চেয়ে সংসারে বড় উপভোগ্য তার কাছে যেন আর কিছু নেই।

তবু অনেক আশ্চর্য কাণ্ড করল বিকাশ। রেস্টুরেন্টের পর্দা ঢাকা কেবিনে বসে স্ত্রীকে নিয়ে চা আর ফাউল কাটলেট খেল। ছোট একটা স্টুডিওতে ঢুকে যুগল ফটো তুলল-- যাতে বিকাশের চিরদিনের আপত্তি। নাইটশোয়ের সিনেমার টিকিট কিনল দু'খানা। কাপড়ের দোকানে ঢুকে পঁয়ত্রিশ টাকা দামের সিল্কের শাড়ি কিনে বসল। অবাক কাণ্ড।

নন্দা লজ্জিত হয়ে বলল, 'এ কী করলে বল তো। শাড়ির জন্যে আঠেরো টাকার বেশি তো বরাদ্দ ছিল না।'

বিকাশ বলল, 'বরাদ্দ কথাটা বড় বেশি গদ্য ঘেঁসা। আধুনিক কবিতাতেও ওর ব্যবহার নেই। শাড়িটা তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা তাই বল। পাড় জমিন—'

নন্দা খুশি হয়ে বলল, 'দুইই চমৎকার! আমার পছন্দের চেয়ে তোমার পছন্দ ঢের বেশি ভাল। কিন্তু খরচে কুলোবে কী করে। এত টাকা পেলেই বা কোথায়?'

বিকাশ বলল, 'সেজন্যে ভেবো না। কারও তবিল তছরুপ করিনি, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

নন্দা বলল, 'কিন্তু আমি তো তোমাকে কিছু দিলাম না।'

বিকাশ আবৃত্তির সুরে বলল, 'গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়। তোমরা তো নেওয়ার ভিতর দিয়েই দাও।'

তবু চার আনা দিয়ে একটি বেল ফুলের মালা কিনে নিল নন্দা।

তারপর ওরা বাড়ি ফিরল। ছেলেমেয়েদের খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে মাসিমাকে পাহারায়

রেখে ওরা নটার শোয়ে সিনেমা দেখতে যাবে। টিকিট তো কাটাই আছে। দশ.বারো মিনিট দেরি হলেও কিছু এসে যাবে না।

বাসায় পৌঁছে নিজের শোবার ঘরে এসে মালা গাছটি স্বামীর গলায় পরিয়ে দিতে যাচ্ছিল নন্দা, বিকাশ বাধা দিয়ে বলল, 'এখন না পরে। আজ তো একই সঙ্গে বিয়ে বাসি বিয়ে আর ফুল শয্যা। ফিরে এসে ধীরে সুস্থে সব সারব। এবার ছেলেমেয়েদের ভোজনপর্বটা আগে সেরে ফেল।

তাই সারল নন্দা। খাওয়াবার পর ওদের ঘুমোবার ব্যবস্থা করল। মাসিমাকে আর একবার অনুরোধ করল ওদের দিকে চোখ রাখতে। তারপর সিনেমায় যাওয়ার জন্যে নতুন শাড়িটি পরতে যাচ্ছে দরজার কড়া নড়ে উঠল।

'কে?'

'আমি মনোমোহন।'

সুখলতার সেই বুড়ো স্বামী হাঁপানির রোগী মনোমোহন হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছে।

এর আগেও দু-একবার টাকা চাইতে, কি স্ত্রীর কাজ কামাইয়ের কৈফিয়ৎ দিতে এ বাড়িতে এসেছে মনোমোহন। বিকাশ ওকে চেনে। কুঁজো, কুদর্শন চেহারা। একবার দেখলে আর ভোলা যায় না।

বিকাশ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী ব্যাপার। তোমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে?'

'না বাবু।'

'কেন বর আসেনি?'

মনোমোহন সব খুলে বলল। বর এসেছে। তবু সমস্যা মেটেনি। কারণ বিভ্রাট বর নিয়ে নয়, শাঁড়ি নিয়ে। লাল রঙের যে দামি শাড়িখানা সুখলতার পিসতুতো ভাই অমূল্যধনের দেওয়ার কথা তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। সে পালিয়েছে। এই রাত্রে চেতলা থেকে তাকে আর খুঁজে আনা সম্ভব নয়। এদিকে দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। বাড়তি টাকাই বা কোথায়। ভাল শাড়ির অভাবে বিয়েই বন্ধ হতে বসেছে।'

বিকাশ বলল, 'নতুন লালপেড়ে যে কোন একখানা শাড়ি পরিয়ে বিয়ে দিয়ে দাও।'

মনোমোহন কাতরভাবে বলল, 'তা দেওয়ার উপায় নেই বাবু। বরের কাকা বড় সেয়ানা। সে ঘটিবাটি শুদ্দু সব জিনিস মিলিয়ে নিচ্ছে। একচুল এদিক ওদিক হলেও ভাইপোর বিয়ে দেবে না। আমার জান যাবে বাবু। একখানা নতুন কাপড় আমাকে দিতেই হবে।'

বিকাশ ফিরে এল ঘরে। স্ত্রীর কাছে এসে বলল, 'কী ব্যবস্থা করা যায় বল দেখি। শুনেছ তো সবই।'

নন্দা বলল, 'শুনেছি। কিন্তু এক বর্ণও বিশ্বাস করিনি। সুখলতা জানে আজ আমার শাড়ি আসবে। তাই ছলেবলে সেখানা আদায় করে নিতে এসেছে। ওরা ঠগ-জোচ্চোর বদমাস। আমি ওদের কথা একবিন্দুও বিশ্বাস করি না।'

বিকাশ স্ত্রীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'ছিঃ নন্দা। মানুষকে অত ছোট ভেব না। তাতে নিজেই ছোট হয়ে যাবে। শাড়ির অভাবে একটি গরিবের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, আর তুমি বুড়ো বয়সে জমকালো শাড়ি পরে সোহাগ করছ, আর ওদের গালাগাল দিচ্ছ, মজা মন্দ নয়।'

নন্দা চিৎকার করে উঠল, 'চুপ, চুপ কর। তোমার দরদ যে কী জন্যে তা আর আমার টের পেতে বাকি নেই। আমি বুড়ি? তুমি তো চিরযৌবনের দখলী স্বত্ব নিয়ে এসেছ, যাও তাই ভোগ কর গিয়ে। আমার কাছে আর তোমায় আসতে হবে না।'

স্বামীর পাশ কাটিয়ে হাত এড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল নন্দা। তারপর মনোমোহনের

হাতে নতুন কেনা সিল্‌কের শাড়িখানি নিঃশব্দে তুলে দিল। বিস্মিত মনোমোহন কী যেন বলতে যাচ্ছিল। নন্দা তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'যাও, এক্ষুণি চলে যাও। আর কথা নয়।'

প্রায় শেষ রাত অবধি ঝগড়াঝাটি কান্নাকাটি পালা চলল। নন্দা বারবার বলতে লাগল, বিকাশের মতো স্বামীর হাতে পড়ে জীবনে একদিনের জন্যেও সে সুখী হয়নি। চিরকাল তার দুঃখে দুঃখে গেল। যতদিন যত রকমের দুর্ব্যবহার তার সঙ্গে করেছে বিকাশ, নন্দা তার ফিরিস্তি দিতে লাগল।

বিকাশ বিদ্রূপ করে বলল, 'তোমার যেমন স্মৃতিশক্তি তেমনি কল্পনাশক্তি।'

শেষরাত্রে প্রায় ভোর ভোর সময় স্ত্রীর ঘুমন্ত বিষণ্ণ মুখখানির দিকে চেয়ে বিকাশের বড় মায়া হল। ভিজে চোখ দুটিতে চুম্বন করল। ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে দিল চুম্বনে চুম্বনে।

নন্দা চমকে জেগে উঠল। তারপর গভীর অভিমানে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি ছোট, আমি হীন, আমি তোমার যোগ্য নই।'

কিন্তু বিকাশ কিছুতেই স্ত্রীকে ছেড়ে দিল না। জোর করে ধরে রাখল। তারপর এ ধরনের দাম্পত্য কলহের ফল যা হয় সেই বাঞ্ছিত পরিণতি হল। মিল হয়ে গেল দুজনের।

নন্দা স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে বলল, 'একটা কথা বলব, বল রাখবে?'

বিকাশ বলল, 'বল!'

নন্দা বলল, 'কাউকে যেন বল না, আমি শাড়িখানা ওদের রাগ করে দিয়েছি।'

বিকাশ স্ত্রীকে আরও টেনে নিয়ে অতি অনায়াসে একটি মধুর মিথ্যা উচ্চারণ করল, 'বাঃ রাগ করে দিতে যাবে কেন? তুমি ইচ্ছা করে দিয়েছ, খুশি হয়ে দিয়েছ। নাহলে কি আর দিতে?'

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫

অভিনেত্রী

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

চুলে কলপ, বাজপাখী প্যাটার্ন বাঁকানো নাক, খুদে চোখ কিন্তু চাউনি ধারালো, ঝুলে পড়া ঠোঁট। দু-হাতে আটটা আংটি। পলা, পান্না থেকে গোমেদ। কখন কোন্ গ্রহ রুষ্ট হয় বলা মুস্কিল। কোঁচানো ধুতি, গায়ে ঝলঝলে পাঞ্জাবী।

পারুল ঢুকতেই হরগোবিন্দবাবু হাত থেকে গড়গড়ার নলটা সরিয়ে রাখলেন। ঘর খালি। এখন লোকজন আসার সময়ও নয়। আপাদমস্তক দেখলেন চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে। চেহারা তো নিন্দার নয়। আটসাঁট গড়ন, বাড়ন্ত পুঁইডগার মতন চিকচিকে ভাবও একটা আছে। কিন্তু হয়তো ওই চেহারা সর্বস্ব। মুখ দিয়ে একটি কথা বলাতে গেলেই দাঁত-কপাটি হল ভর্তি, মানুষের সামনে দাঁড়াতে হ'লেই মূর্ছা।

পারুলকে ডিঙিয়ে হরগোবিন্দবাবু অমিয়নাথের দিকে চোখ ফেরালেন।

—তারপর অমিয়নাথ কি খবর বলো?

অমিয়নাথ চৌকাঠের কাছ বরাবর দাঁড়িয়েছিল, এবার ঘরের মধ্যে এলো। হরগোবিন্দবাবুর সামনে এসে মুচকি হাসির ভান করে বলল, খবর তো আপনার সামনে এনে হাজির করেছি স্যর।

আর একবার হরগোবিন্দবাবু পারুলের দিকে চাইলেন। জরিপ করার ভঙ্গীতে চোখ কুঁচকে দেখলেন—তারপর অমিয়নাথের দিকে ফিরে বললেন, কি নাম?

অমিয়নাথ নয়, পারুলই বলল নাম।

—এ লাইনে আগে এসেছিলে কখন? মানে অভিনয়-টভিনয় করেছিলে এর আগে?

অভিনয় যে করেনি তা হরগোবিন্দবাবুর জানা। এ ব্যবসায় আজ ত্রিশ বছরের ওপর রয়েছেন। এক নজরে সব বলে দিতে পারেন। শুধু পারুলের গলার আওয়াজটা পরখ করতে চেয়েছিলেন। মিহি না মোটা, মিষ্টি না কর্কশ।

দু-এক মিনিট পারুল ভাবল। মেয়েদের আবার অভিনয় শিখতে হয় নাকি। এ তো ওদের সহজাত। ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের মধ্যে মিশে যায়। তা ছাড়া অভিনয়ে যে পারুল কত দক্ষ তার সাক্ষী-সাবুদও আছে। সেকেণ্ড মাস্টারকে ডেকে আনতে হয় কুসুমপুর থেকে, কিংবা নিখোঁজ হওয়া তারাচরণকে। মুখে রঙ মাখেনি বটে পারুল, ফ্লাড লাইটের উগ্র আলোয় দাঁড়ায়নি, কিন্তু অভিনয়ে আশ-পাশের লোকের তারিফ কুড়িয়েছে। নির্ভেজাল প্রশংসা।

কিন্তু এসব কথা তো আর বাণীপীঠের মালিককে বলা যায় না। পায়ের নখ দিয়ে পারুল মেঝে আঁচড়ালো। থে'ম থেমে বলল, না এ লাইনে কোনদিন ছিলাম না, কিন্তু আমার মনে হ'চ্ছে আমি পারবো। ঠিক পারবো।

এ আত্মপ্রত্যয়টুকু হরগোবিন্দবাবুর খুব ভাল লাগল। এর দাম আছে। নিজের চোখে দেখেছেন। শাড়ী জড়ানো জড়ভরত মেয়ে, জড়িয়ে জড়িয়ে হাঁটে, যুক্তাক্ষর উচ্চারণ করতেই ঘায়েল, কিন্তু মনের জোরে ঠিক উৎরে গেছে। কোথা থেকে সাহস এনেছে মনে, সারারাত জেগে পার্ট মুখস্থ, মোশন মাস্টারের প্রাণান্ত, কিন্তু ঠিক দাঁড়িয়ে গেছে। চাকরাণী থেকে রাজরাণী, বাঁদী থেকে বেগম ধাপে ধাপে ওপরে উঠেছে।

—একটু বসো। মোশনমাস্টার এসে পড়চে এখনি। দু-একটা লাইন আওড়ালেই বুঝতে পারবো।

পারুল এদিক-ওদিক চাইলো। ঘরের এক কোণে একটা সতরঞ্জ জড়ো করা। বসতে হলে ওটাই পাততে হয়।

অমিয়নাথই সরে এলো। হাত দিয়ে সতরঞ্জটা টেনে পেতে দিল এদিকে। নিজেও বসলো, পারুলকেও বসালো।

—নতুন বই কিছু ধরছেন নাকি? অমিয়নাথ জিজ্ঞাসা করল। সরিয়ে রাখা গড়গড়ার নলটা হরগোবিন্দবাবু মুখে তুললেন। অল্প ধোঁয়া ছাড়লেন—তারপর ভ্রূ কুঁচকে বললেন, না, মিছিমিছি খরচ করে নতুন বই নামিয়ে লাভ কি। যত ভিড় তো কেবল সিনেমার দরজায়। থিয়েটার ফাঁকা। গড়ে পিটে এক একজনকে মানুষ করছি আর অমনি ডিরেক্টররা এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে--টাকার লোভ দেখিয়ে। পূজো অবধি পুরনো বই-ই চালাবো। দেখি বাজারটা।

হরগোবিন্দবাবু কথা শেষ করবার আগেই সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ। হাসির আওয়াজ। শাড়ীর আঁচলে মুখ মুছে পারুল ঠিক হয়ে বসলো।

দুটি ভদ্রলোক, পিছনে একটি মেয়ে।

হরগোবিন্দবাবু মেয়েটির দিকে চাইলেন, কটা বেজেছে খেয়াল আছে?

মেয়েটি নাকি-সুরে উত্তর দিল, আমি কি করব, আমি তো বেলা দুটো থেকে রেডি। ওই মাস্টার মশাইয়ের কাণ্ড। ম্যাটিনিতে সিনেমায় নিয়ে গেলেন। বাব্বা, কি বই। মাথা ধরে গেছে।

নাদুস-নুদুস মাঝবয়সী ভদ্রলোকটি হাসল, তোমরা তো সিনেমা সিনেমা করে পাগল। তাই তোমাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম, তবু যদি চোখ ফোটে।

—কি বই মাস্টার? হরগোবিন্দবাবু নল টানার ফাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—ধূসর ধরণী। আমাদের পারিজাত দেবী যে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

—কোন্ পারিজাত? হরগোবিন্দবাবু ঠিক চিনতে পারলেন না। ঝাঁক ঝাঁক পায়রা উড়ে এসে বসেছে। কেউ মাসখানেক থেকেছে, কেউ বা আবার বছরের পর বছর। নানা রংয়ের, নানা জাতের। সকলকে মনে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু সিনেমায় নায়িকার পার্ট করছে এমন মেয়েকে তো মনে থাকবার কথা।

—কে বল দেখি মাস্টার। আমার তো ঠিক ঠাওর হচ্ছে '। মোশন মাস্টার হেসে উঠল ভুঁড়ি দুলিয়ে।

—আরে আপনি চিনবেনই বা কেমন করে। আমার বলাই অন্যায় হয়েছে। এখানে তো নাম ছিল পাঁচী।

পাঁচী। হরগোবিন্দবাবু একটু ভাবতেই মনে পড়ে গেল। প্যাঁকাটি প্যাঁকাটি চেহারা। হাতে মাদুলীর বোঝা। মেদিনীপুর না কোথা থেকে এসেছিল। মাসের মধ্যে দশদিন ম্যালেরিয়ায় কোঁ কোঁ করতো। একদিন তো স্টেজে নাদিরার পাট করতে করতেই জ্বর এসে গেল। সে কি কাণ্ড। লোকেরা হৈ রৈ চেঁচামিচি করাতে ড্রপই ফেলে দিতে হ'লো। সেই পাঁচী পারিজাত হয়েছে সিনেমায়। সর্বনাশ। গলাটা মেয়েটার ভাল ছিলো। টিকে থাকলে একদিন ভালই হ'তো। কিন্তু সিনেমায় টিকে থাকলে দিতে তো। পাঁচী পারিজাত হচ্ছে, পদি-পদ্মিনী। হরদম।

—যাক্। গড়গড়ার নলটা হরগোবিন্দবাবু ছেড়ে দিলেন, যার যা ইচ্ছা করুক। মাস্টার, এই একটি মেয়ে অমিয়নাথ এনেছে, দেখো দেখি পরখ করে।

সঙ্গে সঙ্গে সব কটা চোখ পারুলের ওপর পড়লো। এতক্ষণ কেউ দেখেও দেখে নি। রোজ রোজ কত মেয়ে আসছে। সকলের দিকে চোখ ফেরাবার মতন অঢেল সময় কোথায়। কিন্তু এ মেয়ের বিশেষত্ব আছে। অমিয়নাথ এনেছে। এতদিন 'বাণীপীঠে' বই যোগাতো অমিয়নাথ, আজকাল মন্দার বাজারে বুঝি এসবও যোগাচ্ছে।

—চেহারা তো মন্দ নয়, নস্য নাকে দিতে দিতে মোশন মাস্টার বলল, এখন রাঙা পলাশ না হ'লেই বাঁচি।

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা বই বের করে, পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় থামলো, নাও দেখি ওঠো, একটা লাইন বল দেখি। শানুবাবু আপনিও উঠুন।

—আবার আমাকে কেন? ভদ্রলোক আড়ামোড়া ভাঙলো। হাই তুললো একবার, তারপর ভ্রূ দুটো কায়দা-মাফিক তুলে জিজ্ঞেস করলো, কোনখানটা?

—ওই যে শম্বুক হত্যার সিনটা। তুমি রামের প্রক্সিটা দাও। আর তুমি তুঙ্গভদ্রা। স্বামীকে হত্যা করার জন্য অভিশাপ দিচ্ছে রামচন্দ্রকে।

না। এমনি দাঁড়াতে গেলেই বোধ হয় ছিটকে পড়বে মেঝেয়। আন্দাজে বুঝতে পারলো কপালে ঘামের ফোঁটা জমেছে। তালু পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ। একটু জল পেলে হতো। এক চুমুক।

এদিক ওদিক চাইতে গিয়েই অমিয়নাথের চোখে চোখ পড়ল। আকুল আগ্রহই কেবল নয়...অমিয়নাথের দৃষ্টিতে প্রত্যাশার আভাস। মনে মনে পারুল দৃশ্যটা কল্পনা করে নিল। পায়ের তলায় অমিয়নাথের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। এই মৃত্যুর জন্য দায়ী শানুবাবু।

মোশন মাস্টারের কথা শুনে শুনে পারুল বলে গেল। ভয় কম্পিত গলার স্বর। চড়াতে গিয়ে পারলো না। কিন্তু তাতেই কাজ হলো। হরগোবিন্দবাবু কানের দু'পাশে দুটো হাত রেখে শুনলেন। উটপাখীর মতন গলা বাড়িয়ে।

মোশন মাস্টার তারিফ করল, অবশ্য খুব উচ্ছ্বসিত না হয়ে--গলা ভাল, তবে আরো মাজা-ঘষা করতে হবে। একটু ফ্ল্যাট, ওঠানামা নেই গলার।

—মাস্টার, হরগোবিন্দবাবু কথা বললেন, শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। হাতে সময়ও তো আর বেশী নেই।

পারুল বহাল হ'ল। মাইনেপত্র সব কিছু অমিয়নাথই ঠিক করবে। কথা হবে হরগোবিন্দবাবুর সঙ্গে। দিন সাতেক পর থেকেই মহলা শুরু হবে।

ঘোড়ার গাড়ীতেই দুজনে ফিরল। অমিয়নাথ আর পারুল।

বাড়ীর দরজায় নেমেই অমিয়নাথ পিছিয়ে এলো। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওপরের বারান্দায় মোট ঘাট বাক্স, বিছানা, ঘটি বাটি। তারই একটার ওপর অমিয়নাথের মা বসে।

—সর্বনাশ, মা ফিরে এসেছেন।

পারুল পা ঝুলিয়ে নামতে যাচ্ছিলো, অমিয়নাথের কথায় গুটিয়ে নিলো নিজেকে।

—উপায়? ফিসফিসিয়ে অমিয়নাথকে জিজ্ঞাসা করলো।

উপায়! ভেবে কূলকিনারা পেলো না। একমাত্র উপায়, বাণীপীঠে ফিরে যাওয়া। হরগোবিন্দবাবুকে ব'লে ওখানেই থাকার বন্দোবস্ত করা। ঘর আছে অবশ্য গোটা দুয়েক। আগের দিকে দু-একজন অভিনেত্রী থাকতো, কিন্তু পারুলের হয়তো অসুবিধা হবে।

কথাটা পারুলকে বলতেই সে মুখ নাড়লো, হলোই বা একটু অসুবিধা, তার আর উপায় কি? অমিয়নাথের বাড়ীতে গিয়ে ওঠবার পথ তো বন্ধ। কি পরিচয় দেবে অমিয়নাথ মায়ের কাছে। কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির থেকে এটিকে সংগ্রহ করেছি। জাত জানি না, পরিচয় জানি না, হেঁসেলের ভার তুলে দিয়েছি হাতে, খেলাঘরের সংসারে বৌ বৌ খেলার মতন ঘর করছি একে নিয়ে।

হরগোবিন্দবাবু ছিলেন না, হিন্দুস্থানী দরওয়ান ছিলো। অমিয়নাথকে জানে অনেক বছর ধরে, সেই বন্দোবস্ত করে দিলো। রাত্রে দোকান থেকে খাবার আনা, জলের ব্যবস্থা সব করে দিলে।

অমিয়নাথ কথা দিলো, পরের দিন পারুলের বাক্সটা দিয়ে যাবে।

যাবো যাবো করেও অনেকক্ষণ অমিয়নাথ গেলো না। ঘোরাঘুরি করলো বারান্দায়।

—কি হলো, এখনও দাঁড়িয়ে যে? ওদিকে বুড়ী মা বন্ধ দরজার সামনে বসে আছেন। পারুল তাগাদা দিল।

—যাচ্ছি। অমিয়নাথ সোজাসুজি চাইলো না পারুলের দিকে। চাইতে পারলো না। অনেকদিন ঘর-করা-বৌকে যেন ছেড়ে যাচ্ছে এমন ভাব।

—যাও, আবার কাল এসো, পারুল এগিয়ে এসে দাঁড়ালো অমিয়নাথের মুখোমুখি।

অমিয়নাথ আর দাঁড়ালো না। তর তর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো।

মাসখানেক, তার মধ্যেই পারুল অনেকটা তৈরী হ'য়ে নিল। আর দাঁড়ালে তেমন পা কাঁপে না, গলার আওয়াজেও কোন জড়তা নেই। পাঠও বেশ মুখস্থ হ'য়ে এসেছে।

মাঝে মাঝে রিহার্সালে অমিয়নাথ থাকে। মহড়ার শেষে ঘর-সংসারের কথা হয়। অমিয়নাথ বলে, পারুল শোনে।

—জানো, অমিয়নাথ মুখ টিপে হাসলো, মা খুব ধরেছে। কিছু পারুল বুঝলো। কিন্তু না বোঝার ভান করলো।

—কি ব্যাপার?

—মানে, দক্ষিণেশ্বরে কাকে দেখে মার খুব পছন্দ হয়েছে, সেখানে পাকা কথা দিতে চায়।

—বা, এ তো সুখবর। রাজা হয়ে গেছো নিশ্চয়।

—হুঁ অমিয়নাথ ঘাড়া নাড়লো মাথা নিচু করে। আস্তে আস্তে বললো। গলার স্বরে খেদের মিশেল।

—নিজেরই অন্ন জুটছে না, আবার লোক বাড়াবো।

পারুলের বুকের মাঝখানটা ধ্বক্ ক'রে উঠলো। জ্বালা করে উঠলো চোখ দুটো। শুধু টাকা পয়সার কথাটাই অমিয়নাথের মনে পড়লো। বাড়তি একটা মুখের গ্রাস জোটাবে কোথা থেকে সেই। এ কথা একবারও বললো না, এতদিন ঘর করছে পারুলকে নিয়ে, অন্য কাউকে সে জায়গায় বসাতে চাইছে না। শুধু পারুলের মুখ চেয়েও তো বলতে পারতো এমন একটা কথা।

অমিয়নাথ চলে যাবার পর পারুল বারান্দায় হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল। এখনো বাতি জ্বালানো হয় নি। সিঁড়ির খাঁজে খাঁজে জমাট অন্ধকার। অনেকটা ওর অনাগত জীবনের মতই। শ্যাওলার মতন ভেসে বেড়াচ্ছে। এক ঘাট থেকে আর এক ঘাট। মাটির আশ্রয় নেই, শত জীবনের বাঁধন নয়, ঢেউয়ের তালে তালে শুধু ভেসে যাওয়া। দুহাত দিয়ে যখনই যাকে আঁকড়ে ধরতে গেছে, সেই ছিটকে সরে গেছে। এ ঘরবাঁধার খেলায় হার হয়েছে পারুলের। জীবনে অসহ ক্লান্তি, মরারও সাহস নেই পারুলের। কিন্তু কতদিন কাটবে এই জীবন্মৃত অবস্থায়।

বারান্দায় আঁচল পেতে পারুল শুয়ে পড়ল।

অনেকগুলো পায়ের শব্দে পারুলের তন্দ্রা ভেঙে গেল। উঠে বসল ধড়মড়িয়ে।

হরগোবিন্দবাবুর গলা, কই গো, কোথায় গেলে। ঘরদোর অন্ধকার কেন। বাতিটা জ্বালাও।

বেসামাল কাপড় ঠিক ক'রে পারুল সুইচ টিপে দিলো।

প্রথমে হরগোবিন্দবাবু, পিছন পিছন দুজন কুলি একটা তক্তাপোষ বয়ে আনছে।

মেঝেয় শোয়াটা ঠিক নয় এ সময়ে। ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লেগে গেলেই সর্বনাশ। গলা ধরে যাবে, ছিটে ফোঁটা আওয়াজ বের হবে না গলা দিয়ে।

হরগোবিন্দবাবুর নির্দেশে তক্তপোষ ঘরের মধ্যে পাতা হ'লো। দেয়াল ঘেঁসে। হরগোবিন্দবাবু কুলিদের বিদায় দিয়ে তক্তপোষের ওপর বসলেন।

—বেশ মন দিয়ে শেখো। এ লাইনে নাম করতে পারলে পয়সার অভাব থাকবে না। সিনেমার

লোকদের একেবারে পাত্তা দেবে না। বুঝলে। ওরা এক একটি মাথা বিগড়োবার যম।

হরগোবিন্দবাবু গলার স্বর পালটালেন।

—এখানেই থেকে যাও। কোন অসুবিধা হ'লে আমাকে বলো। আমি মাঝে মাঝে আসবো, এখন এই নাও।

হরগোবিন্দবাবু হাত প্রসারিত করে দিলেন। হাতে দশ টাকার নোট।

—নাও, রেখে দাও। খাওয়া দাওয়ার খরচ তো আছে। ভগবানের ইচ্ছায় পূজোর সময় বইটা যদি জমে যায় তা হ'লে আর দেখতে হবে না। তখন দেখবে হরগোবিন্দর বুকের পাটা। দিতে থুতে একটুও পিছপা নয়।

কথার মাঝখানই হরগোন্দিবাবু দাঁড়িয়ে উঠলেন, উঠি আজ। সিন টিন দু একখানা আঁকাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। আর বেশী সময়ও নেই হাতে।

হরগোবিন্দবাবুর বরাত—না পারুলের কপাল বোঝা গেলো না। মাস কয়েকের মধ্যেই অবস্থা পালটে গেলো। শুধু অবস্থাই নয়, নামও পালটে গেলো পারুলের। পারুল থেকে পলি। ওরই নাম দিয়ে বাণীপীঠের বিজ্ঞাপন শুরু। ফুলের তোড়া, হাততালি, কাগজে কাগজে পাতাজোড়া প্রশংসা, মন কেড়ে নেওয়া ঢঙে নিত্য নতুন ফটো।

হরগোবিন্দবাবু আগে সপ্তাহে একদিন আসতেন খোঁজ খবর নিতে। এখন রোজ বিকেলে আসেন একবার। উপদেশ, পরামর্শ। থিয়েটার ছেড়ে কোনদিন সিনেমার নেশা না পেয়ে বসে সে বিষয়ে সৎযুক্তি।

আগে ফাঁকা ছিলো দেয়াল। এখন গোটা পাঁচ ছয় ছবি টাঙানো হ'য়েছে। হরগোবিন্দবাবুই পাঠিয়ে দিয়েছেন। গঙ্গাবতরণ, কালীয়দমন থেকে শুরু করে কংসবধ আর সমুদ্র-মন্থনের ছবি। ওরই মধ্যে হরগোবিন্দবাবুর ফটোও আছে। ছোট সাইজের। তা আর দোষের কি। অন্নদাতা জীবনদাতারই সামিল। যত্ন করে পারুল সে ছবিও টাঙিয়েছে। পাঞ্জাবী চাদর জড়ানো হরগোবিন্দবাবুর যৌবনের ছবি।

ধাপে ধাপে পারুল যত উঠেছে ওপরে, আস্তে আস্তে অমিয়নাথ তত সরে গিয়েছে দূরে। মাঝে মাঝে অভিনয়ের শেষে গ্রীনরুমের দরজায় দেখা হয়েছে।

—এখনও যে গালে কপালে রঙ লেগে রয়েছে, অমিয়নাথ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে।

—ও রঙ নয়, কালি। হাজার ধুলেও উঠবে না। পারুল মৃদু হেসেছে। তারপর তোমার খবর কি? বিয়ে-থা করলে বৌকে একবার দেখালেও না। পারুল ফুলের তোড়াগুলো জড়ো করতে করতে বলেছে।

অমিয়নাথ আর দাঁড়ায় নি। ছলছুতো ক'রে মিশে গেছে ভিড়ের মধ্যে। দিনকতক একেবারে গা-ঢাকা। ধারে কাছে কোথাও দেখা যায় নি।

অমিয়নাথকে দেখা গেল দিন সাতেক পরে। উস্কো খুস্কো চুল। অপরিচ্ছন্ন পোষাক। ম্যাটিনি শো শেষ ক'রে বাইরে আসতেই পারুলের সঙ্গে মুখোমুখী দেখা।

—কি ব্যাপার, শরীর খারাপ নাকি? পারুল উৎকণ্ঠিত হ'লো।

এক হাত দিয়ে চুলগুলো অমিয়নাথ মুঠো করে ধরলো, তারপর বললো, না শরীর ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

পারুল ভ্রূ কোঁচকালো। ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের ছিটে, হলো কি? বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে এসেছ নাকি?

অমিয়নাথ মাথা নাড়ল, এখন নয় কাল যাবো তোমার কাছে। কাল তো প্লে নেই। বাড়ীতেই আছো তো। দ্রুত গলায় অমিয়নাথ কথাগুলো বলে গেল। বুকের অশ্রান্ত দাপাদাপির চিহ্ন ফুটে উঠল গলার স্বরে।

—বাড়ীতে থাকবো না তো আর যাবো কোথায়। পারুল খুব আস্তে কথা বলল।

—ঠিক আছে। কাল দেখা করবো। অমিয়নাথ বাইরে বেরিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পারুল চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। সাড় নেই, চেতনা নেই।

প্রম্পটার নিতাইবাবুর গলার আওয়াজে চমক ভাঙলো।

—কারুর জন্য অপেক্ষা করছেন নাকি। নিতাইবাবু বিনয়ে বিগলিত দুটো হাত জড়ো করে রাখলো বুকের ওপর।

—অপেক্ষা? না অপেক্ষা আর কার জন্য। চলি।

পারুল দ্রুত পায়ে বাইরে চলে এলো। সিঁড়ি দিয়ে উঠলো খুব আস্তে আস্তে। দু একটা ধাপে থামলোও কিছুক্ষণের জন্য। যতই ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলে পারুল, ততই যেন চিন্তাটা আঁকড়ে ধরলো তাকে। এক চিন্তা। একটা মানুষের।

খুব বিপদে পড়েছে বোধ হয় অমিয়নাথ। নয়তো ফিটফাট মানুষটা এমন অগোছালভাবে ছুটে আসে। কিন্তু কিসের দরকার।

আন্দাজে হাতড়ে তালাটা খুলে পারুল বিছানায় শুয়ে পড়লো। জামাকাপড় না বদলে।

কি দরকার বুঝতে এত দেরী হ'লো পারুলের। যখন সে অমিয়নাথের বাড়ী ছেড়েছিলো তখনই তো সংসার পানসীর টলমলে অবস্থা। দুদিক দিয়ে জল উঠছে। তার লাঘব করার জন্যই পারুল সরে এসেছিলো। কিন্তু তাতেও কি সুরাহা হয়েছে। মা এসে উঠেছেন, নতুন মানুষ সংসারে ঢুকেছে ঘোমটা দিয়ে। একটা মানুষ, কতদিক সামলাবে।

ছি, ছি, কথাটা মনে হ'তেই পারুল বিছানার ওপর উঠে বসলো। বলতে নেই পারুলের অবস্থা ফিরেছে। বাঁধা মাইনে ছাড়াও যখন দরকার হরগোবিন্দবাবু টাকা-পয়সা দিয়েছেন। বাড়তি জিনিষপত্র। তার কারণও আছে অবশ্য। পারুলের দাম হ'য়েছে। পারুল ছাড়লে বাণীপীঠের পথ কেউ মাড়াবে না, তা হরগোবিন্দবাবুর জানা। এখন বাড়তি চেয়ার দিয়ে কুলিয়ে ওঠা দায়, তখন কেবল ছারপোকার রাজত্ব। ইতিমধ্যেই 'অজন্তা' থিয়েটার পারুলের পিছনে লেগেছে। মোটা টাকার টোপ। পাঁচ বছরের চুক্তি। হরগোবিন্দবাবু দুটো ডানা দিয়ে পারুলকে আগলে রেখেছেন।

কিন্তু পারুলেরই না হয় অবস্থা ফিরেছে, অমিয়নাথের জন্য কি করেছে। দেখা হ'লে দু একটা মিষ্ট কথা, ব্যস্, এই পর্যন্তই। কোনদিন ডেকে জিজ্ঞাসা করেনি অভাব অভিযোগের কথা। একটা তামার পয়সাও তার হাতে তুলে দেয় নি।

এতদিন পরে অমিয়নাথ এই কথাই বলতে আসবে। অভাবের তাড়নায় মিথ্যা মর্যাদার আব্রু খসে পড়েছে। লোক-লজ্জার বালাই রাখে নি। যা পারুলের করা উচিত ছিলো এগিয়ে গিয়ে, কি লজ্জার কথা, সে কাজ করতে ওর দরজায় অমিয়নাথই এগিয়ে আসছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে পারুল বাতি জ্বালাল। আঁচলের চাবি দিয়ে দেয়াল আলমারী খুললো। মাইনের পঞ্চাশ টাকা রয়েছে, তা ছাড়াও এদিকের খুপরীতে হরগোবিন্দবাবুর দেওয়া বাড়তি ত্রিশ। আটখানা নোট পারুল গুণে গুণে সরিয়ে রাখলো একদিকে। কোন কথা নয়, অমিয়নাথ এলেই জোর করে এই টাকাগুলো তার পকেটে ফেলে দিতে হবে। কোন কথা শুনবে না। একটু ওজর আপত্তি নয়।

দেরী করার উপায় নেই। সন্ধ্যার পালা একটু পরেই আরম্ভ হবে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে পারুল তৈরী হ'য়ে নিলো।

তখনও ভাল করে আলো ফোটে নি, পারুলের দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ।

সারা রাত বিছানায় ছটফট ক'রে পারুল ভোরের দিকে একটু চোখ বুজিয়েছে, আচমকা আওয়াজে উঠে বসলো।

—কে?

—হামি দিদিমণি।

হিন্দুস্থানী দরওয়ানের গলার আওয়াজ। এত ভোরে আবার কিসের দরকার। নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটু কি জিরোবারও জো নেই।

থমথমে মুখ ক'রে পারুল দরজা খুললো।

—কি হলো কি? রাত থাকতে দরজা ফাটাফাটি যে?

দরজা খোলার শব্দেই রামলোচন একপাশে সরে দাঁড়ালো।

—একটি মাইজী খোঁজ করছে আপনার?

মাইজী। পারুল ঠোঁট কামড়ালো। সাতসকালে মাইজী আবার কে এলো দেখা করতে।

—কে মাইজী বলো তো? তুমি চেনো তাকে?

—না, রামলোচন ঘাড় নাড়লো। চিনবে কি ক'রে, দেখেই নি সাতজন্মে।

অনেক ভেবে-চিন্তে বললো, একটা বুড়ী মাইজী। ভিতরে আসতে বললাম, কিছুতেই রাজী হ'লো না।

বুড়ী মাইজী। পারুল ভেবে কূল কিনারা পেলো না। একটা কথা মনে হ'তেই আঁতকে উঠলো। ফ্যাকাসে হয়ে এল মুখ, বিবর্ণ দুটি ঠোঁট। সর্বনাশ, তাই যদি হয়!

বাপের বাড়ী বেলেঘাটা। পথে ঘাটে পোস্টার পড়েছে, ছবিও বেরিয়েছে ছোট খাটো দু একটা কাগজে। বাপের বাড়ীর কারুর নজরে পড়া মোটেই বিচিত্র নয়। অবশ্য পলি আর পারুলে তফাৎ অনেক, নাম দেখে কেউ ঠাওর করতে পারবে না, কিন্তু বলা যায় না কেউ যদি বাণীপীঠের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। হাজার ঝলমলে পোষাক আর রঙের প্রলেপে চেনা মানুষ কি আর ঢাকা পড়ে যাবে! রক্তের সম্পর্ক রঙের তুলির টানে উধাও!

খবর পেয়ে মা-ই হয়তো এসে দাঁড়িয়েছে। কুলে কালি দেওয়া মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায়।

—কি বলবো দিদিমণি? রামলোচন মনে করিয়ে দিলো।

—কিছু বলতে হবে না। আমি যাচ্ছি। পারুল মন ঠিক করে ফেললো। এসপার নয় ওসপার। নাচতে নেমে আর ঘোমটা টেনে লাভ কি। বালিতে মুখ গুঁজে থাকলে ক্ষতি তো নিজেরই। নড়বড়ে অল্প রোজগারের সংসারে বাড়তি মানুষ নিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই পারুলের মায়ের, তার চেয়ে বরং অস্বীকার করবে মেয়েকে। প্রাণ খুলে গালিগালাজ করবে। শাপ-শাপান্ত। সেই জন্যই খুঁজে খুঁজে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ভোর না হ'তে।

মুখ হাত ধুয়ে পারুল নিচে নেমে গেলো, আলু থালু চুলগুলো হাত দিয়ে ঠিক ক'রে নিয়ে। আটপৌরে শাড়ী পরনে। কাল রাতে মাখা রঙের পোঁচ হয়তো রয়েছে গালে, চোখের কোণে কাজলের অস্পষ্ট টান। আঁচল দিয়ে ঘসে ঘসে এ দাগের আর কতটুকু তুলতে পারবে পারুল!

থিয়েটারের গেটের পাশে একটি প্রৌঢ়া মহিলা। সিক্ত বসনা। বোধ হয় গঙ্গা স্নান সেরে ফিরছেন।

ইচ্ছা করেই পারুল চটির আওয়াজ করল। জোরে পা ঘসে। প্রৌঢ়া মুখ ফেরালেন। দু হাত দূরে বাজ পড়লেও বোধ হয় পারুল এতটা চমকে উঠতো না।

অমিয়নাথের মা। কাশীতে দেখেছিলো পারুল, সেদিন অমিয়নাথের ঘরের বারান্দায় দেখেছিলো কিছুক্ষণের জন্য, ভুল হবার কথা নয়।

—আপনি?

মনে মনে পারুল চিন্তা করলো। লজ্জায় অমিয়নাথ নিজে আসতে পারে নি, নিজের মাকে বুঝি পাঠিয়েছে!

—হাঁ বাছা। কোন উপায় না দেখে নিজেই এলাম, তবু যদি তোমার একটু দয়া হয়।

—ভিতরে আসুন না। পারুল শান্ত গলায় অনুরোধ জানালো।

—ওইটুকুই বাকি আছে, প্রৌঢ়ার গলার স্বরে দৃঢ়তার রেশ ; তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, এ বয়সে আর এসব আস্তানায় ঢোকবার প্রবৃত্তি নেই। সেই জন্যই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি।

পারুলের সমস্ত শরীর জ্বালা করে উঠলো। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়েছে, তবু দম্ভ রয়েছে পুরোমাত্রায়, কৃত্রিম কৌলীন্যবোধ।

—কি আপনার দরকার বলুন, আমার কাজ আছে। পারুল শক্তগলায় বললো।

প্রৌঢ়া হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে পারুলের দুটো হাত আঁকড়ে ধরলো। দুচোখে অশ্রুর বন্যা।

—আমার ছেলেকে ছেড়ে দাও বাছা। ওই আমার দুঃখিনীর ধন, শিবরাত্রির সলতে। সব গিয়ে ওইটুকুতে ঠেকেছে। আমি তোমার দুহাত ধরে বলছি ওকে রেহাই দাও।

—তার মানে? পারুল সজোরে হাত ছিনিয়ে নিলো, কি বলতে চান আপনি?

আঁচল দিয়ে প্রৌঢ়া চোখ মুছল। ভাঙা গলায় বললো, তুমি তো সবই জানো। ছেলে থিয়েটারে বই লিখতো, রাজার মন্দা। না খেয়ে মরার দাখিল। ব্যাপার দেখে তুমি সরে পড়লে। আমি ফিরে দেখি সংসারের এই অবস্থা। আমার এক দেওরকে ধরাধরি ক'রে এক কারখানায় বহু কষ্টে চাকরি একটা করে দিয়েছি। বলতে নেই, মাইনে পত্র ভালোই। প্রৌঢ়া একদমে এতগুলো কথা বলে দম নিলো। একটু থেমে আবার শুরু করলো, কদিন ধরে ছেলের বিয়ের চেষ্টা করছি। বলে বলে হয়রান। কেবল হাতে পায়ে ধরা বাকি রেখেছি। কিন্তু কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। অবশ্য কেন যে হচ্ছে না, তা আমার অজানা নয়। আমি ঠিকই ভেবেছিলাম, কদিন হ'লো অমিয়নাথ খুলেই বলেছে সব।

—কি বলেছে? পারুল টান হ'য়ে দাঁড়ালো।

—কি যে বলেছে বুঝতেই তো পারছো। বিয়ে যদি করতে হয় তো তোমাকেই করবে। সমাজ মানবে না, আত্মীয়স্বজনের মুখ চাইবে না। দোহাই তোমার, এ বুড়ীর মুখ চেয়ে ও দুধের বাছাকে তুমি ছেড়ে দাও। কত বড় ঘরের ছেলে আসচে তোমার কাছে। কথা শেষ করার আগেই অমিয়নাথের মা আবার কান্নায় ভেঙে পড়লো।

দরজা ধরে পারুল টাল সামলালো। সমস্ত শরীর ট'ছ। বুকের মাঝখানে অসহ্য দাহ। অস্থি মজ্জা সব যেন পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে। নিজেকে সামলে নিলো, পারুল দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে সংযত গলায় বললো, আপনি বাড়ী ফি'ব যান। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনার ছেলেকে ফিরিয়ে দেবো। আপনি নিশ্চিন্ত মনে তার বিয়ের আয়োজন করুন।

—বেঁচে থাকো বাছা, রাজরাণী হও। আমি দু হাত তুলে তোমায় আশীর্বাদ করছি। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।

এত কথা পারুলের কানে গেলো না। সিঁড়ির হাতল ধ'রে খুব সাবধানে সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো। কোন রকমে ভেজানো দরজা খুলে টলতে টলতে বিছানায়।

দুপুরের দিকে পারুল একবার উ'লো। খাবে না, শরীর খারাপ একথা আগেই বলে দিয়েছিলো। নিচে গিয়ে রামলোচনের সামনে দাঁড়ালো।

—গ্রীনরুমের চাবিটা একবার দাও তো রামলোচন, কাল রাত্রে মাথার সোনার কাঁটাটা ফেলে এসেছি।

খাটিয়ায় বসে রামলোচন তুলসীদাস পড়ছিলো, দাঁড়িয়ে উঠে পৈতেয় বাঁধা চাবির গোছা পারুলের হাতে তুলে দিলো।

নিজের রুমে নয়, চাবি খুলে পারুল শান্তনুবাবুর কামরায় ঢুকলো। বেশী খুঁজতে হ'লো

না, ড্রয়ারের কোণে চ্যাপ্টা বোতল। মন তাজা রাখবার ওষুধ। মেজাজ খুশ রাখার মন্ত্রগুপ্তি। শাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে পারুল সাবধানে বোতলটা ওপরে নিয়ে এলো।

সময় খুব কম। বিকেল হবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো অমিয়নাথ এসে হাজির হবে। নটীকে ঘরণী করে তোলার প্রলোভন দেখাবে। মরুবারিণীকে মরূদ্যানের ইসারা। কিন্তু অমিয়নাথের জীবনকে বিষময় করে তোলার তার কোন অধিকার নেই। অমিয়নাথের মার কাছে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ফিরিয়ে দেবে অমিয়নাথকে।

আঁচল দিয়ে পারুল বার বার চোখের জল মুছলো। পোড়া চোখের জলের যেন আর শেষ নেই। দামী শাড়ী বের করলো, জমকালো ব্লাউজ। সযত্নে প্রসাধন সারলো। সব শেষে বোতলের ছিপি খুলে সারা গায়ে ফোঁটা ফোঁটা ঢাললো। গাড়ীতে, জামায়, ঠোঁটের কাছেও মাখালো। উগ্র গন্ধ। গা বমি বমি করে উঠলো পারুলের। বারান্দার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। এখান থেকে রাস্তার মোড় পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। অমিয়নাথ এলেই নজরে পড়বে।

শবরীর প্রতীক্ষা। পারুলের দুটো পা ট'ন ট'ন করে উঠলো। কোমরে ব্যথা। মনে ভাবলো বিছানায় একটু গড়িয়ে নেবে। সারাটা দিন পেটে কিছু নেই। মোচড় দিয়ে উঠছে নিস্তেজ স্নায়ু-তন্ত্রী। সরে আসবার মুখেই অমিয়নাথকে দেখা গেলো। দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে।

খুব আস্তে পারুল ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। সন্তর্পণে বন্ধ করলো দরজাটা। হাত দিয়ে চুল এলোমেলো করে দিলো। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল হ'য়েই ছিলো। বেশবাস অবিন্যস্ত। চুপ করে বসে রইলো বিছানায়।

ঠুক্, ঠুক্, ঠুক্। অমিয়নাথের মতনই শান্ত করাঘাত। খুব মৃদু গলার স্বর, পারুল, পারুল।

পারুল উঠে দাঁড়াল। দাঁত দিয়ে সজোরে কামড়ে ধরলো নিচের ঠোঁট। দুটো হাতে বুক চেপে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালো অমিয়নাথের মুখোমুখি।

অমিয়নাথ পিছিয়ে গেলো। উগ্র গন্ধ। চোখ লাল, বাতাসে উড়ছে এলোমেলো চুলের রাশ। পা দুটো টলছে।

অমিয়নাথ কিছু বলবার আগেই পারুল মুখ খুললো, কি করতে ঘন ঘন আসো বলো তো? পকেটে তো কানাকড়ির জোর নেই, অথচ সখ আছে ষোল আনা। এখানে সুবিধা হবে না, অন্য কোথাও যাও।

—পারুল, পারুল, অমিয়নাথের গলায় অসহায় কাকুতি।

—থামো, থামো, শুকনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না। পারুল, পারুল! পারুল যেন ওঁর কেনা দাসী। বেরিয়ে যাও সামনে থেকে, নয়তো দরোয়ান ডাকবো।

আর একটি কথাও নয়। অমিয়নাথ আস্তে আস্তে নেমে গেলো। মাথা নিচু করে।

খুব ভয় পেয়েছিলো পারুল। হয়তো পারবে না। ভেঙে পড়বে অমিয়নাথের সামনে। পা দুটো জড়িয়ে বলবে, তুমি আমাকে নাও। পথের ধুলো থেকে কুড়িয়ে তোমার আঙিনায় স্থান দাও।

কিন্তু পারুল পেরেছে। এলেম আছে মোশন মাস্টারের। শুধু কথাগুলোই নয়, হাবভাব চালচলন নিখুঁত।

আর এ পথে আসবে না অমিয়নাথ।

কিন্তু আশ্চর্য, কথাটা মনে হ'তেই পারুল ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলো। চোখের জলে মুখের রং নিশ্চিহ্ন। অভিনেত্রীর মুখোস খুলে নীড় বাঁধার প্রত্যাশী এক অসহায় নারীর রূপ ফুটে উঠলো। ক্লান্ত, বুভুক্ষু এক নারী।

কার্তিক ১৩৬২

রাজা

সুশীল রায়

তারপব পুব দিকের রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। জ্যামিতির সরলরেখার মত লাল শুরকীর রাস্তাটি সটান সিধা পুব দিকে চলিয়া গিয়াছে। নাম অহল্যাবাঈ রোড।

এখানে আসিয়া অবধি আমাদের পায়ের বিরাম নাই। এই ক্ষুদ্র আধা-পল্লীতে আমরা এত শীঘ্রই সবার পরিচিত হইয়া গিয়াছি। রেল লাইনের এক পারে ধু ধু মাঠ, শস্য শ্যামল নয়, পাহাড়ী কাঁকড়ে ভরা ; দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের ভিড় আর শালপিয়ালের বন। অন্য পারে ছোট বাজার, সংক্ষিপ্ত জনতা—আর অহল্যাবাঈ রোড।

আমরা যেন সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া চলিয়াছি। রাস্তার দু'পাশে বট পাইকব আর কৃষ্ণচূড়া পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়া। দিনের আলো পরিপূর্ণভাবে এখানে প্রবেশ করে না।

অনেকটা পথ হাঁটিয়া একটু ক্লান্ত হইয়াছি। নীচে অগভীর নদীর চটুল ফাজলামো। পাথরে ধাক্কা খাইয়া খাইয়া জলের স্রোত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, তাহারি কলকল শব্দ। মজবুত পাথরে তৈরী ছোট নদীর উপর প্রকাণ্ড সাঁকো। আমরা বসিয়া পড়িলাম। চারিদিক নির্জন : কদাচিৎ দু'একজন লোক সাঁকো পার হইয়া যাইতেছে। সন্ধ্যা তখনো হয় নাই। দূরে আম গাছের ঊর্ধ্বে ফিকা তৃতীয়ার চাঁদ কাৎ হইয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে।

বাঁশরী কহিল, 'সত্যিই বড় চমৎকার, তাই না?'

ইসারায় কহিলাম, 'চুপ।'

বাঁশরী আমার মুখের দিকে চাহিল, কাছে সরিয়া আসিয়া সভয়ে বলিল, 'কেন?'

বলিলাম, 'ভয় নাই। চুপ ক'রে নদীর শব্দ শোনো।'

'তা-ও ভালো!' বাঁশরী কহিল, 'যে নির্জন—'

ইতিপূর্বেই বাঁশরী বলিয়াছিল এত কাছে এত ভালো জায়গা, আমি ইহার খোঁজ রাখি নাই কেন। অপরাধই বটে। নিজেরও অনুশোচনা হয়। বসিয়া বসিয়া সেই কথাই আবার ভাবিতেছিলাম! আকাশ হইতে ধীরে ধীরে অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে, ধীরে ধীরে ফিকা রঙের চাঁদ হলুদ বর্ণ ধারণ করিতেছে, একে একে তারা ফুটিতেছে। মহানগরীর পথের ধারে ধারে এই ভাবে একে একে আলো ফুটিয়া উঠে। তুলনাটি সহজেই মনে পড়ে। সব মিলিয়া মিশিয়া একটি নিশ্চল রোমাঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছে। চারিদিকে নীরবতা ঝমঝম করিয়া বাজিতেছে। বাঁশরী শুধু একবার বলিল, 'ঝিঁ ঝিঁ।' তারপর চুপ করিয়া হয়ত নদীর চাপা হাসি শুনিতে লাগিল।

হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম, অন্ধকারের মধ্য হইতে ডাকিল, বাবু।'

বাঁশরী অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিল। ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বলিলাম, 'কে?'

লোকটি কাছে আসিয়া বলিল, 'আমি বাবু আমি! রাবণ!'

বাঁশরী হয়ত একাগ্র মনে রাম-নাম জপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া এই ভাবে বিনা নোটিশে রাবণের আবির্ভাব কেহ প্রত্যাশা করে না। আমাদের পদতলের শীর্ণা নদীটি গোদাবরীও নহে।

রাবণকে আমি চিনি না। সে বলিল, 'চিন্‌লেন তো! আমি রাবণ! সব শেষ ক'রে চ'লে এলাম!'

বাঁশরী ভয়ে কাঁপিতেছে। চাপা গলায় বলিল, 'পালাই চলো! ও মাতাল।'

লোকটির কান তো খুব সজাগ, বলিল, 'মাতাল? দু'পাঁটে কে না মাতাল হয়? আরো একটা আছে, রাতে খাবো। কি বলিস্ মিঠু?'

লোকটার বগলে ওটা বুঝি মুরগী দেখা যাইতেছে। গায়ে প্রকাণ্ড একটি খাকির কোট, হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিতেছে। কোটের পকেটে চক্‌চক্ করিতেছে হয়ত রাত্রে খাইবার খাদ্যটি! ডান হাতে—লোকটি টুংটুং করিয়া বাজাইল—একটা খঞ্জনী।

'গান শুনবেন বাবু, গান? আজ বড় গান পেয়েছে বাবু, ভারী খুস্ আছি।'

শুক্‌না চেহারা চামড়া দিয়া কংকাল ঢাকা, বয়স হইয়াছে অনেক। তৃতীয়ার চাঁদের আলোয় এর বেশী কিছু দেখা গেল না।

বাঁশরী কহিল, 'ভয় করে।'

ইসারায় বলিলাম, 'চুপ।'

বেতালা খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে সে গান জুড়িয়া দিল—

'নতুন বৌকে সামলে রাখা দায়
হাতের থেকে কাঁকন খুলে, মল পরে না পায়—
নাকে কেবল নোলক নেড়ে
প'রে বাংগা পাছ্‌ছা পেড়ে
এম্‌নি এম্‌নি এম্‌নি ক'রে জল আনিতে যায়...'

লোকটা নাচিতে আরম্ভ করিল। সুর ত' দূরের কথা, জড়িত গলায় কথা ঠিক বাহির হইতেছে না। নাচিতে নাচিতে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া অপরূপ ভঙ্গী করিয়া গাহিল ঃ

'(আর) বাঁশবনে এক মিন্‌সে এসে (ছি ছি) মুচ্‌কে হেসে চায়।'

বাঁশরী ভয় ভুলিয়াছে। আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'এত রঙ্গও জানে!'

সেই পথ দিয়া কে যেন যাইতেছিল। গানে আকৃষ্ট হইয়া সে দাঁড়াইল। বলিল, 'কি রে রাবণ! খুব ফূর্তি আজ—নাৎনীকে পুড়িয়ে এলি?'

সগর্বে রাবণ বলিল, 'হাঁ, এই ত আসছি শ্মশান্ থেকে। হেঁ, একাই পারি। ভারি তো বিশ বরষের ছুঁড়ি। একা ছাড়া দুকলা দিয়ে হবেক কি। সঙ্গে আমার মিঠু ছিলো! ভয় করি কাকে—না রে মিঠু?'

বগলের ভিতর হইতে মিঠু প্রত্যুত্তরে একটু গলা বাড়াইল। লোকটি মুরগীর গালে চড় দিয়া আদর জানাইল!

আমাদের পথিক বন্ধুটি রাবণকে বলিলেন, 'এবার তবে তুই ছুটি নে! আর তোর থাকার দরকার কি রে? এই রাবণ!'

নিশ্চল পাথরের মত রাবণ দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইল সে কি যেন ভাবিতেছে।

পথিক বন্ধুটি বলিতে লাগিলেন রাবণের কাহিনী। এখানে রাবণ নাকি এককালে রাজা ছিল, এই সব জায়গাটার মালিক ছিল সে। তার উনিশটা ছেলে, সেই অনুপাতে নাতি নাৎনী। জাতিতে লোকটা মুচি। কিন্তু মুচির কাজ জীবনে বেশি দিন তাকে করিতে হয় নাই। একে একে উনিশটি ছেলে সস্ত্রীক মারা যায়, একে একে নাতি নাৎনীরাও। মাত্র একটি ছিল অবশিষ্ট, সেটিও আজ শেষ করিয়া আসিল! এই নাৎনীটার উপর তার মায়া কতখানি ছিল তা বর্ণনা করা নাকি সম্ভব নয়। দু'টি মাত্র প্রাণী ছিলো যাদের প্রতি রাবণের মমতা অসাধারণ। সেই নাৎনীটা ও এই মুরগীটা। অনেক মুরগী সে জবাই করিয়াছে, মাতাল তো, কিন্তু আজ দু'তিন বছর হইল এই মুরগীটি সে পালন করিতেছে।

রাবণ গাহিয়া উঠিল ঃ

'নুন দেয় না সে ডালনাতে (বাবু) চুণ না পড়ে পানে
যতই ডাক, 'ও নতুন বৌ!' যায় না কারু কানে!
আস্তে আস্তে মুখটি দেখি যেম্‌নি ঘোমটা টেনে

ঝামটা মেরে কয়, 'আমাকে (ও মুখপোড়া)
ভালোবাসিস্ কেনে।'
এমন আহাম্মকের কথার (বলুন বাবু) জবাব দেওয়া যায়?
নতুন বৌকে সামলে...'

রাবণের কথা ভাবিলাম। রাবণ সত্যই রাজা। দুঃখকে সে কেমন ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া হাসি গানে নিজেকে মশগুল্ করিয়া তুলিয়াছে। নিমেষের মধ্যে এই অতি নির্জন পল্লীপ্রান্তের নদীর জনকল্লোল, ঝিঁঝির ঐকতান, তৃতীয়ার বক্র চাঁদ, পরিচ্ছন্ন আকাশের অগুন্তি নিশ্চল তারা এবং বৈজ্ঞানিক সরল রেখার মত লাল শুরকীর রাস্তা কোথায় মিলাইয়া অশরীরী দেহ লইয়া প্রেতের মতন আমার চারিদিকে যেন নাড়িয়া চড়িয়া উঠিল। বাঁশরীর একটি হাত মুঠির মধ্যে ধরিয়া আমি রাবণের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। আরো অন্ধকারের আবছায়াতে রাবণ ভৌতিক পদার্থ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

বলিলাম, 'রাবণ, মুরগীটা বেচবে?'

ধরা গলায় সে কহিল, 'জান্ লিয়ে লিন্ বাবু, মিঠু থাক্।'

থাক্! যখন ছাড়িবেই না, তখন থাক্। কিন্তু তাহাকে কিছু দিতে প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল। পথিক বন্ধুটি রাবণের বর্তমান জীবিকার কথা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অনায়াসে তাহাকে কিছু নিঃসঙ্কোচেই দেওয়া যায়। কিন্তু রাজার হাতে ভিক্ষা দিতে হাত সরিতেছিল না।

রাবণকে বলিলাম, 'যদি কাল মালবাবুর বাসায় যাস্, বখশিস্ পাবি। গান শোনাতে হবে। আজ আগাম এই সিকিটা নে।'

হাত পাতিয়া রাবণ তাহা গ্রহণ করিল এবং নেশার ঝোঁকেই হয়ত অনর্থক বারবার প্রতিজ্ঞা করিল—যে সে যাইবেই।

প্রতিজ্ঞা সে রাখে নাই। তার বাবু অর্থাৎ আমার বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসু বলিলেন, 'ওই তো ওর দোষ! কথার ঠিক নেই! কক্‌খনো কথা রাখে না! ওই জন্যেই তো না খেয়ে মরে! আঁধার ঘরের পিদিম সেই নাৎনীটা কদ্দিন এই রেল্‌ওয়ে কোয়াটারের চারপাশে ঘুরঘুর ক'রে ঘুরে বেরিয়েছে। বুড়োটা—তখন মদ খেয়ে টং হ'য়ে কোথায় পড়ে কে জানে!'

বলিলাম, 'আচার্য-দেব, তুমি যদি এই রেলের তারবাবু না হ'য়ে রাবণরাজা হ'তে তবে বুঝতে মদ কি ওষুদ।'

জগদীশকে আমরা আচার্যদেব বলিয়াই ডাকি। সে বলিল, 'হুঃ, মাৎলামি পোষাবে না, ভাই! লোকটা ছিলো তো ভালোই, কিন্তু এখানকার সেন্টিমেন্টাল কতকগুলো জীব ওর মাথা খেয়েছে, জুতোয় একটা পেরেক লাগিয়ে নিয়ে দু'আনা পয়সা হাতে গুঁজে দেয়। আমার এই জুতোয় হাফসোল দিয়ে বলে, পয়সা। চারআনা দিলাম, মনই উঠ্‌লো না ওর। যত সব!'

তারবাবু, মালবাবু, টালিবাবু ইত্যাদি সবাই একমত হইয়া আমাকে কোণঠাসা করিলেন।

আজ মহানগরীতে ফিরিয়া আসিয়াছি। প্রত্যহ সন্ধ্যায় রাস্তার দু'পাশে আলো জ্বলিয়া উঠিতেছে। সরল সুদীর্ঘ কালো কালো পীচের পথে শকটারোহণে যাতায়াত করিতেছি। কত বিভিন্নমুখ, কত সুখ দুঃখের কাহিনী পাশাপাশি রাখিয়া দিন কাটিতেছে। কখনো চাঁদময়, কখনো চাঁদহীন, আকাশ মাথার উপর চন্দ্রাতপের ন্যায় বিরাজ করে। কিন্তু কখনো দৈবাৎ যদি কোনো সুবৃহৎ গম্বুজের আড়াল হইতে বাঁকা চাঁদের আবির্ভাব দেখি, অমনি এই মহানগরীর অট্টালিকাসমূহ, এই জনকলকোলাহল, অবিরল ব্যস্ত পদপাত কিছুই যেন নিকটে থাকে না ; এমন কি সেই শীর্ণা নদীটির কলধ্বনি, ঝিঁঝির ঝংকার, সধবার সিঁথির সিঁদুরের মত সেই রাঙা টুকটুকে পথটিও মনে পড়ে না!

মনে পড়ে সেই নতুন বৌ, নাৎনী ও মিঠুর কথা।

মাঘ ১৩৪৯

একটি প্রশ্ন

প্রফুল্ল রায়

বোম্বাই শহরের এই ঋতুটাকে একখানা ধ্রুপদ গানের মত মনে হয়। এই ঋতু অর্থাৎ বর্ষা।

ধ্রুপদের যেমন তিনটে স্তর, প্রথমে আলাপ—মধ্যে গান—অন্তিমে বিস্তার, এখানকার বর্ষারও তাই। প্রথমে মেঘেদের আনাগোনা, তারপর অল্প অল্প বৃষ্টি, একেবারে শেষ পর্যায়ে যে বর্ষণ তার বিরাম নেই। দিবারাত্রি প্রবলবেগে অবিরত সে ঝরতেই থাকে।

সপ্তাহখানেক হ'ল এখানে বর্ষার প্রথম পর্ব শুরু হয়েছে। কদিন আগেও জ্যৈষ্ঠের রোদে পুড়ে পুড়ে আকাশটা তামাটে হয়েছিল। এমনই অসহ্য ছিল তার দাহ, যে সেদিকে তাকানো যেত না। তাকালে চোখ ঝলসে যেত। আজকাল আরব সাগরের লবণাক্ত কালো জল থেকে মেঘেরা উঠে এসে আকাশটাকে স্নিগ্ধ করতে শুরু করেছে। সমস্ত গ্রীষ্ম জুড়ে সে শুধু জ্বলেছে। আরব সাগরের মেঘেরা এখন তার সব জ্বালা জুড়িয়ে দিচ্ছে।

যেদিকে যতদূর তাকানো যায়, মেঘ আর মেঘ। সাদা সাদা ভবঘুরে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। মনে হয় এক অদৃশ্য ধুনুরি আকাশময় খুশিমত তুলো ছড়িয়ে দিয়েছে।

আমি বাঙলা দেশের মানুষ। মেঘ দেখলেই আমার মন ময়ূর হয়ে যায়। ইচ্ছা হয় কোনদিকে বেরিয়ে পড়ি। বেরিয়ে আমি পড়িও। শুধু মেঘ দেখেই না, যে কোন সময় একটু অবকাশ পেলেই ট্রাম-বাস-অফিস-ভিড় আর উচ্চৈস্বরের হৈ-চৈ দিয়ে ঘেরা নাগরিক জীবনের ছক থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যাই। আমার স্বভাবে আর শোণিতে একটা অস্থির যাযাবর আছে। সবসময় সে আমাকে চঞ্চল করে রাখে।

আজ ছুটির দিন। দুটো সিদ্ধ ডিম, একটা কলা আর কিছু পাঁউরুটি ঝোলায় পুরে সকালবেলাতেই চার্চগেট স্টেশনে ছুটলাম। ছুটির দিনে একটা মুহূর্তও শহরে থেকে অপচয় করতে আমি রাজী নই।

এখান থেকে একটা ট্রেন ছাড়ে। সোজা সেটা বোরিভিলি পর্যন্ত যায়। শেষ স্টেশনের একখানা টিকিট কিনে গাড়িতে উঠলাম।

একসময় গাড়ি ছাড়ল। বোম্বাই শহর পেছনে রেখে ইলেকট্রিক ট্রেন নিমেষে উধাও হ'ল।

শহরের পর বিস্তৃত শহরতলী। সেখানে কল-কারখানা ধোঁয়া-ধুলো। বছরের কোনসময় সেখানে ছুটি নেই। দিবারাত্রি সেখানে ব্যস্ততা। দেখতে দেখতে শহরতলীও পেরিয়ে গেলাম।

বোরিভিলিতে যখন পৌঁছলাম তখন দুপুর। দুপুর হলেও মেঘের জন্য রোদের তেজ প্রায় নেই বললেই হয়। একটা ঠাণ্ডা ছায়াচ্ছন্নতা চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, আর আছে হাওয়া। আরব সাগরের উচ্ছ্বসিত দুর্বিনীত বাতাস আমার পিছু পিছু এই বোরিভিলি পর্যন্ত ছুটে এসেছে।

কালেক্টারের হাতে টিকিটখানা সঁপে দিয়ে স্টেশনের বাইরে এলাম।

স্টেশনের ঠিক বাইরে থেকেই মাঠ শুরু হয়েছে। মহারাষ্ট্রের অন্তহীন অবাধ মাঠ। চড়াই-উতরাই মাঠটা তরঙ্গিত। মাটির রঙ এখানে কালো। এত কালো যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় সামনের ওটা যেন মাঠ নয়, একটা বিশাল সমুদ্র তার অগণিত ঢেউ নিয়ে ওখানে

স্তব্ধ হয়ে আছে।

মাটির প্রকৃতি এখানে পাথুরে। লক্ষ বছরের বৃদ্ধ আদিম পৃথিবীটা মহারাষ্ট্রের এই প্রান্তরে রুক্ষ আর কর্কশ হয়ে রয়েছে।

আমি বাঙলা দেশের মানুষ। মাঠ বলতেই আমার চোখে একখানা নিবিড় শ্যামলিমার ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু সবুজের আভাষ এখানে প্রায় নেই বললেই চলে। দু-চারটে রুগ্ন চেহারার বাবলা আর আমলকি গাছ ছাড়া কঠিন নীরস মাটি থেকে আর কোন উদ্ভিদই মাথা তুলতে পারে নি।

তবু এই প্রান্তরকে আমার ভাল লাগে। এখানে অসীম মুক্তি, এখানে নিঃশব্দ সীমাহীনতা।

কোন এক মনীষী বলেছেন, 'মাঝে মাঝে প্রকৃতির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িও। আত্মানুসন্ধান হবে।'

আমি তত্ত্বান্বেষী নই। আত্ম-সন্ধানের জন্য আমার কোন ব্যগ্রতাও নেই। আমি স্বভাব-যাযাবর, স্বভাব পলাতক। ছুটি-ছাটায় এই যে শহর থেকে পালিয়ে আসি, এ শুধু একটু মুক্তির খোঁজে। নাগরিক জীবনের খাঁচাটার মধ্যে সারাটা সপ্তাহ প্রায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে থাকি। ছুটির দিনে প্রকৃতির মাঝখানে গিয়ে বুক ভরে শ্বাস টেনে বাঁচি।

কখন যে উঁচু-নীচু চড়াই-উতরাই মাঠটার ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিলাম, খেয়াল নেই। কতক্ষণ হেঁটেছিলাম, তা-ও মনে করতে পারব না।

একটা উঁচু টিলার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মহারাষ্ট্রের এই প্রান্তরে আমার জন্য যে এমন একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আগে জানতে পারি নি।

টিলাটার গা ঘেঁসে বিরাট কম্পাউণ্ড নিয়ে একটা বাড়ি। উঁচু উঁচু প্রাচীর তার চারপাশে বেষ্টন করে রয়েছে। প্রাচীরগুলো এত উঁচু যে বাইরের থেকে ভিতরের কোন অংশই দেখা যায় না। মনে হচ্ছে, মধ্যযুগের কোন এক দুর্গের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

মাঠের মাঝখানে সীমাহীন নির্জনতায় বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। পায়ে পায়ে খুব কাছে এসে পড়লাম।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। কাছে আসতেই দেখতে পেলাম প্রাচীরের গায়ে অনেকগুলো চতুষ্কোণ টিনের পাত আঁটা আছে। ইংরাজীতে সেগুলোর ওপর লেখা আছে 'মনুষ্যজাতির প্রবেশ নিষেধ।'

বিমূঢ়ের মত টিনের পাতের লেখাগুলোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম।

একসময় বিমূঢ় ভাবটা কেটে গেল। মনে হ'ল, এই বাড়িটার ভিতর একটা অগাধ রহস্য লুকিয়ে আছে। যেমন করে হোক সেটা জানতেই হবে। দুর্বার আকর্ষণে বাড়িটার অভ্যন্তরে আমাকে টানতে লাগল।

স্থির করলাম, ভিতরে ঢুকব। খুঁজে খুঁজে সদর দরজাটা বার করলাম। দরজাটা লোহার। ভারী ভারী পাল্লা দুটো ভিতর দিক থেকে বন্ধ। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ডাকতে লাগলাম, 'কে আছেন, দরজা খুলুন।'

ভিতর থেকে কোন সাড়া এল না।

আবার ডাকলাম, 'দরজা খুলুন, দরজা খুলুন—'

বাড়ির ভিতরটা এবারও নিরুত্তর। শুধু আমার গলার স্বরটা লোহার দরজায় ঘা খেয়ে প্রতিধ্বনি হতে লাগল।

একবার মনে হল, সম্ভবত এই বাড়িতে কেউ থাকে না। পর মুহূর্তেই ভাবলাম, কেউ না থাকলে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ থাকতে পারত না। নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আছে।

অনেক ডাকাডাকি করেও যখন সাড়া পেলাম না তখন ঠিক করলাম দরজা টপকে

ভিতরে ঢুকব।

প্রাচীরের তুলনায় দরজাটা খুব বেশি উঁচু নয়। একটু চেষ্টা করতেই সেটা পেরিয়ে গেলাম।

ভিতরে ঢুকেই আমাকে অবাক হতে হ'ল। ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা পুকুর। আর সেই পুকুরটাকে বেষ্টন করে রয়েছে সারি সারি অসংখ্য টিনের চালা। সেগুলোর চারপাশ মোটা মোটা তারের জাল দিয়ে ঘেরা।

চালাগুলোর কোনটাতে মুরগী, কোনটাতে পায়রা, কোনটাতে ময়ূর, কোনটাতে হরিণ রয়েছে। একটা চালায় বড় কাচের বাক্সে একজোড়া চন্দ্রবোড়া সাপও দেখতে পেলাম। আর একটা চালায় বন-বিড়াল জাতীয় ধূসর রঙের একটা জন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ ছাড়াও অন্য চালাগুলোয় এক কি একাধিক প্রাণী রয়েছে তাদের নাম আমি জানি না। মাঝখানের পুকুরটাতে একজোড়া রাজহাঁসের সঙ্গে অসংখ্য পাঁতিহাস চরে বেড়াচ্ছে। সব মিলিয়ে ছোটখাট চিড়িয়াখানা বিশেষ।

যেদিকে তাকাচ্ছি শুধু পশু আর পাখি। কোথাও মানুষের চিহ্নমাত্র নেই।

চারদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ চোখে পড়ল। পুকুরের ওপারে একটা চালার সামনে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়িয়ে আছেন বললে ঠিক বলা হয় না। খাঁচার ভিতরে একটা চিতাবাঘের বাচ্চা রয়েছে। ভদ্রলোক তাকে মাংসের টুকরো খাওয়াচ্ছেন।

আস্তে আস্তে তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডাকলাম, 'শুনুন—'

চমকে ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ালেন। আর সেই মুহূর্তে তাঁর সম্পূর্ণ চেহারাটা আমি দেখতে পেলাম।

গায়ের রঙ টকটকে ফর্সা। মাথার চুল ঈষৎ তামাটে। তীক্ষ্ণ নাকের দু-পাশে দীর্ঘ উজ্জ্বল চোখ। ভুরু দুটো ঘন এবং জোড়া। বিস্তৃত বুক, ক্ষীণ কটি এবং ঋজু মেরুদণ্ড। পরণে ঢোলা পা-জামা ও লম্বা পাঞ্জাবী। পোশাকের হেরফেরে তাঁকে একজন অভিজাত রোম্যান বলে মনে হতে পারে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। দৃষ্টিটা একটু একটু করে তীক্ষ্ণ প্রখর এবং বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল। ক্রুদ্ধ উত্তেজিত গলায় ইংরাজীতে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কে তুমি?'

থতমত খেয়ে গেলাম। কাঁপা ভীত স্বরে বললাম, 'আজ্ঞে, আমি বোম্বাই থাকি। বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এসে পড়েছিলাম। এখানে এসে—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন, 'এতদূরে নিরিবিলি মাঠের মাঝখানে পালিয়ে এসেছি। তবু তোমরা আমাকে বিরক্ত করতে আসছ কেন? হোয়াই?'

ভদ্রলোকের ইংরেজী উচ্চারণ বিশুদ্ধ, ভাষাটাও একেবারে নির্ভুল। রীতিমত শিক্ষিত ব্যক্তি বলেই তাঁকে মনে হয়।

জড়িত দুর্বোধ্য স্বরে কি যেন বলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু গলার স্বর ফুটল না।

ভদ্রলোক আবার বললেন, 'একটা ব্যাপারে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি?'

'কী ব্যাপারে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

'তুমি ভেতরে ঢুকলে কেমন করে? চারপাশে উঁচু পাঁচিল আর সদর দরজাটাও তো বন্ধ রয়েছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তবে?'

'দরজা টপকে ঢুকে পড়েছি।' আমি বললাম।

কি একটু যেন চিন্তা করলেন ভদ্রলোক। পরক্ষণেই বলে উঠলেন, 'কিন্তু কেন?'

উত্তর দিলাম না।

ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন, 'দেওয়ালের গায়ে টিনের পাতাগুলোতে কী লেখা রয়েছে তোমার চোখে পড়ে নি?'

'পড়েছে।' এবার জবাব দিলাম।

'আমার এই কম্পাউণ্ডের মধ্যে মানুষের প্রবেশ নিষেধ। সে কথা আমি স্পষ্ট করে লিখে পাঁচিলময় লাগিয়ে দিয়েছি। তুমি সেগুলো পড়েছ। তা সত্ত্বেও ঢুকেছ যে?'

'আজ্ঞে, খুব কৌতূহল হয়েছিল তাই—' প্রায় মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম।

'কিন্তু কোন কৌতূহলই তোমার মিটবে না।' বলেই আমার একটা হাত ধরলেন ভদ্রালোক। তাঁর মুঠির ভিতর আমার হাতটা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। বুঝলাম এই বিচিত্র রহস্যময় মানুষটি শুধুমাত্র সুন্দর আর সুপুরুষই নন, অসাধারণ শক্তিমানও।

ভদ্রলোক বললেন, 'চল'। বলেই আমাকে টানতে টানতে সদর দরজাটার কাছে নিয়ে এলেন।

ভিতর দিক থেকে দরজাটার তালা আটকানো ছিল। পাঞ্জাবির পকেট থেকে একগোছা চাবি বার করে তালা খুললেন ভদ্রলোক। তারপর আমার ঘাড় ধরে বাইরে ছুঁড়ে দিতে দিতে বললেন, 'গেট আউট। আর কোনদিন এখানে আসবে না।' বলতে বলতে দরজার পাল্লাদুটো টেনে আবার তালা লাগিয়ে দিলেন।

শক্ত পাথুরে মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিলাম। জামার খানিকটা জায়গা ছিঁড়ে গেছে। কপাল মুখ এবং বুকের চামড়া ছড়ে গিয়ে জ্বালা করছে। গা ঝাড়তে ঝাড়তে একসময় উঠে দাঁড়ালাম। বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে সেই ভদ্রলোকটির কথা ভাবতে লাগলাম। এমন একটা অস্বাভাবিক মানুষ জীবনে আর কখনও দেখি নি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, বার বার আমি এখানে আসব। যতদিনই লাগুক এই মানুষটার সমস্ত রহস্য আমাকে জানতে হবে।

পরের ছুটির দিন আবার এলাম। সে-দিনের মতই দরজাটা বন্ধ ছিল। কাজেই টপকে ঢুকতে হল।

আজ আর বাঘের বাচ্চাটাকে মাংস খাওয়াচ্ছিলেন না ভদ্রলোক। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসেছিলেন। দুটো লেগ-হর্ণ মুরগী খানিকটা দূরে ঝটাপটি হুড়োহুড়ি করছিল। একদৃষ্টে তাদের খেলা দেখছিলেন।

কাছে এসে বললাম, 'আমি এসেছি।'

মুরগী দুটোর দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে আমার দিকে তাকালেন ভদ্রলোক। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ফেটে পড়লেন, 'আবার, আবার তুমি এসেছ!'

কিছু বললাম না।

উত্তেজনায় ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'সে দিন না তোমাকে বারণ করে দিয়েছিলাম, কোনদিন এখানে আসবে না—

একটা উত্তর মনে মনে সাজিয়ে রেখেছিলাম। সেটা বলার অবকাশ পেলাম না। তার আগেই সেদিনের মত হাত ধরে টানতে টানতে আমাকে বাড়ির বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে এলেন ভদ্রলোক।

এরপর আমার জেদ বেড়েই চলল। ছুটি পেলেই মহারাষ্ট্রের সেই প্রান্তরে সেই নিঃসঙ্গ বাড়িটায় চলে আসি। নিশির ডাকের মত বাড়িটা যেন আমাকে টানতে থাকে।

আমি আসি। বন্ধ দরজা ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকি। ঐ পর্যন্তই। মানুষের সঙ্গ ছেড়ে যে ভদ্রলোক নির্জন প্রান্তরে পশু-পাখিদের রাজ্যে নির্বাসিত হয়ে আছেন তার রহস্য আর জানা হয় না। আমাকে দেখামাত্র ভদ্রলোক ঘাড় ধরে বাড়ির বাইরে বার করে দেন।

দেখতে দেখতে বর্ষার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হ'ল। ক'দিন আগেও মেঘেদের রঙ ছিল ধবধবে সাদা। হাল্কা তুলোর মত আকাশময় তারা ভেসে বেড়াত। এখন তাদের রঙ এবং প্রকৃতি বদলে গেছে। এখন তারা নিবিড় কালো। ইচ্ছামত ভেসে বেড়াবার চপলতাও তাদের নেই। আরব সাগরের মেঘেরা এখন ভয়ানক গম্ভীর। মহারাষ্ট্রের আকাশ জুড়ে তারা স্থির এবং অনড় হয়ে আছে।

আজকাল প্রায় রোজই অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছে। ক'দিনের মধ্যেই প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হবে, আকাশ-জোড়া কালো মেঘে তারই সংকেত রয়েছে।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে একদিন সেই বাড়িটায় গিয়ে ঢুকলাম।

পুকুরটার চারধারে বৃত্তাকারে পাখি আর জন্তুদের চালাগুলো রয়েছে। তাদের একপাশে একখানা ছোট একতলা বাড়ি। সামনের বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে চুপচাপ বসেছিলেন ভদ্রলোক।

দূর থেকে কেন যেন মনে হ'ল ভদ্রলোক এই চিড়িয়াখানার অন্য সব বাসিন্দার মতই একজন। তাঁর স্বতন্ত্র কোন মানবীয় সত্তা নেই।

যাই হোক, আজকের বৃষ্টিটা বেশ জোরেই নেমেছে। আকাশ থেকে তীরের ফলার মত বড় বড় ফোঁটাগুলো নেমে আসছে।

আমি দৌড়তে লাগলাম। দৌড়তে দৌড়তে ভদ্রলোকের কাছে এসে পড়লাম।

ভদ্রলোক মাথা তুলে তাকালেন। আস্তে আস্তে তাঁর মুখে একটা ভ্রূকুটি ফুটে বেরুল। পরক্ষণেই সেটা মিলিয়ে গেল। হতাশ ভঙ্গি করে তিনি বললেন, 'নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। বাস্তবিক আই এ্যাম ডিফিটেড্।'

অন্য দিন দেখামাত্র ঘাড় ধরে আমাকে কম্পাউণ্ডের বাইরে বার করে দিয়ে আসেন। আজ কিছুই করলেন না। মনে মনে আশ্বস্তই হলাম।

ভদ্রলোক আবার বলে উঠলেন, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো।'

কাছেই একটা খালি বেতের চেয়ার পড়ে ছিল। তার মধ্যে নিজেকে সঁপে দিলাম।

সমানে বৃষ্টি পড়ছে। মহারাষ্ট্রের আকাশে যত মেঘ ছিল সব যেন গলে গলে ঝরে যাচ্ছে।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'যখনই তুমি আস গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দি। তা সত্ত্বেও আবার আস কেন?'

এতক্ষণে মুখ খুললাম। বললাম, 'প্রথম যেদিন এ বাড়িতে ঢুকি সেদিনই তো বলেছিলাম—আপনার সম্বন্ধে আমার অনেক কৌতূহল। সেই কৌতূহল মেটাবার জন্যে বার বার আসি।'

'কৌতূহল! কৌতূহল!' বার দুই শব্দটা উচ্চারণ করলেন ভদ্রলোক। তারপর অনেক্ষণ চুপ করে রইলেন। মুখ দেখে মনে হ'ল, কি একটা চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছেন।

একটু পরেই মগ্ন ভাবটা কেটে গেল। খুব শান্ত গলায় ভদ্রলোক বললেন, 'বল, আমার সম্বন্ধে কী জানতে চাও—'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম না। মনের মধ্যে প্রশ্নগুলোকে সাজিয়ে নিয়ে একমসয় শুরু করলাম, 'এখানে আপনি একাই থাকেন?'

'একা কোথায়? এই যে হাঁস-মুরগী-হরিণ-বাঘের বাচ্চা—এরাও তো রয়েছে।'

'না-না', একটু থতমত খেয়ে বললাম, 'মানে, মানুষ বলতে আপনি একাই—না আর

কেউ আছে?'

'মানুষ বলতে আমি একাই।

'কতদিন এখানে আছেন?'

'তা বছর চোদ্দ-পনের।'

'চোদ্দ-পনের বছর!'

'হ্যাঁ।' ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'এর মধ্যে এক দিনের জন্যেও এই কম্পাউণ্ডের বাইরে যাই নি।'

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলাম। তারপর বললাম, 'একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না।'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন।

'অন্য সব কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু খাওয়া দাওয়া বলে তো একটা ব্যাপার আছে। এই কম্পাউণ্ড থেকে না বেরুলে খাবারদাবার যোগাড় করেন কেমন করে?'

'একটা লোকের সঙ্গে ব্যবস্থা আছে, প্রতি বুধবার আটা-ময়দা-ডাল-ঘি, হাঁস-মুর্গীদের খাবার—এক সপ্তাহের মত খোরাকি দিয়ে দাম নিয়ে যায়। কম্পাউণ্ডের ভেতরে তাকে আমি ঢুকতে দিই না। সদর দরজা খুলে মালপত্রগুলো নিয়ে দাম চুকিয়ে ওখান থেকেই হাঁকিয়ে দিই। একটু থেমে কি ভেবে ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'চোদ্দ পনের বছর ঐ লোকটা ছাড়া আর কোন মানুষ আমি দেখি নি।'

'আচ্ছা—'

'বল।'

'চোদ্দ-পনের বছর তো হাঁস-মুর্গী, খরগোস, এই সব নিয়ে আছেন। সব সময় এদের সঙ্গ আপনার ভাল লাগে?'

'নিশ্চয়ই।' অস্বাভাবিক দৃঢ় গলায় ভদ্রলোক বললেন। 'এরা অন্তত মানুষের মত বিশ্বাসঘাতক বেইমান না।'

আমার স্নায়ুগুলো একসঙ্গে চকিত হয়ে উঠল। বুঝলাম, মানুষ সম্বন্ধে এই ভদ্রলোকটির অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়। আরও বুঝলাম মনের ভিতর একটা অব্যক্ত অবাঙ্ময় যন্ত্রণা আছে তাঁর। সেই যন্ত্রণাটাই তাঁর রহস্য। শুধোলাম—মানুষের সঙ্গ আপনার ভাল লাগে না?'

নীরস শুষ্ক স্বরে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'না, একেবারেই না। তুমি দেখ নি বাইরের প্রাচীরে লিখে রেখেছি—'মনুষ্যজাতির প্রবেশ নিষেধ?'

বললাম 'দেখেছি। কিন্তু কেন আপনি মানুষের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন?'

'কেন শুনতে চাও?' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক।

'চাই।' বেতের চেয়ারটা আরো একটু কাছে টেনে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলাম।

কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন ভদ্রলোক। আস্তে আস্তে তাঁর মুখের চামড়া কুঁচকে যেতে লাগল। কপালের উপর অনেকগুলো গভীর জটিল রেখা দেখা দিয়েছে। মনে হয়, কেউ যেন ধারালো একটা ছুরি বসিয়ে ইচ্ছামত দাগ কেটেছে। বুঝলাম, একটা নিদারুণ অসহ্য ভাবনার মধ্যে তিনি এগিয়ে গেছেন।

একসময় চোখ মেললেন ভদ্রলোক। তীক্ষ্ণ শাণিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে শুরু করলেন, 'আমার দেশ পোরবন্দরে। জাতিতে আমি গুজরাটি। নাম মগনভাইজী। আমার বাবা গগনভাইজী পোরবন্দরে জমিদার শ্রেণীর লোক ছিলেন। হাজার বিঘে জমি ছিল আমাদের। দেশে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ি ছিল। বাড়িটার স্থাপত্যরীতিতে প্রচুর গথিক প্রভাব ছিল। বাবা ছিলেন খুবই সৌখিন প্রকৃতির মানুষ। বাড়ির সামনে সবুজ ঘাসের 'লন্'

বানিয়েছিলেন। 'লনটার মাঝখানে একটা ফোয়ারা সবসময় উচ্ছ্বসিত হয়ে থাকত। ফোয়ারাটাকে ঘিরে মরসুমী ফুলের বাগান ছিল। সবুজ মাঠটার চারপাশে পাথরের অজস্র মূর্তি ছিল। এ তো গেল বাড়ি আর জমির কথা। এসব ছাড়া ছিল খান পাঁচেক লরী, পঁচিশটা মোষের গাড়ি আর দুটো মোটর সাইকেল।'

বলতে বলতে মগনভাইজী থামলেন। আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সামনের পুকুরটার দিকে তাকালেন। ঝরঝর করে অবিরাম জল ঝরছে। অনেকক্ষণ বৃষ্টির শব্দ শুনলেন তিনি। তারপর একসময় আরম্ভ করলেন, 'আমরা কিন্তু পোরবন্দরে থাকতাম না।'

'কোথায় থাকতেন তা হলে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'বাবার সঙ্গে আমি বোম্বাইতে থাকতাম। বোম্বাইতে জাভেরি বাজারে বাবার জহরতের ব্যবসা ছিল। বোম্বাইতে আমাদের বাড়ি ছিল না। ইচ্ছা করলে বাবা একখানা বাড়ি কিনতে পারতেন। কিন্তু কেনেন নি। মালাবার হিল্‌সে ফ্ল্যাট ভাড়া করে আমরা দু-জনে থাকতাম।'

'আপনারা দু-জনে মানে?' আবার প্রশ্ন করলাম।

'বাবা আর আমি।'

'আপনার মা কোথায় থাকতেন?'

'মাকে আমি দেখিনি। শুনেছি আমার জন্মের পরেই তিনি মারা গেছেন।'

'আপনারা তো বোম্বাইতে থাকতেন। আপনাদের পোরবন্দরে বাড়ি আর সম্পত্তি কে দেখাশোনা করত?'

মগনভাইজী বললেন, 'আমার কাকা।'

আমি·আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'রলাম না।'

মগনভাইজী বৃষ্টির দিক থেকে চোখ ফেরান নি। সেদিকে তাকিয়ে থেকেই বলতে লাগলেন, 'অর্থবান বাপের একমাত্র সন্তান আমি। বুঝতেই পার—প্রচুর আদরে মানুষ হয়েছি। যখন যা চেয়েছি তাই পেয়েছি। কোনদিন কোন ব্যাপারে আমাকে বিমুখ হতে হয় নি। অবশ্য অন্য সব বড়লোকের ছেলের মত আমি ছিলাম না। আমার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন রকমের। কোনদিন কোন অসঙ্গত বদখেয়ালে আমি পয়সা ওড়াই নি। ছাত্র হিসাবে আমি ভালই ছিলাম। স্কুলের টীচারেরা, কলেজ এবং য়ুনিভারসিটির অধ্যাপকরা বলতেন, 'জুয়েল!' মানুষকে নানারকম নেশায় পায়। কেউ মদে, কেউ বা মেয়েমানুষে ডুবে যায়। আমার নেশা ছিল বই। দিবারাত্রি লেখাপড়ায় মগ্ন হয়ে থাকতাম।'

মগনলালজী আর একবার চুপ করলেন। এদিকে বৃষ্টি থেমে এসেছে। মেঘ এখনও সম্পূর্ণ কেটে যায় নি। আকাশের রঙ তরল সীসার মত। আত্মবিস্মৃতির মত অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। একসময় আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠলেন, দর্শন নিয়ে এম-এ পাশ করেছিলাম। ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছিলাম। বাবার ইচ্ছা ছিল, এম-এ পাশ করার পর আমি তাঁর জহরতের ব্যবসায় বসব। আমার ইচ্ছা ছিল অধ্যাপনা করব। কিন্তু বাবার বা আমার, কারো ইচ্ছাই পূর্ণ হল না।'

'কেন?' নিজের অজ্ঞাতসারে প্রশ্ন করে বসলাম।

'হঠাৎ বাবা মারা গেলেন।' মগনলালজী বলতে লাগলেন, 'বাস্তববুদ্ধি আমার বিন্দুমাত্র ছিল না। জীবন সম্পর্কে আমার যেটুকু জ্ঞান তার সবই ছিল অতীত। এতকাল লেখাপড়া নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। আর কোনদিকে নজর দেবার প্রয়োজন হয় নি। বাবার মৃত্যুর পর দিশাহারা হয়ে পড়লাম। জহরতের ব্যবসা, পোরবন্দরের সম্পত্তি—এসব নিয়ে কী করব, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অকূল সমুদ্রে সাঁতার-না-জানা মানুষের যে অবস্থা হয়, আমার তখন সেই অবস্থা।'

আমি চুপ করে রইলাম।

মগনলালজী আবার আরম্ভ করলেন, 'ভেবে ভেবে আমি যখন অস্থির, সেই সময় কাকার কথা মনে পড়ল। সেই কাকা--যে আমাদের পোরবন্দরের সম্পত্তি দেখাশোনা করত। ভাবলাম তার সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করব। বাবার মৃত্যুর দিন চারেক পরেই জহরতের দোকান বন্ধ করে পোরবন্দর রওনা হলাম। কিন্তু তখন কি জানতাম পোরবন্দরে আমার জন্যে এত বড় একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে!'

অর্ধস্ফুট স্বরে বললাম, 'কী বিস্ময়?'

'পোরবন্দরের বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল। বাবার মৃত্যুর এবং আমার আসার খবর আগেই টেলিগ্রাম করে কাকাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। গাড়ি থেকে নামতেই দেখি ফটকের কাছে কাকা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই কাকা এগিয়ে এল। তার মুখেচোখে ভাইয়ের শোকের চিহ্নমাত্র নেই। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর শুষ্ক নিরুচ্ছ্বাস গলায় বলে উঠল, 'এ বাড়িতে তুমি ঢুকতে পাবে না।' চমকে উঠলাম। বাবা বেঁচে থাকতে যখনই এ বাড়িতে এসেছি আমাকে নিয়ে কাকা উৎসব শুরু করে দিয়েছে। আমার প্রতি তার স্নেহের অন্ত ছিল না। যে কটা দিন থাকতাম আমাকে নিয়ে যে কী করবে ঠিক করে উঠতে পারত না কাকা। সেই স্নেহপ্রবণ মানুষটা বাবার মৃত্যুর চারদিনের মধ্যে এত বদলে গেল কেমন করে? সব কিছু কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হতে লাগল আমার। যাই হোক, চিৎকার করে উঠলাম, 'এ বাড়িতে ঢুকতে পাব না কেন?' কাকা বলল, ঢুকবার অধিকার নেই, তাই।' অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলাম। তারপর ভীত স্বরে বললাম, 'কেন?' কাকা বলল, 'বোম্বাই ফিরে যাও। সেখানে তোমার নামে উকিলের চিঠি দিয়েছি। সেটা পড়লেই সব বুঝতে পারবে।' আমার পায়ের তলায় যেন মাটির আশ্রয় নেই, দেহে কিংবা মনে কোন চেতনা নেই। অনুভূতিশূন্য জড়ের মত আমি বোম্বাই ফিরে এলাম।' এই পর্যন্ত বলে মগনলালজী থামলেন। বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। তিনি চুপ করেই রইলেন।

আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, 'বোম্বাই এসে উকিলের চিঠিটা পেয়েছিলেন তো?'

মগনলালজী চকিত হয়ে উঠলেন। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললেন, 'পেয়েছিলাম।'

'কী ছিল তাতে?'

'ছিল আমার সর্বনাশের খবর। উকিল মারফত কাকা জানিয়েছে—বাবার বাড়ি-জমি-সম্পত্তি আর জাভেরি বাজারের জহরতের দোকানে আমার কোন অধিকার নেই।'

'কারণ?'

'কারণ, আমি নাকি আমার বাবার বৈধ সন্তান নই। আমার মা আমার বাবার বিবাহিত স্ত্রী নন। কাজেই বাবার সম্পত্তিতে আমার আইনসঙ্গত কোন দাবী থাকতে পারে না। আমি যেন এক কাপড়ে সব ছেড়ে চলে যাই। চিঠিটা পড়তে পড়তে আমি যেন উন্মাদ হয়ে গেলাম। মনে হ'ল হৃদপিণ্ডটা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। স্থির করলাম, কাকার সঙ্গে 'কেস্' করব। বলতে বলতে মগনলালজী উত্তেজিত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

চুপচাপ মুখ বুজে আমি শুনে যেতে লাগলাম।

মগনলালজী থামেন নি। 'বাবার অর্থের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। 'কেস্' করে প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম, আমি অবৈধ সন্তান নই। সত্যিই আমি অবৈধ সন্তান না। যদি হতাম নিশ্চয়ই কখনও না কখনও কারো না কারো কথায় বা ব্যবহারে টের পেতাম। অবৈধ জীবন হচ্ছে পারার ঘায়ের মত। তার পরিচয় কিছুতেই লুকিয়ে রাখা যায় না।'

'কেসে কী হ'ল?' আমি শুধোলাম।

'টাকা দিয়ে অনেক সাক্ষীসাবুদ জোগাড় করল কাকা। তাদের জোরে মিথ্যাকে সে সত্য করল। ফল হ'ল কী? মানুষের চোখে আমি নিরর্থক হয়ে গেলাম। সবাই আমাকে ঘৃণা

করতে লাগল। জীবনটা আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মত মনে হ'ল। পৃথিবীটা একেবারে শূন্য হয়ে গেল। জন্মপরিচয়ের মিথ্যা গ্লানি একটু নিষ্ঠুর ব্যাধের মত আমার পিছু পিছু ছুটতে লাগল।' বলতে বলতে মগনলালজী ঘাড় ভেঙে যেন ঝুলে পড়ল।

এ মুহূর্তে আমার যে কী বলা উচিত—ঠিক করে উঠতে পারলাম না।

মগনলালজী ফিস ফিস করে বলতে লাগলেন, 'এত বড় পৃথিবীতে আমার জন্যে এতটুকু স্থান নেই। আমি হেয়, ঘৃণ্য। জগতের চোখে আমি দূষিত আবর্জনামাত্র। কোথায় যাব, কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব। কে আমাকে দু-হাত বাড়িয়ে কাছে টানবে, এই সব ভেবে ভেবে যখন আমি পাগলের মত হয়ে গেছি সেই সময় ডালিনার কথা মনে পড়ল।।'

'ডালিনা কে?'

'এক পার্শী ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের মেয়ে। আমরা সহপাঠী ছিলাম। এক সঙ্গে এম-এ পাশ করেছি। আমরা সহপাঠী, এটুকু বললে যথেষ্ট বলা হয় না। আমরা পরস্পরের অনুরাগী ছিলাম। ডালিনাকে নিজের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই ভাবতাম। আমার সম্বন্ধে ডালিনার মনোভাবও তাই। আমরা বিয়ে করব, এই বোঝাপড়াটুকু পরস্পরের মধ্যে ছিল। আমার বিশ্বাস ছিল, এই দুঃসময়ে সে পাশে এসে দাঁড়াবে। ডালিনা মডার্ণ শিক্ষিত মেয়ে। তার সঙ্গে কথাবার্তায় যেটুকু বুঝেছি, তাতে মনে হয়েছে জন্ম পরিচয় সম্বন্ধে অহেতুক কুসংস্কার তার নেই। আমার ব্যক্তি পরিচয়টাকে নিশ্চয়ই সে মর্যাদা দেবে। কিন্তু—'

'কী?'

'ডালিনার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, 'সম্পত্তির লোভে কাকা তো আমাকে 'অবৈধ সন্তান' প্রমাণ করে দিল। তুমি এসব বিশ্বাস কর?' ডালিনা বলল, 'তোমার কাকা তোমার বাবার আপন ভাই, নিশ্চয়ই সে সমস্ত খবর রাখে। তোমার জন্মের মধ্যে কোন গলদ না থাকলে তার সাধ্য কি যে কেসে জেতে!' শিউরে উঠলাম। ডালিনা আবার বলল, 'আমার বাবার ইচ্ছা নয় এরকম অবস্থায় তোমার সঙ্গে আর মেলামেশা করি।' বুঝলাম, ডালিনা তার বাবার দোহাই দিয়ে নিজের মনোভাবটাই ব্যক্ত করছে। আরও বুঝলাম, যত আধুনিকা যত শিক্ষিতাই হোক, জন্ম পরিচয় সম্বন্ধে সেই পুরনো সংস্কারটা সে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এই করুণাহীন পৃথিবীতে ডালিনাই ছিল আমার শেষ আশ্রয় শেষ ভরসা। শেষ ভরসা আমার হারিয়ে গেল। একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে গেলাম।'

আমি কিছু বললাম না। একদৃষ্টে মগনলালজী নামে এই প্রৌঢ় যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষটির দিকে শুধু তাকিয়ে আছি।

মগনলালজী আবার আরম্ভ করলেন, 'ডালিনার কাছে আঘাত পেয়ে স্থির করলাম, বোম্বাইতে আর থাকব না। যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যাব। বছর কয়েক ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু শান্তি পেলাম না। যখনই কোন মানুষের সংস্পর্শে গেছি, কোন না কোন ভাবে তারা আমাকে প্রতারণা করেছে। শেষ পর্যন্ত আবার বোম্বাইতে ফিরে এলাম।'

'তারপর?' অস্ফুট গলায় বললাম।

'তারপর আর কি।' মগনলালজী বললেন, 'বাবা আমার নামে হাজার পঞ্চাশেক টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন। তার থেকে হাজার দশেক টাকা মামলা আর নানা জায়গায় ঘোরায় খরচ হয়েছে। বাকি টাকা তুলে বোরিভিলিতে এসে এই বাড়ি করেছি। যে মানুষেরা সারা জীবন আমাকে প্রতারণা করল তাদের সঙ্গ চিরকালের জন্য ত্যাগ করেছি। পশুপাখিরাই এখন আমার সঙ্গী, সহচর, বান্ধব। আমার বাড়ির মধ্যে কোন মানুষকে ঢুকতে দিই না।'

মগনলালজী বেতের চেয়ারটা আরো কাছে টেনে বসলেন। শুধোলেন, 'আমার সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল মিটল?'

আমি জবাব দেবার আগেই মগনলালজী আবার বলে উঠলেন, 'সবই তো শুনলে, এবার আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও—'

'কী প্রশ্ন?' আমি নড়েচড়ে বসলাম।

'আমার কাকা, ডালিনা—এরা সব মানুষ। এই মানুষদের একজন হয়ে আমার বাড়িতে ঢোকার কোন অধিকার আছে কী?' মগনলালজীর গলাটা রূঢ়, রুক্ষ, এবং কর্কশ শোনাল।

তাঁর প্রশ্নের উত্তরটা আমার জানা ছিল। কিন্তু দেবার অবকাশ পেলাম না।

বৃষ্টিটা মাঝখানে একটু কমে আবার প্রবলবেগে শুরু হয়েছে। তার মধ্যেই আমার ঘাড় ধরে বাড়ির বাইরে বার করে সদর দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন মগনলালজী।

আষাঢ় ১৩৬৫

অবশেষে

বুদ্ধদেব গুহ

তাপস গত দু'মাস ধরে রেবাকে পড়াচ্ছে। থ্রি ইয়ার ডিগ্রীর ছাত্রী। ইংরাজীতে কাঁচা। তাপসকে রাখা ইংরেজীটা দেখিয়ে দিতে।

পড়াবার সময় লক্ষ্য করেছে তাপস মেয়েটির হাবভাব। তেমন ভাল লাগেনি। পড়া শুনতে শুনতে অযথা অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়। কখন সোজা তাপসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খুব অল্পকারণেই হেসে লুটিয়ে পড়ে। তাপস মুখ গম্ভীর করে থাকে প্রবীণশিক্ষকের ভঙ্গিতে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে তিলমাত্র ভেজাল থাকা উচিত নয়। নিজের ক্ষেত্রে ভেজাল থাকার কোন প্রয়োজনও বোধ হয়নি তাপসের। কারণ, সে ইতিমধ্যেই প্রেমাভিষিক্ত হয়েছে অন্যত্র। নায়িকা থাকেন অবশ্য প্রবাসে—জামসেদপুর। তাই পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ নেই অনেক দিন। গত পূজোয় শেষ দেখা। তা বলে পত্রবিনিময়ে ত্রুটি নেই কোন। ইদানীং নায়িকা প্রতিটি পত্রেই নায়ককে জামসেদপুর যাবার ব্যাকুল আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

তাপসের নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে একেক সময়। তার খুবই উচিত অন্তত একটিবার করবীর সাথে দেখা ক'রে আসা। এমন কীইবা দূর। মেলে চাপলে ঘণ্টা চারেক। প্রত্যেকবার ভাবে তাপস আগামী মাসে নিশ্চয় যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থে ঘাটতি পড়ে যায়। হয় জামাগুলো সব একসঙ্গে ছিঁড়তে আরম্ভ করে, নইলে সুরু হয় মা'র হার্টের অসুখটার বাড়াবাড়ি। যাওয়া আর হয়ে ওঠে না শেষ পর্যন্ত। করবীকে জানায় সে-কথা পত্রযোগে। করবী উত্তর দেয় ওটা ওর নিছক ছল। আসলে ও অন্যত্র...। এখানে ইনটারেস্ট ফুরিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

কোন কোন মুহূর্তে এ-কথাটা তাপসেরও যে মনে হয়নি তা নয়। করবীর প্রতি আকর্ষণ ঠিক আগের মতই অটুট আছে এমন কথা সে নিজেই হলপ করে বলতে পারে না। ভেবে মনে মনে লজ্জা পেয়েছে তাপস। কিন্তু কথাটায় যেহেতু কিছু সত্য আছে, সেহেতু ভাবনাটাকে মন থেকে এক নিমেষে উড়িয়ে দেওয়া যায় কেমন করে?

করবীর প্রতি আকর্ষণ কমে যাচ্ছে কেন? মনকে প্রশ্ন করেছে তাপস। যে কারণটা তার প্রথম এবং খুব সহজেই মনে হয়েছে তা আর কিছুই নয়, করবী বড্ড পুরনো হয়ে গেছে। খুব স্বাভাবিক। করবীর সাথে প্রেম তার বহু কালের।

এছাড়া অন্য কোন কারণ? নতুন কারোও দিকে তার আগ্রহ বাড়ছে নাকি? অবচেতন মনটার গভীর সমীক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। নতুন পরিচিতাদের মধ্যে...রেবা? দূর, ছোট্ট একটা মেয়ে, কীইবা বোঝে এ-সবের। কীই বা বোঝে—কথাটা মনঃপূত হল না। কারণ রেবার চলনে বলনে ও যে অনেক কিছু বোঝে এটাই বরং তার সময় সময় মনে হয়েছে।

'রেবা ছাত্রী', অন্তত এ কথাটাই ব'লে বন্ধুদের মুখ বন্ধ করেছে বহুবার। কেউ কেউ অবশ্য তীক্ষ্ণ প্রশ্ন আরও ছুঁড়েছে! বলেছে, ছাত্রী তো কি? লাভ্ ইজ ব্লাইণ্ড। বলে হেঃ হেঃ করে বেহায়ার মতো মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হেসেছে।

পরের দিন যথারীতি পড়াতে গেলো তাপস। সেদিনও সে লক্ষ্য করল রেবার মাত্রাতিরিক্ত চঞ্চলতা। মাস্টার মশাইর চেয়ে সে-ই বেশী কথা বলে। নানা রকম বায়না

ধরে। বলে, আজ থাক রাসেলের প্রবন্ধটা। ওটা বড় শক্ত। তার চেয়ে একটা কবিতা পড়ি আজ, কেমন?

'ট্রাভেলিং এ্যাজ্ এ পার্ট অব্ এডুকেশন'। ইংরাজী আলোচনা শুনতে শুনতে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন তুলতে থাকে রেবা। বেড়াতে কি মজাই লাগে না? আপনি বেড়াতে ভালবাসেন? বেড়াতে কোথাও গিয়েছেন?

তাপসের ব্যক্তিগত জীবনে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা খুবই সংক্ষিপ্ত। চিন্তা করে দেখলে বড়জোর গিরিডির কথাই মনে পড়ে। গত মহাযুদ্ধে বোমার ভয়ে পালিয়ে ছিল সেখানে। তখন তার ছোটবেলা। এ ছাড়া—হঠাৎ মনে পড়ে গেল জামসেদপুরের কথা। করবীদের বাড়ি জামসেদপুর। বেশ কয়েকবার গিয়েছিল সে সেখানে। রেবাকে জানালো তাই তার বিশাল ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা। এক গিরিডি, দুই জামসেদপুর।

জা-ম-সে-দ-পুর? চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল রেবা, দুই ভুরু তার কপালে গিয়ে ঠেকেছে।

জামসেদপুরের কোথায়? আবার কৌতূহল।

উত্তরটা দেবার ইচ্ছে ছিল না তাপসের। প্রেমের ব্যাপারে একটা গোপনতা রক্ষা করার প্রবণতা সব প্রেমিকেরই অল্পবিস্তর থাকে। তবু বলল. বিষ্টুপুরে।

বি-ষ্টু-পুরে? মাত্রাতিরিক্ত বিস্ময় রেবার।

সেখানে আমার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আছে জানেন?

হবে। নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল তাপস। কে আছে, কি আছে, সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ কি দূর তাতে তার প্রয়োজন কি? তাই প্রসঙ্গান্তরে তৎক্ষণাৎ চলে গিয়ে চড়া গলায় বোঝাতে সুরু করল শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশভ্রমণের ভূমিকা কি।

সেদিন জরুরী একটা কাজ ছিল বলে তাপস একটু আগে উঠল। কিন্তু তবু বাধা পড়ল বেরুতে গিয়ে। আগামী রোববার সকালে মেট্রোতে জুলিয়াস্ সীজার আসছে, দেখেছেন?

না, দেখিনি।

আপনি যাবেন দেখতে?

না।

কেন? চলুন না, আমিও যাবো। একটু থেমে বলল, গাড়িতে নিয়ে যাবার মত কেউ নেই তো, তাই বলছি। বাবার মামলার কতগুলো জরুরী কাজ পড়ে গিয়েছে, উকিলের কাছে দৌড়তে হবে।

রেবার মাও ঠিক সেই সময় এক কাপ চা হাতে নিয়ে ঢুকলেন। এমনি কপাল, আলোচনার বিষয়বস্তু পুরোপুরি না শুনলেও তিনি মেয়ের কথায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে যন্ত্রবৎ সায় দিয়ে গেলেন।

অগত্যা তাপসের গররাজী হবার উপায় রইল না।

ছবিটা দেখার আত্মপক্ষসমর্থনে শেষ কৈফিয়ৎ দিল রেবা : 'জুলিয়াস্ সীজার' আমাদের কোর্সে আছে তো। ছবিটা দেখলে পড়ার কাজটাও হয়ে যাবে।

'জুলিয়াস্ সীজার' দেখার পর থেকেই রেবার সঙ্গে তাপসের অন্তরঙ্গতা অপ্রতিরোধ্যভাবে বেড়ে গেল। ছবি দেখার দিন থেকেই সুরু হয়েছিল খুব স্বাভাবিক রীতিতেই। পাশাপাশি বসে দেখতে দেখতে সেক্সপীয়রের শক্ত লাইনগুলোর তর্জমা করে দিচ্ছিল। রেবা খুব কৃতার্থ বোধ করছিল। তাই ছবিটা দেখতে দেখতে সে একসময় বলল, আপনি না এলে বইটা কিছুই উপভোগ করতে পারতাম না। তাই না?

'শো' ভাঙ্গলে হলের পাশের কাফে ডি মনিকোতে চা খাওয়া হল ছোট্ট কেবিনে ঢুকে

মুখোমুখি বসে। কেমন কেমন বোধ হচ্ছিল তাপসের। তারা যেন শহরের আর পাঁচটা প্রেমিকের মত। এক সময় মনেও পড়ল করবীর কথা। করবীকে নিয়ে মনিকো'তেও একসঙ্গে বসে চা খেয়েছে গত পূজোয়। করবী তখন কলকাতা বেড়াতে এসেছিল।

পরের দিন টিউশনিতে যেতে নিজের পরিবর্তনটা নিজের কাছেই ধরা পড়ল তাপসের। রেবার প্রগল্‌ভতা, মাত্রাতিরিক্ত উজ্জ্বলতা, প্রসাধনের আতিশয্য কোনটাই খারাপ লাগছে না তার। পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে বিষয়ান্তরে চলে যাচ্ছে নিজের অগোচরে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে একটা দুর্লভ জগতের সন্ধান দেবার বাসনা অহরহ মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে, রেবাও তাপসের মুখচোখের ভাবসাব তার স্বভাবসুলভ কৌতূহলের সঙ্গে নিরীক্ষণ করে চলেছে এবং মাঝে মাঝে অকস্মাৎ বেসামাল হাসিতে তাপসের বক্তৃতাকে অভিনন্দিত করছে।

করবীর একখানা চিঠি এল। এবার চিঠির মধ্যে কিছু ফুলের আল্‌গা পাপড়ি পুরে দিয়েছে সে। চিঠিতে অদ্ভুত একটা স্বপ্নের কথা লিখেছে। স্বপ্নটা দেখেছে যে রাত্রে—তার পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই চিঠিটা লিখে ফেলেছে বিছানায় শুয়ে শুয়ে। সম্প্রতি অসুখে ভুগছে সে। স্বপ্ন দেখেছে, তাপস গিয়েছে জামসেদপুর। তার বিছানার পাশে রাখা ছোট্ট কাঠের চেয়ারটায় বসেছে সে। বসে বসে তার জ্বরতপ্ত মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। পরে কোয়া ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিজে হাতে কয়েকটা কমলাও খাইয়েছে। করবী আনন্দে মরতে চেয়েছে সেই মুহূর্তে।

আশ্চর্যের কথা এই চিঠিতে সে আর যেতে লেখেনি তাপসকে। লিখেছে, তোমার যা খুশী তাই কোরো। দু'ছত্র কবিতাও উদ্ধৃত করেছে চিঠির সমাপ্তিতে—

যদি আর-কারে ভালবাসো, যদি আর ফিরে
নাহি আসো
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, আমি
যত দুঃখ পাই গো।

চিঠিটা পড়ে একটা বৃশ্চিক দংশন অনুভব করল তাপস। নাঃ, এরপর আর চুপ করে কলকাতায় পড়ে থাকা যায় না। ধার করেই হ'ক বা নিজের টাকায় হ'ক একটিবার জামসেদপুর যেতেই হবে, গিয়ে দেখা করে আসতেই হবে করবীর সাথে।

আর যেতে হলে এখনই। করবীর অসুখের খবরটা ওকে সত্যিই বিচলিত করে তুলেছে। কিন্তু যাওয়ার প্রধান উপকরণ টাকা, সেই টাকা পাবে কোথা থেকে। এ মুহূর্তে কার কাছেই বা হাত পাতবে। মাসের শেষ, সবার হাতই খালি। সেদিন পড়াতে পড়াতে একসময় রেবার কাছে বিনয় প্রকাশ করে বলল, কয়েকদিনের জন্য তোমার পড়ার ক্ষতি হবে রেবা। আমি জামসেদপুর যাচ্ছি।

রেবার ঠোঁটে সকৌতুক হাসি ফুটে উঠল, কবে?

টাকা পেলেই। বলেই ভাবল—চাইবে নাকি কিছু টাকা ধার? চাইবার কথাটা ঠোঁটের কাছে এসেই পরমুহূর্তে মিলিয়ে গেল। আত্মসম্মানে বাধল মুখ ফুটে বলতে।

কিন্তু রেবার কাছে রেহাই নেই, রোজ পড়াতে এলেই একবার জিজ্ঞেস করবে, টাকা পেলেন?

সত্য কথা গোপন করবার পথ ছিল না, ফলে প্রতিদিনই একবার করে লজ্জার সম্মুখীন হতে হল।

অবশেষে একদিন পড়িয়ে উঠে আসতে যাবার সময় রেবা প্রায় একরকম জোর করেই ষাট্টা টাকা গুঁজে দিল তাপসের হাতে। আর আবদারের ভঙ্গিতে বলল, আগামী সপ্তাহটা আমার ছুটি, আমি পড়ব না।

তাপস বুঝতে পারল সে কথার অর্থ। তবু আত্মসম্মানের খাতিরে বুঝলাম কি বুঝলাম

না—এমন একটা ভান করে সেদিনের মত বিদায় গ্রহণ করল।

এতদিন পর জামসেদপুরে গেল তাপস। কিন্তু প্রায় প্রথম সাক্ষাতেই করবীর সাথে ঝগড়া হয়ে গেল। দেখল, ওর অসুখের খবরটা বানানো। ও স্বপ্নে দেখেছিল ওর অসুখ হয়েছে, যার আনুপূর্বিক ঘটনা ইতিমধ্যেই সবিস্তারে চিঠিতে জানিয়েছে। নানান কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলে আর সবকথার সারমর্ম হল এই যে সে নিজেদের এতদিনকার গোপন সম্পর্কের ব্যাপারখানা এখন পাকাপাকি করে ফেলতে চায়। না হলে বাড়ির পাঁচজনের প্রবল গঞ্জনা সহ্য করতে হচ্ছে। একসময় কথার ফাঁকে এও জানাতে ভুলল না যে ইতিমধ্যে ওর বেশ কয়েকটা বাঘা বাঘা সম্বন্ধ এসেছিল, শুধু তাপসের কথা মনে করেই সে সব প্রত্যাখ্যান করেছে।

তাপসের ইচ্ছে হচ্ছিল তার পরের দিনই চলে আসে। শুধু ভদ্রতা করে থাকার মেয়াদ আর একটি দিন বাড়ালো সে।

রেবা খুব অবাক হয়ে গেল তাপসকে দেখে। একি আপনি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন?

হ্যাঁঃ—যেন একটা বিরক্তিসূচক স্বর বেরিয়ে পড়ল মুখের থেকে।

তাহলে জামসেদপুর ভাল লাগল না? দুষ্টু দুষ্টু হাসতে লাগল রেবা, যেন কিছু একটা বুঝতে পেরেছে। বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে তাকাল একবার তাপস রেবার মুখের দিকে। একেক সময় তাপসের মনে হয়েছে রেবা অসাধারণ বুদ্ধিমতী। আপশোষ করেছে ওর বুদ্ধির সিকিপরিমাণও যদি করবীর থাকত!

টাকাটা ও মাসের গোড়ায় দিয়ে দেবো। তোমার হয়ত বেশ কিছু অসুবিধা হচ্ছে। ক্ষেদ প্রকাশ করল তাপস।

না—না—কিছুমাত্র নয়। আপনার যখন সুবিধা হবে দেবেন।

তাপস রোজই এসে এই টাকার বিষয়ে একবার করে দুঃখ প্রকাশ করে এবং রেবাও যথারীতি প্রত্যুত্তরে সৌজন্য প্রকাশ করতে কার্পণ্য করে না।

হঠাৎ একেক সময় তাপসের মনে হয়েছে রেবা তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে ভালবাসে। টাকাটা যত সামান্যই হ'ক ওটা দিয়ে সাহায্য করে ও মনে মনে একটা তৃপ্তি লাভ করছে। তবে রেবা কি তাকে মনে মনে কামনা করে। একই সঙ্গে এও মনে পড়ল তাপসের জামসেদপুর থেকে ফিরে এসে করবীকে কোন পত্র দেওয়া হয়নি। এমনকি একটা মামুলি পৌঁছ সংবাদও না।

পরের দিন টিউসনিতে গিয়ে প্রথমেই লক্ষ্য পড়ল রেবা আজ ভীষণ সেজেছে।

কি ব্যাপার? অগোচরে প্রশ্নটা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল তাপসের।

বাঃ, আমার সাজতে ইচ্ছে করে না? আমি কি বুড়িয়ে গেছি নাকি?

না, না, তা কেন!

জানেন? গলাটা অনেক নামিয়ে বলল, আজ আমার জন্মদিন। বুড়ো হয়ে গেছি তো তাই জন্মদিনটা আর পালন করার কথা কেউ বলে না।

তাই নাকি? এঃ, আগে জানলে তোমাকে কিছু উপহার দিতাম নিশ্চয়। বিব্রত বোধ করে তাপস।

আচ্ছা উপহার আমি চেয়েই নিচ্ছি। বলে হাসতে থাকে রেবা।

কি?

আজ আমার ছুটি।

ওঃ! এই। খুব হাসতে থাকে তাপস। ওঃ, তুমি এত অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে পারো রেবা?

সত্যিই তুমি অসাধারণ। কেমন বেফাঁস কথাগুলো বলে ফেলে তাপস। বলে ফেলে লজ্জায় জড়সড় হয়ে পড়ে মুহূর্তকয়েক।

রেবা কিছু মনে করে না। দাঁড়ান. বলে অন্দরমহলে কোথায় কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পরে এক কাপ চা হাতে নিয়ে ঢোকে। আর অন্য হাতে ভাঁজ করা—তাপস লক্ষ্য করে ভালো করে—একটা নীল চিঠি।

বুকটা এবার কেমন একটু একটু করে কাঁপতে থাকে তাপসের।

চায়ের পেয়ালাটা সামনে নামিয়ে রাখে রেবা। বলে চা খান। তারপর অনর্গল কত কথা, হাসি, গল্পের ফোয়ারা ছোটে।

রেবার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে গল্প শুনতে ভাল লাগে তাপসের।

তাপসকে এগিয়ে দিতে রেবা বেরিয়ে আসে বারান্দায়। সিঁড়ির আলোটা জ্বালিয়ে দেবার আগেই হাতে কি একটা গুঁজে দেয় তাপসের।

তাপস বুঝতে পারে সেই নীল চিঠিটা, আনন্দে হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে যেন লাফিয়ে উঠতে চায়। হন্ হন্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে গলিটা পার হয়ে একটা নির্জন গ্যাসপোস্টের নিচে তৎক্ষণাৎ খুলে ধরে দুর্লভ চিঠিখানা। একমুহূর্তে নির্দ্বিধায় সিদ্ধান্ত করে ফেলে, করবীর চেয়ে রেবা অ-নে-ক ভাল।

প্রথম নজরেই হাতের লেখাটা কেমন চেনাশোনা ঠেকে, দু'লাইনের ছোট্ট একটা চিঠি।

সুপ্রিয় তাপস,

রেবাকে টাকাটা ফেরত দেবার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। টাকাটা আমার। আমিই পাঠিয়েছিলাম রেবাকে। নিজে গরজ করে তো আসতে না জামসেদপুর, টাকার অজুহাত দেখিয়ে পড়ে থাকতে কলকাতায় অ-ন-ন্ত-কা-ল।

ইতি
তোমার
করবী।

পুঃ ছাত্রীর দিকে নজর রেখো। রেবাও খুব ভাল মেয়ে।

শ্রাবণ ১৩৬৫

—